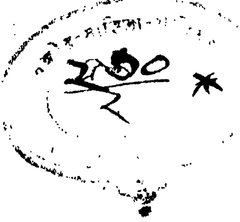
জ্ঞানাঙ্কুর

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১২৮০ অব্দের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮১ অব্দের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত)

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।



ভবানীপুর ;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

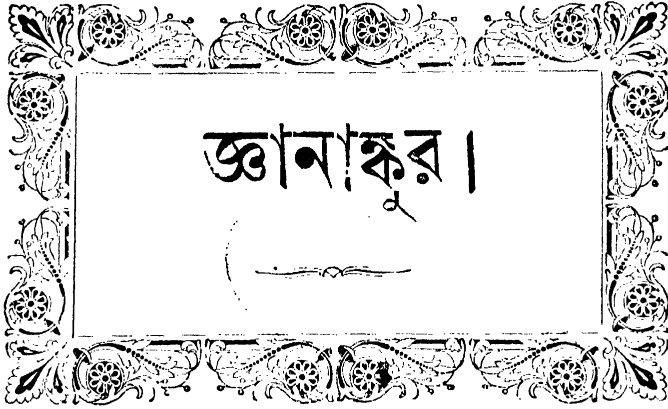
১৮৭৪।

No. 1 Peepulputty Lane, Bhowanipore, Calcutta.

[Vol. II] [Price ... 3.

সূচীপত্র।

—০—



(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড। ১লা অগ্রহায়ণ ১২৮০। ১ সংখ্যা।

আর্য্য জাতি। *

আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে বাস ও তৎকালীন অবস্থার শিক্ষা, বিবাহ, এবং আহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব।

আর্য্যদিগের ইতিহাস গ্রন্থ নাই। ইতিহাস পাঠদ্বারা যত দূর অবগত হইতে পারা যায়, আর্য্য জাতিসম্বন্ধে ততদূর জানিবার উপায় নাই। পরন্তু জাতীয় আচার ব্যবহারাদি সাংসারিক তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে ইতিহাস পাঠ ততদূর কার্য্যকরও হয় না। ইতিহাসে যুদ্ধ, রাজাভিষেক, রাজনিয়ম প্রভৃতি বিষয়ের যেরূপ বাহুল্য বর্ণন থাকে, শিক্ষা, বিবাহ, আহার ও অন্যান্য গৃহ কার্য্যের বর্ণন তত থাকে না। কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা, ধর্ম্ম শাস্ত্র (সকল জাতির পক্ষে নহে) ব্যবস্থা, শাস্ত্র, পুরাণ, দেশ প্রচলিত গল্প, প্রবাদ বাক্য দ্বারাই বিশেষ রূপে জাতীয় আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যায়।

* ঋগ্বেদ, মনু, স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত।

হিন্দুদিগের বিবরণ অবগত হইতে হইলে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ কাব্য নাটকাদি পাঠ করা আবশ্যক।

ঋগ্বেদ দৃষ্টে, বোধ হয়, আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন। পণ্ডিতেরা বলেন, পারস্য দেশের নিকটে ইরান্ নামক যে স্থান আছে, তাঁহারা ঐ দেশের অধিবাসী ছিলেন। কালে ইহাঁরাই ভারতবর্ষে আর্য্য, গ্রীসে গ্রীক, ইটালীতে রোমক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ, ফরাশী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতি সকলও এই আর্য্য বংশ সম্ভূত। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিকস্থ কোন দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বর্ষা একটি স্বতন্ত্র ঋতু, এ নিমিত্ত এদেশে বর্ষা ঋতু অবলম্বন করিয়াই বৎসর গণনা করা

হয়, আমাদিগের ভাষায় বৎসরের একটি নাম বর্ষ। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ হিম ঋতু অবলম্বন করিয়া বৎসর গণনা করিতেন, তৎকালে হিম শব্দে বৎসর বুঝাইত।

ঈশানাসঃ পিতৃ বিত্তস্য রায়ো
বিসূরয় শত হিমা নো অশ্যাঃ!

আমাদের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধনের স্বামী, বিদ্বান্, ও শত হিম (অর্থাৎ শত বর্ষ) জীবী হয়। ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশানুবাকের নবম সূক্ত, ৮০৫ ঋক শেষার্দ্ধ।

তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।

শত হিম ঋতু জীবিতবান্ পুত্র ও পৌত্র যেন আমরা পোষণ করি। ১ম অষ্টক, ৬৪ সূক্ত, ১৪ ঋক্।

হিম প্রধান দেশবাসী না হইলে হিম-ঋতু অবলম্বন করিয়া কখনও বর্ষ গণনা করা হইত না। ফলতঃ হিমপ্রধান দেশ যে আদিমার্য্যগণের নিবাসভূমি ছিল, ঋগ্বেদে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালে আর্য্যগণ ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এদেশে আগমন এক সময়ে হয় নাই, প্রত্যুত বহু কাল লাগিয়াছিল। পথিমধ্যে এবং এদেশে আসিয়াও আর্য্যগণকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বোধ হয়, জাতিভেদ প্রণালী বদ্ধমূল ছিল না; কিন্তু পরাজিতগণ তখনও হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল—ঋগ্বেদে দেখা যায়;—

"মনবে শাসদব্রতান্
ত্বচং কৃষ্ণা মরন্ধয়ং"

ইন্দ্র দেব যজ্ঞবিহীন কৃষ্ণ চর্ম্ম লোকদিগকে শাসন করিয়া মনুর (অর্থাৎ মনু বংশোদ্ভব আর্য্যদিগের) অধীন করিলেন। ঋগ্বেদ ২অষ্টক, ১৩০ সূক্ত, ৮ ঋক্।

সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ
সনৎ সূর্য্য সনৎদপঃ সুবজ্রঃ।

ইন্দ্র তাঁহার শ্বেতবর্ণ সখাদিগকে, ক্ষেত্র, সূর্য্য ও জল দিলেন। ১ অষ্টক, ১০০ সূক্ত, ১৮ ঋক।

এই সকল শ্লোক দ্বারা তাহাদের ভারতবর্ষাধিকারের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়; তৎকালীন আর্য্যগণ শ্বেতবর্ণ ও পরাজিতগণ কৃষ্ণকায় ছিল। আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে ঘৃণা করিতেন।

এরূপ ঘৃণা যে কেবল আর্য্য জাতিরই ছিল, এমন নহে; জগতে এখন পর্য্যন্ত এমন জাতিই দেখা যায় নাই, যাঁহারা পরাজিত জাতিকে সমকক্ষ জ্ঞান করিয়াছেন, কি করিতেছেন।

ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যগণ পশু পালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিতেন, গাভী সকলের মঙ্গল কামনায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি দেবতার নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করা হইত। তৎকালের রচিত ঋক সকলের মধ্যে অনেক সময় জল প্রার্থনা দেখা যায়। কৃষির চর্চ্চা না থাকিলে এরূপ প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা যায় না। তখন অশ্বাদি পশুর ব্যবহারও ছিল, দ্রুতগামী অশ্ব ও দুগ্ধবতী গাভীর নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা হইত।

এই সময়ে কৃষিজাত শস্য, মৃগয়ালব্ধ বা পশু পালনজাত মাংস ও দুগ্ধ এবং ফল মূল আর্য্যগণের আহারীয় ছিল। তাঁহাদের গৃহ কার্য্য বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইত, ঋষিগণ নিরন্তর সাংসারিক সুখকামনায় যজ্ঞ ও দেবতাস্তুতি পাঠ দ্বারা সময়াতিপাত করিতেন। তৎকালে অক্ষর না থাকায়

শিক্ষারও বিশেষ উন্নতি ছিল না, সুমধুর কবিতাময় ঋক সকল আর্য্যসন্তানগণ মুখস্থ রাখিতেন ; সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি তাৎকালিকী সমুদয় বিদ্যাই এই কবিতাময় বেদে নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণসন্তানেরা এই সকল ঋক্ যজ্ঞ স্থলে ও গুরুগৃহে নিরন্তর গান করিতেন। যখন বেদ বহু শাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল, তখন এক ব্যক্তির সমুদয় বেদ অভ্যাস করিয়া ব্যাখ্যা অসম্ভব। অতএব এক এক বংশের লোকে এক এক বেদ অভ্যাস করিয়া রাখিতেন। যে পরিবারে যে বেদ অভ্যস্ত হইত, তাঁহারা সেই সেই বেদী বলিয়া অভিহিত হইতেন ; অর্থাৎ যাঁহারা ঋক্ অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা ঋগ্বেদী, এই রূপে যজুর্ব্বেদী, সামবেদী ইত্যাদি। কাল প্রভাবে প্রত্যেক বেদ বিস্তৃত হইয়া উঠিলে এক এক বেদও এক এক ব্যক্তির অভ্যাস করিয়া ব্যাখ্যা সাধ্যায়ত্ত রহিল না। তখন এক এক বেদের এক এক শাখা এক এক পরিবারে অভ্যাস করিতেন ; তদনুসারে তাঁহারা অমুক বেদী অমুক শাখী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, অর্থাৎ যে পরিবারে যে বেদের যে শাখা অভ্যস্ত হইত, তাঁহারা সেই বেদী সেই শাখী বলিয়া বিখ্যাত হইতেন। মনে কর, রাম অথবা তাঁহার বংশ পরম্পরা সাম বেদের কুথুম শাখা অভ্যাস করিয়াছেন, অতএব রাম সামবেদী কুথুম শাখ্যাস্থ ব্রাহ্মণ। এক্ষণেও ব্রাহ্মণদিগের পরস্পর পরিচয় স্থলে এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদ ও শাখার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে।

অক্ষর স্থষ্টির পূর্ব্বেই বেদ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। যে সকল পরিবারে এই বেদ অভ্যস্ত থাকিত, তন্মধ্যে কোন কোন পরিবার নির্বংশ হওয়াতে বেদের সেই সকল শাখাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে আর্য্য জাতির সাংসারিক উন্নতি যেরূপ ছিল, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারা তত উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ প্রভৃতি ভৌতিক উপাসনাই প্রবল রূপে চলিত ছিল। আর্য্যগণ এই সকল দেবতার নিকট সাংসারিক উন্নতির অর্থাৎ পুত্র, ধন, পশু প্রভৃতিরই প্রার্থনা করিতেন ; পরকালের ভাব তাঁহাদের মানস ক্ষেত্রে অল্পই উদয় হইত। তখন আর্য্যেরা অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন। এই অনেকেশ্বরবাদিতা অথবা ভৌতিক উপাসনা তাঁহাদিগের দোষ নহে, আদিম জাতি মাত্রই প্রথমে ভৌতিক উপাসনা করিত ; সূর্য্যের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, অগ্নির অচিন্ত্য শক্তি ও উপকারিতা দৃষ্টে আদিম নরগণ যে প্রথমতঃ ঐ সকল পদার্থকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর রূপে কল্পনা করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই সকল ভৌতিক পদার্থের শক্তি সকল যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কথঞ্চিৎ বিজ্ঞানের সমালোচন ব্যতীত তাহা অনুভূত হইবার নহে। ঈশ্বরের সত্ত্বা যদিও সহজজ্ঞান দ্বারা অনুভব হয়, তথাপি শিক্ষা ব্যতীত সেই সহজজ্ঞানলব্ধ ঈশ্বরের ভাব এবং ঈশ্বরোপাসনা পরিস্ফুট ও বিশুদ্ধ হইবার নহে।

এখনও আমরা এই সকল জড় পদার্থের শক্তি দৃষ্টেই জগদীশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি অনুভব করিতেছি, ভৌতিক পদার্থের উপকারিতা দৃষ্টে তাঁহার দয়া, জগতের সুকৌশল দৃষ্টে তাঁহার

অনন্ত জ্ঞান, ও অদ্ভুত শক্তি দৃষ্টে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি অনুভব করিতেছি। ফলতঃ ভৌতিক জগতে অবস্থান করিয়া এই জগতের সহিত আমাদের মনোবৃত্তির সম্বন্ধজনিত যে সকল উপকারিতা ও কৌশল দেখিতে পাই, আমরা তাহাই অনন্ত পরিমাণে ঈশ্বরে দৃষ্টি করি। দয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা আমাদের ক্ষুদ্র মানসক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহাই প্রকৃষ্ট রূপে ও অনন্ত পরিমাণে ঈশ্বর হইতে অনুভব করি। আমাদের মনে যে সৎপ্রবৃত্তি নাই, ঈশ্বরে সেই সৎপ্রবৃত্তি আমরা অনুভবও করিতে পারি না।

যদিও আর্য্যদিগের মধ্যে বহুকাল জড়োপাসনা চলিত ছিল, কিন্তু ঋগ্‌বেদেই দেখা যায় যে, অগ্নি প্রভৃতির নিকট "পরতত্ত্ব শিক্ষা দাও" বলিয়া আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেছেন, এইটী ঋগ্‌বেদের মধ্যমাবস্থা। বোধ হয়, এই সময় হইতেই পরকালের ও একেশ্বরের ভাব আর্য্যদিগের মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা এই সময়েও অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন।

কালে আর্য্য সমাজে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়। যে সময়ে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব আর্য্যদিগের মানসমন্দিরে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ সময়কে ঋগ্‌বেদের শেষ সময় বলা যায়। এই সময়েই বোধ হয়, ঋক্ প্রভৃতি বেদ গুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেননা ঋক বেদেই "দ্বাসু পর্ণা সুযুজা সখায়।" প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বচন দেখা যায়।

বলা হইল যে, ঋগ্‌বেদেই জড়োপাসনা ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম জ্ঞান উভয় বিষয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। এই জড়োপাসনার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ আর্য্যগণ প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থের স্বতন্ত্রং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাসনা করিতেন। এই সময়ে পরকালের ভাব তাঁহাদের মনে ছিল কি না সন্দেহ। পরে অনতি পরিস্ফুট রূপে পরকালের ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাও ঋগ্‌বেদেই দেখা যায়। সর্ব্ব শেষে "দ্বাসুপর্ণা" ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রতিপাদক বচনও ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায়। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঋগ্‌বেদ এক সময়ে বা এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই; উহা যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, ঋক্‌বেদেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ উহা বহু কালে রচিত হইয়াছিল। যদিও কত দিনে উহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিবার উপায় নাই, কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আর্য্য জাতির আদিম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নতির অবস্থা হইতে যত সময় লাগিয়াছিল, ঋগ্‌বেদের রচনা কার্য্যও তত কালে সম্পন্ন হইয়াছে। যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ ঋগ্‌বেদের পরে রচিত হইয়াছে। ইহার পরে উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল। এই উপনিষদের সময় আর্য্যজাতি ধর্ম্ম বিষয়ে এত উন্নত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উদ্ভাবিত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি মত গুলি অতীব উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত ছিল।

এক্ষণে চারি বেদের বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। বেদ দুই অংশে বিভক্ত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অন্য নাম সংহিতা। মন্ত্র ভাগে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে; ব্রাহ্মণে সংহিতার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ

ভাগ উপনিষৎ। তাহাতে এক মাত্র পর ব্রহ্মের কথা আছে। তৎকালে অক্ষর ছিল না, সুতরাং লোকে বেদ গুরুপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিত, এই নিমিত্ত বেদের অন্য নাম শ্রুতি। মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা এই বেদার্থ সঙ্কলন করিয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার এবং রাজনীতি দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম স্মৃতি। অনেক স্মৃতিকর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২০ জন ঋষি প্রধান। সকল স্মৃতি হইতে মনু-স্মৃতি প্রধান। ইহা ব্যতীত পুরাণ প্রভৃতি দ্বারাও তাৎকালিক আচার ব্যবহার অনেক জানা যায়। পুরাণে সহস্র অত্যুক্তি থাকুক, তথাপি পৌরাণিক সময়ের আচার ব্যবহার জানিতে হইলে উহা স্মৃতি অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয়। প্রধান পুরাণ ১৮ খানি, এতদ্ব্যতীত অনেক উপপুরাণ আছে। দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

মনুসংহিতা। এই গ্রন্থ বৈদিক সময়ের বহুকাল পরে হইলেও অন্যান্য সমুদয় স্মৃতি ও পুরাণের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, মনুর ভাষার সহিত উপনিষদের ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই গ্রন্থ আর্য্য জাতির উন্নতির প্রথমাবস্থায় রচিত। বোধ হয়, উপনিষদের সময়ের অব্যবহিত পরেই মনু রচিত হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, মনুসংহিতা এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা রচিত হয় নাই। ইহাও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থ দ্বারা আর্য্যদিগের সামাজিক আচারাদি যেরূপ জানা যায়, ইহার পূর্ব্বের কোন এক গ্রন্থ দ্বারা সেরূপ অবগত হইবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা সকলেই মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মুখে তাঁহারা যতই কেন মনুর প্রাধান্য স্বীকার করুন না, তাঁহাদের গ্রন্থে মনুর বিরুদ্ধ ব্যবস্থাও দেখা যায়। এরূপ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে, কেননা মনুসংহিতা এ দিকে যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র, অপরদিকে উহা রাজ্য শাসনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিশেষ। চিরকাল এক ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ শাসন চলে না, সমাজের প্রকৃতি অনুসারে রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন আবশ্যক, বোধ হয়, উত্তর কালের স্মৃতি সকল এই নৈসর্গিক নিয়মের বশীভূত হইয়া মনুর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্মৃতি সকলে পরস্পর ভিবিন্ন মত অতি অল্প, অধিকাংশ স্থলেই সকল স্মৃতির প্রায় এক মত।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন পূর্ব্ব প্রচলিত আইনের সহিত পর প্রচলিত আইনের বিভিন্নতা দেখা যায়, স্মৃতি সকলের বিভিন্নতাও সেই রূপ। এখন যেমন কোন আইন পাঠ করিলে তাহার পূর্ব্ব প্রচলিত আইনের আভাস পাওয়া যায়, এই রূপে পরের স্মৃতি পাঠ করিলে পূর্ব্ব স্মৃতির অনেক আভাস পাওয়া যায়।

মনুসংহিতায় জাত কর্ম্ম, শিক্ষা, বিবাহ, আহার ব্যবস্থা, জাতিগত ব্যবসা পদ্ধতি, যুদ্ধ, রাজনীতি, বিচারপ্রণালী প্রভৃতি সাংসারিক সমুদয় ব্যবস্থা দেখা যায়। মনু পাঠে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, ইহার সমুদয় ব্যবস্থা কখনও কোন সমাজে চলিত কি না, সন্দেহ। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার অধিকাংশ যে চলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। মনুতে যে সকল ব্যবস্থা দেখা যায়,

তাহার অধিকাংশ মনুর স্বকপোল কল্পিত নহে। স্থানবিশেষে বৈদিকব্যবস্থা, স্থানবিশেষে তৎকালের আচার ব্যবহার ব্যবস্থা রূপে গৃহীত হইয়াছে। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুন্নত সময় আর্থাৎ মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত আর্য্যগণের শিক্ষা, বিবাহ, ও আহার সম্বন্ধে কি রূপ রীতি ছিল, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শিক্ষা। যদিও প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক বা তাহার পরের সময় পর্য্যন্ত আর্য্য জাতির আচার ব্যবহারের সহিত শিক্ষা প্রণালীর তথা শিক্ষিতব্য বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উপনয়নের পর হইতে গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক শিক্ষা লাভের নিয়মের কোন পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয় না। সত্য বটে, অধিকাংশ রাজপুত্র স্বগৃহে থাকিয়া শিক্ষা করিতেন কিন্তু এটী সাধারণ নিয়ম নহে। এক্ষণে যেমন ইউরোপে ও এদেশে স্থানে স্থানে বোর্ডিঙ্ স্কুলের রীতি চলিত আছে, প্রাচীন আর্য্যগণ মধ্যেও এতাদৃশ রীতি ছিল।

প্রথম সময়ে বেদের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি ছিল এবং শিক্ষারও প্রধান বিষয়ই বেদ ছিল; কালে নানাবিধ বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইলে বেদের প্রতি লোকের আন্তরিক ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকিলেও মুখে বেদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেই করিতেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করেন, তাঁহারাও শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বকীয় দর্শনের সমর্থনে ত্রুটি করেন নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী যে সকল দর্শন আছে, তৎসমুদয় গ্রন্থকর্ত্তারাই শ্রুতি প্রমাণ অমোঘ বলিয়া স্বীয় বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই রূপে কালে একটি শ্রুতি বাক্যের যে নানা রূপ অর্থ হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ অনেক স্থলে যে দুই গ্রন্থকর্ত্তা এক শ্রুতি বাক্যের পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। মনু সংহিতায় লিখিত আছে, দ্বিজগণ উপনয়নের পরে ক্রমাগত ৩৬ কিম্বা তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৮ কিম্বা তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৯ বৎসর অথবা যত দিন সমুদয় বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারা যায়, তত দিন পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম কার্য্যত যদিও ঠিক প্রতিপালিত না হউক, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, অনেকেই বহুকাল গুরুকুলে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। তখন পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহ হইত না।

এক্ষণে যেমন রবিবারে কিম্বা অন্যান্য পর্ব্বাহ উপলক্ষে স্কুলের কার্য্য বন্ধ থাকে, তৎকালেও প্রতিপদ, অষ্টমী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে কিম্বা বিশেষ কারণ উপলক্ষে কোন কোন দিন পাঠ বন্ধ থাকিত।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন ব্যক্তি বিশেষকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত দেখা যায়, তৎকালে এক এক ব্যক্তিতে নানা বিধ শাস্ত্র জ্ঞান অতি বিরল ছিল। ব্যক্তি বিশেষের শাস্ত্র বিশেষে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও শাস্ত্র বিশেষে অনভিজ্ঞতাই বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এবং সাধারণের শিক্ষা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্য সন্তানগণ গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে ছাত্র শিক্ষকের পরস্পর ব্যবহার এক্ষণকার অপেক্ষা প্রশংসনীয়

ছিল, পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় ভক্তি ও স্নেহ করিতেন। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আহার প্রদান করিতেন। তখন মুদ্রা যন্ত্র ছিল না, সুতরাং পাঠ্য পুস্তক সকল ছাত্রেরা স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। যদি কখনও অন্য ব্যয়ের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন হইত, ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করিতেন।

শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বেতন গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শিক্ষকের গোরক্ষণ, কৃষি কার্য্য প্রভৃতি অনেক সাংসারিক কার্য্য ছাত্রগণ স্বহস্তে করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের ভিক্ষা লব্ধ ধন শিক্ষক পাইতেন। অনেক ছাত্র পাঠ সমাপ্তি হইলে গুরুদক্ষিণা বলিয়া শিক্ষককে এক কালীন কিছু দান করিয়া আসিতেন। এতদ্দ্বারা শিক্ষক দিগের সংসার নির্ব্বাহ হইত, এমত বোধ হয় না। রাজ সাহায্যই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।

অস্ত্রশিক্ষা। এক্ষণে যেমন আমরা সাহিত্য গণিতাদি মানসিক শিক্ষাকেই এক মাত্র শিক্ষা মনে করিয়া থাকি, তৎকালে এরূপ শিক্ষা আদরণীয় ছিল না। তখন শারীরিক শিক্ষা অর্থাৎ যাহাতে শরীর সবল হয়, অস্ত্রাদি চালনায় নিপুণতা জন্মে, মৃগয়া বা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়, এই সকল বিষয় শিক্ষাকেও লোকে শাস্ত্রাধ্যয়নের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কেবল রাজপুত্রগণ অথবা ক্ষত্রিয় জাতিই যে একমাত্র অস্ত্র বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন, এরূপ নহে; সাধারণতঃ সকলেই অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। তবে রুচিভেদে আগ্রহভেদ হইয়া থাকে; যে বিষয়ে যাঁহার অধিক আগ্রহ, তিনি সেই বিষয়েই যত্ন করিতেন। পরিশেষে কেহ বা শস্ত্রে কেহ বা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিতেন ও ইচ্ছানুরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। নতুবা ব্রাহ্মণ হইলে অস্ত্রশিক্ষা করিবে না, অথবা ক্ষত্রিয় হইলে বেদাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শস্ত্র বিদ্যার অনুশীলন করিবে, এরূপ কোন নিয়ম ছিল না।

পরশু রাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু ইহাঁরা অস্ত্র বিদ্যায় এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে অনেক রাজপুত্র ইহাঁদের অন্যতমের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকে প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধা হইয়াও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া মনে২ গৌরব করিতেন। এইসকল ব্রাহ্মণদিগের অস্ত্রবলে এক সময় ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়াছিল।

যেমন ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী লোক পাওয়া যায়, সেই রূপ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শাস্ত্র বিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত দুর্লভ নহে। বিশ্বামিত্র ও জনক ঋষি উভয়ই ক্ষত্রিয়সন্তান, কিন্তু ইহাঁদিগের নিকট অনেক ব্রাহ্মণকুমার বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিতে যাইতেন।

তবে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে সাধারণতঃ অধিকাংশই শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ক্ষত্রিয় জাতি অধিকাংশ অস্ত্র শিক্ষা করিতেন তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলেই অস্ত্রাদি শিক্ষা করিবে না, কিম্বা ক্ষত্রিয়দিগের শাস্ত্র চিন্তা করিতে নাই, এমন কোন নিয়ম ছিল না।

তৎকালীন সমাজে বংশ মর্য্যাদা বলিয়া কোন গৌরব ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনিই সমাজ মধ্যে আদরণীয় ছিলেন। বেদে

উল্লিখিত কবস ঋষি শূদ্র সন্তান ও পুরাণে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়াও স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বেদ ব্যাসের জন্ম বৃত্তান্ত সকলেই জ্ঞাত আছেন, তিনি কানীন সন্তান হইয়াও অসাধারণ বিদ্যাবলে সমাজমধ্যে যেরূপ মান্য হইয়াছিলেন, কোন সুজাত ঋষি কুমারের অদৃষ্টেও সেরূপ সম্মান ঘটে নাই।

এ দিগে কর্ণ, অলাম্বুষ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ আজীবন হীন বংশজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিয়া স্বকীয় ভুজবীর্য্য বলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান অপেক্ষাও অত্যধিক সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী শিক্ষা। স্মৃতি ও পুরাণাদি পাঠে বোধ হয, তৎকালে স্ত্রী শিক্ষার রীতি বিলক্ষণ ছিল।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধন রত্ন সমম্বিতা।

কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবে, যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবে, এবং ধন রত্নের সহিত বিদ্বান বরকে দান করিবে। মহাভারতের বন পর্ব্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির সংবাদে লিখিত আছে।

প্রিয়াচ দর্শনীয়াচ পণ্ডিতাচ পতিব্রতা।
অথ কৃষ্ণাধর্ম্ম রাজমিদং বচনমব্রুবীৎ॥

প্রিয়া, দর্শনীয়া, পণ্ডিতা, পতিব্রতা কৃষ্টা ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন।

এই বচনে পণ্ডিতা এই বিশেষণ পদ দেখিতে পাওয়া যায়, সমাজ মধ্যে স্ত্রী জাতির লেখা পড়ার চর্চা না থাকিলে কখনই "পণ্ডিতা" এই বিশেষণ দেওয়া হইত না। শ্রীমদ্ভাগবতে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল গ্রন্থ ও এই রূপ অপরাপর গ্রন্থ দৃষ্টে বোধ হয়, তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল।

যদিও কোন কোন স্মৃতিতে স্ত্রীলোকদিগের বেদ পাঠে অধিকার দেওয়া হয় নাই, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা পুস্তকগত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা শ্রুতিতে স্পষ্ট দেখা যায়, স্ত্রী লোকেরাও পুরুষের ন্যায় বেদ পাঠ করিতেন।

এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবদন্তি।
হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম।

এই শ্রুতি দ্বারা গার্গির বেদাধ্যয়নের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই রূপ মৈত্রেয়ী প্রভৃতি অন্যান্য স্ত্রী লোকেরাও বেদাধ্যয়ন করিতেন। ফলতঃ তৎকালে স্ত্রী লোকে যে কেবল লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন, এমন নহে। পরিবার বিশেষে শিল্প বা সঙ্গীতাদিরও আলোচনা হইত। দায়ভাগে "শিল্পার্জ্জিত-ধন" বলিয়া স্ত্রী ধন প্রকরণে যে উক্ত আছে, ঐ ধন স্ত্রী লোকেরা শিল্প দ্বারা লাভ করিতেন। এবং মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বিরাট রাজ কন্যার সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। এতদ্দ্বারাই অনুভব হইতেছে, পরিবার বিশেষে শিল্প সঙ্গীতাদির আলোচনা ছিল।

অনেক স্ত্রীলোক স্বয়ং শকটাদি চালাইতেও পারিতেন; তৎকালে স্ত্রীগণ এক্ষণকার ন্যায় অন্তঃপুরনিরুদ্ধ থাকিতেন না। মহাভারতে সুভদ্রাহরণ পর্ব্বে দেখা যায় যে, সুভদ্রা, সত্যভামা কৃষ্ণ, ইহাঁরা অনেক সময় রথারোহণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, সুভদ্রা স্বয়ং সারথির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বিবাহ। ঋগ্বেদের সময় হইতেই

আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রণালী দেখা যায়, ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে বিবাহ প্রথা কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। ঋগ্‌বেদে বর ও কন্যার আচরণগত কিঞ্চিৎ উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু তৎকালের বিবাহ প্রথার বিস্তার বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। মনু সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র ও পুরাণাদি পাঠ দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, এ স্থলে তাহাই লিখিত হইল।

ইহা বক্তব্য যে, হিন্দু জাতির বিবাহ, আচার ও ব্যবহার উভয়াত্মক সংস্কার; ইহা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের দশ বিধ সংস্কারের শেষ সংস্কার, ও শূদ্রের এই এক মাত্র বৈদিক সংস্কার।

হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অবিবাহিত ব্যক্তির অনেক প্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়ার অধিকার নাই। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে;

তিন ঋণ (ঋষিঋণ, দেব ঋণ, পিতৃ ঋণ) পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। যে ঐ তিন ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করে, তাহার অধোগতি হয়। বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং শক্ত্যনুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। কোন দ্বিজ বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ নিষ্পাদন না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার অধোগতি হয়। শ্রুতিতেও এই রূপ ব্যবস্থা পাওয়া যায়।

মনু সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে বিবাহের আট প্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা;—

১ ব্রাহ্ম, ২ দৈব, ৩ আর্ষ, ৪ গান্ধর্ব্ব, ৫ প্রাজাপত্য, ৬ আসুর, **৭ রাক্ষস,** ৮ পৈশাচ।

১। কন্যাকে বসনাচ্ছাদিতা করিয়া বেদবেত্তাকে আহ্বান ও অর্চনা পূর্ব্বক যে দান করা হয়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ।

২। কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া যজ্ঞ ব্রত ঋত্বিক্‌কে যজ্ঞ সম্পাদন কালে যে দান করা হয়, তাহার নাম দৈববিবাহ।

৩। বর হইতে এক বা দুইটী গো মিথুন ধর্ম্মার্থে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কন্যাদান করার নাম আর্য বিবাহ।

৪। উভয়ে ধর্ম্ম কর, এই বলিয়া বরকে কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

৫। কন্যা ও তাহার পিত্রাদিকে যথা শক্তি ধন দিলে পর যে কন্যা প্রদান করা হয়, তাহার নাম আসুর বিবাহ।

৬। স্ব স্ব ইচ্ছাতে বর ও কন্যার পরস্পর সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এই বিবাহের ঘটনা কামাশক্ত ভাবে হইয়া থাকে।

৭। কন্যার পিত্রাদিকে হত ও আহত করিয়া রোদনপরায়ণা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহের নাম রাক্ষস বিবাহ।

৮। কন্যা সুপ্তা, মত্তা বা প্রমত্তাবস্থায় থাকিলে, গোপনে ঐ কন্যা গমন করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা সকলেই মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; কোন কোন স্মৃতিতে মনুর লিখিত আট প্রকার বিবাহ বিভিন্ন ছন্দে উদ্ধৃত পর্য্যন্ত হইয়াছে।

প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের, **গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর** বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের বিধেয়। পৈশাচ

বিবাহ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মনুতেও পৈশাচ বিবাহ অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণেরা ইচ্ছানুসারে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিবাহ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা নিকৃষ্ট প্রণালীর বিবাহ করিবে না।

বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থের পরেই মনুর সময়। বোধ হয়, মনুর লিখিত ৮ প্রকার বিবাহের মধ্যে অনেক প্রকার বিবাহ বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল।

পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, তৎকালে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, ভীষ্ম কাশীরাজতনয়াদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুভদ্রাহরণ, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি প্রস্তাবেও রাক্ষসবিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে পুরাণে গান্ধর্ব্ব বিবাহেরও অনেক প্রমাণ আছে। শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যজাতির ও শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের বিবাহ গান্ধর্ব্ব প্রণালীতে হইয়াছিল।

এই গান্ধর্ব্ব প্রণালী ব্যতীত স্বয়ংবরের প্রথাও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। স্বয়ংবর দুই প্রকারে সম্পন্ন হইত,—১ম, বহুতর বিবাহার্থী উপস্থিত হইলে কন্যা তন্মধ্যে এক জনকে মনোনীত করিয়া লইতেন। ২য়, একটি বিশেষ বিষয়ে পণ থাকিত, যে বিবাহার্থী ঐ বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিতেন, তিনিই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। ইন্দুমতীর সহিত অজয় এবং দময়ন্তীর সহিত নলরাজার বিবাহ প্রথম বিষয়ের উদাহরণ, ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্রের সীতা লাভ ও লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুনের দ্রৌপদী প্রাপ্তি শেষোক্ত বিষয়ের প্রামাণ।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ এবং স্বয়ংবর প্রথা পর্য্যালোচন করিলে বোধ হয়, কি প্রথম সময়ে, কি শেষ সময়ে, কোন কালেই উন্নত আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে এক্ষণকার ন্যায় বর কন্যার নিতান্ত স্বাধীনতার অভাব ছিল না। যদিও কোন কোন স্মৃতিতে বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থা যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। ইন্দুমতী, দময়ন্তী, সুভদ্রা, রুক্মিণী প্রভৃতি আর্য্য রমণীগণ যেমন নানা বিষয়ে গুণবতী ছিলেন, এক্ষণকার নিতান্ত পরাধীনা আর্য্যনারী অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক স্বাধীনতাও ছিল। তাঁহারা সকলেই স্বং ইচ্ছানুসারে পতি মনোনীত করিয়াছিলেন। এক্ষণকার, কুল বা ধন লুব্ধ কোন কোন পিতার ন্যায় কেহই তাঁহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাত্রস্থা করিতে পারেন নাই।

যদিও মনুসংহিতায় বাল্য বিবাহের আভাস পাওয়া যায় বটে, এই সংহিতারই স্থানান্তরে লিখিত আছে, ঋতুমতী হইয়াও কন্যা তিন বর্ষকাল অপেক্ষা করিবে। কিন্তু অন্যান্য স্মৃতিকর্ত্তা এ ব্যবস্থা মান্য করেন নাই। কেহ কেহ বাল্য বিবাহের স্পষ্ট বিধান করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদি পাঠদ্বারা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে, এ ব্যবস্থা পুস্তকগত ছিল। কেননা স্বয়ংবর বা গান্ধর্ব্ববিবাহে পতি মনোনীত করিয়া লওয়া কখনও অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার সাধ্য নহে। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রেও বাল্য বিবাহের এক প্রকার নিষেধ দেখা যায়।

ঊন ষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চ বিংশতিং
যদ্যাবিত্তে পুমাম্ গর্ভং কুক্ষিস্থ সবিপদ্যতে।
যাতোবা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ॥

যে পুরুষ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হয় নাই, তৎকর্ত্তৃক যদি ষোল বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই মরিবে অথবা যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও বহু দিন জীবিত থাকিবে না, জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইবে।

যিনি যথার্থ, অনুসন্ধিৎসু হইয়া পুরাণাদি গ্রন্থ গুলি পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন, উন্নত আর্য্যদিগের মধ্যে কখনও বাল্য বিবাহ ছিল না; এই প্রথা আর্য্য সন্তানগণের অবনতির সময় তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছে। এখন পর্য্যন্তও বাল্য বিবাহ প্রথা বাঙ্গালীদিগকে যত দূর আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে, অপেক্ষাকৃত বলবীর্য্য সম্পন্ন উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীদিগকে তত দূর আক্রমণ করিতে পারে নাই। এখনও গুজরাট দেশীয় রজঃপুত প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা নাই। তাহাদের মধ্যে কন্যার অন্ততঃ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ দিবার রীতি নাই। লাহোর, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে যদিও কন্যার বয়ঃক্রমগত কোন নিয়ম না থাকুক, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই, বলিতেই হয়। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় যে, এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য হিন্দু সন্তানের অগ্রে আমরাই অধিক অধঃপাতে গিয়াছি।

বহুবিবাহ। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সময়ের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর, তাহাতেই দেখিতে পাইবে, আর্য্যগণ একাধিক দ্বারপরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন না, পুরাণাদি পাঠে দেখা যায়, অনেক রাজা বহু পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংহিতাকারেরা বিশেষ কারণ ব্যতীত একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন।

মনু সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, স্ত্রী মদ্যপায়িনী, দুশ্চরিত্রা, প্রতিকূলা, ব্যাধিযুক্তা, হিংস্রা ও অর্থ নাশিনী হইলে তাহার পতি অবশ্য ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবে। এবং স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট, মৃত বৎসা হইলে দশ, কন্যা মাত্র প্রসব করিলে, এগার বৎসর অপেক্ষা করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবে, কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্য অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে। স্ত্রী রোগিণী হইয়াও যদি সুশীলা হয় ও পতিহিতে রতা থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহার অনুমতি লইয়া অন্য বিবাহ করিবে, কদাচ তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কত দূর মান্য ছিল, বলা যায় না। আমাদিগের প্রাচীন রাজগণ অনেক সময়ে কন্যা পাইলেই বিবাহ করিতেন। বোধ হয় না যে, তাঁহারা শাস্ত্রের এই সকল ব্যবস্থা সকল সময়ে মান্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরন্তু যদিও একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ আর্য্য জাতি মধ্যে দোষাবহ না হউক, তথাপি এক্ষণকার রাড়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ন্যায় আর্য্যগণ বিবাহিতা পত্নীর অনাদর করিতেন না, এবং এক্ষণে যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অনেক ব্যক্তির বিবাহই উপজীবিকা, এরূপ বিবাহোপজীবী লোক আর্য্য জাতির মধ্যে ছিল না। বিবাহিত পত্নীর সুখ সাধন, ধর্ম্মনীতি সাধন, গ্রাসাচ্ছাদন দান পতির পরম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মনু সংহিতার এক স্থলে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার বশে, যৌ-

বনে স্বামীর বসে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রের বশে থাকিবে; কখনও স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিবে না। অন্য স্থলে আছে বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী স্ত্রী এবং শিশু পুত্রদিগকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিরন্তর সুখ বৃদ্ধি হয়. সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী সকল বহু কল্যাণপাত্রী, তাহারা গৃহের দীপ্তি স্বরূপ। স্ত্রী ও শ্রীতে (লক্ষ্মীতে) বিশেষ নাই। শাস্ত্রের এই সকল বচন দৃষ্টে বোধ হয়, তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা থাকিলেও এক্ষণকার বহু পত্নীক কুলীন পত্নীগণ অপেক্ষা তৎকালে যাঁহারা বহুবিবাহ করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী ছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলে অথবা আশিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশে যেরূপ বহুবিবাহ প্রথা আছে, অথচ কোন দেশেই বিবাহ একটা ব্যবসায় নাই; সকল দেশেই বিবাহিতা পত্নীর ভরণ পোষণ পরম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত, প্রাচীন আর্য্যগণ মধ্যেও এরূপ বহুবিবাহ প্রথাই ছিল।

বিধবা বিবাহ। বহু বিবাহের ন্যায় বিধবা বিবাহও আর্য্য জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া অন্য পুরুষের ভার্য্যা হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহার নাম পৌনর্ভব সন্তান।" পরাশর বলেন, "স্বামী অনুদ্দেশ হইয়া মরিলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে, অথবা সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, কিম্বা পতিত হইলে স্ত্রী অন্য পতি আশ্রয় করিবে।" নারদ সংহিতারও এই মত। অধিকন্তু অনুদ্দেশ হইলে কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ সন্তান প্রসব করিয়া থাকিলে কত বৎসর ও সন্তান প্রসব না করিয়া থাকিলে কত বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে, নারদ সংহিতায় তাহার বিধান পর্য্যন্তও দেখা যায়। অন্যান্য স্মৃতিকারেরাও বিধবা বিবাহের বিধি দিয়াছেন। কোন কোন স্মৃতিতে নিষেধও আছে। কিন্তু যে সকল স্মৃতিতে নিষেধ আছে, তাহার সংখ্যা অল্প। এই সকল ব্যবস্থা কত দূর চলিত ছিল, পুরাণাদি পাঠে তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

মনু বিবাহিতা বিধবার গর্ভ জাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন। কিন্তু কালে ঐ সকল সন্তান ঔরস বলিয়া গণ্য হইত। মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বে লিখিত আছে, নাগরাজার কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে শ্রীমান বীর্য্যবান পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে "নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন, অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।" ঐ গ্রন্থের স্থলান্তরে লিখিত আছে, "অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষ্ম রক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন।"

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের প্রস্তাব অনেকেই অবগত আছেন। যদিও নল রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়াই দময়ন্তীর এই উদ্যোগের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তৎকালে এই রূপ বিবাহের প্রথা না থাকিলে কখন রাজ পরিবারে এরূপ উদ্যোগ হইত না, এবং সমাজ মধ্যে বিধবা বিবাহ পবিত্র বলিয়া বোধ না

থাকিলে কখনও তদ্গর্ভজাত সন্তান ঔরস বলিয়া সমাদৃত হইত না।

কাহার সহিত কাহার বিবাহ নিষিদ্ধ।

আর্য্য জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলেই বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। রক্ত সম্বন্ধ বর্জন পূর্ব্বক বিবাহ করা যে নিতান্ত আবশ্যক, বর্ত্তমান সময়ের শরীরতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই এই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আর্য্য জাতি ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোন জাতিতে বিবাহের এই সুপ্রণালী কার্য্যতঃ বদ্ধমূল দেখা যায় না।

এখনও সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে পিতৃব্য কন্যা, মাতুল কন্যা, মাতৃ স্বসৃ কন্যার পাণি গ্রহণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যগণ বহুকাল পূর্ব্বে এরূপ বিবাহের অপকারিতা অবগত ছিলেন।

মনু সংহিতায় লিখিত আছে, "যে কন্যা বিবাহার্থীর মাতার অসপিণ্ড, ও পিতার অসগোত্রা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ, তাহাকে বিবাহ করিবে।" সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হয়, মাতার সপিণ্ডা অর্থে মাতা মহের সহিত যাহার সপিণ্ডতা আছে, তাহাকে বুঝায়। কোন কোন ঋষির মতে মাতা মহের সগোত্রাকেও বিবাহ করিবে না। কিন্তু এই মত বিশেষ চলিত নাই। অধিকাংশ ঋষির মতে মাতৃ সপিণ্ডা বর্জন করাই বিহিত। মাতা মহ সগোত্রা বিবাহ অন্যায় নহে।

সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে ভার্য্যা করিবে না এবং মাতা হইতে পঞ্চমী, পিতা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। বিষ্ণু সূত্র।

নারদ প্রভৃতি ঋষিরও এই মত, বিষ্ণু পুরাণেও প্রসঙ্গতঃ এই ব্যবস্থা দেখা যায়। যে কন্যার সহিত জল বা পিণ্ড দ্বারা সম্পর্ক না থাকে, অথবা যে কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা, তাহাকে বিবাহ করিবে। বৃহন্মনু।

যে সকল স্মৃতি বচনার্থ উদ্ধৃত হইল, তদ্ব্যতীত যাবদীয় স্মৃতিরই এই মত। বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতিতেও এই সকল ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা বদ্ধমূল হইতে বোধ হয়, বহুকাল লাগিয়াছে। সুভদ্রা অর্জ্জুনের মাতা মহের পৌত্রী ছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন ; ইহাতে বোধ হয়, মহাভারতের সময় পর্য্যন্তও এ সকল ব্যবস্থার ব্যভিচার হইত। কিন্তু এরূপ অনুমান অন্যায় নহে যে, তৎকালে অর্থাৎ মহাভারতের সময় অথবা তাহার বহু কাল পূর্ব্ব হইতে জন সাধারণে এই সকল ব্যবস্থা মান্য করিয়াই চলিতেন। কারণ যখন সমুদয় ঋষি সমভাবে এই ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন দেশ মধ্যে এটী বহু কালের রীতি, তাহার সন্দেহ নাই। কেমনা যে সকল আচার দেশ মধ্যে সর্ব্বদা প্রচলন থাকে, অনেক সময় তাহাই ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় এখনও যে আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখা যায়, উহা অনেকাংশে এই সুনিয়মের ফল। পৃথিবীতে আর্য্য দিগের সমকালীন জাতি, বোধ হয়, এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। এই আর্য্য জাতির কনিষ্ঠ স্বরূপ কত জাতি উন্নতি লাভ করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কত বুদ্ধিমান্ জাতির বংশধরগণ নির্ব্বোধ বলিয়া

পরিগণিত হইতেছে, কিন্তু আর্য্য সন্তানগণ যদিও পূর্ব্ব পুরুষদিগের অন্যান্য গুণ রাশির উত্তরাধিকার করিতে পারেন নাই, বুদ্ধি সম্বন্ধে এখন তাঁহারা সেই মহানুভব আর্য্যগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে নিতান্ত অযোগ্য নহেন। বিবাহের এই সুপ্রণালীই ইহার একমাত্র কারন না হউক, প্রধান কারণ বটে।

বিবাহের এই সুপ্রণালী না থাকাতে ইউরোপ খণ্ডের কোনং রাজবংশ নিতান্ত নিকটবর্ত্তিনী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া এক্ষণে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া, ক্রমে অকর্ম্মণ্য সন্তান সকল উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই দোষে তত্রত্য পর্ত্তুগীশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড় প্রকৃতি লোক উৎপন্ন হইয়াছে।

আহার। আর্য্যদিগের, বীর্য্য, পরাক্রম, তীক্ষ্ণধী প্রভৃতি দৃষ্টে এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে যে, ইদানীন্তন বাঙ্গালীদিগের ন্যায়, ডাইল তরকারী, ভাত মাত্র তাঁহাদের আহার ছিল না। আর্য্য বীরগণ অথবা ঋষিরা যে একমাত্র ফলমূল আহার করিয়া উৎকট বীর্য্য অথবা মানসিক চিন্তার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

ঋক্ প্রভৃতি বেদ ও মনু প্রভৃতি স্মৃতি এবং ভারত প্রভৃতি পুরাণ ও ইতিহাস পাঠে আর্য্যদিগের আহার সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হওয়া যায়।

মাংসাহার। গোঘ্ন এই শব্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অন্যান্য শীতপ্রধান দেশ বাসীদিগের ন্যায় আর্য্যগণও গো মাংস ভক্ষণ করিতেন। গো + হন্, টচ্ প্রত্যয় করিয়া সম্প্রদান বাচ্যে গোঘ্ন পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোঘ্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ—গো হনন করা যায়—যাহার নিমিত্ত। আভিধানিক অর্থ অতিথি। পূর্ব্ব কালে আর্য্যগণ অতিথি আগমন করিলে তাহাকে মধু পর্ক দিতেন, এই মধুপর্কার্থ গোবধ করা হইত। সমাংসো মধু পর্ক। কল্লুক ভট্ট ধৃত গ্রন্থ বচন মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে;

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায় হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিনং তল্প আসীন মর্হয়েৎ প্রথমংগবা।

বর বিবাহের পূর্ব্বে পিতাকে অথবা যদি পিতার অভাবে অন্য ব্যক্তি হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তবে সেই আচার্য্যকে মালা দ্বারা অলংকৃত করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া প্রথমে গো সাধন মধুপর্কে পূজা করিবে।

এই সকল ব্যবস্থা দৃষ্টেই মহাকবি ভব ভূতি স্বপ্রণীত উত্তর রাম চরিত ও বীর চরিত গ্রন্থে ঋষিদিগের গো ভক্ষণ সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন।

"সমাংস মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহ মেধিনঃ তংহি ধর্ম্ম সূত্র কারঃ সমামনন্তি। উত্তরাম চরিত ৪ র্থ অঙ্ক।

"সমাংস মধুপর্ক দিবে" এই বেদবিধি বহুমান করিয়া গৃহীরা অভ্যাগত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত, বৎসতরী, মহোক্ষ (ষাঁড়) কিম্বা মহাছাগ বধ করিবে। ধর্ম্ম সূত্রকারগণও এই বিধির সমাদর করেন।

সম্পদ্যতে বৎস তরীং হবিষ্যান্ন পচ্যতে। বৎসতরী বধ করিয়া হবিষ্যান্ন (বোধ হয় পোলাও) পাক হইত।

এই রূপ প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থ দেখিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে; তাৎকালীন গো মেধ যজ্ঞ প্রণালীতে বিলক্ষণ বোধ হয়, যে ঋষিগণ গো হত্যা করিয়া যজ্ঞ করিতেন এবং যে পশু বধ করিয়া যজ্ঞ করা হইত, উক্ত পশুর মাংস কতক অগ্নিতে নিক্ষেপ ও কিয়দংশ ভোজন করা হইত। মনু সংহিতার ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে;

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চকাম্যয়া।
যথা বিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানা মেবচাত্যয়ে।
২৭ শ্লোক।

প্রোক্ষণাখ্য সংস্কার যুক্ত যজ্ঞ হুত পশুমাংস ভক্ষণ করিবে, ব্রাহ্মণগণ কামনানুসারে যজ্ঞ ব্যতীত মাংস ভক্ষণ করিবে; এবং যথা বিধি নিযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ শ্রাদ্ধে মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া) মাংস ভক্ষণ করিবে। অন্য আহার অভাবে, ব্যাধিযুক্ত হইলে মাংস খাইবে;

প্রোক্ষণাখ্য সংস্কার যুক্ত যজ্ঞহুত পশু মাংস।
ভক্ষণমিদং যজ্ঞাঙ্গ বিধীয়তে।
কল্লূক ভট্ট।

প্রোক্ষণাখ্য সংস্কার যুক্ত যজ্ঞহুত পশু মাংস ভক্ষণকে যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া বিধান করা হইয়াছে। গো মেধের ন্যায় অশ্ব-মেধ যজ্ঞও প্রসিদ্ধ। এই যজ্ঞে অশ্ব বধ করিতে হইত, এবং ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞ সময়ে সেই মাংস ভক্ষণ করিতেন।

অশ্ব মেধেন যজেত।

অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করিবে।

পশুনা রুদ্রং যজেত।

পশু বধ করিয়া রুদ্র যাগ করিবেক।

অগ্নি সোমীয়ং পশু মালভেত।

পশুবধ করিয়া অগ্নি ও সোমদেবতার যাগ করিবে।

বায়ব্যং শ্বেত ছাগল মালভেত।

শ্বেত ছাগল বধ করিয়া বায়ু দেবতার যাগ করিবে।

উষ্ট্রং বধ মালভেত তস্যচ মাংস অশ্নীয়াৎ।

উষ্ট্রবধ করিয়া যজ্ঞ করিবে, ও সেই মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্রুতি।

এই রূপ বেদে নানা যজ্ঞে নানা পশু বধের বিধান আছে, ঐ সকল যজ্ঞ সময়ে যজ্ঞ প্রদত্ত মাংসের যে কিয়দংশ ঋত্বিক্‌গণ ভোজন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ যজ্ঞীয় মাংস ভক্ষণ করা যজ্ঞের অঙ্গ বিশেষ।

বাজে সনেয়ী যজুর্বেদের এক স্থলে এই রূপ লিখিত আছে যে, তিনটি তাক্ষ বায়ু দেবতাকে, তিনটি মহিষ বরুণকে, বহু সংখ্যক গবয় (গো সদৃশ পশু বিশেষ) তষ্ট্রাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। সুতরাং তৎকালে এই সকল পশু ভক্ষ-ণীয় ছিল। চরণ ব্যূহ গ্রন্থে যজুর্বেদ সম্বন্ধীয় অষ্টাদশ খানি পরিশিষ্টের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম যুপ-লক্ষণ। এই গ্রন্থে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যুপাদি প্রস্তুত করার পদ্ধতি। ২য় ছাগ লক্ষণ। ইহাতে যজ্ঞে কোন্ কোন্ পশু বলি রূপে প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার নিরূ-পণ আছে।

অষ্টাদশ পরিশিষ্টানি তত্রাদৌ যুপলক্ষণং। চাতুর্বর্ণং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণা পশুভিঃসহ॥”

মনু সংহিতা দৃষ্টে এ বিষয়ের আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। মনু বলেন,

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগ প-ক্ষিণঃ। ভৃত্যানা ঞ্চৈব ভক্ষ্যার্থ মগস্ত্যো হ্যাচরৎপুরা।

ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞার্থে এবং ভৃত্য অর্থাৎ অবশ্য ভক্ষণীয় বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃ-তির ভরণ পোষণ নিমিত্ত শাস্ত্র বিহিত

মৃগ পক্ষী বধ করিবে। পূর্ব্বকালে অগস্ত্য মুনি এই রূপ করিয়াছিলেন।

ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপ কৃত মেব বা।

দেবান্ পিতৄংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি। ৫; ৩২।

মাংস ক্রয় করিয়া বা স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া বা অন্যের নিকট পাইয়া দেবতা ও পিতৃলোককে অর্চ্চনা করিয়া শেষ ভক্ষণ করিবে। মনু এই রূপ মাংস ভক্ষণ বিধান করিয়া পরিশেষে কোন্ কোন পশুর মাংস ভক্ষণীয় ও কোন্ কোন্ পশু অভক্ষ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ যে সকল মাংস দ্বারা পিতৃ শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান দ্বারা ঐ সকল মাংস যে ভক্ষণীয়, তাহারও ব্যবস্থা সুতরাং প্রদত্ত হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়ে পঠীন রোহিত প্রভৃতি কতিপয় মৎস্য, হরিণ, মেষ, বিশেষ বিশেষ পক্ষী, ছাগ, চিত্র মৃগ, রুরু মৃগ, এণ মৃগ, শূকর, মহিষ, শশ, কচ্ছপ, গণ্ডার প্রভৃতি পশু মাংসে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিবার বিধান হইয়াছে।

৫ম অধ্যায়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও কতিপয় পশুপক্ষী ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত, কতক গুলি অভক্ষ্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মাংসাশী পশু, গৃধ্রাদি পক্ষী, গ্রাম্য পক্ষী, যে পশুর পদদ্বয় যুক্ত, যথা ঘোটকাদি (১) টিট্টিভ পক্ষী, চটক, প্লব (শুক, বানর, কারণ্ডব, জলকাক ইত্যাদিকে প্লব বলে) হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যূহ (কালকণ্ঠ পক্ষী বিশেষ) শুক ও শারী জাতীয় পক্ষী, যে সকল পক্ষী চঞ্চু দ্বারা ভক্ষ্য বস্তু বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে (যথা কাঠ ঠোকরা) তাহা জালপাদ (অর্থাৎ শরারি পক্ষী বিশেষ) কোযষ্টি নাগাপক্ষী, নখ বিষ্কিরা (যাহা নখ দ্বারা ভূমি বিদারণ করে) যথা শ্যেনাদি, যে সকল পক্ষী জল মগ্ন হইয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহা শ্যেন জাতীয় পক্ষী এবং পাঠীন রোহিত প্রভৃতি কতিপয় মৎস্যভিন্ন অন্য মৎস্য, গ্রাম্য কুক্কুট, গ্রাম্য শূকর ভক্ষণ করিবে না।

কিন্তু যে সকল মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা ও শ্বাবিষ (এক প্রকার পশু) শল্যকী, গোধা, গণ্ডার, কচ্ছপ, শশ প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করিবে।

এই রূপে মনু সংহিতায় ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শশ, কচ্ছপ প্রভৃতি কতক গুলি জীব ভক্ষণীয় ও মাংসাশী পশু গৃধ্রাদি পক্ষী কতকগুলি জীব অভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। যে সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে মনুতে নিষেধ আছে, সেই সকল নিষিদ্ধপশুর অধিকাংশ কেবল হিন্দু জাতি কেন, পৃথিবীর প্রায় কোন সভ্য জাতির আহার্য্য নহে।*

সত্য বটে, মনুসংহিতায় অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু

* বিশেষতঃ মনুসংহিতায় মাংসবিক্রয়ী জাতি বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়, মাংস বিক্রয়ীগণ বোধ হয়, এক্ষণকার কসাইদিগের ন্যায় ছিল।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।

৫ ম ৫১ শ্লোক।

জন সাধারণে কোন দ্রব্য ব্যবহার না করিলে বোধ হয়, তাহার বিক্রয়ী থাকে না, ক্রয় কর্ত্তা আছে বলিয়াই বাজারে দ্রব্যজাত উপস্থিত হয়, তৎকালে লোকে মাংস ক্রয় করিত বলিয়াই বিক্রয়ী ছিল; এতদ্দ্বারা জন সাধারণের মাংসাহার বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

তাহা সাধারণ বিধি অনর্থ। হিংসা কর্ত্তব্য নহে, এই উপদেশ মাত্র। ফলতঃ আর্য্যগণ পশুপক্ষী ইতর প্রাণীদিগের আত্মা স্বীকার করিতেন, যজ্ঞাদি দেব বা পিতৃকার্য্য বা অতিথি প্রভৃতি সেবা ব্যতীত কেবল স্বোদর পূরণ নিমিত্ত মাংসভক্ষণকে তাঁহারা পাপ মনে করিতেন। কেননা মনুই বলিয়াছেন ;

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিনশ্চরাচরে।
অহিংসা মেবতাং, বিদ্যাদ্বেদাদ্ধ র্ম্মোহি নির্বভৌ॥

বেদ বিহিত হিংসা অহিংসা মধ্যে গণিত, কেননা বেদ ধর্ম্মের এক মাত্র প্রমাণ স্থল। জগতে আর্য্যদিগের তুল্য ধর্ম্ম পরায়ণ জাতি অতি অল্প, আহার, বিহার, শয়নোপবেশন, যাহা কিছু সাংসারিক ক্রিয়া আছে, তাহার প্রত্যেক ক্রিয়াতেই তাঁহারা কোন না কোন রূপ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকিতেন। যাগাদি ক্রিয়াও ছিল, সুতরাং যজ্ঞোপলক্ষে পশুহনন ও মাংসাহারও নির্ব্বাহ হইত।

মনুসংহিতা পাঠে বোধ হয়, আর্য্যগণ মধ্যে তৎকালে মাংসাহার নিতান্ত প্রবল ছিল। মনু ক্রিয়াবিশেষে মাংসবিশেষের ব্যবস্থা দিয়া মাংসের ব্যবহার সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই সকল ব্যবস্থার কতদূর তৎকালে প্রচলিত ছিল। যে পুরাণ পাঠ করা যায়, তাহাতেই রাজাদিগের মৃগয়া বৃত্তান্ত ও মাংস ভক্ষণের উদাহরণ পাওয়া যায়। দশরথ, দুষ্মন্ত, শান্তনু, পাণ্ডু প্রভৃতি রাজাদিগের মৃগয়া বর্ণন অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল মৃগমাংস যে তাঁহারা ভক্ষণ করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য; মহাভারত আদিপর্ব্বের ৬০ অধ্যায় দুষ্মন্তের সৈন্য কর্ত্তৃক মৃগ ভক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে ;

শুষ্কাশ্চাপি নদীর্গত্বা জল নৈরাশ্য কর্ষিতাঃ
ব্যায়াম ক্লান্ত হৃদয়া পতন্তিস্ম বিচেতসঃ।
ক্ষুৎপিপাসা পরীতাশ্চ শ্রান্তাশ্চ পতিতাভুবি।
কেচি ওএ নর ব্যাঘ্রৈর ভক্ষ্যান্ত বুভুক্ষিতৈঃ।
কোচিদগ্নি মাথোৎপাদ্য সংসাধ্যচ বনেচরা।
ভক্ষয়ন্তিস্ম মাংসানি প্রকুট্য বিধিবত্তদা॥
২৬—২৮ শ্লো

যূথ ভ্রষ্ট মৃগগণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হৃদয় হইয়া জল পানার্থ শুষ্ক নদীতে গমন করিয়া নিরাশ ও হত চেতন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মৃগগন ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে কোন কোন নর শ্রেষ্ঠ সেনাগণ বুভুক্ষিত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহবা তাহাদিগের মাংস কর্ত্তন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিল।

এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে, কোন২, সৈনিক অপক্ক মাংসও আহার করিয়াছিল, বিপ্রগণ যখন রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তৎকালে রাজগণ মাংসাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, মধুপর্কে গোহত্যা করা হইত। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের আহারার্থ সামিষ অন্ন ব্যঞ্জন দেওয়া হইত।

কথিত আছে, বনস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভীমার্জ্জুন মৃগয়া ও ফল মূলাদি দ্বারা ইহাঁদের ভরণ পোষণ করিতেন। বিশেষত মহর্ষি দুর্ব্বাশা যখন দুর্য্যোধনের প্রার্থনায় কাম্য বনে রাজা যুধিষ্টিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, যুধিষ্টির মাংস দ্বারা সশিষ্য দুর্ব্বাশাকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

ফলতঃ পুরাণাদি পাঠে বিলক্ষণ অনুভব হয়, কি ঋষি কি রাজা, সকলেই মাংসাদি ভক্ষণ করিতেন। তবে পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন মাংসাশী জাতি বিরল, এই ক্ষণে যেমন অধিকাংশ মনুষ্য জীব ও উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকার বস্তু আহার করে, আর্য্যগণও তাহাই করিতেন। এক্ষণে যেরূপ কোন সভ্য জাতি মধ্যে শতকরা ২।১ জন লোক নিরামিষাশী আছেন, তখনও এরূপ ছিল, কিন্তু জাতি সাধারণতঃ আর্য্যগণ যে মাংসাদি ভক্ষণ করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যদি ও আর্য্যগণ মধ্যে মাংস ভক্ষণ ছিল, কিন্তু কালে গবাশ্ব পশুমাংস ভক্ষণ করা অনুচিত বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছিল, তদনুসারে তাঁহারা গো এবং অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নর মেধাশ্ব মেধকৌ,
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মুখং ॥
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মণিষিভিঃ।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নর মেধ অশ্ব মেধ যজ্ঞ, মহা প্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন।

বিশাল আর্য্য জাতির ইতিহাস এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে লিখা অসম্ভব। উহা লিখিতে হইলে সহস্র পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয় কি না সন্দেহ। এই সম্বন্ধে যে দুই এক কথা বলা হইল, এতদ্দ্বারা বোধ হয়, আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত, এত উন্নত যে, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। এই সম্বন্ধে এক্ষণে বলিবার সময় নাই। সংক্ষেপে ২।১টী কথা বলিয়া প্রস্তাবের শেষ করা গেল। ১ম শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য এই;—পূর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীতে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে বহুল উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই উন্নতি এত অল্প যে, কিছু না বলিলেই হয়। ইংলণ্ড আমাদের পার্শ্বে আছেন বলিয়া আমাদের উন্নতি দেখিতে পাই। ইংরেজী গ্রন্থ গুলি ছাড়িয়া বাংলা ভাষার অনুসন্ধান কর, তাহাতে কি সাহিত্য কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান, কোন শাস্ত্রই পুষ্ট দেখা যায় না। প্রায় সমুদয় বাঙ্গলা গ্রন্থই ইংরেজী বা সংস্কৃতের অনুবাদ; এই সকল অনুবাদও উচ্চ শাখার নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রন্থকর্ত্তারা অনুবাদ করিয়াও ভাষাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে আর্য্যগ্রন্থ গুলি দেখ, সকলই তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। আমাদের মধ্যে এই পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই শক্তির পরিচয় দেন নাই। যে জাতির মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তাহারা সুশিক্ষিত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ দিগে শারীরিক বল বীর্য্য প্রদায়ক অস্ত্রাদি শিক্ষা আমাদের মধ্যে এক বারে নাই।

২য়। আমাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা এত হীন যে, প্রাচীন আর্য্যগণের সহিত কোন রূপে তুলনা হইতে পারে না। বাল্য ও বৃদ্ধ বিবাহ ক্রমে আমাদিগকে নিহত করিতেছে।

৩য়। যাহাতে শারীরিক বলবীর্য্যের উন্নতি হয়, আমাদের আহার তদ্রূপ নহে। মাংস ভক্ষণ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুই প্রকার মত দেখা যায়। কেহ মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধ বাদী, কেহ বা সপক্ষ। এই উভয় সম্প্রদায়ের কোন দলই এ পর্য্যন্ত পরাস্ত হন নাই। যাহা হউক, আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ

অবস্থা, আমরা ক্রমে এরূপ নির্ব্বীর্য্য হইয়া আসিতেছি যে, কোন রূপ সাহসিক কর্ম্ম করিতে আমাদের সাধ্য হয় না। আমাদের এই রোগের চিকিৎসা স্বরূপ অন্ততঃ কিছুকাল দেশ মধ্যে মাংসের ব্যবহার প্রচলন করা উচিত। জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মোন্নতি, বিস্তৃত বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজমঙ্গলকর বিষয় গুলিতে কৃতকার্য্য হওয়া দুর্ব্বল লোকের কর্ম্ম নয়। যাহার শরীরে বল নাই, তাহার মনেও বল নাই। দুর্ব্বলশরীর বা দুর্ব্বলমনা লোকের দ্বারা উন্নত ব্যক্তির কার্য্য কখনও হয় না।

মাংসাহার করিতে হিন্দু সম্প্রদায় বিরোধী হইবেন না। যে সকল মাংসাহার শাস্ত্রসিদ্ধ ও দেশপ্রচলিত, তাহা আহার করিলে অনায়াসে চলে।

আহা, আমরা কি আর উন্নত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সমকক্ষ হইব! শতাধিক বর্ষ আমরা ব্রীটিস্ শাসনে আছি, রাজাও আমাদের উন্নতি সাধনে যত্নবান; কিন্তু এখনও শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা প্রায় পূর্ব্ববৎই আছে! এখনও আমাদের মধ্যে সাহসিক কার্য্য প্রায় দেখা যায় না, এখনও আমরা চাকুরি মিলিলে প্রায় ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করি না; পূর্ব্বেও কৃষি শিল্পাদির যে অবস্থা ছিল, এখনও প্রায় সেই অবস্থা।

সূর্য্য ঘড়ি।*

সংজ্ঞা

১। সময় নির্ণয় করণার্থ যে কোন বস্তুর উপর ঘন্টার অঙ্ক অঙ্কিত করা যায়, তাহাকে সময় নির্ণায়ক ডায়াল (১) বলে।

২। এই ডায়ালের উপর যে কতক গুলি রেখা টানা থাকে, তাহাদিগকে ঘন্টার রেখা (২) কহা যায়।

৩। যাহার ছায়া ডায়ালের ঘন্টার অঙ্কের উপর পতনে সময় নির্ণয় করা যায়, তাহাকে কাঠী বা ভিত্তি (৩) কহে।

৪। যে ডায়ালের উপর কাঠী বা ভিত্তির ছায়ার ঘন্টার রেখার সহিত মিল হওয়ায় সময় নির্ণয় করা যায়, তাহাকে সূর্য্য ঘড়ি (৪) কহা যায়।

৫। সূর্য্য ঘড়িতে যে সময় দর্শায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ সময় (৫) বলা যায়।

৬। সাধারণ ঘড়িতে (৬) যে সময় দর্শায়, তাহাকে মাধ্যিক সময় (৭) বলা যায়।

৭। ঠিক দুই প্রহরের সময় প্রত্যক্ষ ও মাধ্যিক সময়ের যে প্রভেদ (৮) তাহাকে সময়ের সমীকরণ (৯) কহা যায়।

(১) Dial.—(২) Hour lines.—(৩) Style or gnomon.

(৪) Sun-Dial.—(৫) Apparent time. (৬) Clock, watch.—(৭) Mean time.—(৮) Difference. (৯) Equation of time.

* এই প্রস্তাবে প্রথমাংশে গণিত সংক্রান্ত যে সকল কথা বলা হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে না বুঝিলেও শেষাংশের বিবরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, পাঠক সূর্য্য ঘটিকার বিষয়অবগত হইতে পারিবেন।

সূর্য্য ঘড়ি।

১। যদ্রূপ মনুষ্য জাতির শরীর রক্ষার্থে আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান প্রয়োজন, তদ্রূপ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সময় নিরূপণ করাও অত্যাবশ্যক। জগদীশ্বর দিবা রাত্রির সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু দণ্ড, পল, বিপল নিরূপণার্থে মানসিক অনুভব (১) ব্যতীত উপায়ান্তর বিধান করেন নাই।

২। অতি প্রাচীন কালেই মনুষ্যগণ এক এক প্রকার ঘটিকাযন্ত্র সৃষ্টি করিয়া এই অভাবের নিরাকরণ করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস্ বলেন যে, এই যন্ত্র নির্ম্মাণের উপায় গ্রিস্ বাসীরা ক্যালডিয়া দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। ইতিহাসে যে প্রথম দায়ালের (২) কথা উল্লেখ আছে, তাহা বিরোসাস্ (৩) কৃত। ইনি, বোধ হয়, খ্রীষ্টের জন্মের ৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

৩। ডায়াল পদটী লাটিন ভাষার ডায়েস্ (দিন) শব্দ (৪) হইতে উৎপন্ন।

৪। সকল প্রকার অবস্থার লোকেরই বিষয়কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী ঘটিকা যন্ত্র রাখা উচিত। কিন্তু ঘটিকা যন্ত্র নানা কারণে পরস্পর অমিল হইয়া থাকে, তজ্জন্য বৈষয়িক কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। এই অমিল সূর্য্য ঘড়ি দ্বারা দূরীকৃত হইতে পারে। অতএব প্রত্যহ অথবা প্রতি সপ্তাহে সূর্য্য ঘড়ির সঙ্গে ঘটিকা যন্ত্রের মিল করা উচিত।

৫। পূর্ব্বকালে কাঠী লম্বভাবে পুতিয়া ছায়ার দ্বারা সময় নির্ণয় করা হইত, কিন্তু এই ছায়া সকল ঋতুতে এক সময়ে এক দিকে পড়ে না; বিশেষ রূপে জ্যোতিষ শাস্ত্র না জানিলে ইহার দ্বারা সময় নির্ণয় করা সুকঠিন, অতএব কাঠি লম্বভাবে প্রোথিত না করিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ডের (৫) সমান্তরাল করিয়া অথবা ধ্রুবতারা (৬) লক্ষ্য করিয়া সমতল ভূমির অর্থাৎ যে ভূমি উচ্চনীচ নয়, এমন ভূমির উপর প্রোথিত করিলে, সকল ঋতুতে এক সময়ে এক দিকে কাঠীর ছায়া পড়ে। পরে একটী ডায়াল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সময়ের অঙ্কের দাগ দিলে, যখন যে অঙ্কের উপর ঐ কাঠীর ছায়া পড়িবে, তখন তত ঘন্টা বলিয়া স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ সূর্য্যের (৭) গতি (৮) ক্রমে যখন যে সময় হইবে, সূর্য্য ঘড়ির কাঠীর ছায়াও তখন ডায়ালের উপর সেই সময় দর্শাইবে। কিন্তু এই সময় প্রত্যক্ষ সময়, (৯) ইহা মাধ্যিক সময়ের সহিত সকল দিন সমান হয় না। অতএব তাহা সময়ের সমীকরণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে—ঠিক দিবা দুই প্রহরের সময় প্রত্যক্ষ সময় ও মাধ্যিক সময়ের যে অন্তর, (১০) তাহাকে সময়ের সমীকরণ কহা যায়। সূর্য্য ঘড়ির সময় ঘটিকা যন্ত্রের সময় অপেক্ষা কোন্ দিন কি পরিমাণে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে, তাহার এক নির্ঘণ্টও নিম্নে প্রকটিত করা গেল। কখন বেশী অর্থাৎ ঘড়ি, সূর্য্য

(১) অনুভব কখন এক রূপ হয় না।—(২) First dial.—(৩) Berosus.—(৪) Dies, a day.

(৫) Axis of the earth.—(৬) Polestar, ইহার উচ্চতা কোন এক স্থান হইতে যত ডিগ্রি (degree) সেই স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) তত ডিগ্রি।

(৭) বাস্তবিক পৃথিবীর।—(৮) Transit of the sun.—(৯) Apparent time.—(১০) Interval of time.—

ঘড়ি অপেক্ষা বেশী হইবে; আর কখন কমী অর্থাৎ ঘড়ি সূর্য্য ঘড়ি অপেক্ষা কমী হইবে—বেশী হইলে সূর্য্যঘড়ির সময়ের সহিত যোগ ও কমী হইলে বিয়োগ করিয়া যত সময় হইবে, তাহাই সাধারণ ঘড়ির সময়, এবং এই রূপে মিল করিয়া লওয়াকে ঘড়ি সংশোধন করা কহে।

যথা মার্চ্চ মাসের ৪ ঠা তারিখে সূর্য্য ঘড়িতে অপরাহ্ন ২ ঘটিকা দেখা গেল, এক্ষণে নির্ঘন্ট দেখিয়া ২ ঘটিকা + ১২´, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে ২ ঘটিকা ১২´ মিনিট করিতে হইবে; আর যে মাসের ১৫ তারিখে দেখিলে ২টিকা—৪´ অর্থাৎ ঘড়িতে অপরাহ্ন ১ ঘটিকা ৫৬ মিনিট করিতে হইবে।

৬। সূর্য্য ঘড়ির ডায়াল সামতালিক(১) লম্ববান বা খাড়া (২) অথবা বক্র বা তেড়্‌চা (৩) করা যাইতে পারে; অর্থাৎ ডায়াল সহ কাঠীর যে কোন কোণ (৪) হইতে পারে, কিন্তু এটী স্মরণ রাখা উচিত যে, কাঠীটী চির কাল ধ্রুব তারা লক্ষ্য করিয়া স্থাপিত করিতে হইবে।

সূর্য্যঘড়ি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

১। কাঠী ডায়াল সহ সমকোণ করিতে হইলে কাঠীর উভয় পার্শ্বে সমান সমান অন্তর অর্থাৎ দুই প্রহর হইতে প্রতি ঘন্টা ১৫° অন্তর ডায়ালের উভয় পৃষ্ঠায় ঘন্টার অঙ্ক অঙ্কিত ও উভয় দিক কাঠী বিস্তৃত করিবে। কারণ বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে সূর্য্য উত্তর দিকে থাকে, এ জন্য উহার কিরণ ডায়ালের উপরে পড়ে। আর শরৎ ও শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণদিকে থাকে, এজন্য কিরণ ডায়ালের নীচের দিকে পড়ে। কিন্তু কাঠী ডায়াল সহ সম কোণ না করিলে ঘন্টার দাগ সমান সমান অন্তর হইবে না। অতএব পার্থিব গোলোকের (৫) অক্ষ পাত দ্বারা ডায়ালের ঘন্টার দাগের অন্তর নিরাকরণ করিবে; কিন্তু অধিক সূক্ষ্ম ও ঠিক করিয়া করিতে হইলে বার্ত্তুল ত্রিকোণমিতির (৬) আর্য্যার দ্বারা ডায়ালের ঘন্টার দাগের অঙ্ক স্থির করিবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আবশ্যক মত ডায়ালের উভয় দিকে কাঠী বিস্তৃত ও ঘন্টার দাগ অঙ্কিত করিবে, কারণ কাল ও স্থান অনুসারে সূর্য্যরশ্মি ডায়ালের নীচেও পড়িতে পারে।

২। সাধারণতঃ সামতালিক ডায়াল নির্ম্মাণ করাই প্রসিদ্ধ, অতএব তাহারি নিয়ম নিম্নে দেওয়া গেল।

সামতালিক ডায়াল প্রস্তুত করিবার নিয়ম। দ ও খ সামতালিক ডায়ালের তল (৭); ধ ধ্রুব তারা।

দ ধ ও যাম্যোত্তরের তল (৮)।

ক ধ খ ঘন্টার বৃত্তের তল (৯)।

ক ধ কাঠী;

ক ও কাঠীর লক্ষ্য বা দিক (১০) অর্থাৎ উত্তর দক্ষিন দিক্

ধ ও লঘিমা।

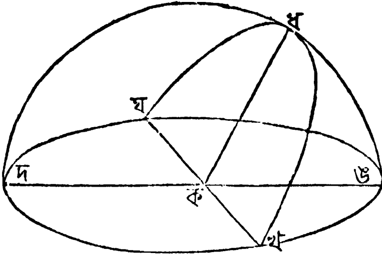
ক　কেন্দ্র।

---

(১) Horizontal.—(২)Vertical.—(৩)Oblique. (৪)Angle.

(৫) Terrestrial globe.—(৬) Spherical Trigonometry.—(৭) Plane of the horizontal dial.—(৮) Plane of the meridian.—(৯) Plane of an hour circle.

(১০) Direction of the Gnomon towards North and South.



খ ক ঘ পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ সমানমিক ঘন্টার রেখা, যে যে ঘন্টায় অর্থাৎ সময়ে সূর্য্য যাম্যোত্তরের উপর পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অবস্থিতি করে (১)—যথা ৯ ঘটিকা পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ।

দ ঙ দুই প্রহরের অর্থাৎ দিবা ১২ ঘন্টার রেখা।

ল=ধ ঙ স্থানীয় লম্বিমা।

খ=∠খ ধ ঙ ডিগ্রির পরিমাপে ঘন্টার কোণ (২) অর্থাৎ দুই প্রহর হইতে প্রতি ঘন্টায় ১৫° ধরিয়া স=ঙ খ, ঙ হইতে ডিগ্রির পরিমাপে ঘন্টার দাগের চাপ অর্থাৎ দূরত্ব বা অন্তর (৩) তাহা হইলে ধ ঙ খ বৈর্ত্তিক ত্রিভুজে যাহার ঙ কোণ সম কোণ। (৪)

শিন ল=কোপশি খ×পশি স

∴পশি স=শিন ল×পশি খ

বা, লগ পশি স=লগ শিন ল+লগ পশি খ—১০ (৫) এই সমীকরণের দ্বারা সর্ পরিমাপ (৬) জানা যাইতে পারিবে, কারণ ল=যে কোন স্থানের নির্দ্দিষ্ট লম্বিমা (৭), আর খ=ক্রমে ১৫°, ৩০°, ৪৫°, ৬০°, ইত্যাদি—যথা

৩। রামপুর বোয়ালিয়ার উত্তর লম্বিমা ২৪° ২২´, (৮) অতএব ইহার সামতালিক ডায়াল প্রস্তুত করিতে হইলে ১২টা অর্থাৎ দুই প্রহর হইতে ইহার ঘন্টার দাগের চাপ বা দূরত্ব ডিগ্রি অর্থাৎ কোণের পরিমাপে এই রূপ হইবে।

১টা অপরাহ্ণ বা ১১টা পূর্ব্বাহ্ণের জন্য ৬° ১৯´ হইবে।

২টা অপরাহ্ণ বা ১০ টা পূর্ব্বাহ্ণ জন্য ১৩° ২৩´ হইবে।

লগ পশি স=লগ শিন ২৪° ২২´+ লগ পশি ১৫°—১০

=৯.৬১৫৫০২৪+৯.৪২৮০৫২৫—১০

=১৯.০৪৩৫৫৪৯—১০

=৯.০৪৩৫৫৪৯

=লগ পশি ৬° ১৯´

পশি স=শিন ২৪° ২২´+পশি ৩০°—১০

=৯.৬১৫৫০২৪+৯.৭৬১৪৩৯৪—১০

=৯.৩৭৬৯৪১৮

=পশি ১৩° ২৩´

আর গুলিও এই রূপ।

অতএব যে স্থানে অধিক সময় রৌদ্র পায়, এমন স্থানে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ মণ্ডলাকার বেদীর উপর পারা মাটাম (৯) অথবা জল দ্বারা (১০) একটী সমতল বৃত্ত (১১) নির্ম্মাণ করিয়া উহার কেন্দ্রোপরি একটী কাঠী লম্ব ভাবে প্রোথিত করিলে উহার ছায়ার অগ্রভাগ যখন পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ঐ বৃত্তের পরিধির

(১) Hour line corresponding to that meridian which gives hours of the same name in the forenoon and afternoon.—(২) The hour angle in degrees from noon reckoning 150° to the hour.—(৩) The distance or arc in degrees of the hour line from ঙ।—

(৪) Then in spherical △ ধ ঙ খ, having the rt ∠ ঙ।—

(৫) Sin ল=cot খ × tan স

∴ Tan স=Sin ল × tan খ, or log tan =log + sin ল log tan খ—10.—(৬) Values of স. (৭) Any given latitude.—(৮)N. Lat. (৯) Spirit level.—(১০)যেমন রাজ মিস্ত্রির সাধারণতঃ করিয়া থাকে।—(১১)Horizontal circle.

যে কোন দুই বিন্দুতে ছেদ করিলে (১) এই বিন্দুদ্বয় মধ্যস্থিত চাপের (২)ঠিক মধ্য বিন্দু কেন্দ্র সহিত সংযোগ করিলে যে রেখা হয়, সেই রেখা উত্তর দক্ষিণে পাত হয়; কিন্তু আরও সূক্ষ্ম করিয়া করিতে হইলে ঐ বেদীর উপর ৪।৫টী ঐককেন্দ্রিক (৩) বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া উক্ত প্রকারোদ্ভূত প্রত্যেক চাপের মধ্য বিন্দু কেন্দ্র সহিত যোগ করিলে যদি এক বা ততোধিক ভিন্ন২ রেখা হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের সমদ্বিখণ্ডকারী রেখাই ঠিক উত্তর দক্ষিণে পাত হইবে। উত্তর দক্ষিণ দিগ্‌ দর্শন শলাকার (৪) দ্বারাও জানা যাইতে পারে, কিন্তু স্থান ও সময়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে উহার দিকেরও ব্যতিক্রম হয়। অতএব উত্তর দক্ষিণ নিরূপণ করিবার এই উপায় অপেক্ষা পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ই শ্রেষ্ঠ। উত্তর দক্ষিণ নিরূপণ করিবার আরও অনেকানেক উপায় আছে। উল্লিখিত ইষ্টক নির্ম্মিত সামতালিক বৃত্তের কেন্দ্র মধ্য দিয়া ঐ রূপে একটী সরল রেখা উত্তর দক্ষিণ ভাবে পাত করিয়া লইয়া কেন্দ্র হইতে—তদুপরে ইটের একটী ভিত্তি অর্থাৎ ডায়ালের কাঠী (৫) ২৪° ২২´ (৬) কোণ করিয়া অর্থাৎ উত্তর দিকের ধ্রুব তারা (৭) লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ করিবে, পরে ভিত্তির দুই পার্শ্বে কথিত সমীকরণের পরিমাপ দ্বারা ০° অর্থাৎ ১২ ঘন্টা বা দুই প্রহর হইতে ৬° ১৯´, ১৩° ২৩´ ইত্যাদি (৮) ক্রমে অপরাহ্ন ১টা বা পূর্ব্বাহ্ন ১১টার, অপরাহ্ন ২টা বা পূর্ব্বাহ্ন ১০টার ঘন্টার অঙ্ক অঙ্কিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই রামপুর বোয়ালিয়ার (৯) সামতালিক সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যে পরিধির উপর ঘন্টার অঙ্ক দাগ দিতে হইবে, সেই পরিধির উপর ব্যতীত, বৃত্তের মধ্য স্থান হইতে উহার কাঠী বা ভিত্তির শীর্ষ ভাগ লম্ব ভাবে উত্তোলন করিবে না, কারণ গ্রীষ্ম কালে সূর্য্য মস্তকোপরি থাকায় কাঠীর ছায়ার দৈর্ঘ্য কম হয়, অতএব কাঠীর ছায়া সকল ঘন্টার দাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেও না পারে।

৪। যাঁহারা লগ্ন নিষ্পত্তিক বা ঘাতমাপ (১০) ও বার্ত্তুল ত্রিকোণমিতি না জানেন, তাঁহারা উক্ত রূপে বৃত্ত ও ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঠিক ১২টার সময় (১১) প্রত্যহ সপ্তাহ কাল একটী ঘড়ি মিল করিয়া লইয়া ক্রমে পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন ঘন্টার দাগ দিলেও সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অন্যান্য ঘন্টার দাগ দেওয়ার কারণ এই যে, কার্য্য বশতঃ ১২টার সময় ঘড়ি মিল করিয়া লইতে না পারিলে অন্যান্য সময়েও তাহা করা যাইতে পারে।

৫। আর এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা

(১) Intersect.—(২)Arc.—
(৩) Concentric (৪) Mariners compass.
(৫) এস্থলে ভিত্তির বেধ (thickness) আছে, অতএব বেধের পরিমাণানুসারে ভিত্তির উভয় পার্শ্ব হইতে ০° বিবেচনা করিবে, কারণ যদিও এখানে একটী মাত্র ভিত্তি নির্ম্মাণ হইল কিন্তু উহার বেধ থাকা হেতু দুই পার্শ্বে বাস্তবিক দুইটী কাঠি উত্তোলন হইল অতএব ভিত্তির উভয় পার্শ্ব হইতে ০° বিবেচনা করিবে।
(৬) ইহা ডায়ালের কেন্দ্রোপরি চাঁদার বা প্রোটেক্টরের protector কেন্দ্র স্থাপন দ্বারা নিরূপণ করিবে।
(৭) N. Polestar.
(৮) ইহাও ঐরূপ চাঁদা বা প্রোটেক্টর দ্বারা নিরূপণ করিয়া ডায়ালের উপর ঘন্টার দাগ দিবে।
(৯) এই স্থানের লঘিমা ২৪° ২২´, অতএব কাঠির ডায়াল সহ কোণ অর্থাৎ ধ্রুব তারার উচ্চতাও elevation ২৪° ২২´ হইল। (১০) Logarithm.—(১১) কাঠীর ছায়া ১২ টার সময় চির কাল এক ভাবে এক দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে পড়ে।

কর্ত্তব্য, যে কোন স্থানে সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে যাঁহাদের সেই স্থানের লঘিমা জানিবার কোন সুবিধা না হইবে, অথবা যাঁহারা সেই স্থানের লঘিমা বাহির করিতে সক্ষম নন, তাঁহারা ইহার উত্তর বা দক্ষিণ স্থিত অন্য কোন স্থানের লঘিমা জানিয়া ইহাদের মধ্যস্থ দূরত্ব অনুমান করিয়া লইয়া ৬৯$\frac{১}{২}$ মাইল বা ৩৪$\frac{৩}{৪}$ ক্রোশ (১) দ্বারা হরণ করিয়া লইয়া যত হইবে, তত ডিগ্রি, ঐ নিকটবর্ত্তী জ্ঞাত স্থানের লঘিমার সহিত, উত্তরে হইলে যোগ, ও দক্ষিণে হইলে বিয়োগ করিয়া লইয়া যত হইবে, তত ডিগ্রি অভীষ্ট স্থানের লঘিমা হইবে, অতএব কাঠীর উচ্চতাও তত ডিগ্রি করিতে হইবে ; মনে কর, ক স্থানের লঘিমা ৬°, ও তদুত্তর স্থিত খ স্থানের দূরত্ব ১৩৮$\frac{১}{২}$ মাইল বা ৬৯$\frac{১}{২}$ ক্রোশ, অতএব ১৩৮$\frac{১}{২}$ মাইল, ÷৬৯$\frac{১}{২}$ মাইল=২°, অথবা ৬৯$\frac{১}{২}$ ক্রোশ ÷৩৪$\frac{৩}{৪}$ ক্রোশ =২°, অতএব ৬°+২°=৮° খ স্থানের লঘিমা ৮° হইল অর্থাৎ কাঠী ডায়াল সহ ৮° করিবে।

৬। তেড়চা বা বক্র ডায়াল। (২) এক স্থানের ডায়াল অন্য স্থানের উপযোগি করিতে হইলে লঘিমার ও কাঠী সহ ডায়ালের ডিগ্রির প্রভেদানুসারে ডায়াল উঠাইতে বা নামাইতে হয়; এবং এই রূপ করাতেই সামতালিক ডায়াল বক্র অর্থাৎ তেড়চা হইয়া থাকে। অথবা বক্র ডায়াল প্রস্তুত করিবার পৃথক কোন আর্য্যার আবশ্যক করে না। যথা কাশীর লঘিমা ২৫°১৮, আর কলিকাতার লঘিমা ২২°৩৩; অতএব বোয়ালিয়ার সামতালিক ডায়াল কাশীতে লইয়া দেখিতে হইলে ৫৬ ডায়াল নামাইতে হইবে। আর কলিকাতায় লইয়া দেখিতে হইলে ১° ৪৯ উঠাইতে হইবে।

৭। কোন স্থানের ডায়াল প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার এক বৃত্তপাদের (৩) অর্থাৎ ০° (১২ ঘন্টা) হইতে ৯০° (৬ ঘন্টা) পর্য্যন্ত অঙ্ক করিলেই সমুদয় বৃত্তের অঙ্ক করা হয়। কারণ পূর্ব্বাহ্ন ১১টার দাগ আর অপরাহ্ন ১টার দাগ সমান, পূর্ব্বাহ্ন ১০টার আর অপরাহ্ন ২টার দাগ সমান, আর২ গুলিও এই রূপ। আর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার রেখা বর্দ্ধিত করিলে পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার রেখা হইবে, আর পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকার রেখা বর্দ্ধিত (৪) করিলে অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার রেখা হইবে, আর২ গুলিও এই রূপ।

৮। এস্থলে পাঁচ মিনিট ক্রমে রামপুর বোয়ালিয়ার সমতালিক ডায়ালের এক পাদের অঙ্ক পাতের নির্ঘন্ট নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা দ্বারা সমুদয় ডায়ালের অঙ্ক পাতের কার্য্য হইবে।

(১) ৬৯$\frac{১}{২}$ মাইল বা ৩৪$\frac{৩}{৪}$ ক্রোশে এক ১° ডিগ্রি হয়।

(২) Oblique dial.

(৩) One-fourth of a circle.—(৪) Produce.

রামপুর বোয়ালিয়ার সমতালিক ডায়ালের নির্ঘণ্ট । *

ঘণ্টা	ডিগ্রির পরিমাপে ঘণ্টার কোণ		ডিগ্রির পরিমাপে ঘণ্টার চাপ		ঘণ্টা	ডিগ্রির পরিমাপে ঘণ্টার কোণ		ডিগ্রির পরিমাপে ঘণ্টার চাপ	
১২ ০´ টা	০°	০´	০°	০´	৩ ০´ টা	৪৫°	০´	২২°	২৫
৫´	১	১৫	০	৩১	৫	৪৬	১৫	২৩	১৯
১০´	২	৩০	১	২	১০	৪৭	৩০	২৪	১৪
১৫´	৩	৪৫	১	৩৩	১৫	৪৮	৪৫	২৫	১২
২০´	৫	০	২	৪	২০	৫০	০	২৬	১১
২৫´	৬	১৫	২	৩৫	২৫	৫১	১৫	২৭	১৩
৩০´	৭	৩০	৩	৬	৩০	৫২	৩০	২৮	১৬
৩৫´	৮	৪৫	৩	৩৮	৩৫	৫৩	৪৫	২৯	২২
৪০´	১০	০	৪	১০	৪০	৫৫	০	৩০	৩০
৪৫´	১১	১৫	৪	৪২	৪৫	৫৬	১৫	৩১	৪২
৫০´	১২	৩০	৫	১৪	৫০	৫৭	৩০	৩২	৫৬
৫৫	১৩	৪৫	৫	৪৬	৫৫	৫৮	৪৫	৩৪	১৩
১ ০ টা	১৫	০	৬	১৯	৪ ০ টা	৬০	০	৩৫	৩৩
৫	১৬	১৫	৬	৫২	৫	৬১	১৫	৩৬	৫৭
১০	১৭	৩০	৭	২৫	১০	৬২	৩০	৩৮	২৪
১৫	১৮	৪৫	৭	৫৯	১৫	৬৩	৪৫	৩৯	৫৫
২০	২০	০	৮	৩১	২০	৬৫	০	৪১	৩০
২৫	২১	২৫	৯	৭	২৫	৬৬	১৫	৪৩	১০
৩০	২২	৩০	৯	৪২	৩০	৬৭	৩০	৪৪	৫৩
৩৫	২৩	৪৫	১০	১৭	৩৫	৬৮	৪৫	৪৬	৪২
৪০	২৫	০	১০	৫৪	৪০	৭০	০	৪৮	৩৫
৪৫	২৬	১৫	১১	৩০	৪৫	৭১	১৫	৫০	৩৩
৫০	২৭	৩০	১২	৭	৫০	৭২	৩০	৫২	৩৭
৫৫	২৮	৪৫	১২	৪৫	৫৫	৭৩	৪৫	৫৪	৪৬
২ ০ টা	৩০	০	১৩	২৩	৫ ০ টা	৭৫	০	৫৭	০
৫	৩১	১৫	১৪	৩	৫	৭৬	১৫	৫৯	২০
১০	৩২	৩০	১৪	৪৪	১০	৭৭	৩০	৬১	৪৫
১৫	৩৩	৪৫	১৫	২৫	১৫	৭৮	৪৫	৬৪	১৬
২০	৩৫	০	১৬	৭	২০	৮০	০	৬৬	৫২
২৫	৩৬	১৫	১৬	৫০	২৫	৮১	১৫	৬৯	৩২
৩০	৩৭	৩০	১৭	৩৪	৩০	৮২	৩০	৭২	১৮
৩৫	৩৮	৪৫	১৮	১৯	৩৫	৮৩	৪৫	৭৫	৮
৪০	৪০	০	১৯	৬	৪০	৮৫	০	৭৮	২
৪৫	৪১	১৫	১৯	৫৩	৪৫	৮৬	১৫	৮০	৫৮
৫০	৪২	৩০	২০	৪৩	৫০	৮৭	৩০	৮৩	৫৮
৫৫	৪৩	৪৫	২১	৩৩	৫৫	৮৮	৪৫	৮৬	৫৮
					৬ ০ টা	৯০	০	৯০	

নির্ঘণ্ট।*

মাস	তারিখ	মিনিট	
জানুয়ারি	১	৪	ঘড়ি সূর্য্য ঘড়ি অপেক্ষা বেশী করিতে হইবেক
	৩	৫	
	৬	৬	
	৮	৭	
	১০	৮	
	১৩	৯	
	১৬	১০	
	১৯	১১	
	২২	১২	
	২৭	১৩	
ফেব্রুয়ারি	১	১৪	
	১১	১৫	
	২১	১৪	
	২৭	১৩	
মার্চ	৪	১২	
	৮	১১	
	১২	১০	
	১৬	৯	
	১৯	৮	
	২২	৭	
	২৬	৬	
	২৯	৫	
এপ্রিল	১	৪	
	৫	৩	
	৮	২	
	১২	১	
	১৫	০	
	*		
	২০	১	ঘড়ি কম করিতে হইবেক
	২৫	২	

মাস	তারিখ	মিনিট	
মে	১	৩	ঘড়ি কম করিতে হইবে
	১৫	৪	
	২৯	৩	
জুন	৫	২	
	১০	১	
	১৫	০	
	*		
	২০	১	ঘড়ি বেশী করিতে হইবে
	২৪	২	
	২৯	৩	
জুলাই	৫	৪	
	১১	৫	
	২৭	৬	
আগষ্ট	১১	৫	
	১৬	৪	
	২১	৩	
	২৫	২	
	২৮	১	
	৩১	০	
	*		
সেপ্টেম্বর	৪	১	ঘড়ি কম করিতে হইবে
	৭	২	
	১০	৩	
	১৩	৪	
	১৬	৫	
	১৯	৬	
	২১	৭	
	২৪	৮	
	২৭	৯	
	৩০	১০	

মাস	তারিখ	মিনিট	
অক্টোবর		১১	ঘড়ি সূর্য্য ঘড়ি অপেক্ষা কম করিতে হইবেক
	৩	১২	
	৭	১৩	
	১০	১৪	
	১৫	১৫	
	১০	১৬	
	২৮	১৫	
নবেম্বর	১৬	১৪	
	২১	১৩	
	২৪	১২	
	২৮	১১	
	৩০	১০	
ডিসেম্বর	৩	৯	
	৬	৮	
	৮	৭	
	১০	৬	
	১২	৫	
	১৪	৪	
	১৬	৩	
	১৮	২	
	২০	১	
	২২	০	
	২৪		
	*		
	২৬	১	ঘড়ি বেশী করিতে হইবে
	২৮	২	
	৩১	৩	

• *বাঙ্গলা মাসের তারিখ প্রতি বৎসর এক রূপ না হওয়ায় ইংরাজি মাসের তারিখ অনুযায়ী সমীকৃত সময়ের নির্ঘণ্ট দেওয়া গেল। আর সময় গণনার জন্য ন্যূনাধিক অর্থাৎ কমি বেশী পল বিপলে না দিয়া ইংরাজি সময়ের "মিনিটে" দেওয়া গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভাষা।

পশুদিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কি ? এ প্রশ্নের কেবল একটি মাত্র উত্তর হইতে পারে। আমাদিগের ভাষা আছে, পশুদের নাই। অন্য যে কোন বিষয়ে তারতম্য থাক্, তাহারও মূল ভাষা। কেহ কেহ বলেন, পশুর সহিত মানবের প্রভেদ অনেক। পশুদের আত্মা নাই, বিচার শক্তি নাই ; কার্য্যকালে, আমরা বিচার পরায়ণ, পশুগণ সহজ-জ্ঞানের দাস। মনুষ্য নিষ্ট অনেক মানসিক বৃত্তিও তাহাদের নাই। এই সকল মত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, এবং অশ্রদ্ধেয়, তাহা ইউরোপীয় দার্শনিকেরা অনেক দিন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে পশুদের সহিত আমাদের তারতম্য অল্প। যে কিছু প্রভেদ আছে, তাহা পরিমাণে—প্রকারে নহে।

বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধমূলক ইন্দ্রিয় সংখ্যা পশুদের অপেক্ষা আমাদের অধিক নহে। আমরা যেমন সুখ-দুঃখ উপভোগ করি—হর্ষ এবং বিষাদ যেমন বাহ্য চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করি, সেই রূপ তাহারাও করে। যদি আমাদের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে বাহ্য লক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে পশুদের সময় কেন না হইবে ?

পশুদিগের স্মৃতি আছে। জন্ লকের অনুসারে, পক্ষীরা যে স্বরবিশেষের অনুকরণ করে, ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কল্য যে স্বর বলিয়া দিয়াছ, পাখী আজ সেই স্বর আপন কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত করিবার যত্ন করিতেছে। প্রথমোদ্যমেই অবিকল অনুরূপ হয় না ; যত দিন না হয়, ততদিন পাখী পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করে। স্বর অবশ্য তাহার স্মৃতিতে রহিয়াছে, নহিলে কিরূপে অনুকরণ করে ?—যাহার ভাব মনে নাই, তাহার অনুকরণ হইতে পারে না। অনেক পশু আপনার প্রভুর স্বর চিনিতে পারে, প্রভুর বাটী কোন্‌টী, তাহা বিলক্ষণ জানে। যিনি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করে, যিনি ক্লেশ দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ক্রোধ কত দিন পর্য্যন্ত মনে সঞ্চয় করিয়া রাখে। কে বলিবে, পশুর স্মৃতি নাই ?

পশুরও স্বতন্ত্র অভিপ্রায় আছে ; একগুঁয়ে দুষ্ট অশ্বে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার সাক্ষী। তাহাদের তুলনা করিবার ক্ষমতা আছে ; আমাদের দেশীয় কুক্কুর ইউরোপীয় লোক দেখিলেই চীৎকার করে, দেশীয় লোক দেখিলে করে না। তাহাদের স্নেহ আছে ; উত্তর আফ্রিকায় কয়েকটী বানরী অপত্য বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের কৃতজ্ঞতা এবং প্রভু ভক্তির দৃষ্টান্ত আবশ্যক করে না। এ সকল কাহিনী নহে। যাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাষ যোগ্য, এবং অলীক কথা বলিয়া যাঁহাদের কোন লাভ নাই, কোন রূপ স্বার্থসাধনের সম্ভাবনা নাই, তাঁহারাও বলিয়াছেন এবং ঐ সকল কথা যে সত্য, তাহাও অনুসন্ধানের দ্বারায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

পশুদিগের বুদ্ধি আছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। ইজিপ্ট দেশীয় কুক্কুরের জলপান কৌশল দেখুন। নীল-

নদ অসংখ্য কুম্ভীরে পরিপূর্ণ ; কোন পশু জলপান করিতে নামিলে, অমনি ধরিয়া লইয়া যায়। তদ্দেশীয় কুক্কুরগণ জলপান করিতে হইলে প্রথমতঃ নদতীরে গিয়া চীৎকার করে ; শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ সমস্ত কুম্ভীর সেই স্থানে আগমন করে। কুক্কুর সময় বুঝিয়া দৌড়িয়া গিয়া অন্যত্র জলপান করিয়া, নিরাপদে ফিরিয়া যায়। মেং হগের কুক্কুরের কথা পাঠ করিলে আর অণুমাত্র সংশয় থাকে না। এক দিবস অন্ধকার রজনীতে সাত শত মেষ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করে। হগ্ এবং তাঁহার সহকারী কিছুই করিতে পারিলেন না। অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার কুক্কুর নিঃশব্দে সেই মেষপালের অনুসন্ধানে গমন করিল। রাখালেরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রাতে হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, একটী বৃহৎ গুহায় কতকগুলি মেষ রহিয়াছে, মনে করিল পলায়িত মেষদলেরই কিয়দংশ এই গুহায় আশ্রয় লইয়া থাকিবে। নিকটে গিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল, সাত শতই রহিয়াছে আর সেই কুক্কুর তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। হগ্ লিখিয়াছেন যে, সেই তামসী রজনীতে কি রূপে অনন্যসহায় সেই কুকুর ভিন্ন২ মেষদল একত্রিত করিয়াছিল, এবং অর্দ্ধরাত্রি রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পল্লীর সমস্ত মেষরক্ষক একত্র হইলেও, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। কে বলিবে, পশুদিগের বুদ্ধি নাই ?

কোন২ দার্শনিক মনে করেন যে, পশুদিগের স্বাভাবিক সংস্কার আছে, আর আমাদের বিচারশক্তি আছে, ইহা বলিলেই সকল কথার মীমাংসা হইল, সকল সন্দেহ দূর হইল। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এখনও গোল মিটিল না। সহজ এবং বিচারশক্তি এত বিরুদ্ধধর্ম্মা নহে যে, একাধারে থাকিতে পারেনা। আমাদের বিশ্বাস এই, উভয়েরই সহজ সংস্কার আছে, উভয়েরই বিচারশক্তি আছে।

আমরা অনায়াসে বলি যে, ঊর্ণনাভ যে জালনির্ম্মাণ করে, পক্ষীগণ যে আপন আপন নীড় নির্ম্মাণ করে, সে সহজ সংস্কারের দ্বারা ; নির্ম্মাণ কৌশল তাহাদিগকে কেহই শিখায় না। কিন্তু ক্ষুধার সময় মাতার স্তন পান করিলেই যে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে, তাহাও তো বালককে কেহ শিখাইয়া দেয় না! বলিতে পারেন, মাতাই বালকের মুখে স্তন প্রদান করেন। উত্তম, কিন্তু পান করিতে কে শিখায়? আহার কিম্বা পান কালে শরীরের অংশ বিশেষের পরিচালনা আবশ্যক ; সেই সকল অংশ চালন করিতে বালককে কে শিখায়? কেহই না। যদি বল ঈশ্বর—যদি বল প্রকৃতি, তাহা হইলেই হইল ;—তাহারই নাম সহজজ্ঞান। শিশুর কথা কেন, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বিষয়েই দেখুন। আমরা প্রত্যহই আহার করি, কিন্তু আহার্য্য কণ্ঠ দিয়া উদরস্থ করিতে হইলে কোন্ অঙ্গ, কোন্ শিরা পরিচালন করিতে হয়, তাহা আমাদের কয় জন জানে? আবার অনেক কার্য্য আছে, যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিতে হইলে সকল সময় তাহাতেই অতিবাহিত হইয়া যায়। আমাদিগকে

যদি প্রতিবার নিশ্বাস ফেলিতে এবং শ্বাস গ্রহণ করিতে, প্রতিবার চক্ষের পাতা ফেলিতে সংকল্প করিতে হইত, তাহা হইলে আমরা আর কোন্ কাজে লাগিতাম? যখন চক্ষে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়, তখন কত শীঘ্র পল্লব মুদ্রিত করি; বিবেচনা করিয়া করি না, কারণ তখন বিবেচনার সময় নাই। পতনোন্মুখ হইয়া যে ভার ঠিক করিয়া লই, তাহাও ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে। এ সকল সহজ সংস্কারের দ্বারা করি, সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, আমাদের সহজ সংস্কার নাই?

পশুদিগেরও বিচার শক্তি আছে। ঊর্ণনাভ অবশ্য সহজ সংস্কারের দ্বারা জাল নির্ম্মাণ করে। কিন্তু আরও দেখিতে পাই, যদি ঘটনাক্রমে সেই জাল ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঊর্ণনাভ সেই ছিন্ন জাল বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করে। যদি দেখে, তাহা সংশোধনের উপায় নাই, তাহা হইলে অন্যত্র আবার তেমনি জাল নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি তাহা সংশোধনযোগ্য হয়, তাহা হইলে তখনই সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়। ছিন্ন জাল সংশোধন যোগ্য কি না, তাহা স্থির করিতে বিচারশক্তির আবশ্যক।

আমেরিকায় এক বানর একবার মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, তাহার পর তাহাকে মদ্য দিলে স্পর্শও করিত না। এক্ষণে দেখুন, আমরা কার্য্যকালে কি রূপ বিচার করি। পীড়াজনক কোন দ্রব্য আহারের পূর্ব্বে ভাবি—"ইহা খাইলে পীড়া হয়; আমি খাইতেছি, অতএব আমারও পীড়া হইবে।" এই হলো বিচার। উত্তম—কিন্তু এই বিচার বানরের মাদকস্পর্শন করার সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন। বানরও অবশ্য এই রূপ ভাবিয়াছিল—"ইহা পান করিলে মত্ততা জন্মায়; আবার যদি পান করি, আবার মত্ততা জন্মাইবে, অতএব পান করিব না।"—নহিলে এক দিন যাহা পান করিয়াছিল, পরে আবার তাহা স্পর্শও করিল না কেন? এখন প্রতীয়মান হইতেছে, পশুদিগেরও আমাদের ন্যায় বিচারশক্তি আছে; তবে ইহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। ঘৃণাস্পদ পশু আর পৃথিবীর ঈশ্বরস্বরূপ মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প, তাহা স্বীকার করা অবশ্য ক্লেশকর; কিন্তু তা বলিলে কি হইবে? যাহা সত্য, তাহা সত্য; তোমার দুঃখ হয় বলিয়া তাহার বিপরীত হইতে পারে না।

কিন্তু যদিও তাহারা বিচার করিতে পারে, তবু সে অল্প পরিমাণে। দুটো চারিটা সরল ভাব লইয়া তাহাদের নাড়াচাড়া। আমাদের ন্যায় জটিলযুক্তি পরম্পরাসম্বন্ধ বিচারক্ষম নহে। না হোক্—কিয়ৎ পরিমাণে হোক্ আর অধিক পরিমাণে হোক্, বিচার ক্ষমতা বটে। এই মাত্র স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইল—ইহার অধিক স্বীকার করাইবার আমাদের এক্ষণে আবশ্যক নাই। আবার যদি ডারউইনের কথা সত্য হয়—আমরা যদি সত্য সত্যই বানরবংশসম্ভূত হই, তবেতো কোন কথাই নাই। আমরাও পশু; কালে উন্নত হইয়া অন্যান্য জীবকে আপন আয়ত্ত করিয়াছি, কিন্তু প্রাচীনকালে বানরের সঙ্গে ডালে ডালে ফিরিতাম।

তবে আমরা কি লইয়া গৌরব করিব? পুরাকালে যেরূপই হউক, এক্ষণে সাহঙ্কারে সগৌরবে বলিতে পারি—আমা-

দের ভাষা আছে, আর কাহারও নাই।

ভাষা আমাদের বত্রিশ পুত্তলিকার সিংহাসন—ইহাতে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই। ভাষা আমাদের রিউবিকন্ নদী—ইহা আর কাহারও পার হইবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং ভাষা লইয়া আমরা গৌরব করিতে পারি।

"অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসা
মনন্যসাধারণমেব কর্ম্ম।"

তাহাতে ভাষা অনন্য সাধারণ, অথচ অপ্রসিদ্ধ কর্ম্ম নহে। এই ভাষা আমাদের প্রভুত্ব—আমাদের উন্নতি—আমাদের সুখ—আমাদের সকলেরই মূল। অন্যান্য জীবের উপর যে আমাদের প্রভুত্ব আছে, তাহার মূল ভাষা। অন্যান্য বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পশুদিগের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য কিছুই দেন নাই। পশুদের শৃঙ্গ, নখ, চর্ম্ম আছে, এই সকলের দ্বারা তাহারা বিপদের সময় আত্মরক্ষা করে, ক্ষুধা হইলে আহার আহরণ করে, নিরাপদে নিদ্রা যাইবার জন্য, রৌদ্র বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য গর্ত্ত খনন করে, শত্রুকে শাসন করে। কিন্তু আমাদের কিছুই নাই; সিংহের ন্যায় সামর্থ্য নাই, ব্যাঘ্রের ন্যায় তীক্ষ্ন নখ নাই, গণ্ডারের ন্যায় কঠিন দুর্ভেদ্য গাত্রাবরণ নাই, কর্ত্তননিপুণ খরধার দন্ত নাই, বেগশালী পদ নাই, শত্রুতানিরাকরণোপযোগী শৃঙ্গ নাই। প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকিলে যাহার যাহার নিতান্ত আবশ্যক, যাহা নহিলে বাঁচিবার উপায় নাই, তাহার কিছুই আমাদের নাই। জীবের মধ্যে এ সকল সম্বন্ধে আমরাই অধম। মনের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি কাড়িয়া লইয়া লৌহবর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র খুলিয়া লইয়া যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, প্রকৃতির নিকট যাহা পাইয়াছি, তাহা মাত্র লইয়া যদি পশুদিগের মধ্যে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে মনুষ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদিও আমাদের এ সকল কিছুই নাই, তবু যে অনন্যসাধারণ ভাষা নির্ম্মাণ ক্ষমতা আছে, তাহাতেই সকল অভাব দূর হইয়াছে, ও সকল কিছুরই আবশ্যক নাই। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রভাবে আমরা জীবের মধ্যে অতি দুর্ব্বল হইয়াও সকলের প্রভু। আমরা যে পশুদিগের উপর রাজা, তাহার এক মাত্র কারণ এই, আমরা অনেকে সংমিলিত হইয়া উদ্দেশ্য বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে পারি, যাহা একের অসাধ্য, তাহা সংসাধিত করিতে হইলে শত জনের বল তাহাতে নিযোজিত করিতে পারি। পশুগণ তাহা পারে না, সুতরাং তাহারা দাস। কিন্তু এরূপ ঐক্য ভাষা ব্যতীত থাকিতে পারে না, ভাষা ব্যতীত হইতে পারে না; একের ইচ্ছা কিরূপে অন্যে জানিবে?

ভাষার ন্যায় বন্ধন সংসারে আর নাই। আমাদের ভাষা যাহাদের ভাষা নহে, তাহাদিগকে আমরা আমাদের বলিয়া গণ্য করি না। অন্যান্য সম্বন্ধে কালিদাস এবং সেক্ষপীয়র উভয়েই আমাদিগের নিকট তুল্য। কালিদাসের নিকট হইতে যে পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হই, সেক্ষপীয়রের নিকট বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিক পাই। আমোদও অধিক—বিদূষকের সহবাস অপেক্ষা ফলষ্টাফের সহবাস অধিক বাঞ্ছনীয়। অথচ

কালিদাসের নাম করিয়া গৌরব করি, সেক্ষপীয়রের নাম, করিয়াও করি না। ইহার একমাত্র কারণ, কালিদাস সংস্কৃতে লিখিয়াছেন—সেক্ষপীয়র ইংরাজিতে। সংস্কৃত আমাদের ভাষা, ইংরাজী আমাদের ভাষা নহে।

বলিতে পারেন, সংস্কৃত আমাদের ভাষা কিসে? কেন, কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত ব্যবহার করি না বলিয়া কি সংস্কৃত আমাদের ভাষা নহে? ভক্তির পাত্র পিতা মাতার সংস্কৃত বলিয়া শ্রাদ্ধ করি—পূর্ব্বপুরুষদিগকে জলগণ্ডূষ দিতে হইলে সংস্কৃত বলিয়া দি—দেবতার আরাধনা সংস্কৃত বলিয়া করি—সন্তানের অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কার সংস্কৃতে করি—এ সংসারের সার, জীবনের সর্ব্বস্ব, নিয়ত সহচরী যে স্ত্রী, তাহাকে যখন গৃহ উজ্জ্বল করিবার জন্য, জীবন সার্থক করিবার জন্য গৃহে লইয়া আসি, তাহাও সংস্কৃত বলিয়া—আর চিরদিন ভরসা করি, যখন এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তখন আমাদের উদ্দেশে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিলেই স্বর্গের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে। আবার এই যে ভাষায় লিখিতেছি—যে ভাষায় কথা কহিতে হইলে ভাবিতে হয় না, ভয় করিতে হয় না—যে ভাষা কবে কি রূপে শিখিয়াছি, তাহাও জানি না—সে ভাষায়ও সংস্কৃতের ভাগ অধিক—তবে সংস্কৃত আমাদের ভাষা না হইবে কেন? অবশ্য আমাদের—সুতরাং গৌরব করি। কিন্তু যদিও কালিদাসের নাম করিয়া গৌরব করি, তথাপি এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রচলিত অন্য কোন ভাষার কথা লইয়া অহঙ্কার করি না—অন্য কোন প্রদেশের কোন কবির নাম করিয়া গৌরব করিতে কাহাকেও দেখি নাই—আমরাও করি না। কেন করি না? ইহাঁরাও তো সেই প্রাচীন আর্য্যগণের বংশধর; ইহাঁদেরও আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অনেকাংশে আমাদের ন্যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আমাদের সকলেরই উপাস্য দেবতা, বিদ্যার অভিলাষে সকলেই সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দি—ধনের কামনায় সকলেই লক্ষ্মীর উপাসনা করি। গণেশ আমাদের সকলেরই সিদ্ধিদাতা—যম আমাদের সকলেরই সংহর্ত্তা; কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, সকলেরই তীর্থ—ভারতবর্ষ সকলেরই জন্মভূমি, তবে কেন এ ভাব? কেন নির্ব্বোধ বলিতে হইলে উড়ে বলি, কেন আমাদেরই দরওয়ানেরা আমাদেরই খাইয়া আমাদিগকেই 'পাজি' 'গিধ্বর' বলিয়া সম্মানিত করে? ইহার কারণ, তাহাদের ভাষা আমাদের ভাষা নহে। সত্য, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা এক মূলোৎপন্ন, কিন্তু এক মূলোৎপন্ন ভাষা মাত্রকেই আমাদের বলিতে হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাকেই আমাদের বলিতে হয়।

পাঠক, আর একটী কথা বলিতে পার। তুমি হয় তো বলিবে, ভাষা যদি পৃথিবীর এমন বন্ধন, তবে আমরা ইংরাজ অপেক্ষা উড়েকে অধিক ঘৃণা করি কেন? বাঙ্গালা ভাষার, ইংরাজী অপেক্ষা উড়িষ্যার ভাষার সহিত নিকটসম্বন্ধ, তবে কেন এ ভাব? কেন—কারণ, ইহার সহিত বাঙ্গালার নিকটসম্বন্ধ। জ্ঞাতিসুলভ বৈরিতা, ঈর্ষ্যা দ্বেষ কোথায় যাইবে? বিশেষতঃ আমরা নরাধম বাঙ্গালী—যে বলবান, তার ক্রীতদাস। আমাদের স্বভাব ক্যামেলিয়নের (বহুরূপী) ন্যায়; যখন যে সহবাসে থাকি,

তখন সেই বর্ণধারণ করি। যখন মুসলমানদের ছিলাম, তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মের অবতার বলিতাম, দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলিতাম; এক্ষণে ইংরাজদের হইয়াছি, সুতরাং তাহাদের উপর ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। যিনিই কেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করুন্ না, তাঁহাকেই 'কাউন্টেস অব্ জস্‌টিস্' বলিব। একদিন ওলা বিবিকে এবং মাণিক পীরকে সিন্নি দিয়াছি, সন্তানের পীড়া হইলে পীরের গান দিয়াছি—সভ্যের ন্যায় সাজ করিতে হইলে ইজের এবং চাপকান্ পরিয়াছি—সভ্যের ন্যায় আহার করিতে হইলে পোলাও খাইয়াছি। আবার এখন দেবতায় বিশ্বাস করি না, অথচ এঞ্জেলে বিশ্বাস করি, ভাল আহার করিতে হইলে উইলসনের হোটেলের কাটলেট, খ্রীষ্টমাসকেক বই আর উপায় নাই, ভাল পোষাক কেবল হার্‌মানের দোকানেই পাওয়া যায়। কোন এক প্রধান সাহেব, দেশের উপকারী হউন বা না হউন, পরলোক গত হইলে বা এ দেশ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার স্মরণার্থ কিম্বা সেলর্স হোম ফণ্ডে দশ সহস্র দিতে পারি অথচ মহেন্দ্র বাবুর 'সায়েন্স আসোসিয়েশনে' এক শত দিতে কুণ্ঠিত হই। সহধর্ম্মিণী দ্বিতীয় স্ক্যালিগর না হইলে আর মন উঠে না; এখন আর সুসভ্য 'প্রাণনাথ' অথবা পাড়াগেঁয়ে 'ও শুন্‌ছো' ভাল লাগে না, এখন "আমার গোপাল" শুনিলে;—শুনিলে কি, সহধর্ম্মণী নাম করিয়া 'আমার' বলিবেন, ইহাত কল্পনাতেই গলিয়া যাই। ছেলে বেলায় কাহিনীতে যে ভিক্ষার ঝুলির কথা শুনিয়াছেন, আমাদের স্বভাব ঠিক সেই রূপ। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষার ঝুলি, তুমি কার?" ভিক্ষার ঝুলি বলিল, "যখন যার কাছে থাকি, তখন তার"।—

আমরাও যখন যার কাছে থাকি, তখন তার; এইত আমাদের স্বভাব। তবে আর এ কথায় কাজ কি?

ভাষাই আমাদের উন্নতির মূল। পশুদিগের উন্নতি নাই। তাহারা পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজিও তেমনি। সিংহের গুহা, পক্ষীর নীড়, মধুমক্ষিকার মধুচক্র সহস্র২ বৎসরেও পরিবর্ত্তিত বা পরিমার্জ্জিত হয় নাই। মধুকর কুসুম পরিমল সংস্কৃত মকরন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য এতদিনেও আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই, ঊর্ণনাভ জাল নির্ম্মাণে পটুতর হইতে পারে নাই, আর আমরা এই সময়ের মধ্যে কত উন্নত হইয়াছি। পাখা নাই, অথচ আকাশপথে বিচরণ করিতে পারি; জলচর নহি, অথচ সমুদ্র হৃদয়ে নির্ভয়ে ক্রীড়া করি, নির্ভয়ে অতিক্রম করি, সমুদ্র গর্ভ হইতে রত্ন উদ্ধৃত করি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সূর্য্য দেবতা স্থির করিয়া "প্রণতোঽস্মি দিবাকরং" বলিয়া নমস্কার করিতেন, সেই সূর্য্য আমাদের খেলাইবার সামগ্রী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উলঙ্গ হইয়া বনে২ ফিরিতেন, বন্য ফল মূল আহার করিতেন, অনাবৃত ভূমিতে পশুর সহিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। আর এখন? আমাদের পরিধেয় কেমন সুন্দর! আহার্য্য কেমন সুখসেব্য, শয্যা কেমন কুসুমকোমল! বনে থাকিতাম, এখন দেবোপভোগ্য সুরম্য অট্টালিকায় বাস করি! পশু থাকিয়া দেবতা হইয়াছি; পশুদের সহচর ছিলাম, এখন তাহাদের প্রভু। আমরা যেন সে জীবই

নহি। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লোক যদি জীবিত হইয়া আসেন, অথবা ঔষধি বলে কোন ইজিপ্ট দেশীয় 'মমীকে' যদি জীবিত করিতে পারি, তাহা হইলে সে ইদানীন্তন পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া কত বিস্মিত হয়! এই বিস্ময়কর উন্নতির মূল ভাষা। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে কোন রূপ উন্নতি সম্ভবে না। কিন্তু জ্ঞানের উন্নতি এক দিনে হয় না; বহুকালে, বহুলোকের যত্নে মানবজাতি একপদ২ করিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়। পঞ্চসহস্র বৎসরে মনুষ্যজাতি যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে আমাদের দশ বৎসরের অধিক লাগে না। তাহা লাভ করিলাম। তার পর যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনি আবার নূতন কিছু বাহির করিলেন;—জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল। এই রূপে পৃথিবী যতই পুরাতন হইবে, ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। অবশ্য স্থান বিশেষ পূর্ব্বাপেক্ষায় হীন হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ধরিয়া বিচার করিলে, উন্নতি বই অবনতি দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু ভাষা না থাকিলে, তাহা হইত না। তুমি কিছু নূতন উদ্ভাবিত করিলে; তুমিই তাহা জানিলে, তোমার সঙ্গেই তাহাও লয় প্রাপ্ত হইল। আবার যদি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান কেহ জন্মিলেন, তাহা হইলে তিনিও তোমার ন্যায় কোন কাজেই লাগিলেন না। যাহা সহস্রবার আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে, আবার তাহাই লইয়া জীবন কাটাইলেন। ভাষা না থাকিলে যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম দুই দিনে শিখিতে পারিতেন, তাহাই লইয়া জীবন কাটাইয়াও হয়তো কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কৃতকার্য্য হইলেই বা কি লাভ? যাহা নূতন বাহির করিলেন, তাহাও তাঁহার সঙ্গে২ চিতানলে ভস্ম হইয়া গেল; মানবজাতি যেমন, তেমনি রহিল। ভাষার প্রসাদে সে অসুখ নাই। যাহা কিছু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা লইয়া আর ঘুরিতে হইল না—অল্প দিনের পরিশ্রমে অনেক জানিলাম—ক্ষমতা থাকে তো আরও কিছু নূতন তাহাতে যোগ করিলাম। জ্ঞানের উন্নতি হইতে চলিল। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে২ অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি হইল।

ভাষা আমাদের সুখের মূল। ভাষা আছে বলিয়া আজি যেন আমরা অনন্তকালের উৎসঙ্গে বসিয়া রহিয়াছি। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, সকলই চতুর্দ্দিকে দুই হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্যে রহিয়াছে; যখন যেখানে মন, তখন তথায় গমন করিতেছি। যাহার সঙ্গে ইচ্ছা, তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি। কোথাও যাইতে হয় না, বাটীতে বসিয়াই সকল সাধ মিটাইতেছি। ইচ্ছামাত্র হোমরের সাক্ষাৎ পাইতেছি, তাঁহার সহিত গল্প করিতেছি। কি রূপে নরপ্রেত পারিস্ আতিথ্যের প্রতিদানস্বরূপ মেনেলেয়সের ভার্য্যা হরণ করিয়াছিল, কেমন করিয়া ক্রুদ্ধ গ্রীকেরা ট্রয় ধ্বংস করিয়াছিল, কবিকুলগুরু তাহাই বলিতেছেন, আমরা শ্বাস পর্য্যন্ত রোধ করিয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছি। ভাল না লাগিল, তৎক্ষণাৎ ব্যাসের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতেছি, ভীমসেন ভীমগদার ভীমাঘাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে নষ্ট করিতেছেন, দুর্য্যোধনের চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু বিগলিত হইতেছে। যুদ্ধ

ভাল না লাগে, প্রণয়ীর কাছে চলুন, কেহ নিবারণ করিবে না। চলুন, যেখানে স্যাফো নিভৃত কক্ষে, দীনভাবে উদাস অন্তরে বসিয়া রহিয়াছেন, ক্ষণে২ দুই এক বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া হস্তস্থ বীণার উপর পড়িতেছে। ঘুরিয়া দেখুন, সীতাগত প্রাণ, কোমল প্রকৃতি স্নেহের আধার রাম সীতাবিরহে ব্যাকুল অন্তরে বৃক্ষ দেখিয়া—বৃক্ষ অচেতন, তাহা ভুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"হা! সীতা কেন নীতা মম হৃদয়গতা কেন বা কুত্র দৃষ্টা।"

পরক্ষণেই আবার উচ্চৈঃস্বরে, উন্মাদের ন্যায়—

"ক্বাসি প্রেয়সি। হা কুরঙ্গনয়নে 'চন্দ্রাননে' জানকি" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িতেছেন।

অভিমানিনী যুবতী আপনার চক্ষে সুন্দর লাগে তো বৃন্দাবনে গিয়া দেখুন, অভিমানিনী রাধা "রজনীজনিত গুরু জাগররাগ কষায়িত মলসনিমেষং' হইয়া লম্পট স্বভাব কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

"হরি হরি যাহি মাধব যহি কেশব মা বদ কৈতববাদং তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং।"

পাঠক, ভাষার প্রসাদে কত সুখ! হোমর, বাল্মীকি, সেক্ষপীয়র, কালিদাস তোমার বন্ধু—অকৃত্রিম বন্ধু; বিপদের সময় ফেলিয়া পলায়ন করেন না। আবার এ বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ নাই। তুমি যাহাই কেন কর না, তাঁহারা তোমারই। হঠাৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাও, তবু চটেন না, আবার যখন আসিয়া ডাক, তখনই সঙ্গে মিশিবেন। এত সুখ কে পায়?

ভাষার প্রসাদে যে সংসর্গ ইচ্ছা কর, তাহাই পাও। পণ্ডিত, মূর্খ, নির্ব্বোধ, যাহাকে ভাল লাগে, তাহার কাছেই গিয়া বসিতে পার। ফলষ্টাফ্, ব্র্যাসো, বেসস্, বিদূষক তোমার আমোদবর্দ্ধন করিতে সতত যত্নবান। ইহাদের সঙ্গে মিশিবার অধিকার না থাকে, গজপতি তো ঘৃণা করিবেন না।

আবার দেখুন, মস্তকের ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিয়া যে সংসারে এত ক্লেশ সহ্য করি, সে কোন্ সুখের আশায়? এই মনে করিয়া, যে সন্তানের মধুমাখা আধ আধ কথা, গৃহলক্ষ্মীর প্রণয় পবিত্র মুখে প্রেমময় আলাপ, জননীর স্নেহোক্তি শুনিয়া হৃদয় শীতল করিব। ইহার অধিক সুখ আর পৃথিবীতে নাই। এ সকলে যাঁহার সুখ না হয়, তিনি মনুষ্যকুলের কলঙ্ক—নিশ্চয় তিনি পাপের পথে ভ্রমণ করিয়া হৃদয়কে কঠিন করিয়াছেন। এ সুখের সংসার তাঁহার জন্য নহে—এ পৃথিবী পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। দেখুন, এখন ভাষা সকল সুখের আকর কি না?

এই সুখের আকর, উন্নতির মূল ভাষার কি রূপে উৎপত্তি হইল, তাহাই এক্ষণে দ্রষ্টব্য। ইহা কি স্বাভাবিক কতকগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন অথবা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য ভাষা বিশেষ সৃষ্টি করিয়া প্রথম মানবকে অথবা মানব মণ্ডলীকে শিখাইয়া দেন? আমরা কি আপনাদের সৌকর্য্যার্থে সকলে মিলিত হইয়া বস্তু বিশেষের এবং কার্য্য বিশেষের পরিব্যঞ্জক শব্দ সৃষ্টি করিয়াছি, অথবা সকলের সম্মতি ব্যতীতও কেবল অনুকরণের দ্বারা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে? এই সকল মতের কোন্টী সত্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি

না। যদি আদি পিতৃগণের দেখা পাইতাম, তাহা হইলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম,—নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিতাম, কোন্ মত সত্য, কোন্টী বা মিথ্যা।

যাহা সত্য, তাহা সত্য—ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাসে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তুমি বিষ্ণুর দশাবতারে বিশ্বাস কর বা না কর; মহম্মদকে পেগম্বর বলিয়া মান, বা না মান; ঈশাকে ঈশ্বরপুত্র বল, বা না বল, তাহাতে সত্যের বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। যদি বিষ্ণু সত্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে তোমার অবিশ্বাসে তাহা ফিরিবে না; মহম্মদ পেগম্বর হইলে তোমার অবিশ্বাসে তাঁহার পেগম্বরত্ব ঘুচিবে না; ঈশা যদি ঈশ্বরপুত্র না হয়েন, তাহা হইলে তুমি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র করিয়া তুলিতে পারিবে না। সুতরাং বলিয়াছি, সত্যাসত্য বিশ্বাসাবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। এই কারণে কোন্ মত সত্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। তবে কোন্ মতে আমাদের বিশ্বাস এবং কি কারণে বিশ্বাস হইল, তাহাই বলিতে পারি এবং নিম্নে তাহাই যথাসাধ্য বলিতেছি।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতরাজিকে প্রধানং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, ঈশ্বর সৃষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, মানবনির্ম্মিত। এই প্রধান শ্রেণীদ্বয়ের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। যাঁহারা বলেন, ভাষা ঈশ্বরপ্রদত্ত, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, প্রথম মানবদলকে একটী ভাষা দিয়াই ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরসৃষ্ট ভাষা কালক্রমে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে—তাহার শাখা প্রশাখা সকল আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জেন্দ সেই আদিবৃক্ষের শাখা—বাঙ্গালা, হিন্দি, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী প্রভৃতি সেই শাখার শাখা। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর আমাদিগকে ভাষা বিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই,—কেবল কতক গুলি ধাতু মাত্র দিয়াছেন। মনুষ্য এই উপকরণের দ্বারা ভাষা রূপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাঁহারা ভাষাকে মানবসৃষ্ট বলেন, তাঁহাদের কেহং বলেন, আদিকালে মানবদল একত্র হইয়া সকলের সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক বস্তু এবং কার্য্যের নামকরণ করিয়াছিল। পরে যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনি নূতন শব্দ গৃহীত হইয়াছে; যেমন রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি শব্দেরও রূপান্তর হইয়াছে। কেহং বলেন, ভাষা অনুকরণসম্ভূত। মনুষ্য অনুকরণপ্রিয়। যে শব্দ শুনিয়াছে, যে শব্দ ভয়, ঘৃণা, আহ্লাদ, শোক, প্রভৃতির প্রথম বেগে আপনা আপনি আমাদের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহারণ অনুকর করিয়াছি। সেই সকল শব্দ ভাষার মূল।

প্রথমতঃ, ঈশ্বর মানব মণ্ডলীর হিতার্থে একটী ভাষা সৃজন করিয়া দিয়াছিলেন। সে ভাষা যে কোন্টী, তাহা আমরা অবগত নহি। তাহা কালক্রমে পৃথিবী হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই আদি ভাষা প্রাচীন সময়ে মধ্য পারস্যে ইরাণ দেশে প্রচলিত ছিল। সেই ভাষা, ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত, ইটালীতে লাটিন, গ্রীসে গ্রীক হইয়াছে।

গ্রীক, হিব্রু, জেন্দ, সংস্কৃত প্রভৃতি আর্য্যভাষা সকল পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে এক মূলোৎপন্ন বলিয়াই বোধ

হয়—অন্ততঃ অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই ভাষাগুলি এক ভাষা সম্ভূত বলিয়াই যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা সেই ভাষামূলক, তাহা বলা যাইতে পারে না। ভাষা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষা এক নির্দ্দিষ্ট ভাষামূলক। তবে সকল ভাষার মধ্যেই কিছু২ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহার কারণ পরে দেখান যাইবে। এক্ষণে ভাষার প্রেরিতত্বের উপর যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহাই দেখান যাইতেছে।

যাহা কিছু স্বভাবসিদ্ধ বা ঈশ্বরপ্রদত্ত, তাহাই সম্পূর্ণ। ভাষাও ঈশ্বরপ্রদত্ত হইলে পূর্ণ হইত। কিন্তু ভাষা পূর্ণ নহে। ভাষাকে তবেই পূর্ণ বলা যায়, যদি ভাষায় সকল পদার্থেরই একটী২ নাম থাকে—মনের সকল ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যতগুলি শব্দ আবশ্যক, তত গুলিই থাকিবে—অধিকও নহে, কমও নহে। কিন্তু এ রূপ ভাষা পৃথিবীতে নাই। অনেক ভাষায় দেখিবেন যে, একার্থবাচক অনেক শব্দ আছে, অথচ অনেক পদার্থের এবং ভাবের নাম মাত্র নাই, যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা মার্জ্জিত এবং উন্নত, তাহাতেও আবশ্যকীয় সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রতিদিন এমন অনেক ভাব মনে উদয় হয়, যাহা বাক্যের দ্বারা কোন ক্রমেই প্রকাশ করা যায় না। যদি উপন্যাস পাঠ করা অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বহুদিন পরে প্রণয়ীদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইলে কথাবার্ত্তা প্রায়ই চক্ষের দ্বারা অথবা অঙ্গবিকৃতির দ্বারা হয়। অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর যখন মৃণালিনীর সহিত বাপীতীরে সাক্ষাৎ হইল, তখন হেমচন্দ্রের মুখ ফুটিল না কেন? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সে সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন শব্দ ভাষায় কি আছে?

তবে বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরপ্রদত্ত আদিভাষাতে সকল পদার্থেরই নাম ছিল—তাহার দ্বারা সকল ভাবই প্রকাশ করা যাইত। এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। যাহা ভাল, তাহা কেহ মন্দের সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না, যে ভাষায় কোনই অভাব নাই—যে ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা পরিবর্ত্তন হইবার কোনই কারণ নাই। যে সকল কারণে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতেও সে ভাষার একবারে লোপ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরপ্রদত্ত কোন ভাষা যদি কোন কালে পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আজিও সেই ভাষা ব্যবহৃত হইত। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ ভাষার পরিবর্ত্তে কখনই অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ ভাষা গ্রহণ করিতাম না। চক্ষুর দ্বারা, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা, স্বরবিকৃতির দ্বারা অর্দ্ধেক ভাব প্রকাশ করিতে হইত না; অনেক সময়ে নিস্তব্ধ হইয়াও থাকিতে হইত না।

আর এক আপত্তি,—ঈশ্বর কি রূপে ভাষা শিখাইলেন? বলিতে পারেন যে, মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; মানব সেই পূর্ব্বসৃষ্ট ভাষা লইয়াই পৃথিবীতে আগমন করে। ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। তাহা হইলে সদ্যোজাত শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বিনা উপদেশে, বিনা অনুকরণে আপনা হইতে সেই ভাষা ব্যবহার করিত। প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়। তুমি যাহা

যাহা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ, সকলেই তাহা লইয়া পৃথিবীতে আইসে। কিন্তু অনন্যোপদিষ্ট মানব-শিশু কোন ভাষাই তো ব্যবহার করে না।

মানবের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? যদিও অনেক বিজ্ঞ লোকের এই মত, কিন্তু আমরা এ মতের পোষকতা করিতে পারি না। কেননা যদিও ঈশ্বর মানবের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা মানুষে শিখিল কি প্রকারে? ঈশ্বর কি তাহার সঙ্গে২ থাকিয়া তাহাকে সেই নব সৃষ্ট ভাষা শিখাইয়াছিলেন? যে ব্যক্তি কোন ভাষাই জানে না, তাহাকে ভাষা শিখান বড় কঠিন ব্যাপার। তাহাকে কেবল "সিংহ" শব্দটী শিখাইলেই নিস্তার নাই; তাহাকে একটী সিংহ দেখাইয়া দিতে হইবে। কেবল "নদী" শব্দটী শিখাইলে হইবে না; একটী নদী দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ইহাকে নদী বলে। যে সকল ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা ইংরাজদিগকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দেন, তাঁহারাই জানেন যে, ইহাতে কত কষ্ট। তবু এস্থলে এই একটী সুবিধা আছে যে, ছাত্র এক ভাষা জানেন।

ঈশ্বর আমাদিগকে কিছুই ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেন নাই। আহার আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বর কখন সমুদ্র হইতে মৎস্য, বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া দেন না। শক্তি রহিয়াছে—উপকরণ রহিয়াছে, পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। ভাষা সম্বন্ধে সে নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে পারে না।

অনেক শব্দ মানবের কার্য্য হইতে উৎপন্ন। অগ্রে দেখিয়াছি যে, জনক আমাদিগকে পালন করেন, তবে তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। 'দুহিতা' শব্দের সৃষ্টির পূর্ব্বে অবশ্য কন্যার উপর দুগ্ধ দোহনের ভারন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অনেক শব্দের স্রষ্টা মানব। যে অনেক শব্দ সৃষ্টি করিতে পারে, সে সকল শব্দ সৃষ্টি করিতে না পারিবে কেন? যদি অন্য রূপে ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে, তবে মিছামিছি কেন ঈশ্বর অথবা প্রকৃতির উপর বরাত্ দিয়া খালাস হই?

অসভ্য জাতীয় ভাষা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকার জাতি বিশেষের সম্বন্ধে শেলিং লিখিয়াছেন—"ইহাদের মধ্যে ভাষার অবস্থা অত্যন্ত হীন এবং প্রতিপদে পরিবর্ত্তনশীল। এ পাড়ার ভাষা ও পাড়ার লোকে বুঝিতে পারে না। ইহাদের উচ্চারণ শক্তিও প্রায় না থাকার মধ্যেই। ইহাদের স্বর অতি ক্ষীণ। ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক বধ করিলেও ইহারা উচ্চৈঃস্বর ব্যবহার করে না। বাক্যোচ্চারণ সময়ে ইহাদের অধরৌষ্ঠ কদাচ কম্পিত হয়। ইহারা কথা কহিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, শত পাদক্ষেপ দূরে কোন বন্ধুকে দেখিলে বরং দৌড়িয়া তাহার নিকটে যায়, তবু ডাকে না। এস্থলে ভাষা একবারে প্রান্তভাগে রহিয়াছে—আর একপদ মাত্র পশ্চাতে সরিয়া গেলেই লুপ্ত হইয়া যায়।" ইহাদের সভ্যতার অবস্থাও তদ্রূপ—আর একপদ মাত্র সরিয়া গেলেই খাঁটি অসভ্য; প্রকৃতির ছাঁচে থেকে যে রূপ নির্গত হইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থা। সুতরাং বলিতে হইল, যখন মনুষ্য ঠিক প্রাকৃ-

তিক অবস্থায় ছিল, সভ্যতার লেশমাত্র তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তখন কোন ভাষাই ছিল না! প্রথম জ্ঞান—প্রথম ভাবের সঙ্গে প্রথম কথার জন্ম হইয়াছে। তার পর যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই নূতন কথার আবশ্যক হইয়াছে—নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে। কি রূপে কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পরে দেখান যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধাতু হইতে উৎপন্ন। সেই সকল ধাতু স্বভাবসিদ্ধ বা ঈশ্বরদত্ত; মানবসৃষ্ট নহে। কোন২ মহাত্মা সেই আদিধাতু সমষ্টির সংখ্যা পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন। মরে সাহেব বলেন যে, সমস্ত ভাষা আটটী ধাতু হইতে উৎপন্ন। ডকটর্ স্মিটের মতে আদি ধাতু একটী।

আমরাও স্বীকার করি যে, ভাষা মাত্রই কতকগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, সেই সকল ধাতুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট—সকল ভাষাই সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাও স্বীকার করি না যে, সেই সকল ধাতু স্বভাবসিদ্ধ বা ঈশ্বরদত্ত—মানবসৃষ্ট নহে।

আমরা যে বলিয়াছি 'ভাষা মাত্রই কতকগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন' তাহার অর্থ পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে চাহি। এক্ষণে যে সকল ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে—অন্ততঃ যতগুলি ভাষার বিষয় আমরা অবগত আছি,—তাহা ধাতুমূলক। কিন্তু তাই বলিয়াই মনে করিবেন না যে, অগ্রে ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে, তদনন্তর সেই ধাত সকল হইতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আদি ভাষা অথবা ভাষাসকল ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই; আদিভাষা হইতেই ধাতুর উৎপত্তি। এক্ষণে যাহা ধাতু বলিয়া পরিগণিত, প্রাচীনকালে তাহাই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। এক অভিন্ন শব্দই সংজ্ঞা, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি সকল ভাবেই ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে ভাষা পরিমার্জ্জিত হইয়াছে; যখন এক অভিন্ন শব্দ নানা ভাবে ব্যবহার করা অসুবিধা বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্ব ব্যবহৃত শব্দ ধাতুরূপে পরিগণিত হইয়াছে, এবং ভিন্ন২ ভাব বুঝাইতে তাহার রূপান্তর করা হইয়াছে। এ রূপ ভাষা আজিও প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাতে অনেক শব্দের ধাতুর সহিত কোনই তারতম্য নাই। চীন ভাষায় এক 'লাই' শব্দের অনেক অর্থ, যথা;—ভূমি কর্ষণ করা, কর্ষণ করিবার যন্ত্র, যে কর্ষণ করে। পলিনেসিয়ার ভাষায় প্রত্যেক ক্রিয়াপদ কোন প্রকার রূপান্তর না করিয়া, সংজ্ঞা এবং বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বন্সেন্ বলেন, ইজিপ্ট দেশীয় ভাষায় এক 'অংহ' শব্দ জীবন, জীবিত, সজীব, জীবন ধারণ করা, প্রভৃতি নানা অর্থবোধক।* ঐ 'অংহ' বেদপ্রণেতাদিগের হস্তে পরিলে তাঁহারা উহাকে ধাতু করিয়া বিভক্তি, প্রত্যয়যোগে উহার রূপান্তর করিয়া এক একটী রূপ এক এক অর্থ বুঝাইতে নির্দ্দেশ করিতেন। এখন যাহা চীনের ভাষায়, ইজিপ্টের ভাষায়, পলিনেসিয়ার ভাষায় দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে তাহা সকল ভাষাতেই ছিল।

ধাতু সকলের স্বভাবসিদ্ধত্বের প্রতিবাদার্থে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন

* Max Muller's Lectures on the Science of Language, Vol. II.

নাই। ভাষার ঈশ্বর সৃষ্টত্বের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করা গিয়াছে, তাহার প্রায়ই এ মতের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, অনেক শব্দ মনুষ্যের কার্য্য হইতে উৎপন্ন, অগ্রে মনুষ্যের কার্য্য লক্ষিত হইয়াছে, পরে শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রূপ অনেক ধাতুকেও মনুষ্যের কার্য্যমূলক বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ম্না' ধাতু দেখুন। 'ম্না' ধাতুর অর্থ অভ্যাস করা। অভ্যাস কালে অথবা বিস্মৃত কথা মনে করিতে হইলে, আমরা অধরৌষ্ঠ এবং জিহ্বা সঞ্চালিত করি। তাহাতে যে শব্দ উত্থিত হয়, বোধ হয়, তাহারই অনুকরণের দ্বারা 'ম্না' ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে। নিশ্বাসের শব্দ অনুকরন করিয়া যে 'অস্' ধাতু পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, কেহই সন্দেহ করিবেন না। ধাতু যদি মানব-কার্য্য-মূলক হয়, তাহা হইলে আর স্বভাবসিদ্ধ বলা যায় না।

যদি সকল ভাষাই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধাতু হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে একার্থবাচক শব্দ ভাষামাত্রই এক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইত; কিন্তু তাহা নহে। যে সকল ভাষাকে আর্য্য ভাষা বলি, তাহাদের মধ্যে এ রূপ সম্বন্ধ অবশ্য অনেক পরিমাণে আছে। কিন্তু আর্য্য ভাষা সমূহের মধ্যে এ রূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে থাকিবে, তাহা হইতে পারে না। আর্য্যজাতীয়েরা এক বংশোদ্ভূত, সুতরাং তাহাদের ভাষায় এ রূপ সম্বন্ধ না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অন্যান্য ভাষার সহিতও যদি ঐ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতাম যে, ভাষা মাত্রই স্বভাবসিদ্ধ কতকগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত এবং কোচীন চীনের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলেই এ রূপ সম্বন্ধের অবিদ্যমানত্ব প্রতিপন্ন হইবে। 'টয়' এবং 'অহং'; 'ত্বং' এবং 'মাই' ইহাদের মধ্যে ধাতুগত সম্বন্ধ কিছুই লক্ষিত হয় না; অথচ 'আমি' এবং 'তুমি' বাচক শব্দ যে ভাষাসৃষ্টির প্রারম্ভেই হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

হেরাডোটস্ বলেন যে ইজিপ্ট দেশীয় একজন নৃপতি আদিভাষা নিরূপণ জন্য একটী শিশুকে নিভৃতে রাখিয়াছিলেন। ছাগদুগ্ধ পান করিয়া তাহার জীবন ধারণ হইত। রাজাজ্ঞানুসারে কেহ তাহার নিকট কোন কথা কহিত না। শিশু কেবল ছাগকণ্ঠ শব্দ শুনিতে পাইত। সেই শিশুর মুখ দিয়া আপনা হইতে 'বেকস্' শব্দ নির্গত হয়। প্রকৃতিসিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট ধাতু থাকিলে সেই গুলিই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া 'বেকস্' নির্গত হইল। অনুকরণপ্রিয় মানবশিশু ছাগের শব্দের অনুকরণ করিল। তাহার মুখনিঃসৃত বাক্য যখন প্রমাণরূপে পুস্তকে লিখিত হইল, তখন তাহাতে গ্রীক প্রত্যয় যুক্ত হইল।

পশুদিগকে প্রকৃতি যে শব্দ দিয়াছেন, পশুগণ চিরদিনই সেই শব্দ ব্যবহার করে। আমাদিগকে দিলে, আমরাও পশুদিগের ন্যায় চিরদিনই তাহা ব্যবহার করিতাম। তবে বলিতে পারেন যে, পশুদিগকে অন্য শব্দও তো শিখান যায়! যায়, কিন্তু আমাদিগকে কে শিখাইবে?

সভ্যতার ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

মনুষ্য কি? শরীরসহ কি সম্বন্ধযুক্ত—২ সভ্যতা—স্বকীয় ও সামাজিক—৩ বাহ্য সভ্যতা ৪ প্রকৃত সভ্যতা—৫ উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজ—৬ উপসংহার।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ রূপ পরিচালন করিয়া মনুষ্য যে সকল উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমরা এস্থলে তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতে পারে, মনুষ্য কি, এবং প্রকৃত সভ্যতাই বা কাকে বলে?

১। মনুষ্য কি? শরীর-সহ কি সম্বন্ধযুক্ত?

হস্তপদ নাসিকাদি অঙ্গবিশিষ্ট নানা বর্ণে চিত্রিত বিবিধ বসনাবৃতচর্ম্মচক্ষু-গোচর যে দেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কি মনুষ্য? অথবা তাহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ?

দার্শনিকেরা বলেন, মনুষ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় জড় দেহ নহে—চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধি, লজ্জা, ভয়, অভিমান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত গুণবিশিষ্ট এক আশ্চর্য্য পদার্থই। আমরা মনুষ্যের প্রকৃত সত্তা অবগত হইতে পারি না।* কেবল কয়েকটী গুণমাত্র দেখিতে পাই। সেই সকল গুণ তিন ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি, ভাব ও ইচ্ছা। এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত গুণাবলীর সমষ্টিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য। ইহার নামান্তর "আত্মা।" তবে শরীর কি? ও কোন্ প্রয়োজন সাধনোপযোগী? "মনুষ্যের" ন্যায় "শরীরেরও" প্রকৃত সত্তা জানিবার উপায় নাই। আমরা কেবল তাহার গুণ ও প্রয়োজনোপযোগিতা জানিতে পারি। এক্ষণে জগৎ, শরীর ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়, "শরীর" আত্মার সমুদায় কার্য্যেরই আগন্তুক-হেতু। চক্ষুঃ কর্ণ দ্বারা জড় জগতের গুণ না জানিলে আত্মার কখন কোন বৃত্তিরই চরিতার্থতা সাধিত হইতে পারে না। আবার শরীর স্বয়ং কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যতক্ষণ আত্মা দেহে বাস করে, ততক্ষণই এই হস্ত লেখনী পরিচালন-সক্ষম, অন্যথা ইহার কোন শক্তিই নাই। আবার হস্তব্যতীত আত্মা কখনই লেখনী ধারণ করিয়া "সভ্যতার ইতিহাস" লিখিতে পারিত না, এবং চক্ষুর সাহায্য না লইলে পাঠকবর্গ কখনই তাহা পাঠ করিয়া মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। অতএব একথা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, "মনুষ্য" কার্য্য করেন এবং "শরীর" তাহার আগন্তুক হেতু। এক অন্যকে ছাড়িলে কিছুই নহে।

এ স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, আত্মা যখন শরীর হইতে পৃথক্ হইবে, তখন কি তাহার কার্য্যক্ষমতা এক বারে দূর হইবে? আমাদিগের বিশ্বাস "না।" এ বিষয় কি রূপ সাধিত হইবে, তাহা পরলোকগত ব্যক্তি বা বিধাতা পুরুষ

* মনুষ্য কিছুরই প্রকৃত সত্তা জানিতে পারে না। বস্তুর গুণমাত্র তদুপযোগী ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানগোচর হয়।

ব্যতীত কেহই জানেন না, সুতরাং কল্পনা-পরায়ণ সম্প্রদায়িকদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় তাহা সভ্যতার ইতিহাসে স্থান পাইবে না।

আমরা প্রথম পুস্তকে যাহা বর্ণন করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, **সভ্যতা** মনুষ্যের অবস্থা বিশেষ। পৃথিবীতে মনুষ্য স্বকীয় ও সামাজিক, উভয়-বিধ অবস্থাতেই অবস্থিত। "স্বকীয়" অবস্থাতে আমরা কেবল আপন হিত-চিন্তাই করি—যথা মানসিক উন্নতি; আর সামাজিক অবস্থাতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বদেশী, বিদেশী প্রভৃতি যাবতীয় মনুষ্যেরই জন্য ব্যস্ত হই। দুই অবস্থাভেদে সভ্যতা দুইভাগে বিভক্ত, স্বকীয় ও সামাজিক। কিন্তু উভয়ে পরস্পর নিঃসম্বন্ধ নহে। একের হ্রাসবৃদ্ধিতে অপরের হ্রস্বতা বা উন্নতি হয়। আপনার উন্নতি হেতু বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব নিচয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দ্বারা জন-সমাজের অশেষ হিত সাধিত হয়। বেকন কখন পরোপকার-ব্রতপরায়ণ হইয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, এক মাত্র স্বার্থই তাঁহাকে জ্ঞানালোচনায় উৎসাহিত করিয়াছিল, কালে তাহা হইতে ভূমণ্ডলের কত হিত সাধিত হইল।

২ সভ্যতা স্বকীয় ও সামাজিক।

ষোড়শ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা আমরা যে সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি, নানারূপ নূতন উপভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মূলে বেকন—তাঁহারই সাংদৃষ্টিক ন্যায়বাদ*।

অদ্য যে রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার দিন দিন এত উন্নতি হইতেছে, তাহার কারণ কি? আমরা বলি, প্রধানতঃ বেকনের সাংদৃষ্টিক ন্যায়বাদ। এই রূপ আপনার যে কোন উন্নতি সাধিত হউক না কেন, তাহার দ্বারা মানব-সমাজের কোন না কোন হিত হইবেই হইবে। আবার পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলে কি রূপে অন্যের উপকার সাধিত হইবে—তদ্বিষয় অনুসন্ধান, আলোচনা ও চিন্তা করিতে করিতে আপনারও অনেক উন্নতি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পাঠক-বর্গ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। গ্রামের যে ব্যক্তি সাধারণের হিতানুষ্ঠান জন্য ব্যস্ত, প্রায় সে সর্ব্বাধিক বুদ্ধিজীবী। ডণ কুইক্সুটের স্যাঙ্ক পাঞ্জির ন্যায় উপায় হীনদিগের হিত-সঙ্কল্প উন্মত্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? সত্য বটে, জাতি সাধারণের সংস্কারকেরা প্রথমে অনেক অবিজ্ঞাত ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন আগ্নেয়গিরি-উত্থিত ধাতু নিঃস্রব মাধ্যা-কর্ষণের শক্তি দ্বারা ভূতলে পতিত হয়, সেই রূপ তাহারাও কালসহকারে বিজ্ঞতা ও সুশীলতা দ্বারা শান্ত-প্রকৃতি হইয়া নরলোকে বিচরণ করে। এই বিজ্ঞতা ও সুশীলতার কারণ কি? সদভিপ্রায় সত্ত্বেও ঔদ্ধত্য দ্বারা মনুষ্যের হিত সাধন না হইয়া অহিত প্রত্যক্ষ করাই একমাত্র কারণ। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ের উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা পুনরায় প্রাচীন বেশ ধারণ করিতেছেন।

৩। বাহ্য সভ্যতা।

স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা "সভ্যতার" আভ্যন্তরিক অংশ। আর বাষ্পীয় রথ, তাড়িত বার্ত্তাবহ, ব্যোমযান, বাষ্পীয় পোত

* Inductive Philosophy.

প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র দ্বারা আমাদিগের শ্রম লাঘব হইতেছে, তাহা বাহ্য অংশ। এই উভয় আবার পরস্পর সাপেক্ষ, অর্থাৎ একের উন্নতি হইলে তৎসহ অপরেরও কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি লক্ষিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস অনুন্ধান করিলে আমরা প্রাচীন আর্য্য প্রভৃতি কতিপয় জাতিকে আভ্যন্তরিক সভ্যতাতে এবং চীন প্রভৃতি কয়েকটী জাতিকে বাহ্য সভ্যতাতে উন্নত দেখিতে পাই। কিন্তু কি প্রাচীন আর্য্য, কি চীন, কাহাকেও প্রকৃত সভ্য বলিতে পারি না। যেহেতু পুরাকালে আর্য্য বংশীয় জ্ঞানবান্ মহাপুরুষদিগের ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী এত সামান্য ছিল, বোধ হয়, তজ্জন্যই তাঁহাদিগের অনেক সময় বৃথা ব্যয় হইত; সুতরাং সেই সময়ে যে উন্নতি হইতে পারিত, তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতেন। এই জন্যই প্রাচীন মুনিঋষি ও ইদানীন্তন চতুষ্পাঠীর শিষ্যবর্গ বহুকাল বিদ্যা উপার্জ্জন করেন, এবং এই জন্যই ইহাঁদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোককে বহু বিদ্যাবিশারদ দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার চীনদিগের বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ চর্চ্চিত হয় নাই, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহারা শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। চীনদিগের অবস্থা কখনই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উন্নত হয় নাই এবং বোধ হয়, হইবেও না। চীনেরা যেরূপ বাহিরের বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে, যদি তাহাদিগের মধ্যে সহস্রে এক জনও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহা হইলে যেরূপ ইউরোপীয়দিগের উন্নতি হইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকাংশে সেই রূপ হইত

৪। প্রকৃত সভ্যতা

অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সভ্যতার সমষ্টির নামই প্রকৃত সভ্যতা। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বাহ্য সভ্যতা আভ্যন্তরিক সভ্যতা অপেক্ষা সমধিক প্রবল হইলে, শীঘ্রই সেই জাতিকে অধঃপাতিত করে। ভোজ্য ভোগ্য বিলাসের বস্তু নহে। ভোজ্য ভোগ্য কেবল শরীরকে সচ্ছন্দ রাখিবে, এবং তাহা হইলে মনেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু মনের উন্নতি হইতে শারীরিক সুখবিচ্ছিন্ন হইলে তদ্দ্বারা শীঘ্রই তত্তৎ জাতির বিনাশ হয়। প্রাচীন রোম, পারস্য, বাবিলন ও মধ্য সময়ের মুসলমানগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

৫ উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজ।

আমরা উপরে যে কয়েকটী কথা কহিলাম, তাহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, উন্নতিশীল সমাজই -সভ্যসমাজ। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উন্নতিশীল সমাজ অপেক্ষা বহুকাল উন্নত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে ধ্বংস হইবার উন্মুখ; এখন সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য। ইহার উদারহন ডিকেট্‌টদিগের অধীনস্থ রোম ও সীজরদিগের শাসন কালীন বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্য। প্রথমোক্ত উন্নতিশীল সমাজে, শেষোক্ত সমাজের অপেক্ষা ২.১ জন উৎকৃষ্টতর ব্যক্তি বিশেষ থাকিতে পারেন, কিন্তু সমষ্টিতে শেষোক্ত সমাজ, প্রথমোক্ত সমাজের অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ লোকে পরিপূর্ণ

৬। উপসংহার।

উপসংহার কালে কত্তব্য যে, আমরা সভ্যতার কয়েকটী ভাব মাত্র বর্ণন করিলাম, কিন্তু প্রকৃত সংজ্ঞা অবধারণে অক্ষম।

কাগার ক্ষেত্রে দিল্লীশ্বর পৃথুরাজের মৃত্যু দর্শনে চাঁদ কবির খেদ।

কাঁদ মা ভারত ভূমি, বীর-পুত্র-শোকে !
কীর্ত্তি-কমলিনী-রবি, যার যশে মুগ্ধ কবি,
অস্তগত আজি মর্ত্ত্যলোকে !

কাঁদ গো কাঁদ গো মাতা, পৃথুরাজ তরে,
এত দিন অরিগণ, লুণ্ঠিতে তোমার ধন,
পারে নাই শুধু যাঁর ডরে।

অনন্ত নিদ্রায় হায়, অশক্ত সে হাত !
ধরি যাহা করবাল, এত কাল যেন কাল
করেছিল যবন নিপাত।

নীরব এখন হায়, সে গম্ভীর স্বর !
যে স্বর স্বগণ মনে, উৎসাহ বাড়াত রণে,
বিপক্ষেরে করিয়া কাতর।

ধরায় পতিত হায়, আজি ধরাধিপ,
পশ্চিম কন্দর বাসী, যবন পবন আসি,
নিবাইল অগ্নি কুল দীপ।

অন্ধকার দেখি মাতা, তোমার ভবন।
অগণ্য তনয় তব, কিন্তু লাজে কিবা কব,
তার তুল্য কোথা এক জন।

ভাবি তব ভাবী দশা হে জনম ভূমি,
রাবণের চিতা সম, দহিছে অন্তর মম ;
কি রূপে তিষ্ঠিবে ভবে তুমি !

দুর্ব্বিপাকে হারাইয়া স্বাধীনতা মণি,
বিজাতির দাসী হঁয়ে, তাদের পীড়ন সয়ে,
কেমতে হা বাঁচিবে জননি ?

ভারত ভূমির দুখে কাঁদ সরিদ্বরে !
যমুনাদি নদী মিলি, শোকাশ্রু সলিলে গলি,
কাঁদ সবে কল কল স্বরে।

পবনের সঙ্গে কাঁদ বন উপবন !
মর্ম্মরে বিটপী বৃন্দে, কাঁদ সবে নিরানন্দে,
করিয়া হিমাশ্রু বরিষণ।

হে উচ্চ স্বাধীন নভঃ স্পর্শি-নীর-ধর !
পর পদানত জনে, দেখিয়া দয়ার্দ্র মনে,
অশ্রুধার ঢাল নিরন্তর।

তুঙ্গ শৃঙ্গবান্ ওহে বীর হিমাচল।
হেরি স্বদেশের দুখ, তুষারে ঢাকত মুখ,
নির্ঝরে বহায়ে অশ্রু জল।

কাঁদ মাতা বীণাপাণি, সকরুণ স্বরে,
অপার কৃপার সিন্ধু রাজন্য কুলের ইন্দু
দীন বন্ধু সম্রাটের তরে।

অতি দীন মানুষেরো হইলে মরণ,
অবশ্য কেহ না কেহ, দেখি তার মৃত দেহ,
নেত্র নীর করে বিসর্জ্জন।

কিন্তু হলে কাল প্রাপ্ত ধার্ম্মিক ভূপতি,
ক্রন্দনের কোলাহল, পরশে গগন তল,
অশ্রু জলে ভিজে বসুমতী।

হা বীর ! সুধীর ! প্রজাপ্রিয় ! যশোধন !
সুহৃদে একেলা ফেলি, কোথা তুমি গেলে চলি,
অন্ধকার করে এ নয়ন ?

হায় হায়, হিন্দুদিগে জিনিয়া কৌশলে,
দুরাত্মা যবন সব, করিতেছে মহোৎসব ;
দেখিয়া হৃদয় মম জ্বলে।

কোথায় ভূভারহারি কল্কি অবতার ?
বিজাতীয় অত্যাচার, সহিতে না পারি আর
আশু আসি করহ উদ্ধার।

হর কালি ভক্তগণ ত্রাস।
জাগ মাগো উগ্রচণ্ডা, করে পুনঃ ধরি খাণ্ডা
দেব দ্বিষ দৈত্যে কর নাশ !

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত রামানন্দী ও অন্যান্য সম্প্রদায়।

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় * হইতে কালক্রমে অন্যান্য আরও কতকগুলি সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সকল সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ান্তর্গত হইলেও তৎসহ মূলে অনেক পৃথক। বোধ হয়, শ্রীবৈষ্ণবদিগের মধ্যে ভোজ্য, ভোজনাদি সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম প্রচলিত থাকাই ইহার প্রধান কারণ। সত্য বটে, কোন ধর্ম্ম নূতন প্রচলিত বা সংস্কৃত হইলে তাহার অব্যবহিত পরিবর্ত্তী লোকেরা স্বার্থশূন্য, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সময়োচিত উন্নতমনাঃ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু প্রথম উদ্যম ও উৎসাহ অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং সাধারণ জনসুলভ আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা তৎস্থানে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। যে ধর্ম্ম বাহ্য কঠোরতাবিহীন, তাহা কিছুকাল স্থায়ী হয়; কারণ মনুষ্য প্রকৃতির অনুযায়ী সুখলিপ্সু এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানাভাবে অধিকাংশ লোকই ঐহিকের আশু-সুখপ্রদ পদার্থের প্রতিই সবিশেষ নিবিষ্টচিত্ত।

রামানুজাচার্য্যের জন্ম গ্রহণের পর এক শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই, রামানন্দ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। ইহারই নাম রামানন্দী বা রামাওয়াৎ। কালে এই রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, রুইদাসী, মীরাবায়ী প্রভৃতি বিস্তর সম্প্রদায় উপজনিত হইয়াছিল।

রামানন্দ কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা তাদৃশ সহজ নহে। কথিত আছে, তিনি প্রথমতঃ রামানুজ সম্প্রদায়ান্তর্গত ছিলেন। একদা দেশ ভ্রমণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বহু দিনান্তে প্রত্যাগত হইলেন; সুতরাং আখড়াস্থ অন্যান্য যাবদীয় বৈষ্ণব তাঁহার প্রতি ভক্ষ্য ভোজ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে পৃথক্ গৃহে আহারাদি করিতে আদেশ করিলেন। রামানন্দ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থিতি করিলেন। এবং তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থানান্তর আপনার মত প্রচার দ্বারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংস্থাপন করিলেন।

রামানন্দের দ্বাদশটী প্রধান শিষ্য ছিল। তাহাদের নাম।

১	আশানন্দ	৭	ভবানন্দ
২	কবীর	৮	ধন্না
৩	রোইদাস	৯	সেন
৪	পীপা	১০	মহানন্দ
৫	সুরসুরানন্দ	১১	পরমানন্দ
৬	সুখানন্দ	১২	শ্রিয়ানন্দ

রামানন্দ জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি বলিতেন যে, ভগবান্ যখন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি নীচ প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তগণ নীচ জাতি মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ সংসারমুক্ত ভক্তের আবার

* শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবরণও ৬ষ্ঠ সংখ্যক পত্রে লিখিত হইয়াছে।

জাত্যভিমান কি? জাতিভেদের প্রাধান্য না থাকায় রামানন্দের শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রামানন্দের অনেক শিষ্যের সম্বন্ধে বিস্তর অদ্ভুত কথা শ্রবণ করা যায়। সে সকল সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছু আশ্চর্য্য না থাকিলে ও রূপ বাক্যোৎপত্তির কোনই কারণ হইতে পারে না।

প্রাগুক্ত দ্বাদশ ব্যক্তি ব্যতীতও এ সম্প্রদায়ে আরও অনেক প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তন্মধ্যে লাভাজি, সুরদাস, তুলসীদাস ও জয়দেব সমধিক প্রসিদ্ধ।

ডোমকুলে লাভাজির জন্ম হয়। লাভাজীর অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সুতরাং বিধবা মাতা তাঁহাকে প্রতিপালনাক্ষম হইয়া একাকী প্রান্তর মধ্যে ত্যাগ করিয়া যান। দৈবাৎ সেই সময়ে কীল এবং অগ্রদাস নামক দুই জন বৈষ্ণব সেই পথে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আপনাদিগের আখড়ায় লইয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করেন। অগ্রদাস লাভাজীকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। লাভাজীউ "ভক্তমাল" গ্রন্থের প্রণেতা।

সুরদাস অন্ধ ছিলেন। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ কবি ও পরম বিষ্ণুভক্ত। সুরদাসকে একটী স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু যে সকল অন্ধ বৈষ্ণব গীত গাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের অধিকাংশই তাঁহার মতাবলম্বী। লোকে ঐ সকল বৈষ্ণবকে সুরদাসী বলে।

তুলসীদাস স্বীয় পত্নীর দ্বারা প্রথমতঃ রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন। দীল্লির সম্রাট্ সাজেহান তুলসীদাসের যশঃশ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে দিল্লীতে আনয়ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সুরদাস সম্রাটের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা মহাপুরুষ তুলসীদাসের অবরোধ বার্ত্তা শ্রবণে মহানিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। সম্রাট্ ভীত হইয়া তুলসীদাসকে মোচন করিলেন এবং কথিত আছে, তাঁহারই বাক্যানুসারে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া জাহানাবাদে বসতি করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, তুলসীদাস চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তুলসীদাস কাশীরাজের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া বারাণসী ধামে আগমন করেন। ঐ স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থানানন্তর অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই তুলসী দাসই হিন্দী ভাষাতে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত মৎস্য, রামগুণাবলী প্রভৃতি আরও কএক খানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৮০ সংবতে তুলসীদাস লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ কবি, জয়দেব ঠাকুর, বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জয়দেব বিবাহ করিতে অনিচ্ছু ছিলেন, কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেব জগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তির আদেশে, জনেক ব্রাহ্মণ কন্যার অনুরোধে পাণিগ্রহণে

বাধ্য হইয়াছিলেন। কাষ্ঠমূর্ত্তি অনুরোধ করুক বা না করুক, যতদূর পাষাণ হৃদয় হউক না কেন, যুবতীর অনুরোধ ও অশ্রুপাতে বিগলিত না হয়, এরূপ লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

সুন্দরীর অনুরোধ বাক্য দৃষ্টান্তরূপে এ স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব।"
ভক্তমাল।

জয়দেব গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করণানন্তর সুপ্রসিদ্ধ গীত গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। বোধ হয়, রমণী সহবাসে কোমলান্তর না হইলে তিনি কখনই এরূপ সুললিত কবিতা রচনা দ্বারা মানব মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতে পারিতেন না।

কবীর পন্থী।

কালসহকারে রামানন্দী হইতে যে কয়েকটী সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কবীর পন্থীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। রামানন্দের শিষ্য কবীর দ্বারা এই সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। ইতিহাস অনুসন্ধানে ধর্ম্ম সংস্কারক ও প্রবর্ত্তকদিগকে যে সমস্ত গুণে ভূষিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বোধ হয়, কবীর কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না; তিনি একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন উন্নতমনা ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। শিক গুরু নানক কবীরের গ্রন্থ হইতে এত নীতি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বোধ হয়, তাঁহার ধর্ম্ম কবীরের ধর্ম্মের একটী শাখা মাত্র।

ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, কবীর এক জন বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পাছে কবীর জারজ সন্তান নামে অভিহিত হন, এই জন্য তাঁহার দলস্থ লোকেরা অনেক রূপ কল্পিত উপন্যাস রচনা করিয়া তদীয় জননীর সতীত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহাহউক, এজন্য তাঁহারা কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ দোষী হইতে পারেন না। যেহেতু এমত অবস্থায় অনেকেই এরূপ কল্পিত উপন্যাস দ্বারা আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করেন।

ঐ বিধবা যুবতী অপযশগ্রস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা-হেতু সন্তান প্রসূত মাত্রই এক অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া গৃহ প্রত্যাগত হইলেন! দৈবাৎ সেই সময়ে একজন জোলা ঐ পথে গমন করিতে২ সদ্য প্রসূত শিশু একাকী পতিত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে গৃহে আনয়ন করিল। ঐ তন্তুবায়ের সন্তান ছিল না, সুতরাং তাহার স্ত্রী কবীরকে আপন সন্তানবৎ লালনপালন করিতে লাগিল।

কোন সময়ে কবীর জন্মিয়াছিলেন, এবিষয় নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তবে বোধ হয়, তিনি রামানন্দের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লোক ছিলেন।

কবীর মুসলমান দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় মুসলমান জাতীয় বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। মুসলমান কি রূপে রামানন্দের শিষ্য হইলেন, এবিষয়ে অনেকের সংশয় হইতে পারে। এই বিষয়ের অনেক কাল্পনিক বৃত্তান্ত আছে, সে সমুদায় আমাদের বিশ্বাসযোগ্য নহে, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক বোধ করিলাম। বোধ হয়, রামানন্দের তাদৃশ জাত্যভিমান না থাকায় তিনি কবীরকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কবীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিপক্ষে ধারণ করিলেন। এবং আপনার

নিঃস্বার্থ বৈরাগ্য ভাব দ্বারা অনেককে তন্মতাবলম্বী করণে সক্ষম হইলেন। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই একই ভাবে দৃষ্টি করিতেন। তিনিই প্রথমতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে জাতিভেদ উম্মূলন করেন।

কবীরের মৃত্যুতে মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল উপস্থিত হইল। মুসলমানেরা তাঁহার শবকে আপনাদিগের ধর্ম্মানুসারে সমাহিত এবং হিন্দুরা দাহ করিতে উদ্যত হইল ; এই রূপ গোলযোগের পর শেষে কাশীরাজ তাঁহার অর্দ্ধশব আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দাহ করিলেন। এবং মুসলমান দলাধিপতি বিজিলিখা অর্দ্ধ শরীর সমাহিত কবিলেন।

কবীরপন্থীদিগের অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে প্রধান২ কয়েক খানির নাম নিম্নে লিখিত হইল। (১) সুখনিধান, (২) গোরখনাথ কি গোষ্ট, (৩) কবীর পাঞ্জি, (৪) রমেনি, (৫) বীজক, (৬) শাখি প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আরও ১৭ ১৮ খানা পুস্তক আছে। এই পুস্তকাবলি উত্তম রূপ অধ্যয়ন না করিলে কেহ কবীরের মতে পণ্ডিত হইতে পারেন না। কিন্তু সচরাচর প্রায় সেরূপ ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, অধিকাংশই ২।১ খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন।

কবীরপন্থীদিগের সংক্ষিপ্ত মত

কবীরপন্থীরা একেশ্বর বাদী এবং রামানুজদিগের ন্যায় ঈশ্বর সাকার ও সগুন স্বীকার করেন।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও পবিত্র স্বরূপ হইলেও পাঞ্চ ভৌতিক ও ত্রিগুণাত্মক শরীর বিশিষ্ট, তাঁহার শরীরগত জড়পদার্থ নিত্য। কবীর পন্থীরা মায়ার অসত্য স্বভাব ও দোষাশ্রিত আচরণের কথা পুনঃ২ উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে মায়ার বশতাপন্ন বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিতে অস্বীকার করেন। জীবাত্মা যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারে যে, কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার যোনি ভ্রমণ করে। দয়া প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত করা অতি ঘোরতর কুকর্ম্ম, সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ গাহস্থ্যাশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও শান্তি লাভের ব্যাঘাত এবং অবিশ্রামে নর ও ঈশ্বর বিশ্বাসের চিন্তা নিবারিত হয়।”

কবীরপন্থীরা বিশেষ রূপে না জানিয়া শুনিয়া কাহার নিকট দীক্ষিত হয় না,—কারণ কবীর পুনঃ২ বলিয়াছেন যে, গুরুর দোষে শিষ্য ও শিষ্যের দোষে গুরু দায়ী। এমতে তীর্থ ও উপবাসাদি নিসিদ্ধ এবং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু উপাস্য নহে।

শ্রুত গোপাল দাস, ভগোদাস, নারায়ণ দাস, চূড়ামন দাস, জগদাস, জীবন দাস, কমাল, তক সাহী, জ্ঞানী, সাহেব দাস, নিত্যানন্দ, কমল নাদ নামক দ্বাদশ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের দ্বাদশ শাখার প্রবর্ত্তক। ইহারা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সকলের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর সম্প্রদায় সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

স্মৃতি তত্ত্ব, বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম খণ্ড। ইহাতে রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে মূল গ্রন্থ অনুবাদের সহিত প্রচারিত হইবে। এই কার্য্যের নিমিত্ত অনুবাদক ও প্রকাশক আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন।

সকল দেশে সমাজের অনুন্নত অবস্থাতে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রণালী কতিপয় যাজক ব্যতীত অন্যের সম্পূর্ণ অগম্য থাকে। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র কেন, অধিকাংশ শাস্ত্রের জ্ঞান যাজক মণ্ডলীর এক চেটিকা থাকে। সেই সমস্ত দুর্ব্বোধ শাস্ত্রে সাধারণ লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং অন্যেরও তদ্বিষয়ক কোন কথা জানিতে হইলে যাজক দিগেরই দ্বারস্থ হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে অন্য শাস্ত্র কাহার একচেটিয়া নাই, কিন্তু এখনও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের একাধিপত্য।

কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার দিন ক্ষণ প্রভৃতি সমুদায়ই স্মার্ত্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। একটি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট পাঁতি লইতে হয়, বিষয়ী লোক যতই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হউন, তাঁহাদিগের কিছুই বলিবার সাধ্য নাই। কারণ স্মৃতি শাস্ত্র সংস্কৃতে রচিত, এবং তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। কিন্তু রমাপতি তর্করত্ন মহাশয় যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে, এই অসুবিধা অনেকাংশে নিরাকৃত হইবে। রঘুনন্দনীয় স্মৃতি সংগ্রহ বাঙ্গালা দেশে বিশেষ আদরণীয় এবং তদনুসারেই দেশীয় আচার ব্যবহার এপর্য্যন্ত চলিতেছে, সেই গ্রন্থের অনুবাদ শেষ হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্রে সাধারণের যথেষ্ট প্রবেশ হইল।

যদি কেহ বলেন যে, এক্ষণে সমাজের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে কিছু কাল পরে স্মৃতি ব্যবস্থা তত আবশ্যক থাকিবে না। এ কথায় আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি না, কারণ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার কোন কালে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে, বোধ হয় না। যদিও বিশেষ বিশেষ লোকের বা সম্প্রদায়ের পক্ষে অনাবশ্যক হয়, তথাপি প্রাচীন আচারের ইতিহাস জানিবার জন্যও ইহা তাঁহাদিগের দেখিবার যোগ্য হইবে।

ভারতবর্ষে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত প্রভৃতি অনেক ঋষির সংহিতা মান্য ও প্রচলিত আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর কোন কোন বিষয়ে বিলক্ষণ মতবৈষম্য দেখা যায়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ন্যায় সংগ্রহকারেরা সেই সমস্ত মতবৈলক্ষণ্য স্থলের মীমাংসা করিয়াছেন। অসংস্কৃতজ্ঞ বা অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে মূল সংহিতা দেখিয়া বা অনুবাদ পাঠ করিয়াও তৎস্থলের সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সুকঠিন, এই জন্য এই সকল সংগ্রহ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আমরা ভরসা করি, স্মৃতি তত্ত্ব দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ইহার অনুবাদ উৎকৃষ্ট, অথচ যথাসম্ভব সরল ও সুগম হইতেছে।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত সমালোচন ।

বোধ হয়, আমাদের পাঠকবর্গের নিকট এই মহাপুরুষ অপরিচিত নহেন, এবং তাঁহার মতাবলম্বী মুসলমানদিগকেও পাঠকগণ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির জীবনচরিত জানিতে সকলেরই কৌতুহল হইয়া থাকে। আমরা অদ্য এই মহাত্মার সংক্ষেপ জীবনচরিত বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বোধ হয়, পাঠকগণও এতৎ পাঠে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

লোহিতসাগর, ভারত মহাসাগর ও পারস্যোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম আরবদেশ। এই দেশের স্থানভেদে প্রকৃতির ভীষণ ও মোহন উভয়ভাব লক্ষিত হয়; কোথায় বা নয়নরঞ্জনকারী হরিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্র অধিবাসিগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিতেছে, কোথাও বালুকাময় মরুভূমি সূর্য্যাতপে অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনগণের ভীতির সঞ্চার করিতেছে, কোথাও মৃদু বেগবতী স্রোতস্বতী গ্রাম বা নগরের সন্নিধানে প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতেছে, কোথাও শত শত ক্রোশ স্থান নিরম্বু ভাব ধারণ করিয়া পিপাসাকুল মানব মণ্ডলীর কণ্ঠ শুষ্ক করিতেছে। কিন্তু সামান্যতঃ আরবদেশ জলশূন্য মরুভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয়, এই এক কারণেই আরবের অধিবাসিগণ বহু কাল এক স্থানে অবস্থিতি করে না। অন্যান্য পশুপালনোপজীবী জাতির ন্যায় আরব দেশীয়েরাও নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে। যখন যে খানে পশুদিগের আহারোপযোগী তৃণ ও জলের সুবিধা দেখে, তখন সেই স্থানই বাসোপযুক্ত মনে করিয়া তথায় অবস্থিতি করে, পশ্চাৎ তথাকার দুর্ব্বাদি তৃণ সকল নিঃশেষিত হইলে স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মই এই—যে দেশে আহার ও সাংসারিক অন্যান্য উপকরণ প্রায় অনায়াসে সাধ্য, তত্রত্য লোক অপেক্ষাকৃত বিলাসী। এই বিলাসিতাই আবার লোককে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া উঠায়, লোকে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে জীবনের প্রতি বিশেষ মমতাবান্ হয়। বাঙ্গালা দেশে আহার ও সাংসারিক সুখ সম্পাদনার্থ বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। বোধ হয়, এই কারণেই আমরা ভীরুস্বভাব ও বিলাসী।

পক্ষান্তরে আরবের অবস্থা আমাদের দেশের বিপরীত। তথায় সামান্য আহারার্থেও উৎকট শ্রমের প্রয়োজন। আরবীয়দিগের জীবন সুখের জীবন নহে; বোধ হয়, এ নিমিত্তই তাহারা স্বভাবতঃ বলবীর্য্যসম্পন্ন, জীবনের প্রতি মমতাশূন্য, সুতরাং যুদ্ধপ্রিয়। আশিয়া, আফ্রিকা, এবং ইউরোপ, এই তিন মহাদেশের অনেক স্থানেই এক সময়ে আরবগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু কোন্ জাতি আরবে আধিপত্য বিস্তারে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছে? প্রকৃতি কোন কালেই আরব দেশীয়দিগকে অনায়াসে সাধ্য আহার বা অন্যবিধ বিলাসবস্তু প্রদান করেন নাই, যথার্থ বটে, কিন্তু

তাহাদিগকে স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্ন দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত রহিয়াছেন।

যখন ভুবনবিখ্যাত আলেকজাণ্ডর গ্রীক হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত আপনার জয়-পতাকা উড্ডীন করেন, আরব তখনও স্বাধীন ছিল, যখন দিগন্তব্যাপী রোম-সাম্রাজ্য ব্রীটিন দ্বীপ হইতে সমস্ত ইউ-রোপ খণ্ড পদানত করিয়াছিল, আরব তখনও স্বাধীন ছিল; আরবের বীর্য্য-বত্তাই যে ইহার কারণ, এমত নহে। অনুর্ব্বরতা, নির্ধনতা ও সম্মুখে ভীষণ মরু দেশই এই সকল প্রকার জাতির কবল হইতে আরবকে এক সময়ে রক্ষা করিয়া-ছিল। ইহাও এক প্রকার অনুমানসিদ্ধ। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, আরব সত্য-যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত স্বাধীন, তাহার সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আরবের ন্যায় সৌভাগ্যশালী দেশ ভূমণ্ডলে অল্পই আছে।

যদিও আরবেরা মহম্মদের আবির্ভা-বের পূর্ব্বে ভিন্ন জাতির সহিত কোনরূপ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় নাই, তথাপি তাহাদের গৃহবিবাদের বিরাম প্রায় ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আরবেরা প্রধানতঃ দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত; এই প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলপতি ছিল। কিন্তু এরাবা, হেড্জাজ, এই উভয় রাজবংশের কোন কোন ভূপতি সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া অনেক সম্প্রদায়ের উপর স্বাধিকার বিস্তার করি-য়াছিলেন। এই রূপ অধিকার বিস্তার কখনও স্থায়িরূপে সম্পন্ন হয় নাই। বিজেতা ভূপালের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে অনেক সময়ে অধীনগণ তদীয় উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছেন। এরূপ ঘটনা অতি প্রাচীন কাল হইতে মহম্মদের সময়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত নিরন্তর চলিয়া আসিয়াছিল।

যে মহাপুরুষ, এই বিভিন্ন প্রকৃতি, পরস্পর কলহপ্রিয়, অস্থিরচিত্ত আরব-দিগকে একতা সূত্রে বন্ধন করিয়া নূতন বলবীর্য্য প্রদান করিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহার নাম মহম্মদ; ইনি ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাঁর পিতার নাম আবদুল্লা। আবদুল্লা বিখ্যাত কো-রেস বংশীয় মহাবীর আবদুল মতালে-বের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। এই বংশীয় হাসেম নামা কোন ব্যক্তি এক সময়ে মক্কা বাসিদিগে বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশীয়েরা মক্কা নিবাসিদিগের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রসিদ্ধ কাবা নামক পবিত্র ধর্ম্ম স্থান ইহাঁদিগেরই হস্তগত ছিল।

পূর্ব্বতম চরিতাখ্যায়ক মাত্রেই আ-লোচ্য ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি নানারূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের পারিষদ অথবা চরিতাখ্যায়কেরাও এই প্রসিদ্ধ-রীতি অতিক্রম করেন নাই। মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার মাতা প্রসববেদনা অনুভব করেন নাই। এই সময়ে স্বর্গীয় কিরণে চতুর্দ্দিগ্ আলো-কিত হইয়াছিল, নদী সকল উচ্ছলিত হইয়াছিল, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হই-য়াছিল, ধর্ম্মবিদ্বেষী যোধবর্গ নানা রূপ কুস্বপ্ন দেখিয়া হতাশ হইল, অগ্নি-পূজকদিগের যজ্ঞীয় অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, পৌত্তলিকদিগের উপাস্য দেবদেবীগণ স্থানভ্রষ্ট ও ভূপতিত হইল। ঈদৃশ অলৌকিক ঘটনাবলী দৃষ্টে জনগণ চমৎ-

কৃত হইয়া উঠিল, কেহবা কুলক্ষণ বিবেচনায় ভীত, কেহ বা সুলক্ষণ বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিল।

ক্রমে শিশুর বয়ঃক্রম সাত দিবস হইলে তাহার পিতামহ সমারোহ পূর্ব্বক নামকরণ ও অন্নপ্রাশনক্রিয়া সমাপন করিলেন। মহম্মদের বয়ঃক্রম দুই মাস সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় *। বিধবা জননী স্বামীশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া নিকটবর্ত্তিনী হালেমা নাম্নী কোন কৃষক-বনিতার প্রতি মহম্মদের লালন পালন-ভার সমর্পণ করিলেন। মহম্মদের হালেমার গৃহে অবস্থিতি সময়েও তৎসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বর্ণন দেখা যায়। তদীয় উষ্ট্র বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সাধুদিগের অগ্রণী মহম্মদকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছি।" এবং প্রতি-পালিকা হালেমার কোন দুঃখ থাকিল না, তাহার ক্ষেত্রসকল প্রচুর শস্যশালী, বৃক্ষ সকল ফলবান, গাভীগণ প্রচুর দুগ্ধ-বতী ও কূপ সকল নিরন্তর উৎকৃষ্ট জল-পূর্ণ হইল।

তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইলে একদা মহম্মদ জনৈক বয়স্যসহ উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গীয় দূত গাব্রি-য়েল নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যসাধারণ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিলেন। মহম্মদ ও তাঁহার বয়স্য গৃহপ্রত্যাগত হইলে বালক হালেমাকে এই শুভ সংবাদ অবগত করাইল; তৎশ্রবণে হালেমা শিশুর অনিষ্ট আশ-ঙ্কায় ভীতা হইলেন; এবং ত্বরায় মহম্মদকে মক্কা নগরে পাঠাইয়া তাঁহার জননীর নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন, এই সময় হইতে ছয় বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মহম্মদ জননীর নিকট বাস করেন, অনন্তর মাতার মৃত্যু হইলে, তিনি পিতা-মহগৃহে জনৈক দাসীকর্ত্তৃক সস্নেহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিছু-কাল পরে পিতামহও পরলোক গমন করিলেন। মহম্মদ পিতৃব্যের গৃহে প্রতি-পালিত হইতে লাগিলেন। বোধ হয়, এই স্থলেই তদীয় অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাবের প্রথমোদ্রেক হয়।

* হক নামার মতে মহম্মদ মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। হকনামার ৫৬ পৃষ্ঠা।

মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেব কা-বার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার গৃহে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অনুষ্ঠানেরই অপ্রতুল ছিল না। মহম্মদ গৃহে থাকিয়াই তৎকালের ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল অনায়াসেই অবগত হইতে পারি-য়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরবদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে যে সকল লোক কাবা দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও কথোপকথন অনায়াসে চলিত। স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহম্মদ এই দুই উপায়ে বিলক্ষণ জ্ঞানো-পার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাৎকালিক প্রচ-লিত ধর্ম্মজ্ঞান ও নানা প্রদেশীয় বিভিন্ন-প্রকৃতি লোকের সহিত আলাপনিবন্ধন মানবপ্রকৃতিজ্ঞান গৃহে বসিয়াই পাই-য়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পিত-ব্যের বাণিজ্য ব্যবসায় থাকাতে তদু-পলক্ষে পারস্য সাগরের উপকূলভাগে ও তুরস্ক দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করি-তেন। এতদ্দ্বারাও তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

আরব ও সিরিয়া দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান মরুভূমি। পথিকগণ বহুকাল হইতে

এই মরুময় পথ সম্বন্ধে নানা রূপ কল্পিত উপন্যাস বলিত। এই সকল উপন্যাস ভূত প্রেত প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক জীববিষয়ক। ফলতঃ যে সকল জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হয় নাই, তাহাদের মধ্যেই উল্লিখিত ভূত প্রেত বিষয়ক অবাস্তবিক উপন্যাস সকল প্রচলিত থাকে। বিজ্ঞানবিবর্জিত আরব জাতিও যে এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্বর্ত্তী ছিল, বলা বাহুল্য।

"অধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা আরবদিগের বিনাশের নিদান" ইত্যাদি যে সকল বচন কোরাণে পাঠ করা যায়, বোধ হয়, আরবদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দৃষ্টেই কোরাণে এই রূপ লিখিত হইয়াছে।

বাণিজ্যোপলক্ষে মহম্মদ পিতৃব্যের সহিত নানা স্থান পবিভ্রমণ করিতেন, এই সময়ে তিনি খুল্লতাতের সহিত বসরা নগরে উপনীত হইলেন এই নগরে অনেক খ্রীষ্টীয়ানের বাস ছিল। মহম্মদও তাঁহার পিতৃব্য একজন সন্ন্যাসীর গৃহে আবাস নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসীর সহিত মহম্মদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুবিধ আলাপ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তীক্ষ্ণধী দেখিয়া আগ্রহ-সহকারে খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ কাবার অধিকারির ভ্রাতুষ্পুত্রকে খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিলে আরবে বাহুল্য রূপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হইবে, এই আশার বশীভূত হইয়া সন্ন্যাসী স্বাবলম্বিত ধর্ম্মে মহম্মদকে দীক্ষিত করিতে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনুমান হয়, এই কালেই মহম্মদের অন্তঃকরণে স্বদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয়, কোরাণে সিরিয়া দেশের এত অধিক প্রশংসা দেখা যায়। মুসলমান লেখকগণ এ সম্বন্ধে যতই কেন অত্যুক্তির বাহুল্য না করুন, আমরা এই প্রশংসার অন্য কারণ দেখি না। বাহুল্য ভয়ে আমরা তাঁহাদিগের অত্যুক্তি সকল উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

মহম্মদ পিতৃব্যের সহিত প্রায় এই সময়ে হওজান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এই তাঁহার প্রথম যুদ্ধ যাত্রা। এই সকল কার্য্যদ্বারা তাঁহার বিভিন্ন দেশভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির চরিত্রজ্ঞান বিলক্ষণ হইয়াছিল। বাণিজ্য-সম্বন্ধেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। ত্বরায় তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনসমাজে প্রচারিত হইল।

মক্কানগরে খাতিজা নাম্নীজনৈক বণিক্ বিধবা ছিলেন; খাতিজার ধনসম্পত্তি প্রচুর ছিল, কিন্তু উপযুক্ত পরিদর্শকের অভাবে তাঁহার বাণিজ্যে নিরন্তর ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইত না। খাতিজার ভ্রাতৃপুত্র চুজিমা মহম্মদের কার্য্যদক্ষতা বিশেষ অবগত ছিলেন। চুজিমার প্রস্তাবানুসারে খাতিজা মহম্মদকে স্বকীয় বাণিজ্য-কার্য্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

মহম্মদের যত্নে দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। খাতিজা ত্বদীয় বুদ্ধিমত্তা, কার্য্য-দক্ষতা এবং যৌবনসুলভ-রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। ত্বরায় বিবাহের প্রস্তাব হইল; মহম্মদও পিতৃব্যের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে খাতিজার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই বিবাহ দ্বারা মহম্মদ প্রচুর বিত্তশালী হইলেন; বোধ হয়, ধন লোভই এই বিবাহের প্রবর্ত্তক ছিল, কারণ ধনাঢ্যতা ব্যতীত চত্বারিংশবর্ষ বয়স্কা সুতরাং

বিগতযৌবনা খাতিজার এমন কোন রূপ গুণ ছিল না যে, তিনি তদ্দ্বারা নব যুবক ও উজ্জ্বল প্রতিভাশালী মহম্মদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারেন।

ইতি পূর্ব্বাবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মপ্রচার।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, সামাজিক যত বিশেষ ঘটনা দেখা যায়, সকলই সমাজের প্রয়োজনানুসারে সংঘটিত হইয়াছে। এবং যে সময়ে প্রোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সূত্রপাত হইতেছিল। জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতিতে সমুদ্রগমনের সুবিধা, সুতরাং যে দেশ বনিগ্‌বৃত্তি-পরায়ণ, তথায় উক্ত বিদ্যার ভূয়সী উন্নতি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই অমোঘ নিয়মানুসারেই প্রাচীন ফিনিসীয় জাতি জ্যোতিঃ শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড, হলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বাস করা ক্লেশকর বলিয়াই তত্তদ্দেশে শিল্প শাস্ত্রের এত দূর উন্নতি দেখা যায়। ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধবীরদিগের অলৌকিক বিবরণ আমরা পাঠ করি, সেই সকল দেশের ইতিহাস দেখ, পরম্পরায় এমন সকল ঘটনা দেখিতে পাইবে যে, সমাজ সুশৃঙ্খল রাখিবার নিমিত্ত ঐরূপ ব্যক্তি বিশেষের আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইবে। আলেকজাণ্ডর, জুলিয়স সিজর, হানিবল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতির আবির্ভাবই আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত। জাতীয় প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে পরে যে ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবে, ইহাও পরিস্ফুট রূপে অনুমান হইতে থাকে। লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া বিগত বিদ্রোহিতার প্রায় দশবর্ষ পূর্ব্বে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এক সময়ে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত করিবে। ১৮-৫৭ অব্দে এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়। বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, রাম মোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের প্রাদুর্ভাবও এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অন্তর্গত।

যদিও বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তথাপি দেশের প্রকৃতির সহিত যাঁহার মত যেখানে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই দেশে সেই ব্যক্তির মত আদৃত হইয়াছে। দেশের অবস্থানুসারে আরবগণ যেমন নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ত্ত করে, তাহাদের মনও বোধ হয়, সেই রূপ পরিবর্ত্তশীল ছিল।

মহম্মদ প্রণীত ধর্ম্ম চিরভক্তিভাজন কাবা ও জমজমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। বীর্য্য প্রদর্শনও এ ধর্ম্মে নিষিদ্ধ কার্য্য নহে। সুতরাং এই ধর্ম্মে আরবদিগের শ্রদ্ধা হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। চিন্তা শীল ধীরপ্রকৃতি ভারতবর্ষে হইলে মহম্মদ কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস দেখ, এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু বাসস্থান প্রাপ্ত হইল না। বাস্তবিক নূতন ধর্ম্মের সহিত দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহারের বা মতবাদের কিয়ৎ পরিমাণে একতা থাকা আবশ্যক; এই একতা ছিল বলিয়াই

য়িহুদী জাতির মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও আরবে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে।

মহম্মদ শৈশব হইতেই নানাবিধ সৎ-গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার দেহাবয়ব সুন্দর, শরীর দৃঢ় ও বলশালী ছিল। ফলতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ স্মরণ-শক্তি, প্রবল কল্পনা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরতা প্রভৃতি যে সকল গুণে লোকে সমাজে আদরণীয় হইয়া থাকে, মহম্মদে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। এরূপ কিংবদন্তী, মক্কা বাসিদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে মহম্মদ মধ্যস্থ হইয়া ভঞ্জন করিয়া দিতেন। যাঁহার যৌবনের প্রথম ভাগেই দেশ-মধ্যে এত দূর প্রভুত্ব, সেই ব্যক্তি কালে যে এক জন অসাধারণ হইবেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। মহম্মদের ন্যায় লোকে কখনও এক জন সামান্য আরবের ন্যায় জীবন কর্ত্তন করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে পারেন না। তদ্দ্বারা অবশ্যই স্বদেশের কোন মহান্ উপকার সিদ্ধ হইবে।

মহম্মদের বাণিজ্যোপলক্ষে ভ্রমণ ও খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসিদিগের সহিত আলাপ দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এদিকে স্বদেশপ্রচলিত ধর্ম্মেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তদ্ব্যতীত তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও নিরন্তর চিন্তাও অল্প ছিল না। বোধ হয়, এই সমস্ত কারণেই তাঁহার মনে নূতন প্রকারের এক ধর্ম্ম-ভাব উপস্থিত হইয়াছিল।

মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আরবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে চারিটি মত প্রচলিত ছিল; ১ম স্যাবীয়, ২য় ম্যাজীয়, ৩য় য়িহুদীয়, ৪র্থ খ্রীষ্টীয়। এই মত চতুষ্টয়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই স্যাবীয় ও ম্যাজীয় মতের আদর করিতেন; য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বির সংখ্যা যৎসামান্য ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে স্যাবী ও ম্যাজীর মত অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল।

উভয় মতেই একেশ্বরবাদ স্বীকার করে, কিন্তু পাপাক্রান্ত মানবগণ স্বয়ং ঈশ্বরোপাসনা করিতে অক্ষম বলিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারকাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে মধ্যস্থরূপে মান্য করিত। ম্যাজির মতে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকে ঈশ্বরের আবাস-স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। কালক্রমে এই উভয় মতাবলম্বিরাই একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের ও অগ্নির আরাধনাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়াছিল।

মহম্মদ স্বদেশপ্রচলিত ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যত তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর বহু চিন্তার পর তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, সৃষ্টি-কর্ত্তা আদিম নরনারী আদম ও হবার নিকট সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালে মনুষ্যগণ তাহাতে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। যখন মানব জাতির ধর্ম্ম নিতান্ত নিকৃষ্টা-বস্থাপন্ন হয়—ধরণী পাপভার বহনে অসমর্থা হন, তখনই জগদীশ্বর এক এক জন মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা ধর্ম্মসংস্কার ও মনুষ্যের পাপভার হরণ করেন। এই রূপে ৪।৫ শতাব্দী পরেই এক এক জন ধর্ম্মসংস্কারক ভূমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া থাকেন; নোহ, আব্রাহিম, মুষা, ঈশা প্রভৃতি সকলেই এই একমাত্র

কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরাই পেগাম্বর বা প্রেরিত ব্যক্তি।

এই সকল প্রেরিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আরবেরা আব্রাহিমের বংশসম্ভূত। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া আব্রাহিমের প্রতি মহম্মদের অপেক্ষাকৃত অধিকতর ভক্তির উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। এবং আব্রাহিমের মত রক্ষা ও তাহা সাধারণে বিশেষ প্রচলন বিষয়ে যে তাঁহার অধিক যত্ন হইবে, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

স্বদেশের ধর্ম্মের অবস্থা দৃষ্টে মহম্মদের বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সময়ে আর এক জন ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যক। তৎকালে মহম্মদ ধর্ম্ম চিন্তনে এত মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মক্কার অনতিদূরস্থ হারা পর্ব্বতের উপরে উপবেশন করিয়া নিরন্তর ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন। এবং মন সর্ব্বদা ঈশ্বর-বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত আশক্ত থাকায় নিয়ত স্বপ্নেও ঐ সকল বিষয়ই দেখিতেন। বোধ হয়, মহম্মদ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যে সকল মত জনসমাজে প্রচার করিতেন, স্বপ্নেই তাহা আদৌ উপলব্ধি করিতেন। কেবল মহম্মদই যে এইরূপ ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, এরূপ নহে; কথিত আছে, সকল ধর্ম্মপ্রচারকই এই রূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ নিরন্তর ধর্ম্মচিন্তা ও ঈশ্বরের নিমিত্তে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলে, সংসারের অন্য কোন বিষয়ে মনঃ ধাবিত হয় না। ঈশা, মুষা চৈতন্য, নানক প্রভৃতির জীবনচরিতই আমাদের উল্লিখিত বিষয়ের প্রমান।

জগতে এমন লোক নাই, যিনি মানব-মণ্ডলীতে প্রধান লোক বলিয়া বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইলে সহজে পরিত্যাগ করেন। কোন ব্যক্তিই নিজের বুদ্ধিমত্তা বা গুণবত্তা অল্প দেখে না। মহম্মদও এই মানব-জাতিসুলভখ্যাতি লাভ স্পৃহা করিতেন না, এমত নহে। আরবের তাৎকালিক অবস্থা মহম্মদের খ্যাতি লাভের বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিশ্বাস হইলে যে, "তিনি ধর্ম্ম সংস্কারার্থ জগদীশ্বরকর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন।" নিরন্তর চিন্তা দ্বারা এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

মহম্মদ প্রায় ছয় মাস কাল এইরূপ চিন্তা, ঈশ্বরধ্যান ও সমাধি দ্বারা অতিবাহিত করিলেন। একদা রজনীতে তিনি নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহম্মদ, তুমি **সত্যধর্ম্ম** প্রচার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে আসিয়াছ, ঈশ্বর তোমার নিকট এই ধর্ম্ম পুস্তক (**কোরাণ**) পাঠাইয়াছেন। যাও, **সত্যধর্ম্ম** প্রচার কর, **পৌত্তলিকতা** বিনাশ কর।"

মহম্মদ স্বপ্ন দর্শনে চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। তদীয় প্রিয়তমা পত্নী খাতিজার সম্মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। খাতিজা পতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থই হউক, অথবা বহুকালের পর স্বামী প্রসন্নচিত্তে আলাপ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান আবশ্যক বলিয়াই হউক, কিম্বা স্বকীয় বিশ্বাসানুসারেই হউক, সানন্দ চিত্তে মহম্মদের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিলেন।

খাতিজার গৃহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পত্র

ওয়ারিকা বাস করিতেন; ওয়ারিকা পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং আরবী ভাষায় বাইবল গ্রন্থের অনুবাদ করেন। খাতিজা মহম্মদের কথিত বৃত্তান্ত ওয়ারিকাকে বলিলেন। ওয়ারিকা তৎশ্রবণে নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ খাতিজাকে বলিলেন, "পূর্ব্বকালে ঈশা মুষা প্রভৃতি মহাত্মারাও জগদীশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তোমার স্বামীও সেই রূপ ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছেন; সত্য সত্যই এই মহাত্মা জগদীশ্বরের দূত।'

ওয়ারিকার পোষকতায় মহম্মদ ও খাতিজার স্থির বিশ্বাস হইল যে, মহম্মদ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের দূত; তিনি স্বপ্নে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা জগদীশ্বর-সহচর গাব্রিয়েলের উক্তি, উহা বৃথা স্বপ্নকল্পনা, বা সয়তানের প্রবর্ত্তনা নহে।

ইহার পর হইতে প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত মহম্মদ আপনার পরিবারবর্গ ও দাস দাসীগণকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই কালের মধ্যে প্রায় ৮০ জন লোক মহম্মদের মতাবলম্বী হয়। প্রথমে গোপনে ইহাদের উপাসনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত। অনন্তর প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই নূতন মত প্রকাশ হইলে মহম্মদের পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁহারা কাবার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধবাদী কোরীয় বংশীয়েরা মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহম্মদের পিতৃব্য আবুলাহেব ভ্রাতৃ নন্দনের ঈদৃশ আচরণ বংশের অগৌরবকর মনে করিয়া তাঁহাকে নানা রূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে যখন বিনয় প্রদর্শনেও মহম্মদ ক্ষান্ত হইলেন না, তখন উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। মহম্মদের দুহিতা রুকায়া আবুলাহেরের পুত্রবধূ ছিলেন। রুকায়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করায় শ্বশুরালয়ে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃতা হইয়াছিলেন।

এই সকল ব্যাপারে মহম্মদ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; পরিশেষে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, গাব্রিয়েল তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ করিয়াছেন। এই সময় হইতে প্রকাশ্যরূপে তিনি নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ঈশার ন্যায় পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত জনগণকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

মহম্মদের মত যদিও আরবদিগের তাৎকালিকী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কোন নূতন মত আবিষ্কার করেন নাই; বলিতে গেলে তিনি আরব দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মবাদেরই পুনরুদ্ধার করেন। তিনি স্বয়ংই বলিতেন, "যে ধর্ম্ম আব্রাহিম ও মুষার অবলম্বিত ছিল, কালে অনভিজ্ঞ লোকে তাহাতে নানা রূপ কুসংস্কার মিশ্রিত করিয়াছে, এক্ষণে লোকে আব্রাহিম ও মুষার মত পরিত্যাগ করিয়া কুসংস্কার নির্ম্মিত মনঃ কল্পিত ধর্ম্মের সেবা করিতেছে; আমি তাহাদের এই কুসংস্কার-বিনাশ করিয়া মহাত্মা আব্রাহিম ও মুষার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছি।" তিনি নিজের উক্তির পোষকতায় আরবদিগের বহু মান্যাস্পদ 'কাবা' ও 'জমজম' কূপের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। এই ভক্তিপ্রদর্শন তাঁহার আন্তরিক কি কৌশলে অবলম্বন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; মহম্মদের জীবনের অন্যান্য

ক্রিয়ার সহিত সমালোচন করিলে বোধ হয়, তিনিও যেশুইট সম্প্রদায়ের ন্যায় কৌশল অবলম্বনে বিমুখ ছিলেন না। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ হিমপ্রধান দেশবাসী ছিলেন। হিমপ্রধান দেশে বাস করিলেই অগ্নির উপকারিতা অধিকতর অনুভব হয়। এই উপকারিতাই, বোধ হয়, তৎকালীন আর্য্যগণের অগ্নিপূজার কারণ। গ্রীষ্মপ্রধান মক্কা নগরেও বোধ হয়, এই কারণেই জমজম কূপ আদরণীয় হইয়াছিল। চিরভক্তিভাজন কাবা ও জমজমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এবং আব্রাহিম ও মুষার নামকীর্ত্তন যে আরবদিগকে স্বমতে আনয়নের অমোঘ উপায়, মহম্মদ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ইতিহাসেও দেখা যায়, যখন যে সমাজ সংস্কারক বা ধর্ম্ম প্রচারক এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনিই অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্য এক মাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে একরূপ হিন্দু ধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মবিবর্জ্জিত ভক্তিপ্রধান মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের নাম ছিল বলিয়াই, শীঘ্র শীঘ্র বঙ্গ দেশে এত বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে নব্য ব্রাহ্মগণ এত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না; শাস্ত্র ও স্বদেশীয় আচারের সহিত বিরোধই তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক বলিয়া অনুমান হয়।

এ দিকে বিপক্ষবর্গ মহম্মদের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। মহম্মদ উৎপীড়নে ক্ষান্ত হইবার লোক ছিলেন না। যত উৎপীড়ন হইতে লাগিল, ততই মহম্মদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও দলপুষ্টি হইতে লাগিল।

পুরাবৃত্তের যে অংশ পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, কোন দেশের ধর্ম্ম বা অন্য কোন সামাজিক প্রথা যখন নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে আর সেই ধর্ম্মাচরণ বা সেই প্রথানুসারে চলিতে সমর্থ হয় না। হয় ত সেই ধর্ম্ম বা আচার দ্বারা দেশের মহান্ অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তখনই সেই দেশে এক ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজসংস্কারক জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের দুরবস্থা দূর করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার ইহাও দেখা যায়, কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, কিছু কাল তদবলম্বি লোকদিগের চরিত্র অতি পবিত্র থাকে।

পুরাতন মতের সহিত তুলনায় মহম্মদের মত পরম উৎকৃষ্ট। তখন যাঁহারা মহম্মদের শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রও বিশুদ্ধ ছিল। তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে বিশ্বাসও প্রগাঢ় ছিল। যথার্থ ভদ্রপ্রকৃতি লোকে অত্যাচারিত হইলেও অত্যাচারির প্রতি সুনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার করেন না। যখন সামান্য লোকে দেখিতে পাইত, প্রাচীন মতাবলম্বিরা মহম্মদ বা তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, এবং তাঁহারা আত্মরক্ষার্থেও কোন ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন না, তখন অবশ্যই মহম্মদের প্রতি লোকের ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, ভক্তি ভাজনের মত অবলম্বন করা মনের প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং প্রাচীন মতাবলম্বিদিগের অত্যাচার যে মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবী তাঁহাদিগের শিষ্যবর্গকে অধিকতর স্থান দান করিয়াছেন।

এই রূপে মহম্মদের ধর্ম্ম দিন দিন প্রচার হইতে লাগিল, কিন্তু প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদিদিগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। একদা মহম্মদ কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমন সময়ে বিপক্ষেরা এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, আবুবেকার নামা শিষ্য তথায় উপস্থিত না থাকিলে, তিনি সেই দিনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এ দিকে তাঁহার কতকগুলি শিষ্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আবিশিনিয়া দেশে পলায়ন করিল। কিছু দিন মধ্যেই কোরেসীয়েরা এই নিয়ম প্রচার করিল যে, কোন মহম্মদীয় আরবে বাস করিতে পারিবে না। মহম্মদ অগত্যা মক্কা পরিত্যাগ করিয়া ছাফা পর্ব্বতের উপরে অর্খাম নামা শিষ্যের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ খানেও সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারিলেন না; এক মাস গত না হইতে হইতে তদীয় বিপক্ষ আবুয়াল নামা এক ব্যক্তি মহম্মদের সন্ধান পাইয়া সশস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে মহম্মদের পিতৃব্য হামজা এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। হামজার সহিত আবুয়ালের তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল, পরিশেষে হামজা ক্রোধ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাদের ইষ্টক ও প্রস্তরময় দেব দেবীতে বিশ্বাস করি না, তুমি কি বলপূর্ব্বক আমাকে বিশ্বাস করাইবে?" অনন্তর হামজা নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং আবুয়ালকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

আবুয়াল গৃহে আসিয়া ভ্রাতৃপুত্র ওমারের নিকট সবিশেষ বলিলেন। ওমারের ন্যায় বীর, সাহসী ও বলিষ্ঠ লোক মক্কাতে অল্পই ছিল। ওমার খুল্লতাতের অপমান শ্রবণে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; এবং মহম্মদের প্রাণ নাশসংকল্প করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, "ওমর, তোমার ভগিনী ও ভগিনীপতি মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অগ্রে তাহাদিগকে শাসন কর, পরে মহম্মদের নিকট যাও।"

ওমার এই কথা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং অগ্রেই ভগিনীর গৃহে যাইবার মনন করিয়া তদভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, ভগিনী স্বামীর সহিত ভক্তিভাবে কোরাণ অধ্যয়ন করিতেছেন। ঈদৃশ আচরণে ওমার অধৈর্য্য হইয়া ভগিনীপতিকে গুরুতর প্রহার করিলে তদীয় ভগিনী স্বামির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, আমরা একেশ্বরে বিশ্বাস করি বলিয়া শাস্তি দিতেছ?" এই বাক্য শ্রবণে ওমার স্তম্ভিত হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহারা কোরাণের যে অংশ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা ওমারকে বুঝাইয়া দিলেন। ওমার ক্রমে শান্ত হইয়া আসিলেন, তাঁহারাও উপদেশ দিতে লাগিলেন; ওমারের মত পরিবর্ত্ত হইল। অনন্তর তিনি মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ওমার এবং হামজা মক্কা নগরের যোদ্ধাদিগের অগ্রণী ছিলেন; এই দুই ব্যক্তিই মহম্মদের মত গ্রহণ করেন, সুতরাং এক্ষণে মহম্মদের সাহস অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহম্মদ এই দুই ব্যক্তির বীরত্বে নির্ভর করিয়া প্রকাশ্য ভাবে মক্কার পথে যাতায়াত

এবং শিষ্যগণের সহিত কাবায় গমন ও উপাসনাদি ক্রিয়া বিনা বাধায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মক্কার ছোট বড় সকল লোকেই এখন মহম্মদকে ভয় করিতে লাগিল।

এই রূপে কিছু কাল গেল; অনন্তর কোরেসীয় বংশীয় সকলে একত্রিত হইয়া ঘোষণা করিল যে, অতঃপর আর কোন ব্যক্তি মুসলমানদিগের সহিত আহার, ব্যবহার ও বিবাহাদি ক্রিয়া করিতে পারিবে না। ইহার পরে তাহারা এরূপ আদেশও প্রচার করিল যে, মুসলমানদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে হইবে। এই সময়ে মহম্মদ ও তদীয় শিষ্যবর্গের প্রতি কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল, উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই অনুভব হইতে পারে।

যদিও মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেব ভ্রাতৃপুত্রের ধর্ম্ম মতাবলম্বী ছিলেন না, তথাপি স্নেহ বশতঃ মহম্মদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে মক্কার অনতিদূরবর্ত্তী একটী দুর্গ প্রদান করেন। মহম্মদও অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় শিষ্যবর্গের সহিত এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বিপক্ষগণ আহারসামগ্রী ক্রয়ের ব্যাঘাত করায়, এখানেও নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় রহিল না।

প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশে প্রথা ছিল যে, রমজানের রোজার সময়ে বহু সংখ্যক লোক কাবা দর্শন নিমিত্ত মক্কা নগরে সমাগত হইত। ঐ সময়ে আরবীয়েরা পরস্পর মধ্যে শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলেই ধর্ম্মক্রিয়ায় রত হইত। মহম্মদও এই সময়ে শিষ্যগণ সহিত মক্কাতে সমাগত হইয়া নিঃশঙ্ক ভাবে উপাসনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

এরূপ কিংবদন্তী যে, হাবিব ইবন্‌মালেক নামা জনৈক রাজা বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ সময়ে মক্কায় আগমন করেন। হাবিব ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টীয়, য়িহুদীয় এবং অগ্নিহোত্র, এই ধর্ম্ম ত্রিতয় অবলম্বন করেন; তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এত অভিজ্ঞতা ছিল যে, লোকে তাঁহাকে "জ্ঞানী" বলিয়া সম্বোধন করিত।

কোরেসীয় অধিপতি আবু সোফায়ান ও আবুয়াল মহম্মদের প্রাণ নাশ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধির উপায় প্রাপ্ত হন নাই। এক্ষণে হাবিবকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তদ্দ্বারা মহম্মদের প্রাণ নাশের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। হাবিব তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, লোকদ্বারা মহম্মদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মহম্মদ এই সময়ে খাতিজার গৃহে ছিলেন। খাতিজা এই ব্যাপারে নিতান্ত ভীতা হইয়া মহম্মদকে রাজসমীপে গমন করিতে নিষেধ করিলেন। মহম্মদ স্ত্রীজনোচিত ভীরুতায় নিরস্ত না হইয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মহম্মদ উপস্থিত হইলে হাবিব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া প্রচার করিয়াছ, পূর্ব্বে যাঁহারা স্বর্গীয় দূত বলিয়া জগতে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা স্ব২ উক্তির প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ করাও।"

বৃদ্ধাবস্থায় হাবিবের এক কন্যা হইয়াছিল। তাহার নাম সাতিলা। সাতিলা বাল্যাবধিই অন্ধ, খঞ্জ ও মূক ছিল। হাবিব কন্যার এই দুর্দ্দশা দূর করিতেই মক্কায় উপস্থিত হন। মহম্মদ হাবিবের কথা সমাপ্ত হইলেই বলিলেন, "হাবিব, তুমি কন্যার অশুভ শান্তির নিমিত্তই এখানে উপস্থিত হইয়াছ; যাও, তোমার কন্যার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ কর, তবেই ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে।" হাবিব এই কথার পরেই কন্যার শিবিরে যাইয়া দেখেন, সে দর্শন, শ্রবণ ও গমনশক্তিবিশিষ্টা হইয়া উত্তমরূপে কথা বলিতেছে। হাবিব এই ঘটনাতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মহম্মদকে স্বর্গীয় দূত বলিয়া, স্বীকার পূর্ব্বক, তাঁহার পদানত হইলেন। এই সময়ে হাবিবের সহিত মক্কাবাসী ৪৭০ জন লোক মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

হাবিবের কন্যার আরোগ্য বিবরণ মুসলমানেরা যে রূপই বলুন না কেন, এই বিবরণ অথবা মহম্মদসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে যত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়ই যে মহম্মদের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীদ্বারা কল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য। মহম্মদ এক জন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও দৃঢ়ব্রত লোক ছিলেন; প্রথমে তিনি এক মাত্র যুক্তি ও সদাচরণদ্বারাই নিজের মত প্রচার করেন, কালে যখন আশাতিরিক্ত ফল লাভ করেন, বোধ হয়, তখনই তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়; বোধ হয়, তৎকালে তিনি আপনাকে মানব জাতি অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাশালী লোক মনে করেন। এই সময়েই তরবারিপ্রয়োগ এবং নানা রূপ কৌশল তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের সহকারী হইয়া উঠে। আমরা যেমন মহম্মদকে মানব জাতিবহির্ভূত গুণসম্পন্ন মনে করি না, সেই রূপ প্রতারকও মনে করি না। যদিও তিনি আপনাকে মানব মণ্ডলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়া থাকেন, অথবা নিজের অমানুষশ্রেষ্ঠতা কাহাকেও প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহার প্রবঞ্চনা নহে; কুসংস্কার বলা যাইতে পারে। এটী কেবল মহম্মদেরই ছিল, এমন নয়। প্রাচীন কালের অনেক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরই এই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই যে প্রবঞ্চনাপরায়ণ ছিলেন, এরূপ বলা যায় না। প্রথম যোগে মহম্মদ অলৌকিক কার্য্য দর্শনার্থীদিগকে বলিতেন, "কোরাণের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাদৃশ সামান্য লোকের দ্বারা প্রচার অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা আর কি হইতে পারে?" অনন্তর যুক্তি ও তর্ক দ্বারা যখন সাধারণের মত পরিবর্ত্ত করিতে অক্ষম হইলেন, তৎকালে বোধ হয়, অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শনেও ত্রুটি করেন নাই। ফলতঃ বিজ্ঞানবিবর্জ্জিত মূর্খ মণ্ডলীতে সহস্র যুক্তি প্রদর্শন অপেক্ষা একটী অলৌকিক কার্য্য দ্বারা অধিকতর কৃতকার্য্য হওয়া যায়। মহম্মদ যে সময়ের লোক, তাহা বিবেচনা করিলে, তিনি স্বয়ংও যে অদ্ভুত ঘটনাপ্রিয় ছিলেন না, তাহাই বা কি রূপে বলা যাইতে পারে। এক মাত্র যুক্তিদ্বারা মনুষ্যের মত পরিবর্ত্তনের সময়, বোধ হয়, এখনও উপস্থিত হয় নাই; এখনও সর্ব্বদেশীয় ইতর সম্প্রদায় যুক্তি অপেক্ষা অদ্ভুত ক্রিয়ার অধিকতর আদর করিয়া থাকে।

মহম্মদ এত দিন এক প্রকার সুখেই নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু

এক্ষণে নানা রূপ বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব ও প্রিয়তমা ভার্য্যা খাতিজা পরলোক গমন করিলেন। খাতিজা অধিক বয়স্কা হইলেও মহম্মদ তদ্দ্বারা বহু প্রকার উপকার প্রাপ্তিহেতু তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এদিগে আবুতালেব জীবিত থাকাতে লোকে তাঁহার ভয়ে মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিতে বড় পারিত না। এক্ষণে পিতৃব্যের মৃত্যুতে মহম্মদ চারিদিগ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, এবং অনতিবিলম্বে মক্কা নগর পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি খাইস নগরে উপস্থিত হন। খাইসের অধিপতি পৌত্তলিক ছিলেন, সুতরাং শীঘ্রই তথা হইতে দূরীকৃত হইয়া মককাতে জনৈক শিষ্যের গৃহে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহম্মদের মন কত দুশ্চিন্তান্বিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। মুসলমানেরা বলেন, এই সময়ে স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েল মহম্মদকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যান, এবং তথায় পরমেশ্বরের সহিত মহম্মদের নানা রূপ কথোপকথন হয়। বোধ হয়, এই দুশ্চিন্তার সময়ে মহম্মদ স্বপ্নে ঐ রূপ ঘটনা দেখিয়াছিলেন।

মহম্মদের ন্যায় লোকের বাসস্থান কখনও লোকসমাজের অজ্ঞাত থাকিতে পারে না, কোরেসীয়েরা শীঘ্রই অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সময়ে আবার রমজানের রোজা উপস্থিত হইল। মক্কার যাত্রী সকল সমাগত ও পরস্পর বিদ্বেষ ভাব পরিত্যক্ত হইল। মহম্মদ এই সুযোগে বাহির হইয়া কাবা দর্শন, উপাসনা এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইয়াথ্রার নিবাসী কতকগুলি লোক মক্কায় উপস্থিত ছিল। তাহারা পূর্ব্বাবধিই যিহুদীদিগের নিকট শুনিয়াছিল যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক এক জন দূত প্রেরিত হইবেন। মহম্মদ আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিতেছেন, তাহারা মহম্মদের এই বাক্য শ্রবণ, ও অন্যান্য সদ্গুণ দর্শনে তাঁহার মত গ্রহণ করিল।

ইহার কিছু কাল পরেই মদিনাবাসিরা মহম্মদের নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা মহম্মদকে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় বাস করিতে অনুরোধ করে। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যাবৎ কণ্ঠে প্রাণ থাকিবে, মহম্মদের সাহায্য করিবে। মহম্মদ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দ্বাদশজন শিষ্য সহিত মদিনায় গমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রমজানের রোজা অতীত, ও পুনর্ব্বার মহম্মদ ও তদীয় শিষ্যবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ, হইল। একদা রজনীতে কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া মহম্মদের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল; মহম্মদ অনতিবিলম্বে বিপক্ষদিগের অভিসন্ধি অবগত হইয়া কৌশলক্রমে গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আবুবেকারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মদিনা পলায়ন করিলেন। পাছে শত্রুগণ অনুসরণ করে, এ নিমিত্ত মরুভূমি ও অরণ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তিনি নির্ভয় হইতে পারিলেন না, পশ্চাৎ২ বিপক্ষগণ শীঘ্রই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,

যাহা হউক, তাহাদের কোন ফল লাভ হইল না, শীঘ্রই পরাভূত হইয়া প্রতিগমন করিল। পর দিবস তিনি মদিনার সম্মুখবর্ত্তী কবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মদিনাবাসিরা মহম্মদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। মদিনাতে মুসলমান সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। অনন্তর ভুবনবিজয়ী রাজার ন্যায় বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া মহম্মদ মদিনা নগরে প্রবেশ করিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহার জামাতা আলী ও অন্যান্য মুসলমানগণও মদিনায় উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের মদিনা আগমন হইতে মুসলমানদিগের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে তাহাদের শাক গণনা আরম্ভ হয়, উহার নাম হিজরী শাক, উহা খ্রীষ্টীয় ৬২২ বর্ষে আরম্ভ হয়।

ইতি শান্তভাবে ধর্ম্ম প্রচার।

ভাষা।

ভাষা সম্বন্ধে তৃতীয় মতকে সম্মতিবাদ বলা যাইতে পারে। কেহ২ বলেন, আদিকালে মনুষ্য সকলে সমবেত হইয়া সম্মতি পূর্ব্বক বস্তু সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তাহার পর যখন মানবগণ অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া আদিম আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন২ দেশে গিয়া বাস করে, তখন দেশভেদে, রুচিভেদে, অবস্থাভেদে ভাষাভেদ হয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অভাব বৃদ্ধি হয়; যাহারা যত সভ্য, তাহাদের অভাব তত অধিক। প্রয়োজনানুসারে নূতন২ শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আদিমকালের এক অভিন্ন ভাষা ভিন্ন২ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; এক বৃক্ষের অনন্ত শাখা প্রশাখায় পৃথিবী ব্যাপিয়াছে।

এই মতের অসারতা এতদূর জাজ্বল্যমান যে, তাহা প্রমাণ করিতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। মোটামুটি দুই চারিটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। যাহা দেখিতে পাই না, তাহার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, যাহা দেখিতে পাই, তাহা লইয়াই বিচার করি। ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এক্ষণেও আমরা দেখিতেছি যে, ভাষায় অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিতেছে; দিন দিন অনেক নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে। যে ভাষা সাহিত্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে, সে ভাষার অবশ্য অধিক পরিবর্ত্তন হয় না। না হওয়াতে লাভও আছে, কারণ তাহাতে অধিক পরিবর্ত্তন হইলে আজিকার লিখিত অথবা এক্ষণে প্রচলিত সাহিত্য আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে কাহারও বোধগম্য হইবে না। ইহাতে কত অনিষ্ট, কত ক্ষতি, বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে ভাষা ব্যাকরণের এবং সাহিত্যের ভার মস্তকে করে নাই, সে ভাষার লীলা অপার। অসভ্য জাতিদিগের ভাষা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কুক্ সাহেবের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত

টাহিটীর ভাষায় দশটী সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে পাঁচটী পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যথা।—

'রুয়া' (দুই) এক্ষণে 'পিটি' হইয়াছে
'হা' (চারি) " 'মাহা' " "
'রিমা' (পাঁচ) " 'পেই' " "
'অনো' (ছয়) " 'ফেনি' " "
'ভারু' (অষ্ট) " 'ভাউ' " *

এচ্ ডব্লিউ বেট্স্ বলেন যে, ব্রেজিল দেশে এক নদীর তীরস্থ গ্রাম সকলে দুই শত মাইলের মধ্যে সাতটী অথবা আট্টী ভাষা শ্রুত হওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইবারও প্রয়োজন নাই। একটু মনোযোগ করিলে ঘরে বসিয়াই দেখিতে পাইবেন, আমাদের স্ত্রীলোকেরা কত নূতন২ শব্দ উদ্ভাবিত করিয়া ব্যবহার করে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় দেখিয়াছেন, অনেক স্ত্রীলোক একত্রে বসিয়া নূতন শব্দ উদ্ভাবনের যত্ন করিতেছে ?

অসভ্য জাতীয়েরও সর্ব্বসম্মতিপূর্ব্বক নূতন২ শব্দ ব্যবহার করে না। তাহাদের সকলে সমবেত হইয়া সকলের সম্মতিক্রমে ভাষা পরিবর্ত্তনের কথা আমরা কোন গ্রন্থে পাঠ করি নাই, কোন প্রমাণও নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

প্রকৃর্ত্তির অভাব পূর্ণ করিতেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং এরূপ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের জন্য কষ্ট করিবার সময় তাহাদের কোথায় ? এ সকল নিশ্চিন্ত লোকের কাজ—সুসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ হইতে পারে। আমাদিগকে নৈসর্গিক বিকার নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় না। দোকানে আহার্য্য রহিয়াছে, টাকা দিলেই পাই ; পুষ্করিণীতে জল রহিয়াছে, আবশ্যক হইলেই, ইচ্ছা হইলেই আনাইতে পারি ; অথচ একটী শব্দের অভাবে, একটী শব্দের জন্য অনেক অসুবিধা ঘটে। সুতরাং একটী শব্দের অভাব হইলে, আমরা বিচার করিয়া, পরামর্শ করিয়া নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু অসভ্য জাতীয়দিগের অবস্থা আমাদের অবস্থার ন্যায় নহে। তাহারা যতক্ষণে পশুবধ করিবে, ততক্ষণ জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে পারিবে ; পিপাসা হইলে যে খানে নদী আছে, সেই খানে দৌড়িতে হইবে। আবার আহার্য্য, পানীয়, বিলাসীয়, এ সকল আহরণ করিয়াও নিষ্কৃতি নাই। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে পাপ ও পুণ্য নাই ;—পরস্বাপহরণ করাকে তাহারা পাপ মনে করে না। সুতরাং আবশ্যকীয় আহরণ করিয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। যিনি বলবান্, তাঁহার আবশ্যক হইলেই তিনি কাড়িয়া লইলেন। আবার বনে গিয়া মৃগবধ কর, নহিলে আহার হইবে না ; আবার নদী হইতে জল লইয়া আইস, নহিলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবে।

দ্বিতীয়তঃ, তুমি অনেক পশুর আহার্য্য, অনেক পশুর বধ্য। তোমার আশ্রয়স্থান নিরাপদ নহে ; তোমার সামর্থ্য সকল পশুর অপেক্ষা অধিক নহে, সুতরাং আত্মরক্ষার্থেও তোমাকে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতে হয়—সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা করুন, এরূপ যাহাদের অবস্থা, তাহাদের কি দুটো কথার জন্য সমবেত হওয়া সম্ভব ?

* Max Muller's Lectures on the Science of Language, Volume II.

সম্মতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি এখনও রহিয়াছে। সে আপত্তি এই যে, যখন মনুষ্যমধ্যে কোন ভাষাই ছিল না, তখন সম্মতিক্রমে ভাষা সৃষ্টি কি রূপে হইতে পারে? সম্মতিপূর্ব্বক যে ভাষা সৃষ্টি একবারে না হইতে পারে, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু বিনা ভাষায় হইতে পারে না, যখন কোন ভাষাই ছিল না, তখন হইতে পারিত না। মনুষ্য কথা কহিতে শিখিলে, তর্ক করিতে শিখিলে, পাঁচ জনে বসিয়া নূতন ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। পাঁচ জনে কেন, এক জনেও পারে। পারে যে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বিসপ্ উইল্কিন্স্ এবং জর্জ আল্মেনেজারকে পাঠকের সম্মুখে দিতে পারি। কিন্তু যখন কোন ভাষাই ছিল না, তখন পাঁচ জনের সম্মতি কি রূপে হইতে পারে? অবশ্য ভাষা না থাকিলেও বাহ্য-বস্তু সম্বন্ধে দুই চারিটী সরল অমিশ্র ভাব থাকিতে পারে, সেই সকল ভাব শরীর সঞ্চালনের দ্বারা প্রকাশও করা যাইতে পারে; কিন্তু ভাষা নির্ম্মাণ করিবার প্রসঙ্গ কিরূপে উথাপিত করিবে? অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃক্ষস্থ ফল, সরোবরের বারি, মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র দেখাইতে পার, কিন্তু ভাষা বুঝাইতে কি নির্দ্দেশ করিবে? কোন অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা সে সময়ে আবশ্যকীয় কথা ব্যক্ত করা যায়, তাহা কল্পনার অগোচর। বিশেষতঃ সম্মতি ক্রমে ভাষা সৃষ্টি করিতে হইলে তর্কের আবশ্যক; অল্প হউক, অধিক হউক, তর্কের আবশ্যক। ভাষা ব্যতীত কি রূপে হইতে পারে?

ভাষা অনুকরণমূলক। মনুষ্য অনুকরণ প্রিয়, যখন যে শব্দ কর্ণে লাগিয়াছে, তাহারই অনুকরণ করিয়াছে, তাহার অনুকরণের দ্বারা ভাষার মূল পত্তন হইয়াছে। আমরাও এই মতের অনুমোদন করি। এক্ষণে দেখাইতেছি, অনুকরণের দ্বারা কিরূপে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে।

মনুষ্য যে অনুকরণপ্রিয়, তাহা বোধহয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। অনুকরণ প্রিয়তা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যখন যে মত প্রবল হইয়া উঠে, যখন যে রীতি প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখন আমরা সকলেই তাহার দিকে ধাবমান হই, বিচার না করিয়া, বিবেচনা না করিয়াই সাদরে তাহা অবলম্বন করি। ধর্ম্মে, ক্রীড়ায়, আচারে, ব্যবহারে, আহারে, শয্যায় সাহিত্যে, দর্শনে, নিন্দায়, প্রশংসায়, সকল বিষয়েই এই নিয়ম। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পালা পড়িল, তখন বিচার না করিয়াই; হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা না জানিয়াই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। বেদের, পুরাণের নামমাত্র শুনিয়াই, 'মিথ্যা২' করিয়া চীৎকার করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারের সার, ভব পারাবারের তরণী, অমৃতধামের সোপান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া উঠিল। মনে২ করিলাম, আমরাই ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, আমরা ঈশ্বরের পোষ্যপুত্র, উত্তরাধিকারী স্বত্বে কেবল আমরাই অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করিব; আর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান সকলেই ঈশ্বরের ত্যজ্যপুত্র, সুতরাং সকলেই অনন্তকাল নীরয়ে পচিবে। বৃক্ষ হইতে একটী শুষ্ক পল্লব খসিয়া পড়িল, দেখিয়া ভাবে গদ্ গদ্ হইলাম, অজশ্র প্রেমাশ্রু দরদর বিগলিত হইল। আর যদি কোন হিন্দুভক্তকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণবিরহে

শ্যামবিলাসিনী,শ্যাম কাঙ্গালিনী, শ্যাম-পাগলিনী রাধিকার যাতনার বর্ণনা শুনিয়া রোদন করিতে দেখিলাম, তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্বোধ, মূর্খ, পাষণ্ড, পৌত্তলিক প্রভৃতি সুসভ্য গালাগালি দিতেও ত্রুটি হইল না। অবলীলাক্রমে গালাগালি দিলাম, একবারও মনে করিলাম না যে, প্রাণের অধিক প্রিয়বস্তু ধনের বিরহ যাতনায় রোদন করা মনুষ্যের ধর্ম্ম, স্বভাবের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, আর পল্লবপাতে অশ্রুপাত যত্নসাপেক্ষ, চক্ষে লঙ্কা দিয়া কাঁদিতে হয়। আবার এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া হাসিবার দিন পড়িয়াছে, সকলে মিলিয়াই হাসিতেছি, বিচার না করিয়াই হাসিতেছি। বিচার শক্তির উপর প্রচলিত মতের এতদূর প্রাধান্য, মনুষ্যহৃদয়ে অনুকরণপ্রিয়তা এতদূর প্রবল।

আমাদের এ মতের পোষকস্বরূপ যদি দুটো বড় লোকের নাম শুনিতে চাহেন, তাহাও শুনাইতে পারি। হামিল্টন বলিয়াছেন, "যেমন মনুষ্যদেহে প্রত্যেক অঙ্গের কার্য্য অন্যান্য অঙ্গের সহিত মিলিয়া হয়, তেমনি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি আর সকলের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করে—চিন্তা করে।" লোকে যাহাকে ভাল বলে, আমরাও তাহাকে ভাল বলি—সকলের চক্ষে যাহা মন্দ, আমাদের চক্ষেও তাহা তদ্রূপ। চ্যারণ লিখিয়াছেন, "সকল বিষয়েই আমরা পরের উপর নির্ভর করি ; আমরা বিশ্বাস করি, বিচার করি, কার্য্য করি, জীবনধারণ করি, মরি, পরের উপর নির্ভর করিয়া।" অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বালকের স্বভাব দেখুন, যাহা শুনে, তাহাই অনুকরণ করে পশু পক্ষির স্বরানুকরণের দ্বারা তাহাদের নামকরণ করে ;—কাকের নাম 'কা কা,' বিড়ালের নাম 'ম্যাও' কুকুরের নাম 'ভেউ।' অসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে এই বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। মাক্ষমূলর—যিনি আমাদের মতের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী—তিনিও স্বীকার করেন যে, অসভ্য মনুষ্য অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়।

মনুষ্যের কোন বৃত্তিই নিরর্থক অথবা অকর্ম্মণ্য নহে, সকল বৃত্তিরই অনুশীলনোপযোগী উপকরণ পৃথিবীতে রহিয়াছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভাব পূরণের উপায়ও সৃষ্ট হইয়াছে ; যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রহিয়াছে, তেমনি বৃক্ষে ফল, সরোবরে বারিও রহিয়াছে। অনুকরণপ্রিয়তা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম—অনুকরণের দ্রব্যেরও অভাব নাই।

যাহা সৃষ্টি করা মনুষ্যশক্তির অতীত, তাহা এখনও যেমন, প্রাচীন কালেও তেমনি ছিল। নদী এখনও যেমন হাসিতে২, নাচিতে২, খেলিতে২ গিয়া সাগরে মিলিত হয়, তখনও তেমনি হইত। এখনও যেমন কাননে দেখিতে পাও, বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র, পক্ক ফল খসিয়া পড়ে, দুই একটী পাখী শাখায় বসিয়া স্বরলহরী বিস্তার করে, দুই একটী পশু বৃক্ষতলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, তখনও তাহাই ছিল। এখন যাহা স্থানে স্থানে দেখিতে পাও, তখন সর্ব্বত্রই তাহা দেখিতে পাইতে ;—পৃথিবী শব্দে পরিপূর্ণ। রঙ্গময়ী তরঙ্গিণীর তরঙ্গোৎক্ষেপে, বিলাসপরায়ণ বায়ুর গতিতে, ক্রীড়াশীলা বিহঙ্গিনীর সঙ্গীতে, পশুগণের গর্জ্জনে, অঙ্গ সঞ্চালনে, নিশ্বাস প্রক্ষেপে বাহ্য জগতের সমস্ত কার্য্যে শব্দ। তখন অসভ্যাবস্থা, বালকের ন্যায় অবস্থা, যাহা শুনিল, তাহারই অনুকরণ করিল,

যে শব্দ শুনিল, তাহাই মনে করিয়া রাখিল, সেই শব্দের সঙ্গে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় একটী ভাবও মনে লাগিয়া রহিল আবার যখন সেই ভাব মনে উদয় হইল, তখন সঙ্গে২ সেই শব্দটী স্মৃতিতে দেখা দিল—পূর্ব্বপরিচিত ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে সেই শব্দটীও ব্যবহার করিল। অন্য কোন কারণে তৎসদৃশ ভাবের উদয় হইলে তাহাদের সূক্ষ্ম২ ভেদাত্মক গুনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল সাদৃশ্য মাত্র মনে করিয়া তাহাতেও সেই শব্দ সংযোগ করিল। এ সময়ে মোটামুটি সাদৃশ্যমূলক গুণ সকল মনে করিয়া রাখাই তোমার পক্ষে সম্ভব। অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র২ বিভিন্নতাত্মক গুণ, কার্য্য অথবা অবয়ব মনে করিবার সময় সে নহে। শিশু প্রথমে 'মা' শব্দ ব্যবহার করিতে শিখে—সহস্রবার অপরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দেয় 'ঐ তোর মা।' বালক যখনই 'মা মা' বলে, তখনই লোকে ঐ রূপ করে। আকৃতি বিশেষের ভাবের সঙ্গে 'মা' শব্দ মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু বালকের তুলনা করিবার ক্ষমতা অল্প, মাতার অবয়বের সঙ্গে অন্যের কি প্রভেদ, বুঝিতে পারে না, সুতরাং যাহাকে দেখে, তাহাকেই—মনুষ্য মাত্রকেই 'মা' বলে। অসভ্যাবস্থা শৈশবাবস্থার ন্যায়। শব্দ বিশেষ শুনিয়া শিখিল; সেই অভ্যস্ত শব্দের দ্বারা শব্দ করণের নাম করণ করিল। আবার পূর্ব্বভাবের ন্যায় অন্য কারণ সম্ভূত অন্যভাব মনে উদয় হইলে তাহাদের অন্তর ভুলিয়া সাদৃশ্য মাত্র মনে করিয়া ঐ শব্দের দ্বারা তাহারও নামকরণ করিল। দেখিল, বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িল, মর্‌মর্‌' শব্দ তোমার কর্ণে বাজিল, মনে রহিল। পর ক্ষণেই হয় তো দেখিলে, এক জন মানব পীড়া শীর্ণ দেহ হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। মৃত ব্যক্তির শুষ্ক লাবণ্য বিহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িতে দেখিলে—আর সেই যে শুষ্ক বর্ণ বিহীন পত্র খসিয়া মাটীতে পড়িয়াছিল দেখিয়াছিল, তাহা অমনি মনে চমকিত হইল—সাদৃশ্য লক্ষিত হইল। তখন যে 'মর্‌ মর্‌' শব্দ শুনিয়াছিল, তাহা ব্যবহারের সময় পাইল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সিদ্ধান্ত হইল যে, মনুষ্যের সকলেরই এক দিন এ অবস্থা হয়—মনুষ্যের নাম হইল 'মর।' কালে যখন দেবতায় বিশ্বাস হইল, যখন 'অ' নাস্তিত্ব বোধক হইল, তখন সুতরাং তাঁহারা 'অমর' হইলেন।

মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন অবিরত নিশ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগ করে দেখিতেছে; যখন মরে, তখন আর শ্বাস থাকে না দেখিল, সুতরাং সিদ্ধান্ত করিল, জীবিত থাকার প্রমাণ শ্বাস প্রক্ষেপ। জীবিত আছে, ইহা কেবল শ্বাসের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। নিশ্বাসের শব্দ অনুকরণ করিল। 'অস্থ' শব্দে হইল 'প্রাণ'। 'অস্‌' ধাতুরও সৃষ্টি হইল। এই রূপে বোধ হয়, ধাতুর এবং ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা আমাদের বিশ্বাস, লিখিলাম। যাহা আমাদের তাহাই যে সত্য, তাহা বলিতে পারি না। তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। কিন্তু অনুকৃতিবাদে আমাদের বিশ্বাসের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি, সে কারণ এই;—যত ভাষার কথা আমরা জানি, যত ভাষার কথা আমরা শুনিয়াছি, অথবা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি,

সে সকল ভাষাতেই দেখিতে পাই যে, অভৌতিক পদার্থের এবং মানসিক বৃত্তি সকলের নাম ভৌতিক পদার্থের নামের রূপান্তর মাত্র। আভ্যন্তরীণ জগতের নামকরণ বাহ্য জগতের সাহায্যেই হইয়া থাকে। ভাষার ঈশ্বরসৃষ্টত্ব অথবা প্রকৃতি সিদ্ধত্ব স্বীকার করিলে এই কথা লইয়া ঢের গোলযোগ হয়। প্রকৃতি ভৌতিক পদার্থ বাচক শব্দ দিতে পারিয়াছিলেন, তবে অভৌতিক পদার্থের নাম দিতে পারিলেন না কেন? অচেতন পদার্থ অপেক্ষা চেতন পদার্থ উৎকৃষ্টতর; যদি ঈশ্বর ভাষাসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তিনি অপকৃষ্টতর পদার্থের নাম করণ করিলেন আর উৎকৃষ্টতর পদার্থের নামকরণ জন্য আমাদের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, ইহাই বা কি রূপে বিশ্বাস করিব? কিন্তু অনুকৃতিবাদ মানিলে আর কোন গোল থাকে না। এ পৃথিবীতে আভ্যন্তরীণ জগৎ অপেক্ষা বাহ্য জগৎ লইয়া আমাদের অধিক আবশ্যক; আভ্যন্তরীণ জগতের কার্য্য, কার্য্য—কেন স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত বাহ্য জগতের কার্য্যসাপেক্ষ! যাহা লইয়া অধিক আবশ্যক—যে কার্য্যে অগ্রে মনোভিনিবেশ হইয়াছে, তাহারই নামকরণ অগ্রে হইয়াছে। সংসারের দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পৃশ্য প্রভৃতি সকল পদার্থের সহিত এক প্রকার পরিচিত না হইলে আর আভ্যন্তরীণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য হয় না। চিন্তা করিতে হইলে ভাষা আবশ্যক; সুতরাং যখন চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে, যখন অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়, তখন ভাষা সৃষ্টি এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। এই কারণে যখন আভ্যন্তরীণ বৃত্তির এবং ভাবের নামকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন সম্মুখে উপকরণ ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রূপান্তর করিয়া এক রূপ করিয়া তুলিয়াছিলাম। আবার আভ্যন্তরীণ জগতে অনুকার্য্য শব্দেরও অসদ্ভাব, সুতরাং বাহ্য জগতের উপর নির্ভর না করিলে আর উপায় কি!

তবে এক আপত্তি—যদি স্বাভাবিক শব্দের, অনুকরণ করিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল তবে ভিন্ন২ দেশে ভিন্ন২ ভাষা কেন? স্বভাবের কার্য্য ত সর্ব্বত্রই সমান; পৃথিবীর সমস্ত মানবের নিঃশ্বাস শব্দ এক রূপ, শুষ্কপত্র পাৎশব্দ সর্ব্বত্রই এক। তবে ভাষায় এত প্রভেদ কেন? কেন সর্ব্বত্র "অসু" শব্দ প্রাণবাচক না হইল? কেন যে হইল না, তাহার কারণ নিম্নে যথাসাধ্য প্রকটিত করিতেছি।

প্রকৃতির কার্য্য যদিও সর্ব্বত্র সমান, কিন্তু প্রকৃতির অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নহে; জল প্রপাতের শব্দ অবশ্য সর্ব্বত্র এক রূপ হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্র জলপ্রপাত নাই। ভাষানির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ যখন সর্ব্বত্র সমান নহে, তখন স্বতন্ত্র২ উপকরণ নির্ম্মিত ভাষাই বা কি রূপে এক হইবে?

দেশভেদে রুচিরও অনেক প্রভেদ হয়। রুচি মনুষ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে, এবং দেশভেদে অবস্থাভেদে অপরিহার্য্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতকাল মধুর—শীতপ্রধানদেশে ঠিক বিপরীত; তথায় গ্রীষ্মকালই বাঞ্ছনীয় এবং সুখময়, সুতরাং কাহারও মনে গ্রীষ্মকাল ক্লেশের সঙ্গে সংযুক্ত, কাহারও মনে সুখের সঙ্গে। এখন বিবেচনা করুন, গ্রীষ্মকালে যে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইতে কেহ বা ক্লেশকর পদার্থের, কেহ বা

সুখময় ভাবের নাম করণ করিল। ভাষায় প্রভেদ হইল।

দেশভেদে রুচির কত দূর প্রভেদ হইতে পারে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ সুখের স্থান, লোকে সমস্ত সুখের সামগ্রী একত্র করিয়া স্বর্গের কল্পনা করে। এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বর্গ দেখুন—দেখিতে পাইবেন, লোকের সুখ দুঃখাত্মক রুচির কত প্রভেদ। হিন্দুদের স্বর্গ দেখুন, তথায় নন্দনবন আছে; মনোহর পারিজাত কুসুম প্রফুল্ল হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করে; বসন্ত নিরন্তর বিরাজ করে; লম্পট স্বভাব ভ্রমর গুণ২ করিয়া ফুলে২ মধু লুটিয়া বেড়ায়। সে খানে আবার বিদ্যাধরী আছে, কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যোদ্দীপ্ত, স্থিরযৌবনা, কামকলাচতুরা, নৃত্যগীত রঙ্গরস পরায়ণা রমণী—কুলবধূ নহে, বারবিলাসিনী—সকলের উপভোগ্য। এই হিন্দুদের সুখের চরম। স্বর্গে আহারের জন্য ভাবিতে হয় কি না, তাহার উল্লেখও নাই, কারণ এ স্বর্গ ভারতবর্ষীয়দিগের। যে দেশ বহুল শস্য প্রসবিনী, সেই দেশের এ স্বর্গ, সুতরাং আহারের কথা নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা বিলাসপ্রিয়, স্বর্গেও বিলাসিনী অনেক। আবার লাপ্‌লাণ্ডের স্বর্গ দেখুন—তথায় হরিণ যূথে২ ভ্রমণ করে, গ্রীষ্ম নিরন্তর বিরাজমান। এ যে শীতপ্রধান দেশের স্বর্গ—যে দেশে রেণডিয়ার নহিলে চলে না, যে খানে আহার, অনায়াসলভ্য নহে, সুতরাং এ স্বর্গ আহার্য্যে এবং রেণডিয়ারে পরিপূর্ণ। এখন বিবেচনা করুন, অবস্থাভেদে লোকের সুখ দুঃখ কল্পনায় কত প্রভেদ হয়—রুচির কত তারতম্য হয়। রুচিভেদে ভাষাভেদ অবশ্যই হইবে।

দেশভেদের প্রয়োজন কি? এক দেশীয় লোকেরই অবস্থাগত কত তারতম্য লক্ষিত হয়। এই অসীম পৃথিবীতে দুই ব্যক্তির আকৃতি যেরূপ অবিকল এক রূপ হয় না, তেমনি দুই ব্যক্তির মনও ঠিক এক রূপ হয় না। একে ত নৈসর্গিক বৈষম্য আছে, তাহার উপর আবার শিক্ষা, সংসর্গ, অভ্যাস, অনুশীলন, রোগ, শোক, নানা কারনে বৈষম্য হয়। আত্মার কার্য্য যেমন বাহ্যজগৎ সাপেক্ষ, বাহ্য জগতের কার্য্যও সেই রূপ আত্মার অবস্থাসাপেক্ষ। পার্ব্বতীয় কণ্ঠে মুক্তামালার ন্যায় উভয়ই উভয়ের সহায়। সুতরাং এক পদার্থেরই ভিন্ন২ মনে ভিন্ন২ কার্য্য হয়। তুমি যাহা ভাল বল, আমার চক্ষে তাহা ঘৃণিত! আমার চক্ষে যাহা সুন্দর, তোমার চক্ষে তাহা কুৎসিৎ। নির্ম্মল শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে প্রাসাদশিখরে বসিয়া চন্দ্রের হাস্যময় রশ্মি, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র দেখিয়া, পরিমলবাহী মৃদুমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া কেহ বা ভূতসুখের কথা মনে করে, প্রণয়িনীর মুখ এই রজনীর শোভার ন্যায় সুন্দর, এমনই কোমল, এমনি প্রেমে মাখা মুখ মনে করিয়া অশ্রুপাত করে, কেহবা প্রাণের অধিক ধনকে বুকে করিয়া সুখাতিশয্যে গলিয়া যায়। আবার চৌর এবং লম্পট অন্ধকার হইল না কেন, বলিয়া দুঃখ করে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ এবং বাহ্য জগতে, ইন্দ্রিয়গণ এবং মনেও এই সম্বন্ধ। মন, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্যজগৎ প্রণয়শীল দম্পতীর ন্যায়, পরস্পর পরস্পরের দাস। সুতরাং বাহ্য জগতের কার্য্য তোমাতে এক রূপ,

আমাতে অন্যরূপ। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভাষাবাহুল্যে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। চক্ষের উপর দেখিতেছ, এক অভিন্ন শব্দ কোথাও 'কলকল' কোথাও 'মর্‌মর্; কোথাও 'হুইজ্' কোথাও 'স্বন্‌স্বন্'; এখানে যাহা 'ফোঁস্' অন্যত্র তাহা 'হিস্'; তবু কেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য তর্ক করিয়া মর?

মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় ভাষায় যে রূপ পরিবর্ত্তন হয়, মনুষ্য সভ্য হইলে আর তদ্রূপ হয় না। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে২ ভাষার পরিবর্ত্তনশীলতা হ্রাস হইয়া আইসে, কিন্তু অসভ্যাবস্থায় সে-রূপ নহে। মনুষ্যদেহের ন্যায় ভাষার পরিবর্ত্তন, বাল্যাবস্থায় দিন দিন পরিবর্ত্তন। সদ্যপ্রসূত বালককে দেখিয়া রাখ, আর ছয় মাসে আবার দেখিও, আর চিনিতে পারিবে না। আবার কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে ছয়মাসে আকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্যই দৃষ্ট হইবে না। পুনরায় আবার যৌবনকাল দেখ; ত্রিশ বৎসরে যে আকৃতি, পঁইত্রিশ বৎসরেও তাই—পাঁচ বৎসরেও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মনে কর, তোমার ভাগিনেয়ের অন্নপ্রাশনে গিয়া আপনার উৎসঙ্গে বসাইয়া তাহার মুখে অন্ন দিয়াছ। যে কয় দিন তথায় ছিলে, সে কয়দিন সহস্রবার নাম করিয়া সোহাগ করিয়াছ, সহস্র বার বুকে করিয়াছ, সহস্র বার তোমার গোঁপ ধরিয়া টানিয়াছে, তুমি হাসিয়াছ; কিন্তু আবার তাহারই বিদ্যারম্ভের সময় গিয়া আর তাহাকে চিনিতে পারিবে না। পাঁচ বৎসরে কত পরিবর্ত্তন! কিন্তু তাহার পিতাকে যেমন দেখিয়াছ, তিনি তেমনি আছেন।

মনে কর, ক্রমে তোমার বৃদ্ধাবস্থা আসিল; সে চঞ্চলতা নাই, সে সামর্থ্য, সে তেজ, কিছুই নাই। এক একটী করিয়া ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিতেছে; শেষে লীলা সম্বরণ করিলে কিছু দিন লোকের মনে এবং মুখে থাকিলে, তার পর সকলেরও যে দশা, তোমারও তাই; তোমার নাম পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। তবে যদি বড় লোক হও; যদি কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে পার, অথবা সমাধি-প্রস্তর থাকে, তাহা হইলে আর পৃথিবী হইতে নাম লুপ্ত হইবে না। ভাষারও যখন বাল্যাবস্থা, তখন পদে পদে পরিবর্ত্তন। ক্রমে যৌবন সময় আসিল। সাহিত্যের ভার মস্তকে, পরিবর্ত্তন অতি অল্প। তার পর বৃদ্ধকাল; অন্য ভাষার সহায়তা চাই; সকলে আর ব্যবহার করে না; অন্য ভাষা আসিয়া প্রভুত্ব খাটাইতেছে। সে ভাষা হয়ত ভাবি উত্তরাধিকারী, কিন্তু মানবেনর ন্যায় পিতার জীবিতাবস্থায়ই আপন প্রভুত্ব বিস্তারে যত্নবান। তার পর আরও কিছু দিন গেল, একটী মৃতভাষা হইয়া দঁড়াইল। সাহিত্য বিজ্ঞানরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ থাকিল, অথবা ভাষান্তরের সাহিত্যে নামোল্লেখরূপ সমাধি-প্রস্তর থাকিল ত নাম থাকিল, নহিলে ডুবিল।

অসভ্যতার সময় ভাষার বাল্যকাল। এ অবস্থায় আজি যে ভাষা, পাঁচ বৎসর পরে আর তাহার চিহ্নমাত্র পাইবে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা অনেক বার মধ্য আমেরিকার অসভ্য জাতিদিগের ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বহু যত্নে অভিধান পর্য্যন্ত সংকলন করিয়াছেন, কিন্তু দশবর্ষ পরে আবার তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিয়াছেন যে, আর সে ভাষা নাই;

তৎপরিবর্ত্তে অন্য ভাষা চলিতেছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে অনেক পুরাতন শব্দ পরিত্যক্ত, অনেক নূতন শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

ভাষার এই পরিবর্ত্তনশীলতার কারণ অসভ্য জাতি মাত্রের অবস্থা। তাহাদের অবস্থা আমাদের অবস্থার ন্যায় নহে। আমাদের মধ্যে যে সকল কারণের অস্তিত্ব বশতঃ ভাষায় পরিবর্ত্তন অতি অল্প, অসভ্য জাতীয় দিগের মধ্যে সে সকল কারণ নাই। আমাদের সাহিত্য রহিয়াছে, আমরা সাধারণ সভায় যাতায়াত করি; সকল সভ্যজাতিরই আবার ধর্ম্ম-পুস্তক আছে এবং সকলে অথবা প্রধান প্রধান লোকে যেরূপ রচনা প্রণালীর অনুমোদন করেন, তোমাকে সেই রূপ লিখিতে হয়। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হইতে একপাদ মাত্র সরিলে তোমাকে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। সুতরাং ভাষায় পরিবর্ত্তন অতি অল্প।

অসভ্য জাতির অবস্থা এরূপ নহে। তাহাদের সাধারণসভা নাই, সর্ব্বাদরণীয় সাহিত্য নাই, সর্ব্বার্থসার ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্মপুস্তক নাই, লিপিবদ্ধ সামাজিক নিয়ম নাই; নূতন কথা বলিলে হাস্যাস্পদ না হইয়া বরং প্রশংসা লাভই হয়। ভাষা যাহাতে একভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, সে সকল কারণের অভাব, অথচ পরিবর্ত্তনের কারণ অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে বনে বনে ফিরিতে হয়; অনেক সময়ে বাসস্থান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর গমন করিতে হয়। এরূপ স্থলে যে কেহ ভার বহন করিতে পারে, যে কেহ পথ হাঁটিতে সক্ষম হইলেই যায়; বালকেরা দুই এক জন বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির নিকটে থাকে। এই বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধস্ফুট দুই একটী শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, কেহ২ সোজাসুজি দুই চারিটী ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম এবং আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক বয়স্ক। ইহারা সকলে মিলিয়া একত্রে ক্রীড়া করে, সকলে মিলিয়া লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া, আমোদ করিয়া দিবস অতিবাহিত করে; ভাষা আপনা আপনি শিখিতে হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক তাহারা অল্প বয়স্কের সাহায্য করে—প্রয়োজন হইলে নূতন কথা সৃষ্টি করিয়া ব্যবহার করে।* সে শব্দগুলিও ভাষায় প্রবেশ করে। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে ভাষার মূর্ত্তির সমগ্র পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; নূতন ভাষা চলিতে থাকে। পুরাতন ভাষাও লোপ হইল না, প্রাচীন দিগের মধ্যে তাহাই প্রচলিত রহিল; ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

অসভ্য জাতীয়দিগের যে কেহ আত্মীয় নহে, সেই শত্রু। তাহাদিগের মধ্যে সমগ্র মানবজাতি শত্রু এবং মিত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—তৃতীয় শ্রেণী নাই। যে কেহ অপরিচিত, যে কেহ সঙ্গী নহে, দলভুক্ত নহে, সেই শত্রু। সুতরাং ইহাদের জীবনের ভয় অধিক; লোকের প্রতি সন্দেহ অধিক। এই কারণে তাহাদিগের মধ্যে কেবল আত্মীয় বোধগম্য কতকগুলি শব্দ থাকে। পাছে অপরে তাহাদের অভিসন্ধি ভেদ করে, এই জন্য আপনাদের মধ্যে কথপোকথন সময়ে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করে। কালক্রমে এই সকল যথেচ্ছা সৃজিত বাক্য ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করে। প্রচীন শব্দ পরিত্যক্ত হয়! ভাষা নবকলেবর ধারণ করে।

* Max Muller's Lectures Volume & II.

অসভ্য জাতীয়েরা আবার দলে দলে বিভক্ত। সেই সকল দলের সংখ্যাও অল্প নহে; এক জাতির মধ্যে অনেক দল। প্রত্যেক দলের ভাষা পূর্ব্বোক্ত কারণে অনেকাংশে ভিন্ন। কালে এই ভাষাগত বিভিন্নতা বদ্ধমূল হইয়া যায়; পিতামহের ভাষা পৌত্রে বুঝিতে পারে না। এইরূপে এক নির্দ্দিষ্ট তরু হইতে শতং শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়; এক ভাষা হইতে সহস্রং ভাষার উৎপত্তি হয়। গাব্রিয়েল সেগার্ড বলেন, উত্তর আমেরিকার হুরণ জাতির মধ্যে ভাষার এত প্রভেদ যে, এক পল্লীতে যে ভাষা প্রচলিত, অপর পল্লীতে আর সে ভাষা শ্রুত হয় না। পল্লী কেন, দুই পরিবারের মধ্যে অবিকল এক ভাষা ব্যবহৃত হয় না।

লোকে বলে ঘনিষ্ঠতায় অনাদর জন্মে এবং আমরা বলি, প্রকাশ্যে যাহা করি না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, বৃদ্ধকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করি। যে নিতান্ত অপদার্থ, সে আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে; তাহা কার্য্যে পরিণত করে।

যে বুদ্ধিমান এবং সভ্য, সে মনের ভাব মনে রাখিয়া, বাহিরে ভক্তি এবং আদর দেখায়। মনুষ্য চরিত্রের আরও একটী নিয়ম এই যে, যাহাকে ভাল·বাসি তার সব ভাল, আর "যাকে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা" তার সব মন্দ। এই কয়েকটী কারণেও ভাষার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভাষা সভ্য সম্প্রদায়েরভাল লাগে না। তাঁহারা অধিক সতেজ, অধিক ক্রীড়াশীল ভাষা চাহেন। আবার কিছু দিন যে ভাষা ব্যবহার করি, সে ভাষাও আর ভাল লাগে না; অধিক সেবন করিয়া অরুচি জন্মায়। আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয়, বিদ্যাসাগরের এবং বঙ্কিম বাবুর ভাষা তুলনা করিয়া দেখুন, প্রাচীন সম্প্রদায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুরাগী, নব্যদল বঙ্কিম বাবুর পক্ষপাতী। আবার 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'বিষবৃক্ষের' ভাষা তুলনা করিয়া দেখুন, দশ বৎসরে লিখিবার পদ্ধতি কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—পরিমার্জ্জিত হইয়াছ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বলিতে পারেন যে কেবল প্রণালীরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভাষার ত পরিবর্ত্তন হয় নাই; স্বীকার করি, কিন্তু সভ্য জাতির মধ্যে যে কারণে ভাষার গতিমাত্র পরিবর্ত্তিত হয়, অসভ্য জাতি মধ্যে সেই কারণে ভাষার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

কতকগুলি সামান্য কারণেও ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সেই সকল কারণেরও দুই একটীর উল্লেখ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না। সকল দেশের লোকেই নৃপতি অথবা প্রধান ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রবল। টাহিটীবাসিদিগের মধ্যে রাজার প্রতি সম্মান এবং ভক্তি প্রকাশার্থ আর একটী প্রথা প্রচলিত আছে; উপস্থিত রাজার নাম অথবা নামের কোন অংশ প্রজাদিগের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে লোকে তদর্থবোধক অন্য শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য রাজার মৃত্যুর পর সে বাক্য গুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন শব্দ পুনঃগ্রহণ করিতে কোন অপত্তি নাই; কিন্তু যে স্থলে লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত নাই, সে স্থলে অব্যবহৃত শব্দ সকল লুপ্ত হইবারই বিলক্ষণ

সম্ভাবনা। আবার অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার একের অধিক নাম প্রায়ই থাকে, সুতরাং ভাষার পরিবর্ত্তনও অধিক হয়।

ক্যাফ্রেরিয়া দেশে নিকট-সম্বন্ধীয় কোন পুরুষের নাম গ্রহণ করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবৈধ। এই সামাজিক নিয়মের অনুরোধে তাহাদিগকে অনেক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য এ নিয়ম কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাষা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পুরুষের অপেক্ষা রমণীর প্রভাব অধিক। ডান্‌টী বলেন, স্ত্রীলোকের জন্যই ইটালীতে লাটিনের পরিবর্ত্তে ইটালিয়ান চলিয়াছে। ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষার জননী স্বরূপ প্রাকৃতও স্ত্রীলোকের জন্যই সংস্কৃতকে পরাভব করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতবর্ষীয়েরা এসকল বিষয়ে পরাস্ত হইবার লোক নহেন। শুদ্ধ নিকট কুটুম্ব এবং রাজা কেন, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কৃপণ, গুরু, অভিশপ্ত, মাতা পিতা প্রভৃতি অনেকের নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এ শাস্ত্রগুণে ভাষার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বলিতে পারি না। এনিয়ম প্রচলিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণের ভাষা বদ্ধমূল হইয়াছিল, সুতরাং যদি রূপান্তর হইয়া থাকে, তবে অতি অল্পই হইয়াছে।

রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, বিজ্ঞানবিপ্লব প্রভৃতি অনেক কথা বলা হইল না। এ সকল দুইচারি কথায় শেষ করিবার বিষয় নহে, সুতরাং আজিকার মত উল্লেখ মাত্র করিয়াই ইতি করা গেল।

মৃত কবি দীনবন্ধু মিত্র

হায়, কি অশুভ দিন, বঙ্গ আজি দীপ্তি-হীন,
মলিন বদন সবাকার!
সাহিত্য-আকাশ-ইন্দু, অশেষ গুণের সিন্ধু,
দীন বন্ধু ত্যজিলা সংসার।
স্মরি তাঁর হাসি মুখ, বিষাদে বিদরে বুক;
নাহি থামে নয়নের ধারা।
প্রাণের রমণী তার, করিতেছে হাহাকার,
হৃদয়ের মণি হয়ে হারা।
সন্তান গণের মুখ, দেখে আরো বাড়ে দুখ;
কিছু সুখ নাই এ ভুবনে।
ওরে দুষ্ট কালচোর, এই কি করম তোর?
হরে নিলি তার প্রাণ ধনে!
কোথা হে হৃদয়সখা, আর কি দিবে না দেখা,
তুষিতে সুহৃদগণ আঁখি?
থেকে মাত্র অল্পকাল, কাটিয়া সংসার জাল,
ভাল পলাইলে প্রিয় পাখি!

আমরা ত কাছে কাছে যাইতেছি পাছে পাছে
তবে কেন দর্শন হারাই?
পথে 'কাল' আছে বসি, তার দ্বার দিয়া পশি
দেখি দেখা পাই কি না পাই।
ভার্য্যা তব, প্রাণনাথ, পুত্রগণ, প্রিয় তাত,
মিত্রগণ, মিত্র হীন হল।
রাজ্য, কর্ম্মচারী দক্ষ, দীন প্রজারা, সপক্ষ,
কাব্যামোদী কবি হারাইল।
মথুরা অমরাবতী, গেলে তুমি, ব্রজপতি,
সহ 'কাল' অক্রূর নিঠুর।
দীনবন্ধু দয়াময়, কেন হলে নিরদয়,
কাঁদাইতে বঙ্গ ব্রজপুর?
কাঁদ মাতা বীণাপাণি, প্রিয়-পুত্র-মিষ্ট বাণী,
যুড়াবে না আর ও শ্রবণ।
নীরব সে হাস্য আহা! কর্ণেতে পশিলে যাহা
শোক তাপ হতো নিবারণ।

কাঁদ মাগো বঙ্গ ভূমি, হারাইলে আজি তুমি
আর এক তনয় রতন।
তরল তরলাকারে, বিমল মুকুতা হারে,
বুকে যারে করিতে ধারণ;
ইহাও কি প্রাণে সয়, না যাইলে মাস ছয়,
দুই জন কবীন্দ্র বিশেষ।
আমাদিগে হয়ে বাম, চলে গেল স্বর্গধাম,
অন্ধকার করি এই দেশ।
কাব্য কমলের রবি, মাইকেল মহাকবি,
সে দিন পশিল অস্তাচলে;
আজি তুমি দীনবন্ধু, নাটক কুমুদ-বন্ধু,
মর্ত্ত্যহতে অদর্শন হলে।
মধুর "মধুর" গীত, হল যদি তিরোহিত,
তুমি ও কি গেলে তার পাছে?
হরিতে মানসক্ষুধা, কে আর যোগাবে সুধা,
কাব্য রস পাব কার কাছে?
তোমার প্রাণের মিত্র, "বঙ্কিম"অতি বিচিত্র,
আখ্যায়িকা রচনে নিপুণ,
কিন্তু এস্কটের ন্যায়.. পদ্য পথ ত্যজি হায়!
লুকালেন তিনি নিজ গুণ।
এই বঙ্গ রঙ্গ ভূমি, উজ্জ্বল করিলে তুমি,
তোমা বিনা আবার আঁধার।
"দর্পণ"* করিয়া সৃষ্টি, দেখাইলে নীল-রিষ্টি
দীন প্রজা করিতে উদ্ধার।
হাস্য রসে অদ্বিতীয়, ছিলে তুমি সর্ব্বপ্রিয়,
তার সাক্ষী "বিয়ে পাগলা বুড়া।"
"নবীন তপস্বিনীতে," দেখাইলে হাসাইতে
"হোঁদল কুৎকুত" রস-চূড়া।
"সধবার একাদশী," দীপ্তি পায় যেন শশী,
আধুনিক বঙ্গীয় সমাজে।
বিদ্যাবান মতিভ্রষ্ট, নিমচাঁদ মদে নষ্ট,
তার কষ্ট হেরি মরি লাজে।
জামাই বারিকে বেশ, বহু বিবাহের ক্লেশ
প্রকাশিলে পরিহাস ছলে।
অথচ চরম ভাগে, সকরুণ প্রেমরাগে,
বিমোহিত করিলে সকলে।
রূপবতী "লীলাবতী," "কমলে কামিনী"সতী
রসবতী যুবতী উভয়।
ভাবুকগণের মন, করিবেক আকর্ষণ,
যত দিন বঙ্গ ভাষা রয়।
সুরধুনী সম ধীরা, গভীরনির্ম্মলনীরা,
তব সুরধুনী নহে মানি,
স্থানে২ তবু তার, রস আছে যে প্রকার,
সার তার কি রূপে বাখানি!
"দ্বাদশ কবিতা" হায়, ফুল্ল-ফুল-মাল্যাকার,
ভারতীর কণ্ঠে কিবা শোভে!
আহা কিবা মকরন্দ! কি মাধুরী, কি সুগন্ধ!
ভাবুক ভ্রমর মন লোভে।
এত দিন কত নরে, তব কাব্য সুধাকরে,
নিরখিত কলঙ্ক কেবল;
ঘুচিল তাদের জাঁক, সাহিত্য গগন ফাঁক!
শশী বিনা সকলে বিকল।

* নীলদর্পণ।

বিবাহ। *

মানব সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন; তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত লোক সমাজের জীবনস্বরূপ। সামাজিক উন্নতি, অবনতি, আন্দোলন, পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সকল মধ্যবিত্ত লোকদ্বারা সংসাধিত হয়। যে দেশে এই শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা ভাল, সেই দেশ উন্নত, অন্যথা ইহার বিপরীত। বোধ হয়, ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে ধনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তথাপি এত দুরবস্থা কেন? এই প্রশ্নের একমাত্র সদুত্তর এই যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় মধ্যাবস্থ লোকের ধন, মান ও বিদ্যা বুদ্ধি অধিক।

এক্ষণে আমাদিগের দেশে দিন দিন বিদ্যালোচনা, বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি

* সমাজ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা।

সাধারণ্যে দুঃখের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস নাই। পূর্ব্বে যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, অধুনা আর সেরূপ হইবার উপায় নাই। বোধ হয়, মধ্য শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে শিল্প ও বানিজ্য প্রচলিত না থাকা এবং তাহাদিগের নানা বিষয়ে অভাব ও বাঞ্ছাতিরিক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ও মন্দ অবস্থা, এই চতুষ্টয় ইহার কারণ। এই কয়েকটীর মধ্যে আমরা অভাব বোধের হ্রাস করিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহি। যেহেতু, অভাবজ্ঞানই একমাত্র উন্নতির কারণ। এ বিষয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আদরের খর্ব্বতা হয়। মধ্য শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগেরই আদরের হ্রাস হয়। আবার মধ্য শ্রেণীর উন্নতিতেই প্রকৃত পক্ষে সমাজের উন্নতি, সুতরাং মধ্য শ্রেণীর সংখ্যা যাহাতে বাঞ্ছাতিরিক্ত না হয়, এবং অল্প সংখ্যকই যাহাতে গুণমান্ হয়, এ বিষয়ে সকলের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। শত শত নক্ষত্র গগনে উদিত হইলেও অন্ধকার নিরাকৃত হয় না, কিন্তু এক চন্দ্র দিঙ্মণ্ডলকে আলোকিত করে।

বঙ্গদেশ প্রচুর শস্যশালী, সুতরাং ভক্ষ্য, ভোজ্য সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার আবশ্যক নাই। হয় ত এই জন্যই লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে কেহ বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে কাল নাই। আর কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহন করিলেই কেহ ভদ্র সমাজ ভুক্ত হইতে পারেন না। আজ্ কাল ভদ্র হইতে হইলে ধন ও বিদ্যা উভয়ের আবশ্যক। ওমর * উষ্ট্র-চর্ম্ম পরিহিত হইয়া মৃত্তিকোপরি উপবেশন করিয়া আরব দেশে যেরূপ সমাদর পাইয়াছেন, ও দেশ বিদেশে ইস্লাম ধর্ম্মের যে প্রকার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, এক্ষণে আর তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সভ্যতার বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ।

এই কারণ বশতঃ এক্ষণে সন্তানকে ভরণ পোষণ ব্যতীত যাহাতে সে, সভ্য সমাজের উপযোগী অপস্থাপন্ন হইয়া বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। পিতার অপেক্ষা সন্তানের অবস্থা অপকৃষ্ট হইলে পিতার সাতিশয় মনোদুঃখ হয়। সুতরাং বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদন কালে সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যে অবস্থাতে অবস্থিত হইলে আপনার ও পরিবার বর্গের অনায়াসে ভরণ পোষণ করিতে পারা যায়, পীড়া হইলে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ হওয়া যায়, আপনার ও পরিবার বর্গের মনোবৃত্তি পরিচালনোপযোগী আবশ্যকীয় ব্যয় করণের সাধ্য থাকে, এবং সন্তানগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্যবসায় বিশেষ শিক্ষা করাইতে পারা যায় ; এমত অবস্থাতেই বিবাহরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ইহার অন্যথাচরণ করিলে অশেষবিধ ক্লেশ পাইতে হয়, পরিবারবর্গকে নানা প্রকার ক্লেশে পাতিত করা হয়, এবং ন্যায়বান্ ঈশ্বরের নিকট ন্যায়দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। কামোত্তেজনায় ইতি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দারপরিগ্রহ করিলে যৎ-

*দ্বিতীয় কালিফ, ইহাঁর সময়েই আরবীয়গণ সিরিয়া প্রভৃতি কয়েকটী দেশ জয় করে।

রোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। উপায়াক্ষম বিবাহিত ব্যক্তির কথঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তির পর যখন আহারের চিন্তা উপস্থিত হয়, তখনই সেই ব্যক্তি গত কর্ম্মের জন্য বিশেষ অনুতাপ করে। সত্য বটে, কামিনীর মনোহর সহাস্য বদন, মধুর সম্ভাষণ, প্রেমময় আলিঙ্গন অপেক্ষা সংসারে কিছুই মধুর বোধ হয় না, কিন্তু উদরান্নের চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট তাহা বিষময়। সত্য বটে, নবযৌবনে সকলেই যৌবন-সুলভ-হাস্য কৌতুকে মত্ত হয় এবং বিলাস সুখসম্ভোগের নিমিত্ত হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য হয়, কিন্তু কিয়দ্দিনান্তে পরিবার প্রতিপালন ভারগ্রস্ত হইলেই দুশ্চিন্তা সেই মধুর হাস্যবদনকে একবারে গ্রাস করে।

ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া বিবাহ করিলে যদি সন্তান হয় এবং সেই সন্তান আহারীয় বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া পিতার সমক্ষে রোদন করে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশকর, পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে যিনি এক দিনও সে অবস্থাতে (ঈশ্বর না করুন) পড়িয়াছেন, তিনিই তাহা বিলক্ষণ রূপ অবগত আছেন। ইহলোকে এই রূপ মনোদুঃখ ; আবার অনাহারে বা রোগগ্রস্ত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে সন্তান গতাসু হইলে, পিতা অবশ্যই ন্যায়বান্ রাজার অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে দণ্ডিত হইবেন। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, এই অবস্থাতে বিবাহিত হওয়া কতদূর সঙ্গত ও সুখদায়ক? আমাদিগের বিবেচনায় যদি কামানলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া একবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তথাপি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে চিত্তশান্ত করিবার উপায় স্বরূপ প্রজ্ঞা দিয়াছেন ; ইচ্ছা করিলেই রিপু দমন করিতে পারি। আমরা এ বিষয়ে নূতন মত আবিষ্কার করিলাম, একথা বলিতে পারি না। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে অনেক জাতির বিবাহ-সম্বন্ধীয় নিয়ম দেখিলে বোধ হয়, প্রাচীন দিগের মধ্যেও এভাব প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছিল :

আর্য্যদিগের বিবাহ-সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলে নিশ্চিতই বোধ হইবে যে, উপযুক্ত অবস্থা না হইলে তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পদ্ধতি ছিল না।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং
ব্রতং গুরুকুলে স্থিতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা
গ্রহণান্তক মেববা ॥ মনু।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্ব। সমাবৃত্তো যথাবিধি। উদ্বেহেতদ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥

নরওয়ে ও সুইডেনে ২৫ বৎসর অতীত না হইলে দার পরিগ্রহের প্রথা প্রচলিত নাই।

এক শতাব্দী অতীত হইল, স্কটলণ্ডের সামান্য অবস্থার লোক প্রায় ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিত। তখন তাহাদিগের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, অন্ততঃ আপনার একটী কুটীর প্রস্তুত করিতে না পারিলে কেহ বিবাহ করিতে পারিত না।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোক চর্‌কা দ্বারা সুতা কাটিতে শিক্ষা না করিলে বিবাহ যোগ্য হয় না।

অস্মদ্দেশীয় বর্দ্ধমান বিভাগের কোন কোন অসভ্য জাতির বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুসন্ধান করিলে এই বাক্যের

ভূরিপরিমাণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র কুটীরের চালে আরূঢ় হয় ও অবতরণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। আত্মীয় বন্ধু তাহাকে ঈদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেয় যে, "আমি আপনার ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ, এমত অবস্থায় কি রূপে অন্য আর এক জনের ভার গ্রহণ করিব?" ইহাতে কন্যা সর্ব্বসমক্ষে প্রতিশ্রুত হয় যে, " আমার আহার্য্য আমি স্বয়ং আহরণ করিব, তজ্জন্য আমার স্বামী কোন ক্লেশ পাইবেন না।" এই বাক্য শ্রবণানন্তর বর সানন্দে অবতরণ করে, এবং বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। যদিও কালসহকারে এই প্রথাটী বিবাহ পদ্ধতির অঙ্গ বিশেষ হইয়াছে, তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, **উপযুক্ত অবস্থাব্যতীত পরিণীত না হওয়াই** ইহার মূল।

এতদ্ব্যতীত সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধীয় একটী নিয়ম দেখিলে আমাদিগের বাক্য দৃঢ় রূপে সপ্রমাণ হইবে। বাল্যকালে বিবাহ করিলে বিবাহিত ব্যক্তি * শারীরিক পীড়া গ্রস্ত হয়, বালক কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়, দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, লোকে নিতান্ত অক্ষম অবস্থাতে পরিণীত না হইয়া পরিণত বয়োবুদ্ধিতে (যখন আপনার ভরণপোষণ অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ) বিবাহ করিবে, **এইটীই জগদীশ্বরের** ইচ্ছা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, লোকে বিবাহিত না হইলে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়শীল হয় না। একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি বিবাহকালে অবস্থার উপর কিছু দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং ভাল অবস্থা না হইলে কখনই সন্তান উৎপাদন কর্ত্তব্য নহে। হয়ত এ কথা শুনিলে অনেকে আমাদিগকে উপহাস করিবেন। কেননা আমাদিগের দেশের অনেকেরই এই সংস্কার আছে যে, সন্তান হওয়া ঈশ্বরের হাত। আমরা স্বীকার করি, "হওয়া ঈশ্বরের হাত বটে কিন্তু **না হওয়া** আমাদিগের হাত।"

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের দেশীয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ, বিবাহকালে এবং সন্তান উৎপাদন সময়ে আপন২ অবস্থার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসিগণ ধন, মান ও বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ্য শ্রেণীমধ্যে গণ্য হইতে পারিবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

খাকী সম্প্রদায়।

খাকী সম্প্রদায় অতি আধুনিক। কোন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ সম্প্রদায়ের শৈবদিগের সহিত কতকটা সামাঞ্জস্য আছে। হয় ত ইহার প্রবর্ত্তক কীল শৈবদিগের মধ্যে স্বমত

*আধুনিক প্রসিদ্ধ ডাক্তার, ও প্রাচীন বৈদ্য সকলেই এক বাক্যে এই কথার পৌষকতা করেন।

প্রচার জন্য এরূপ বেশ ভূষা করিয়াছিলেন, কালে মূর্খ শিষ্যেরা তাঁহার অনুকরণ করিয়া চলিতেছে। খাকীরা গাত্রে ও পরিধেয় বস্ত্রে ভস্ম লেপন ও মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া থাকে, এবং ইহারদিগের মধ্যে দিগম্বর উদাসীনও দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় রামায়েত্‌দিগের একটী শাখা মাত্র; সুতরাং রাম, সীতা ও হনুমানজী ইহাদিগের উপাস্য দেবতা।

ফরেক্কাবাদ প্রদেশে অনেক খাকী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু হনুমানগড়ে ইহাদিগের প্রধান মঠ সংস্থাপিত আছে।

মলূকদাসী।

মলূকদাসী সম্প্রদায় রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন, এবং ২/১ টী বিষয় ব্যতীত উক্ত সম্প্রদায়সহ একরূপ। মলূক দাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থকে প্রামাণিক জ্ঞান করে এবং ললাটে একটী ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রেখা ধারণ করে।

আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত করা মানিকপুর গ্রামে মলূক দাসের জন্ম হয়। মলূকদাস একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ী-লোক ছিলেন, কালে স্বাবলম্বিত ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শিষ্যগণ অদ্যাবধি উক্ত প্রদেশের সন্নিহিত স্থানে বসতি করে এবং ঐ মানিকপুর গ্রামেই মলূকদাসীদিগের এক মঠ আছে।

দাদূ পন্থী।

দাদূ পন্থী সম্প্রদায় রামায়েৎদিগের একটী শাখা ব্যতীত কখন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইতে পারে না। কিন্তু রামানন্দীদিগের গ্রন্থাদি ভিন্ন ইহাদিগের রামমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক কতিপয় গ্রন্থ আছে। "রাম" নাম জপ ব্যতীত এ সম্প্রদায়ের অন্য কোন রূপ উপাসনা নাই। দাদূপন্থীদিগের রাম, রামায়ণের দশরথরাজ-তনয় রাম নহে; তাহাদের রাম বেদান্তপ্রতিপাদ্য নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কিম্বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ। তাঁহারা তিলক বা কণ্ঠমালা ধারণ করেন না।

এই দাদূপন্থী সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক দাদূ এক জন ধুনারীর পুত্র, অহমদাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পরিণত বয়সে কল্যাণপুরে অবস্থিতি করেন, দৈবাৎ অতি সামান্য কারণে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় আপনার মতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। দাদূ কোন্ সময়ের লোক ছিলেন,ইহা নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে এই মাত্র বোধ হয়, তিনি আকবরের রাজত্ব কালাপেক্ষা (১৫৫৬ খ্রী) প্রাচীন বা জাহাঙ্গিরের রাজত্ব কালাপেক্ষা (১৭০৭ খ্রী) আধুনিক নহেন। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ ও তর্ক বিতর্ক আছে, তৎসমুদায় এ ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে লিখিতে হইলে বাহুল্য হইয়া যায় বলিয়া বিরত হইলাম।

দাদূ পন্থীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বিরক্ত, নাগা ও বিস্তরধারী। বিরক্ত দাদূপন্থীরা সন্ন্যাসী, ভাগবতানুযায়ী উত্তম বৈষ্ণব। নাগারা সৈনিক পুরুষ। এক নাগা ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আর কোন সম্প্রদায়কে যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। সৈনিক কার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ সুদক্ষ এবং বিশ্বাসী। বিস্তরধারীরা গৃহস্থ, সুতরাং অন্যান্য গৃহী লোকের ন্যায় প্রায় যাবতীয় অনুষ্ঠান করে।

এই দাদূ পন্থীদিগের মতে শবদাহ

নিষিদ্ধ, যেহেতু তৎসহ শরীরস্থ বহুতর জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। কিন্তু সচরাচর সর্ব্বথা এই বাক্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

আজমীর ও মাড়োয়ার দেশে বহুতর দাদূ পন্থী অবস্থিতি করে। নারায়ণ গ্রামে ইহাদিগের প্রধান মঠস্থাপিত আছে। তথায় এক পর্ব্বতোপরি দাদূর লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, সেই স্থানে ফাল্গুন মাসের শুক্ল প্রতিপদ অবধি ১৫ দিবস পর্য্যন্ত একটী মেলা হইয়া থাকে; এই মেলায় বিস্তর সমারোহ হয়, এবং অনেক লোক একত্রিত হইয়া থাকে।

ইহাদিগের মতের বিষয়ে পূর্ব্বেই কতক লেখা হইয়াছে, এস্থলেও সংক্ষেপে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা গেল। সমুদায়ই দয়াল রামের ইচ্ছানুগ, সুতরাং জীবের কিছুতেই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরই কেবল সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তাঁহাকে বিশ্বাস কর এবং তাঁহার উপরেই নির্ভর কর। সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত থাকিলে আনন্দ হয়। রাম হৃদয়-স্থিত, সুতরাং হৃদয়েই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে। এক মাত্র এই হৃদয়স্থ রামের সাহায্য ব্যতীত রিপু দমন ও পবিত্রতা লাভ হয় না। রামকে বিশ্বাস করিলে সকল আশা পূর্ণ হয়। ঈশ্বর যাহা প্রদান করেন না, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া অকর্ত্তব্য। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সত্য নম্রতাদি ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা হইবার, তাহাই হয়, কখন তাহার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সমুদায় চিন্তা ও পরিশ্রম বৃথা।

সাঁই মত সন্তোষদে ভাঁরভ গতিবে শাস।
সিদক সমুরী পাছুদে মাগই দাদূ দাস॥"

হে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর! দাদূ দাস তোমার নিকট প্রীতি, সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য মাত্র প্রার্থনা করে।

রুই দাসী।

রামানন্দ স্বামীর শিষ্য রুই দাস এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রুইদাস চর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন, এবং এই জন্যই হয় ত চর্ম্মকারদিগকে রুইদাস বলে। পূর্ব্বকালে কোন অদ্ভুত ঘটনা হইলেই লোকে দৈবকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিত। কথিত আছে, রুইদাস রামানন্দ স্বামির এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি পরম গুরুভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা বিশেষ কারণ বশতঃ রুইদাস গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘন করায় রামানন্দ তাঁহাকে নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে অভিশাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ রুইদাস এক জন চর্ম্মকারগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রুইদাস শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হত না হওয়ায় দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ স্বামী এই শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন, ও গমন করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন।

রুইদাস নীচ বংশে জন্মিয়াও এক জন পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন, এ সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে অনেক রূপ অসম্ভব কথা লিখিত আছে; তৎসমুদায় দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন।

রুইদাস যদিও চর্ম্মকার ছিলেন, বৈষ্ণব দিগের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে, ঝালী নাম্নী এক রাণী দীক্ষিতা হইবার অভিপ্রায়ে গুরু অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রাজ্ঞী দৈবাৎ লোক মুখে রুইদাসের

নাম ও তাঁহার সরলভক্তির বিবরণ শ্রুত হইয়া একবারে মুগ্ধ হইলেন, এবং লোকের কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া রুইদাসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্ত মালের একটী উপাখ্যান পাঠ করিয়া বোধ হয়, ঝালীর প্রভাবে রুইদাসের বিস্তর সম্মান হইয়াছিল। কেহই তাঁহাকে চর্ম্মকার জ্ঞান করিতেন না। কথিত আছে, রাজ্ঞী এক দিবস তাঁহাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণসহ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে এক পঁক্তিতে ভোজন করাইয়াছিলেন।

চর্ম্মকারদিগের মধ্যে অনেকেই ইহাঁর মতাবলম্বন করিয়াছিল।

সেন পন্থী।

রামানন্দের শিষ্য সেন এ সম্প্রায় সংস্থাপন করেন। ভক্তমালে সেনের একটী অদ্ভুত উপাখ্যান ব্যতীত আর কোন বিবরণই অবগত হওয়া যায় না। সে উপাখ্যানের মূল তাৎপর্য্যস্ত এই, সেন বন্ধ গড়ের রাজার ক্ষৌর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু রাজা তাঁহার সরল বিষ্ণুভক্তি ও বিশ্বাস দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামসনেহী সম্প্রদায়।

রামচরণ নামক একজন রামানন্দী বৈষ্ণব রামসনেহী নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রাম চরণ জয়পুরের অন্তঃপাতী সুরাসেন গ্রামে ১৭৭৬ সংবতে জন্ম গ্রহণ করেন। রাম চরণের দেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মবাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইলে দেবদেবীর উপাসকগণ, তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নানা রূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। পরিশেষে তাহারা রামচরণকে রাজ দণ্ড দ্বারা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। অসহায় রামচরণ গৃহত্যাগী হইয়াও ধর্ম্মত্যাগ করিলেন না, এবং দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার অনেক দিবস পরে ১৮২৪ সংবতে সাহপুরের ভূপতি ভীম সিংহ রামচরণের সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। নিরাশ্রয় রামচরণ রাজার সমাদরে যার পর নাই তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রেরিত দূত সহ আগমনানন্তর আপনার মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামচরণ সাহপুরে আগমন করিয়াও সম্পূর্ণ রূপে উৎপীড়নের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন নাই। কথিত আছে, এখানেও অনেকে তাঁহার প্রাণ নাশার্থ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি নিরাপদ হইয়া স্বমত প্রচার করণানন্তর ১৮৫৫ সংবতে তনুত্যাগ করেন। রামচরণ বিলক্ষণ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন তিনি আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রায় যাব জ্জীবন অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন।

রামসনেহী সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ সাহপুর গ্রামে স্থিত। তথায় তাঁহার পরলোক গমনের পর রমজান, দুলহ রাম, ছত্র দাস, নারায়ণ দাস যথা ক্রমে মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মোহান্তের মৃত্যুর পর সম্প্রদায়স্থ প্রধান২ যাবতীয় লোক একত্র মিলিত হইয়া গত মোহান্তের শিষ্য কিম্বা সম্প্রদায়স্থ অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের মধ্য হইতে এক জনকে তৎপদে নিযুক্ত করে।

এ সম্প্রদায়স্থ মোহান্তদিগকে বিস্তর কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নীতি ব্যতীত ইহাদিগকে অন্যান্য অনেক বাহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। বিবাহ করিয়া বা অন্য কোন রূপে কামিনী সংসর্গ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। বেশ ভূষা, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, উপানৎ পরিধান, দর্পণে মুখাবলোকন, তামাক বা নস্য ব্যবহার, মাদক দ্রব্যপান বা সেবন, মুদ্রাগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু শেষোক্ত বাক্যটী ইহাঁরা কোন মতেই প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ মোহান্তদিগের ন্যায় শিষ্যের নিকট মুদ্রা গ্রহণ ব্যতীত ইহাঁরা বাণিজ্য ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মতে জীব হিংসা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। জীব হিংসাপক্ষে ইহাঁরা এতই সতর্ক যে, দীপ জ্বালিবা মাত্র তাহা আবরিত করেন এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পথে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া পাদক্ষেপ করেন না। বৌদ্ধ সম্প্রদায় জৈনদিগের মধ্যে এরূপ দীপাবরণ প্রায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কারণ অহিংসাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। (অহিংসা পরম ধর্ম্মঃ।) সাহাপুর আদি যে সকল স্থলে জৈনদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানেই রাম সনেহী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের আধিক্য; ইহাদ্বারা বোধ হয়, ইহাঁরা জৈন মতের অনুকরণ করায় এরূপ ঘটিয়াছে।

রামচরণ মঠের কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করণাভিপ্রায়ে শিষ্যদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সাহাপুর মঠের কার্য্যভার দ্বাদশ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। কেহ বা আহারীয় অনুসন্ধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিত, কেহ বা অতিথি সৎকারে নিযুক্ত থাকিত, কেহ বা সাধুদিগকে উপদেশ দিত; ইত্যাকার এক এক জন এক একটী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খল রূপে সম্পাদিত হইত।

সাধুমণ্ডলীর মধ্যগত কোন ব্যক্তি নিসিদ্ধ কর্ম্মাচরণ করিলে ঐ দ্বাদশ শিষ্য মধ্যে হইতে একটী পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইত এবং সেই পঞ্চায়েত উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিত।

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় রাম সনেহী সম্প্রায় ভুক্ত হইতে হইলেও পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন ও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

ইহাদিগের সাধু দুই ভাগে বিভক্ত, বিদেহী ও মোহনী। বিদেহীরা উলঙ্গ থাকে। মোহনীরা মৌনব্রতাবলম্বী; শেষোক্ত ব্যবহার সাধনের অঙ্গ। কিন্তু গৃহস্থ দিগের এই দুই সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার অধিকার নাই। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছুক হইলে সাধ্বী হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে স্বামি-পুত্র পরিত্যাগ করিতে হয়।

যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এ সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারে, সাহাপুরের মঠাধ্যক্ষ ব্যতীত কাহারও কোন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিবার ক্ষমতা নাই। অধ্যক্ষ বিশেষ বিবেচনা ও পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও সম্প্রদায় ভুক্ত করেন না।

অন্যান্য রামানন্দী দিগের ন্যায় ইহাঁরাও আপন উপাস্যদেবকে "রাম" নামে অভিহিত করেন। "রাম" রাম সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত ও যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। মনুষ্য তাঁহার অভিসন্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং তিনি যাহা বিধান করেন, তাহাতেই

সম্মত থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা ও অনুতাপাদিদে খণ্ডে, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ খণ্ডে না।

"রামের" রূপকল্পনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, রামকে উপাসনা করিলে আর কাহাকে উপাসনা করিবার আবশ্যক নাই। দিবা রাত্রি মধ্যে রাম সনেহীরা তিনবার উপাসনা করেন; কিন্তু সায়ং কালের উপাসনাতে স্ত্রীলোকেরা অধিকারিণী নহেন। উপাসনা কার্য্য মঠেই সম্পাদিত হয়। এ উপলক্ষে ইহারা সঙ্গীতাদি করিয়া থাকে, সময়েং সঙ্গীতে বিস্তর সময় ব্যয়িত হয়।

সাহপুরে ফুলদোল উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে একটী মেলা হয়, সেই মেলায় এই সম্প্রদায়স্থ যাবতীয় বৈষ্ণব একত্রিত হয়। কোন বৈষ্ণবই উপর্য্যুপরি দুই বৎসর মেলায় গমন না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই ফুল দোল এতদ্দেশে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল নহে। এই মেলা উপলক্ষে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প হয় না। সম্প্রদায়স্থ কেহ গুরুতর দোষ করিলে, এই সময়ে তাহার বিচার হয় এবং পঞ্চায়েতের বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইলে তাহাকে সম্প্রদায় হইতে শিখা ছেদন করিয়া বহিষ্কৃত করা হয়।

রামমোহনীরা কহেন যে শরীরই ঈশ্বরের মন্দির, তাঁহার জন্য ব্যাকুলতাই আহ্বান এবং স্মরণই তাঁহার উপাসনা করা। সাধুরা হীনাবস্থ হইলেও পঞ্চায়েতদিগের অপেক্ষা সমধিক সুখী। কামনাতেই লোকে সদা ক্লিষ্ট হয়। ঈশ্বরপ্রেমী সর্ব্বদা নিত্যানন্দে মগ্ন থাকেন।

ইতি রামানন্দী সম্প্রদায়।

প্রিয়তমার প্রতি।

চতুর্দ্দশ পদী

হেরিয়াছি যদবধি ও চারু আনন,
প্রিয়তমে! সাধ নাহি অপরে হেরিতে।
অথবা তারকাদলে কে চাহে দেখিতে
ছাড়ি পৌর্ণমাসি শশী নয়নরঞ্জন?
বিকসিত কমলিনী ত্যজিয়া কখন
অলি কি বাসনা করে পর-মধু পীতে?
ধরাতলে কত শত সরসী থাকিতে—
চাতক তৃষিত চোকে চাহে নব-ঘন!
আরো দেখ প্রিয়তমে! চটুল চকোর
সুধা-আশে ধায় সদা সুধাকর পাশে;
যুড়ায় (মিটায়ে সাধ) তাপিত অন্তর,
সন্তোষ-লহরী মাঝে প্রেমানন্দে ভাসে;
হতাশ বিষম বাজ না করে কাতর।
সে কেবল বুকে বাজি মম প্রাণ নাশে!

২

প্রিয়তমে! যদবধি করেছি শ্রবণ
সুধা মাখা কথা তব হরষ অন্তরে,
কি ছার অন্যের কথা সাধ নাহি করে
শুনিবারে সুমধুর কোকিল কূজন।
সুখকর ভাবি যবে বিজন কানন,
বাসে তথা নর,—হয়ে তাপিত অন্তরে,—
শুনেছি প্রকৃতি তার আশা-পূর্ণ তরে
আদেশে বিহগে গান করিতে তখন।
জানি না কেমনে সেই অন্তর-অনল
নিবায় তাহারা সেথা; কেমনে বা আর
শুনিতে সুমিষ্ট-লাগে পাখি-কল কল!

এই ত বিজনে আমি ; এখানে আমার
তবে কেন মনোদুঃখ শমিত না হল ?
বুঝেছি—গরল সব বিরহে প্রিয়ার !

৩

প্রিয়তমে ! মম পাশে বসিয়া যখন
সুখ-রস-আলাপন করিতে হরষে,
চারিদিকে সমীরণ তোমার পরশে
কিবা রমণীয় ভাব করিয়া ধারণ,
করিত এ নাসা-পথে সুধা বরিষণ।
আর কি এপাপ দেহ সেই সুধা-রসে
সিক্ত হবে ?—সে সৌরভ অন্তরেতে পশে
আর কি করিবে তারে পুলকে মগন ?
সে আশা দুরাশা মোর ! নতুবা বিজনে
কেন বা আসিব আমি দুঃখিত অন্তরে ,
কেন বা বিশ্বাসি আর কবির বচনে,—
মূঢ়ের মতন,—সেই সুখ লাভ তরে
এত সমুৎসুক হব ? কমল-আঘ্রাণে ;
সৌরভ তেমন হায় নলিনী কি ধরে ?

৪

ননীর পুতলি তুমি—যবে সুকোমল
তনু তব পরশিয়া হৃদয় আমার
লভিল অশেষ সুখ আনন্দ অপার,
কেমন যে তদবধি হয়েছে চঞ্চল
অন্তর আমার, আহা ; সতত কেবল
ইচ্ছা, লভি সেই সুখ—পরশ তাহার।
অন্য কিছু আর ভাল না লাগে আমার !
কবি-মুখে শুনিয়াছি কুসুম-কোমল
রমণী-শরীর। কিন্তু সে কবি-বচন
কল্পনা-কাননে সাজে, আর কোথা নয়।
শিরীষ কুসুম সনে তাহার তুলন
কখন কি হতে পারে ?—কখন ত নয়।
তাই সে কুসুমে করি হৃদয়ে ধারণ,
তেমন বিমল সুখ সঞ্চার না হয় !

৫

এত সাধ, ভাল বাসা,—সকলি এখন
দুঃখের কারণ আহা হয়েছে আমার,
না হয় তেমন আর সুখের সঞ্চার
আগেকার কথা সব করিলে স্মরণ।
জেনেছি রে সেই মত পুলকিত মন
না হবে না হবে মোর, এ জনমে আর ;
তথাপি কেমন সে যে বশগ তোমার,
তোমারি চিন্তায় থাকে সতত মগন।
অথবা থাকিবে মন তোমা প্রতি রত,
শুনিতে এ কথা প্রিয়ে, বিচিত্র ত নয় !
এখনো যে বাস ভাল আগেকার মত,
তাহাতেই যাহা কিছু সুখ উপচয়।
কারো দোষ নয় প্রিয়ে, বিধি বাদী তাই
অভাগা, কপাল দোষে সুখে দুঃখ পাই !

শ্রীঃ—

অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্য।

বেকন বলিয়াছেন, বিদ্যাই ক্ষমতা। ইউরোপীয়েরা বিদ্যাবলেই পৃথিবীর অধীশ্বর। বিদ্যাজাত ক্ষমতাও অসীম। ভারতে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য, মধ্য সময়ে ইউরোপে ধর্ম্ম যাজকদিগের একাধিপত্য বিদ্যাজাত ক্ষমতার পরিচয়। আমাদের বিদ্যা অল্প ; আমাদের বিদ্যা অসার—আমরা পরের দাস।

গ্রন্থ প্রচার যে সভ্যতার একটী প্রধান চিহ্ন, এ কথা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। গ্রন্থ প্রচার সভ্যতার চিহ্ন মাত্র নহে। ইহা সভ্যতার একটী প্রধান কারণ। পীড়া হইতে উৎকট উপসর্গ সমুদ্ভূত হয়। উপসর্গ আবার রোগীর রোগ বৃদ্ধি করে। সভ্যতাই সদগ্রন্থের প্রসূতি। সৎগ্রন্থের দ্বারা আবার সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। মুদ্রাযন্ত্রে যে পরিমাণে মনুষ্যকে সুসভ্য করিয়াছে, তত বোধ হয়, কিছুতেই করে নাই। পূর্ব্বে অবশ্য মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। প্রাচীন রোমে ক্রীত

দাসেরা মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিত। প্রাচীন এথেন্সে সাধারণ শিক্ষালয় মুদ্রাযন্ত্রের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সক্রেটিস্ রাজপথে বিদ্যা বিতরণ করিতেন। প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণই স্ব স্ব মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিতেন।

যে দেশে যে পরিমাণে লোক চিন্তোপজীবী, সে দেশ সেই পরিমাণে সভ্য। অসভ্যাবস্থায় আপন২ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সকলকেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে এই আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। দেশের আহার্য্য উৎপাদন করিতে দেশে সমস্ত লোকের পরিশ্রম আবশ্যক হয় না; কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোকের পরিশ্রমই যথেষ্ট হয়। বাকী লোকে অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। বিদ্যানুশীলন কতক লোকের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার উন্নতি হয়।

যে দেশে অধিক সঙ্খ্যায় নব২ গ্রন্থ প্রচারিত হয়, সে দেশের অবশ্য সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র নিয়ম। আমাদের দেশে যে আজি কালি বহুল পরিমাণে গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মুদ্রাযন্ত্র প্রতি মাসে শত২ নূতন গ্রন্থ উদ্গীরণ করিতেছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের আহ্লাদ না হইয়া বরং ভয় হয়। এটী সুলক্ষণ নহে।

সকল বিষয়েরই দুই দিক আছে। ভিন্ন২ লোকে পরস্পর বিরুদ্ধ কারণে এক অভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। কোন বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয়ে ক্ষমতাও প্রকাশ হইতে পারে, দৌর্ব্বল্যও প্রকাশ হইতে পারে। যে ব্যক্তি বিলক্ষণ বাকপটু, সে অধিক কথা কহে—কিছু বলিবার না থাকিলেও অধিক বাগাড়ম্বর করে। অধিক বকিলেই যে তিনি বাকপটু হইলেন, তাহা নহে। আমরা যে এত এত গ্রন্থ লিখি, ইহার কারণ, আমাদের লিখিবার কথা অতি অল্প। যিনি যাহা কিছু লেখেন, তাহা হয় ইংরেজীর রূপান্তর মাত্র, অথবা অর্থবিহীন। অবশ্য এ তালিকা হইতে দুই চারি জন বঙ্গীয় লেখককে বাদ দিতে আমরা সম্মত আছি।

আজি কালি গ্রন্থ প্রণয়ন করা বাঙ্গালীর রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহার বক্তব্য কিছু নাই, তিনিও ছাই ভস্ম লিখিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ রোগের কারণও অপ্রাপ্য নহে।

আজি কালি যে পরিমাণ লোক সুশিক্ষিত, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া বাহির হইতেছেন, তাহার সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহাদের সকলকে গবর্ণমেন্ট চাকরী দিয়া উঠিতে পারেন না। বাণিজ্য বাহুল্যে দেশের অনেক লোক তাহাতেই নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু বাণিজ্য সভ্যতার অনুগামী, আমাদের বাণিজ্য অল্প। সুতরাং অনেক লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্য কি কর্ম্ম করিবেন, অতএব গ্রন্থ লেখেন। লাভের এবং যশের এ অতি সহজ পথ।

কিন্তু অধিকাংশ লেখকেরই পুঁজি অতি অল্প। লিখিবার কিছুই নাই, অথচ না লিখিলে নয়, সুতরাং যাহা পান, তাহাই লিখেন। তারকেশ্বরের মোহন্ত কার স্ত্রীকে নষ্ট করিল—তার এক গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা সুমহৎ ঘটনা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়া-

ছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে আমরাও করিতেছি। বাল্মীকি রামচরিত লিখিয়াছেন, হোমার ট্রয় যুদ্ধ কীর্ত্তন করিয়াছেন, বর্জিল ইনিয়াস্ চরিত লিখিয়াছেন, ব্যাস কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ লিখিয়াছেন, আমরাও মোহন্ত চরিত লিখিতেছি। সীতা হরণের পুস্তক হইতে পারে, ত এলোকেশী হরণের পুস্তক না হইবে কেন? অবশ্য হইবে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন আর্য্যদিগের সহিত আমাদের আরও সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহারা আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। এক রাম চরিত লইয়া বাল্মীকির রামায়ণ, ভবভূতির উত্তর চরিত, আবার মহানাটক, লোকে বলে, স্বয়ং হনুমান মহানাটক লিখিয়াছিলেন। আমরাও এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছি। এক বাল্মীকি "মোহন্তের এই কি কাজ?" লিখিয়াছেন। তার পর ভবভূতি আবার "উঃ মোহন্তের এই কাজ?" লিখিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কেহ একখানি মোহন্ত বিষয়ক মহানাটক প্রণয়ন না করেন কেন? অল্পের জন্য অঙ্গহীন করিয়া রাখা ভাল হয় না।

সাহিত্য প্রধানতঃ পদ্য এবং গদ্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত। পদ্য এবং গদ্যও আবার ভিন্নং শ্রেণীতে বিভক্ত। সে সকলের কথা আমরা অদ্য উল্লেখ করিব না। আমাদের পদ্য এবং গদ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহারই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

পদ্য। মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্তরের গতি সম্যকরূপে অবগত হওয়া, এবং তাহা সুন্দর করিয়া চিত্রিত করা যে অতি কঠিন ব্যাপার, তাহার আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে প্রকৃত কবি অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুকবির গুণে ভাষার মুখোজ্জ্বল হয়, দেশের মুখোজ্জ্বল হয়। পৃথিবীতে অনেক নূতন ভাষা হইবে। আবার কালে সে সকল লুপ্ত হইবে। কিন্তু এক কালিদাসের গুণে রত্নগর্ভা সংস্কৃত চিরকাল জীবিতা থাকিবে। বঙ্গদেশেও দুই চারি জন সুকবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন দত্তের নাম সকলেই জানেন। ঈশ্বর গুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুকবি। বঙ্গভূমি আরও সুকবি প্রসব করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়।

অনেকের সংস্কার আছে, যিনি অক্ষরের মিল করিয়া লিখিতে পারেন, তিনিই সুকবি। এ রূপ মিল রাখিয়া লিখিতে পারাই বিশেষ গৌরবের কথা; ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন, তাহা দ্রষ্টব্য নহে। বাঙ্গালীকে উপকরণের জন্য ভাবিতে হয় না; তাহা যথেষ্ট রহিয়াছে। কোন প্রকারে অক্ষর মিলাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায়। কমলিনী, কুমুদিনী, সৌদামিনী, কুসুম, মলয় সমীরণ, মদন, ফুলবাণ, নবমেঘ, চাতকিনী, ময়ূরী, কোকিল, ভ্রমর, গুঞ্জরব, শরৎচন্দ্র, বিরহ, বসন্ত, যমুনা, বৃন্দাবন, বংশীরব, ব্রজবালা, অন্তরের বেদনা, যৌবনের জ্বালা, মণিহারা ফণী, কান্ত গুণমণি, এ সকল কেহই লইতে পারিবে না। এ সকল থাকিলে অন্য উপকরণেরও আবশ্যক নাই। তাহাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায়। আবার যিনি 'ভ্রমর'

না লিখিয়া 'দ্বিরেফ' লিখিলেন; 'কোকিল' না লিখিয়া 'পরভৃৎ' কিম্বা 'অন্য পুষ্ট' লিখিলেন, তিনি ত মহাকবি। এই সংস্কার বশতঃ বাঙ্গালী মাত্রেই আপনাকে কবি বলিয়া জানেন। স্ত্রীলোক, বালক, সকলেই কবি। এক ব্যক্তি স্বভাব বর্ণন করিয়া এক খানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে আমি তাহা পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুইটী পংক্তি অত্যন্ত মধুর বোধ হওয়ায় তাহা মনেই রহিয়াছে। সে দুই ছত্র এই—

"আকাশে শরৎ চাঁদ বসে বসে হাসে,
মনোদুঃখে বৃদ্ধ ব্যক্তি শুয়ে ২ কাশে।"

স্বভাব বর্ণন করাই রচয়িতার উদ্দেশ্য, সৌভাগ্য বশতঃ পুস্তক খানি মুদ্রিত হয় নাই। বাঙ্গালা পদ্যের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র, মধুসূদন কবি। তারাসুন্দরী পাঁড়ে, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মিকাও কবি!

গদ্য। আমাদের গদ্য পদ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল। ইহাতে অবশ্য পদ্যের প্রশংসা হইল না। জলধর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুন্দর বলিলে কিছু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা হয় না। আমাদের গদ্যে সাধারণতঃ প্রশংসা করিবার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি অভিধান খুঁজিয়া লম্বা২ শ্রুতিকটু, ক্লেশোচ্চার্য্য শব্দ সন্নিবেশ করিতে পারেন, তিনিই আপনাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ করেন—তিনিই অমনি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। দুই একটী অনুপ্রাস লিখিতে পারিলে ত আর কথাই নাই। পাঠকবর্গ পুলকিত হইয়া তাঁহার সহস্র মুখে প্রশংসা করেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সখি, ভ্রান্ত মানস শান্ত হইবে কিসে? দুর্দ্দান্ত কৃতান্তোপম দুরন্ত বসন্ত অবিশ্রান্ত প্রাণান্ত করিতেছে। অশান্ত প্রাণ কান্ত বিনা ক্ষান্ত হইতেছে না। অসময় এ সময় রসময় কোথায়!" সকলে একবাক্য হইয়া বলিল, ইনি অসাধারণ ব্যক্তি; এমন লোক আর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি বোধ হয়, শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। আমরা যেমন শ্রোতা, বক্তাও তেমনি।

গদ্য অনেক ভাগে বিভক্ত। আমরা সে সকল ভাগের কথা কিঞ্চিৎ বলিব।

উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই পথ প্রদর্শন করেন। তার পর বঙ্কিম বাবু কয়েক খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। রাজবালা, শৈবলিনী, বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপন্যাস বাঙ্গালায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' মন্দ নহে। ইহাতে গুণ আছে। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আদর করিয়া পড়িবার উপযুক্ত। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে বোধ হয়, দুই মত হইতে পারে না—এ খানি আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাদরণীয়। পাঠক যদ্যপি টেকচাঁদ ঠাকুরকে বাঙ্গালার ডিকন্স এবং বঙ্কিম বাবুকে বাঙ্গালার ওয়াল্টার স্কট বলেন, তাহা হইলে উভয়ের ঔৎকর্ষ্য এবং তারতম্য বিলক্ষণ অনুমীত হয়। রাজবালা এবং শৈবলিনীতে বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না—কোন গুণও দৃষ্ট হয় না। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' উম্মাদিনীর চিত্রটী মন্দ হয় নাই। ইহা ব্যতীত আর প্রশংসা করিতে পারি না। তবে গ্রন্থকার যে

ধৈর্য্য ধরিয়া পুস্তক খানি লিখিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গল্পটীর সার কথা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 'আইভান্হো' পড়িবেন।)

এক্ষণে অনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকেরই বিশ্বাস, উপন্যাস লেখা অতি সহজ। বাস্তবিকও একটী কাহিনী সাজান বড় কঠিন ব্যাপার নহে। যে সকল গুণ থাকিলে আখ্যায়িকা আদরণীয় হয়, তাহা সন্নিবেশ করা অবশ্য কঠিন। বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা কেবল কাহিনী সাজাইয়া থাকেন অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করেন না।) রাণী চুল বাঁধে, রাণী স্বামীর মুখচুম্বন করে, বেণে বৌ দর্পণে আপনার তাম্বুলরাগরঞ্জিত মুখ দেখে, ইহাই লিখিয়া তার সঙ্গে সতীত্ব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়া দিলেই নভেল্ হইল। গ্রন্থের পুরুষ এবং স্ত্রী গুলি মানুষ হলো, কি প্রেত হলো, কি গুণমাত্র হলো, তাহা দেখেন না। প্রায় অধিকাংশ নভেলের নায়িকা—নায়িকা কেন, পরিচারিকা পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যাপকের ন্যায় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন। কখন বর্ণপরিচয় দেখেন নাই, অথচ দীর্ঘ২ বক্তৃতা করেন, অনেক দুরূহ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন, মধ্যে২ প্রণয় সমালোচন করেন। এ সকল করিয়াও যদি গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে ছাই ভস্ম লিখিয়া গ্রন্থ বড় করেন। যাঁহারা আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় নিবেদন, একবার নটনন্দিনী পড়িয়া দেখিবেন। গ্রন্থকার কতকগুলি "আষাঢ়ে গল্প" লিখিয়াছেন। কেন যে লিখিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

এই রূপ কদর্য্য পুস্তক আজি কালি বাঙ্গালায় লিখিত হইতেছে। ইহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের মুখে কালী পড়িতেছে।) যে দেশে এ রূপ পুস্তক বিক্রয় হয়, (অবশ্য বিক্রয় হয়, নহিলে লোকে লিখিবে কেন?) সে দেশের পাঠকের রুচিরও বড় প্রশংসা নাই।) যে স্থানে শর্করা এবং মুড়ি এক দর, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে দেশের যে বিশেষ দুর্ভাগ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শুদ্ধ এক দর নহে, অনেক উত্তম গ্রন্থের আদর একবারে নাই। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস আর মুদ্রিত হয় না।

নাটক। বঙ্গদেশে সকল প্রকার গ্রন্থ অপেক্ষা নাটকই অধিক পরিমাণে লিখিত হইতেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নাটক রচিত হওয়া উচিত, সে উদ্দেশ্যে কেহই নাটক লিখেন না। বঙ্গভাষায় যত গুলি নাটক লিখিত হইয়াছে, সম্প্রদায় বিশেষকে গালি দেওয়া তাহার অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য। কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি কতকগুলির অবশ্যই এ উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দেশীয় কদাচার, সম্প্রদায় বিশেষ, ব্যক্তি বিশেষ, বা সামাজিক বিপদ, এ সকল নাটকের বিষয় নহে। অনেক সুবিজ্ঞ লেখকও এই রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। সধবার একাদশী, নীলদর্পণ, কুলীন কুল সর্ব্বস্ব, নয়শো রূপেয়া, এই দোষে দূষিত। কিন্তু এ দোষ সত্ত্বেও এ গুলি প্রশংসনীয় বটে।)

যাহা দেশাচার, তাহা যে কেহ পুস্তক লিখিয়া উঠাইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হেরোডোটস্ লিখিয়াছেন, কোন পারস্য

দেশীয় রাজার সভায় গ্রীক দেশীয় এবং ভারতবর্ষীয় অনেক লোক উপস্থিত ছিল। একদা একজন গ্রীক্ তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। গ্রীকেরা মৃতদেহ দাহন করিত। হেরোডোটস্ বলেন, তৎকালীন ভারতবর্ষীয়েরা মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। পারস্যরাজ গ্রীক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এ শব ভক্ষণ করিতে পার কি না?" গ্রীকেরা উত্তর করিল, "প্রাণ গেলেও না।" রাজা তদনন্তর ভারতবর্ষীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ভক্ষণ না করিয়া শবদাহ করিতে পার কি না।" তাহারাও ঐ উত্তর করিল। মনুষ্যের উপর দেশাচারের এমনি একাধিপত্য। যাহা শাস্ত্র, স্বার্থ, স্নেহ, মমতা পরাজিত করিয়া আধিপত্য করে, একজন সামান্য গ্রন্থকার একখানি পুস্তক লিখিয়া যে তাহা উঠাইব মনে করেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

✓বঙ্গীয় নাটক রচয়িতাদিগের মধ্যে দীনবন্ধু বাবুই প্রধান। ইনি কয়েক খানি নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের বিবেচনায় 'সধবার একাদশী' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক পুস্তকে 'নবীন তপস্বিনীরই' সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় সধবার একাদশীই উত্তম। নীলদর্পণ এবং নবীন তপস্বিনী মন্দ নহে। 'লীলাবতী'র গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক।

মধুসূদন দত্ত নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাঁর নাটকের কথা বলিবার আবশ্যক নাই।

'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকও আদরণীয় বটে। বাঙ্গালা নাটকের দুরবস্থা দেখিয়া এখানির প্রশংসা করা যায়। এখনকার নব প্রচারিত গ্রন্থের মধ্যে 'নয়শোরূপেয়া' এবং 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটক উত্তম হইয়াছে।

সাধারণ সাহিত্য। শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুত রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত অক্ষয় কুমার দত্ত এবং আরও দুই এক জন এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সর্ব্বাপেক্ষা দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার চারুপাঠ প্রভৃতিতে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা যদিও কৃতবিদ্যের নিকট অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু বালকদিগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। পাঠক মনে রাখিবেন যে বালকদিগের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থেই এই পুস্তক রচিত হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালায় বিজ্ঞান লিখিবার পথ প্রথমতঃ তিনিই দেখাইয়াছেন; এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। দুঃখের বিষয় এই যে, আর কেহ এ পথে হাঁটেন না। তাঁহার কৃত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা ভাষার পিতা বলিতে হইবে, তিনিই বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালা শিখে। তিনি অনুবাদক বলিয়াই বিশেষ খ্যাত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মূল গ্রন্থের ভাব রাখিয়া অনুবাদকক্ষম লোক বোধ হয়, আর বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ নাই। বাঙ্গালা শকুন্তলা পাঠ করিলে কালীদাসের শকুন্তলার ঔৎকর্ষ্য অনেক অনুভূত হয়। তারাশঙ্করের পুস্তক সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল বাঙ্গালা কাদম্বরীর প্রশংসা করেন। 'বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও 'বহুবিবাহ' বিষয়ক পুস্তকে অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় আছে।

পূজ্যপাদ শ্রীযুত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত। তাঁহার 'বঙ্গভাষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য' নামক পুস্তকের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ। কিন্তু এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গ সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের এরূপ ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার এই প্রথম উদ্যম। আর কেহ এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই, সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অন্ততঃ এ পরিশ্রমের জন্যও তিনি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাঙ্গালী গ্রন্থকারকে কালীপ্রসন্ন সিংহ আর এক পথ দেখাইয়াছেন। অনেক লোক কিছু দিন সেই পথে ভ্রমণ করিয়া এখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের আমোদ বর্দ্ধন করাই ইহাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য—রসিকতাই ইহাঁদিগের ব্যবসায়। ইহাঁরা যে কাহারও আমোদবর্দ্ধন করিতে পারেন না, একথা আমরা বলি না। আমাদের মনে হয়, যখন সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিয়া, ছিন্ন মলিন পুস্তক খানি হাতে করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে উড্ডীয়মান ঘুড়ির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্কুল হইতে হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতাম, তখন প্রত্যহ পুস্তকের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতাম, চারি পয়সা মূল্যের নূতন পুস্তক আছে কি না? পুস্তক বিক্রেতা 'নাই' বলিলে, বড় দুঃখিত হইতাম।

যে বাঙ্গালী অন্য কিছুই লিখিতে পারেন না, তিনি ধর্ম্ম লইয়া পড়েন। যে ধর্ম্মানুসারেই হউক ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব লেখার ন্যায় সহজ বোধ হয়, আর কিছুই নাই। ধর্ম্মে সকল দিকই রক্ষা হয়। লোককে অনায়াসে গালি দেওয়া যায়। ধর্ম্মের কাছে দাঁড়াইয়া অন্যকে গালি দিলে, যাঁহারা সেই ধর্ম্মভুক্ত, তাঁহারা অধিক শ্রদ্ধা করেন। সাধারণে মনে করে, এ ব্যক্তি বড় ধার্ম্মিক; যাহারা গালি খায়, তাহারা মনে করে,

"পাগলে কি না বলে?"

এই এক সুবিধা। আরও অনেক সুবিধা আছে। বেকন্ বলিয়াছেন, "অত্যুক্তি কেবল প্রণয়ীর মুখেই ভাল লাগে।" আমরা বলি, প্রলাপ কেবল ধর্ম্মব্যবসায়ীদের মুখেই ভাল লাগে। কেন?—আদৃত হয়।) পার্থিব বিষয় লইয়া যে রূপ তর্ক করিলে লোকে মূর্খ বলে, ধর্ম্মবিষয়ে সে রূপ তর্ক করিলে অসামান্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ হয়। কোন২ ইংরাজী গ্রন্থকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই রূপ তর্ক করিয়াছেন, যে দেশে শাসনকর্ত্তা নাই, সে দেশ উচ্ছিন্ন যায়। পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা না থাকিলে পৃথিবী উচ্ছিন্ন হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, সুতরাং ঈশ্বর আছেন। পাঠক, এই তর্কের সারবত্তা দেখিবেন। আমাদিগকে কেহ নাস্তিক বোধ করিবেন না—আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি না। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, এ যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে অপারগ হইলে লোকে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া সংবাদ পত্রাদিতে মুদ্রিত করিয়া যশোলিপ্সা চরিতার্থ করেন। আমরা যে বলিয়াছি, ধর্ম্ম বিষয়ে অসার তর্কেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়, তাহার যাথার্থ্য সাধারণের

তর্ক শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। বক্তা বলিতেছেন, "কে বলে ঈশ্বর নাই? আজিও পৃথিবীতে এক পোয়া ধর্ম্ম আছে, আজিও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়।" শ্রোতৃবর্গ মনে মনে করিলেন, "লোকটা বড় বিচক্ষণ। কি সারগর্ভ কথাই বলিল; ইহাঁর সকল শাস্ত্রে অধিকার আছে।"

আমরা সকল বিষয়েই ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে যাই। আপনাদের অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই, আপনাদের ক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়াই ইংরেজদিগের সমকক্ষ হইতে দাঁড়াইয়াছি। বালক হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বেই দৌড়াইবার চেষ্টা করে, আর পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়। আমরাও তাহাই করিতেছি। ফলও যে তদ্রূপ হইতেছে, তাহারও সন্দেহ নাই। ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রী রচিত পুস্তক কি রূপ হয়, তাহার পরিচয় দিবার বোধ হয়, আবশ্যক নাই। ইউরোপ কত দিন সভ্যতা শ্রেণীতে আরূঢ় হইয়াছে, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা বহুকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি, স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে তুল্য। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত মাডেম ডি ষ্টেল ব্যতীত কয় জন রমণী পুস্তক রচনা করিয়া সাহিত্যের উপকার করিতে পারিয়াছেন? ইংলণ্ডেও দুই এক জন রমণী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের লিখিত ঐ গ্রন্থ গুলি না থাকিলেও সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের মেয়েরা 'বোধোদয়' এবং 'সীতার বনবাস' পড়িয়াই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটীও বড় কুচিহ্ন।

আমাদের দেশে এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে এবং পড়িতে লজ্জা করেন। যাঁহারা ইংরেজীতে কৃতবিদ্য এবং যাঁহারা সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক গুলি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা লিখিলে লেখনী কলঙ্কিত হয়। তাঁহাদের ন্যায় কৃতবিদ্যের বাঙ্গালা লেখা অপমানের বিষয়, সুতরাং তাঁহারা লেখেন না। তাঁহারা যে লেখেন না, তাহাতেও আমাদের বিশেষ দুঃখ নাই;—অনুগ্রহ করিয়া না লিখিলেই মঙ্গল। কিন্তু অনেক গুলি যথার্থ কৃতবিদ্য লোক আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে অভ্যাস করেন নাই বলিয়া, লেখেন না, আবার যাহা লেখেন, তাহাও মনঃপুত হয় না বলিয়া মুদ্রিত করেন না। তাঁহাদিগকে আমরা বলি;—বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা; অতি অল্প যত্নেই এক রূপ লিখিতে পারা যায়। সে যত্ন না করেন কেন? ইংরেজীতে যত উত্তম কেন লিখুন না, তাহা কখনই আদৃত হইবে না। যত কেন প্রতিভাশালী হউন না, যত কেন রচনাশক্তি থাকুক না, কস্মিন্ কালে অন্য ভাষায় লিখিয়া নাম কিনিতে পারিবেন না। মহাকবি মিল্টন্ লাটিন ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন, বিউকেনান্ লাটিনে রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা লাটিন জানেন, তাঁহারা বলেন, ইহাঁদের রচনা দ্বিতীয় শ্রেণীতেও পরিগণিত হইতে পারে না। ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট্ চিরকাল ফ্রেঞ্চ শিখিয়াছিলেন;—ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথোপকথন, ফ্রেঞ্চ পুস্তক পাঠ, ফরাসীস্ লোকের সহিত প্রণয়, ফরাসীস্ চাকর পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন, অথচ কৃত-

কার্য্য হইতে পারেন নাই। এত করিয়াও ফরাসীসের ন্যায় ফ্রেঞ্চ লিখিতে পারেন নাই—এত করিয়াও ভল্‌টেয়ার তাঁহার লেখা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাহাতেই বলি, আপনারা বাঙ্গালা লিখুন।

ইংরেজীর আপনারা কি করিবেন? কোন উপকার করিতে পারিবেন না। আপনারা ইংরাজী কবিতা লিখিবেন? লিখুন, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন—সেক্ষপীয়র, মিল্টন্, চসর, স্পেন্সর্ থাকুন; ড্রাইডেন, পোপ, বাইরন্,ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থাকুন—নিশ্চয় জানিবেন, আপনারা মেরি হাউইটের ন্যায়ও লিখিতে পারিবেন না। ইংরাজীতে বিজ্ঞানাদি লেখাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কারণ বিজ্ঞান আপনাদের অপেক্ষায় মেরি সমরভিল্ ভাল লেখেন। তবে কেন? ইংলণ্ড অনেক কৃতী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তাঁহারা যে খানে যে রত্ন পাইয়াছেন, আনিয়া জননীর চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা অলঙ্কারের কাঙ্গালিনী নহেন—তাঁর অনেক আছে। তাঁহাকে আপনারা কি একটী ভাঙ্গা পিত্তলের পুরাতন অঙ্গুরীয় দিয়া যশ পাইবেন? আপনারা কাহার জন্য লিখেন? ইংরেজের জন্য, বাঙ্গালীর জন্য, না আপনার গৌরবের জন্য? ইংরেজী লিখিয়া যে গৌরব পাইবেন না, তাহা দেখাইয়াছি। যদি ইংরেজের জন্য লেখেন, তবে এ শ্রম বৃথা, তাহাও দেখান হইয়াছে। যদি বাঙ্গালীর জন্য লেখেন, তবে ইংরেজীতে কেন? বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী ভাল জানেন,তাঁহারা এ সকলও জানেন। তাঁহারা যাহা জানেন, তাহার অধিক আপনি কিছুই বলিতে পারিবেন না। আপনি যে কথা যে রূপ করিয়া লিখিবেন, সেই কথা অন্যত্র আরও প্রাঞ্জল রূপে বিবৃত আছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন—হয় ত শতবার দেখিয়াছেন। তাঁহারা আপনার এ রূপান্তর চাহেন না। কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার দিন আজিও বাঙ্গালী লেখকের হয় নাই। আপনারা সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের হিতে ব্রতী হউন। তবে বঙ্গভাষায় শব্দ অল্প, সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার উপায় নাই। অনেক সময় একটী শব্দের জন্য লেখনী হস্তে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়—শব্দ অন্বেষণ করিতে গিয়া চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া যায়। এরূপ অসুবিধা অবশ্য আছে, কিন্তু আপনারা যদি অভাব দেখিয়া পলাইবেন, তবে সে অভাব মোচন করিবে কে? বাঙ্গালা পড়িতে লজ্জা হয়, পড়িবেন না। আমরাও স্বীকার করি, পরিশ্রম করিয়া পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালায় অতি অল্প আছে। কিন্তু আপনারা লিখুন, তাহা হইলেই আর অল্প থাকিবে না।

কৃতবিদ্য বঙ্গ ভ্রাতৃগণ! বঙ্গমাতার সমস্ত আশা ভরসা আপনাদের উপর। যাহাতে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হয়, তাহা করুন। পরিধেয়ই সভ্যতার প্রধান চিহ্ন—বিজ্ঞানই সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। বঙ্গ মাতার বড় দুর্দশা। একবার তাকাইয়া দেখুন, বস্ত্র শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিযুক্ত, অত্যন্ত মলিন। এক খানি ভাল কাড়প আনিয়া দেন। হতভাগিনীর ও জীর্ণ বসন খনিও ছিল না। ও খানি অক্ষয় দত্ত দিয়াছেন। দিয়াছেন, কিন্তু বসন খানি বড় জীর্ণ, বড় পুরাতন।

কিন্তু কাঙ্গালিনীকে যিনি দিয়াছেন, তিনি মন্দ দেন, তবু দিয়াছেন—তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। আপনারা ভাল দেন—কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান লিখুন। সংস্কৃত আয়ীর ভাল কাপড় আছে, চাহিয়া দেন। ইংলণ্ডের আরও ভাল আছে, ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দেন। ক্ষমতা থাকে, তাহার উপর দুটী ফুল কাটিয়া শোভা বৃদ্ধি করুন।

মাতাকে যদি দশ জনের মধ্যে এক জন করিতে চাহেন, তবে আর কিছু অলঙ্কার আনিয়া দেন। মাতা একবারে নিরলঙ্কার নহে। বড় ঘরের মেয়ে—কাঙ্গালিনী হইলেও দুই চারি খানি অলঙ্কার আছে। বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন কিছু২ অলঙ্কার দিয়াছেন। কিন্তু আজিও অভাব দূর হয় নাই। বঙ্গমাতা আজিও অনাথিনী—অনাথিনীকে যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে, যাহাই দিবেন, তাহাতেই সুখ্যাতি হইবে, তাহাতেই পুণ্য হইবে। আপনারা যেখানে যাহা পান, আনিয়া মাতাকে দেন—নিজের যাহা আছে দেন, অন্যের কাছে ভিক্ষা করিয়া দেন। ভিক্ষার অলঙ্কার দিতে লজ্জা হয়, ভিক্ষালব্ধ অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভিক্ষা করিতে লজ্জা কেন? ভিক্ষুকের লজ্জা কি? যাহার কিছু নাই, তাহার ভিক্ষায় লজ্জা করিলে চলিবে কেন? যাহার কাছে ভিক্ষা করিতেছেন, তাহাকেই দিলে কি ফল? সে তাহার প্রার্থী নহে। ভিক্ষার ধন বিলাইবার পূর্ব্বে, মাতা যে হতভাগিনী—কাঙ্গালিনী, তাহা মনে করিলে ভাল হয়। গৃহে মাতার এই দশা, পরের কাছে ধনী বলিয়া পরিচিত হইতে যত্ন কেন? এ যত্নও বৃথা। যাহার লইয়া ধন, যাহার প্রসাদলব্ধ ধনে ধনী, তাহার কাছে সে ধন দেখাইয়া গৌরব পাইবেন না। আমাদের দেশের সংস্কৃত অধ্যাপকেরাও বাঙ্গালার নাম শুনিলে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, নাসিকা তুলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মনুষ্যের যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা সকলই সংস্কৃতে আছে—যাহা কিছু মনুষ্যের বলিবার, তাহা প্রাচীন আর্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে যাহা নাই, তাহা না থাকিবারই যোগ্য—তাহা অসার, অথবা মিথ্যা। ইহাঁরাও বাঙ্গালা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহেন না। আমরাও বলি, আপনারা বাঙ্গালা লিখিয়া বঙ্গভাষা কলঙ্কিত করিবেন না। ইহাঁদিগের বাঙ্গালা কি রূপ হয়, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এ খানি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা, বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

✓এ স্থলে বঙ্গীয় সমালোচকদিগের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। কোন পুস্তকের সমস্ত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা সকলের সাধ্য নহে। পুস্তকের লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য সাধারণকে বুঝানই সমালোচনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতি মন্দ পুস্তক সকলের দোষোদ্ঘাটন করিয়া সাহিত্য পবিত্র এবং অকলঙ্কিত রাখাও এক উদ্দেশ্য। আমাদের এ সকল উদ্দেশ্য নহে। খুঁজিয়া২ দোষ বাহির করিয়া পুস্তকের নিন্দা এবং গ্রন্থকারকে ব্যঙ্গ করাই অধিকাংশ বঙ্গীয় সমালোচকের উদ্দেশ্য। যিনি যত গুণে অন্ধ হইবেন,

যিনি যত দোষ লইয়া রসিকতা করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। আবার আর এক সম্প্রদায়ের সমালোচক আছেন, তাঁহাদের বাছাবাছি নাই—সকল পুস্তকেরই প্রশংসা করেন। এও আমাদের দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে গ্রন্থকারের অল্প গুণ দেখিলেও প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত। অবশ্য যাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহার নিন্দা করিতেই হইবে, কিন্তু গুণথাকিলে তাহার অনুরোধে দোষ বিস্মৃত হইতে হইবে। নটনন্দিনী অথবা মোহন্তের এই কি কাজের প্রশংসা করিতে বলি না, কিন্তু নয়শো রূপেয়ার ন্যায় গ্রন্থের দোষের ভাগ না ধরিলে ভাল হয়।

আমরা যাহা বলিয়াছি,তাহাতে বোধ হয়, এক রূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় দুরবস্থা। কত কালে যে এই দুরবস্থা ঘুচিবে, কতকালে যে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে পাইব, তাহা কে বলিবে? কিন্তু এতদিন আমাদের আশা ছিল। আশা ছিল যে, ভারতবর্ষ আবার সোনার ভারতবর্ষ হইবে। এক্ষণে আর সে আশা আমরা করি না। বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের সব আশা ভরসা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে! যিনি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে বলি—অশ্লীলতা নিবারণী সভা দেখিয়া। এটী আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ—ইহাতে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। এ কথা শুনিয়া অনেকেই খড়্গহস্ত হইবেন—কোন সম্প্রদায়ের লোক হয় ত প্রাণ ভরিয়া গালি দিবেন—'পাষণ্ড, মহাপাপী প্রভৃতি কত সুমিষ্ট বিশেষণ আমাদের নামের সঙ্গে যোগ করিবেন। করুন—সাধ মিটাইয়া করুন, আমরা কিন্তু কাহার মন রাখিয়া কথা বলিব না। আমরা অবশ্য স্বীকার করি, ইহাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে নির্গুণ অশ্লীলতা একবারে উঠিয়া যায়,ইহা আমাদেরও ইচ্ছা। কিন্তু ইহাঁরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,ইহাতে অমঙ্গল হইবে—সুধার আশায় সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিয়া শেষে হলাহল উঠিবে।

এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার বাল্যকাল। এক্ষণে উহাকে শৃঙ্খল পরাইলে পুষ্টিসাধন হইবে না। এ অবস্থায় ভাষা ইচ্ছামতে ক্রীড়া করুক, নহিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে কেন? শরীর বলিষ্ঠ হইবে কেন? লেখকদিগের হস্তপদ বাঁধিয়া দিয়া লিখিতে বলিলে তাহারা লিখিবে কি রূপে?

অনেকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি অনিষ্ট হইবে? আমাদের উত্তর—পিউরিটানদিগের কঠিন শাসনে ইংলণ্ডে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। পিউরিটানদিগের পূর্ব্বেও ইংরেজীতে অনেক অশ্লীল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অশ্লীলতার সারভাগ লইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁহাদের কঠোর শাসনের ফল। চসর, রাউই, বোমোণ্ট, ফ্লেচার, বেন্ জন্সন্ও অশ্লীলতা পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মাতা সন্তানের সহিত প্রণয় করিতেছেন, এ রূপ চিত্রও মাসিঞ্জের আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা এই চিত্রগুলি এরূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা দেখিলেই ঘৃণা হয়। পিউরিটানেরা যাহা অসাধ্য,তাহার চেষ্টা করিলেন—রাজবিধির দ্বারা লো-

ককে ধার্ম্মিক করিবার যত্ন করিলেন—বিষময় ফল ফলিল। তাঁহাদের অন্যায় আচরণের দরুনই কন্‌গ্রীভ, উইচারলী, ভ্যানব্রু, ফারকুহারের জন্ম হইল, "প্রো-ভোক্‌ট্ ওয়াইফ্," "কনট্রী ওয়াইফ্," "জেন্‌টল্‌ম্যান্ ড্যান্‌সিংমাষ্টার" "ডবল্ ডীলার" "ম্যারেজ আ লা মোড্" এই শাসনের ফল। এই সকল গ্রন্থ কতদূর অশ্লীল, তাহা যিনি এ সকল না পড়িয়া-ছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। পাঠক জানিতে ইচ্ছা হয়, উইচার্‌লী প্রণীত "জেন্‌টল্‌ম্যান্ ডানসিংমাষ্টার" পড়িয়া দেখিবেন। ইহার এক পাতায় যতদূর অশ্লীলতা আছে, সমস্ত বিদ্যাসুন্দরে তাহা নাই। অশ্লীলতা নিবারণী সভা হইতে আমরা এই বিপদের আশঙ্কা করিতেছি। আজি কালি ভারতচন্দ্রই সকলের গালি দিবার পাত্র হইয়াছেন। এই সভার দরুন বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অশ্লীলগ্রন্থ যে বাঙ্গালায় হইবে না, তাহার নিশ্চ-য়তা কি?

আমাদের মত এই যে, সৎকর্ম্মেও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাল নহে। বিশুদ্ধ রুচি জন্মান সভ্যদের ইচ্ছা, একবারে সমস্ত বাঙ্গালীকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির করিয়া তুলিবেন। সভা করিয়া, বিধি করিয়া লোককে ধার্ম্মিক করিবেন। একটু চিন্তা করিলেই আপনার ভ্রম আপনি বুঝিতে পারিবেন। সাহিত্য আপনি বিশুদ্ধ হইবে—সময় ইহার একমাত্র প্রবর্ত্তক। সমাজের ইহাতে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় এবং অনিষ্টকর। সমাজের ইহাতে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে না, অথচ ক্রমে বাঙ্গালা আরও দূষিত হইবে।

লোকের রুচি বিশুদ্ধ রাখিবার এ যত্ন অনাবশ্যক। যাহার মানসিক পবিত্রতা একখানি পুস্তক পড়িয়া অপনীত হয়, নিশ্চয় জানিবেন, তাহার পবিত্রতা পুস্তক পাঠের পূর্ব্বেই অপনীত হইয়াছে এবং সে পুস্তক খানি না পড়িলেও হইত। তাহা রক্ষা করিবার যত্ন বৃথা—তাহা যত্নের অযোগ্য। সংসারে রৌদ্র হোক, বৃষ্টি হোক্ যাহা পচিবে, যাহা শুকাইবে, তাহা যাক্। তাই বলিয়া রৌদ্র বৃষ্টি বন্ধ করিবার প্রার্থনা করা যাইতে পারে না। যিনি রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া বলিষ্ঠ হইবেন, তিনিই সংসারের কাজে লাগিবেন। পূর্ব্ব দিকের বাতাসে যাঁহার শরীর অসুস্থ হয়, তাঁহার শরীর না থাকিলেও তত ক্ষতি নাই।

বিশেষতঃ এক্ষণে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ অশ্লীল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রহি-য়াছে। সে সকল কি হইবে? "কি মজার শনিবারের" ন্যায় পুস্তক প্রচার বন্ধ হইল, কিন্তু ভারত চন্দ্রের শৃঙ্গার বর্ণন, দাসরথি রায়ের নলিনী ভ্রমরের বিরহ পাঠ কে নিবারণ করিবে? মনে কর, এ সকলও বন্ধ হইল। 'গীতগোবিন্দ এবং রাস পঞ্চাধ্যায়ের' পক্ষেও কি ঐ নিয়ম? না, এসকল সংস্কৃত যে? উত্তম বটে!

✓বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথে আর একটী প্রতিবন্ধক আছে; তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা অদ্য নিরস্ত হইব। প্রাচীন দলের পণ্ডিতেরা ভাষার পবিত্রতা রক্ষায় বিশেষ যত্নবান। যে শব্দটী সংস্কৃত নহে, তাহা ব্যবহার করা ইহাঁদের মতে পঞ্চমহাতক মধ্যে গণ্য। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে সমা-লোচকের হাতে নাস্তানাবুদ হইতে হবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা আজিও

অপরিপক্ক; যদি বাঙ্গালাকে সংস্কৃত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে কোন কালে ভাষার উন্নতি হইবে না। সমাজ যতই উন্নত হইবে, বিজ্ঞান যতই নূতন২ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিবে, ততই নূতন২ শব্দের আবশ্যক হইবে। সে সকল শব্দ অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ না করিলে ভাষা চিরকালই এমনি থাকিবে। ভাষায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক, যাহাতে পরিবর্ত্তন নাই, সে মৃতভাষা।)

দেশের কিয়দংশ লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলেই দেশের উন্নতি হইল না, দেশের উন্নতি সূচিপত্র, সাধারণের অবস্থা। সরল ভাষায় গ্রন্থাদি না হইলে সাধারণের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? সকলেই কিছু সংস্কৃতজ্ঞ নহে। 'উত্তরচরিতের' ভাষা অনুকরণ করিলে কয় জনে বুঝিবে? যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যাহারা বুঝিবে না, তাহাদিগকেই বুঝাইতে হইবে—তাহাদিগকে বুঝানই আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সকল গ্রন্থকারের মনে থাকা উচিত। তাহা হইলেই দেশের উন্নতি হইবে, নহিলে কি হইবে, কে জানে?

সরল ভাষা লিখিলেও আবার অনেকে গ্রাম্যতা হইয়াছে বলিয়া বজ্র নির্ঘোষ করেন। ভাষা অত্যন্ত সরল করিতে গেলে যে একটু গ্রাম্যতা দোষ, তাহা অপরিহার্য্য—কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কৃত বিবর্জ্জিত পথে চলিতেই হইবে। তাই বলিয়া গালি দিয়া কোন গ্রন্থকারকে ভগ্নোৎসাহ করা আমাদের অন্যায়। সরল করিয়া লিখিতে গিয়া যদি একটু গ্রাম্যতা হয়, তাহা অবশ্য মার্জ্জনীয়।)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

জয়দেব চরিত। রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। এই ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আমরা জানিতে পারিয়াছি, লেখক অল্প বয়স্ক। ঈদৃশ বয়সে বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা এক প্রকার স্বাভাবিক। অতএব গ্রন্থের অংশ বিশেষে যে রচনার আড়ম্বর আছে, তাহা মার্জ্জনীয়। এই সামান্য দোষটি বাদ দিলে পুস্তক খানি বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। লেখক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার জন্য অনেক প্রাচীন পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন। এবং বিলক্ষণ বহুজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার অত্যন্ত পীড়িত, এমন কি, মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহার আরোগ্য লাভের সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম, আমরা ভরসা করি, তিনি পুনরায় এরূপ পরিশ্রমে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গ্রন্থকারদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপকার হইবে।

ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রদেশের কবি ও গ্রন্থকারদিগেরজীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যত কঠিন, বঙ্গদেশীয় কবিগণের চরিত সংগ্রহ করা তাদৃশ দুঃসাধ্য নহে। বঙ্গদেশে জয় দেবই সকল অপেক্ষা প্রাচীন কবি, তাঁহার চরিতাখ্যান যত আয়াসসাধ্য হইয়াছে, রূপ গোস্বামী,

জীব গোস্বামী, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবি ও গ্রন্থকারদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে তত শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, কারণ ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই তিন শত বৎসরের অধিক পূর্ব্ব কালের লোক নহেন।

অতএব আমাদিগের বাসনা, কোন বিদ্যোৎসাহী লোকের যত্নে বঙ্গদেশ-বাসী সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থকার দিগের জীবনী সংগৃহীত হয়। যথা যোগ্য উৎসাহ পাইলে এপ্রকার কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

জয়দেব জীবনের অনেকাংশ কাল উড়িষ্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখনও জগন্নাথের মন্দিরে প্রতি দিন সন্ধ্যার পর জয়দেব রচিত সঙ্গীত গান করিয়া থাকে। উড়িষ্যায় স্ত্রীলোকেরাও জয় দেবের অনেক গান গাইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, উৎকল বাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে আমাদের এই মধুর ভাষী কবির জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত আরও দুই এক উপাখ্যান অবগত হওয়া যাইতে পারে। কথিত আছে, জগন্নাথ দেব স্বয়ং নররূপ ধারণ করিয়া জয়দেবকে মিত্র সম্ভাষণ করিতেন। জগন্নাথ সরলমতি জয়দেবের সহিত সময়ে২ যে নানা কৌতুক ও আমোদ করিতেন, তদ্বিষয়ক অনেক উপাখ্যান প্রচলিত। ইহার দ্বারা বোধ হয়, জয়দেব দীর্ঘকাল উৎকলে ছিলেন, এবং তত্রত্য লোক সকল যে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, তাহার সন্দেহ নাই।

রজনী বাবু যদি এই পুস্তকের পুনঃ সংস্কার করেন, অথবা অন্য কোন চরিতাখ্যায়ক জয়দেব চরিত লেখেন, তাহা হইলে আমাদিগের এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলে কিছু ফল হইবার সম্ভব।

পদ্যপাঠ। শ্রীতারাশঙ্কর তর্কালঙ্কার প্রণীত। পুস্তক খানি ভাল হয় নাই। গ্রন্থকার একবার কবি জনোচিত গুণ বিরহিত।

তমোলুক পত্রিকা। কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত ও তমোলুকে প্রকাশিত। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে তমোলুক পত্রিকার প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত কেহই স্থায়ী সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বেকন কহেন, "জ্ঞানই মনুষ্যের বল।" যদি এই বাক্য সত্য হয়, তবে জাতি সাধারণের শারীরিক বল বীর্য্য উদ্দীপক নিয়মের আবিষ্কারক অপেক্ষা মনোবৃত্তি প্রকৃষ্ট রূপে পরিচালন ক্ষম পুস্তক বা পত্রিকার রচয়িতা অধিক আদরণীয় ও উপকারী, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তমোলুক পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ায় আমাদিগের নিকট বিশেষ প্রশংসার পাত্র। অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যার ন্যায় হইলে ইহা বঙ্গ ভাষাতে এক খানি ভাল পত্র হইবে।

বাঙ্গালা পত্রিকার একটা দোষ এই যে, উহা নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না। কোন২ বাঙ্গালা দৈনিক পত্র পর্য্যন্তেরও এই দশা। তমোলুক পত্রিকার প্রকাশক যেন এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন।

অনুরোধ করি যেন তমোলুক পত্রের লেখক বর্গ অর্থলোলুপ হইয়া ইদানীন্তন বঙ্গীয় পাঠকগণের রুধির স্রোতে ভাসিয়া

না যান। আপনাকে অবনত না করিলে কেহ সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ কার্য্যকারী হইতে পারে না। লোকের নিকট আদরের পাত্র হই বা না হই, আমাদিগের উদ্দেশ্য যেন একই থাকে।

অবকাশ তোষিণী। মাসিক পত্র চেতলা হইতে প্রকাশিত।

আজ কাল পত্রিকা সম্পাদন এক রূপ বাল্য ক্রীড়া হইয়া উঠিয়াছে। ২। ৪ জন বালক একত্র হইলেই এক খানা পত্রের আরম্ভ হয়, কিছু দিন অর্থ নষ্ট ও উৎসাহের হ্রাসতা হইলেই তাহা উঠিয়া যায়। অবকাশ তোষিণী সম্বন্ধেও আমাদিগের এই মত।

এই জন্য বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও পত্রিকার এত ছড়াছড়ি। আজ কাল নানা স্থানে নানা প্রকার বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ হাতে করিবার যোগ্য নহে। এরূপ পত্র ও পত্রিকা না হওয়াই ভাল।

পল্লীদর্পণ। হরিপুর হইতে প্রকাশিত, চাটমহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদিত।

বিবাহ পদ্ধতি। শ্রীতারাশঙ্কর তর্কালঙ্কার প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। গুরু শিষ্যের কথোপকথন ছলে বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক গুলিন মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য আছে. অন্যান্য খণ্ড প্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রকাশ করিব। ভরসা করি, গ্রন্থকার ২য় খণ্ডে মোর্টিস্ থিসমস্ত, ম্যালথস্, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দিগের মত সঙ্কলন করিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

অমৃতে গরল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিমাতার ষড়যন্ত্র।

শীত কাল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, জীবগণ সুষুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। সন্ সন্ শব্দে এক এক বার প্রবল বায়ুর দমকা আসিতেছে। মধ্যে২ বৃক্ষপত্র হইতে স্খলিত শিশির পতনের টস্ টস্ শব্দ, অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব, বিরহিগণের দীর্ঘ নিশ্বাস, প্রহরিগণের বিকৃত স্বর, শিবাগণের উচ্চরব এবং কুকুরের বিকট চীৎকার প্রভৃতিতে অন্ধকার রজনীকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে।

এই ভয়ানক সময়ে সারণগড়ের রাজবাটীর একটী দ্বিতল গৃহ মধ্যে এক জন যুবা পুরুষ প্রদীপের নিকট একখানি পুস্তক অর্দ্ধমুক্ত করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। দুরন্ত শীত—উত্তরীয় বস্ত্র অজ্ঞাতসারে অঙ্গ হইতে পতিত হইতেছে, প্রশস্ত ললাট-দেশে বিন্দু২ ঘর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হইতেছে, মুখমণ্ডল মলিন ও বিষাদিত, মেঘাচ্ছন্ন শশীর ন্যায় বোধ হইতেছে। বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া ঊর্দ্ধদিগে এক দৃষ্টে রহিয়াছেন। কি করিতেছেন? পড়িতেছেন? তবে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কেন? ভিত্তিস্থিত চিত্র দর্শন করিতেছেন? তবে মুখ এত মলিন কেন? ভাবিতেছেন? এ যুবা-বয়সে কিসের ভাবনা? বিদ্যাভ্যাসের? পাঠ ত সমাপ্ত হইয়াছে। কোন রমণীর চিন্তা? এই বিংশতি বর্ষ বয়সে রমণীর চিন্তা? ইনি ত বাঙ্গালী নহেন! যুদ্ধের চিন্তা? তবে মুখ কেন এত বিষাদিত? বীর পুরুষদের কিসের ভয়? রাজ্যের চিন্তা? রাজাও বর্ত্তমানআছেন। পারিবারিক চিন্তা, বিমাতার ষড়চক্র—তাই ভাবিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কে যেন দ্বারে আঘাত করিল, চিন্তা-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, ত্রস্তভাবে দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। একটী দাসী এক খানি পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল, "এই যম পুরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই, প্রাণ বিনষ্ট করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র হইতেছে; যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে কল্যই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়।" ইহা কহিয়া দাসী চলিয়া গেল, যুবক একটী উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করতঃ পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন।

প্রদীপের নিকট পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল, মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল, পুনর্ব্বার আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল ভাবিয়া পুনরায় পত্রখানি লইয়া পড়িতে বসিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত হইল, সত্বর দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন, একটী বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "পত্র খানি পড়েছেন?"

"হাঁ।"

"তবে এখন কি স্থির করিলেন?"

"আমি বনবাসে যেতে কি দেশান্তরী হতে ভয় করি না।"

"আমি জানি, বীরপুরুষদিগের সাহস ভয়ানক; বনে যাওয়া কি দেশান্তরিত হওয়া ত তুচ্ছ কথা, তাঁহারা প্রাণ দান করিতেও ভীত হয়েন না।"

"তবে আপনার কি ইচ্ছা?"

"আমার ইচ্ছা যে আপনি অন্য কোন দূরদেশে না গিয়া আমার আলয়ে অবস্থিতি করেন।"

"এতে মহারাজের কি মত?"

"তাঁহার মত সম্পূর্ণই আছে।"

"তবে তাই হবে।"

"তবে কবে দিন স্থির করা যাবে?"

"আমি ত কাল সকালে অনঙ্গপুরের রাজার সাহায্যার্থ সসৈন্যে যুদ্ধে গমন করিব। মহারাজ এরূপ আদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি যুদ্ধ হইতে ফিরিতে পারি, তবে আসিবার সময় আপনার বাটীতে গমন করিব, আপনি পিতাকে বলিয়া সমস্ত সুস্থির করিয়া রাখিবেন।"

"আপনার সেখানে কত বিলম্ব হইবে?"

"বোধ করি, প্রায় দুমাস।"

"আচ্ছা, তবে এই কথাই স্থির রহিল।"

ইহা কহিয়া বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। পাঠক এই যুবক কে?—ইনি সারণগড়ের রাজা সুরেন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইহাঁর নাম বিজয় সিংহ, শৈশব কালে, ইহাঁর জননী লোকান্তর গমন করাতে, রাজা সুরেন্দ্র সিংহ পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। বিমাতা সপত্নীপুত্রকে বিষ-স্বরূপ দেখে, এটী চির-প্রসিদ্ধ, আমাদের বিজয় সিংহের ভাগ্যেও তাই ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ যুবরাজের প্রাণ বিনষ্ট করাই তাঁহার বিমাতার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু রাজার ভয়ে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে যুবরাজের অনেক কল্পিত দোষ কীর্ত্তন করিয়া রাজাকে বশ করতঃ যুবরাজকে দেশান্তরী করাই স্থির করিলেন। যদিও রাজার মনে অপত্যস্নেহ সম্যক রূপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, নব প্রণয়িনী রূপ বিষভাণ্ডের অমৃত বারি ক্রমশঃ সিক্ত হওয়াতে দিন২ সে অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল, তথাচ সে ইচ্ছা পুত্রের সমক্ষে লজ্জা বশতঃ প্রকাশ করিতে না পারিয়া পত্র দ্বারা জানাইলেন। যুবরাজ এই মাত্র যে পত্র পাঠ করিলেন, এ সেই পত্র, এবং এতক্ষণ যে চিন্তা করিতেছিলেন, সেও বিমাতার এইরূপ আচরণের চিন্তা।

রাজা মন্ত্রীর নিকট বিজয় সিংহের দেশান্তর গমনের প্রস্তাব করাতে, মন্ত্রী বিজয়কে তাঁহার নিজ বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, রাজাও সেই প্রস্তাবে সাহ্লাদে অনুমোদন করেন। মন্ত্রী আশাতিরিক্ত ফল লাভে সন্তুষ্ট হইয়া রাজ সদন হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ রাজকুমারের নিকট আগমন করেন। এই মাত্র যুবরাজের সহিত যে বৃদ্ধের আলাপ হইল, ইনি সেই মন্ত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি এখন কোথায়?

মহারাষ্ট্রীয়েরা চির কালই অর্থপিশাচ। ইহারা দুর্ব্বল নরপতিগণের যম স্বরূপ। ছলে, বলে কৌশলে যেরূপেই হউক, আপনাদের স্বার্থ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। অনঙ্গপুরের রাজা মহেন্দ্র সিংহ অতি ভোগবিলাসী, রাজকার্য্যভার মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া অহরহ অন্তঃপুরে বাস করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহা জানিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে অনঙ্গপুর নগর আক্রমণ করিল। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরম মিত্র সারণগড়ের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই নিমিত্তই রাজা সুরেন্দ্র সিংহ তাঁহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহকে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করেন।

রাত্রি এক প্রহর সময়ে বিজয়সিংহ সসৈন্যে অনঙ্গপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নগর প্রবেশের উপায় নাই, মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ নগর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিজয় সিংহ সৈন্যগণকে নিকটস্থিত এক বন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করত বিপক্ষগণের আচার প্রণালী দেখিতে বহির্গত হইলেন।

তিনি একাকী সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিকটস্থিত এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও সৈন্যগণ আহারের উদ্যোগ করিতেছে, কোথাও মদোন্মত্ত হইয়া আস্ফালন করিতেছে, কোন স্থানে কতকগুলি ধরাসনে শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছে, প্রহরিগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিক হুঙ্কার ধ্বনিতে পরিপূরিত করিতেছে। কোন স্থানে দুরাত্মাগণ, কুলবতীগণের সতীত্ব নষ্ট করিতে বল প্রয়োগ করিতেছে, কোথায়ও বা সৈন্যগণ নাগরিকগণের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই রূপ নানা স্থানে সৈন্যগণ নানা রূপে বিচরণ করিতেছে।

এতদৃষ্টে রাজ কুমারের মনে হঠাৎ ক্রোধের উদয় হইল। তিনি ধীরে২ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বসৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। পরে সেনাপতিগণ সহ পরামর্শ সুস্থির করিয়া অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষগণ একে অপ্রস্তুত ও বিশৃঙ্খল ভাবে ছিল, তাহাতে আহারের সময় হঠাৎ এরূপ আক্রমণে একবারে ভীত হইয়া সত্বর অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু সময় কোথায়? শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় বিজয় সিংহের সৈন্যগণ বাণ চালনা করিতে লাগিল। শরাঘাতে মহারাষ্ট্রীয়দের শরীর জর্জ্জরীভূত হইল, চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মহারাষ্ট্রীয়গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বিজয় সিংহের সৈন্যগণ রণজয়ী হইয়া জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বিজয় সিংহ সৈন্যগণকে বিশ্রামার্থ আদেশ দিয়া কতিপয় সেনানী সহ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরী প্রবেশ করিয়া দেখেন, জনমানব নাই। ভাবিলেন, অন্তঃপুরে সকলে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। ধীরে২ অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, অন্তঃপুর হইতে প্রভূত ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। এতদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ানক সন্দেহ ও আশঙ্কার উদয় হইল, তিনি দ্রুতপদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দেখিলেন, ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড! তন্মধ্যে নরদেহ দাহ হইতেছে। তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত, নিকটে ভৃত্যবর্গ হাহাকার করিতেছে। বিজয় সিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে দেখিবা মাত্র ভৃত্যগণ, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ বোধে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বিজয় সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জনৈক অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার হে? রাজা মহেন্দ্র সিংহ ও রাজ্ঞী কুসুম কুমারী কাহাকেও ত দেখিতে পাই না? আর এই চিতাকুণ্ডে যে সকল শবদাহ হইতেছে, ইহারাই বা কে? আর

ভৃত্যগণই বা আমাদের দেখিয়া পলায় কেন?" অনুচর উত্তর করিল, "রাজকুমার, আমরা ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তাঁহারা যখন এই রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সেই সময় নিকট স্থিত এক গৃহ হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। বিজয় সিংহ তৎক্ষণাৎ সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন।

গৃহের দ্বারের নিকট যাইয়া দেখেন, একটী রমণী পাগলিনীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছেন! মুখচন্দ্রমা মলিন, মস্তকের কেশ রাশি আলুলায়িত, চক্ষু দুইটী বিশাল ও রক্ত বর্ণ, অবিরত জলধারা বহিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, আলুথালু বেশ, নিকটে একখানি তরবারি পতিত রহিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে বিজয় সিংহ স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

সুন্দরী অপরিচিত পুরুষকে দ্বারের নিকটে দেখিবামাত্র ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন, এবং নিকটস্থিত অসি হস্তে লইয়া তার স্বরে বলিলেন, "রে মহারাষ্ট্রীয় পিশাচ, তুই এখান হতে দূর হ।" রাজকুমার সকরুণ স্বরে বলিলেন, "সুন্দরি, আমি মহারাষ্ট্রীয় নই।" তিনি এই কথা বলিতে না বলিতে, রমণী পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রে ছদ্মবেশী, আমি তোকে জানি, তুই যদি আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিস, তবে এই হস্ত স্থিত অসি দ্বারা আপন প্রাণ বিনষ্ট করিব।"

রাজকুমার দেখিলেন, বিষম বিপদ—উভয় সঙ্কট। যদি সুন্দরীকে কিছু বলিতে কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, তাহা হইলে হয় ত রমণী ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মহত্যা করিলেও করিতে পারেন, কিম্বা যদি একাকী রাখিয়া গমন করেন, তাহা হইলেও শোকে আত্মহত্যা করিতে পারেন, কোন দিকেই নিস্তার নাই। যাহা হউক, তিনি পরিশেষে "হত ইতিগজ" করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অনুচরবর্গকে সমস্ত বিষয় অবগত করিয়া মন্ত্রীকে আনয়নার্থে লোক প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন বুঝেছি।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজকুমার অন্তঃপুরস্থিত উদ্যানে প্রবেশ করত এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া নানা বিধ চিন্তা করিতেছেন। অনঙ্গপুরের রাজা কোথায়। এই অগ্নিকুণ্ডই বা কোথা হতে হলো? অন্যান্য রাজ পরিবারই বা কোথায়? রাজভৃত্যেরাই বা আমাদের দেখে পলায়ন করিল কেন? নাগরিকগণই বা আমাদের ভয়ে পলায় কেন? রাজ কর্ম্মচারীরাই বা কোথায়? আর সেই তেজস্বিনী রমণীই বা কে? রাজকুমার যখন এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন রক্ষকসহ অনঙ্গপুরাধিপতির মন্ত্রী উপস্থিত হইয়া কুমারকে অভিবাদন করিলেন। বিজয় সিংহ মন্ত্রীকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, আমি আপনাদের এখানে এসে সমূহ বিপদে পড়েছি। বোধ হইতেছে, আমি যেন কোন যাদুকরের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমার নিকটে সকলই অদ্ভুদ বোধ হইতেছে, আপনি বলুন দেখি, কি রূপে২ ঘটেছে?"

"রাজকুমার আপনি যে আমাদের

দেশে আগমন করেছেন, তাহা আমরা অবগত নই। গত রাত্রে যখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের সহিত আপনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন আমরা সৈন্য কোলাহল শুনে মনে করিলাম, বুঝি দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়গণ আমাদের পুরী প্রবেশ করিতেছে, আর প্রতিহারীরা আসিয়াও সেই সংবাদ রাজার নিকট দেয়। মহারাজ সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার মানসে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সপরিবারে চিতারোহণ করিলেন, আমরা খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম।

"কি সর্ব্বনাশ! তবে রাজা সপরিবারে দগ্ধ হয়েছেন?"

"তা ত দেখেইছেন।"

"তবে ভৃত্যেরা সকলে আমাদের দেখে পলায় কেন?"

"বোধ করি, আপনাদের মহারা ভেবেছে।"

"উপরের ঘরে যে একটী রমণী দেখিলাম, তিনি কে?"

"তাঁর কত বয়স হবে?"

"অনুমান ১৭।১৮ বৎসর।"

"তবে তিনি আমাদের রাজদুহিতা ক্ষীরোদ কামিনী, তিনি বড় অভিমানিনী।"

"আমাকে দেখে তিনি মহারাষ্ট্রীয় বোধে আত্মহত্যা করিতেছিলেন, আমি সেই জন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিয়াছি। অতএব আপনি সত্বর তাঁহার নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বলুনগে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ ক্রমে যাহা ঘটেছে, তজ্জন্য যেন তিনি শোকাকুলা না হন, আপনি যেয়ে তাঁকে একটুকু সান্ত্বনা করুন।"

"আমি এখনই চল্যেম।"

"আর দেখুন, তাঁকে যাতে কালই সারণ গড়ে আমাদের বাটীতে পাঠান হয়, এমত করিবেন। এখানে একদণ্ড তাঁহাকে একাকিনী রাখা যুক্তি সংগত হয় না। বিশেষ একাকিনী থাকিলে তাঁহার শোকের বৃদ্ধি বই কিছু হ্রাস হইবে না।"

"আপনার কবে যাওয়া হবে?"

"আমি বোধ করি, কল্যই গমন করিব।"

"কিছুকাল অপেক্ষা করে গেলে ভাল হতো না?"

"না এম্নিই আসতে যেতে কতদিন হবে, এতো আর নিকট নয়, তাতে সৈন্য সামন্ত কতগুলো সঙ্গে আছে।"

"আচ্ছা, কাল রাজনন্দিনীর সঙ্গে সৈন্যেরা সকল যাক, পরে আপনি রাজকার্য্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিয়ে কিছু দিন অন্তে গেলেই ত হবে।"

"বেস, তবে তাই হবে, শীত ঋতুটা এখানেই গত হলো।"

"তবে আসুন আমরা উভয়েই রাজনন্দিনীর ভবনাভিমুখে গমন করি।" ইহা কহিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী কে?

পূর্ব্বকালে চন্দ্রপুর অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সারণ গড় হইতে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান হওয়াতে রাজধানীস্থ সমস্ত ধনাঢ্য বণিকের বাসস্থান এই স্থলে ছিল। নগরের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত, এই নদীর সহিত মহানদীর সংযোগ থাকাতে বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া-

ছিল। নদীর উপরেই মন্ত্রীর প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান। বর্ষাকালে যখন নদীর জল বৃদ্ধি হওত উদ্যানের প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটগুলি জলে ডুবু২ হইত, তখন কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিত। মন্ত্রীর বাসস্থানের পশ্চাতেই প্রমোদবন, এই বনে নানা জাতীয় পক্ষী ও গৃহ-পালিত পশুগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। প্রমোদবনের মধ্য স্থানে একটী সুরম্য অট্টালিকা, তাহার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়। তাহার তীরস্থ লতা বল্লরী সকল ছিন্ন ভিন্ন ভাবে উক্ত জলাশয়ে পতিত হওয়াতে একটী পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইত। হঠাৎ সেই স্থানের মনোহর শোভা দৃষ্টি করিলে বোধ হইত, যেন বর্ষাকাল অন্তেই কোন পল্লীগ্রামের জঙ্গলময় প্রান্তরের মধ্যস্থিত কোন একটী জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। মন্ত্রীর প্রাসাদ হইতে এই স্থানে আসিবার জন্য একটী সং-কীর্ণ পথ ছিল, উহার দুই ধারে নিবিড় বিটপী পুঞ্জ শ্রেণী বদ্ধ ভাবে রোপিত থাকাতে সূর্য্যের প্রখর কিরণও তদ-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত না। গ্রীষ্মের আতিশয্য হইলে মন্ত্রীর পরি-বার স্থিত ব্যক্তিগণ সময়ে২ এই নির্জ্জন প্রদেশে বিশ্রামার্থ আগমন করিতেন। এই প্রমোদ বনের কিঞ্চিৎ উত্তরেই একটী বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সংলগ্ন উত্তর দিকে একটী বৃহৎ অরণ্য। সারণ গড়ের ও অন্যান্য নিকট স্থিত রাজারা এই বনে সময়ে২ মৃগয়ার্থ আগ-মন করিতেন।

নগরের পশ্চিম দিকে ভদ্র পল্লী ও প্রধান২ বণিকগণের বাসস্থান, তৎপরেই বাজার, এই স্থানে নানা দেশীয় ব্যব-সায়ীগণ পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ার্থ আগমন করিত। নগরের মধ্যে প্রশস্ত২ পরিষ্কৃত রাজপথ ও তাহার দুই ধারে পয় প্রণালী থাকাতে নগরটী অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। বাজারের কিঞ্চিৎ অন্তরেই কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী-দিগের বাসস্থান ছিল। নগরের পূর্ব্ব-দিকে প্রকাণ্ড মাঠ ও তাহার মধ্যে২ বিশৃঙ্খল ভাবে কৃষকদিগের পর্ণ কুটীর। সারণ গড়ে যাইবার জন্য এই মাঠের মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত রাজপথ ছিল।

বসন্তকাল উপস্থিত। প্রকৃতি দেবী নানা রূপ ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া পাড়া গেঁয়ে মেয়ের মত আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সুমধুর বসন্ত কাল, মধু-মাস—সকলই মধুময় বোধ হইতেছে। নানা জাতীয় বৃক্ষের নবীন পল্লব, নব-প্রস্ফুটিত পুষ্প, আম্রের মুকুল রাজি, বিহঙ্গগণের সুমধুর সঙ্গীত, মলয় সমীরণ প্রভৃতি বসন্তের চির সহচরগণ সকলই বিদ্যমান। বেলা অবসান প্রায়, দিন-নাথ অস্তাচল চূড়াবলম্বী, রৌদ্রের আর সে তেজ নাই, দুই একটী উচ্চ বৃক্ষের মস্তকোপরি অল্প২ রৌদ্র দৃষ্টি গোচর হইতেছে। পশ্চিমাকাশে রক্তবর্ণ মেঘ, মৃদুমন্দ মলয় মারুৎ ধীরে২ বৃক্ষের পল্লব গুলি কাঁপাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করি-তেছে। এই সুমধুর প্রশান্ত সময়ে একটী নবীনা রমণী সহচরী সঙ্গে মন্ত্রীর প্রমদোদ্যানে পুষ্প বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন।

এই ভুবন মোহিনী কে? পাঠক এক বার প্রশান্ত মনে চেয়ে দেখ। যেমন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে প্রভূত জল রাশি পবনবেগে তরঙ্গাকুলিত ও বক্রভাবে পতিত হইয়া বেগে পাতাল অভিমুখে

ধাবিত হয়, সেই রূপ সুন্দরীর মস্তকের উপরিভাগ হইতে নীল নিবিড় কেশ রাশি আকুঞ্চিত ভাবে কর্ণের উপরি ভাগ দিয়া মৃত্তিকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। প্রশস্ত ললাটদেশে ক্ষুদ্র২ মুক্তার ন্যায় বিন্দু২ ঘর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হইতেছে, চক্ষু দুইটী ঈষৎ রক্তিম। কিন্তু স্থির স্নিগ্ধ ও রসাল অথচ কোন রূপ মদন রস তাহাতে লক্ষিত হইতেছে না; নয়নে অঞ্জন নাই, কিন্তু নীল তারা এবং সূক্ষ্ম২ নীল নিবিড় পক্ষ্মাবলী অঞ্জনের কার্য্য করিতেছে। শারদীয় চন্দ্রমার জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রশান্ত ও সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি, তোমার উপরে সেই দৃষ্টি পড়িলে তুমি জানিতে পার, ললনার অন্তঃকরণ কি রূপ সরল ও নির্ম্মল। সেই দৃষ্টি দেখিলে তোমার মনে বাৎসল্য স্নেহ ভিন্ন অন্য কি ভাব হইতে পারে? কারণ তোমার বয়স কিঞ্চিৎ আশাতিরিক্ত অধিক, রক্তের তত তেজ নাই, অথচ অকর্ম্মণ্য বিলাসীগণের ন্যায় তোমার স্বভাব চঞ্চল নয়, কিম্বা তোমার চক্ষুতে কোন দোষ স্পর্শে নাই। কিন্তু একজন প্রকৃত যুবকের উপর সেই দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার মন কি রূপ হয়, আমরা তাহা বলিতে পারি না, কারণ সে রূপ যন্ত্রণায় কোন দিন পড়ি নাই। চক্ষুর উপরি ভাগে দ্বিতীয়া চন্দ্রমাকৃতি সুচিক্কণ রেখা, তদূর্দ্ধে নীল নিবিড় ভ্রূযুগ মধ্য স্থানে ঈষৎ বক্র হইয়া কর্ণদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত অথচ তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। ওষ্ঠ দুই খানি লাল, কিন্তু চিনে সিঁদুর পলাসপুষ্প কিম্বা বিম্বফল যে রূপ লাল, এ সে লাল নহে, সতেজ ও সদ্য প্রস্ফুটিত শাল্মলি ফুলের যে লাল, এ সেই লাল। গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ সরু, কিন্তু সরল নয়, দুই একটী রেখাযুক্ত এবং ঈষৎ বঙ্কিম। নাসিকাটী নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ, নিটোল কিন্তু অগ্রভাগ ঈষৎ বর্দ্ধিষ্ণু। সুন্দরীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ, নব-যৌবন, বর্ষাকাল উপস্থিত, নদীতে নূতন জল পড়িতেছে কিন্তু এখনও আড়ি ঝাঁপিতে অনেক বিলম্ব। পাঠক, এরূপ অপূর্ব্ব রূপ তোমার নিকট ভাল লাগিতেছে, কারণ তুমি নীল কুঠীতে কোন দিন চাকরী কর নাই। তুমি পুষ্পের সৌরভ ভাল বাস? না ভয় করিতেছ, পাছে তাহার তীব্র ঘ্রাণে মাথা ধরিবে। দর্শন করিতেও ভাল বাস না, কারণ তা হলে তোমার চাল্‌সে বৃদ্ধি হবে। তবে কিছুই আবশ্যক নাই, মনে মনেই ধারণা কর। আমি যদি বলি, সিন্দূরে আমের মত সুন্দরীর বর্ণ, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই ভাল বাসিবে, কারণ এতে দন্তের সাহায্য আবশ্যক করে না, তথাচ খাইতে না জানিলে রস সমস্ত চুঁইয়া পড়ে, কিন্তু এ তাও নয়; তার চেয়ে একটু ঘোর, সূর্য্যমুখী ফুল কখন দেখেছ? এ সেই রঙ্গের অথচ তত উজ্জ্বল কান্তি নহে। সুন্দরীর ভুবন মোহিনী রূপ, তাতে আবার সায়ংকালীন পশ্চিমাকাশের লাল মেঘের আভা তাঁহার শরীরের উপর প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আরও উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছে।

তিনি ধীর স্বভাবা অথচ অলস নহেন, অনুৎকণ্ঠিত অথচ অমনোযোগী নহেন, আগ্রহ বিহীনা অথচ অনুৎসাহিনী নহেন, সুমিষ্টভাষিণী অথচ প্রগল্‌ভার ন্যায় অতিভাষিণী নহেন, সরল অথচ লঘু প্রকৃতি নহেন। যেমন বাহ্যিক আকৃতি সরল ও সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ, অন্তরও তেমনি সরল এবং নির্ম্মল।

সুন্দরীর অঙ্গে তাদৃশ কোন অলঙ্কার ছিল না। মস্তকে একটী পুষ্পের গুচ্ছ অর্দ্ধ বেষ্টিত, গলদেশে একটী পুষ্পের হার, কর্ণে দুইটী হীরক কুণ্ডল এবং হস্তে দুই গাছি স্বর্বণ বলয়। বসন্তকাল, কুসুম বর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, তম্মধ্য হইতে নবযৌবন সহাস্য মুখে কিঞ্চিৎ অলক্ষিত ভাবে উকি মারিতেছে, সকল সৌন্দর্য্য এই স্থানেই। রমনী আলবালে জল সেচন করিতে২ মৃদুস্বরে সঙ্গিনীকে কি বলিতেছেন।

"সখি, হেমলতে, দেখ বসন্তকালে বাগানের প্রায় সকল বৃক্ষের গাত্রেই ফুল ফুটেছে, এই মাধবীলতাটীর আজও ফুল ফুটছে না কেন?" হেমলতা ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, "মন্ত্রি নন্দিনি! এই লতা গাছটি আপনি স্বহস্তে রোপণ করেছিলেন, তা আপনার ফুল না ফুটলে কি এর ফুল ফুট্তে পারে?"

হেমলতার এই কথাতে মন্ত্রী নন্দিনীর গণ্ডদেশে ঈষৎ রক্তিম আভা প্রকাশ পাইল এবং চক্ষু দুইটি সজল হইয়া আসিল তিনি অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সখি যাবে না? সন্ধ্যা হলো, বউ হয়ত কত বকবেন?"

তাঁহারা উভয়ে যখন এই রূপ কথা বার্ত্তা করিতেছিলেন, সেই সময় মন্ত্রী ও কুমার বিজয় সিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করত মন্ত্রীর প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে হেমলতা মন্ত্রীনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখি, এই দিক দেখেছো এক যুবাবীর পুরুষ মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমাদিগের বাটীর দিকে যাইতেছেন। আহা কি মনোহর রূপ!" তচ্ছ্রবণে মন্ত্রিতনয়া ঈষৎ মস্তকোত্তলন ও বক্রগ্রীব হইয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এই সময় বিজয় সিংহও দৃষ্টিপাত করিলেন, সর্ব্বনাশ হইল। চারি চক্ষু একত্র হইল। মন্ত্রীনন্দিনী তৎক্ষণাৎ লজ্জিত ভাবে অধো দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার গাত্র হইতে প্রভূত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, তিনি পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীনন্দিনী কিয়ৎকাল এতদবস্থায় থাকিয়া সখিকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার যদি এখানে কায থাকে, তবে তুমি থাক, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া পুনরায় অলক্ষিত ভাবে বঙ্কিমনয়নে একবার পথ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন, হেমলতা ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন, "দেখা যাবে" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরাও এই বেলা পাঠকগণকে বলিতেছি, দেখা যাবে।

আমরা জাতি ভিক্ষুক।

ভূমণ্ডলের সমুদায় কার্য্যই যত্নসাপেক্ষ। সর্ব্ব দেশীয় বিখ্যাতকর্ম্মা পুরুষদিগের জীবন চরিত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রগাঢ় যত্ন ও একাগ্রতা তাঁহাদিগের উন্নতির প্রধান কারণ। কি রণক্ষেত্র, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান চর্চ্চা, কি পরোপকার, কি অন্য কোন বিষয়, কোথাও একাত্ম-হৃদয়ে যত্নব্যতীত কেহ পারগতা লাভ করিতে পারেন নাই।

কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে২ তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ভেদ হয়। ভুবনবিখ্যাত সর আইজাক নিউটন কহিতেন, "আমি সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে একাগ্রচিত্তে এক বস্তুর প্রতি অভিনিবিষ্ট হইতে পারি, সাধারণ লোক সহ আমার এই পার্থক্য।" অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে।

যত্ন ও একাগ্রচিত্ততা প্রয়োজনমূলক। প্রয়োজন দুই ভাগে বিভক্ত; স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। জন্তু সাধারণের আহার্য্য পানীয় প্রভৃতি প্রথমোক্ত স্থলের উদাহরণ; আর পণ্ডিতের গ্রন্থ, মদ্যপায়ির মদ প্রভৃতি শেষোক্ত স্থানের উদাহরণ। শারীরিক প্রয়োজনোপযোগী বস্তুর জন্য যত্ন আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। ক্ষুধার্ত্তের ভোজ্য, রোগীর ঔষধ, শীতপ্রপীড়িতের বস্ত্র, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপদগ্ধের বৃক্ষচ্ছায়া ও নবযুবকের কামিনী অনুসন্ধান আপনা হইতেই হইয়া থাকে। সময় বিশেষে এই সকল নিতান্ত আবশ্যকীয় উপকরণের জন্য এত ব্যাকুল হই যে, উন্মত্ত লোক-সহ আমাদিগের কোন প্রভেদ থাকে না। যতই তাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, আমাদিগের ব্যাকুলতা ও যত্নের ততই আধিক্য হইয়া থাকে; সুতরাং সেই পরিমাণে মনোবৃত্তি পরিচালিত ও তৎসহ উন্নতি হয়। জেনী পীড়িতা হইলে সূত্রাভাবে আর্কারাইটের দিনপাত অতি ক্লেশকর হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি একাগ্র চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে স্পিনিং জেনী (সূতার কল) উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় ইংলণ্ডে ভিক্ষা প্রণালি প্রচলিত থাকিলে, কখনই এই গুরুতর ব্যাপার উদ্ভাবিত হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, লোকের যত প্রকার কৃত্রিম অভাব আছে, তন্মধ্যে সম্মানাকাঙ্ক্ষাই সর্ব্ব প্রধান। এই সম্মানাকাঙ্ক্ষা চারি ভাগে বিভক্ত। যথা প্রাধান্যেচ্ছা, * যশোলিপ্সা, † অভিমান, ‡ বৃথাগর্ব্ব §।

এই চারিটীর মধ্যে প্রাধান্যেচ্ছা, যশোলিপ্সা ও অভিমান, এই তিনই অনেক সময়ে লোককে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় ও উন্নতির পথে লইয়া যায়। এক প্রাধান্যেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কতশত লোক কত দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে; আবার তাহার দ্বারা জনসাধারণের কত উপকার সাধিত হইতেছে। অধুনাতন যুদ্ধ বিদ্যা সংস্কারক

* প্রাধানেচ্ছা তিন ভাগে বিভক্ত, অন্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের ইচ্ছা (Ambition) অন্যাপেক্ষা গুণবত্তা দেখাইবার ইচ্ছা (Emulation) হিংসা (enmy।)

† Love of Approbation.

‡ Pride. § Vanity.

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারক **ভাস্কডিগামা** ও আমেরিকা আবিষ্কারক **ক্রাইষ্টফর কলম্বস** প্রভৃতি বিখ্যাত নামা মহাপুরুষগণ সকলেই এক মাত্র প্রাধান্যেচ্ছা পরতন্ত্র হইয়া উক্ত রূপ কার্য্য নিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালে তাহা হইতে সাধারণ মানব মণ্ডলীর কত উন্নতি সাধন হইয়াছে।

যদিও ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা বিষ্ণুপ্রীতিকামে সমুদায় কার্য্য উৎসর্গ করিতে উপদেশ দেন, তথাপি এ কথা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহাদিগের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। চীনদেশ হইতে পেরু এবং রুসিয়া হইতে কুমারিকা ও হরণ অন্তরীপ পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ মহীমণ্ডলের যে দেশে মহতী কীর্ত্তি লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই (অধিকাংশ কেন, সমস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।) ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইবার উদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। অধুনাতন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দেশহিতকর কার্য্য দর্শন করিলে আমাদিগকে **ভারত-নক্ষত্র, রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর** প্রভৃতি উচ্চউচ্চ উপাধি প্রদান করেন বলিয়াই আমরা কত প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া থাকি। দিন২ বঙ্গদেশে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও প্রশস্ত রাজমার্গের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইতেছে। একাগ্র সম্মান ইচ্ছাই ইহার প্রধান কারণ।

অভিমান লোকের কত সময়ে কত উপকার সাধন করে, তাহা বলা যায় না। অভিমানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যককেই কুকর্ম্মাশক্ত দেখা যায়। বিশেষ গুণ না থাকিলে লোকে অভিমান করে না। পাছে আমার সম্মান হানি হয়, এই বলিয়া আমরা অনেক সময় দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হই। সতী স্ত্রী, অভিমানিনী হয়। কিন্তু ভ্রষ্টা স্ত্রীর কে কোথায় অধিক পরিমাণে অভিমান দেখিয়াছেন? সতী অনায়াসে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি অপমান সহ্য করেন না। সেক্সটস্ টারকুইন কর্ত্তৃক লুক্রিসিয়ার অপমান এবং তজ্জন্য আত্মহত্যাই রোমের স্বাধীনতা ও তৎসহ অশেষ উন্নতির কারণ। অভিমানপরায়ণ হইয়া লোকে আত্মহত্যা এবং গর্হিত আত্মজ বিনাশ প্রভৃতি কোন কার্য্যই করিতে ইতস্তত করে না। সত্য বটে, সময়ে সময়ে এতদ্দ্বারা রাজপুতদিগের কন্যাবধের ন্যায় অনেক অপকর্ম্ম সাধিত হয়, কিন্তু লোক সাধারণের অনিষ্ট, চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কোন অপকর্ম্ম কখনই সাধিত হয় না। সকল বিষয়েরই দুইদিক আছে। সুতরাং অভিমানেরও উপকার অপকার, দুই ফলই আছে। কিন্তু অপকার অপেক্ষা উপকারের পরিমাণ অশেষ গুণে অধিক। কিন্তু তৃণ অপেক্ষাও লঘু ভিক্ষুকের অভিমান বা সম্মান ইচ্ছা কোথায়?

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ভরই যে সমুদায় উন্নতির মূল, ইংলণ্ড প্রভৃতি কতিপয় দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। ইংলণ্ডে **জ্যেষ্ঠত্বাধিকার** নিয়ম প্রচলিত থাকায় ধনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু অন্য সন্তানেরা, ভবিষ্যতে আত্মভরণ পোষণ করিতে হইবে, ভাবিয়া সাধ্যানুসারে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে ও গুণবান্ হইতে যত্নশীল হয়েন। এই

জন্যই ইংলণ্ডে ধনি লোকের জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্যান্য পুত্রদিগের মধ্যে এত প্রধান ব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে একান্নভুক্ত পরিবার, পুত্রদিগের মধ্যে পিতৃ সম্পত্তি সমবিভাগ ও ভিক্ষাব্যবসায় প্রণালী প্রচলিত থাকাতে এই আত্ম-নির্ভরের ভাব হ্রাস হইয়া কেমন বিষময় ফল প্রসব করিতেছে!

চতুর্থতঃ, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা অলিসন বলেন, পূর্ব্ব সম্মানবিস্মৃতি জাতি সাধারণকে অবনত করে। রোম সাম্রাজ্য বিনাশ হইলে তথাকার সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা অতি হীনাবস্থাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে বিদ্যা চর্চ্চা বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা যখন ভূত ঘটনা অবগত হইলেন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের বিনাশ সংকল্প ফরাশি দেশীয় ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন। বিখ্যাত কার্থেজ নগরের ইদানীন্তন অধিবাসিগণ পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই জ্ঞাত নহে, এই জন্যই এত হীনাবস্থায় বাস করিতেছে। যদিও প্রাচীন আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব গৌরব একবারে বিস্মৃত হন নাই, এবং এই জন্যই পুনরায় বীরকুণ্ডল স্পন্দন করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জাতি ভিক্ষুকদিগের বংশাবলীর এরূপ গৌরবের কি কিছু আছে? বোধ হয়, সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন,—না।

এই জাতিভিক্ষুকদিগের দ্বারা আমাদের সমাজে যে কত অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ, জাতি ভিক্ষুক হওয়াতে কোন সত্য ব্যবস্থা পাইবার উপায় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল, জৈনদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তখন পণ্ডিতবর ই, বি, কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কালেজের অধ্যাপকগণ কোন পক্ষের নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহা সাহেব মহোদয় প্রদত্ত ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য হইয়াছিল। কাউয়েল সাহেব প্রথমতঃ আপনার ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দৃষ্টি করিয়া কালেজের পুস্তকাগার হইতে পুস্তক অনুসন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানে দেখিলেন যে, তাঁহার ব্যবস্থাই ভুল হইয়াছে। তৎপরে বাটী যাইয়া আপনার পুস্তক দেখিয়াই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, অধ্যাপকগণ অর্থ-লোলুপ হইয়া কল্পিত শ্লোক দ্বারা কলেজের গ্রন্থকে রূপান্তরিত করিয়াছে। এই ঘটনা বশতঃ কাউয়েল সাহেব অধ্যাপকদিগের ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষমতা একবারে রহিত করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, পুরুষানুক্রমিক ভিক্ষা ব্যবসায়ী না হইলে এরূপ গর্হিত অন্যায়াচরণ হইত না। পক্ষান্তরে ইউরোপখণ্ডে কোন এক বিষয়ের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে, তথাকার পণ্ডিতগণ, যাহাতে সত্য নিরূপণ হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন করেন।

কুলীন ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করেন না। বিবাহ কালীন অর্থগ্রহণ এবং বিবাহান্তেও পত্নী ও তদীয় অভিভাবকগণের নিকট অর্থ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাই তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয়। সৌভাগ্যের বিষয়, দিন দিন এইরূপ ভিক্ষুক সংখ্যার হ্রাস হইতেছে,

তথাপি পল্লীগ্রামে আজও এমন অনেক লোক আছে ; কৌলীন্য নিবন্ধন লৌকিকতা গ্রহণই যাঁহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। সকলেই অবগত আছেন, পরিবারস্থ কোন এক জনের বিবাহ দিতে হইলে মানী বা কৃতী লোকদিগকেও ইহাঁদিগের নিকট কত অপমান সহ্য করিতে হয়। বিবাহিত পাত্রও সময়ে২ ইহাদিগের অনুরোধে শ্বশুরালয়ে জল গ্রহণ করে না।

এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য জাতি ভিক্ষুকদিগের সংখ্যা আমরা দিন২ কত দেখিতে পাই। তাহারা ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। এবং সত্য সত্যই মনে ভাবে, জনসাধারণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, রামায়েৎ, ফকির প্রভৃতি কত দলেই ইহারা বিভক্ত। কেহ বা হস্তীপৃষ্ঠে ডঙ্কা বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে যায়, কেহ বা বাদ্য বাজাইয়া, কেহ বা সংগীত করিয়া কেহ বা নৃত্য করিয়া ভিক্ষা করে। কেহ বা ঊর্দ্ধ হস্তে, কেহ বা দিগম্বর বেশে ভিক্ষা করিয়া থাকে। কোন২ ব্যক্তি মনোমত ভিক্ষা না পাইলে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করে। যেরূপ তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা এক মাসের প্রাপ্য সংবাদ এক মুহূর্ত্তেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ প্রতিগ্রামে ভিক্ষা ব্যবসায়িদিগের বাস থাকায়, বহু দূর ব্যবধান কোন স্থানে শ্রাদ্ধ বা অন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে দান হইবার সংবাদ অত্যল্প কালে প্রদেশস্থ সমস্ত ভিক্ষুকে পাইয়া থাকে।

এই সকল প্রকাশ্য ভিক্ষুক ব্যতীত প্রচ্ছন্ন ভিক্ষুক যে আর কত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে এক জন ক্ষমবান হইলে, স্বজনগণের অনেকেই তাঁহার অন্ন ধ্বংস করেন। বৃদ্ধাস্ত্রী লোকদিগের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে শৈশবে ক্রোড়ে করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহার স্বর্গীয় মাতা পীড়িত হইলে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহার কল্যাণে সোমবার ও মঙ্গলবার করিয়া থাকেন, এই সকল কারণে তাঁহার অর্থ-শোষণ করণের প্রয়াসী হন।

এতদ্ব্যতীত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, সম্বন্ধীয় প্রভৃতির ত কথাই নাই।

এই সকল কারণ নিবন্ধন সামান্য লোকদের মধ্যে পারিতোষিক (বক্‌সিস্) প্রার্থনা এতই প্রবল হইয়াছে যে, লিখিয়া শেষ করা যায় না। কোন একটী শুভকর্ম্ম বা কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, চৌকিদার, বেহারা, মেতর প্রভৃতি কেহই সাধ্যানুসারে আমাদিগের অর্থশোষণ করিতে ত্রুটি করে না।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই, ভিক্ষা প্রথা বঙ্গদেশে এত প্রবল হইয়াছে যে, জন্ম, অন্ন-প্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের সময়েই লৌকিকতা স্বরূপ অর্থ গ্রহণ জাতীয় প্রথা বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের সমাজ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যায়, তাহারা অতি সামান্য কার্য্য দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তথাপি কেহ ভিক্ষাচ্ছলে কখনই আত্মীয় স্বজনের অন্ন গ্রহণ করিবে না। এমন কি, সামান্য অবস্থাপন্ন পিতাও ঐশ্বর্য্যশালী পুত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধনের বা

সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কষ্টেও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তথাচ কখন অন্যের প্রত্যাশাপন্ন হইবে না। বোধ হয়, এই রূপ স্বাবলম্বন প্রথা প্রচলিত থাকাতেই আমরা ইংলণ্ডে হন্টর প্রভৃতির ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি সকল দেখিতে পাইয়া থাকি।

হায়, আমাদিগের দেশ হইতে এই সকল কুপ্রথা কত দিনে সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত হইবে, এবং কত দিনেই বা আমরা আপনার উপর আপনি নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়া উন্নত হইব? আমাদিগের দেশের ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা, যদি সেই সমস্ত ভূমি উত্তম রূপে আবাদ হইয়া আসিত, যে সকল লোক ভিক্ষোপজীবী, তাহারা যদি ঘৃণিত ভিক্ষা-বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত তাহা হইলে এক বৎসর শস্য না হওয়াতে দেশে কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারিত না। হে বঙ্গবাসিগণ! ঈশ্বর তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শাস্তি দিতেছেন, তথাপি কি তোমাদিগের চৈতন্যোদয় হইল না? একবার সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রকৃত মনুষ্যের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব আহার্য্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও; দেখিবে, আর ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য থাকিবে না। ভিক্ষা কি সুলভ ও সুখের বিষয়? বোধ হয়, বলিবে—না। তবে কেন উহা অবলম্বন করিয়া তৃণাপেক্ষা লঘু হইয়া থাকিবে? দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উহা একবারেই পরিত্যাগ কর। ভিক্ষা করিতে কি শ্রম হয় না? আমাদের বোধ হয়, উহাতে যত শ্রম হয়, তদপেক্ষা অল্প শ্রমে কৃষি ও শিল্পাদি দ্বারা সুচারু রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, দেশেরও ধনভাগ বৃদ্ধি হয়। ভিক্ষা করিতে যে শ্রম হয়, সেই শ্রম দ্বারা জগতের কিছুই হিত সাধিত হয় না, বরং তদ্দারা সংসারের ধনভাগ হ্রস্বই হইয়া যায়। আর এই কার্য্য দ্বারা আপনাকেও যার পর নাই অপমানিত হইতে হয়। অতএব পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তোমরা ভিক্ষা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি ও শিল্পকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে এবং জগতেরও ধনভাগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

সূর্য্যঘড়ি।*

পূর্ব্বপত্রে আমরা—"মিনিটের" প্রভেদ ক্রমে সমীকরণের নির্ঘণ্ট প্রদর্শন করিয়াছি, এবারে প্রতিদিন কি পরিমাণে প্রভেদ হয়, তাহারই এক নির্ঘণ্ট নিম্নে লিখিত হইল।

এই নির্ঘণ্টের মধ্যে (+) ও বিয়োগের (—) চিহ্ন দেওয়া গেল, অতএব তাহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যঘড়ির সময়ের সহিত সময়ের সমীকরণ + থাকাতে ২৫ এ ডিসেম্বর হইতে ১৫ ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ও ১৬ ই জুন হইতে ৩১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত যোগ, আর(—)থাকাতে ১৬ ই এপ্রিল হইতে ১৫ ই জুন পর্য্যন্ত ও ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ২৪ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিয়োগ করিয়া লইয়া সাধারণ ঘড়ি মিল করিবে।

* জ্ঞানাঙ্কুরের ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠার ১ম সারি দেখ।

জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিবসের সময়ের সমীকরণ।

তারিখ	জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অকটোবর		নবেম্বর		ডিসেম্বর	
১	৩′	২১″ +	৬′	১″ +	০′	৩″ —	১০′	১৪″ —	১৬′	১৫″ —	১০′	৪৯″ —
২	৩	৩২	৫	৫৭	০	২২	১০	৩৩	১৬	১৬	১০	২৬
৩	৩	৪৪	৫	৫৩	০	৪১	১০	৫১	১৬	১৭	১০	৩
৪	৩	৫৫	৫	৪৮	১	১	১১	১০	১৬	১৬	৯	৩৯
৫	৪	৫	৫	৪৩	১	২০	১১	২৮	১৬	১৫	৯	১৪
৬	৪	১৫	৫	৩৬	১	৪০	১১	৪৬	১৬	১৩	৮	৪৯
৭	৪	২৫	৫	৩০	২	০	১২	৩	১৬	১০	৮	২৩
৮	৪	৩৫	৫	২৩	২	২০	১২	২০	১৬	৬	৭	৫৭
৯	৪	৪৪	৫	১৫	২	৪১	১২	৩৬	১৬	১	৭	৩০
১০	৪	৫৩	৫	৬	৩	১	১২	৫২	১৫	৫৬	৭	৩
১১	৫	১	৪	৫৮	৩	২২	১৩	৮	১৫	৪৯	৬	৩৬
১২	৫	৯	৪	৪৮	৩	৪৩	১৩	২৩	১৫	৪২	৬	৮
১৩	৫	১৭	৪	৩৮	৪	৪	১৩	৩৭	১৫	৩৪	৫	৩৯
১৪	৫	২৪	৪	২৮	৪	২৪	১৩	৫১	১৫	২৫	৫	১০
১৫	৫	৩১	৪	১৭	৪	৪৫	১৪	৪	১৫	১৫	৪	৪১
১৬	৫	৩৭	৪	৫	৫	৬	১৪	১৭	১৫	৪	৪	১২
১৭	৫	৪৩	৩	৫৩	৫	২৭	১৪	২৯	১৪	৫৩	৩	৪৩
১৮	৫	৪৮	৩	৪০	৫	৪৮	১৪	৪১	১৪	৪০	৩	১৩
১৯	৫	৫৩	৩	২৭	৬	৯	১৪	৫২	১৪	২৭	২	৪৩
২০	৫	৫৭	৩	১৪	৬	৩০	১৫	৩	১৪	১৩	২	১৩
২১	৬	০	৩	০	৬	৫১	১৫	১২	১৩	৫৮	১	৪৩
২২	৬	৩	২	৪৫	৭	১২	১৫	২২	১৩	৪২	১	১৩
২৩	৬	৬	২	৩০	৭	৩৩	১৫	৩০	১৩	২৬	০	৪৩
২৪	৬	৮	২	১৫	৭	৫৪	১৫	৩৮	১৩	৯	০	১৩
২৫	৬	৯	১	৫৯	৮	১৪	১৫	৪৫	১২	৫১	০	১৭+
২৬	৬	১০	১	৪৩	৮	৩৪	১৫	৫২	১২	৩২	০	৪৭
২৭	৬	১০	১	২৬	৮	৫৫	১৫	৫৭	১২	১৩	১	১৬
২৮	৬	৯	১	৯	৯	১৫	১৬	২	১১	৫৩	১	৪৬
২৯	৬	৮	০	৫১	৯	৩৫	১৬	৭	১১	৩২	২	১৫
৩০	৬	৬	০	৩৩	৯	৫৪	১৬	১০	১১	১১	২	৪৪
৩১	৬	৪	০	১৫			১৬	১৩			৩	১৩

জানুয়ারি মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিবসের সময়ের সমীকরণ।

তারিখ	জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন	
১	৩′	৫০′+	১৩′	৫৭″+	১২′	৪২′+	৪″	৪″+	৩′	১″—	২′	৩৬″—
২	৪	১৯	১৪	৪	১২	৩০	৩	৪৬	৩	৮	২	২৭
৩	৪	৪৭	১৪	১১	১২	১৭	৩	২৮	৩	১৫	২	১৮
৪	৫	১৪	১৪	১৭	১২	৪	৩	১০	৩	২২	২	৮
৫	৫	৪১	১৪	২২	১১	৫০	২	৫২	৩	২৮	১	৫৮
৬	৬	৮	১৪	২৬	১১	৩৬	২	৩৪	৩	৩৩	১	৪৮
৭	৬	৩৪	১৪	২৯	১১	২২	২	১৬	৩	৩৮	১	৩৭
৮	৭	০	১৪	৩২	১১	৭	১	৫৯	৩	৪৩	১	২৬
৯	৭	২৫	১৪	৩৪	১০	৫১	১	৪২	৩	৪৬	১	১৫
১০	৭	৪৯	১৪	৩৫	১০	৩৬	১	২৫	৩	৪৯	১	৪
১১	৮	১৩	১৪	৩৫	১০	২০	১	৯	৩	৫২	০	৫২
১২	৮	৩৭	১৪	৩৫	১০	৪	০	৫২	৩	৫৪	০	৪০
১৩	৮	৫৯	১৪	৩৩	৯	৪৭	০	৩৬	৩	৫৫	০	২৮
১৪	৯	২২	১৪	৩১	৯	৩০	০	২১	৩	৫৬	০	১৫
১৫	৯	৪৩	১৪	২৯	৯	১৩	০	৫	৩	৫৬	০	৩
১৬	১০	৪	১৪	২৫	৮	৫৬	০	৯—	৩	৫৬	০	১০+
১৭	১০	২৪	১৪	২১	৮	৩৮	০	২৪	৩	৫৫	০	২৩
১৮	১০	৪৪	১৪	১৬	৮	২০	০	৩৮	৩	৫৩	০	৩৬
১৯	১১	৩	১৪	১১	৮	৩	০	৫২	৩	৫১	০	৪৯
২০	১১	২১	১৪	৫	৭	৪৫	১	৫	৩	৪৮	১	২
২১	১১	৩৮	১৩	৫৮	৭	২৬	১	১৮	৩	৪৫	১	১৫
২২	১১	৫৫	১৩	৫১	৭	৮	১	৩০	৩	৪১	১	২৮
২৩	১২	১১	১৩	৪৩	৬	৫০	১	৪২	৩	৩৭	১	৪১
২৪	১২	২৬	১৩	৩৪	৬	৩২	১	৫৪	৩	৩২	১	৫৪
২৫	১২	৪০	১৩	২৫	৬	১৩	২	৫	৩	২৭	২	৭
২৬	১২	৫৩	১৩	১৫	৫	৫৫	২	১৫	৩	২১	২	২০
২৭	১৩	৬	১৩	৪	৫	৩৬	২	২৫	৩	১৪	২	৩৩
২৮	১৩	১৮	১২	৫৩	৫	১৮	২	৩৫	৩	৮	২	৪৫
২৯	১৩	২৯			৪	৫৯	২	৪৪	৩	০	২	৫৭
৩০	১৩	৩৯			৪	৪১	২	৫৩	২	৫৩	৩	৯
৩১	১৩	৪৮			৪	২২			২	৪৫		

মসলা বাঁধা কাগজ।

ভূমিকা।

এক দিবস গ্রীষ্ম কালের অপরাহ্ণে আমরা কাশিম বাজারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। অন্যান্য অনেক স্থান দেখিয়া একটী বৃহৎ অথচ ভগ্ন গৃহে প্রবেশ করিলাম। সেই বৃহৎ পুরীতে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করে। তাহার নিকটে গৃহটী দেখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায়, সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত দেখাইল এবং ঐ স্থানের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক কথা বলিল—ভূত, প্রেত সম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য গল্প করিল। সেই গৃহের একটী জীর্ণ কক্ষের এক কোণে অনেক গুলি কাগজ একত্র করা ছিল। কাগজ গুলি কিসের, তাহা জানিতে কৌতূহল হইল। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল—"বাবা, আমি গরিব মানুষ; কাগজ পত্র যেখানে যাহা পাই, কুড়াইয়া রাখি, সময়ে২ দোকানীরা মসলা বাঁধিবার জন্য ক্রয় করে। পরশ্ব দিবস ঐ কাগজ গুলি পাইয়াছি। সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কোন বেণের কাছে বিক্রয় করিব। এ কাগজ গুলি অনেক ভাল—গত বৎসর দুই ব্যক্তি এই বাড়ীতে বাসা লইয়াছিল, বোধ হয়, তাহাদেরই হইবে। তাহারা দুই জনেই বসন্ত রোগে মরিয়াছে। তা বাবা, এ কাগজ গুলি খুব জীর্ণ নয়, তাহাতেই যত্ন করিয়া রাখিয়াছি—কিছু অধিক দাম হইতে পারে।"

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া নিবৃত্ত হইতেছিলাম, এমন সময় একটী কবিতা মনে হইল——

"যে খানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলেও পেতে পার লুকান রতন।"

কবিতাটী কোথায় পড়িয়াছিলাম, মনে হয় না; কিন্তু তখন অকস্মাৎ মনে পড়িল। একখানি কাগজ তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, আরও পড়িতে ইচ্ছা হইল। তখন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কাগজ গুলি লইয়া দোকানী কত দিবে?" বৃদ্ধা বলিল, "এত গুলি কাগজে এক পয়সা হয়। এ গুলি অনেক ভাল, দোকানী দুই পয়সা দিলেও দিতে পারে।"

আমি তখন পকেট্ হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিয়া, সেই কাগজ গুলি লইলাম। এক পয়সার কাগজের মূল্য স্বরূপ এক টাকা পাইয়া বৃদ্ধা কত আশীর্ব্বাদ করিল।

বাটী আসিয়া সেগুলি খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে নানাবিধ জিনিস্ আছে—এক টুক্‌রা ফরাশী ছিট্, গুটিকত শুষ্ক লঙ্কা, কয়খানি জমাওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর খান কত জীর্ণ পত্র, একখানি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বস্ত্রখণ্ডে কতকগুলি হরিদ্রার গুঁড়া, একখানি ছোট সমুদ্রের ফেণ ইত্যাদি এবং কয়েকটী রচনা। রচনা গুলির অনেক স্থান পড়িতে পারা যায় না—বহুকষ্টে একরূপ সারোদ্ধার করিয়াছি। সেই রচনা গুলি এক এক করিয়া 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি। আমি এক টাকা দিয়া এগুলি লইয়া ঠকিয়াছি কি না—এগুলি মসলা বাঁধিবারই যোগ্য কি পাঠ করিবার উপযুক্ত, তাহা বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমার টাকাটী বৃথায় না যায়,

এই জন্য আমি প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

এই স্থানে আর এক কথা বলিয়া রাখা উচিত। ইহার মধ্যে কোন স্থানে ন্যায় বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহার জন্য আমাকে দায়ী করিবেন না, যে গালি গালাজ করিতে হয়, তাহা অজ্ঞাত রচয়িতার উদ্দেশে করিবেন। ইতি।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম কি?

এক জনের অথবা বহুজনের অধীনতা স্বীকার করা মনুষ্যের স্বভাব—উপাসনা মনুষ্যের ধর্ম্ম। পরের অধীন হইয়া সংসারে আসিয়াছি, অন্যথা শৈশবেই গতাসু হইতাম। বয়োবৃদ্ধিসহকারে দেখিতে পাই, পরের উপাসনা না করিলে চলে না। যাঁহারা কাহারও অধীন নহেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পরাধীন হয়েন—কারণ পরোপাসনা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রাচীন কালে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, সাংসারিক পদার্থ, ভৌতিক কার্য্য মনুষ্যের উপাস্য ছিল। ইহার এক মাত্র কারণ আদিম কালের মানব বাল-স্বভাব। বালকের নিকট কিছুই নির্জ্জীব অথবা অচেতন নহে। বালক, মাটীতে পড়িয়া বেদনা পাইলে, প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মাটীতে পদাঘাত করে। বালক, মাতার স্তনে দুগ্ধ না পাইলে, রাগ করিয়া তাহাতে দন্তাঘাত করে; স্তনের যেন স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে—স্তন যেন নষ্টামি করিয়া দুগ্ধ দিতেছে না। বালক, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া, তাহাকে আপনি হস্ত সঞ্চালন করিয়া ডাকে, আবার ডাকিয়া দিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করে—চন্দ্র যেন ক্রীড়ার সঙ্গী। বালকের চক্ষে সকলই সজীব—বাল-স্বভাবে অসভ্যের চক্ষে সকলই সজীব। সেই সকল সজীব পদার্থ আবার অসীম প্রভাবশালী। যে মহীরুহ সহস্র লোকে নড়াইতে পারে না, বায়ু সেই মহীরুহকে অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া আকাশমার্গে কোথায় লইয়া যায়। সূর্য্য গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ করে; চন্দ্র উত্তপ্ত দেহ শীতল করে; ভূমি আহার্য্য প্রসব করে; জল তৃষ্ণা নিবারণ করে—এই কারণ বশতই মানবগণ পুরাকালে ইহাদের উপাসনা করিয়াছেন। তরল-মতি যুবতী তরলগতি তরঙ্গিনীর কূলে বসিয়া২ কাঁদে, কাঁদিয়া২ বলে, "আমি বড় ভালবাসি।" নীল গগনে শান্তজ্যোতি শশাঙ্ককে দেখিয়া প্রিয়জনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে। সকলেরই উপাসনা করে। প্রকৃত চন্দ্র অথবা প্রকৃত সূর্য্যদেবকে কেহ কখন দেখে নাই। সূর্য্যকে কর্ণপ্রসবিনী কুন্তী দেখিয়াছিলেন কি না, অঞ্জনানন্দনের কক্ষ তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিল কি না, গুরু-পত্নী তারা চন্দ্রকে হৃদয়ে করিয়া হৃদয় শীতল করিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারিতেন। যাহা হউক, সাধারণে কেহ কখন ইহাঁদিগকে দেখে নাই, অথচ ইহাঁদিগকে উপাসনা করিয়াছেন। স্বার্থ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। কল্পনা সেই স্বার্থসম্ভূত ধর্ম্মকে সুন্দর করে।

কাল সকলই পরিবর্ত্তন করে। কালে মনুষ্যের অবস্থা উন্নত হয়, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়; প্রকৃতির কার্য্যে মনুষ্য নিয়ম দেখে। দেখে, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু সকলেই নিয়মের বাধ্য—সেই অলঙ্ঘ্য নিয়ম অতিক্রম করা এই উপাস্য দেবতাদিগেরও অসাধ্য। মানব সিদ্ধান্ত করে, এ

নিয়মের অবশ্য নিয়ন্তা আছে। ভীম পরাক্রম বায়ু, অগ্নিমূর্ত্তি সূর্য্য অপেক্ষাও তিনি মহৎ। চিন্তাশীল মানব ঈশ্বর কল্পনা করে। মানব একেশ্বরবাদী হয় — এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করে।

মনুষ্য স্বার্থপর—আপনার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে। মনুষ্য আকাশের শোভা দেখে। দেখে, অগণ্য ক্ষুদ্র২ নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে; সুধাকরের শান্ত শীতল রশ্মি, প্রণয়িনীর প্রিয়সম্ভাষণের ন্যায় প্রাণ, মন, দেহ সব শীতল করে। পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে; পৃথিবীর শোভা ক্ষণভঙ্গুর, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বিকৃত হয় —আর এ শোভা চিরদিন সমান, চিরদিন একভাবে অবিকৃত থাকে। বসন্ত সমাগমে বাসন্তী কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; সান্ধ্যসমীরণ সে কুসুম সৌরভ লইয়া ঘরে২ বিলাইয়া বেড়ায়—আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে। পৃথিবীর অপূর্ব্ব ভূষন-স্বরূপ কুসুম গুলি শুকাইয়া যায়, পৃথিবী প্রোষিতভর্ত্তৃকা বেশধারণ করে—নক্ষত্র গুলি তেমনি জ্বলিতেছে, তেমনি হৃদয় শীতল করিতেছে। লোকের এগুলিকে স্বতই সুখের স্থান বলিয়া বোধ হয়। এরূপ স্থান যে নিরর্থক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য তথায় জীব আছে—অবশ্য তাহারা উৎকৃষ্ট জীব। কিন্তু জীবের মধ্যে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে পায় না, সুতরাং সিদ্ধান্ত করে, মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যাত্মা এবং ঈশ্বরের প্রিয়, তাঁহাদেরই জন্য ঐ স্থান। মনুষ্য স্বর্গ কল্পনা করে—কল্পনাসম্ভূত সুখের স্থানে যাইবার জন্য ঈশ্বরোপাসনা করে।

জড়োপাসনা হইতে যেমন একেশ্বরবাদ সমুদ্ভূত হয়, তেমনি একেশ্বর-বাদ হইতে আবার পৌত্তলিকতার জন্ম হয়। যিনি প্রমাণ চাহেন, তিনি দেখিবেন যে, এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে; প্রাচীন ভারতে বেদান্তের পর পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠালাভ করে; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মান্তর্গত রোমান ক্যাথলিসিজম্ নামক শাখা অতি হেয় পৌত্তলিকতা মাত্র। ইহার কারণও দুষ্প্রাপ্য নহে। মনুষ্য ঈশ্বরকে মনে করিতে চায়, কিন্তু নিরাকারের ধারণা নিতান্ত সহজ নহে; ঈশ্বরের যে সকল গুন কল্পনা করে, সেই সকল গুন একত্র করিয়া, তৎপরিচায়ক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে। এবিষয়ে একটী উদাহরন দিলেই যথেষ্ট হইবে। দশভুজা মূর্ত্তি মনে করুন দেখিবেন, ঈশ্বরে আর ইহাঁতে কোন প্রভেদ নাই। এই যে সংসার এত সুন্দর, এ সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বরই ইহার বিধাতা—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সেই সৌন্দর্য্যাধারের প্রতিবিম্ব মাত্র—ভগবতী তপ্তকাঞ্চনাভাসাঙ্গিনী। ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ—তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন—দুর্গা ত্রিনয়নী। ঈশ্বরের কাছে কিছুই লুকাইবার উপায় নাই; অন্তরে ভাবটী উদিত হইতে না হইতে, তিনি জানিতে পারেন—দুর্গার বিশাল-চক্ষু তীব্রজ্যোতি। ঈশ্বর সকলের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি দশ দিক রক্ষা করিতেছেন—জগন্মাতা দশভুজা। যাহা অতি মহৎ, যাহা ভয়ঙ্কর, ঈশ্বরের নিকট তাহা সামান্য, ক্ষুদ্র, তৃণ হইতেও অকিঞ্চিৎকর—হরমোহিনীর পদতলে সিংহ। ঈশ্বর সকলের শাসনকর্ত্তা; তিনি শিষ্টের পালনের

জন্য দুষ্টের দমন করেন—মহামায়া মহিষাসুরঘাতিনী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময়, অথচ নিয়মের বহির্ভূত কিছুই করেন না। সংসারে যাহা কিছু হয়, সব নিয়মাধীন—পার্ব্বতী ঈশ্বরী—ইচ্ছায় সব করিতে পারেন, অথচ নিয়ম মত যুদ্ধ করিয়া অসুরের হৃদয়ে বড়ষা বিঁধিয়াছেন—একবারে ভস্ম করেন নাই। দয়া, ঈশ্বরের প্রধান গুন—যে দিকে তাকাই, দেখি, তাঁহার অপার স্নেহের পরিচয় বিকীর্ণ রহিয়াছে—মহাময়া রমণী। সংসার সুন্দরা, "পরিণাম রমণীয়।" গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে, জীবন প্রদেশে মৃদুকল্লোলিনী তটিনীর তীরে বসিয়া প্রকৃতির অনন্ত অবক্তব্য শোভা দেখিয়া প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের সরল হৃদয় গলিয়া গেল। পরক্ষনেই কাল মেঘ আসিয়া সব গ্রাস করিল। করাল জলদ দিগন্তব্যাপ্ত হইল—প্রকৃতির মুখে কালিমা পড়িল। প্রচণ্ড বায়ু, বন, উপবন ভাঙ্গিয়া, সুকুমার কুসুম চরণে দলিত করিয়া ভীমনাদে প্রধাবিত হইল। নদী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী পাঠ রাখিয়া, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বিশাল তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইল। ঋষির মন উছলিয়া উঠিল। সভয়ে মনের বেগে, সৌন্দর্য্যের এই করাল মূর্ত্তি দেখিয়া প্রান ভরিয়া বলিলেন, "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" আর সঙ্গে২ দুর্গার বীরমূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। জগন্মাতা রমণী, যুবতী, সুন্দরী, অথচ দেখিলে ভয় হয়।

এক্ষণে বঙ্গদেশ প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মও যে কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে, তাহারও পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতেছে। এক্ষনেই কেহ২ অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন—তৃতীয়াবতার পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। পরে আরও হইবে, তাহও বুঝা যাইতেছে। ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন, "নিরাকারে ঈশ্বর পরম সুন্দর।" কালে বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের সুন্দরের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া আরাধিত হইবে।

এই রূপ ধর্ম্মের গতি। মনুষ্য সকল সময়েই উপাসক। জড়পদার্থ, দেবদেবী, আত্মবৃত্তি নিচয়ের কল্পিত রূপ, ঈশ্বর, সকলই মনুষ্যের উপাস্য। কিন্তু মানবের আর এক আরাধ্য দেবতা আছে। সকল দেবতা অপেক্ষা তিনিই প্রধান। সে দেবতা রমণী—তাঁহার প্রতি মানবের অচলা ভক্তি—তাঁহার সেবা মানবের প্রধান ধর্ম্ম।

এই সনাতন ধর্ম্ম, মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কেহ শিখায় না, কেহ উপদেশ দেয় না, কেহ দীক্ষিত করে না, অথচ সকলেই দেবীর ভক্ত। রমণীউপাসনার স্বভাব সিদ্ধত্ব প্রতিপাদনার্থ একটী প্রমাণও দিতেছি। এক জন সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট হইতে এ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। একদা এক যুবতী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকার পীড়াতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শিশুর পিতা ভার্য্যাবিরহে সংসার পরিত্যাগ করিয়া এক নির্জন প্রদেশে গিয়া বাস করিলেন। সেই খানে কোন ক্রমে শিশুটিকে লালনপালন করতঃ কাল যাপন করেন। ক্রমে শিশু বড় হইল। কিছু দিন পরে নিকটস্থ কোন গ্রামে মেলা উপলক্ষে মহা সমারোহ উপস্থিত হইল। বালকটীকে সঙ্গে করিয়া তাহার পিতা মেলা দেখিতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটী পুষ্করিণীতে কতকগুলি হংস ক্রীড়া করিতেছে! বালক

জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, ও কি ?" তাহার পিতা বলিল, "ও সব মেয়ে মানুষ।" বালক কিছু না বলিয়া হাঁটিতে লাগিল। আর কিছু দূর গিয়া দেখিল, একটী পুষ্করিণীতে সত্যই কতকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। বালক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ও কি ?" তাহার পিতা বলিল, "ও সব হাঁস জলে খেলা করিতেছে।" বালক অমনি ঔৎসুক্য সহকারে বলিল, "বাবা, একটা হাঁস নেব।" কে বলিবে, এ ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ নহে ? চিন্তা শক্তির ন্যায়, রমণীভক্তি মনুষ্যের প্রধান লক্ষণ। যার চিন্তাশক্তি নাই, সে মনুষ্য নহে—রমণীর প্রতি যার ঐকান্তিক অনুরাগ নাই, সে কারুণ্য-রস-বিহীন পশু-প্রকৃতি।

সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মনুষ্যের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হয়। কি রূপে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জড়োপাসনা হইতে দেবোপাসনা, দেবোপাসনা হইতে একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ হইতে পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতা পরিমার্জ্জিত হইয়া আবার একেশ্বরবাদ। ধর্ম্মের এই রূপ গতি দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহার পর পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না—কালে সকলেই নাস্তিক হইবে। অনেক বিদ্বান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মতাবলম্বী। যাহা হউক, কালে কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে, কিন্তু ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, রমণী চিরকাল মনুষ্যের উপাস্য হইয়া থাকিবে। সকল ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু এ ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন নাই—এ ধর্ম্মের পতন নাই। সমাজ যতই উন্নত হইতেছে, মনুষ্য যত সভ্য হইতেছে, এই সর্ব্বার্থসার দেবীর প্রতি ভক্তি ততই বাড়িতেছে। সুতরাং বোধ হয়, কালে সকল ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইলে, রমণী উপাসনাই পৃথিবীর এক মাত্র এবং সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে।

উপাস্য দেবতার প্রতি প্রেমই ধর্ম্ম। ঈশ্বরই হউন, আর পুতুলই হউক, কেবল উপাসনাতেই পুণ্য হয় না। উপাসনা ভয়ে হইতে পারে, স্বার্থসাধন জন্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অবশ্য পুণ্য নাই। উপাসনা করিতে যদি ভাল লাগে, উপাসনা না করিলে সে দিন বৃথা গিয়াছে বলিয়া যদি দুঃখ হয়, তবেই পুণ্য হয়। মনুষ্যের ঈশ্বরোপাসনা, দেবতার উপাসনা ভয়সঞ্জাত—না করিলে নরকে যাইতে হইবে, বলিয়া করে। কেবল রমণীর উপাসনা মনুষ্য আন্তরিক ভক্তিসহকারে করে, সুতরাং মনুষ্য যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জন করে, তাহা এই উপায়েই।

মনুষ্যের চক্ষে এ দেবীর সহিত তুলনায় সকল তুচ্ছ। মানব সব করিতে পারে, কিন্তু রমণীর আজ্ঞার বহির্ভূত হইতে পারে না। রমণীর আজ্ঞা পাইলে ঈশ্বরাজ্ঞাও তুচ্ছ করে। আদম অনায়াসে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন, কিন্তু হবার কথা ঠেলিতে পারিলেন না। অমুক বালক বড় বুদ্ধিমান, কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন—অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, অধিক রাত্রি পড়িলে তাঁহার—রাগ করেন।

দেবীও জাগ্রত। মনুষ্য সকল দেবতাকে অনায়াসে অবহেলা করে, দেবতারা কিছুই করিতে পারেন না—ঈশ্বর অগ্রাহ্য করে, ঈশ্বর কিছুই করিতে পারেন না, কিন্তু এ দেবীর একটু অযত্ন হই-

লেই সর্ব্বনাশ হয় । এখানে সেবাপরাধের ফল হাতে হাতেই—যার সেবায় ইনি সন্তুষ্ট হইলেন, সে সশরীরে স্বর্গ-সুখভোগ করে, যার প্রতি ইনি বিরূপ থাকেন, তাকে জীবিতাবস্থাতেই নরক-ভোগ করিতে হয় ।

এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপ তিন মূর্ত্তিতে ব্যক্ত, তেমনি এ সর্ব্বারাধ্য দেবীরও তিন মূর্ত্তি । সে তিন মূর্ত্তি—জননী, স্ত্রী এবং কন্যা । মনুষ্য বয়োভেদে এক২ মূর্ত্তির আরাধনা করে—বাল্যে জননী, যৌবনে স্ত্রী, বৃদ্ধ বয়সে কন্যা ।

সংসারে জননী বিষ্ণুরূপিণী—প্রশান্ত মূর্ত্তি, দেখিলেই ভক্তির উদ্রেক হয়—স্নেহ পরিপূর্ণ স্বভাব—সন্তান চক্ষের বাহির হইলেই ভাবিতে বসেন ; আসিতে বিলম্ব হইলে পথপানে তাকাইয়া থাকেন, একটু শব্দ হইলেই ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া মনে করেন, 'এই বুঝি আসিতেছে ।' বিষ্ণু পালনকর্ত্তা—জননীও তাই । বিষ্ণু মিষ্ট কথার দেবতা—ভক্ত শত অপরাধ করিয়া যদি একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকে, তিনি সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া ভক্তকে আশ্রয় দেন—তিনি, ডাকিলেই সন্তুষ্ট । জননীও মিষ্ট কথার দেবতা—শত অপরাধ কর, তবু তিনি বিরূপ নহেন ; একবার প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিলেই সব ভুলিয়া যান—আদরে সন্তানকে বুকে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করেন । ভক্ত বিষ্ণুকে ডাকিয়া পরিতৃপ্ত হয়—বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলে, যেন প্রাণ শীতল হয়—সকল যাতনার শেষ হয় । সুখের দিনে লোকে হরিকে স্মরণ করে না—বিপদে পড়িলে তাঁহাকে মনে হয় । লোকে সুখের দিনে আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া জননীকে ভুলিয়া থাকে—যখন রোগ, শোক, দুঃখ আসিয়া ব্যাকুল করে, তখন স্নেহময়ী জননীকে ডাকে ।

স্ত্রী ব্রহ্মারূপিণী । ভক্ত ব্রহ্মাকে রক্ত-বর্ণ কল্পনা করে—স্ত্রী, স্বামীর চক্ষে অদ্বিতীয়া সুন্দরী । ব্রহ্মা মরালবাহন—মরালগতিতে গমন করেন—স্ত্রী অশ্ব-গামিনী হইলেও স্বামীর চক্ষে মরাল গামিনী । ব্রহ্মার আসন পদ্ম—স্ত্রীর আসন স্বামীর হৃদয়-পদ্ম । ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ—স্ত্রী এক মুখেই চারি মুখের কাজ করেন ; সময়ে নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার না পেলেই চারি মুখে বক্তৃতা করেন । ব্রহ্মা স্রষ্টা—ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করেন—স্ত্রীও করেন । স্ত্রী, অন্তরের কোমল বৃত্তি গুলির কারণস্বরূপ—দয়া, স্নেহ, মমতা, সহৃদয়তা, প্রণয় হইতেই সমুদ্ভূত হয় । যে ভাল বাসে না, যার স্ত্রী নাই, তার অন্তর বড় কঠিন । ব্রহ্মার কথা শাস্ত্রে বলে ।—

"যদা স দেব জাগর্ত্তি তদেব চেষ্টতে জগৎ
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং প্রণীয়তে ॥"

ব্রহ্মা যখন জাগিয়া থাকেন, তখনই জগৎ সচেষ্ট থাকে ; ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলেই প্রলয় হয় । স্ত্রী যত দিন চেতন থাকে, মনুষ্য তত দিন প্রাণপণে সাংসারিক কার্য্যে রত থাকে—সচেষ্ট থাকে; স্ত্রী যে দিন মহানিদ্রাভিভূত হয়, সেই দিন সব ফুরায়—জীবন অন্ধকার হয়—হৃদয় শূন্য হয়, মনুষ্য জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকে । ব্রহ্মার পূজার পদ্ধতি সচরাচর লোকে জানে না—কি করিলে স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাও কেহ জানে না । এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত—

কেহ বলেন, আদরে ; কেহ বলেন বসনে এবং অলঙ্কারে ; কেহ বলেন, রূপের এবং গুণের প্রশংসায় ; কেহ বলেন, যাহা কিছু অপদার্থ এবং অকিঞ্চিৎকর, তাহাতেই রমণীর প্রীতি।

কন্যা শিবরূপিণী। শিব দিগম্বর, গায়ে ভস্ম মাখিয়া পাড়া২ বেড়ান —কন্যা উলঙ্গিনী হইয়া পথের২ ধুলা মাখিয়া বেড়ায়। মহাদেব গায়ক—বড় মধুর গান করেন ; কন্যার মুখের আধ২ কথা বড় মধুর—প্রাণ শীতল করে। শিব পাগল—স্তবে স্তুতিতেও সন্তুষ্ট হয়েন না, আবার বিল্বৃক্ষাঘাতেও বরদান করিয়া থাকেন—কন্যাকে মিষ্ট কথায় বশ করিতে না পারিলে, প্রহারের দ্বারা করিতে হয়। শিব অতি উগ্র-স্বভাব—শীঘ্র রাগ করেন এবং একবার রাগ করিলে অতি কষ্টে সন্তুষ্ট হয়েন ; কন্যার কথায়২ রাগ এবং রাগ হইলে তাহা বহু যত্নে যায়। শিব পঞ্চমুখ—পিত্রালয়ে কন্যারও পাঁচ মুখ ; কলহে তিনিই প্রধান—গলাবাজিতে কাহার সাধ্য নিকটে থাকে ; শিবকে ব্রহ্মা বিষ্ণুও ভয় করেন—পিত্রালয়স্থা কন্যাকে তাহার জননীও ভয় করেন। বাটীর বৌয়েরাও সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে। শিব সংহর্ত্তা—কন্যাও সংহার রূপিণী। কন্যাকে যাহা দাও,তাই নষ্ট হয়—পরের ভোগে লাগে। শিবের উপাসক প্রায় সন্ন্যাসী;—যাঁহার গুটিকত মেয়ে হইয়াছে, তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কন্যা গুলিকে পাত্রস্থা করিতে হাতে মালা, গাছের তলা সার করিতে হয়। বিবাহে যৌতুক, পণ, গণ, দান, বস্ত্র, অলঙ্কার দাও ;—সব জামাতার—তাঁর ভাগ্যে ব্রহ্মা রূপিণী, সৃষ্টি করিতেছেন। দাও—ভাল২ কাপড় দাও ; পুত্র বধূকে একখানি অলঙ্কার দিবে মানস করিয়াছ ? কন্যাকে অগ্রে দাও, নহিলে অনর্থ ঘটিবে। দাও—তিনি স্বামীর গৃহে রাখিয়া আসুন—আবার দাও, নহিলে বড় বিপদ—দুর্নাম হইবে—লোকে বলিবে, "বাপ্ হয়ে মেয়েকে একবার ডেকে সুধায় না।"

এই সর্ব্বারাধ্য দেবী ব্রহ্মারূপেই অধিক পূজিত হইয়া থাকেন, সুতরাং সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

রমণী ব্রহ্মা মূর্ত্তিতে সকলের গৃহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যে নিতান্ত হতভাগা কেবল সেই পারে না। যাহার গৃহে এ বিগ্রহ নাই, সে দশ জনের মধ্যে এক জন বলিয়া পরিগণিত নহে—তার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইলেও সে লক্ষ্মীছাড়া ; তার সহস্র গৃহ থাকিলেও সে গৃহী নহে, লোকে তাহাকে সন্ন্যাসী বলে। সে সমাজ হইতে বিচ্যুত—সে বনে গিয়া বাস করুক। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এরূপ নিয়ম আছে যে, দেবীর সেবক ভিন্ন অন্য কেহ ভদ্র পল্লীর মধ্যে বাস করিতে পাইবে না—গৃহস্থ পাড়ায় বাঁসাড়েকে স্থান দেওয়া হবে না।

উপযুক্ত বয়সে, অর্থাৎ সেবার ক্রম উত্তম রূপ শিখিলে, মানব, বাদ্যভাণ্ড সহকারে, শুভ দিনে, শুভক্ষণে, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবীকে আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই দিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে হয়। যেখানে যাহা পাও, আনিয়া উপহার দাও, আপনি পেটে খাইও না, জীর্ণ বসন পরিধান করিও, যত দূর কষ্ট সহ্য করিতে পার, তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না।

সেবকদিগের মধ্যে যাহারা অক্ষম, তাহারা দুষ্কর্ম্ম এবং হীন উপায় অবলম্বন করিয়াও যথাবিধি দেবীর সেবা করে। ভিক্ষা, চুরি, ডাকাতি, জাল, নরহত্যা করিয়াও দেবীর সেবা করিতে হইবে—দেবীর উদ্দেশে যাহা কিছু করা যায়, তাহাতে পাপ নাই। সেবার কঠিন নিয়ম পালন করিতে যদি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আত্ম হত্যার পাতকী হইবে না। শাস্ত্রকারেরা তাহার জন্য বিশেষ বিধি করিয়াছেন; যথা—

যজ্ঞার্থে পশবঃ শ্রেষ্ঠাঃ তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ

পাছে দেবীর সেবায় কোন প্রকার অযত্ন হয় বলিয়া, সকল দেশের শাস্ত্রকারেরা বিশেষ২ শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিধি আছে। মনু স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যে গৃহে রমণীর অনাদর হয়, সে গৃহ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হয়। ইউরোপ খণ্ডে যে পাপী দেবীর অযত্ন করে, লোকে তাহাকে অতি নীচ, অতি নরাধম জ্ঞান করে।

কেহ২ অপরিমিত বয়সেই দেবীর বেসায় নিযুক্ত হয়;—বাল্যবিবাহ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত। কিন্তু ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং ইহাতে বিশেষ প্রত্যবায় আছে। সেবাপরাধ ঘটিতে পারে;—সেবাপরাধে পরিণামে বিলক্ষণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

রমণী রাজবিধির অতীত—রাজবিধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার গৃহের শালগ্রাম শিলা কেহ চুরি করিলে, তুমি রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া বলপূর্ব্বক শালগ্রাম লইতে পার; কিন্তু তোমার স্ত্রীকে কেহ লইলে, তাহার প্রতি দেবীর অনুগ্রহ থাকিলে, তুমি কিছুই করিতে পার না। দেবীকে বল পূর্ব্বক আনিবার উপায় নাই—দেবী যদি সদয় হইয়া আসেন তবেই, নাহলে নয়। স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের দণ্ড নাই। তাঁহার নায়কের কারাবাস হইতে পারে কিন্তু রমণী অদণ্ডনীয়া। তাঁহার যে কোন দোষ নাই, তাহা নহে; প্রত্যুত সকল দোষই তাঁহার—হয় তো তিনিই পুরুষকে মজাইয়াছেন, কিন্তু রাজবিধি বলেন, রমণী নিরপরাধিনী—দেবীর অপরাধ সেবকের ধর্ত্তব্য নহে।

তোমার গৃহের অন্য বিগ্রহ চুরি গেলে তুমি উপহাসাস্পদ হও না যে চুরি করে, সেই চৌর; তাহাকেই লোকে ঘৃণা করে। কিন্তু যিনি তোমার গৃহিণীকে ভুলাইয়া লইতে পারেন, তিনি লোকের বিচারে অতি সুরসিক এবং বাহাদুর ব্যক্তি। অবশ্য দুই চারি জন বৃদ্ধ লোকে তাহাকে লম্পটস্বভাব বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু এ সকল সম্বন্ধে বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ্য। আর তুমি অতি অপদার্থ—কোন কর্ম্মের নও;—তোমার প্রতি দেবীর নিগ্রহ হইয়াছে, অতএব তুমি আর লোকের কাছে মুখ দেখাইও না।

সংসারে দেখিতে পাই, যাহারা সমাজের হেয়, দেবতার অনুগ্রহ তাহাদেরই উপর। তেলী, মালী, কামার, কুমার, সোনার বেণে, হাড়ি, বাগদি—ইহাদিগকে প্রায় দেবতার স্বপ্নাদেশ হয়—ইহাদের উপর দেবতার ভর হয়,। পৃথিবীর দেবীদেরও কৃপা অতি হেয় লোকের উপর;—উড়ে বেহারা, পূজোরি বামুন, আখড়ার মহান্ত, মুর্খ বৈষ্ণব, ভিখারী দরবেশ;—ইহারাই দেবীর অত্যন্ত প্রিয়! বড় লোকে দেবীর মন পায়

না। দেখা যায়, অনেক মহৎ লোকের গৃহিনী ব্যভিচারিণী—জূলিয়স্ সিজর্, মহম্মদ, এন্তোনাইনস্, বিক্রমাদিত্য, আরও সহস্র লোকের স্ত্রী কলঙ্কিনী। রাজ্ঞী সেমিরামিসের কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে মানবী না বলিয়া পিশাচী বলিতে ইচ্ছা করে।

ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে অসংখ্য যুদ্ধ হইয়াছে—যিরুশালমের ধারা বাহিক যুদ্ধ * মুসলমানদিগের দিগ্বিজয়, প্রাচীন ভারতে আর্য্যাধিকার, তাহার পরিচয়। রমণীর জন্য কত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? ট্রয়ধ্বংস, লঙ্কাবিনাশ রমণীর জন্য হইয়াছিল ;—একটিয়মের ভয়ঙ্কর অর্ণবযুদ্ধ অক্টেভিয়ার জন্য, আ-নটনী পৃথিবী হারাইলেন ক্লিওপেট্রার জন্য—আমরা স্বর্গ হারাই প্রায় ইহাঁ-দেরই জন্য।

দেবীর কীর্ত্তি অক্ষয়—পৃথিবীর অনেক সুমহৎ কার্য্য রমণীর দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। রমণী না থাকিলে রোমনগর কবে ধ্বংস হইয়া যাইত। রমণীর কৃপায় রোম তিনবার রক্ষিত হইয়াছে। মহা-বীর সেকন্দর যে পৃথিবী জয় করিয়া-ছিলেন, রমণীই তাহার এক মাত্র কারণ। তাঁহার মাতা তাঁহাকে জুপিটরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছিলেন, বলিয়াই এ অসীম আকাঙ্ক্ষা, এ বিষম উৎসাহ। বঙ্গবাসীগণ আজিও যে দেবোপাসনা করে, সে কেবল রমণীর অনুরোধে। মহাজ্ঞানী সক্রেতিস্ রমণীর কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, ভারতবর্ষীয় কোন রাজ্য যন্ত্র যখনই উত্তম রূপে পরিচালিত হয়, তখনই দেখা যায় যে, রমণী সে যন্ত্র চালাইতেছেন *। বঙ্গদেশে যে জাতি-ভেদ উঠিয়া যাইতেছে, তাহারও মূল রমণী। বঙ্গীয় নব্য সম্প্রদায় জাতিভেদে অনাস্থা করিবার উপদেশ প্রথমতঃ প্রায় বারবিলাসিনীদিগের নিকটে প্রাপ্ত হয়েন—এ সনাতন উপদেশ কার্য্যে পরি-ণত করিতে অভ্যাসও তাহাদিগের নিক-টেই করেন।

যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন করে—বিষয় বিভব সুখ সব তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহার নাম জগতে ধন্য। প্রাচীন ঋষিগণ ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার তুচ্ছ বোধ করিয়া বনে বসিয়া তপস্যা করিতেন—তাঁহাদের নাম জগতে ধন্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা রমণীর জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করেন—আপনা ভুলিয়া পরকে ভাল বাসেন, তাঁহাদের নাম আরও ধন্য। মহাই পণ্ডিতগণ তাহা-দের গুণকীর্ত্তন করেন—তাঁহাদের উপরে রমণীভক্তি বিবৃত করিয়া পুস্তক রচিত হয়। সেই সকল পুস্তককাব্য এবং আ-খ্যায়িকা বলিয়া খ্যাত হয়। পরবর্ত্তী মানবগণ তাহা আদরে পাঠ করেন। অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তক বড় নীরস—সাধ করিয়া কেহ পড়িতে চাহে না। কিন্তু এ ধর্ম্মের পুস্তক সকল বড় মধুর। এমন কি, অনেকের মতে যে পুস্তকে রমণীর কথা নাই, তাহা ভদ্র লোকের অপাঠ্য। যাঁহারা রমণীর গুণকীর্ত্তন করিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধাস্পদ, যাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহারা

* The Crusades.

* Mill's Subjection of Women. এই অজ্ঞান লেখককে অতি ভয়ঙ্কর লোক বলিয়া বোধ হয়। ইনি আপনার মত সমর্থনার্থ মিলের কথা উল্টাইয়াছেন। (যখন তখনই) এ রূপ কথা মিল বলেন নাই। মিল এই রূপ লিখিয়াছেন—" In nine cases out of ten......&c " নাস্তিকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই—চ।

বিদ্বান। হোমর, বাল্মীকি, ব্যাস, স্কট্, আনাক্রিয়ন্, হোরেস, বাইরন, কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্র যে সকলের পূজিত তাহার এক মাত্র কারণ, ইহাঁরা রমণীর ভক্তের ভক্ত। যে রমণীর ভক্তের ভক্ত, তাহাকে যে সম্মান না করে, সে নরাধম ঘোর মূর্খ।

ধর্ম্ম অন্তরের কথা। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম গায়ে মাখিয়া বেড়ায়, তাহাকে প্রায় ভণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। অন্যান্য সকল ধর্ম্ম কপটতামাত্র—সকল ধর্ম্মই ভণ্ডামি পরিপূর্ণ; কেবল এই সনাতন ধর্ম্মে ভণ্ডামি নাই। লোকে যখন গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাজলসিক্ত বস্ত্রে গঙ্গাজলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া তারস্বরে পাঠ করে—

বরমিহ গঙ্গাতীরে সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবর কোটীশ্বরো নৃপতিঃ

তখন হয়তো তিনি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, আকণ্ঠ মজ্জিতা কোন সীমন্তিনীর প্রতি এক দৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছেন—হয়তো সেই যুবতীর উদ্দেশেই এই স্তোত্র পাঠ করিতে২ মনে করিতেছেন—দূরে কোটি হস্তির অধীশ্বর হইয়া কি হইবে? যে ঘাটে এ মোক্ষদায়িনী স্নান করেন, সে ঘাটে কুকুর হইয়া পড়িয়া থাকাও ভাল। ভক্ত যখন ভাবে গদ গদ হইয়া প্রাণ ভরিয়া বলে—

"ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং"

যখন দেবীর ক্রোধশান্তির জন্যে চরণে ধরিয়া বলে—

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং
দেহি মুখ কমল মধুপানং"

তখন যে ভক্ত ভক্তিসহকারে বলে, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে?

এ দেবীর ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর—কৃতাপরাধীর দণ্ড হাতে হাতে। তবে অপরাধের লঘুগুরুভেদে দণ্ডেরও তারতম্য আছে। দণ্ড নানাবিধ, তন্মধ্যে মুখভারি, বক্রগ্রীব হইয়া ভ্রূকুটি, আরক্ত কুটীল কটাক্ষ, তিরস্কার, রোদন আপনার মস্তকে আঘাত এবং পিত্রালয়ে পলায়ন প্রধান। বিশেষ২ অপরাধের জন্য বিশেষ২ দণ্ডও আছে, যথা—কলহ, পদাঘাত, ইত্যাদি। দেবী রোষপরবশা হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবারও নিয়ম আছে। অনেক বহুদর্শী ব্যক্তি সে সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, দেবীর ক্রোধ দেখিলে চুপ করিয়া থাকাই সৎপরামর্শ; কেহ বলেন, দীনভাবে স্তুতি করিতে হয়, কেহ বলেন চরণ ধরিতে হয়, কেহ বলেন এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখে মাথা চুল্‌কাইতে হয়। কোন২ বিজ্ঞব্যক্তি বলেন, দেবীর ক্রোধ দেখিলে আপনিও ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলেও দেবীর ক্রোধ শীঘ্র উপশমিত হয়। আমার বিবেচনায় দেবীর নিকট অলঙ্কার অথবা বস্ত্র মানিলেই ভাল হয়—দেবীকে প্রসন্ন করিবার এ অমোঘ উপায়।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত কয়েকটী অতি লঘু দণ্ড—"অজ্ঞানাৎ যদিবা মোহাৎ" যে সকল অপরাধ হয়, তাহার এই সকল দণ্ড। ভক্তের একজন বন্ধু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—বন্ধুর গৃহে আমোদ, আহ্লাদ, আহারাদি করিয়া আসিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়াছে, অতএব এই সকল দণ্ডের অন্যতর বিহিত হইবে।

ইহার মধ্যে একটী দণ্ডের কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক—সে দণ্ড, রোদন।

সেবকের অপরাধের জন্য প্রায় এ দণ্ড বিহিত হয় না। ভক্তের প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইলে বুঝিতে হইবে, যে ভক্ত প্রকৃত পক্ষে অপরাধী নহে—দেবী আত্মকৃত অপরাধের জন্য সেবকের উপর দণ্ডবিধান করিয়া আপনার দোষ লুকাইতেছেন।

আর এক প্রকার দণ্ডের কথা বলা হইল না। সে দণ্ড স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার চরণে ধরিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন; যথা—

"সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়ন শরঘাতং
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেনবা
ভবতি সুখজাতং"

এই দণ্ডের বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই।

যে মত সংস্থাপনের জন্য আমি এতক্ষণ লিখিয়া২ একটী ইষ্টিল্ নিব্ নষ্ট করিলাম, কোন২ অদূরদর্শী ব্যক্তি সে মতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, ধন এ সংসারের দেবতা—ছোট বড় সকলেই এই দেবতার উপাসনা করে। এ মত নিতান্ত ভ্রান্ত। ধন, দেবী নহে—দেবীর দাসীমাত্র; তবে সামান্যা দাসী নহে, অতি প্রিয়তমা দাসী। লোকে ইহার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু সে কেবল রমণীকে প্রসন্ন করিবার জন্য—কর্ত্তার অনুগ্রহ প্রাপ্তি কামনা করিলে, তাঁহার দাসীর উপাসনা ব্যতীত কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। দেবীর নিকট বর প্রার্থনা আপনি না করিয়া এই দাসীর মুখ দিয়া করাইলে শীঘ্র মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই কারণে—ধনের দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা সহজে লাভ করা যায় বলিয়া, লোকে ধনের উপাসনা করে। তবে সংসারে এমন নীচ প্রকৃতি লোকও আছে, যাহারা, পেনেলোপীর পাণি প্রার্থীদিগের ন্যায়, দাসীর সহিত প্রণয় করে। আমার মতে তাহারা অতি পাষণ্ড—নবকুল কলঙ্ক। দেবীও ইহাদের উপর বড় নারাজ—ইহাদের উপর রমণীর কৃপাদৃষ্টি প্রায়ই দেখা যায় না। অতি যত্নে রাখিলেও ধনবানের ঘরের স্ত্রীলোকেরা প্রায় ব্যভিচারিণী হয়।

রমণীই সংসারে ধন্য। রমণী না থাকিলে, মানব এতদূর উন্নত হইত কি না, কে বলিবে? এক জন ইংলণ্ডীয় কবি স্পষ্ট বলিয়াছেন, হইত না। তিনি বলেন, পৃথিবীতে রমণী না থাকিলে মনুষ্য দ্বিপদ পশু হইয়া থাকিত।* যাহা হউক, লোকে যে তুলসী চন্দন লইয়া রমণীর পাদপদ্মে প্রকাশ্য রূপে অঞ্জলি না দেয় কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার মতে এই উদ্দেশ্যে কিছু রাজবিধি হওয়া উচিত; কিন্তু পৃথিবী আজিও ততদূর সভ্য এবং উন্নত হয় নাই। যখন এই প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, মানবের উন্নতির চরম হইয়াছে। আমি এই খানে প্রস্তাব শেষ করিলাম—সকলে একবার ভক্তিভাবে এই পরম দেবতার নামে জয়ধ্বনি করুন।

*Otway.

"Woman, woman;
What had we been but beasts without thee,"
Venice Preserved.

এ প্রস্তাব আমাদিগের মত বিরোধী। আগামীতে আমরা ইহার সমালোচনা করিব।
সম্পাদক।

অভাগিনী বঙ্গসতী ।

কেও বামা একাকিনী এঘোর কাননে রে
　　করিছে রোদন ?
ঘন বহে দীর্ঘ শ্বাস, লুটাইছে কেশ পাশ,
　　মলিন বদন ॥
এমন রূপের ডালি, কি জন্যে হয়েছে কালি,
　　কেনই বা অশ্রুধারা বহিছে নয়নে ?
ত্যজে কুল, শীল, মান, পাগলিনী মত কেন,
　　ভ্রমিতেছে এ অরণ্যে কিসের কারণে ॥

২

বুঝি কোন কুলীনের অনাথা রমণী রে,
　　এই অভাগিনী ।
সতিনের গঞ্জনায়, ত্যজিয়ে কুলের ভয়,
　　এবন বাসিনী ॥
কিম্বা বুঝি পতি সুখে, বঞ্চিত হইয়া দুখে,
　　ঘুচাতে মনের জ্বালা জনমের তরে ।
লতাপাশগলে পরে, জীবন আপন করে,
　　বধিতে আইল সতী এ বন মাঝারে ॥

৩

কিম্বা কোন কুলনারী শঠের প্রণয়ে রে,
　　হইয়া মগন ।
জীবন যৌবন ধন, সব করি সমর্পণ,
　　তাহার কারণ ॥
চেয়েছিল তারপানে, শেষে দাগা পেয়ে মনে
　　লজ্জায় লোকের কাছে তুলিতে বদন ।
না পেরে, কলঙ্কডালা, লইয়ে মস্তকে বালা,
　　এসেছে করিতে বুঝি অরণ্যে রোদন ॥

৪

অথবা যৌবন কালে কোন কুলবতী রে,
　　সংসার সাগরে ।
পুত্ররত্ন হারা হয়ে, অকালেতে শোক পেয়ে,
　　হৃদয় মাঝারে,
সংসারের মায়া ত্যজে, গভীর অরণ্যমাঝে,
　　এসেছে জুড়াতে যত চিত্তের দহন ।
যেন ফণি মণিহারা, দুনয়নে বহে ধারা,
　　মনোদুখে তাই বসে করিছে রোদন ॥

৫

অথবা বঞ্চিত হয়ে, শত্রুর করেতে রে,
　　স্বরাজ্য রতনে ।
না পেয়ে অনাথ গতি, ভিকারিণী মত সতী,
　　ফিরিছে এ বনে ॥
দুই কর হানি শিরে, কাঁদিতেছে সকাতরে,
　　নয়নের জলে তাই তিতিছে বসন ।
বিষাদেতে অঙ্গ ঢালি, হয়েছে বরণ কালি,
　　তাই বুঝি হইয়াছে মলিন বদন ॥

৬

অথবা ভারত লক্ষ্মী, ছাড়িয়া চলিল রে,
　　সাগরের পারে ।
তাই বিষাদিণী এত, কাঁদিতেছে অবিরত,
　　শোক তাপ ভরে ॥
ভারত সন্তান সবে, হয়েছে দুর্ব্বল এবে,
　　কে রক্ষিবে তাই সতী ভাবিছে এখন ।
অপার জলধি পারে, যেতে মন নাহি সরে,
　　তাইত এ ঘোর বনে করিছে রোদন ॥

৮

তা নয় তা নয় ঠিক, তা নয় তা নয় রে,
　　ভেবেছি যেমন ।
অভাগিনী বঙ্গমাতা, বুঝি হৃদে পেয়ে ব্যথা,
　　হয়েছে এমন ।'
কৃতবিদ্য পুত্রগণ, থাকে সবে বিদ্যমান
　　ঘুচাতে নারিল কেহ মাতার রোদন ।
তাই বুঝি কেঁদে সতি, কহিছে ভারত প্রতি
　　তাইতে নয়ন নীরে ভাসিছে বদন ॥

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত সমালোচন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম প্রচার ও যুদ্ধ।

এত দিবস মহম্মদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান এবং জীবিকা নির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল না। যেখানে থাকিলে শত্রুগণ তাঁহার সন্ধান না পায়,সেই স্থানেই বাসস্থান মনোনীত করিতেন; প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা বোধ করিলেই স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। এই রূপে নূতন নূতন বাসস্থান মনোনীত করিয়া শত্রু মণ্ডলী হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে উদরান্ন সংগ্রহ হইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন।

কিন্তু মনুষ্যের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল; কাহারও দুঃখ চিরস্থায়ী নহে; দুঃখভোগ সময়েও দূর হইতে সুখের ছায়া না দেখিলে অথবা চিরজীবন দুঃখভোগ করিতেই হইবে, মনে এই রূপ ভাব দৃঢ়তর হইলে, মনুষ্যের জীবন ধারণ নিতান্ত কষ্টকর হইত; এমন কি, মানব জাতি দুঃখময় জীবন ভার বহনে সম্মত হইত কি না, সন্দেহ। বোধ হয়, লোকে জীবনের প্রতি হতাদর হইয়া অচিরে আত্মবিনাশ সম্পাদন পূর্ব্বক পৃথিবীকে নির্ম্মনুষ্য করিত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম সেরূপ নহে। প্রকৃতি মানব মাত্রের অন্তঃকরণ সুখে দুঃখে জড়িত করিয়া দিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখী বা দুঃখী লোক জগতে একটিও নাই। এক সময়ে যাহাকে দুঃখের কঠোর আক্রমণে মুহ্যমান দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়, সময়ান্তরে তাহাকেই সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত দেখা যায়। সিংহাসন ও কারাগার উভয় স্থানেই যে অনেক সময়ে এক ব্যক্তির বাসস্থান হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য।

শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়াও ভদ্র সন্তানের ন্যায় বহু যত্নে প্রতিপালন, চতুর্ব্বিংশ বর্ষে বণিক বিধবা খাতিজার পাণি গ্রহণে প্রভূত সম্পত্তিভোগ, নূতন মত প্রচার দ্বারা তৎসমুদয়ের বিনাশ সাধন এবং আত্ম রক্ষার্থে দীন বেশে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ, এক্ষণে আবার এই নূতন মতের প্রসাদাৎ মদিনা নগরে রাজোচিত সম্মান লাভ; এ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে মহম্মদের ভাগ্যে এই সকল অবস্থা দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতেই মদিনাতেস্ব তন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ী লোক বাস করিত, এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ বিসংবাদেরও অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু মহম্মদ প্রচারিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ একবারে পরিত্যক্ত হইল। সকলেই একমনা ও এক অভীষ্ট সাধনে তৎপর হওয়াতে পরস্পরের হিতৈষা বলবতী হইয়া উঠিল। মদিনাবাসীরা এক্ষণে নবধর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্ট হইল।

মহম্মদ এই সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। তন্মধ্যে রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে ও দিবসের অন্যান্য বিশেষ সময়ে মস্জিদে যাইয়া উপাসক মণ্ডলীকে আহ্বান নিমিত্ত ডাক নমাজের * রীতি ও মানব মাত্রে দয়া প্রকাশের উপদেশই প্রধান। মহম্মদের এই সময়ের উপদেশাদিতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনেক উপ-

* ডাকনমাজের অর্থ এই যে ঈশ্বর মহান্, এক ও অদ্বিতীয়, তোমরা তাঁহার উপাসনার্থ সমাগত হও।

দেশ লাভ করিয়াছিলেন, ও খ্রীষ্টের ন্যায় ক্ষমার ভাব প্রদর্শন নিমিত্ত যত্নশীল ছিলেন। এই সময়ে মহম্মদের মত সাধারণ্যে প্রচার হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি স্বীয় শিষ্য আবু বেকারের কন্যা আয়েসার পাণি গ্রহণ করেন। আয়েসা পরমা সুন্দরী ছিলেন। খাতিজার গর্ভজাতা কন্যা আয়েসাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য আলির হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

এতকাল মহম্মদ ক্ষমা প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই। ফলতঃ ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষমাপ্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। এই কাল মধ্যে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল, শত্রু সংখ্যাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং বহু পরিমাণে অধিক ছিল। শত্রুদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করাতে তাহাদের অত্যাচার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি খাতিজার প্রভূত সম্পত্তি হারাইলেন; গৃহ ত্যগ করিলেন। অবশেষে জন্মভূমি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া রাজ দণ্ডে দণ্ডিত দোষী ব্যক্তির ন্যায় বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কত বার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা উপস্থিত ও ভাগ্যক্রমে প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তথাচ বিপক্ষদিগকে ক্ষমা প্রদর্শনে এক দণ্ডও বিমুখ ছিলেন না। ক্ষমা প্রধান গুণ বটে, কিন্তু নিরন্তর ক্ষমার বশীভূত হওয়া প্রায় মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মহম্মদ ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ক্ষমাপথে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ বর্গের অত্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বলিয়াই হউক অথবা প্রতিশোধ লইবার শক্তি ছিল না বলিয়াই হউক; এত কাল যে রূপ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন, নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমা দ্বারা বিপক্ষদিগের অত্যাচার নিবারিত হইবার নহে, তখন কার্কশ্য প্রদর্শনে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রকৃতি ভেদে উপদেশ কার্য্যকর হইয়া থাকে, নম্র প্রকৃতি বাঙ্গালী দিগকে ক্ষমাশীল হইতে উপদেশ দাও, তাহারা সহজেই তাহা গ্রহণ করিবে; এ নিমিত্তই শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী দিগের মধ্যে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সকলেই, আদি, করুণ, শান্তি, প্রভৃতি কোমল রস ব্যঞ্জক রচনায় অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ স্থিত পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের লোক উগ্র প্রকৃতি; তাহারা শান্তি, করুণ প্রভৃতি অপেক্ষা বীর রৌদ্র প্রভৃতি রসেই অধিক রসিক, বাঙ্গালী জনোচিত উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে বড় একটা স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাহারা কার্য্যতঃ তদ্রূপ উপদেশের আদরও করে না। সুতরাং তদ্দেশীয় কবিগণও বীরাদি ওজঃগুণ সম্পন্ন রস বর্ণনে অধিকতর ক্ষমতাশালী। আরব জাতি স্বভাবতঃ যুদ্ধপ্রিয়; যে উপদেশে যুদ্ধ সৎকার্য্য এবং তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণিত হইবে, তাহা স্বভাবতঃই তাহাদের আদরের বস্তু; সুতরাং মহম্মদের যুদ্ধ বিষয়িণী অনুজ্ঞা সকল যে অচিরেই তাহাদের অন্তঃকরণ বিমোহিত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

মহম্মদ শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন

যুক্তি, তর্ক বা অপর কোন সৎগুণ প্রভাবে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; এই জন্যই পরমেশ্বর আমাকে তরবারির সাহায্য লইতে আদেশ করিয়াছেন। তোমরা তর্ক রূপ অস্ত্র না লইয়া প্রকৃত লৌহময় অস্ত্র দ্বারা অবিশ্বাসী দিগের উচ্ছেদ সাধন কর। এরূপ ধর্ম্ম যুদ্ধে জয়ী বা সমরশায়ী, যেরূপ কেন হও না, পরকালে অনন্ত স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইবে। কোরাণ সরিফে স্পষ্ট লিখিত আছে, নিয়মিতকাল পূর্ণ না হইলে মৃত্যু হয় না, সুতরাং মৃত্যু ভয় তোমাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার বাধক হইতে পারে না।”

একদা রমজানের সময়ে আবদুল্লা কয়েক জন কোরেসীয়কে হত করিয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়াছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ মধ্যে কেহ২ আবদুল্লার দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইল। মহম্মদও প্রথমে এই লুণ্ঠিত ধন গ্রহণে অসম্মত হইলেন; কিন্তু পরিশেষে রমজানের মাহাত্ম্য নাশ করাতে যে পাপ হইয়াছে, পৌত্তলিকতার বিনাশের সুকৃতির সহিত তুলনা করিলে এই পাপ অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং মহম্মদ লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত গ্রহণে সম্মত হইলেন, শীঘ্রই তাহা গৃহীত হইল।

মহম্মদের মদিনা অবস্থানের দ্বিতীয় বর্ষে আবু সোকায়েল প্রভৃত ধন সম্পত্তি ও অনুচরবর্গ সহ মক্কা তীর্থে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। মহম্মদ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পথি মধ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বীয় বাসস্থান মদিনায় যাত্রা করিলেন; এদিগে সোকায়েল মক্কাতে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র মক্কা হইতে বহু সংখ্যক পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য যথা সময়ে সোকায়েলের সাহায্যকর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেতার নামক স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নব ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত মুসলমান গণ শীঘ্রই জয় লাভ করিল। মহম্মদ প্রভূত সম্পত্তি লাভ ও বহু সংখ্যক বিপক্ষকে বন্দী করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মদিনায় প্রত্যাগত হইলেন। এদিগে যুদ্ধপ্রিয়, ধনলুব্ধ আরব জাতি নূতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিবিধ রূপ সৌভাগ্য দর্শনে দলে দলে মহম্মদের মতাবলম্বী হইতে লাগিল। এই সময়ে মুসলমানেরা মদিনা বাসীদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করাতে, তাহারাও মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাংসারিক অনেক বিধ বিপদ হইতে আশু মুক্ত হইল। এই সময়ে মহম্মদ ওমর তনয়া হাফেজার পাণি গ্রহণ করেন।

মক্কাবাসীরা বেতারের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইল এবং ত্বরায় প্রতি হিংসার উপায় দেখিতে লাগিল; এজন্য পর বৎসরেই আবু সোকায়েল বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া মহম্মদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ওহদ নামক স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; মহম্মদ পরাভূত হইলেন। এই সময়ে মহম্মদ ওমার তনয়া হেস্তেকে বিবাহ করিয়া তদীয় প্রণয় সমাগমে কথঞ্চিৎ পরাভব দুঃখ বিস্মৃত হন।

এদিগে আবু সোকায়েল বিজয় লাভে উৎসাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মহম্মদকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। মহম্মদ এই বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত ব্যস্ত

হইলেন, এবং আবু সোকায়েলকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগর রক্ষা বিষয়ে সমধিক যত্নবান হইলেন। অনতি বিলম্বেই মদিনা নগরের চতুর্দ্দিকে পরীখা খনন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর আবু সোকায়েল মদিনা বাসী কতক গুলি লোকের যোগে মহম্মদকে প্রথমতঃ বিপদে পাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্বরায় আবু সোকায়েলকেই মহম্মদের বুদ্ধি কৌশলে পরাভব প্রাপ্ত হইতে হইল। এই যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে আকটা নাম্নী একজন যিহুদী কন্যা ছিল। তাহার রূপ লাবণ্য শীঘ্রই মহম্মদের মন হরণ করিল। মহম্মদ এই রূপবতীর সৌন্দর্য্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শীঘ্রই তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে সকল শিষ্য মক্কা হইতে মহম্মদের সহিত মদিনা গমন করেন; তাঁহারা তথায় প্রায় ছয় বর্ষ কাল বাস করিলেন। বহু দিন জন্ম ভূমির মুখ দর্শন না করাতে এই সময়ে মক্কা গমন করিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে নিবারণ করা অসাধ্য বিবেচনায় মহম্মদ মক্কা গমন বিষয়িণী চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এবং শীঘ্রই রমজানের রোজা উপলক্ষে মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। শিষ্যগণ যে সানন্দ চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিবে, এ কথা বলা বাহুল্য। ধর্ম্ম ও জন্ম ভূমির অনুরাগ বশতঃ তদীয় সৈন্য বা শিষ্যগণ মহোৎসাহে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিগে মক্কা বাসিগণও মহম্মদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার মক্কা প্রবেশ রোধের বহু বিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল। কোরেসীয় পতি আবু সোকায়েল বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে মহম্মদ মক্কা আগমন করিলেই স্থানীয় বহু সংখ্যক লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে; অথচ মহম্মদ যেরূপ উদ্যমে আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার গতি রোধ করাও অসাধ্য। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সোকায়েল মনে মনে বিগ্রহ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি সংস্থাপনে কৃত সংকল্প হইলেন; অনতি বিলম্বেই সন্ধির প্রস্তাব সহ মহম্মদের নিকট লোক প্রেরিত হইল। মহম্মদ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সন্ধিতে মহম্মদ তিন দিবস পর্য্যন্ত মক্কায় বাস করিতে পারিবেন, এরূপ নিয়ম হইল। কিন্তু সন্ধিতে এরূপ নিয়ম হইলেও মহম্মদ এযাত্রায় নগরে প্রবেশ করেন নাই। বাহিরে থাকিয়াই কুর্ব্বানি আদি ধর্ম্ম কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মদিনায় প্রত্যাগত হইলেন। আশ্বস্ত শিষ্যবর্গ এতদূর আসিয়াও জন্ম ভূমি দর্শন করিতে পারিল না, সুতরাং মরীচিকাপ্রতারিত আতপ ক্লান্ত পথিকের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিতান্তরে তাঁহার অনুগমন করিল। মহম্মদ শিষ্য বর্গের মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহাদের সন্তোষার্থ খাইবার সহর আক্রমণ করিলেন। যে সকল যিহুদী মদিনা হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা এই নগরে অবস্থান করিত। নগর বাসীরা প্রাণ পণে মহম্মদের বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। মহম্মদ দুর্গ অধিকার করিলেন। অধিবাসীদিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল।

খাইবার নগরে জেনাব নাম্নী একটি সম্ভ্রান্ত যিহুদী কন্যা বাস করিতেন, তিনি স্বজাতি হন্তা মহম্মদের বিনাশ জন্য উপায় করিতে লাগিলেন। একদা এই রমণী মহম্মদের ভক্ষ্য মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন। মহম্মদ গ্রাসৈক মাত্র ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আহারে বিরত হন; কিন্তু উদরস্থ বিষ অল্পতা নিবন্ধন যদিও আশু তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই, তথাপি এই বিষই যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের ও কিছু কাল পরে জীবন নাশের কারণ হইয়াছিল, অনেকেই এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে মহম্মদ জনৈক শিষ্যের বিধবা পত্নী পূর্ব্বোক্ত আবু সোকায়েলের কন্যা হাবিবকে বিবাহ করিলেন। বোধ হয়, প্রেম বা ধন সম্পত্তি লাভ এই পরিণয়ের উদ্দেশ্য নহে, চির শত্রু আবু সোকায়েলকে কথঞ্চিদ্রূপে নতমস্তক করাই ইহায় উদ্দেশ্য।

বিনা কৌশলে এক মাত্র বল বীর্য্য দ্বারা শত্রু দমন সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। ভুবন বিখ্যাত যুদ্ধ বীরগণকেও অনেক সময়ে কৌশলের শরণাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে, মহম্মদও কৌশল-পরায়ণ না হইলে এত শীঘ্র নব ধর্ম্মের প্রচারে এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তিনি আবু সোকায়েলের দুহিতার পাণি গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন। সোকায়েল নূতন প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি যতই কেন বিদ্বেষ প্রকাশ না করুন, মহম্মদের সহিত যতই কেন শত্রুতা না থাকুক; এক্ষনে মহম্মদ তাঁহার জামাতা; জামাতাকে বধ করিয়া স্বীয় দুহিতাকে বিধবা করিবেন, নূতন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এত বিদ্বেষ বা প্রাচীন ধর্ম্মের উপর এত অনুরাগ ছিল না।

তরবারি ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সাধন ছিল বলিয়া মহম্মদ অন্যান্য উপায় এক বারে পরিত্যাগ করেন নাই। বস্তুতঃ শান্ত ভাবে অন্যান্য উপায় বিস্তারেও বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন। অবিলম্বেই পারস্য রাজ ও কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটের নিকট নবধর্ম্ম গ্রহণার্থ অনুরোধসহ দূত প্রেরিত হইল। পারস্যরাজ এই অনুরোধে যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বে মহম্মদকে শাসনার্থ আদেশ করিলেন। কনষ্টান্টিনোপল রাজ সানন্দ চিত্তে পত্র বাহককে বহুমান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। এদিকে মহম্মদের প্রেরিত মিসর দেশাগত দূত বিস্তর ধন সম্পত্তি লইয়া প্রত্যাগত হইল।

এই সময়ে বসোরা নগরেও এক জন দূত প্রেরিত হয়। বসোরা বাসী এক জন খ্রীষ্টীয়ান ঐ দূতকে বিনাশ করে; মহম্মদের নিকট দূতের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন, এবং ত্বরায় সিরিয়া দেশ আক্রমণার্থ এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু অনেক সৈন্য ক্ষয় হইল। মহম্মদের পিতৃব্যও এই যুদ্ধে পরলোক গমন করেন।

ক্রমে ক্রমে জয় লাভ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়াতে, মহমম্মদ শীঘ্রই জন্ম ভূমি মক্কা নগর অধিকার করিতে বাসনা করিলেন। মাতৃ ভূমির অনুরাগ বশতঃ সহচরগণও অবিলম্বেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। পূর্ব্বে আবু সোকায়েলের সহিত

যে সন্ধি পত্র হয়, নানাবিধ ছলান্বেষণ দ্বারা তাহা ভঙ্গ হইল। অবিলম্বে যোদ্ধাগণ প্রকাশ্য রূপে মক্কার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল।

আবু সোকায়েল এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্বর হইয়া মহম্মদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলেন। যত কেন বিনয় প্রদর্শিত না হইক, কিছুতেই মহম্মদ স্বাভীষ্ট পরিবর্ত্তনে সম্মত হইলেন না। সোকায়েলকে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। তিনি শীঘ্রই স্বজাতিগণ নিকট মহম্মদের অত্যাচার সকল বর্ণন করিলেন; মক্কাবাসীরাও যুদ্ধার্থ কৃত সংকল্প হইল।

এই সময়ে মহম্মদীয়েরা ষড়যন্ত্র দ্বারা আবু সোকায়েলকে বন্দী করে। সোকায়েল বন্দীভূত হইলে মক্কাবাসীরা নায়কবিহীন হইয়া সহজেই মহম্মদের অধীনতা স্বীকার করিল। সোকায়েলও মহম্মদের শিবিরে আনীত হইলে প্রাণভয়ে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এদিকে মহম্মদ নির্ব্বিঘ্নে মক্কা প্রবেশ করিলেন; তদীয় আদেশে অনুচরেরা অনতি বিলম্বে নগর লুণ্ঠন ও কাবা মন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। মহম্মদ স্বচক্ষে কাবাস্থ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিনষ্ট দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নিবাসী বেণীসাও, কাককাইট প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ী আরবগণ কাবার দেব মূর্ত্তি বিনাশের সংবাদ পাইয়া শীঘ্রই মহম্মদের বিরুদ্ধে রণ সজ্জা করিল। মহম্মদ কোন গুপ্তচর দ্বারা তাহাদের এই চেষ্টা অবগত হইয়া উপস্থিত বিপৎপাত নিবারিণের উপায় দেখিতে লাগিলেন। শীঘ্রই বহুল পরিমাণে সেনা সংগৃহীত হইল। মহম্মদ অগ্রেই বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া বিজয় শ্রীর সহিত প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করিলেন।

এই সময় হইতে মহম্মদের উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইল। পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এখন এক মাত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতেন না; ধর্ম্ম প্রচার ও সাম্রাজ্য লাভ, উভয়ই এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য হইল।

সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত হইলে মনোবৃত্তি পরিচালনে সক্ষম হওয়া যায়; দুরবস্থা লোককে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন রাখে, এ নিমিত্ত নিতান্ত দরিদ্রের মধ্যে মানসিক শক্তি সম্পন্ন প্রখর বুদ্ধিমানের সংখ্যা অল্প দেখা যায়। দরিদ্রগণ ধনীদিগের ভক্ষ্য ভোজ্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া নিরন্তর মনে করিয়া থাকে, "এ রূপ অবস্থাপন্ন হইলে মানসিক উন্নতি লাভ সহজ ব্যাপার।" পক্ষান্তরে বিলাস বাসনা যে ধনের নিয়ত সহচর ও সমুদয় উন্নতির হানিকারক, ইহা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না।

মহম্মদ ও তদীয় সহচরগণ রাজ্য লাভকে ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায় মনে করিয়া হয়ত প্রথমে তাহাতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পরিশেষে যখন রাজ্য ভোগের আস্বাদ পাইলেন, তখন যে ধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা রাজ্য ভোগ বাসনা সহজেই বলবতী হইয়া উঠিল, এ কথা বলা বাহুল্য। পুনঃ পুনঃ জয়, রাজ্য ও ধন সম্পত্তি লাভে তদীয় অন্তরে যে বিলাস বাসনা বিলক্ষণ বলবতী হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

এই রূপে মহম্মদ ধর্ম্ম প্রচার ও যুদ্ধ

কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে সম্রাট হিরা ক্লিউস তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার বাসনায় আরব ও সিরিয়া দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহম্মদ এই সমাচার পাইয়া, যথা সাধ্য প্রতিকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রমে বিংশতি সহস্র পদাতি ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল। তিনি নিজ জামাতা আলির হস্তে মদিনা রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং সসৈন্যে বিপক্ষ দমনে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ আরবের সীমা অতিক্রম করিলে, অনেকানেক রাজা মহম্মদের শরণাগত হইলেন। এই যাত্রায় এইরূপ জয় লাভ করিয়াই মহম্মদীয়েরা সন্তুষ্ট চিত্তে মদিনায় প্রত্যাগমন করিল।

মহম্মদ শিষ্যদিগের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বীয় অন্তঃপুরে তত দূর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। একদা স্বীয় উপপত্নী মিরিযর সহিত আমোদে মত্ত আছেন, এমন সময়ে হাফেলা নাম্নী তদীয় এক জন বনিতা, হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়া সর্ব্ব সমক্ষে এই রহস্য প্রকাশ করিয়া দিল। মহম্মদের ঈদৃশ আচরণে তাঁহার বনিতাগণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইল। মহম্মদ কিছুকাল অপ্রতিভ থাকিয়া পরে বলিলেন, "ব্যভিচার সাধারণ মানবগণের পক্ষে পাপ বটে, এবং তাহারা এই পাপের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু ঈশ্বরের দূত এই নিয়মের অন্তর্গত নহেন।" যদি এই ঘটনা সত্য হয়, তাহা হইলেও নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। মহম্মদ যে হেতু প্রদর্শন করিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিয়াছিলেন, যদিও তাহা যুক্তি সঙ্গত নয়; কিন্তু নিরন্তর পুণ্য পদবীতে পরিভ্রমণ করা মানবস্বভাবসাধ্য নহে; হঠাৎ পাপাশক্ত হন নাই, এমন লোক জগতে দুর্লভ। চির জীবন ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও হঠাৎ এক সময়ে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যে পাপাশক্ত হইতে পারেন। মহম্মদ মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং কোন সময়েই পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, এরূপ নহে। অনেকে এই সকল দোষ দর্শন করিয়া মহম্মদকে প্রবঞ্চক প্রভৃতি নানা রূপ গালি দিয়া থাকেন; বিশেষ বিবেচনা করিলে এরূপ ভর্ৎসনা যে নিতান্ত অন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই। মহম্মদের প্রভূত ক্ষমতা ও সদ্গুণ সমূহের সহিত তুলনা করিলে দোষের ভাগ অতি অল্প।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিজরী শাকের নবম বর্ষ উপস্থিত। এই সময়ে মহম্মদ দেখিতে পাইলেন, সমুদয় আরব তাঁহার করতলস্থ, প্রধান প্রধান শত্রুগণ হত বা অপদস্থ; যেখানে তাঁহার আক্রমণ, তথায়ই জয় লাভ; তাঁহার প্রতি শিষ্যগণের অবিচলিত ভক্তি। এই সকল কারণে তিনি সমগ্র ভূমণ্ডলে জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিতে অভিলাষ করিলেন। এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি রমজানের রোজার সময়ে প্রিয় শিষ্য আলির দ্বারা কোরাণের একটি নূতন অধ্যায় প্রকাশ করিলেন। এই অধ্যায়ের সার মর্ম্ম এই যে, "অদ্য হইতে চারি মাসের মধ্যে অবিশ্বাসীগণ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ বা মহম্মদকে কর প্রদান না করিলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।" এই আদেশ সর্ব্বত্র প্রচার হইলে অনেক

লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, অনেকে পূর্ব্ব ধর্ম্মে থাকিয়া মহম্মদকে কর প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উপপত্নী মেবিয়ার গর্ভ-জাত মহম্মদের একটি পুত্র সন্তান দেহ-ত্যাগ করে; মহম্মদের আর পুত্র সন্তান ছিল না, সুতরাং এই শিশুর মরণে মহ-ম্মদ নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন।

আত্মজের মৃত্যু নিবন্ধন শোক, বৃদ্ধ কালের জরা, যাত্রার প্রাককালে অমঙ্গল, আজীবন যুদ্ধ ও তন্নিবন্ধন নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া মহ-ম্মদ পূর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার শরীর নিতান্ত শীর্ণ হইয়াছিল; তিনি শারীরিক অবস্থা দৃষ্টে মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিয়া, অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্ম কার্য্যে অতিবাহিত করিতে সংকল্প করিলেন, পরিশেষে এই অভিপ্রায়েই মক্কা গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রীতিমত নমাজ ও বলি-দানাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ার পর শিষ্যদিগকে নানা বিধ সদুপদেশ প্রদান করিলেন। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পরিশেষে মদিনা প্রত্যাগত হইলেন। এদিগে আসাদ ও মসিলামা নামা দুই ব্যক্তি আবার আপনাদিগকে স্বর্গের দূত বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আর এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মহম্মদ শীঘ্রই লোক পাঠাইয়া ইহাঁ-দিগকে নিরস্ত করিলেন।

পরিশেষে খ্রীষ্টের ৬৩২ শালে (হিজি-রীর একাদশ শালে) যে মহাপুরুষ শৈ-শবে পিতৃবিহীন হইয়া পিতৃব্যের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও সমুদয় আরবদেশকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতি-ষ্ঠিত নব ধর্ম্মাবলম্বী শিষ্যগণ মধ্য সময়ে ভারত হইতে স্পেন পর্য্যন্ত আপনা-দিগের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, তিনি মানবসুলভ অনন্যসাধারণগতি মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।

তীর্থ মহিমা।*

আর্য্য জাতির মধ্যে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ অতি আদ-রণীয় প্রথা। অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে সন্ন্যাস মুক্তির অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার কারণ সুজ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হইবে।

মনুষ্য মাত্রেরই উন্নতির ইচ্ছা স্বভাব-জাত। এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ইচ্ছা হইতেই অভিলাষ ও বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয়। উন্নতি পথের সীমা নাই। সুতরাং যত উন্নত অবস্থাই কেন লাভ হউক না, তৃপ্তি বা আত্মার নিবৃত্তি হয় না। অপিচ এই আশা সকলের সমান নহে। আমার ভৃত্য আমার অবস্থা ও আমি আমার উচ্চ কর্ম্মচারীর অবস্থার

* তারকেশ্বরের মোহন্তের দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধীয় নাটক। শ্রী নিমাই চাঁদ শীল প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও চুঁচুড়া বেঙ্গল মেগাজিন আপিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা।

জন্য প্রত্যাশী। এক উচ্চাভিলাষ দ্বারা উভয়ে উত্তেজিত, কেবল অবস্থাভেদে লক্ষ্য ভেদ। আর্য্যগণ যৎকালে কৃষি-কার্য্যোপযোগী উৎকৃষ্ট "হলে লাঙ্গলাদি" প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই, তখন সর্ব্বদাই তদুদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। কিন্তু যখন সে লক্ষ্য কিয়ৎপরিমাণে সংসিদ্ধ হইল, তখন আহার্য্যাহরণের সামান্য শ্রমও ক্লেশকর বোধ হইয়া উঠিল। তখন ভাবিলেন, অঙ্গ সঞ্চালন না করিতে হইলেই ভাল হয়। পক্ষান্তরে অর্দ্ধ সভ্য লোকসুলভ অসামান্য কল্পনা-পরায়ণ হইয়া জন্ম মৃত্যুতে কতই ক্লেশ কল্পনা করিলেন। এই সমুদয় ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্ব্বাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস মনুষ্যের গতির পরাকাষ্ঠা সিদ্ধান্ত করিলেন। আবার "কর্ম্মফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী," এ জ্ঞান লোকের প্রকৃতি সিদ্ধ, সুতরাং কর্ম্ম জাল সূত্র হইতে মুক্তিই নির্ব্বাণ, এরূপ প্রতীতি হওয়া অন্যায় নহে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে কর্ম্ম-জালসূত্র হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সংসারে থাকিয়া কখন কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব এই সকল কারণ পরম্পরা হইতে যে রত্ন-গর্ভা ভারতবাসী সুকুমারমতি তৎকালীন আর্য্যগণ সন্ন্যাসকে সদ্‌গতির অনন্য উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে দার পরিগ্রহ না করিয়া সমুদয় জীবন একাকী কর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অবস্থার লোক যতই কেন সচ্চরিত্র হউক না, কখনই গৃহস্থদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস-পাত্র হইতে পারে নাই। মনুষ্য চির দিন স্বকীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধে বাস করিবে, এরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল, অপিচ অসংসারীর দ্বারা পৃথিবীর অতি অল্পই উপকার হইতে পারে। এই কারণ বশতঃ চক্রী-চূড়ামণি পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ কলিযুগে সন্ন্যাস আশ্রম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ সাধু অথচ জ্ঞানবান লোক সংসারে অতি বিরল নহে। এই জন্যই ভাগবতে নিরাশ্রম বৈষ্ণব * মত দৃষ্ট হয়। এবং এই জন্য রামানুজ, রামানন্দ প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দুই সম্প্রদায়েরই ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে অনেক মঠ আছে। তন্মধ্যে ২১ টী মঠের বিস্তর ভূসম্পত্তিও আছে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দু যাত্রিকগণ সেই সকল মঠে অনেক উপঢৌকন দিয়া থাকেন। প্রতি মঠে এক এক জন প্রধান মোহন্ত থাকে। এই মোহন্ত চির জীবন বিবাহ করিতে পারে না। অধুনাতন এই রূপ মোহন্তদিগের মধ্যে অনেকেরই যার পর নাই লাম্পট্য দোষ দেখা গিয়া থাকে।

এই রূপ মঠের মধ্যে শৈবদিগের তারকেশ্বরের মঠ অতি প্রধান ও আদরণীয় স্থান। কথিত আছে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য দিগ্‌বিজয় করিতে বহির্গত হইয়া এই মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। তীর্থ মহিমা এই তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মোহন্ত মাধব গিরির লাম্পট্য দোষ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহার

* ভাগবত একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

মূল ঘটনা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং আমরা আর তাহা বর্ণন করিলাম না। এ বিষয় লইয়া দেশ মধ্যে বিস্তর আন্দোলন হইতেছে। নাটক রচনা, নাটকাভিনয়, চাঁদা সংগ্রহ, রাজদ্বারে আবেদন প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে।

অত্যাচারীর উপর বঙ্গবাসীদিগের এতাধিক ঘৃণা দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহাদিগের পরিশ্রম সফল হউক, হতভাগ্য নবীন অল্প দণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করুক।

তীর্থ মহিমাতে নাটকোচিত প্রায় সমুদয় গুণই লক্ষিত হইল। বিপিন ও পূর্ণ কেশীর পবিত্র দাম্পত্য প্রেম, মোহন্তের লাম্পট্য, বেচারামের ষড়যন্ত্র ও কু অভিসন্ধিতে নিপুণতা, মায়াবতীর কুলটা স্ত্রী জনোচিত ব্যবহার ও বুদ্ধি, জ্ঞান এবং পরিশেষে নৈরাশ্য এবং দামিনীর প্রকৃত অনুতাপ ও আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠতা বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা যে জড় দেহ মাত্র নহে, গ্রন্থকার বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের জটিল প্রমাণাপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী। মোহন্তের স্পর্শে পূর্ণকেশীর দেহ অপবিত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আত্মা (প্রকৃত পূর্ণকেশী) পূর্ব্ববৎ পবিত্র ভাবেই অবস্থিত ছিল। বরং উৎপীড়ন ও প্রলোভনে আরও বলীয়ান্ হইয়াছিল।

হয় ত সাধারণ লোকে মনে করিতে পারেন, পূর্ণকেশী অসতী, কিন্তু আমাদিগের মতে পূর্ণকেশীর ন্যায় সতী স্ত্রীলোক জগতে আছে কি না, সন্দেহ। যে ষড়জালে পূর্ণকেশীর দেহে মোহন্তের কর-স্পর্শ হয়, তাহা অতি বিচিত্র ও পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণকারী অথচ অপ্রাকৃতিক নহে। গ্রন্থকার এই বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন যে অলৌকিক ঘটনা বর্ণন না করিয়া গ্রন্থকে মনোহর করিয়াছেন।

পূর্ণকেশী সংবাদ পাইলেন যে, বিপিন কলিকাতা মোকামে প্রাণ সংশয় পীড়িত। একজন গণৎকার গণনা করিয়া বলিল, পূর্ণকেশী তারকেশ্বরে হত্যা দিলে বিপিনের শুভ হইবে। পূর্ণকেশী এক বার তারকেশ্বরে যাইয়া পিশাচের হস্তে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোমল-হৃদয় দামিনীর সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। এবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পতির অমঙ্গল আশঙ্কায় ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া লোকে যাহা বলিল, তাহাই করিলেন। পূর্ণকেশী তিন দিবস পর্য্যন্ত তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া রহিলেন। গ্রন্থের এই অংশটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

মোহন্তের প্রবেশ।

মোহ। এ সময় কে অমন করে কথা কয়? কে অমন করে বাবার নিদ্রা ভঙ্গ করছে?

মালি। বাবা, আমাদের দোষ ক্ষমা কর, আমরা জানি না।

মোহ। তোরা কে?

মালি। বাবা, এই মেয়েটী তিন দিন বাবার দোরে পড়ে আছে, আজ্‌কের রাত পোহালেই উঠিয়ে দেবে, কেঁদে খুন হল, তা বাবা, তুমি যদি দয়া করে একটীবার এ অবলার জন্যে তোমার অনাথনাথকে বল।

পূর্ণ। মোহন্ত ঠাকুর, তোমায় পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর।

মোহ। ভাল, ভাল, তোর জন্যে অনাথনাথকে বল্‌ছি; তোর নাম কি?

মালি। পূর্ণকেশী।

[মোহন্তের প্রস্থান।]

মায়া। দেখি, আজ্ কপালে কি আছে! (নীরব।)

নেপথ্যে। মোহ। অনাথনাথ, তোমার এ কি বিচার? এমন করে জীবকে দুঃখ দিলে কে আর অনাথপুরে আসবে? কে আর এ মন্দিরে হত্যা দিবে? কে আর তোমাকে বিপদে দয়াময় বলে ডাক্‌বে?

মালি। শুন পূর্ণকেশী, মোহন্ত বাবাকে বক্‌ছেন। দেখ্‌ছো মোহন্তের কত জোর।

পূর্ণ। তাইত ঠাকুরের সঙ্গে এমন করে কথা কচ্ছেন!

মালি। ঠাকুর আর কে!

নেপথ্যে। বেচারাম। উচ্চ হাস্য।

নেপথ্যে। মোহ। হেঁসে উড়িয়ে দিলে হবে না, তুমি আশুতোষ, তুমি ভোলানাথ, কিন্তু তুমি সকলই জান।

নেপথ্যে। বেচা। ভোগপূর্ণ হলে তবে ত দয়া।

নেপথ্যে। মোহন্ত। তা বলে মানুষে অনাহারে ক দিন বাঁচে? যদি হত্যা দিয়ে কারু মরণ হয়, তবে আর তোমার কাছে কে আস্‌বে?

পূর্ণ। ঠাকুরকে অমন্ করে কে বক্‌ছেন।

মালি। যে ঠাকুর, সেই মোহন্ত!

নেপথ্যে। বেচা। তা এখন কি কর্‌তে হবে বল?

নেপথ্যে। মোহন্ত। এই যে একটা পূর্ণকেশী বলে স্ত্রীলোক তার স্বামীর আরোগ্যের জন্যে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, তার প্রতি দয়া না কর্‌লে সে আর কতক্ষণ বাঁচবে?

নেপথ্যে। বেচা। ওর প্রতি আমার দয়া আছে, আমিইত গণৎকার হয়ে ওকে হত্যা দিতে বলে এসেছিলেম!

নেপথ্যে। মোহ। তোমার লীলা তুমিই জান।

মালি। শুনলে?

পূর্ণ। আমার গা কেঁপে উঠ্‌ছে, এ দুঃখিনীর বাড়ীতে বাবা অনাথনাথ আপ্‌নি গিয়েছিলেন।

মালি। আহা, হেলায় হারিয়েছ! তোমার বাবাই পুণ্যবান্।

(নেপথ্যে বাদ্যের শব্দ।)

এইবার বুঝি বাবার কাছে স্বর্গ হতে বিদ্যাধরীরা নাচ্‌তে গাইতে এলো।

পূর্ণ। তাই ত কি আশ্চর্য্য!

(স্বর্গ বিদ্যাধরী ভানে অন্যের আগমন দ্বারা পূর্ণকেশীর বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ।)

নেপথ্যে। বেচা। বৎসে পূর্ণকেশী! তুমি একবার আমার অনাথপুরে এসে বিপদে পড়েছিলে, মনে মনে তোমার আমার উপর অভক্তি হয়েছিল, এখানে আর আস্‌বে না বলেছিলে, সেই জন্যে তোমার এই বিপদ।

পূর্ণ। দোহাই বাবা, আমার ঘাট্ হয়েছে।

নেপথ্যে। বেচা। আমি ভোলানাথ, স্ত্রীলোকের সে সকল বিপদ ঘটিয়ে দেওয়া আমার লীলা খেলা। তা যা হোক্, তোমার উপর আমার দয়া আছে। আর আমি তোমার কঠোর হত্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিচ্ছি। এখনি উঠে গিয়ে আমার পুরীর দক্ষিণে জঙ্গলা পুকুরে স্নান করগে। তার পর সূর্য্যোদয় হলে মন্দিরে এসে এক অহোরাত্র অবস্থান করে আমার স্বরূপ আমার মোহন্তের আদেশ মত কাজ কর্‌বে, তা হলে তোমার স্বামী আরোগ্য হবে।

পূর্ণ। দয়াময়! কৃতার্থ হলেম। (প্রণাম) মালীবউ, তবে চল?

মালি। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সরল-মতি বালিকা পূর্ণকেশী কেন, এরূপ ভয়ানক ষড়জালে আবদ্ধ না হয়, এমন লোক অতি বিরল।

পূর্ণকেশীর সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি ভক্তি বিষয়ে নিম্নের কএকটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।—

"পূর্ণ। (স্বগত) অনাথনাথ! পূর্ণকেশী

কি এ বিপদ হতে রক্ষা হবে না! তোমার মন্দিরে কি অবলার সতীত্ব নষ্ট হবে? দয়াময়; তা হলে ত তোমার দয়াময় নামে কলঙ্কের ডঙ্কা বাজ্‌বে! তা হলে কুলবতীর কুলে যে আর কেউ তোমার চরণে শরণাপন্ন হবে না!

পূর্ণ। (আসীন ও স্বগত) উহঃ! কি ষড়যন্ত্রেই আমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে! (রোদন) মা! তুমি কোথায় রয়েছো মা! তোমার এত সাধের পূর্ণকেশীর কি দশা হল এক বার দেখ মা! মা! তুমি এমনও রাক্ষস পিতার হাতে আমাকে সমর্পণ করে গিয়েছিলে! বাপ হয়ে ধনের লোভে আপ্‌নার মেয়ের এই দশা করে! বাপ্‌ কি মেয়েকে জন্মদুঃখিনী কর্‌বার জন্যে প্রতিপালন করে! মেয়ের গলায় ছুরী দেবার জন্যে বাপ্‌ কি আহার দিয়ে মেয়েকে বড় করে! বাবা, তোমার মনে যদি এই ছিল, তবে তুমি কেন আমার বিয়ে দিয়েছিলে! আজন্ম অবিবাহিতা রেখে কেন এ শত্রুতা সাধন কর্‌লে না! ধর্ম্মের পথে লয়ে গিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লে! আমার সার সতীত্ব ধর্ম্ম নস্ট কর্‌লে! বড় দীদী, আমি তোমার কি অপরাধ করেছিলেম! আমি ত তোমাকে মার্‌ মত দেখি, আমি তোমাকে মার মত ভক্তি করি, তবে তুমিই বা এমন কাজ কেন করলে? অনুগতা সরলা ছোটবোন্‌কে কি এই রূপে নষ্ট করতে হয়! এমনি করে কি প্রাণের ভগ্নীকে স্বামী সুখে বঞ্চিত করতে হয়! অতি বড় শত্রু যে, সেও ত এমন আগুন কারু বুকে জেবলে দেয় না! হায়, হায়! এই কি তোমার ধর্ম্ম! এই কি তোমার আমার প্রতি স্নেহ মমতা! মায়ের পেটের ভগ্নীর প্রতি এই কি তোমার ভালবাসার পরিচয়! পতি মনমোহিনী সতী, পতির স্বর্গের সুখ, তাকে তুমি বেশ্যার অধম করলে! হায়, হায়! আজ পর্য্যন্ত এমন অকারণে কোন সতীর এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে? স্বামীর সর্ব্বস্ব ধন, কত আদরের কত যত্নের স্ত্রীর সতীত্ব, আমার মত কার নষ্ট হয়েছে? হায়, হায়! যারা রক্ষা করবে, তারাই নষ্ট করলে!

দামিনী বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্যারিস্‌ রহস্যের কুলীন তনয়ার ন্যায় তাঁহার অন্তরের সাধু ভাব সকল তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পাপ গ্রাসে পতিত হয় নাই। এবং পরিশেষে অনুতপ্ত হৃদয়ে ভৈরবী হইলেন। বস্তুতঃ যৌবনোন্মত্ত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলে যখন দুষ্প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ শাম্য হয়, তখন দামিনীর ন্যায় অনেকে "হা! হা! তা আমার সতীত্ব কই! পূর্ণকেশী, সোনার পূর্ণকেশী, আমি গোবরের পূর্ণকেশী!" এইরূপ পরিতাপ করে।

অর্থলোলুপ পূর্ণকেশীর পিতা কালীকমলের উক্তি গুলিন অতি স্বাভাবিক ও মনোহর হইয়াছে। কালীকমলের ন্যায় লোক অস্মদ্দেশে নিতান্ত বিরল নহে।

পরিশেষে আমরা নায়ক নায়িকার প্রকৃত দাম্পত্যের একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে পূর্ণকেশীর স্ত্রী জনোচিত সরলতা ও কোমলতা এবং বিপিনের পত্নীর প্রতি আন্তরিক প্রেম, অথচ স্ত্রৈণতা নহে, বীর পুরুষের ন্যায় বীর্য্য তেজস্বীতা সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা রে পাজি নচ্ছার বুড়ো। কোথায় পালালি! মায়া, তুই বা কোথায় গেলি? যাবি কোথায়? আজ্‌ কেটে খণ্ড খণ্ড কর্‌বো? তার পর এই নচ্ছারণীকে কাট্‌বো। মূর্চ্ছা হয়েছে দেখ্‌ছি! কোন্‌ ভয়ে মূর্চ্ছা হল? তোর আবার ভয় কিসের? স্বামী দেখেছো তারই ভয়! ছাই, ছাই, ভস্ম! বেশ্যার আবার ভয়! এ মূর্চ্ছা আর না ভাঙ্গে; অমনি জীবাত্মা পাপ দেহকে ত্যাগ করে; তবে আমাকে আর খুন করতে হয় না! না, না, তা হলে সুখের মৃত্যু হল! কুলটার দোষ প্রকাশ হয়ে একবার ত স্বামীর মুখ পানে চাইতে হল না! তবে

আর হল কি; পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হল; দুষ্কর্ম্মের কি দণ্ড হল? এ সকল দণ্ড ভোগ করে তবে ত প্রাণদণ্ড। এ কপট স্ত্রীর সেই ত উপযুক্ত দণ্ড! পাপীয়সি! স্নেহ, ভালবাসা, স্বামীভক্তির কি পরিমাণই স্বামীকে দেখিয়ে এলি! স্বামী মূর্চ্ছা হয়ে পড়্‌লো, বাঁচ্‌বে কি মর্‌বে তা একবার মনে ভাব্‌লি না. দুষ্কর্ম্মের পরিপাক কর্‌তে পালিয়ে এলি!—তবে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি; ছুঁবো না ত; আর কখনই ছুঁবো না! যদি ছুঁতে হয় তবে একেবারে তরবার দিয়ে ছুঁবো, ও পাপ দেহে আর হাত দেব না! (মুখে জল প্রদান ও বায়ু সঞ্চালন) চণ্ডালিনি, শীঘ্র উঠ? একবার আমার মুখ পানে চা? আর সহ্য হয় না? ঈশ্বর। এরূপে যেন পাপিয়সীর মৃত্যু না হয়। কলঙ্কিনীর মৃত্যুতে যেন কলঙ্ক ঘটে না। এই যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গ্‌ছে, ভাঙ্গ্‌বেই ত, এখনো চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছেন, এখনো রাত দিন হচ্ছে?

পূর্ণ। (চেতনান্তর করযোড়ে) নাথ, এখনো আমায় খুন কর নি? এখনো আমার পাপের দণ্ড দাও নি? এখনো আমাকে জীবিত রেখেছো? হায়, হায়, আবার আমার জ্ঞান হল? আবার এ পোড়ারমুখ তোমায় দেখ্‌তে হল? আমায় খুন কর? আর বিলম্ব করো না? আর আমার সহ্য হয় না! তোমার পায়ে পড়ি! (রোদনে বাক্য অস্পষ্ট)

বিপি। উঠ্, নচ্ছারণী! আর ছলনা করিস্ নে! খুন ত কর্‌বোই! তা কি এখনি কর্‌বো আগে এ পাপের যত দণ্ড আছে সব ভোগ কর, তবে খুন কর্‌বো? কোথায় গিয়েছিলি বল?

পূর্ণ। (কষ্টে উপবেশন।) নাথ, তোমার পায়ে পড়ি, এ গুরু দণ্ড আর আমায় দিও না? আমি এ পোড়ার মুখে সে পাপ কথা তোমায় কেমন করে বল্‌বো? হায় রে প্রাণ! তুই এখনো এপাপ দেহে রয়েছিস্? আমি মৃত্যুর জন্যে তোর চরণে কত দিন কত মিনতি করেছি, তা আর কেন, এই ত সময় হয়েছে, স্বামীর সম্মুখে এই সময় যা, শীঘ্র যা, আর সহ্য হয় না! (রোদন)

বিপি। আবার নাকে কাঁদতে বস্‌লি আমি কি তোর ছলনায় ভুলবো মনে করেছিস?

পূর্ণ। নাথ, আমি কি মরণকে ভয় করছি! অভাগিনীর প্রাণ ত তোমারই। তোমার হাতে আমার মরণ হবে, তুমি আমার পাপের দণ্ড দিবে, এত আমার পরম ভাগ্যি! তা নাথ, পাছে তুমি আমায় খুন করে কোন বিপদে পড়, সেই ভয়ে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! আমায় যা হয় একটা অস্ত্র দাও, আমি এখনি তোমার সামনে আপনার হাতে প্রাণ নষ্ট করছি। নাথ, আমার যদি মূর্চ্ছা না হত, আমি কি এসেই প্রাণত্যাগ করতেম না? আবার তোমাকে কি এ মুখ দেখাতেম? তা পাপের উচিত দণ্ড হবে বলেই এখনো বেঁচে আছি। আমার মত পাপিয়সীর এমন মরণ কেন হবে!—হা রে দুরাচার মোহন্ত! হা পাপিষ্ঠ বাপ! হা সর্ব্বনাশী দীদী! এই সময় একবার আয়, তোদের দুষ্কর্ম্মের শেষ ফল একবার দেখে যা! অবলার দশায় কি হল একবার চক্ষে দেখে যা? (রোদন।)

বিপি। সব বল? কি হয়েছে সব বল? বলতেই হবে।

পূর্ণ। নিতান্তই যদি জিদ্ কর তবে বলি।

বিপি। বল, শীঘ্র বল্।

পূর্ণ। বিষম ষড়যন্ত্রে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। বাবা, দীদী, আর মোহন্ত পরামর্শ করে আমার সর্ব্বনাশ করেছে। পূর্ব্বে একবার দীদীর কথায় অনাথপুরে গিয়ে বিপদে পড়ি, দামিনী আমায় রক্ষা করেন। তখন কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি, তবে অনাথপুরে আর যাব না এইটী মনে ছিল।

বিপি। তবে আবার গেলি কেন?

পূর্ণ। এক দিন মালীবউ কল্‌কাতা হতে এসে বললে তোমার শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, সর্ব্বনেশে মোহন্ত গণৎকার সেজে এসে বাবাকে বলেছিল আমি অনাথনাথের কাছে হত্যা দিলে তুমি ভাল হবে, ওরা জিদ করে আমায় হত্যা দিতে পাঠালে, আমারও প্রাণের দায়, সেই বার আমার সর্ব্বনাশ হল।

বিপি। উঃ কি প্রবঞ্চনা! তা তুমি কচি খুকী কি না?

পূর্ণ। প্রথমে ওরা কত বুঝালে, কত কি প্রসাদ বলে, চরণামৃত বলে আমায় খাওয়াতে চাইলে, আমি কারু কথায় কিছু খেলেম না। তার পর মোহন্ত বাবাকে অনেক টাকা দিলে, ওরা সকলে আমায় ফেলিয়ে পালালো রাক্ষস মোহন্ত আমায় একটা ঘরে পুরে রাখলে।

বিপি। আগে তোর বাপকে কাটবো?

পূর্ণ। তার পর আমি নিরাশ্রয়া মেয়ে মানুষ, কত কাকুতি মিনতি করলেম, দুরাচারের পায়ে কত মাথা খুঁড়লেম, কিছুতেই কিছু শুনলে না। তার পর সে আর বেচারাম আমার বুকে হাঁটু দিয়ে আমার গলায় মদ ঢেলে দিলে, আমায় উলঙ্গ করে দিলে, আমি সেই নরকের একটী কোণে গিয়ে লজ্জা রক্ষা করে থাকলেম। তার পর কি হল— (রোদন)।

বিপি। আর বলো না, প্রাণ ফেটে যায়! রে দুরাচার মোহন্ত, তোর মাথা আমি কাটবোই কাটবো?

পূর্ণ। নাথ, মোহন্ত আর বেচারামকে যদি আমার সম্মুখে কাটো, কেটে যদি এ কলঙ্কিনীকে কাটো, তা হলেই জানবো যে আমার উপর তোমার দয়ার সীমা নাই।

বিপি। তা আবার গেলে কেন?

পূর্ণ। তার পর, ঐ বুড়ো পাপিষ্ঠ বাপ, আমি মেয়ে, আমার পায়ে ধরে কাঁদতো, আমাকে ভগবতী বলে কতই স্তব স্তুতি করতো। যে দিন আমায় পাঠাবে দীদী আমায় কখন কি খাইয়ে দিত, সন্ধ্যার সময়ই যেন আমার জ্ঞান থাকতো না, তখন আমায় লয়ে ওরা যা নয় তাই করতো।

বিপি। উঃ! কি ভয়ানক বাপ!

পূর্ণ। কতদিন উপবাস করেছি যেতেও হয় নি! নিতান্ত যাব না বল্লে মোহন্তকে কোন দিন এখানে আনাত। কোন দিন বেচারাম চোপদার এনে ধরে নিয়ে যেতো।

বিপি। অরাজক! অরাজক!

পূর্ণ। কিন্তু নাথ, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, ধর্ম্মকে সাক্ষী করে বলছি, প্রতিদিনই তার কাছে রোদন করেছি, তার পায়ে মাথা খুঁড়েছি, মুখ চিরে মদ ঢেলে দিয়েছে, তবে আমার দেহকে—

বিপি। তা আমায় এ কথা বলনি কেন?

পূর্ণ। এদের ভয় দেখানতে। আর এর মধ্যে তুমি একবার মাত্র এসেছিলে। মনে করে দেখ বলিনি বটে, কিন্তু সঙ্গে যাবার জন্যে কত জিদ করেছিলেম ও কত কেঁদেছিলাম।

বিপি। আহা! হা! হা! হা! আমি নরাধম! আমিই স্ত্রীকে রক্ষা কর্ত্তে পারি নাই।

পূর্ণ। আজ অনাথপুরের পথে একটী ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হল, তিনিই দিদিকে অনেক গঞ্জনা দিয়ে, তুমি আজ আসবে বলে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন।

বিপি। ভৈরবী সেই দামিনী। তিনিই আমায় প্রথম বলেন।

পূর্ণ। তিনিই দেবী, তিনিই আমার মায়ের কাজ করেছেন। নাথ, এই ত সব বল্লেম, এখন তোমার উচিতে যা হয় তাই কর, আপনার হাতে প্রাণ দণ্ড করে সুখী হও এখনি কর, না হয় আমায় আজ্ঞা দেও আমি তোমার সামনে এখনি মরি। নাথ, যা বল্লেম সকলই সত্য, অবিশ্বাস করো না। পাপ স্বীকার করেছি, কুকর্ম্ম করেছি বলে, মনে ঘৃণা হয়েছে, মরণে প্রস্তুত হয়েছি, আর বিলম্ব করো না।

বিপি। প্রিয়ে, আমি তোমায় ক্ষমা করলেম, তোমায় সতী বলে আবার আমি গ্রহণ কল্লেম; আমার প্রতি তোমার ভালবাসা অসীম বলেই তোমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছিল।

পূর্ণ। (চরণে পড়িয়া) নাথ, আমি তো তোমার এত দয়ার যোগ্য নই! এ অসীম দয়াতে যে তোমার কলঙ্ক হবে! এমন চণ্ডালিনী এমন পাপীয়সী স্ত্রীকে কোন্ স্বামী ক্ষমা করে! কোন্ স্বামী এমন দয়া করে! নাথ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় এ দয়া করো না? এ পাপের ভার আমি কেমন করে বহন করবো! এ অনল আমি চিরদিন কেমন করে বুকে রাখবো! তোমার মুখপানে চেয়ে অসতীর লজ্জাভয়ে অমনি আমাকে হেট

হতে হবে, আমি সে যাতনা কেমন করে সহ্য করবো? নাথ, প্রাণদণ্ড হতেও এমন করে বেঁচে থাকা আরো গুরুদণ্ড! যদি নিতান্তই দয়া কর, তবে এই আজ্ঞা দাও যে আমি আপনার প্রাণ আপনিই নষ্ট করি! (রোদন)

বিপি। পূর্ণকেশী, আর বলো না, আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমারই জন্যে তোমার এ দুর্দ্দশা হয়েছে, যুবতী স্ত্রীকে কেমন করে রক্ষা করতে হয়, তা আমি জান্‌তেম না, আমারই অবহেলায় পাঁচ জনে তোমাকে নষ্ট করেছে, তুমি আমায় ক্ষমা কর?

পূর্ণ। হায় রে, এমন গুণের স্বামী কি কারু হয়!

বিপি। তোমাকে আমি তেমনি ভাল বাসবো, তেমনি যত্ন করবো, আরো যত্ন করবো, তুমি সতী, তুমি অন্তরে সতী, তোমার চরিত্র পবিত্র, তুমি আমার স্বর্গের সুখ।

পূর্ণ। নাথ, তবে যদি আমায় ক্ষমা করলে, আমায় এখান হতে লয়ে চল, এ পাপ পুরীতে আমায় আর এক দণ্ড রেখো না। আমায় যেন আর এ নিষ্ঠুর পাপী পিতার মুখ দেখতে না হয়।

বিপি। প্রিয়ে, একথা আবার বলচো, কালই তোমায় লয়ে যাব। এখন মুখে হাতে জল দাওসে?

[উভয়ের প্রস্থান।]

"সতীর চক্ষে এত জল, তবে মেঘে আবার কিরূপে জল করিবে" এরূপ কবিত্ব সাহিত্য সংসারে অতি বিরল।

এই পুস্তক যে একবারে দোষ শূন্য, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা জোঁকের ন্যায় রুধির অনুসন্ধান করি না। স্থানে২ ইচ্ছা করিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি ও উক্তি গুলিন দীর্ঘ করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন দৃষ্টে শুনিতে পাইলাম, গ্রন্থকার আরও কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা আমরা পাঠ করি নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিতে অক্ষম। উপস্থিত গ্রন্থ খানি পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি ও সময়ের সার্থকতা বিবেচনা করিয়াছি। এবং সামান্য পুরাতন গল্প লইয়া নিমাই বাবু যে বঙ্গ ভাষাতে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসা করি।

যোগের দ্বারা কালীকমলের ধন হরণ হইল। কিন্তু তাহা পাষণ্ড জানিতে পারিল না, সুতরাং ক্লেশানুভব করিল না।

পরিশেষে—স্থানে২ পূর্ণকেশী প্রভৃতি মহিলাগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ কথা কহিয়াছেন।

সভ্যতার ইতিহাস।

বক্লের মত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আমাদিগের বৃত্তি সমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত; মানসিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ইহার মধ্যে একের উন্নতিতেই অপরের উন্নতি হয়। সভ্যতা এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিচালনার ফল। কিন্তু এই বিষয় পণ্ডিতগণের মতে দুই ভাগে বিভক্ত। কোন২ পণ্ডিত বলেন, সভ্যতা মনোবৃত্তি পরিচালনার ফল। কেহ২ বলেন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্নত হওয়াতেই মানব সমাজ সভ্য হইতেছে। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে ইংলণ্ডদেশীয় সভ্যতার ইতিহাস লেখক হেনারী টমাস বক্‌ল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বক্‌ল

বলেন, মানবগণের নীতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই রহিয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা কোন উন্নতি সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে মানব মণ্ডলী ক্রমশঃই মানসিক উন্নতি করিতেছে, কত নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছে, কত নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতেছে, সুতরাং উন্নতিই এক মাত্র মনোবৃত্তি পরিচালনার ফল স্বরূপ।*

২ বক্‌ল সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, বক্‌ল কোন্ ইতিহাস হইতে এই সত্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ও বহুবিদ্যাবিশারদ একথা কখনই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু এটী তাঁহার বালকের ন্যায় উক্তি ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। আমরা নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বক্‌ল স্পষ্টাক্ষরে বলেন, অতি পূর্ব্বকালেও যেরূপ পরোপকার সম্পাদন ও পরের অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, এক্ষণেও সমাজ মধ্যে তাহাই রহিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকগণ রাশি রাশি গ্রন্থ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান লিখিয়াও ইহার কিছুই অধিক করিতে সক্ষম হন নাই। ভারত-মহাসাগরস্থিত বোর্ণীয় দ্বীপের * নীতি প্রণালী দেখিলে তাঁহার এবম্বিধ মত যার পর নাই অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তথাচ অদ্যাবধি ডিয়াক, হটান ও ব্রিটনে নামক জাতিত্রয় মধ্যে অন্ততঃ এক জন শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ না হইলে কোন যুবকই বিবাহিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইউরোপখণ্ডে যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইলেই উভয়ে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ক্যালিডোনিয়া † দ্বীপে, অদ্যাবধি রমণীগণ † নরমুণ্ড দ্বারা শরীর ভূষিত

* "পৃথিবীতে ধর্ম্মনীতির ন্যায় অল্প পরিবর্ত্তন শীল বস্তু আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরের উপকার কর; পরের জন্য আবশ্যক হইলে ত্যাগ স্বীকার কর; শত্রুর দোষ মার্জ্জনা কর; রিপু-দমন কর; পিতা মাতাকে ভক্তি কর—এই রূপ যে কএকটী নীতিশাস্ত্রের মূল, তাহা পূর্ব্বেও যে রূপ লোকের পরিজ্ঞাত ছিল, এক্ষণেও সেই ভাবে রহিয়াছে। ইদানীন্তন ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকগণ এতৎ সম্বন্ধে সহস্রং গ্রন্থ লিখিয়াও কিছুই বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন নাই।"

Buckle's History of Civilization, Vol I. p. 180.

এই বাক্যের প্রমাণ স্থলে বক্‌ল টীকাতে বলেন, খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগকে এমন একটী উপদেশও দেন নাই, যাহা পুরাকালীয় দেবদেবীর উপাসকগণ অবগত ছিলেন না।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন সভ্য সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এমন একটি সত্যও অবগত নহেন, যাহা পুরাকালীন লোকে জানিত না। পক্ষান্তরে মানসিক সম্বন্ধে কেবল সত্য কেন, অনুষ্ঠান প্রণালী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। আজ কাল এমন অনেক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, পুরাকালে যাহার নাম গন্ধও ছিল না।

সভ্যতা, ধর্ম্মনীতি ও মানসিক বৃত্তি উভয় হইতে সমুৎপন্ন। সভ্যতা উন্নতি-শীল। অপিচ ধর্ম্মনীতি এক ভাবে স্থায়ী, মানসিক ভাবের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং উন্নতি-শীল সভ্যতা একমাত্র মনোবৃত্তি পরিচালনারই ফল।

Buckle's Histroy of Civilization. Vol I, chapter IV. comparison between Moral and Intellectual Laws, p. 180-182.

* Britanica Encyclopædia on Borneo.

† Britanica Encyclopædia on Caledonia.



করে, এটী তাহাদিগের অলঙ্কার বিশেষ। সুতরাং নরহত্যা বা নরগণ গতাসু হইলে শারীরিক সৌন্দর্য্য লিপ্সু সরল মতি অবলাগণ যে আনন্দানুভব করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের অতি কঠিন প্রকৃতি যোষিৎগণ ও রোদনধ্বনি শ্রবণ অথবা মৃত দেহ দর্শন করিলে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—প্রাচীন আরবীয়গণ পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, বিধাতা তাহাদিগকে অনুর্ব্বরা মৃত্তিকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু মরুভূমির মধ্যে যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি ধনসম্পত্তি লইয়া আইসে, তাহা হইলে এ ধন সম্পত্তিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। এই বিশ্বাস আরবদিগের মধ্যে যারপর নাই প্রবল ছিল। ঈদৃশ বিগর্হিত আচরণ-আরবীয়দের জাতীয় প্রথা রূপে গণ্য হইত। * এমন, কি পবিত্রাত্মা ধর্ম্মসংস্কারক মহম্মদও এই বিশ্বাসাধীন হইয়া বিস্তর ন্যায় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। আবার ধর্ম্মোন্নত আর্য্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে পথিক অতিথি হইলে পরমারাধ্য "সর্ব্বদেব ময়োঽ তিথি।" † এবং গোহনন করিয়া অতিথিসংকার করা হইত, এই জন্য অতিথির নামান্তর গোঘ্ন। ‡

চতুর্থতঃ—মহাভারতের সময়ে আর্য্যদিগের মধ্যে পরাজিত নৃপের রমণীগণ জেতার উপভোগ্য হইত। তৎকালে এবং তাহার পূর্ব্ব সময়ে এই প্রথা বদ্ধমূল ছিল যে, ইহাকে মনু এক প্রকার বিবাহ নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ এবং ক্ষত্রিয়গণ * এই বিবাহে সম্পূর্ণ অধিকারী। পক্ষান্তরে মগধ বংশীয় রাজগণের সময়ে পণ্ডিতবর চাণক্য এই শ্লোক রচনা করেন।

"মাতৃবৎ পর দারেষু পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত।"

এবং উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইল, মহাত্মা ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে † তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ, ব্যভিচার মহা পাপ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আরও বলিতেছি যে কুভাবে পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও মনেং ব্যভিচার করা হয়।"

পঞ্চমতঃ—পূর্ব্বকালে জেতারা জিত লোক দিগকে সামান্য পশু পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিত। ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে বিক্রয় বা তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে পারিত। আবার যুদ্ধান্তে জর্ম্মানীয়গণ ফরাসিস দিগের নিকট যে অংশ সন্ধি সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় এক বৎসর অতীত না হইতে হইতেই সংস্কৃত কালেজ পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিয়া দিয়া কিরূপে অধিবাসিগণের প্রকৃত হিত সাধন করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার কারণ কি? আমাদিগের বিবেচনায়

* ইস্রায়েলীয়গণ শস্যশালী দেশের অধিকারী, পক্ষান্তরে ম্যায়েল তনয় আরবীয়গণ মরুময় দেশবাসী, এই ঘটনায় তাহাদিগের এরূপ অন্যায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

† বিষ্ণুশর্ম্মা রচিত ও সংগৃহীত পঞ্চতন্ত্র।

‡ আর্য্যজাতি। ২য় খণ্ড ১ সংখ্যা, জ্ঞাঃ।

* এ বিষয় সভ্যতার ইতিহাস প্রথম খণ্ডের বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

† মথি ৬ষ্ঠ অধ্যায় পার্ব্বতীয় উপদেশ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না। অধিকন্তু ইতিহাস বেত্তা এলিসন বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দাসত্ব মোচনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার।

ষষ্ঠতঃ—বঙ্গদেশে যখন তান্ত্রিক উপাসনা জনিত ব্যভিচার প্রবল হইয়া উঠিল, যখন মদ্যপান, যোনি পূজা, নর বলি প্রদান প্রভৃতি গর্হিত আচরণ মুক্তি-পথের অদ্বিতীয় সোপান বলিয়া জাতি সাধারণের বিশ্বাস হইয়া উঠিল, ঈশ্বর প্রসাদে কিয়ৎকাল পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ঐ সকল সমাজ অনিষ্টকর গর্হিত আচরণ উঠিয়া গেল।

সপ্তমতঃ—ঋগ্‌বেদ পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ প্রতিহিংসা ও ক্রোধ পরতন্ত্র ছিলেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবদিগের ক্ষমা ও দয়ার কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ মাধাই কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া তাহার ক্ষমার জন্যে চৈতন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেও দয়াগুণের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। যখন ঈশা শত্রুগণ কর্ত্তৃক ক্রুশে আবদ্ধ হন, তখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "পিতঃ, তুমি তোমার এই অজ্ঞান সন্তানগণকে মার্জ্জনা কর, যেহেতু তাহারা যে কি অপকর্ম্ম করিতেছে, তাহা অবগত নহে।"

অষ্টমতঃ—পূর্ব্বে প্রকৃষ্ট বিবাহ পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সভ্যসমাজ মধ্যেই তাহা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ব্যভিচার হইতে সমাজের যেরূপ অমঙ্গল ঘটিত, এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে।

নবমতঃ—আমাদিগের বঙ্গদেশে অদ্যাবধি দয়ার ন্যায়, সত্যের ও ন্যায়পরতার * উপর যথেষ্ট ভক্তি নাই। তাহাতে দেশের যে কত অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দোষীও আশ্রয় গ্রহণ করিলে অত্যাজ্য, প্রাচীনগণ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই রূপ ভাব হইতে সমাজের কত অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এক জন দস্যু ধৃত হইয়া কোন প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইলে, আবার সে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু সংপ্রতি ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজদিগের সংসর্গ গুণে নব্যগণ অনেকাংশে প্রাচীন কুসংস্কারকে জয় করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন।

বঙ্গদেশ সংস্কার ও বকল অপ্রসিদ্ধ কার। কোন জাতি সাধারণের বহুকাল নিদ্রা ও পাপাসক্তির পর যখন এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তখন তাহাদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে, যে ধর্ম্মোন্নতি হইতেই জাতি সাধারণের সাতিশয় উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশ এক রূপ মহানিদ্রায় অভিভূত

* আর্য্যদিগের মধ্যে ন্যায়পরতার অভাব অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া যে পক্ষ পূর্ব্বে আহ্বান করিত, তাহাদিগের সহায়তা করা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল। ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা মহা পুরুষগণ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ছিল। কল্লুকভট্ট, জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবিকর্ণ প্রভৃতি কয়েক জন ব্যতীত বঙ্গবাসিগণের গৌরবের যোগ্য অতি অল্প ব্যক্তিই এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থান ব্যতিরেকে আর সকল স্থানই একবারে ঘোর অন্ধকারময় ছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারক চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া প্রথমতঃ হরি সংকীর্ত্তন, মনন, হরিনাম জপ করণ প্রভৃতি ভক্তির নব অঙ্গ দ্বারা, এবং আপনার সরল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, অত্যল্প কাল মধ্যে অনেক লোককে স্বমতে দীক্ষিত করিলেন। কেবল যে চৈতন্য দ্বারা ধর্ম্ম সংস্কার হইয়াছিল. এরূপ নহে। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই কাব্য, নাটক, দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্যাবধি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী প্রভৃতির নাম সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবৃন্দ কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

এতদ্ব্যতীত এই চৈতন্যের শিষ্যবৃন্দই বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। দুই তিনখানি ব্যতীত চৈতন্য প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে আর বঙ্গভাষায় গ্রন্থ ছিল না। তার পর গোবিন্দ, কবির, বৃন্দাবন দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বিখ্যাত নামা মহাপুরুষগণ রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালাকে প্রকৃত ভাষা মধ্যে গণ্য করিবার যোগ্য করেন।

কেবল যে ইহাঁরাই বিদ্যা সম্বন্ধে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, এমত নহে। সমাজ সম্বন্ধেও বঙ্গদেশে ইহাঁদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথমতঃ বোধ হয় ইহাঁদিগের দ্বারাই উন্মূলিত হয়। যদিও "চণ্ডালোঽপি-দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ" প্রভৃতি শ্লোক পূর্ব্বরচিত পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, তথাপি একথা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে যে, এক চৈতন্যই বঙ্গদেশে এই সকল প্রথমতঃ কার্য্যে পরিণত করেন।

বিধবা বিবাহও চৈতন্য দ্বারা বঙ্গদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। এই সকল উন্নতির কারণ, কেবল একমাত্র ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। সত্য বটে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ অনেক লোক ধর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া বিস্তর সমাজ অনিষ্টকর আচরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে সমুন্নত ব্যক্তির দ্বারা সে রূপ অনুষ্ঠান হইতে পারে না। অধুনাতন হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ অনেক ব্যক্তি যে ব্রাহ্মও খ্রীষ্টানদিগকে উৎপীড়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সুযোগ পাইলে করিয়াও থাকেন, ধর্ম্মানুরাগই ইহার কারণ বলিতে হইবে। হিন্দুগণ মনে করেন, বিধর্ম্মীদিগকে ক্লেশে পাতিত করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে কিছুমাত্র দোষ বা পাপ বিবেচনা করেন না, যদিও ধর্ম্মানুরাগের আধিক্য ও জ্ঞানের অল্পতাই এই বিশ্বাসের একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি ধর্ম্ম মানব সমাজে সভ্যতার কারণ ভিন্ন নিবারক নহে।

প্রত্যেক বিষয়েরই দুই দিক আছে,—এই সাধারণ নিয়মানুসারে ধর্ম্মের দ্বারাও অশেষ উপকার সাধিত হইয়া তৎসহ কিছু কিছু অনিষ্টও সংঘটিত হইয়া

থাকে ; কিন্তু তথাপি দোষাপেক্ষা গুণের ভাগ অনেক অধিক। সুতরাং বক্‌ল সাহেবের মত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ। ঢাকা, মহাপাপ বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা হইতে প্রকাশিত। এই পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু যে প্রণালীতে এই পত্রিকা চলিতেছে, তাহা উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী বলিয়া বোধ হইল না।

দার্শনিকদিগের তর্ক প্রণালী দ্বিবিধ, ফল সাপেক্ষ প্রণালীও ফল নিরপেক্ষ প্রণালী। সত্য কথা বলায় যখন সমাজের উপকার হইবে, তখন সত্য বলিব ; যদি কখনও সত্য বলায় সমাজের নিরবছিন্ন অপকার দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা এক ব্যক্তিরও উপকারের সম্ভাবনা না দেখি, তবে তখন সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বলা কর্ত্তব্য। ফল সাপেক্ষ মতাবলম্বীরা এই নিয়মানুসারে তর্ক করেন, নিজেরা এই মতে চলেন, অন্যকে চলিতে উপদেশ দেন। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ মতাবলম্বীরা এক মাত্র বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারাই সত্যের উপকারিতা, সত্য বলার আবশ্যকতা, যে অবস্থায় হউক, সকল সময়েই মিথ্যার অপকারিতা, প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন। যদিও জগতে শেষোক্ত মতেরই আদর অধিক, ফলসাপেক্ষবাদী যদিও অল্প সংখ্যক, তথাপি এ কথা স্বীকার্য্য যে আমরা কার্য্য বিশেষে কোন না কোন সময়ে ফল সাপেক্ষ বাদ অনুসারে চলিয়া থাকি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া সকল সময়ে কার্য্য করা মানব মাত্রের পক্ষেই অসম্ভব, এমন অনেক সময় হয় যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভুত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করি ; তন্নিবন্ধন আত্ম প্রসাদও লাভ হয় ; পরিশেষে যখন "সম্পন্ন কার্য্য কর্ত্তব্য সাধ্য সত্ত্বে না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইত" এটি আসিয়া মনে উদয় হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তোমার সম্মুখে গৃহদাহ হইতেছে, তুমি যখন দাহ্যমান গৃহ হইতে কোন বালককে বলপূর্ব্বক বাহির কর ; তাহার প্রাককালে কি সেই রূপ বাহির করা কর্ত্তব্য কি না, তুমি এই বিষয়ের বিচার করিয়া থাক, না স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি বলে বালককে রক্ষা কর ? এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অধিকাংশ সময়ে মনুষ্য বিচারশক্তি বিহীন হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা জগতের ভুরি পরিমাণে মঙ্গল হয়। পক্ষান্তরে এই রূপ বিচারবিহীন হইয়া অনেক সময়ে পাপ পঙ্কেও মগ্ন হয়।

এক্ষণে দেখ, তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মধ্যে বিচারের ভাগ অল্প, আত্ম প্রসাদ বা আত্ম গ্লানি লাভের প্রাক্‌কালেই বিচার শক্তি আসিয়া তোমাকে দেখা দেয় ; কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অনেক সময়ে তুমি বিচার শক্তিকে দেখিতে পাও না।

আবার যখন সমাজের সুশৃঙ্খলার্থ আমরা ব্যবস্থা প্রণয়ন করি, তখন ফল নিরপেক্ষ হইয়া এক মাত্র যুক্তির আশ্রয়ে চলে কোথায় ? ব্যবস্থাপক তখন যুক্তি পরিত্যাগী হইবেন না যথার্থ, কিন্তু তাঁ-

হাকে পূর্ব্বতন লোকচরিত্র, তৎকাল প্রচলিত আইন, এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে ঐ রূপ ব্যবস্থা থাকায় কি কি ইষ্টানিষ্ট হইয়াছে, দেশের স্বভাবানুসারে পূর্ব্ব বিধি দ্বারা এক্ষণেই বা কত উপকার হইল অনিষ্টকারী বলিয়া কোন কোন ব্যবস্থা রহিত করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফল সাপেক্ষ মতেরই অধিক আদর করিবেন।

সমাজ, রাজ শাসন, বা ব্যবস্থাপক নিরবছিন্ন ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেও পারেন না। বেশ্যাবৃত্তি জঘন্য বটে, তদ্দ্বারা সমাজে পাপ স্রোতঃ প্রবল রূপে প্রবাহিত হইতেছে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরামর্শ অনুসারে যাবতীয় বেশ্যা ও বেশ্যা নায়কদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সমাজের অবস্থানুসারে রাজ শাসন দ্বারা এই রূপ দণ্ড বিধান হইতে পারে না; সুতরাং রাজ পুরুষেরা এই পাপ প্রত্যক্ষ করিয়াও শাসন করিতে পরাঙ্মুখ।

এ পর্য্যন্ত আমরা মহাপাপ বাল্য-বিবাহের যে কতিপয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদয় পাঠে, সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত ফল সাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত বাল্য বিবাহ দোষাকর, সামান্যতঃ এই মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। বাল্য বিবাহ দোষাকর, তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতা, হীন সাহসিকতা প্রভৃতি দোষ গুলির অন্যতর কারণ বাল্য বিবাহ। কিন্তু তাহা বলিয়া বাল্য বিবাহের মধ্যে যে কোন গুণই নাই, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এ কথা বলিতে পারি না। অনেক সময়ে বাল্য বিবাহই দম্পতী প্রণয়ের আনুষঙ্গিক কারণ, কিন্তু তাহা বলিয়া বাল্য বিবাহ কর্ত্তব্য, এমন বলা যায় না, বাল্য বিবাহে দোষের ভাগ অধিক।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এই স্থলেই আমাদের অভিপ্রায় বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া এই মাত্র বলিতেছি যে, মহাপাপ বাল্য বিবাহ পত্রিকার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, ইহা তদনুরূপ চলিতেছে না। এ পর্য্যন্ত ইহাতে এমন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই, যে তদ্দ্বারা লোকের মনে ঘৃণিত বাল্য বিবাহের প্রতি বিরাগ সঞ্চার হইতে পারে। পক্ষান্তরে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহকেও সম্পাদক বাল্য বিবাহ মনে করেন। আমাদের দেশের অবস্থানুসারে এবিবাহকে বাল্য বিবাহ বলা যায় না; এই কাল স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যৌবনের প্রারম্ভ।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে, বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভার সভ্যগণ আর এক টুকু বিজ্ঞতার সহিত অভিপ্রায় গুলি লিপি বদ্ধ করিবেন; এই পত্রিকার ন্যায় যদি তাঁহাদের সভার অবস্থা হয়, তবে তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পত্রিকার রচনা গুলি আমাদের নিকট বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের রচনার ন্যায় বোধ হইল।

অমৃতে গরল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজপুত্র দর্শনে।

কোন বিখ্যাত কিম্বা ধনী লোক ঘটনা ক্রমে পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে পল্লীস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আগমন করিয়া থাকে, এটী ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি। পল্লীগ্রাম বাসীরা এই রূপ নবাগত ব্যক্তিকে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, নবাগত ব্যক্তি যেন তাহাদিগের নিকট ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত মনুষ্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। বাস্তবিকই এরূপ ভাব একটী মনের স্বভাবসিদ্ধ। কারণ কোন বড় লোক সুজজ্জীভূত হইয়া আগমন করিলে মন স্বভাবতই তাঁহাকে ভক্তি করিতে চায় এবং রসনা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হয়, এটী মনের স্বাভাবিক গতি। ইহা কেহ শিখাইয়া দেয় না, এভাবটী আপনা হতেই মনে সমুদ্ভূত হয়। এরূপ ভাব যে কেবল পল্লীবাসীদের মনেই উদয় হইয়া থাকে, তাহা নহে, নাগরিকদিগের মনেও এরূপ ভাবের উদয় হয়, কারণ— মনুষ্য কৌতুহল স্বভাবাপন্ন। খ্যাতি প্রতিপত্তি শালী ব্যক্তিদিগের দর্শন লালসাও মনুষ্য মাত্রেরই মনে সমান ভাবে থাকিলেও বিদ্বান, ধনী, মানী, বা নাগরিকগণ সহসা এইরূপ কৌতুহলেচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না, কারণ আত্মগরিমা তাহাতে বাধা দেয়। কিন্তু সরল হৃদয় পল্লীবাসীদিগের মন সেরূপ নহে, ইহাদের আত্মগরিমা অপেক্ষাকৃত ম্লান, সুতরাং ইহারা যে খ্যাতাপন্ন লোকের আগমন সংবাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিতে যাইবে, এ কোন্ বিচিত্র কথা?

রাজপুত্র বিজয় সিংহের অনঙ্গপুরের যুদ্ধজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের কথা চন্দ্রপুরে প্রচারিত হইবা মাত্র, নগরস্থিত স্ত্রী পুরুষ অনেকেই কেহ বা দর্শনেচ্ছায়, কেহবা কুমারের সহিত পরিচিত হইবার মানসে মন্ত্রীর বাটীতে আগমন করিতে লাগিল। অতি অল্প কাল মধ্যেই অন্তঃপুর অঙ্গনাকুলে এবং বহিঃবাটী পুরুষবর্গে পরি পূরিত হইল। আগন্তুকগণের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, বংশ মর্য্যাদায় নীচ অথবা ভদ্র, কিন্তু রাজ সদনে যাইবার কোন উত্তম পরিচ্ছদ নাই, তাহারা সকলেই দূর হইতে নয়নের সার্থকতা সাধন করিতে লাগিল।

রাজকুমারের পরিচ্ছদ, বর্ণ, অবয়ব সম্বন্ধে নানা জন নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, "ঐ যে দীর্ঘ সুন্দর পুরুষটী, যাঁহার মস্তকে রক্ত বর্ণের পাকড়ী—মধ্যে২ সোনার কাজ আছে এবং গায়ে নীলবর্ণের জামা, চারিধারে সোনার গোটা দেখা যাইতেছে, ঐটীই আমাদের রাজপুত্র।"

আর এক জন কহিল "হাঁ—হাঁ, তাই বটে, ঐ দেখ তাঁর পরনে হল্‌দে রঙ্গের পাজামা, কোমরে লাল—সোনার ফুলদার চাদর বাঁধা, পায়ে বোধ হচ্যে, জরির জুতো, সাদা পাথরের সিংহাসনে বসিয়া আছেন।"

এক জন দাম্ভিক পুরুষ উঠিয়া কহিল, "তোমরা কেহই রাজপুত্রকে চিনিতে পার নাই। কাল সন্ধ্যার সময় তিনি যখন অনঙ্গপুর হইতে ফিরিয়া আইসেন,

তখন আমাদের বাটীর নিকট দিয়াই ঘোড়ায় চড়ে এসে ছিলেন, আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ দেখিয়াছি। তাঁহার মস্তকে কাল পাকড়ী ছিল, তাহার মধ্য স্থানে একখানা সোনার পদক ছিল, গায়ে কাল রঙ্গের একটা জামা,—তার চারিদিকে সোনার কায করা এবং বুকের দক্ষিণ দিকে কয়েকটী সোনার বড় বড় ফুল ছিল। সোনার একটী চওড়া গোটা বাম বাহুর উপর দিয়া বুক ও পীট পেঁচান ছিল। কোমরেও ঐ রূপ গোটা-তেও লাল রেশমী কাপড়ে জড়িত একটী কোমর বন্ধ ছিল এবং তাহার সঙ্গে এক খানি তরবারি বাম দিকে ঝুলান ছিল। পরনে কাল রঙ্গের বনাতের আটা পা-জামা, পায়ে কাল জুতো, মুখের রংটী এত ফরসা নহে, ইহাতে কিছু মলিন ও লাল ছিল। বোধ করি, রাজপুত্র এখনও সভায় আসেন নাই।”

এই রূপ নানা জন নানা মত কথা বার্ত্তা বলাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইতে লাগিল। একজন প্রহরী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত দুই চারি জনকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া গোলের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এবং অনতি কাল মধ্যে কারণ অবগত হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কহিল, “হাঁ হাঁ, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনিই বটে।” এই বলিয়া প্রহরী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে যাঁহারা বিদ্বান, ধনী বা মানী, তাঁহারা ক্রমে২ রাজপুত্রের সিংহাসনের নিকট গমন করিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রাজপুত্র সকলকে মৃদু মধুর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন এবং যুদ্ধাদি সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন করিলেন। এবং যথা সময়ে বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। আগন্তুকগণ সকলেই রাজপুত্রের মধুর বচনে তৃপ্তি-লাভ করিয়া রাজপুত্র উঠিয়া গেলে বিদায় হইল।

জনতা দূর হইল, রাজপুত্র সভা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রাম ভবনের প্রাঙ্গণে পদ চালনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এতাবৎ কাল অন্তঃপুরস্থিত অঙ্গনা-গণের রাজপুত্র দর্শনের বড়ই অসুবিধা হইয়া ছিল, এক্ষণে সে অসুবিধা দূরীভূত হইল। এখন খোলা দর্শন। কক্ষে, বাতায়নে, দ্বার দেশে, দেয়ালের নিকট যেখানে একটুকু ফাঁক কিম্বা একটী চিদ্র ছিল, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের আম-দানি হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য স্ত্রী লোক নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া অনিমিষ নয়নে রাজ-পুত্রের অপরূপ রূপের প্রতি কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঠিক যেন অভিমন্যু বধ উপস্থিত। ঈষৎ হাসি, অস্ফুট স্বর, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, নয়নবাণ, রাজপুত্রকে একবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইন্দ্রের সভায় অপ্-সরীর লীলা! তিনি কুলবধুগণের এব-ম্বিধ আচরণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ধীরে২ প্রাসাদের পশ্চাৎ ভাগে প্রমোদ কানন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজপুত্রের এই রূপ হঠাৎ গমনে পুরনারীগণ কিঞ্চিৎ লজ্জিতা ও হতাশ হইয়া ধীরে২ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাধের শারিকা।

সকলে যখন এইরূপে রাজ কুমারের দর্শনে ব্যস্ত ছিল, মন্ত্রী নন্দিনী শৈলবালা একাকিনী দ্বিতল প্রাসাদের একটী ক্ষুদ্র কুঠরীর বাতায়নের নিকট বসিয়া গম্ভীর ভাবে এক দৃষ্টে রাজ পুত্রের রূপ-রাশি নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। পরে রাজ-পুত্র যখন তথা হইতে গমন করিলেন, তখন তৎপশ্চাৎ আড় নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, ক্রমে যখন কুমার বিজয় সিংহ দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, তখন তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং গৃহ মধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কের নিকট আগমন করিয়া শয্যায় অর্দ্ধ শয়ান হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন এইরূপে শয্যাতে অব-স্থিতি করিতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রিয় সখী হেমলতা তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,"প্রিয় সখি, ঘুমালে ?" "না।" ইহা কহিয়া শৈলবালা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করি-লেন। তাঁহার মুখ খানি তখনও গম্ভীর ছিল।

হেমলতা কহিলেন, "এতক্ষণ যে কত লোক আমাদের বাড়ীতে রাজ কুমারকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল, তাহা তুমি দেখিলে না ?"

শৈলবালা কহিলেন, "দেখা রূপ আবার কি দেখ্‌বো ?" এক দিন দেখ-লেও যা, পাঁচ দিন দেখলেও তাই।"

হেমলতা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তা বই কি ? কিন্তু এখানকার মেয়ে মানুষ গুলো বড় পুরুষ ঘেঁসা, অম্নিই রক্ষা নাই, তাতে আবার রাজপুত্র। দুই চোক মেলে হাঁ করে রইল, যেন পারে ত রাজপুত্রকে গিলে খায়। ছি, ছি, রাজপুত্র, ভাই সেই লজ্জাতেই এত শীঘ্র উঠে গেলেন। তা যা হোক, তুমি আজ ফুল বাগানে জল দিতে যাবে না ?"

শৈলবালা উত্তর করিলেন, "না"

হেমলতা হাস্য করিয়া কহিলেন, "বনে২ বেড়ান সখটী কিসে ক্ষান্ত হলো ? বুঝেছি রাজপুত্র যে ঐদিকে গেছেন। তা এত লজ্জাই বা কেন ? তিনি ত আর তোমার স্বামী হন নাই।"

মন্ত্রী নন্দিনী চমকিত হইয়া কহিলেন, "দূর পোড়ার মুখী, তিনি তোমা—'

"হাঁ, হাঁ, বল্‌২,—আহা আর দশবার ঐরূপ গালাগালি দিলেও আমার কষ্ট নাই" ইহা কহিয়া হেমলতা হাসিতে লাগিল। শৈলবালা কহিলেন, "যদি বাগানে যাস্‌, তবে এই বেলা যা, আমি জানালার ধারে বসে দেখিয়ে দেব এখন কোনে২ গাছে জল দিতে হবে। "কিন্তু দেখ যেন দৃষ্টিতে পড় না" ইহা কহিয়া হেমলতা তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হেমলতা গৃহ হইতে গমন করিলে পর শৈলবালা কিঞ্চিৎকাল তদবস্থায় থাকিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং প্রমোদ কাননের সম্মুখস্থিত বাতায়নের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তথায় উপবেশন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজ কুমার কানন অভ্যন্তর হইতে অদৃশ্য ভাবে তাহা দেখিতে পাইলেন।

শৈলবালা কিয়ৎকাল তথায় ঐ ভাবে থাকিয়া হঠাৎ তথা হইতে গমন করি-লেন এবং অনতিকাল মধ্যে পিঞ্জর বদ্ধ

একটী ময়না হস্তে করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তথায় উপবেশন করিলেন। এবং পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করিয়া আপন হস্তে ময়নাকে আহার দিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ আহার দিলেন, আর ভাল লাগিল না। পুনরায় বাতায়নের উপর ঈষৎ হেলায়মানা হইয়া এক দৃষ্টে সায়ংকালীন জগতের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিথিল যত্ন ও অসাবধানতা দৃষ্টে ময়না পিঞ্জর হইতে উড়িয়া নীচে পড়িল। মন্ত্রী নন্দিনীর মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

সাধের ময়না উড়িয়া গেল, দেখিয়া শৈলবালা ত্রাস্ত ভাবে হস্ত স্থিত পিঞ্জর দূরে নিক্ষেপ করিয়া আলুলায়িত কেশে শিথিল অঞ্চলে এবং চঞ্চল চরণে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পোষা পাখী, বহুকাল পিঞ্জরে আবদ্ধ বিধায় উড়িবার শক্তি বিহীন সুতরাং বেসি দূর উড়িয়া যাইতে পারিল না, প্রাসাদের অতি সন্নিকটে একটী কামিনী ফুলের গাছ ছিল, ময়না তাহার উপরে উড়িয়া বসিল। রাজকুমার দূর হইতে ময়নাকে পিঞ্জর হইতে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহাকে বসিতে দেখিয়া ধীরে২ কামিনী বৃক্ষের নিকট আগমন করিলেন এবং বৃক্ষের নিম্নভাগে যাইয়া আস্তে২ হস্ত প্রসারণ করিয়া ময়নাকে ধরিলেন। ময়না ক্যাঁ২ করিয়া উঠিল।

শৈলবালা এতক্ষণ অস্থির ভাবে প্রাসাদের নিকট ইতস্ততঃ ময়নার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষনে হঠাৎ ময়নার ক্যাঁ২ রব শ্রবণ করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। এবং রাজ কুমার বিজয় সিংহের হস্তে দেখিয়া, দ্রুতপদে রাজ কুমারের নিকটে গমন করিলেন এবং কুমারের হস্তস্থিত ময়না লইবার মানসে হস্ত প্রসারণ করিলেন।

রাজকুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া মন্ত্রী নন্দিনীর হস্তে ময়না প্রদান করিবার মানসে হস্ত উত্তোলন করিলেন। শৈলবালা আপন হস্ত সংযম করিয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজকুমার কহিলেন, "এতে লজ্জা কি?" শৈলবালা কথা কহিলেন না, তাঁহার গণ্ডদেশে রক্তিমাভা প্রকাশ পাইল। উভয়ে নিরুত্তর। এমন সময়ে মন্ত্রী হঠাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রী স্নেহপুর্ণ-বচনে বলিলেন, "কি মা, এখানে যে?"

বিজয় সিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "পিঞ্জর হইতে পাখীটী এখানে উড়িয়া পড়িয়াছিল, আমি এখানে ছিলাম, তাই ধরিয়াছি। ইনি লইতে আসিয়াছিলেন। আমি দিতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু একবার মাত্র হস্ত প্রসারণ করিয়া কি জন্য হস্ত সংযম করিলেন, বলিতে পারি না। কথা বলিলেও কোন উত্তর দিলেন না।"

মন্ত্রী বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তা রাজকুমারের হস্ত হতে ময়না লইবে, তাতে আবার লজ্জা, কিসের? ইহাঁরাই আমাদের প্রভু, আমরা এই বিপুল রাজ বংশের অধীনেই প্রতিপালিত। তা ওঁদের কাছে কি আমাদের লজ্জা করা সাজে? তুমি অনায়াসে ইহাঁর হস্তস্থিত ময়না গ্রহণ করিতে পার—তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা নাই। আমাদের পরম ভাগ্য যে রাজ কুমার আমাদের বাটীতে পদার্পন করেছেন। আমি ত অনেক সময় রাজ

সদনে থাকি। পাছে রাজকুমার একাকী থাকাতে কোন কষ্ট অনুভব করেন, সেই ভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে তাঁর থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছি। আমার ইচ্ছা যে তোমরা অনেক সময় একত্রে থাকিয়া বাক্যালাপ করিবে, রাজ কুমারের নির্জ্জনে থাকিবার ক্লেশের ভার লাঘব কর। তা যাও এখন বাটীতে যাও, আমরাও একটু কর্ম্মে যাব।"

"তবে বাবা! তুমিই ময়নাটী লইয়া আইস," মৃদুস্বরে এই কথা বলিয়া শৈলবালা গমনে উদ্যতা হইলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "কেন মা, তুমিই লইয়া যাও না কেন।" এতচ্ছ্রবণে মন্ত্রীবালা পুনর্ব্বার রাজকুমারের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন, রাজকুমার শৈলবালার হস্তে শারিকা প্রদান করিলেন। মন্ত্রীর জন্ম সার্থক হইল। শৈলবালা প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার ও মন্ত্রী উভয়ে বাক্যালাপ করিতে২ অন্যদিকে গমন করিলেন।

পাঠক, তোমার নিকট মন্ত্রীর মুখবিনির্গত এবম্বিধ বাক্য বোধ করি, ভাল লাগিতেছে না, কারণ তুমি আধুনিক নব্য দলের লোক। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহাশয় পুরাকালের লোক, বিশেষতঃ বৃদ্ধ, সুতরাং এরূপ কথা যে বলিবেন, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ সেকেলে লোকের অন্তঃকরণ, এখনকার লোকদিগের মনের ন্যায় খলতা, শঠতা পূর্ণ নহে। তাঁহারা বড়ই সরল ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি জ্বালা।

কালের কি বিচিত্রগতি। অদ্য যে স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্য, উচ্চশীর মন্দির সুপ্রশস্ত রাজপথ, নাগরিকগণের কোলাহল, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ফুল ফল শোভিত বৃক্ষ, এবং নানাবিধ পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি গোচর হইতেছে, হয়ত কালের অদ্ভুদ চক্রে সেই স্থান কিছু দিন পরে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া নানারূপ হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়া উঠিবে; এবং যে স্থান অদ্য বিস্তীর্ণ বৃক্ষ লতাদি, জলশূন্য ভীষণ প্রান্তর রূপে পরিণত আছে, কাল ক্রমে সে স্থানও মনোহর শোভায় সুশোভিত হইয়া মনুষ্যগণের আবাস ভুমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই কাল চক্রের নিরন্তর গতিতে অসম্ভব ও সম্ভব পর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। শুষ্ক বৃক্ষে নবীন পল্লব, মরু ভূমিতে জল সঞ্চার, আগ্নেয় গিরির শীতলতা এবং সুশীতল জলের দাহিকা শক্তি প্রভৃতি সকলই এই কালের কার্য্য। এই কথায় যাঁহাদিগের প্রত্যয় না জন্মে, তাঁহারা একবার স্থির নেত্রে কুমার বিজয় সিংহের এবং মন্ত্রী তনয়া শৈলবালার ভাব প্রত্যক্ষ করুন।

বিজয় সিংহ এক জন প্রকৃত বীর পুরুষ। বীর পুরুষদিগের অন্তঃকরণ পাষাণে নির্ম্মিত হইলেও কালে মন্ত্রী নন্দিনীর অপরূপ রূপের প্রখর কিরণে তাহা দ্রবীভুত হইয়াছিল। পূর্ব্বকার ন্যায় এখন আর মনে শুষ্ক ভাব ছিল না। এক্ষণে শয়নে স্বপনে প্রায় সকল সময়েই শৈলবালার রূপ তাঁহার হৃদয় মধ্যে নৃত্য করিত; তিনি অহরহ সেই রূপই চক্ষে দেখিতেন, সেই বিষয়ই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, বিনা প্রয়োজনে অন্তঃপুরে গমন করিতেন। এবং সুযোগ পাইলেই—শৈলবালার সহিত বাক্যালাপ করিয়া মনকে চরিতার্থ করিতেন।

পক্ষান্তরে, শৈলবালার প্রণয় পদ্ম কলিকাও কাল ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল। কোথা হইতে অনর্থক লজ্জা, গুরুজন ভয় আসিয়া তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে যে কার্য্য মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র সম্পন্ন করিতেন, এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইতস্ততঃ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এখন আর কটিতটে অঞ্চল বন্ধন করিয়া স্বাধীন ভাবে সখী সঙ্গে, প্রমোদ কাননে বিচরণ, কিম্বা পুষ্পোদ্যানে জল সেচন করিতে ভাল লাগিত না। পূর্ব্বে বহিঃ বাটীতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, সৈন্য কোলাহল, ভোজ বাজি ইত্যাদি হইলে যেমন সকলের সমক্ষে নির্ভীক চিত্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিতেন, এক্ষণে সেই রূপ করিতে ইচ্ছা করিলেও কোথা হইতে প্রভূত লজ্জা আসিয়া বাধা জন্মাইতে লাগিল। সুতরাং বাতায়নে, কবাটের ছিদ্রে, ভিত্তিস্থিত রন্ধ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। পূর্ব্বে সদা সর্ব্বদাই ভাবিতেন, কেমন করিয়া ফুলের মালাটী গ্রন্থন করিব, কি করিলে, ঐ বৃক্ষটী সতেজ হইবে, কি রূপ করিলে ময়নাকে সঙ্গীত শিখাইতে পারিব, অমুক আমা পেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারে, ঐ পুস্তক খানি পড়লে ভাল হয়, কেমন করিলে সঙ্গীতাদি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, এই রূপ কত২ নূতন চিন্তাই মনোমধ্যে উদিত হইত। এক্ষণে আর সেই রূপ চিন্তা তত মনে উদয় হইত না, অনেক সময়ই যুবরাজের চিন্তা। কি করিতেন, কি ভাবিতেন, কিছুই নিশ্চয় ছিল না। পূর্ব্বে মনে যখন যে ভাবটী উদয় হইত, কিম্বা যাহার নিকট যে কথা শুনিতেন, তাহাই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিতেন, কিন্তু এখন প্রাণ সদৃশ ভ্রাতৃবধূকে ও প্রিয় সখী হেম লতাকেও কোন কথা সহসা বলিতেন না, অতি সামান্য বিষয় হইলেও বিবেচনা পূর্ব্বক বলিতেন।

শৈলবালা অতি শৈশবাবস্থাতেই মাতৃহীনা হয়েন; সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ স্নেহই পিতার উপর ছিল, ভাবিতেন, এজগতে পিতাই এক মাত্র স্নেহের পাত্র। কিন্তু এক্ষণে, যেন সেই ভালবাসার অংশী হইল, পিতার উপর হইতে স্নেহ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল, সেই স্নেহ কাহার উপর গিয়া বর্ত্তিল, তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেন না। কখন২ বোধ হয়, যুবরাজের উপর, পুনরায় তাহা অনুভব করিতে পারেন না। বিষম বিপদ, যখন ভাবিতে বসেন, তখন পৃথিবী অন্ধকার ময় বোধ হয়, মন উদাস, সর্ব্বদাই অস্থির, জগতের কোন বস্তুই তাঁহার নিকট তত মধুময় বোধ হয় না। চিরতৃপ্তিকর বস্তুতেও পরিতৃপ্তি জন্মে না। মন এরূপ হইবার কারণও কিছু বুঝিতে পারেন না। এভাবটী কি সদা সর্ব্বদাই থাকে? না, তা থাকে না, রাজকুমারকে সম্মুখে দেখিলে কি তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিলে তখন আর এভাব থাকে না, তখন মন আনন্দ রসে ভাসিতে থাকে।

অগ্নি চাপা থাকিবার নহে। এরূপ ভাব অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সরোজিনী ও সখী হেমলতা সকলেই জানিতে পারিলেন, এবং তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া মন্ত্রী নন্দিনীর সহিত পরিহাস করিতেন। কিছু দিন শৈলবালা এরূপ পরিহাসে ক্রোধান্বিত হইতেন,

কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, কিম্বা ক্রোধ ভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহা সহিয়া গেল। অনেক প্রশ্নের, অনেক কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। কিন্তু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। লজ্জা সঙ্গের সঙ্গিনী। যখনই রাজপুত্রের সম্বন্ধে কোন কথা পড়ে, তখনই তিনি লজ্জিতা হয়েন।

কিসের লজ্জা? ভ্রাতৃবধূ, প্রিয় সহচরী, তাহাদের নিকট লজ্জা? এলজ্জাকর কার্য্য জগৎ শুদ্ধ লোকেই করে, না এ তুমিই করিতেছ? করে—এবং পরেও থাকে না, কিন্তু প্রথমে নহে। একদাশে যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন। সুন্দরী পাঠিকারাই ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন, ইহার উত্তর দান করা আমাদের কর্ম্ম নহে।

সখী গণের সহিত এই রূপ হাস্য পরিহাসের পর শৈলবালা যখন একাকিনী নির্জ্জনে অবস্থিতি করেন, তখন ঐ বিষয় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে২ একবার মৃদু মন্দ হাস্য করেন, একবার লজ্জিতা হয়েন, কখন সিহরিয়া উঠেন, কখন বা অঙ্গহইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ঘোর পাপের পাপিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরিশে বিষাদ।

একদা শৈলবালা পুস্তকালয়ে বসিয়া একান্তমনে শকুন্তলা পাঠ করিতেছেন। প্রথমে রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া গমন, শকুন্তলার সহিত রাজার দর্শন, ক্রমে উভয়ের বনমধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ পর্য্যন্ত পড়িলেন। সম্মিলন পড়িতে লাগিলেন, মুখেতে আর হাসি ধরে না, একবার দুইবার তিনবার তাহাই পড়িলেন। ক্রমে সে পৃষ্ঠা সমাপ্ত হইল, পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কতকটা পড়িলেন, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার হাস্য পরিহাস দৃষ্টে গ্রন্থকর্ত্তা যে মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে লাগিলেন,—

অভাগিনী শকুন্তলে,　　হাসিতেছ কুতূহলে,
তব এ সুখের দিন রবেনাকো রবে না।
আপন ভাবিছ যারে, প্রতারিবে সে তোমারে,
তোমার দুরাশা পূর্ণ হবেনাকো হবে না।।
হয়ে তুমি তপস্বিনী,　　হতে চাও রাজরাণী,
তব ভাগ্যদোষ কভু যাবেনাকো যাবে না।
স্বকার্য্য সাধন করি,　স্বদেশেতে গেলে ফিরি,
তখন দর্শন আর পাবেনাকো পাবে না।।

যখন এই কবিতাটী পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার মুখ খানি মলিন হইল, ললাট দেশে বিন্দু২ ঘর্ম্ম দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল, চক্ষু ছল২ হইয়া আসিল, অজ্ঞাতসারে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, শরীর অবশ হইয়া আসিল, হস্তস্থিত পুস্তকখানি পড়িয়া গেল, চিন্তা সাগরে ভাসমানা হইলেন।

যখন তিনি বহির্জগৎ হইতে মন আকৃষ্ট করিয়া এই রূপে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটী স্ত্রীলোক গৃহ প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তবিংশ বর্ষ। শ্যাম বর্ণা শরীর কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, চক্ষু দুইটী বিশাল, ওষ্ঠ মলিন অথচ ঈষৎ হাস্য বাচক। অর্দ্ধ মলিন বসন পরিহিতা, শরীরে কোন রূপ অলঙ্কার ছিল না; কারণ ইনি বিধবা, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি।

সুন্দরী গৃহ প্রবেশ করিয়া শৈলবালার তদবস্থাদর্শনে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং মৃদুস্বরে "ঠাকুর ঝি! ঠাকুর ঝি!" বলিয়া

দুইবার ডাকিলেন। মনুষ্যের কণ্ঠরব হঠাৎ মন্ত্রী নন্দিনীর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চিন্তা শয্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং নিকটে ভ্রাতৃবধূকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া সলজ্জিত ভাবে কহিলেন—

"কি বউ, কতক্ষণ আসিয়াছ ?"

"তাই বটে।" ইহা কহিয়া সরোজিনী উপবেসন করিলেন।

শৈলবালা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "বাস্তবিক আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই। ক্ষমা করিও।"

সরোজিনী কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন "এখন ত আর পাবেই না। এখন সোনার বর্ণ—সোনা জড়ান পোষাক—সোনার সিংহাসন, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই সোনা। সোনা দেখ্‌তেং চোক্ ঝল্‌সে গিয়েছে। এখন কি আর এ কাল কুৎসিৎ রূপ ভাল লাগে? এখন এ সব আঁধারং বোধ হয়।"

শৈলবালা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "সত্যি, তোমার মাথা খাই, আমি তা কিছু ভাবিতে ছিলাম না।"

"কি, কিছু ভাবিতে ছিলে না ?" ইহা কহিয়া সরোজিনী কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন।

শৈলবালা হাসিয়া কহিলেন "তুমি যা ভাবিয়াছ।"

সরোজিনী কহিলেন "আমি কি ভাবিয়াছি ? ঠাকুর ঘরে কে, না আমি ত কলা খাই নাই।"

শৈল কিঞ্চিৎ কম্পিত ও বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি ভেবেছ তা তুমিই জান, তোমায় ভাই পারা ভার।"

সরোজিনী হাস্য করিয়া ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন "আমরি! যেন কচি মেয়েটী কিছুই জানেন না, তুমিও কিছু জান না, তিনিও কিছুই জানেন না, সকল দোষ বাতাসের,

বিজয় পাইলে তোকে, হয় লো বিজয়।
বিজয় হওলো তুমি, পাইলে বিজয়।"

শৈলবালা কথার অবকাশ পাইলেন, কহিলেন,

"বিজয় হইবে তাই, চাওলো বিজয় ;
বিজয় দিলাম ছেড়ে, হওলো বিজয়।"

সরোজিনী কহিলেন "দূর্ মড়া; আপনার কুলোয় না, তা আবার পরকে দিতে চাস।"

শৈলবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে যে বড় বিজয় বিজয় করিতেছিলে, তিনি আমার কে, যে আমার কাছে বিজয় বিজয় কর ?"

সরোজিনী কিঞ্চিৎ বিষণ্ন বদনে বলিলেন, "তুমি রাত দিন তাই ভাব, তাই বলিলাম। আমি বিজয় কি করবো ? আমার যদি বিজয়েরই কপাল হতো, তবে বিধাতা যে বিজয় দিয়েছিলেন, তাই লইয়াই দিগ্বিজয় করিতে পারিতাম।"

তাঁহার চক্ষুতে জল ছল ছল করিয়া আসিল, একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শৈলবালা ব্যগ্র ভাবে বসনাঞ্চলে সরোজিনীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "বউ, তুমি কাঁদলে ? আমি কি বলেছি।"

সরোজিনী পুনর্ব্বার একটী দীঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বোন, আমি কি তোমার কথায় কাঁদিতেছি, আমার এ পোড়া মনে যখনই সে কথা উদয় হয়, তখনই ত কাঁদিয়া থাকি, আমার এ চক্ষু দুইটী যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মত হইয়াছে, এ হতে দিবি নিশিই জল পতিত হয়।"

"কাঁদলেই যদি দাদাকে পাওয়া যায়, তবে রাত দিন কাঁদিতে পারি," এই কথা বলিতে২ তিনিও রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সরোজিনী শৈলবালার এতদবস্থা দেখিয়া রোদন সম্বরণ করিলেন এবং শৈল বালাকে সান্ত্বনা করণার্থ বলিলেন, "ছি বোন, তুমি আমাকে উপদেশ দিতেছিলে, এখন নিজেই কাঁদিতেছ?"

"না,—আমি কাঁদিতেছি না," এই বলিয়া শৈলবালা আপন চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

সরোজিনী কহিলেন, "তবে চক্ষু দলন করিতেছ কেন?"

শৈলবালা অধোবদনে বলিলেন, "আমার বড় ঘুম পাইতেছে।"

"বেস, তবে একটু বিশ্রাম কর, আমি এক্ষণে আসি।" এই বলিয়া সরোজিনী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, শৈলবালা শয্যায় শয়ান হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে২ নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘুমের ঘোর।

শৈলবালা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত অঙ্গে বস্ত্র নাই। বস্ত্র কটিদেশের উপর বিশৃঙ্খল ভাবে পতিত রহিয়াছে। দেহ হইতে অনবরত ঘর্ম্ম রাশি নির্গত হইতেছে। অসংখ্য নিবিড় কেশ রাশি আলুলায়িত ভাবে মুখাবরণ করিয়া রহিয়াছে।

গ্রীষ্মকালের দুই প্রহর বেলা, দিননাথ প্রখর-কিরণ জালে সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত করিতেছেন। জগৎ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। বহির্দ্দেশে একটী জন প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পশু পক্ষিগণ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সমীরণ সেবন করিতেছে। প্রতপ্ত বায়ু প্রবাহে উষ্ণ বালুকারাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিত করিতেছে; এমন ভয়ঙ্কর সময়ে বিশেষ প্রয়োজন সত্ত্বেও কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু বিজয় সিংহ কি ভাবিয়া এমন সময়ে একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তাহা বলিতে পারি না।

তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুত পদে প্রমোদ কাননের অভিমুখে গমন করিলেন এবং নিবিড় বিটপী পুঞ্জ বেষ্টিত একটি শীলাতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। কানন অভ্যন্তরস্থিত মৃগগণ অদূরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, রাজকুমার কিঞ্চিৎকাল তাহাই অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ হরিণগণ তাঁহার দৃষ্টি পথের অতীত হইল। তখন উর্দ্ধগ্রীব হইয়া নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মন অস্থির। কিছুর উপরেই অধিকক্ষণ মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন না। কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন। দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিকট স্থিত একটী গোলাবফুলের বৃক্ষ হইতে একটী পুষ্প উত্তোলন করিয়া তাহার কেশর গুলি অজ্ঞাতসারে ছেদন করিতে করিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন অন্তঃপুরে জন প্রাণী নাই। গ্রীষ্মের প্রভাবে সকলেই সুশীতল নিভৃত স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তথায় কিয়ৎ কাল দণ্ডায়-

মান থাকিয়া অন্য মনস্ক ভাবে শৈলবালার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, শৈলবালা নিদ্রায় অচেতন। মৃদুমন্দ উষ্ণ সমীরণ তদীয় দেহোপরি ক্রীড়া করিতেছে। পর্য্যঙ্ক সন্নিহিত পূর্ব্বদিকের বাতায়ন অর্দ্ধ মুক্ত। এতদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে কত কি ভাবের উদয় হইল, তাহা কে বলিতে পারে? মন্ত্রী নন্দিনী নিদ্রিতা। এ অবস্থায় এখানে একাকী থাকা অনুচিত,—ইহা ভাবিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার মানসে কিঞ্চিদ্দূর গমন করিলেন। কিন্তু যাইতে আর মন সরিল না, পুনর্ব্বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, শৈল বালার নিকটে এক খানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে। কি পুস্তক—জানিতে ইচ্ছা হইল, পুনর্ব্বার দুই এক পদ আসিয়া শৈলবালার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

শৈলবালার নয়ন নিমীলিত, নিদ্রায় অচেতন। কিন্তু ওষ্ঠ দুই খানি এরূপে হাসি হাসি যে দেখিলেই বোধ হয়, ছলনা পূর্ব্বক চক্ষু মুদিত করিয়া আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভাবে, হৃৎপিণ্ডের গতিতে বক্ষঃস্থল ঈষৎ সমুন্নত; থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, দেখিয়া বিজয় সিংহ একবার হাস্য করিলেন। প্রথমে ধীরে ধীরে শৈলবালার মস্তকের আলুলায়িত কেশ রাশি পশ্চাদ্ভাগে একত্র করিয়া বেণীর দ্বারায় আবদ্ধ করিলেন, পরে সুন্দরীর গাত্র স্থিত ঘর্ম্ম বিদূরিত করিবার মানসে বসনাঞ্চলে বীজন করিতে লাগিলেন। বীজন করিতে করিতে একবার শৈলবালার অঙ্গে তাঁহার কর স্পর্শ হইল। নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

শৈলবালা চক্ষু অর্দ্ধমুক্ত করিয়া দেখেন, নিকটে রাজকুমার। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনি ত্রস্তভাবে শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। লজ্জাতে রাজকুমারের প্রতি চাহিতে না পারিয়া বাম জানুর উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসনাঞ্চলে বদন অর্দ্ধ ঢাকিয়া রহিলেন।

রাজকুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মন্দ নহে—কার্য্য অন্তে লজ্জা।" শৈলবালা উত্তর করিলেন না; মস্তক আরও কিঞ্চিৎ অবনত করিলেন। "আমি তোমার অজ্ঞাতসারে এ গৃহে আসিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, এজন্য ক্ষমা কর, আমি এখন বিদায় হই।" ইহা কহিয়া বিজয় সিংহ গমনোদ্যত হইলেন, এবং পর্য্যঙ্ক হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। পরিধেয় বসনের অগ্রভাগ আবদ্ধ রহিয়াছে, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন বসনের উপর শৈলবালা দক্ষিণ জানুদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে কুমার বসন সংযম করিতে চেষ্টা করিলেন, শৈলবালা তখন অপেক্ষাকৃত বেসি ভর দিয়া উপবেশন করিলেন। রাজকুমার সহাস্য মুখে বলিলেন, "কথা বলিলেও উত্তর নাই, যাইতে চাহিলেও ছাড়া নাই, এ ত বড় বিষম বিপদ।"

শৈলবালা মৃদুস্বরে বলিলেন, "কোথায় যাবেন?"

বিজয় সিংহ কহিলেন, "কল্য সন্ধ্যার সময় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম, মহারাজ কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমাকে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন।"

শৈলবালা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "আবার কি যুদ্ধ উপস্থিত?"

বিজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "বোধ হয় না।"

শৈলবালা স্নেহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আবার কবে আসিবেন ?"

রাজকুমার ও সেই রূপ স্বরে কহিলেন, "তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যত শীঘ্র পারি, তাহার চেষ্টা করিব ?"

শৈলবালা সজল নয়নে ও গদ গদ স্বরে বলিলেন, "যে খানেই যান, একবার দেখা না করিয়া কোথাও যাইবেন না, এটী দাসী—আমার সহস্র প্রার্থনা।" ইহা বলিয়া তিনি জানু ঈষৎ উত্তোলন করিলেন। "তা আবার বল্‌তে।" ইহা কহিয়া রাজকুমার ধীরে ধীরে গৃহহইতে প্রত্যাগমন করিলেন, শৈলবালা সজলনয়নে একদৃষ্টে রাজকুমারের গমন পথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

——

দশম পরিচ্ছেদ।

বনপ্রান্তে।

ক্রমে বেলা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী। বিহঙ্গগণ কুল কুল ধ্বনি করিয়া আপন আপন কুলায় অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কৃষকগণ লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছে, রাখালগণ গাভীদল সহ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। অদূরে পল্লী হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক পরিপুরিত করিতেছে, পল্লীর নিকটস্থিত শস্যক্ষেত্রে দুই একটী স্ত্রীলোক স্থূল ও মলিন বসন পরিধান করিয়া মার্জ্জনী হস্তে ক্ষেত্রস্থিত পরিত্যক্ত শুষ্ক গোময় সকল সংগ্রহ করিতেছে। নিকটস্থিত বন হইতে শিবাগণ বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, এবং তদ্দৃষ্টে কুকুর গুলিন হুঙ্কার ধ্বনিতে পল্লী মাথায় করিতেছে। চতুর্দ্দিকে সণ্ সণ্ শব্দে প্রবল উষ্ণ বায়ু বহিতেছে, মৃত্তিকা হইতে তখন যেন অগ্নি নির্গত হইতেছে। দেখিতে২ রজনী আরও গভীরা হইয়া উঠিল।

পাঠক! এই সময়ে একবার চন্দ্রপুরের উত্তরের বৃহৎ অরণ্যে চল। ভয় হইতেছে ? তুমি বাঙ্গালী কি না! গ্রন্থকার সঙ্গে আছেন, তিনিই তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। নচেৎ তুমি তাঁহাকে পয়সা দিবে কেন ? কেবল চন্দ্রপুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বৎ বেষ্ঠন পূর্ব্বক পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সেই বনে চল।

চন্দ্রপুর হইতে সারণ গড়ে যাইবার যে রাজ পথ ছিল, সে এই বনের নিকট দিয়া। যে স্থান বনের শেষ সীমা, সেই স্থানের বন সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল। এই পথ দিয়া উত্তর দিক হইতে আগমন করিয়া সারণ গড়ের রাজপথে উঠা যাইত। কিন্তু এই পথটী অতি সংকীর্ণ ও দুর্গম ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে "মরাগলি" নামে অভিহিত করিত—এতৎ ব্যতীত উহার নিকট পল্লীবাসীরা মৃত পশ্বাদির শব নিক্ষেপ করিত।

রাত্রি অনুমান চারি দণ্ড, এমন সময়ে এক জন পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই মরাগলি দিয়া সারণ গড়ের রাজপথাভিমুখে আগমন করিতেছে।

পথিকের পরিধানে একখানি স্থূল শুভ্র বস্ত্র জানু দ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, গাত্রে একটী জামা। পৃষ্ঠদেশে পথ ভ্রমণের উপযোগী একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। মস্তকে একখানি চাদর বাঁধা। দক্ষিণ

হস্তে এক গাছ বেতের যষ্টি। বাম হস্তে এক জোড়া কটকী জুতা, ললাটে একটী রক্ত চন্দনের ফোঁটা, তন্মধ্যে একটী কৃষ্ণ বর্ণের ফোঁটা। সর্ব্বাঙ্গে তিলক, কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষের মালা। ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুল রাগে ঘোর রঞ্জিত, ললাটের উপরি ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ, তদূর্দ্ধে স্ত্রীলোকের ন্যায় দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ পশ্চাৎভাগে আবদ্ধ রহিয়াছে। পথিক একান্ত মনে দ্রুত পদে গমন করিতেছেন।

এমন সময়ে নিকটস্থিত বন মধ্যহইতে অস্ফুট মনুষ্য স্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল, হৃদয় গ্রন্থি শিথিল হইল, পথিক চলৎ শক্তি বিহীন হইয়া সভয়ে উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন, "কোথায় ?" উত্তর নাই, পথিক স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে, ভীমাকৃতি দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখ বর্ত্তী হইল, পথিক পুনর্ব্বার শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া কহিলেন, "তোমরা কে ?"

পুরুষদ্বয় গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আমরা তোর বাবা।" পথিকের অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল, জানিতে পারিলেন জীবন রক্ষা সংশয়, দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন। পথিক সাহসে নির্ভর করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোমরা কি চাও ?"

এক জন দস্যু উঠিয়া বলিল, "নিকাশের প্রয়োজন নাই, যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তবে যা কিছু তোর সঙ্গে আছে, আমাদের দিয়া পালা।"

এরূপ ভয়ানক বিপদে পড়িলে প্রাণ রক্ষার্থে সমস্ত বস্তু দস্যু হস্তে কে প্রদান না করে ? কিন্তু পথিক উড়িষ্যা বাসী, যে একটী পয়সার জন্য গ্রীবা দেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে প্রোথিত রাখিয়া সমস্ত দিন থাকিতে পারে, সে কখন হঠাৎ আপন সম্পত্তি পরের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে না। পথিক দস্যুর কথাতে সম্মত হইল না।

পথিকের এই রূপ আচরণে দস্যুগণ পথিকের উপর আক্রমণ করিল। এবং ক্ষণকাল মধ্যে পথিককে সাঙ্ঘাতিক রূপে আঘাত প্রদান করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। পথিক শরীরের বেদনায় এবং সম্পত্তির বিচ্ছেদে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

যখন দস্যুগণ পথিকের সর্ব্বস্ব মোচন করিতেছিল, সেই সময়ে দূরস্থিত অশ্বের পদ শব্দ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দস্যুগণ শত্রু সন্নিকট জানিতে পারিয়া ত্রস্ত হস্তে শীঘ্রং কার্য্য উদ্ধার করিয়া বন মধ্যে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু অশ্বারোহী বীরপুরুষ, অতি সত্বর তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া উভয়কে আক্রমণ করিল।

বীরপুরুষ অশ্বারোহণে, দস্যুদ্বয় ভূমিতে, সুতরাং তাহারা বীরপুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারিয়া পলায়নপর হইল, বীরপুরুষ হস্তস্থিত অসির দ্বারায় এক জনকে আঘাত করিলেন, সে ভূমিতে পড়িয়া গেল। অন্য জন প্রস্থান করিল।

অনন্তর বীরপুরুষ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দস্যুকে ধরিলেন এবং পথিকের স্খলিত উষ্ণীশ দ্বারা দস্যুর হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গভীর স্বরে কহিলেন, "তুই কে, সত্য করিয়া বল, নইলে এই হস্তস্থিত তরবারি দ্বারায় তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিব।"

দস্যু সভয়ে উত্তর করিল, "আমরা মহারাজ সুরেন্দ্র সিংহের সম্বন্ধী

জগৎ মোহন সিংহের অনুচর।”

পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে “হুঁ” বলিয়া বীরবর পথিকের নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন পথিক মূর্চ্ছিত, অনেক কষ্টে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে পথিক সাহ্লাদে ও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে?”

“সময়ে বলিব” ইহা কহিয়া বীরপুরুষ পথিককে ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় করিলেন এবং এক হস্ত দ্বারা দস্যুকে ধরিয়া ও অপর হস্ত দ্বারা অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে গমন করিলেন।

মসলা বাঁধা কাগজ।

২য় সংখ্যা।

আমরা পশু না ত কি?

পশু বলিলে গালি হয় কেন? ইহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি অনেক দিন নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু একথার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি যতই ভাবি, ততই বোধ হয় যে, আমরাও পশু।

মনুষ্য কাহাকে বলে? কোন কোন দার্শনিক লিখিয়াছেন, যে জীব হাসিতে পারে, তাহাকে মনুষ্য বলা যায়। যদি দন্ত বাহির করা আমাদের প্রধান গুণ হয়, তাহা হইলে ত বানরকে আমাদের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর জীব বলিতে হয়। আমরা কখন কখন হাসি;—তুমি পড়িয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে, একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিলাম; তোমার গৃহিণী ব্যভিচারিণী হইয়াছেন, তাহার জন্য তুমি ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছ—তোমার অন্তরে শেলবিদ্ধ হইয়াছে, তখন একবার আহ্লাদে দন্ত বাহির করিলাম। এই রূপে আমরা কখনং হাসি, আর বানরগণ সর্ব্বদাই হাসে—সময় অসময় নাই, মানুষ দেখিলেই দন্ত বাহির করে। বোধ হয়, মনুষ্যের কাছে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ এরূপ করে—বোধ হয়, দন্ত বাহির করিয়া তাহারা আমাদিগকে বলে—“দেখ, তোমরা যতই কেন আত্মাদর এবং আত্মগৌরব কর না, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তোমাদের যাহা প্রধান গুণ, তাহাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা অনেক হীন।”

কেহ কেহ বলেন, “চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হিতাহিত বিবেচনাপরায়ণ জীবের নাম মনুষ্য।” আমার মতে এ অর্থ অতি দুষ্ট। এ ব্যাখ্যার দোষ এই যে, নিকৃষ্ট জীবেরাও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ন্যায় চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা হিতাহিত বিবেচনা পরায়ণ নই। ভাই, যখন রাত্রিতে শয়ন করিবে, তখন এক একবার সমস্ত দিবসের কার্য্যগুলি স্মরণ করিয়া দেখিও দেখি, কয়টী কার্য্য হিতাহিত বিবেচনা করিয়া করিয়াছ? হয় ত একটীও না। তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া চারি পাঁচ সিলিম তামাকু পোড়াইয়াছ। তার পর এক জন গরিব নির্দ্দোষ প্রতিবাসীকে সমাজে রহিত করিবার পরামর্শ

করি। স্নান করিয়াছ। পরে আহার করিয়া ঘুমাইয়াছিলে ; চারিটার সময়ে উঠিয়া দুটো খোসগল্প করিতে অথবা দু বাজি শতরঞ্চ খেলিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বারবিলাসিনীর গৃহে আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাত্রি তিনটার সময় বাটী আসিয়াছ। গৃহিণী বলিলেন, "এমন করিয়া শরীর নষ্ট করা কি ভাল?"—তুমি রাগ করিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া শয়ন করিলে। ভেবে বল দেখি, তোমার হিতাহিত বিবেচনা কোথায় ছিল? দেখ ভাই, রাগ করিও না; জিজ্ঞাসা করি—তুমি মানুষ না পশু?

আর তুমি? তুমি যে এই কথা শুনিয়া মনে২ বড় হাসিতেছ, তুমি কি? তুমিও একবার সমস্ত দিনের কার্য্য মনে কর দেখি। তুমি দশটার সময় বিছানা থেকে উঠিয়া এগারটা পর্য্যন্ত খোঁয়ারির ঝোঁকে দশ বারো গেলাস্ জল খাইয়া স্নানান্তে যৎসামান্য দুটী অন্ন আহার করিয়াছ। তার পর দুই তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া অপরাহ্লে সভায় গিয়া "হিন্দুধর্ম্ম আগা গোড়া মিথ্যা" বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছ। সন্ধ্যার পর এক বারাঙ্গনার গৃহে মদ্যপানের আবশ্যকতা সমর্থনার্থ বাইরণ, কাউলি এবং আনাক্রিয়ন হইতে দুই চারি ছত্র কোট্ করিয়া পার্টিতে বসিয়াছিলে। পরে নেশার ঝোঁকে বমন করিয়া, তাহার উপর মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি পড়িয়া থাকিয়া, এই মাত্র উঠিয়া আসিতেছ। তুমি হয় ত রাগ করিয়া বলিবে—"আজ যে রবিবার আজ সন্ধ্যার পরই পার্টিতে বসিয়াছিলাম, না উপাসনা করিয়া বসিয়াছিলাম?" আজ রবিবার আমার স্মরণ ছিল না, সে দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ; আর বলি, তুমি যদি অন্তরের সহিত উপাসনা করিয়া থাক, তবে সেই দশ মিনিট তোমার জীবনের সার। কিন্তু তুমি যে অন্তরের সহিত উপাসনা করিয়াছিলে, তাহার কি পরিচয়? এই দেখ ভাই, রাগ করিয়া যদি আমাদের নামে সংবাদ পত্রে লিখিবে বল, তবে নাচার; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমিও মানুষ না কি?

আমাদের স্বভাব পাপ পরিপূর্ণ। আমরা কেবল শিক্ষার দ্বারা ধার্ম্মিক হই—অশিক্ষিত লোক সব পশ্বাচারী। পাঠক, মনে করিবেন না, যে কেবল মুখস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তি হওয়ার নাম শিক্ষা। অসভ্যজাতির মধ্যে পাপ পুণ্যে ভেদ জ্ঞান বড় পাইবেন না। আমরা যে অতি সভ্য, এতদূর সভ্য যে জয়দেব, অথবা ভারতচন্দ্রের নাম মাত্র শুনিলে আপনাকে কলুষিত বোধ করি—আমাদেরও পশুবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। আমরা মুখে ধার্ম্মিক, তর্ক করিবার সময় ধার্ম্মিক; উইল্‌সনের বাড়ীর মহাপ্রসাদ পাইবার সময় ধার্ম্মিক; কিন্তু অন্তর হইতে পাপ দূর করা বড় কঠিন—সুন্দরী যুবতী দেখিলে বার বার তাকাইতে ইচ্ছা করে। ভাষায় দেখুন, ইহার প্রমাণ পাইবেন; যে আপনার স্ত্রীকে ভাল বাসে, সে স্ত্রৈণ, যে পরের স্ত্রীকে ভালবাসে, সে প্রণয়ী।

পশুদিগের ন্যায় আমাদের কি নয়? দুর্ব্বল পীড়ন, পরস্বাপহরণ মানুষের স্বভাব— নহিলে আমরা পরের দাস কেন? কলহই আমাদের ধর্ম্ম—

নারদ * শব্দ তাহার পরিচয়। পরস্পরের সহিত বিবাদেই আমাদের আমোদ—আমাদের ক্রীড়া সকল পর্য্যন্ত বিবাদের প্রতিরূপ মাত্র। তাস শতরঞ্চ যাহা বলুন, তাহাতেই আমাদের স্বভাবের ছায়া আছে।

আমরা সকলেই বৃথা কাযে অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছি। ধন, যশ, বিদ্যা, গৌরব, খ্যাতি, পদ, সম্মান এই সকলের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি—জীবনের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার ত কই কিছুই করিলাম না? প্রকৃত সুখ কিসে হয়, এক দিনও ভাবিলাম না—প্রকৃত সুখলাভের যত্ন এক দিনও করিলাম না? জীবনের বিমল সুখের বিনিময়ে মুহূর্ত্তেকের অসার আমোদ চিরদিন কিনিলাম,—এখনও কিনিতেছি—পরেও কিনিব। ধর্ম্ম লইয়া অনেক বাদানুবাদ, অনেক বক্তৃতা, অনেক তামাসা করিলাম, কিন্তু যাহা কাজ, তাহার ত কিছুই করিলাম না? পশুর ন্যায় পশুবৃত্তির দাস হইয়া, পশ্বাচারে জীবন কাটাইলাম; ভাবিলাম না যে, পাপের পথ কন্টকময়। প্রত্যহ মনে করি, দুষ্প্রবৃত্তির দমন করিয়া জীবন সংশোধন করিব; কিন্তু কই পারি না ত? আমাদের হিতাহিত বিবেচনা কোথায়? আমরা পশু না ত কি?

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমার বোধ হইল, পশুর মধ্যে যেমন জাতিবিভাগ আছে, মনুষ্য পশুর মধ্যেও তেমনি আছে; এক এক সম্প্রদায়ের মনুষ্য এক এক জাতীয় পশুর স্বভাবাপন্ন। কোন্ সম্প্রদায়ের মনুষ্যের কোন্ পশুর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাবিয়া আমি যে ফল পাইয়াছি, তাহা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি।

ইংরাজদিগকে আমার শিবাবতার হনূমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা যে সমুদ্র পার হইতে সক্ষম, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। হনূমানের কীর্ত্তি আশ্চর্য্য। হনূমান না হইলে সীতার উদ্ধার হইত না; ইংরেজেরা এ দেশে না আসিলে ভারতলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার হইত না—আমাদের নাম উঠিয়া যাইত—আমরা এত দিন সাঁওতাল হইতাম। ইংরেজেরা ইউরোপ হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া মৃতপ্রায় ভারতকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। এই যে সুখসেব্য, উপাদেয় দেবতাদুর্লভ আম্র খাইব বলিয়া আজ হইতেই উৎসাহ করিতেছি, এ অমৃতোপম ফল হনূমানই এ দেশে আনিয়াছিল। আমরা যে সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শনের মধুর রস আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, ইহা অনেকাংশে ইংরেজদের প্রসাদাৎ। মাটীর দোষে অনেক আম্র টক্ হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের এ পোড়া দেশের জল বায়ুর গুণে ইংরেজী সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে টক্ আম্র কোন্ গুলি জান?—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা ইত্যাদি। আমাদিগকে টক্ আম্র খাইতে হয় বলিয়া কিছু আমরা অঞ্জনানন্দনকে গালি দেই না—তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। তিনি আমাদের সুখের কামনাতেই এ ফল আনিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের মাটীর দোষ—আমাদের পোড়া কপালের দোষ। যাহা হউক, আম্রগুলি কিন্তু বড় টক্। যাঁহারা সিভিলিয়ান হইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে

১ নরণাৎ ভাবৎ নারঃ (কলহ) নারং দদাতীতি নারদঃ

মুখে পারে কার সাধ্য—বিধাতা যদি শরীরের বর্ণের পক্ষে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া নূতন আইন জারি করিতেন, তাহা হইলে ইহাঁরা এত দিন প্রকৃত সাহেব হইয়া উঠিতেন। আমার স্ত্রী বোধোদয় পড়িয়াছে ; তাহাকে কোন কাজ করিতে বলিলে, বলে "আমার সময় নাই।" কলিকাতা অঞ্চলে টক আম্রের ভাগ কিছু অধিক—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রাদুর্ভাব কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই কিছু অধিক। আমরা প্রায় টক্ আম খাইনা—যে গুলি টক্ হয়,সে গুলি প্রায় গোরুকে দেওয়া যায় ;—ভাল লোককে কই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ দেখিতে পাই না।

সুদীর্ঘ এবং বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষের উচ্চ শাখা গুলিতে বড় বড় সুন্দর সুন্দর আম্র গুলি ফলিলে কি শোভা হয়! দেখিলেই যেন চক্ষু জুড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটা দুষ্ট বানর তাহার উপর পড়িয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া, ফল ছিঁড়িয়া সব লণ্ডভণ্ড করিবার চেষ্টা করে।

হনূমান না হইলে সাগরে সেতুবন্ধন হইত না—সহজে লঙ্কা যাওয়া হইত না; রামচন্দ্রের অভিলাষ সিদ্ধ হইতে অনেক যত্ন, অনেক কাল লাগিত। প্রণয়িনী দেখিবার জন্য তোমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে ; আজই গিয়া চাঁদমুখ দেখিয়া হৃদয় শীতল করিতে হইবে—রেলের গাড়ি না থাকিলে এত সহজে মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। ভ্রাতার পীড়ার কথা শুনিয়া তুমি বড় ব্যাকুল হইয়াছ—দুই মিনিটে তাঁহার সংবাদ লইয়া হৃদয় শীতল করিলে! টেলিগ্রাফ্ না থাকিলে কি রূপে পারিতে? হনূমান বড় কৌশলী, সূর্য্যদেবকে কক্ষে ধরিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিল—ইংরেজেরা বিদ্যুৎ ধরিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করে।

সীতা, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, স্নেহের পরিচয় স্বরূপ, হনূমানের গলে মুক্তার হার পরাইয়া দিলেন। হনূমান বানর বৈ ত নয় ;—এ অমূল্যধন ছিঁড়িয়া ফেলিল। আদর করিয়া আপন পদ্ম হস্তে এ হার রামচন্দ্রের গলায় দিলে, তিনি চরিতার্থ হইতেন। ইংরেজেরা আমাদিগকে উন্নত করিয়াছেন, আমাদের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন,—আমরা প্রতিদান স্বরূপ ভক্তিপুষ্পহার তাঁহাদিগকে পরাইতে চাই; কিন্তু তাঁহারা সাময়িক অবিজ্ঞতা রূপ খর নখরের দ্বারা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। প্রজাবৎসল রামচন্দ্র প্রজার নিকট এই হার পাইবার জন্য জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, ইহাঁরা তাহা পাইয়া দাঁত দিয়া ছিঁড়িতেছেন—বানুরে বুদ্ধি কি না।

বানরকে আমাদের মত হইতে দেখিলে বড় আমোদ হয়—একটী বানরকে ঢাকাই কাপড় পরাইয়া, পীরান, টুপি জুতা দিয়া সাজাইলে কি আমোদ হয় না? অমুক সাহেবকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র হিন্দু সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইতে দেখিয়া এবং ইংরেজদিগকে ন্যায় এবং সাংখ্যদর্শনের সমালোচন করিতে দেখিয়া, ভাই বঙ্গবাসি, তোমাদের কি হাসি পায় না?

বানরের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। দুই এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ানের সঙ্গে আমি রূপি-বানরের সাদৃশ্য দেখি। ইহাঁরা মানুষ দেখিলেই দন্ত খিচাইয়া থাকেন—নিকটে গেলেও

আঁচড়াইয়া অথবা কামড়াইয়া দেন। তবে যদি রম্ভা দেখাইয়া বশ করিতে পার, তাহা হইলে গলায় শিকল দিয়া নাচাইয়া বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিবে. ইংরেজ জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে যদি সেলাম করিয়া, হুজুর বলিয়া বশ করিতে পার, তাহা হইলে উপার্জ্জনের পথ মুক্ত হইল—উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইবে। বানর গুলা বড় দুষ্ট—তীর্থ স্থান মানে না—বৃন্দাবনে যাত্রিদেব বস্ত্রাদি লইয়া বড় উৎপাত করে। আমাদের হনুমানেরা ধর্ম্মাধিকরণ স্থলেও অত্যাচার করিয়া থাকে। এবং বুদ্ধিমান পাঠক, এতক্ষণ বোধ হয়, বুঝিয়াছ, ডারউইন সাহেব পুস্তক লিখিয়াছেন কেন? প্রবাদ আছে, "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" তিনি যে মনুষ্য মাত্রকে আপনাদের ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিবেন, ইহার আশ্চর্য্য কি? আমার দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি কিছু বিলাত পর্য্যন্ত যাইবে না? যদি যাইত, তাহা হইলে ডাকিয়া বলিতাম—"দেখুন, মহাত্মা ডারউইন, আপনারা কি, তা আপনিই জানেন। আমরা গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল যাহা হই, কিন্তু বানর কখনই নই।"

আমাদের দেশীয় হাকিমেরা পশুর মধ্যে ছাগল। গ্রীষ্মকালে এক এক ব্যক্তি বানর এবং ছাগল লইয়া ভিক্ষা করিতে আসে, তাহা বোধ হয়, সকলেই দেখিয়াছেন। তাহাদের খেলা গুলি একবার মনে করুন, আপনিই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। ভূমি হইতে অর্দ্ধহস্ত উচ্চ একখানি সংকীর্ণায়তন কাষ্ঠের আসন পাতে; শিক্ষিত ছাগলটী অতি কষ্টে তাহার উপর চারি পা একত্র করিয়া দাঁড়ায়। বানরটী মাথায় টোপর দিয়া সেই ছাগলের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। বানর, চাবুক মারে, কান ধরিয়া টানে—ছাগলটী নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বাঙ্গালী হাকিমেরা সাধারণ লোক অপেক্ষা কিছু উচ্চ পদস্থ বটেন, কিন্তু দাঁড়াইবার স্থান বড় সংকীর্ণ; ক্ষমতা অতি অল্প—হাত পা গুটাইয়া থাকিতে হয়। পৃষ্ঠের উপর জেলার বড়২ সাহেব লাগাম দিয়া, কান ধরিয়া—অগত্যা নিরীহ ভদ্রলোকের মতন টুপিওয়ালা বানর বহন করেন। ছাগলটীর পা একটু সরিলেই অমনি উপর হইতে বানর চাবুক মারে, আবার ভিক্ষুক প্রদর্শনকারী চপেটাঘাত করে। হাকিমেরা ভুলক্রমে একটু ক্ষমতার বাহির হইলেই অমনি কানমলা, চপেটাঘাত চাবুক পড়িতে থাকে—বেনামী দরখাস্ত পড়ে, কৈফিয়ৎ তলব হয়, সংবাদ পত্রে পাঁচ সাত পাতা গালি গালাজ ছাপা হয়, আবার জেলার কমিসনর চক্ষু রক্তিমাবর্ণ করিয়া কড়া কথা বলেন,—ছাগল বেচারা অগত্যা সব সহ্য করে। আবার দেখিবেন, ছাগলটী আসন হইতে নামিয়া কেমন সগর্ব্বে ইতস্ততঃ অবলোকন করে—দেশী হাকিমদের সাহঙ্কার দৃষ্টির কথাটাও একবার মনে করিবেন।

ছাগলের গম্ভীর মূর্ত্তি এবং শ্মশ্রু দেখিলে, তাহাকে পশুর মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। দেশীয় হাকিমদের গর্ব্বিত দৃষ্টি এবং শ্মশ্রু * দেখিলে

* ইরাস্‌মস্ শ্মশ্রুকে "জ্ঞানের ঝোপ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,
"Bush of wisdom"
Erasmus' Praise of Folly.

মহা পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, ইহাঁরা মনুষ্যের মধ্যে ছাগল বই আর কিছুই নহেন। বিদ্যা শ্মশ্রুগত—অনেকে গোরু চুরির মোকদ্দমায় জমাওয়াসিল বাকী তলব করেন। বানরবাহী ছাগলের কাছে মানুষ গেলে ঢু মারিতে আসে—ভদ্রলোকে এ মানুষ ছাগলদের সঙ্গে আলাপ করিবেন না, অপমানিত হইতে হইবে—ইহাঁরা ভদ্রলোকের সম্মান জানেন না। বালকের রোগে ছাগ দুগ্ধ বড় উপকারী: এ ছাগলের দয়াদুগ্ধে * ছেলে পিলের ঘোঁড়ারোগ আরোগ্য হয়— ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ভয়ে অনেক বেয়াড়া ছেলে শাম্য অবলম্বন করে।

আমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসূত্রে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আমার গর্দ্দভ বলিয়া বোধ হয়। গর্দ্দভ অনেক রকমের অনেক বস্ত্র পৃষ্ঠে বহন করে। একটী গর্দ্দভের ভার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন,—অমুক রাজার বাড়ীর এক শত টাকা মূল্যের এক খানি শান্তিপুরে শাড়ী, অমুক বড় লোকের গৃহিণীর এক খানি বিচিত্র ঢাকাই শাড়ী, কৃষ্টকান্ত তর্কালঙ্কারের এক খানি ছেঁড়া মলমলের চাদর, ফয়জুল্লা সেখের আধ খানি পায়জামা—উত্তম, মধ্যম, অধম অনেক রকম বস্ত্র দেখিতে পাইবেন; গর্দ্দভের বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিদ্য যুবক দলের মধ্যে একটীর ভার নামাইয়া দেখুন—সেক্ষপীয়রের একটী প্লে, ...নের দুই ছত্র, কালিদাসের আধ খানি শ্লোক, মিল এবং হামিল্টনের দুইটী কথা; গৃহিণীর রচিত একটী পদ্য, বটতলার একখানি নাটকের এক অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। গর্দ্দভ অনেক বস্ত্র বহন করে, কিন্তু আপনি উলঙ্গ—ইহার পৃষ্ঠে বিদ্যাবিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনি কোন বিষয়েই বাক্যব্যয় করিতে পারে না। এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, "মহাশয়, অমুক বিষয়ে আপনার মত কি?"—বাবু থেলিস হইতে অগষ্টী কোমটী পর্য্যন্ত সকলের নাম করিবেন, সক্রেটীস হইতে হারবার্ট স্পেন্সর পর্য্যন্ত সকলের মত আওড়াইবেন, কিন্তু নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিলেন, কেশব বাবু কিছু বলিয়াছেন কি না? যদি না বলিয়া থাকেন, তবেই অবাক; গর্দ্দভ ইহা বুঝে না, যে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত দিগের সহিত তুলনায় কেশব বাবু কীটাণুকীটও নহেন। গর্দ্দভের পৃষ্ঠস্থ বস্ত্ররাশি বহুমূল্য হইলেও অত্যন্ত মলিন—নহিলে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কেন? সে গুলি না কাচাইলে আর ব্যবহার করা যায় না। ইহাদের কাছে যে সকল কথা পাইবেন, তাহা বড় ধূলা মাটীময়—সযত্নে পরিষ্কার না করিলে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ইহাঁরা অনেক সারগর্ভ তত্ত্বের সঙ্গে আপনার মতরূপ ধূলা মিসাইয়া বড় মলিন করিয়া রাখিয়াছেন—পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলে ভারি লাভ। গর্দ্দভের অন্য যে গুণ থাক, কিন্তু শব্দ বড় কর্কশ; আমাদের মানুষ গর্দ্দভেরা যখন শব্দ করেন—সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখেন, অথবা নাটক প্রণয়ন করেন, তখন কর্ণে হস্ত না দিয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, গর্দ্দভ কিন্তু অত্যন্ত শান্ত পশু;

* লেখক এ শব্দটী বোধ হয়, সেক্ষপীয়র হইতে অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন,
'Milk of human kindness" Macbeth.

রজক প্রহার করে, পথে বালকেরা ঢিল ফেলিয়া মারে, পশ্চাতে কুকুর খেউ খেউ করে—গর্দ্দভ সব সহ্য করে। মানুষ গর্দ্দভ গুলিও বড় শান্ত—কত ঝাঁটা নাথি খাইতেছেন, কিন্তু রাগ নাই; একবার শব্দ করিলেই দুই জন সমালোচক পশ্চাতে খেউ খেউ করিয়া লাগেন। গর্দ্দভ সব সহ করে, তবে নিতান্ত অসহ্য হইলে এক বার একটী নিষ্ফল চাট মারে—একটী দুর্ব্বল কবিতা লিখিয়া সংবাদপত্রে মুদ্রিত করে।* যাহা হউক, গর্দ্দভ দেখিতে কিন্তু ঘোটকের ন্যায়—এক জন মাষ্টার অব আর্টস দেখিলে আপাততঃ পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়।

আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বলিয়া খ্যাত, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি কুকুরের সাদৃশ্য দেখি। ইহারা সাহিত্যের দ্বারে প্রহরী—কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখিলেই অমনি খেউ খেউ করিয়া কামড়াইতে আসে। ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারে না; সকলকেই আক্রমণ করে—অভিপ্রায়, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। এমন বুদ্ধিমান কুকুরও আছে, যাহারা লোক চিনিতে পারে; কে প্রবেশ করিবার যোগ্য, কার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু এ রূপ কুকুর আমাদের দেশে বড় বিরল,†—বিলাতি কুকুরের এ গুণ আছে বটে। তবে তোমার শরীরে যদি অধিক সামর্থ্য থাকে, এবং সাহসী হও, তাহা হইলে কুকুর অগ্রাহ্য করিয়া অথবা পদাঘাত করিয়া প্রবেশ করিতে পার; কিন্তু এ রূপ সাহস বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল—বাঙ্গালীরা কুকুরের আস্ফালন দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হন; অনেকে ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া যান। সুধু বাঙ্গালী কেন? —অনেক সাহেবও কুকুর দেখিয়া ভয় করেন। কীট্স নামক কবি কুকুরের ভয়ে জীবন্মৃতবৎ হইয়াছিলেন। লর্ড বাইরণ তাহাদিগকে পদাঘাতে দলিত করিয়াছিলেন। সে বিষম পদাঘাত চিরস্মরণীয় হইয়া আছে—তাহাকে লোকে "ইংরাজ কবি এবং স্কচ্ সমালোচক" বলে।

কুকুরের আহার কি জান? ভদ্রপরিত্যক্ত ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টান্ন। তোমার গৃহিণী অতি যত্নে স্বয়ং পদ্মহস্তে পাক করিয়াছেন; তুমি পাঁচ জন বন্ধুকে লইয়া পরম পরিতোষের সহিত আহার করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিলে। তোমাদের বোধ হইল, এমন অমৃতোপম দেবতাদুর্ল্লভ অন্ন এ জন্মে আহার কর নাই—সহস্রমুখে প্রশংসা করিলে। ভোজনান্তে উঠিয়া যাইবার সময় দেখিলে, উঠানে একটা কুকুর বসিয়া আছে। "মাছের কাঁটা এবং বেগুনের খোসাগুলি কুকুরটাকে দেতরে"—কেহ সে গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিল, কুকুর মহা আমোদ করিয়া তাহা উদরসাৎ করিল। ভারতচন্দ্রের মধুর কবিত্বরসাস্বাদনে তুমি পুলকিত হইলে, কুকুর তাঁহার অশ্লীলতা লইয়া আমোদ করিল। স্বয়ং মধুসূদন দত্ত মাছ রাঁধিয়াছেন। মৎস্যের সার ভাগ খাইয়া তুমি কৃতার্থ হইলে;

* এ কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত, "কেন না হইলি তুই সলিতার কানি, রে প্রাণ বল্লভ," ইত্যাদি পড়িবেন। গর্দ্দভের 'চাট' দুর্ব্বল এবং নিষ্ফল তাহাও দেখিবেন।

† সহচরের তীর্থমহিমা সমালোচন। নিমাই বাবু সামান্য গল্প লইয়া এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়াছেন, এমন দোষ কি মার্জ্জনীয়?

উঠিবার সময় কুকুরকে কাঁটা গুলি দিলে। কুকুরের গলায় কাঁটা বিঁধিল—কুকুর বিরক্ত হইয়া 'কেঁউং' করিয়া বলিল, "ছি ইহাতে রস কই? কেবল কাঁটা—অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে কবিত্ব থাকিতে পারে না।" পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যা * এবং আশ্চর্য্য রচনাশক্তি দেখিয়া পুলকিত হয়েন; সমালোচক আত্ম গরিমারূপ নেশার ঝোঁকে কেবল "টাকশাল আর সিকি দুয়ানি আধুলি" দেখেন।

পাঠকবর্গ গ্রন্থের গুণচয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন; সমালোচকের পোড়া চোখে প্রায় গ্রন্থের দোষ গুলিই পড়ে। কুকুর কি না, ধূলিপূর্ণ বেগুনের খোসা এবং মাছের কাঁটা বই আর কি হবে।

কুকুরের আর একটী দোষ আছে। শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বড় খেউং করে। সে কি শশাঙ্কের কলঙ্ক দেখিয়া? না। কেমন কুকুরের স্বভাব, চন্দ্রের শোভা সহ্য করিতে পারে না—আপনি ছাইয়ের গাদার উপর থাকে কি না? স্যুইফ্‌ট্‌ বলেন, "সংসারে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে চিনিবার প্রধান চিহ্ন এই যে, মূর্খ মাত্রেই তাঁহার বিদ্বেষী।† বানরের সঙ্গে কুকুরের বড় বিবাদ উভয়ে সাক্ষাৎ হইলেই কলহ হয়; পাঠক, আধুনিক সংবাদপত্রে রাজনীতি সমালোচনা দেখিবেন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়ম করেন, তাহাই যে মন্দ তাহা নহে; কিন্তু কেমন স্বভাব, বানর দেখিলেই কুকুর পশ্চাতে লাগে। মনে করে না যে, বানর রহিল উচ্চ ডালে, আমরা ছাইগাদার উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কি করিব? মনে করে না, যে এ বৃথা চীৎকারে কোন ফলোদয় নাই—লাভের মধ্যে, কেবল বানরের রাগ বৃদ্ধি করা হয়। রাজনীতি সমালোচনা কর, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কাম্বেল সাহেবকে গালি গালাজ কেন? তাঁহার কি সবই দূষণীয়? অন্য লোকের ন্যায় তিনিও দোষ গুণে জড়িত।

কুকুর বড় প্রভুভক্ত—আহার দিয়া পুষিতে পারিলে অনেক কাজে লাগে। বিপদের সময়ে পোষা কুকুরের দ্বারা অনেক উপকার হয়। তুমি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছ, কিন্তু গ্রন্থ খানি অতি জঘন্য হইয়াছে। তা হোক;—একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদককে এক দিন তোমার বাটীতে সমারম্ভে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিও, অথবা তাঁহার বাটীতে একখানি ভাল ঢাকাই শাড়ী পাঠাইয়া দিও, এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে। তিনি প্রাণ খুলিয়া তোমার প্রশংসা করিবেন—পুস্তক খুব বিক্রয় হইবে। তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবা যে সারবিঃ রসের ন্যায় দুরন্ত কুকুরও আহারে বশীভূত হইয়াছিল।

কুকুর খেউ করিয়া পশ্চাতে লাগিলে, তাহাকে অগ্রাহ্য করাই সৎপরামর্শ; আর যদি প্রহারের দ্বারা শান্ত করিতে পার, তবে ত কথাই নাই। দেখ, ইংরেজ রাজপুরুষ, তোমাকে বলি, ভাই, বঙ্গীয় গ্রন্থকার তোমাকেও বলি, কুকুর পশ্চাতে লাগিলে, যদি সাহস থাকে, তবে পদাঘাতে তাহার মুখ থেঁতো করিয়া

* তাঁহার পরিচয় বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলি।

† Whenever a geneus appears in the world you may know him by this mark, that all the dunces are against him".
Thoughts on Various Subjects. Swift v.

দিও, অথবা তাহার চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যাইও, কুকুর আপনি নিরস্ত হবে।

"রমণীকুলের সঙ্গে আমি শূকরের সাদৃশ্য দেখি। ছোট২ শূকর গুলি দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু বয়স হইলে বড় কদাকার হয়। অল্প বয়স্কা যুবতী দেখিতে বড় সুন্দর—নয়ন ফিরান দুষ্কর, কিন্তু অধিক বয়স হইলে অতি কদাকারা হয়।

অল্প রৌদ্রেই শূকর উত্তপ্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করে; রমণী অল্প প্রলোভনেই ব্যাকুল হয়। একটু অধিক রৌদ্র হইলেই, নিদাঘ সন্তাপে শরীর উত্তপ্ত হইলেই, শূকর অমনি দৌড়িয়া গিয়া দুর্গন্ধময় নর্দ্দামায় পড়িয়া শরীরের জ্বালা নিবারণ করে। রমণীর চক্ষের উপর রূপের জ্যোতি জ্বলিলে, রূপরৌদ্রে মন উত্তপ্ত হইলে, অমনি জ্ঞানশূন্য হইয়া স্থানাস্থান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়াই দৌড়িয়া গিয়া পাপ পঙ্কে পড়িয়া আশু শীতল হয়। নিকটে দেবতাবাঞ্ছিত নির্ম্মল জাহ্নবীর পবিত্র জল রহিয়াছে, শূকর তাহা চায় না—নর্দ্দামাই ভাল। কি আশ্চর্য্য! নরকুলের গৌরব জুলিয়স্ সিজরের ভার্য্যা পাপ ক্লোডিয়সের অনুরাগিণী!

শূকরকে অতি সাবধানে খোঁয়াড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নহিলে পথ পাইলেই অমনি গিয়া হয় নর্দ্দামায় পড়িবে, না হয়, বিষ্ঠায় মুখ দিবে। স্ত্রীলোককে অতি সাবধানে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া শাসনে রাখিও, নহিলে পাপে পড়িয়া শরীর কলুষিত করিবে।"

কৃতবিদ্য বঙ্গীয় অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্ম, তুমি হাসিতেছ? আচ্ছা হাস। আমিও জানি, তুমি হাসিবে। কিন্তু ভাই অনেককে তোমার মত হাসিতে দেখিলাম, আবার ব্রাহ্ম বাইশ পার হইলে গোয়াল নির্ম্মল করিয়া যে সেই হয়। তুমি না বুঝ, কিন্তু তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহা বুঝিতেন। প্রাচীন আর্য্য ইহা বুঝিতেন বলিয়াই লিখিয়াছিলেন "অঙ্কে স্থিতাপি রমণী পরিশঙ্কনীয়া।" ইহা বুঝিয়াছিছিলেন বলিয়াই মনু বিধি করিয়াছিলেন যে, "রমণী কখন স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিবে না। বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানের বশে থাকিবে।" প্রাচীন আর্য্যেরা ইহা বুঝিতেন বলিয়াই হিন্দুবালা আজিও প্রেমের পুত্তলি;—বুঝিতেন বলিয়াই প্রেমময়ী ভারতদুহিতা স্বামীর চরণরজ অঙ্গে মাখিয়া, স্বামীর মৃতদেহ বুকে করিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না। তোমার বুঝিয়া কাজ নাই, তোমার যাহা কাজ, তাহা কর—কেশব বাবুর পরিত্যক্ত বস্ত্রভার বহন কর।

আমাদের পক্ষে গৃহপালিত শূকর মাংস বড় নিষিদ্ধ, কিন্তু মনু বিধি করিয়াছেন যে, বন্য শূকর আহার করিবে, এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে দিবে। ইহার অর্থ এই যে;—অশিক্ষিত স্ত্রীলোক বিবাহ করিবে; অশিক্ষিত স্ত্রীলোক দেবোপভোগ্য। আর শিক্ষিত স্ত্রীলোক আমাদের অস্পৃশ্য। পালিত শূকর মাংস হাড়ি, ডোম, ম্লেচ্ছে ব্যাবহার করুক্, তুমি আর্য্যসন্তান, তুমি ইহা স্পর্শ করিও না। পালিত শূকর শাস্ত্রবিরুদ্ধ—খাইয়া সাবধান হইলে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু একটু অসাবধান হইলে জাতিভ্রষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

গৃহপালিত শূকর মাংসে আমার বড় অশ্রদ্ধা। কিন্তু কি করিব?—কৃতবিদ্য ব্রাহ্মবন্ধুদিগের অনুরোধে খাইতে হইয়াছে। খাইয়া ফেলিয়াছি—নিরুপায়—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ;—কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তুষানল করিতেছি—প্রত্যহ তুষানলে পুড়িয়া থাকি।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার গৃহলক্ষ্মী 'বোধোদয়' পড়িয়াছেন, তাঁহার প্রণয় সমালোচনা, ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা এবং হিতোপদেশের জ্বালায় বাড়ীতে থাকা—ভার। দিনের বেলায় প্রাণের দায়ে ভিন্ন পাড়ায় গিয়া বসিয়া থাকি—রাত্রে বড় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তুষের অনল শীঘ্র নিবায় না—বক্তৃতার জ্বালায় সমস্ত রাত্রি কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করি, নিদ্রা হয় না।

আমাদের দেশে আজি কালি, যে ব্যক্তি উইলসনের বাড়ীর শূকর মাংসে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তিনি সকলের বিচারে ঘোর মূর্খ। বিশেষতঃ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ শূকর মাংসের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং তাহা অবশ্য আহার করিতে হইবে। এ কথা কেহ মনে করে না যে, মিল্ ভিন্ন জাতীয়ের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদের জন্য নহে। আমরা পবিত্র হিন্দু সন্তান শূকর মাংস আহার করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারি না। লোকে মূর্খ বলে, বলুক—তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা পণ্ডিতাভিমানী নহি। সত্য সত্যই যখন আমরা মূর্খ, তখন কেবল শূকর মাংস খাইয়া পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না।

শূকরের একটী মহৎ গুণ আছে। শূকর খোঁয়াড়ে মলত্যাগ করে না; ঘরটী ভাল থাকে—তবে পশু কি না? হাজার হইলেও, শূকর—ঘরটী খুঁড়িয়া ফেলে। স্ত্রীলোকেরা বাড়ীটী নিকাইয়া, ঝাঁট্ দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে—তবে নূতন মেহগনি টেবিল্‌টীতে গুটিকত খদীর এবং চুণের দাগ, এবং নবনির্ম্মিত গৃহভিত্তিতে দুইটী চর্ব্বিত তাম্বুল রসের বসুধারা অবশ্য থাকে।

মৃত শূকরের কুঁচিতে অলঙ্কার পরিষ্কার হয়। সুবর্ণ অলঙ্কার কুঁচি দিয়া পরিষ্কার করিলে বড় উজ্জ্বল এবং শোভাশালী হয়। রমণীর কথা লিখিলে গ্রন্থের বড় শোভা হয়—সকলে সাদরে পাঠ করে। বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি সুন্দর অলঙ্কার গুলি, যদিও খাঁটি সোনার নয়, তবু কেমন উজ্জ্বল, কেমন মুগ্ধকর! ইহার এক মাত্র কারণ, এ গুলি মৃত শূকরের কুঁচির দ্বারা পরিষ্কৃত—রমণীর কথায় পরিপূর্ণ। আবার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় খানি খাঁটি সোনার হইলেও তত সুন্দর নহে, তত আদৃত নহে; কারণ, ইহাতে শূকরের কুঁচি পড়ে নাই—ইহাতে মানবের সর্ব্বার্থসার রমণীর কথা নাই।

ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগকে আমার বিড়াল বলিয়া বোধ হয়। বিড়ালকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ফেলিয়া দাও, পায়ে ভর দিয়াই পড়িবে,—আঘাত প্রাপ্ত হইবে না। ধর্ম্মব্যবসায়ী যে ধর্ম্মেরই লোক হউন, তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে উল্টাইয়া দাও, কিন্তু তিনি পড়িলেও পা পাতিয়া পড়িবেন।

বিড়াল, আলোক অপেক্ষায় অন্ধকারে দেখে ভাল—লোকে বলে, রাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে পার্থিব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড় পাইবে না, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে সমস্ত

দিন ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। "যজ্ঞোপবীত না ফেলিলে স্বর্গপ্রবেশের অধিকার নাই," এই বিষয় লইয়া এক ব্যক্তিকে আমি স্বয়ং দুই ঘন্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করিতে, শুনিয়াছি।

বিড়াল, নিষ্কর্ম্মা রমণীর বড় প্রিয়পাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, নিষ্কর্ম্মা রমণী মাত্রেরই একটী একটী বিড়াল থাকে। বালকেরাও বড় বিড়ালভক্ত। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের প্রভাব স্ত্রীলোক এবং বালকের মধ্যেই কিছু বেশী। কথক, রামায়ণ গায়ক, গুরু পুরোহিতের কথাটা একবার মনে করুন—ইচ্ছা হয়, বঙ্গদেশের নব প্রচারিত ধর্ম্মের কথাটাও একবার ভাবুন।

শিক্ষকদিগের সঙ্গে আমি গোরুর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। গোরু, পশু হইলেও বড় ভক্তির ধন। গোরু অনেক কাজে লাগে। গোদুগ্ধে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। গোরু না থাকিলে আমাদের দেশে চাষ হইত না—আমাদের অন্নাভাব হইত। শিক্ষকগণ যে কত লোকের অন্নদাতা, তাহার সংখ্যা কে করিবে? ইহাঁদেরই কৃপায়, ইহাঁদেরই বলে আমাদের দেশের অনেক লোক অন্ন করিয়া খায়।

অন্য দেশে গোরু নহিলেও চলে—ইংলণ্ডে ঘোটকের দ্বারা চাষ হয়; কিন্তু বাঙ্গালীর গোরু নহিলে উপায় নাই। ইউরোপে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের যে রূপ অবস্থা এবং গ্রন্থের যে রূপ বহুল প্রচার, তাহাতে শিক্ষকের বিশেষ সাহায্য ব্যতীতও বিদ্যোপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে বিনা শিক্ষকে চলিবার উপায় নাই।

গোরু যে দুগ্ধদান করে, তাহা অতি উপাদেয়, কিন্তু গোরুর আহার ঘাস। পৃষ্ঠে শর্করাভার, কিন্তু তাহাতে অধিকার নাই; বহন করা মাত্র সার—আহারের বেলায় ঘাস। বালকেরা যে শিক্ষা পায়, তাহা উত্তম—তাহাতে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। পৃষ্ঠেও উত্তম ভার—সাহিত্য দর্শনের অনেক কথা জানেন, কিন্তু তাহাতে অধিকার নাই—তাহা লইয়া আলোচনা করেন না। আহার ঘাস—আলোচ্য বিষয় তাস, শতরঞ্চ এবং তাম্রকুট। আমি কেবল স্কুল মাষ্টারের কথা বলিতেছি না;—সকল দিকেই দেখুন। গুরুমহাশয় বসিয়া বসিয়া কেবল তামাকের চিন্তা করিতেছেন—তামাক চুরি না করিতে পারার অপরাধে বালকদিগকে বেত্রাঘাত করিতেছেন। কালেজের মাষ্টার ভাবিতেছেন, "আজ লোকাভাবে তাস খেলা হলো না—দিনটা বৃথায় গেল।" চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মনে করিতেছেন, "কি দুরদৃষ্ট; কর্ম্ম কাণ্ড সব উঠিয়া গেল। কেহত মরেও না? তারাদাস বাবু পীড়িত আছেন—দেখা যাক কি হয়। কিন্তু আমাদের বামুনে কপাল—ভগবান কি এমন দিন করবেন?"

গোরু যদিও সকলের সেব্য, কিন্তু সেবায় তত ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। বাড়ীতে সকলে উত্তম করিয়া লাউ চিংড়ী এবং বম্বাই আম দিয়া ক্ষীর খাইয়াছেন আহারান্তে চাকরের প্রতি হুকুম হইল—"অরে রামা, লাউয়ের খোলা গুলি আর আধ পচা আম গুলি গোরুকে দিয়ে আয় ত"। এই হলো গো-সেবা। চাকরে বলিল, "মশাই, একটা ভাঙ্গা ছাতি পড়ে আছে—ওটা কি হবে?" বাবু বলিলেন "ব্যবহারের যো কি এক-

বারে নাই?” চাকর উত্তর করিল,“আজ্ঞা না, ছাতিটায় কাপড় মোটা নাই”। বাবু সদয় হইয়া বলিলেন,“আচ্ছা, তবে ওটা পাঠশালার গুরু মহাশয়কে দিয়ে আয়।” একটা গাভী মোটে দুগ্ধ দেয় না, কেবল বসিয়াং বাঁধা খায়, বাবু মনে মনে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন “ন্যায়-বাচস্পতিকে অনেক দিন কিছু দেওয়া যায় নাই, আগামী সংক্রান্তিতে এই গাভীটা দিতে হইবে।” গত কল্য বাটীতে ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে—খান কতক বাসী লুচি বাঁচিয়াছে; কর্ম্মকর্ত্তা সন্তানকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে আজ তোদের ইস্কুলের পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিস্”—এই হলো মানুষ গোরুর সেবা। গোরু, লাউয়েব খোসা আর আধ পচা আম খাইয়াই দুগ্ধ দান করে—শিক্ষক ভগ্ন, বস্ত্র বিহীন ছত্র এবং বাসি লুচিতেই সন্তুষ্ট।

সকল গোরুই যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নহে। অনেক গোরুতে কেবল গাড়ি টানে। এ গুলির গুণ এই যে, ইহারা বিলক্ষণ পদাঘাত সহিষ্ণু এবং চালকের ইঙ্গিতজ্ঞ—কথা বুঝে; দক্ষিণে, বামে যে দিকে বাগ ঘুরিয়াছে, সেই দিকেই অমনি ঘুরিয়াছে। কিন্তু অনেক গোরু দুগ্ধ না দিয়া, কেবল গাড়ি টানিয়াই বেস সুখে আছে—যথা সময়ে উত্তম আহার, উত্তম পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন কালেজের শিক্ষক কেবল বাগ বুঝিয়া এবং ‘ইয়েস সার’ করিয়াই তিন চারি শত টাকা বেতন ভোগ করিতেছেন; বার সের দুগ্ধ দিয়াও অনেক ভাল গোরুর পোড়া কপালে এ সুখ হয় না।

“আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আমার শৃগাল বলিয়া বোধ হয়। পশুর মধ্যে শৃগাল অতি ধূর্ত্ত—ধূর্ত্ততার বলেই করিয়া খায়; পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সমস্ত ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া খাইতেছেন—ইহাদিগকে আজি পর্য্যন্ত কেহ ঠকাইতে পারিল না। শৃগাল দিবসে সূর্য্যালোকে প্রায় দেখা দেয় না, রাত্রে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শব্দ করে এবং সুযোগ পাইলে অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। যে খানে জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার অনেক দূর হইয়াছে, সে খানে ব্রাহ্মণেরা বড় আধিপত্য করিতে পারেন না; অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকটে বক্তৃতাদি করিয়া কৌশলে অর্থাপহরণ করেন। শ্মশানে অনেক শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার প্রেম প্রতিমা মানবলীলা সম্বরণ করিয়া তোমার গৃহ শ্মশান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তথায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাতায়াত করিতেছেন। একটী মৃত দেহ পড়িলে, রাজ্যের শৃগাল তাহার চারি পার্শ্বে সমবেত হয়, পরস্পর কলহ করে এবং পরমানন্দে মৃতদেহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদরসাৎ করে। মানুষশৃগালেরাও মৃত্যুর গন্ধ পাইলে, দলে দলে আসিয়া শ্রাদ্ধবাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন; পরস্পর কলহ, বিবাদ, হাতাহাতিও বাদ যায় না। অবশেষে উত্তমরূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নগদ লইয়া প্রস্থান করেন। শিবার পূজার নিয়ম পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ছিল এবং এক্ষণেও আছে, কিন্তু বোধ হয় আর অধিক দিন থাকিবে, না। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ছিলেন এবং এক্ষণেও কিয়ৎ

পরিমাণে আছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বলে এ প্রভুত্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে—আর অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। লোকে বলে, শৃগাল বামে করিতে পারিলে বড় প্রতুল হয়; ইহাঁদিগের বামে করিলে কি হয়, তাহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না—বুদ্ধিমান পাঠক, আপন আপন সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন।

আমাদের দেশের বড় লোকদিগকে আমার ভেড়া বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমি যে কয়খানি কাগচ লইয়া লিখিতে বসিয়া ছিলাম. তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে সুতরাং এ সাদৃশ্যটী সাজাইতে পারিলাম না। পাঠক, তুমি যে অতি বুদ্ধিমান, তাহা আমি জানি। তোমার নিজের বিবেচনায়, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান পৃথিবীতে আর কেহই নাই তোমার নিজের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার এই এক সুযোগ; কই সাদৃশ্যটী সাজাও দেখি? যদি না পার, তবে আর আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া গৃহিণীর কাছে আস্ফালন করিও না।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে কেহ রাগ করিবেন না। রাগ করিলে যাহার ক্ষতি হইবে না, তাহার উপর রাগ করিতে হয় না;—রাগের উপযুক্ত পাত্র কেবল গৃহিণী। আমি যে সাদৃশ্য গুলি দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে আপনিও থাকিতে ভুলি নাই, ইতি।

শ্রী চ শে, মু।

প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম।

প্রথমতঃ কোমটী এক মাত্র দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাতেই নিযুক্ত ছিলেন। এবং কালে যে সেই দর্শন হইতে এক অভিনব ধর্ম্মবাদ কল্পনা করিবেন,এ কথা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। বস্তুতঃ এক বিষয়ে অত্যাসক্তি জন্মিলে মনোমধ্যে কখনই অন্য চিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু ভাব সংসর্গ গুণের বল এত প্রবল যে হঠাৎ একটা ঘটনা বা কারণ সন্দর্শন করিয়া চিরজীবনের অভ্যস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি জন্মে। চির বিশ্বাসপাত্র বা চিরকালের বন্ধুর উপর একবারে অশ্রদ্ধা হয়। বিশেষ পূর্ব্বাবলম্বিত সংস্কার যদি ভ্রমাত্মক হয়, সত্য পথ অবলম্বনের আন্তরিক ইচ্ছা হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, সর্ব্বদাই দেখা যায়। ঘোর পাপাসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির ঈশ্বরনিষ্ঠ হওয়ার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মার্টিন লুথার পিটার প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ, ওমার আবু বেকার প্রভৃতি ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বীরপুরুষগণ এবং রূপ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে প্রথম যৌবনে কেহই সাধু ছিলেন না, কিন্তু দৈবাৎ সামান্য ঘটনাতে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে তাঁহাদিগের জীবনে এত পরিবর্ত্ত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মব্রতই প্রাণ ধারনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ দর্শনকর্ত্তা কোমটীর সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ হইয়াছিল।

পরিণত বয়সে কোমটী ক্লটিল্‌ডা নাম্নী

জনৈক বিধবার প্রতি আন্তরিক আসক্ত হইয়াছিলেন। বিধবা সকলেরই দয়ার পাত্রী। বিশেষ কোমটী পরোপকার ও নারী পূজাই জীবনের সার কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এ অবস্থাতে যে পরম গুণবতী রমণী ক্লটিল্‌ডার সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীলোকের সহিত মনোমিলন হইলে চুম্বক প্রস্তর ও লৌহের ন্যায় শরীর স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কোমটীর জীবনচরিত লেখকেরা বলেন, যে তিনি এক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এই রূপ প্রকৃতি বিপর্য্যয় করিয়াছিলেন, যে ক্লটিল্‌ডার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ে বৎসরেক একত্র বাস করিয়াও দেহ কলুষিত করেন নাই। আমরা এ কথাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না। হইতে পারে যে, কোমটী অনন্য-মনা হইয়া কামোত্তেজিত হন নাই, কিন্তু যুবতী বিধবা কি রূপে অগ্নিকুণ্ড সন্নিধানে থাকিয়া বিগলিত হন নাই?

গুণবতী ক্লটিল্‌ডা সহবাসে এক বৎসর কাল বাস করাতে কোমটীর অন্তর স্নেহে ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং রমণীই শিক্ষক, এ বিষয় আরো দৃঢ় হইল।

অনন্তর ক্ল[illegible]ল্‌ডার মৃত্যু হইলে কোমটীর মনে স্বভাবতঃই সংসারের অকিঞ্চিৎকারিতা ও পরলোকের চিন্তা উপস্থিত হইল। সংসারের পরম সুখ স্নেহাস্পদ দম্পতীর মধ্যে একজন অথবা বৃদ্ধকালের যষ্টির স্বরূপ এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে যে লোকের ইহলোকে বিরাগ ও ঈশ্বরের ভাব অন্তরে প্রজ্বলিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমারা সর্ব্বদাই চাক্ষুষ করিয়া থাকি। সুতরাং ক্লটিল্‌ডার মৃত্যু[illegible] যে কোমটীর দর্শন শাস্ত্র ধর্ম্মে পরিণত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু এ রূপ স্থলে বা আসন্ন কালে লোকে ন্যায়বান্ ঈশ্বরের ভয়ে কুণ্ঠিত হয়। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের গৌরবে চির জীবন আপনাদিগকে **নাস্তিক** নামে অভিহিত করেন, এবং ঈশ্বর ও ধৰ্ম্মবাদীর কথা শুনিলেই উপহাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই আসন্ন কালে পরলোকের ভয়ে কুণ্ঠিত হন। ফরাসী দেশীয় নাস্তিকাগ্রগণ্য বল্‌টেয়র প্রাণ সংশয় পীড়িত হইলেই ধৰ্ম্ম যাজকদিগের শরণাপন্ন হইতেন। কিন্তু সুস্থ শরীর হইলে পরক্ষণে যুক্তি দ্বারা **নিরীশ্বরতা** প্রতিপাদন করিতেন। আর কোমটী কেন ধর্ম্মের আবশ্যকতার কথা স্বীকার করিয়া নিরীশ্বর মত প্রচার করিলেন। আমাদিগের বিবেচনাতে নিম্নলিখিত ত্রিতয়ই ইহার কারণ।

১। পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন ভাব আলোচনা করা এবং কালে তাহা অভ্যাস ও ভাব সংসর্গ গুণে হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কের বিকার উৎপাদন।

২। প্রত্যক্ষ পদার্থ প্রতি আসক্তি ও প্রেমাতিশয্য।

৩। ইতিহাস পর্য্যালোচনায় বিভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য সন্দর্শন।

সত্য সত্যই সার উইলিয়ম হামিল্টন বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অধিক পরিমাণে জড়তত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে, লোকের মন বাহ্য বিষয়ে এত আসক্ত হয় যে, অন্তরে দৃষ্টি বা রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না। কোমটী জড়তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান উভয়কেই সমভাবে উপেক্ষা

করিয়া, কেবল অন্তরের কোমল ভাবের অনুসরণ করিয়াছেন। এবং কালে পরম প্রণয় পাত্রী ক্লটিল্‌ডার মৃত্যু হইলে, আরও অধিক পরিমাণে বিগলিত হইয়া তাঁহার সমুদয় মনকে একবারে গ্রাস করিয়াছিল। এই জন্যই ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন হইয়া কোমটী এক মাত্র মানব সমাজের উপকার সাধন পরম পুরুষার্থ মনে করিয়াছিলেন। ইহার নামই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে?—ধর্ম্ম কাহাকে কহে?

নীতিতত্ত্ববিৎদিগের মতে **ঈশ্বরের প্রতি পিতৃভাব** এবং **মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃভাব,** অথবা **ঈশ্বরের সহিত ও মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধকেই** ধর্ম্ম কহে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ধর্ম্ম। ইহাঁরা আরও বলেন যে, ঈশ্বরকে প্রীতি করাই মুখ্য কার্য্য, তাঁহার প্রিয় কার্য্যও কেবল তাঁহার প্রীতি সাধন উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরকে (ইহাঁদিগের প্রীতি ভাজন ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ এবং সুখ দুঃখাতীত) প্রীতি করিলে তাঁহার কোনই লভ্য হয় না। এ স্থলে ধর্ম্ম শাস্ত্র লেখকেরা বলেন, সত্য বটে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের কোন লভ্য হয় না, কিন্তু তদ্দ্বারা সাধকের আত্মার ঔৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং এ কথা বলা অন্যায় নহে যে আত্মার ঔৎকর্ষ সাধনই যদি পরিণামে এক মাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল মানব সমাজকে প্রীতি করিয়া যদি সেই ঔৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহাও ধর্ম্ম। কোমটী বলেন, আত্মার ঔৎকর্ষ সাধনের এক মাত্র উদ্দেশ্য মানব সমাজের উপকার সাধন। সুতরাং মানব সমাজকে প্রীতি করা ও তাহারই প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ধর্ম্ম। ইহার উত্তর স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, কোমটীর মতানুযায়িক মানব সমাজকে প্রীতি করা ও তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং **প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবাদ ধর্ম্ম** নামে অভিহিত হইতে পারে না।

ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন। তিনি নিত্য, অনন্ত জ্ঞানশালী, স্বতন্ত্র, চর্ম্মচক্ষুর অগোচর এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ, অপ্রতিম, আনন্দময়, মঙ্গল নিদান, ভক্তবৎসল, পতিতপাবন ও স্বয়ং সুখ দুঃখাতীত, এই কল্পনা করিয়া সাধক তাঁহার প্রেমে বিগলিত হয়। নিদাঘ কালীন সন্ধ্যা সমীরণ সমীরিত হইয়া যখন উত্তপ্ত দেহকে শীতল করে, সাধক পুষ্পোদ্যানে নানা জাতি কুসুমের পরিমলে আনন্দিত হইয়া তাহার কারণের প্রতি কৃতজ্ঞ হন। শরৎকালীন শস্য ক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া পরিপক্ক শস্যের মনোহর বেশ সন্দর্শন করিয়া সাধক ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হন। এই কল্পনার বিষয় সত্ত্বেও পৃথিবীতে কয়টী লোক ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত হইয়া থাকে? এতদবস্থাতে চর্ম্ম চক্ষু গোচর অপূর্ণতা ও দোষ পরিপূর্ণ মনুষ্য কি রূপে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে? পণ্ডিতবর কার্লাইল বলেন, "আমরা বাল্যকালে অনেক লোককে ভক্তি করি, কিন্তু কালে বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদিগের ভক্তিভাজন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয়। যতই বুদ্ধি ও দৃষ্টি পরিমার্জ্জিত হয়, ততই লোকের দোষ দেখিতে পাই। এই রূপে বাল্যকালে যাহাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস হইত, এক্ষণে তাহাকে আপনার

ন্যায় এক জন পিশাচ বলিয়া অনুভূত হয়।” যদিও কোমটীর উপদেশানুসারে মনুষ্যকে প্রীতি ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং নানা রূপে মনকে প্রবোধ দিয়া ভক্তি করিলাম। কিন্তু যখন তাহার দোষ দেখিয়া মন নিরাশ হইবে, তখন আবার কি রূপে তাহাকে উপাস্য দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিব? সত্য বটে, পরিবারস্থ দুই এক জনের সামান্য দোষ থাকিলে তাহা স্নেহের চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু অপর সামান্য কারণেই এরূপ বিরাগ জন্মে, সেই ব্যক্তির মুখ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং কোমটীর মতানুযায়ী প্রথমত পরিবারবর্গ, পরে গ্রামবাসী, তাহার পর দেশবাসী, এই রূপে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে সমুদায় মানব সমাজ আমাদিগের প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিবে—এবাক্য কল্পনা সম্ভূতমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হয়ত মনুষ্যের অপূর্ণতা দেখিলে স্বভাবতঃ অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে, এই জন্য কোমটী প্রথমতঃ স্নেহ ভাণ্ডার স্ত্রীপুত্র কন্যার উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতেও যে এই রূপ দোষ আরোপিত হইতে পারে, তিনি একথা কি একবারে আলোচনা করেন নাই—আমরা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি মহাপুরুষদিগের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোমটী বলেন, সার্লিমেন বা এই রূপ অন্য কোন মহাপুরুষের জন্ম বা মৃত্যু তিথি উপলক্ষে সকল মনুষ্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জীবদ্দশার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার উপাসনা কর। কি আশ্চর্য্য! কয় জন মহাপুরুষ এই রূপ উপাসনার যোগ্য এবং বৎসরের মধ্যে কত দিন উপাসনা করিতে হইবে, কোমটী তাহা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি বিষম ভ্রম! কোমটী কি সত্য সত্যই আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে ভাবিতেন? তাঁহার বুদ্ধির অগোচর কি আর মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই? প্রচলিত ইতিহাস ব্যতীত আর কোমটী ধ্যানে সমুদয় অবগত হইতে পারেন নাই। ইতিহাসে হয়ত কোন পিশাচ দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আর কোন প্রকৃত দেবতার নামোল্লেখও নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কি মানব-সুলভ অপবিত্রতা ছিল না? আমি কোমটীকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, “গাঞের ফকির ভিক পায় না” “A prophet is not honored in his own country and among his own kith and kin” এই জনপ্রবাদটী কি তিনি কখন শ্রবণ করেন নাই? মহাপুরুষ মাত্রেই মৃত্যুর পর বিশেষ সম্মানিত হয়—এবাক্যের কারণ কি? আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এই মাত্র বোধ হয় যে, তিনি যে পর্য্যন্ত জীবদ্দশায় থাকেন, তাঁহার অপবিত্রতা সাধারণ্যে প্রকাশিত থাকে; কিন্তু মৃত্যুর পর লোকে তাহা বিস্মৃত হয় এবং জীবনচরিত লেখকদিগের বর্ণনাতে মৃত মহাপুরুষের গুণাবলী বর্ণিত দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া পঞ্চ মুখে তাঁহার প্রশংসা করে, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমান বহু বিদ্যাবিশারদ লোক কখন তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন না।

উপযুক্ত কারণ ও দৃষ্টান্ত পরম্পরায় একথা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে, মানব

সমাজ যেন আমাদিগের ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারে না। এবং যদিও বালকের ন্যায় কোন বিশেষ মনুষ্য বা মনুষ্য সমষ্টিকে শ্রদ্ধা করি, পরিণত বয়সে তাহা নৈরাশ্যের কারণ হয় এবং জনসনের আবিসীনিয়ার যুবরাজ রাসালাসের ন্যায় পদে পদে ঠকিতে হয়। এই জন্যই সাধারণ কথায় লোকে বলিয়া থাকে, কাহাকে দেবতা জ্ঞান করিও না। এবং এজন্য সুপ্রসিদ্ধ কবি টমসন বলিয়াছেন, "Ah! nothing is pure, virtue has still some tincture of vice" পৃথিবীতে কিছুই একবারে পবিত্র নহে।

দ্বিতীয়তঃ—অন্যান্য উদ্দেশ্যে মনুষ্যের হিত সাধন অতি অল্পই সম্ভবপর। কোমটী যাহাই কেন বলুন না, স্বার্থই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। সত্য বটে, সময়ে সময়ে ভাব বিশেষের প্রাধান্য অনুভূত হয়, এবং লোকে তাহার দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া স্বার্থ বিরুদ্ধে কার্য্য করে। কিন্তু এরূপ কার্য্য অকিঞ্চিৎকর। যতক্ষণ তাহার উদ্দীপক ভাবের প্রাধান্য অনুভূত হয়, ততক্ষণ লোকে স্বার্থশূন্য ও ইতি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ শাম্য হইলে অনুতাপ উপস্থিত হয়, এবং কি রূপে প্রতিকার সাধন হইতে পারে, তাহারই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল হয়। স্বার্থশূন্য হইয়া লোকের দুঃখে বিগলিত হইয়া উপকার সাধনের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। হয়ত সুকুমারমতি বালক বা কোমল হৃদয়া রমণী এরূপে কাহারও কখন কোন উপকার করিতে পারেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কএক দিন এইরূপ দয়ার পাত্র দেখিলে স্বভাবতঃ দয়ার ভাব হৃদয়ে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। এটী আমাদিগের নৈসর্গিক নিয়ম যে প্রথমাবস্থাতে যেরূপ ভাব * উদ্রিক্ত হয়, চিরদিন তাহা সমান থাকে না। এবং ক্রমশঃ তাহার তেজের খর্ব্বতা হয়। হয়ত কালে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন দুঃখানুভব হয় না, অথবা অতি অল্প পরিমাণ হয়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সাধন হইতে পারে না। সুতরাং এক মাত্র দয়ার ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পরের উপকার সাধন কখন চিরজীবন সম্ভবপর নহে, এবং তাহাতে সমাজের কার্য্য চলে না। হয়ত এমন এক জন লোক থাকিতে পারে, যাঁহার হৃদয় এতই কোমল যে পরের দুঃখ দেখিলেই বিগলিত হয়, সুতরাং তিনি এক মাত্র দয়ার দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া লোকের উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে মূল কথার কিছুই প্রমাণ হইল না।

পক্ষান্তরে এক বার সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে যে, যে সকল মহাত্মা পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ বা যশোলিপ্সু, কেহ-বা পরলোকে সুকৃতির জন্য সমিচ্ছুক। কোমটীর মতানুযায়ী উদাসীন ভাবে পরোপকার আদৌ আছে কি না, সন্দেহ।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টর † সমালোচনের এক জন কৃতবিদ্য লেখক আক্ষেপ করিয়া বলেন, ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম্মের নাম শুনিলে হয়ত অস্মদ্দেশের অধিকাংশ লোকেই কর্ণে হস্ত দিবেন, অবশিষ্ট লোকে ধর্ম্মের

* Feeling.

† Westminister Review. New series. No. IV. January and April 1865.

নাম শুনিলেই উপহাস করেন। বস্তুতঃ এমন একটী লোকও নাই, যে ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করে, অথচ ঈশ্বর মানে না। এই লেখকের মতে কতগুলিন নির্দ্দিষ্ট বিশ্বাস থাকিলেই ধর্ম্ম হইল এবং সেই বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিলেই ধার্ম্মিক হইল। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, সেই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম সাধন হয়।

"বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু" এই বাক্য আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু অভ্যন্তরে ঈশ্বর না থাকিলে কখনই আমাদিগকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এক পথে রাখিতে পারে না, একথা যে কি রূপে সম্ভবপর, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রভাবে দার্শনিকগণ যাহাই কেন বলুন না, আমরা একথা কখনই স্বীকার করিতে পারি না যে পরলোকে সদ্গতির স্বার্থ না থাকিলে লোকে ঐহিকের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুসরণ করে। সুতরাং কোমটীর কল্পিত নিরীশ্বর **প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম** ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণ্য নহে।

বালকদিগের আহার-ব্যবস্থা।

এক্ষণে সভ্যসমাজের মধ্যে প্রায় এই এক বিশ্বাস প্রবল হইতে দেখা যাইতেছে, যে বালকদিগের বরং অতি অল্প খাওয়া এবং তদনুযায়ী নিয়ম করা যুক্তিসিদ্ধ, তথাপি তাহাদিগকে কদাচ অল্প অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু এইটী বিষম ভ্রম। আমরা অনেক প্রাচীন লোকের মুখে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লোকের বিশেষ রূপ আহারের গল্প শুনিতে পাই, এবং অনেক অধুনাতন লোককেও বড় অল্প খাইতে দেখি না, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, যে নিয়মানুসারে আপনারা চলিতে পারেন না ও চলেন না, সেই নিয়মের একান্ত অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার পুত্রগণকে চালাইবার নিমিত্ত অনেকেই ব্যগ্র। সত্য বটে, অতিশয় অধিক আহার ভাল নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে নিরতিশয় কম খাওয়া, তাহাও ভাল নহে। বরং এতদুভয়ের মধ্যে কম খাওয়া অধিকতর অপকার জনক। কোন এক জন সুচতুর বিজ্ঞ লেখক * লিখিয়াছেন, 'বরং অধিক আহার করিয়া যে পীড়া হয়, সে ভাল ও সহজে আরাম হইতে পারে, কিন্তু অনাহারে (অতিশয় অল্পাহারে) যে পীড়া জন্মে, তাহার চিকিৎসা নাই।' বিশেষতঃ ইহা সকলেরই জানা ও স্মরণ রাখা আবশ্যক, যে বিশেষ পীড়া পীড়ি অথবা অন্যায় অনুরোধ না করিলে, কেহ কখন আপনা হইতে অপরিমিত ভোজন করে না। উপরে যে লেখকের কথা বলা গেল, তিনিই আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'যে যুবা এবং শিশুদের অপেক্ষা, বরং বয়স্থ লোকেরাই অপরিমিত ভোজন দোষে অধিক দূষিত হয়; কেননা বালকেরা

* Cyclopædia of practical Medicine.

তাহাদের প্রতিপালন কর্ত্তার দোষ বা অনবধানতা ব্যতীত কখন অতি ভোজন করে না।' অতএব যে পিতা মাতা বা শিশুপালনকর্ত্তা শিশুদিগকে অতি অল্প পরিমাণে খাইতে দেয় ও তাদৃশ ব্যবস্থা করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং বালকদিগের শরীর নাশক বলিতে হইবে।

এস্থলে অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন,—'তবে কি ছেলেদিগকে অপরিমিত ভোজন করিতে দেওয়া যাইবে? তাহারা যতই ইচ্ছা, ততই মিষ্ট সামগ্রী খাইয়া পীড়িত হইবে? কেননা তাহাদিগকে বারণ না করিয়া, খাইতে দিলেই ত অপরিমিত খাইয়া ফেলিবে?'—এই প্রশ্নের আমরা এই উত্তর দিই। যদি ইতর প্রাণীদের পক্ষে ক্ষুধা প্রধান খাদ্য পরিমাপিকা হয়, যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের পক্ষে ইহা তদ্রূপ হয়, যদি পীড়িত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ইহা সেই কার্য্য করে, বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত নানা জাতীয় মনুষ্যের পক্ষে যদি ইহা সেই রূপ হয়, প্রত্যেক সুস্থ শরীর প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষেও যদি ইহা তাদৃশ পরিমাপিকা হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে, যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের পক্ষেও সেই ক্ষুধা তদ্রূপ উপদেষ্ট্রী এবং আহার নিয়ন্ত্রী হইবে। যদি এ স্থলে তাহা না হয়, তবে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব নিশ্চয় জানিও যে বালকদিগকে খাইতে দিলে, তাহারা কখনই তাহাদের ক্ষুধার ওজনের অতিরিক্ত ভোজন করিবে না।

এই উত্তরে বোধ হয়, অনেকে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবেন। কেননা তাঁহারা বলিবেন যে, অনেক স্থলে বালকদিগকে অপরিমিত আহার করিয়া পীড়িত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সে স্থলে তাঁহাদের এই স্মরণ করা উচিত, যে তাঁহারাই যে সকল উদাহরণ দেন, তাহাতেই আমাদের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। তাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, যে তাঁহাদের প্রদত্ত উদাহরণের অধিকাংশ ব্যক্তি চিরদিন অল্পাহার করিয়া থাকিত, পরে কোন সময়ে অধিক সুখাদ্য খাইবার সুযোগ পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারায় অতি ভোজন করাতে পীড়িত হইয়াছে। না খাইয়া তাহাদের পেট মরিয়াছিল, সুতরাং এক দিন অধিক খাওয়াতে অসুস্থ হইয়াছে। এ রূপ অবস্থাতে লোক অধিক খাইয়া পীড়িত হয়। এ রূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই—সকল বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, যে পিতামাতা তাঁহাদের পুত্রকে অতি শিশুকাল হইতে কঠোর ভাবে লালন পালন করেন, এমন কি, বালককে একটী পয়সাও বাজে খরচ করিতে দেন না—সেই বালক যখন পিতা মাতার অবর্ত্তমানে অথবা অন্য কোন কারণে অধিক ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়, তখন সে নিশ্চয়ই অপব্যয়ী হইয়া পড়ে ও বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে। তাহাতে বালকের কিছু মাত্র দোষ নাই—পিতা মাতারই সে দোষ। অধিক দিন কোন বাসনা অপরিপূরিত থাকিলে, যখন সেই বাসনা পরিপূরণের প্রথম সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন লোকে প্রায়ই অতিচারী হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার নৈসর্গিক নিয়ম বলা যাইতে পারে। অতএব বালকেরা সচরাচর কি আহার করিতে ভাল বাসে, এবং তজ্জন্য তাহাদের প্রতিপালনকর্ত্তারাই বা তাহা-

দের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বালকেরা প্রায় সকলেই ও সকল দেশেই মিষ্ট দ্রব্য খাইতে বড় ভাল বাসে। কিন্তু তা বলিয়া কয় জন লোকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকে? বোধ করি, শতকরা এক জন ভিন্ন আর সকলেই বলিবে, যে ইহা কেবল রসনা তৃপ্তির জন্য; এবং তাহাতে পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ইন্দ্রিয় সুখের ন্যায়, বালকদিগের মিষ্ট প্রিয়তাকে দমন করা উচিত। অনেকে হয়ত বলিয়া বসিবেন, যে বালকেরা অধিক মিষ্ট খাইলে তোতলা হয়। সুতরাং তাহা খাওয়া উচিত নহে। কি অজ্ঞতা! তাঁহারা একবার ভাবেন না, যে বালকের মিষ্ট প্রিয়তার কারণ কি? কিন্তু দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ রূপ ভাবেন না। তাঁহারা এই মিষ্ট প্রিয়তার অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে বলিয়া সন্দেহ করেন—এবং তত্ত্বদ্বারা সেই গূঢ় কারণ নির্ণয় করিয়া সন্দেহাপনয়ন করেন। তিনিই দেখিতে পান, যে জীবনী শক্তির প্রক্রিয়াতে শর্করার অতিশয় আবশ্যক। যে সকল পদার্থে শর্করা ও বসা থাকে, তাহা আহার করিলে, পরিশেষে অম্লজলাকারে পরিণত হয়; এবং তজ্জন্য শরীরে এক প্রকার তাপের উদ্রেক হয়। সেই তাপ শরীর রক্ষার্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যে কিছু খাদ্য খাই না কেন, তাহা শরীর মধ্যে তাপজনক হইবার পূর্ব্বে শর্করাকারে পরিণত হয়। এই ক্রিয়া শরীর মধ্যেই হইয়া থাকে। পরিপাক ক্রিয়ার সময় শুদ্ধ যে দ্রব্যের সারাংশ (Starch) শর্করা রূপে পরিণত হয়, এমত নহে; একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন, যে আমরা যে কিছু দ্রব্য ভোজন করি, যকৃৎ ক্রিয়াদ্বারা তৎসমস্তই অল্প বা অধিক পরিমাণে শর্করা রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এমন কি, শরীরের পুষ্টি সাধনে চিনির এত প্রয়োজন, যে আমরা অন্য কোন দ্রব্য না খাইয়া যদি যবক্ষারযুক্ত দ্রব্যও অধিক আহার করি, তবে তাহা হইতেও চিনি প্রস্তুত হইবে। অতএব যখন দেখিতে পাই, যে বালকেরা একান্ত শর্করাযুক্ত পদার্থপ্রিয়, অথচ তদপেক্ষা অধিক উষ্ণতা সাধক বসাযুক্ত পদার্থ ভোজনে তাহারা একান্ত অপ্রিয়, তখন ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে, যে তাহাদের শরীরে একটীর অভাব অপরটীর দ্বারা পরিপূরিত হয়,—তাহাদের শরীর পুষ্টি সাধনে অধিক শর্করা আবশ্যক করে, কেননা তাহাদের পাকস্থলীতে বসা সহে না।

আরও দেখ, বালকেরা ঈষদম্লাস্বাদ উদ্ভিজ্জ ভাল ভাসে। সকল প্রকার পক্কফল আহারে তাহারা বড় সন্তুষ্ট। এমন কি, যদি ভাল ফল না পায়, তবে তাহারা বইচি ও কুল পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। কেন?—শুদ্ধ যে খনিজাম্লের ন্যায় উদ্ভিজ্জাম্ল অত্যন্ত পুষ্টিকর, এমত নহে; তদ্ব্যতীত পরিমিত রূপে আহার করিলে, উদ্ভিজ্জাম্লে আরও অনেক উপকার হয়। প্রসিদ্ধ ডাক্তর এন্‌ড্রু কোম্ব বলেন, যদি উদরের ক্রিয়া পরিষ্কার না হয়, তবে পক্ক ফল সেবনে অনেক উপকার দর্শে। অতএব দেখ, বালকদিগের স্বাভাবিক স্পৃহা ও তাহাদিগকে সচরাচর প্রদত্ত খাদ্যের কত প্রভেদ। বালকগণ স্বং শরীর পুষ্টি সাধনে যে দুই দ্রব্যের প্রধান আবশ্যক, তাহাই খাইতে ইচ্ছা করে, অথচ

তাহাদের লালন পালন কর্ত্তারা তাহা না বুঝিয়া, এমন কি, অনেক স্থলে না মানিয়া, সেই সকল দ্রব্যেরই আহার বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া থাকেন। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সকালে বিকালে কেবল দুগ্ধ অথবা অল্প মাখন প্রভৃতি 'লঘু আহার' দিয়া থাকেন। কাজেই যখন বালক একটু বড় হইলে, হাতে কিছু পয়সা পায়, অথবা কোন ভাল সামগ্রী যথেষ্ট লইবার সুযোগ পায়, তখন সে অবশ্যই অপরিমিত আহার করে ও পীড়িত হয়। কেননা সে ভাবে, যে আজি যাহা পাই, খাইয়া লই, কালি আবার নিশ্চয় উপবাস করিতে হইবে। এইরূপে ও এই সকল কারণে অপরিমিত ভোজন করিয়া, যখন বালকেরা পীড়িত হয়, তখনই অনেকে কহিয়া থাকেন যে, শিশুদিগকে যথেচ্ছা খাইতে দেওয়া উচিত নহে; দিলেই তাহার এই রূপ ফল হয়। কি বিষম ভ্রম! তুমি তাহাকে খাইতে দাও নাই বলিয়া, সে সুযোগ পাইয়া অধিক খাইয়াছে, তাহা বলিয়াই কি তাহাকে আরও খাইতে দিবে না? এই মত যে কতদূর ভ্রান্ত, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে। সেই জন্যই আবার বলি, যে যদি বরাবর বালকদিগের স্পৃহনীয় পদার্থ তাহাদিগকে ন্যায্যমত খাইতে দাও, তবে কখনই তাহারা অপরিমিত ভোজন দোষে দূষিত হইবে না। তাহাদের শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক এই সকল দ্রব্য যদি তাহাদিগকে যথাযোগ্য প্রতি দিন আহার করিতে দাও,—যদি তাহাদিগকে কোম্বের মতানুসারে প্রতিদিন আহারের সময় (অন্য সময় নহে) পক্ক ফল খাইতে দাও, তবে তাহারা সুযোগ পাইলেও কখন অপরিমিত ভোজন করিবে না—কখন কাঁচা কুল বা বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিবে না।

বালকদিগের এই প্রকার প্রাকৃতিক স্পৃহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে উদর পূরিয়া (অপরিমিত নয়) খাইতে দেওয়া যে ন্যায্য ও উপকারী, তাহার আর সন্দেহ নাই; বরং না দেওয়াই বিশেষ অপকারী ও অন্যায়। কেননা আমরা স্বভাবের উপর নির্ভর না করিয়া অনুমানের অধিক অনুসারী হইলে, অনেক স্থলেই ভ্রান্ত হইয়া পড়িব। অতএব যে পিতামাতা স্বীয় সন্তানদিগকে চিরকাল অল্পাহারী করিয়া রাখেন, তাঁহারা বিষম ভ্রান্ত বলিতে হইবে। তাঁহারা যে দেহতত্ত্ব শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হয়। এ কারণ শিশুদিগের খাদ্যের বিষয়ে স্বভাবের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

কি পরিমাণে বালকদিগের আহার করা কর্ত্তব্য, তাহার কথা বলা গেল। এক্ষণে খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুনের কথা বলা যাইতেছে। এ বিষয়েও যে ঐরূপ ভ্রম লোকের মনে আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক পিতামাতা যে স্বীয় সন্তানদিগকে অল্প পরিমাণে আহার দিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, এমত নহে; অনেকে আবার নিতান্ত লঘু আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ লোকের মনে এই বিশ্বাস আছে যে, বালকদিগের অতি অল্প পরিমাণে আমিষ দ্রব্য ভোজন করাই ভাল। অনেকেই ভাবেন যে, ছোট২ ছেলেরা কেবল মৌরলা ও তাদৃশ ছোট২ মাছের ঝোল খাইবে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মাংসাদি তাহাদের খাওয়া উচিত নহে। সামান্য লোক

দিগের মধ্যে মিতব্যয়ীতাই (অর্থাভাব ?) এই মত জন্মাইয়া দিয়াছে বলিলে বড় অন্যায় হয় না। কেননা ছেলেদের পর্য্যন্ত মাংস খাওয়াইতে হইলে অনেক ব্যয় হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ধর্ম্মও (আজিও যে তাহা অনেক স্থলে প্রবল আছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন) মাংসাহার প্রচলনের পক্ষে এক প্রধান প্রতিবন্ধক, কিন্তু তাহা এক্ষণে সামান্য বলা যাইতে পারে, কেননা তাহা বোধ হয়, আর অধিক দিন প্রতিবন্ধকতা করিবে না। যাহা হউক, আমরা মিতব্যয়ীতাই প্রধানতম বলিয়া বিবেচনা করি। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকেরা আপনারা মধ্যে২ মাংস খাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; কিন্তু ছেলেরা খাইতে স্পৃহা প্রকাশ করিলে, তাহাদের খাওয়া উচিত নহে বলিয়া নিষেধ করিয়া থাকেন। অনেকে আবার আর এক পন্থা বাহির করিয়াছেন। অনেক হিন্দু বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তাঁহারা বলেন, "যে পেটে মাংস ধারণ করে, তাহার মাংস ভোজন নিসিদ্ধ,"—সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের মাংস আহার করা উচিত নহে। এই কথা যে সম্পূর্ণ অসত্য,—স্বভাবের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কি সম্পূর্ণ তাঁহাদেরই কার্য্যের বিপরীত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, স্ত্রীলোক যদি মৎস্য খাইতে পারে, তবে কি অন্য মাংসে বঞ্চিত থাকিবে? মৎস্য কি মাংস নয়? আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই নিয়ম স্বভাবের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবিক তাই—মাংশাশী ইতর প্রাণিদের বিষয় ভাবিয়া দেখ, তাহাদের স্ত্রীজাতি উদরে মাংসধারণ করে বলিয়া কি মাংসভক্ষণ করে না? আরও বলি, স্ত্রীলোকের মাংসাহার শাস্ত্র নিষিদ্ধও নহে—বরং আমাদের পুরাণ শাস্ত্রাদিতে স্ত্রীলোকের মদ্যমাংস পান ভোজনাদির কথা দেখা যায়। তবে এই মত এক্ষণে কেন প্রচলিত হইল? —আমরা তাহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি—১ম, মিতব্যয়ীতা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২য়টী অতিশয় লজ্জাজনক—স্বার্থপরতা, পুরুষের অন্যা২ স্বার্থপরতা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যেমন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতারত্ন হরণ করিয়া লইয়াছেন, এবিষয়েও সেই রূপ। কেননা বাটীতে যদি অল্প মাংস পাক হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা তাহার অংশ লইলে আর পুরুষদের কুলায় না। এই কারণেই তাহাদের মাংস ভোজন নিষেধ। ইহা ব্যতীত আর কোন কারণ লক্ষিত হয় না। ইহা অপেক্ষা আর কি লজ্জাকর হইতে পারে?

কিন্তু যদি এই মতের সত্যাসত্যতার বিষয় বিবেচনা করা যায়, তবে ইহা অসত্য বলিয়াই প্রতীত হইবে। হইতে পারে, যে যাহাদের পাকস্থলী প্রচুর পরিমাণে সতেজ হয় নাই, এরূপ অতি শিশুদিগের পক্ষে মাংস অনুপযুক্ত খাদ্য;—কেননা মাংস পরিপাক হইবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা সাধন করিতে তাহাদের পাকস্থলীর তত তেজঃ হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে সকল আমিষ হইতে গুরুপাক শিরা ও পেশী সমস্ত বাছিয়া বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, এরূপ কোমল মাংস খাওয়াতে কোন বাধা হইতে পারে, তাহা নহে। বিশেষতঃ যাহাদের বয়স তিন চারি বৎসর, এবং তজ্জন্য পাকস্থলীও অল্প সবল হইয়াছে,

সে সকল বালকের প্রতিও নিরামিষ ভোজন নিয়ম খাটে না। অনেক বড়২ চিকিৎসক ও দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মত এই রূপ;—তাঁহারা বলেন যে, বালকদিগের খাদ্য বয়স্কদিগের খাদ্যাপেক্ষা কখন অল্প পুষ্টিকর হওয়া উচিত নহে; বরং যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দেওয়াই উচিত।

এরূপ উপলব্ধির কারণও সহজেই নিশ্চয় ও নির্ণয় করা যাইতে পারে। বয়স্থ ব্যক্তির জীবনী প্রক্রিয়ার সহিত বালকের তৎ প্রক্রিয়ার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অপেক্ষা বালকের শরীর পোষক দ্রব্যের সমধিক প্রয়োজন। বয়োবৃদ্ধের খাদ্যের প্রয়োজন কি?—প্রতিদিন তাহার শরীর অল্প বা অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয়—শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির চালনায় ক্ষয় হয়, মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মস্তিষ্কের ক্ষয় হয়, শারীরিক পাকযন্ত্রাদির অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা আন্ত্রিক শিরা সমূহের ক্ষয় হয়। প্রতিদিন শারীরিক তাপও কিছুং করিয়া নির্গত হইয়া যায়। সেই তাপ সংরক্ষিত না হইলে শরীর পুষ্ট ও সতেজঃ থাকিতে পারে না।—অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিদিন এইরূপে যে পরিমাণে শরীর ক্ষয় ও দুর্ব্বল হয়, সেই পরিমাণে সেই ক্ষতিপূরণ ও দৌর্ব্বল্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত, এবং প্রতিদিন যে তাপ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়, তদুৎপাদনোপযুক্ত দ্রব্য যোগাইবার উদ্দেশেই লোকে আহার করিয়া থাকে। এক্ষণে বালকের বিষয় বিবেচনা কর। বয়স্থের ন্যায় বালকও শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা শিরা ক্ষয় করে; এমন কি, তাহার শরীর ও চাঞ্চল্যের বিষয় গণনা করিলে, বয়স্থের অপেক্ষা অনেক স্থলে তাহার শরীর অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয় বলিতে হইবে। বালকেরও শারীর তাপ নির্গত হইয়া যায় এবং বয়স্থের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাহার শরীরও অধিক পরিমাণে তাপহীন হয়, বলিতে হইবে; কেননা তাহার শরীর অধিক অনাবৃত থাকে। সুতরাং বয়স্থের অপেক্ষা বালকের অধিক পরিমাণে তাপজনক ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি বালককে বৃদ্ধের অপেক্ষা আর অন্য কিছু জীবনী প্রক্রিয়ার সাধন করিতে না হইত, তাহা হইলেও তাহার শরীরের পরিমাণানুসারে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা তাহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বালককে আর একটী কাজ করিতে হয়, যাহা বৃদ্ধকে করিতে হয় না। বৃদ্ধের শারীর ক্রিয়া দ্বারা যে ক্ষয় হয়, শুদ্ধ তাহা পরিপূরণ করিলেই চলে; কিন্তু বালকের শুদ্ধ সেই ক্ষতি পূরণে চলে না;—তাহাকে শরীরের পুষ্টি সাধন ব্যতীত স্বীয় শরীরের বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়; বালক পুষ্ট হইবে, আবার বাড়িবে, বৃদ্ধ কেবল পুষ্ট থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে বালক যাহা আহার করিবে, তদ্দ্বারা তাহার শিরা ক্ষয় ও তাপ ক্ষয়, এ দুয়ের পরিপূরণ হইয়া, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার শরীর বর্দ্ধিত হইবে। সেই অবশিষ্ট পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ ও গুণ যতটুকু হইবে, বালকের শরীরও তদনুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে শরীর বৃদ্ধি সাধনের আবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যেখানে সেই

নির্দ্দিষ্ট আবশ্যক পরিমাণের যত অভাব হইবে, সেখানে শিশু শরীরও তৎপরিমাণে হীনভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবে,—অর্থাৎ পুষ্টিকর অবশেষ অংশ যত কম হইবে, বালকের শরীরও তত ক্ষীণ ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। অতএব বৃদ্ধের অপেক্ষা বালকের যে শরীর পোষক দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব।

যখন বালকের শরীর পুষ্টিকর দ্রব্য কিছু বেশী খাওয়া আবশ্যক নিশ্চয় হইল, তখন এই প্রশ্ন হইতে পারে, যে এই জন্য বালকদিগকে অধিক পরিমাণে অল্পসার পদার্থ খাইতে দেওয়া যাইবে, কিম্বা তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে সমধিক সারবান্ পদার্থ দেওয়া বিধি। সকল দ্রব্যের পুষ্টিকারিতা সমান নহে, এক সের মাংসের যতটুকু পোষণ শক্তি, সেই পরিমাণের রুটির তদপেক্ষা কম; এবং সেই পরিমাণের গোল আলুর অথবা শাকের আরও অনেক কম। সুতরাং পোষণ ক্রিয়ার জন্য যদি এমন কোন দ্রব্য আহার করা যায়, যাহার পুষ্টিকারিতা কম, তবে অবশ্যই সেই দ্রব্য অধিক মাত্রায় খাইতে হইবে। অতএব বালকদিগকে কি খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য? যে দ্রব্যের পুষ্টিকারিতা অধিক, তাহাই অল্প পরিমাণে ভোজন করিতে দেওয়া যাইবে, কিম্বা যাহার পুষ্টিকারিতা কম, তাহাই অধিক মাত্রায় খাইতে দেওয়া যাইবে;—অর্থাৎ (বিবেচনা কর) অল্প মাত্রায় মাংস দেওয়া যাইবে, কি অধিক মাত্রায় আলু, শাক প্রভৃতি পদার্থ খাওয়ান যাইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যাঁহারা পরিপাক ক্রিয়ার রীতি অল্প অবগত আছেন, তাঁহারাই কেবল এই প্রশ্নের উত্তর করিতে সক্ষম। আহারের পরক্ষণেই অধিক পরিমাণে রক্ত পাকস্থলীর দিকে ধাবিত হয়; এবং তাহাতে তাহাকে সতেজঃ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায্য করে। ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে রক্ত শিরা ক্ষয় হয়। পরে ভক্ষিত দ্রব্য পরিপাক হইলে, তাহা হইতে যে নূতন রক্ত উৎপন্ন হয়, সেই রক্ত দ্বারা উক্ত ক্ষতি পূরণ হয়। পাকস্থলীকে যত অধিক পরিমাণে পূর্ণ করা যায়, ততই অধিক পরিমাণে শিরা ও রক্ত ক্ষয় হয়; সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, যে পরিপাক ক্রিয়ায় পাকস্থলীর পরিশ্রমের যত লাঘব হইবে, ততই শরীর পোষণ ও শরীর ক্রিয়ার জন্য অধিক পরিমাণে রক্ত শরীরে সঞ্চয় হইবে,—তাহার ক্ষয় হইবে না। অতএব অনায়াসেই এই উপলব্ধি করা যাইতে পারে, যে দ্রব্য অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর, অথচ সহজে অর্থাৎ পাকস্থলীর অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে পরিপাক যোগ্য, বালকেরা যথাসম্ভব তাহাই ভোজন করিবে।

নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভিদাহারে বালকবালিকাগণ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারে সত্য;—বড় লোকের ছেলেদের মধ্যে অনেককে অতি অল্প মাত্র মৎস্যাদি খাইতে দেখা যায়, এবং তাহারা তাহাতেও বর্দ্ধিত ও সুস্থ শরীর হয়। সামান্য শ্রমোপজীবী লোকের সন্তানেরা প্রায় ভাল মৎস্য খাইতে পায় না; তথাপি তাহাদিগকে সুস্থ শরীরে অধিক দিন জীবিত থাকিতে দেখা যায় বটে;—কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল বিরুদ্ধ বিষয় কখনই উপযুক্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে

না। আদৌ ইহা কখনই হইতে পারে না, যে যাহারা শৈশবাবস্থায় কেবল ফল মূলাদি আহারে প্রতিপালিত, তাহারা পরিশেষে উৎকৃষ্ট পুষ্ট শরীর হইবে। এবিষয়ের ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বড় ও ছোট লোকের ছেলেদের মধ্যে সর্ব্ব দেশেই বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। তাহা দেখিয়া উদ্ভিজ্জাহার কখনই শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধ শরীর মোটা হইলেই হয় না; তাহাতে আবার বিশেষ গুণ থাকা চাই। কোমল অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ড, নিরেট দৃঢ়কায়ের ন্যায় দেখিতে ভাল বটে; কিন্তু এ দুয়ের কত প্রভেদ, তাহা বলের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভদ্র লোকের ছেলেদের প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম বশতঃ শরীর অনেক ক্ষীণ ও ওজনে কম হয়। এই সকল কারণ বিবেচনা করিতে গেলে, উদ্ভিজ্জাহারী বালকদিগের শরীর কখনই ভাল বলিয়া বোধ হইবে না। তৃতীয়তঃ আকার ব্যতীত, ক্ষমতার বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে, কেবল ডাল ভাত আহারী সামান্য লোকদিগের সন্তান ও মাংসাহারী ধনী লোকদিগের সন্তানের মধ্যে বিস্তর ও স্পষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। কি মানসিক, কি শারীরিক, উভয়বিধ শক্তিতেই ভদ্র লোকের পুত্র অপেক্ষা ছোট লোকের ছেলে অনেকাংশে নীচ। *

খাদ্য যে পরিমাণে পুষ্টিকর হইবে, শরীরও সেই পরিমাণে সতেজ ও সবল হইবে। ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ আয়াস পাইবার প্রয়োজন করে না। যদি আমরা বিভিন্ন প্রকার জন্তুদিগের, অথবা ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যদিগের অথবা ভিন্ন২ দ্রব্যাহারী একজাতীয় জন্তু বা মনুষ্যদিগের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই এবিষয় অতি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া, বোধ করি, এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে গোরু ও তাজি ঘোরায় এত প্রভেদ কেবল খাদ্যজনিত; উভয় জন্তুই এক রূপ গঠনের; কিন্তু একটী নিতান্ত অপুষ্টিকর তৃণমাত্রাহারে প্রাণ ধারণ করে বলিয়া অপেক্ষাকৃত শ্লথগতি ও নিস্তেজ; অপরটী তদপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে বলিয়া, তাহার কত তেজঃ ও বল; কত দ্রুতগতি। এইরূপ শস্যাহরী ভেড়া ও মৎস্যাহারী কুকুরের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। কেনা জানে যে নিরবচ্ছিন্ন মাংসাহারী ব্যাঘ্র ও সিংহ, তৃণ মাত্রাহারী গবাদি অপেক্ষা সহস্র গুণে বলবান্। এই সকল উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট দেখাযাইতেছে, যে পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে শারীরিক বল ও তেজের কত নিকটসম্বন্ধ।

অনেকে বলিতে পারেন, যে এ রূপ প্রভেদ গঠন জন্য। আমরা বলি কখনই তাহা নহে। খাদ্যের প্রভেদেই এত

* যদিও এই সকল বিষয়ের যাথার্থ্য অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম না হইবার সম্ভাবনা, কেননা আমাদের দেশে মাংসাশী লোকের সংখ্যা অতি অল্প, তথাপি যাঁহারা ইউরোপীয় দেশবাসীগণের বিবরণ ভাল অবগত আছেন, এবং যাঁহারা শরীরতত্ত্ব উত্তম রূপ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যদি আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে অধিক পরিমাণে মাংসাহার প্রচলিত হয়, (এবং তাহা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল, ও হওয়া একান্ত উচিত) তবে অতি সত্বরেই এ বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করা যাইতে পারে। এবং এক্ষণে যাঁহারা সচরাচর মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও এ বিষয়ে প্রমাণ স্থল বলা যাইতে পারে।

প্রভেদ। যে জন্তু যে খাদ্য আহারের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, সে জন্তু সেই পরিমাণে বলশালীও হইয়াছে। এই কথা কত দূর সত্য, তাহা বুঝিবার জন্য এক জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যজনিত যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাই একবার বিবেচনা করিলে হয়। বিভিন্ন প্রকার ঘোটকের মধ্যেই এই রূপ কত প্রভেদ দেখ। তৃণমাত্রাহারী মোটা পেট নিস্তেজ অকর্ম্মণ্য বেতো ঘোড়ার সঙ্গে, সমধিক পুষ্টিকর খাদ্যাহারী যুদ্ধের অথবা শীকারের অশ্বের একবার তুলনা করিয়া দেখ, কত অন্তর দেখিতে পাইবে। বিভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের মধ্যেও এই রূপ প্রভেদ বিস্তর। অষ্ট্রেলীয়, বুশমেন এবং অন্যান্য অতি নীচ অসভ্য জাতীয় লোক, যাহারা ফল মূলাহারে জীবন ধারণ করে, তাহারা কত ক্ষুদ্রাকৃতি, মোটা পেট, অসম্পূর্ণ-বর্দ্ধিত-মাংসপেশী এবং নিস্তেজ। দেখ; তাহাদের সঙ্গে ইউরোপীয় জাতির একবার তুলনা কর, কত প্রভেদ দেখিবে। আবার দেখ আফ্রিকার অন্তর্গত কাফ্রি, উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ান, পাটাগোনিয়া নিবাসী প্রভৃতি জাতিরা কত সতেজ, বলিষ্ঠ, সুবর্দ্ধিতাঙ্গ এবং তৎপর তাহার কারণ কি?—তাহারা অধিক পরিমাণে মাংস আহার করিয়া থাকে। বলিতে লজ্জা করে, এই আহারের তারতম্য হেতুই হিন্দু ইউরোপীয়ে এত প্রভেদ। ইতিহাস পাঠকালে প্রায়ই দেখা যায়, যে জাতি উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিত, সেই জাতিই জগতীতলে অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। হিন্দুপাঠক! এই স্থলে স্মরণ কর, যে বৈদিক আর্য্যগণ কি গুণে ভারতবর্ষে আর্য্যাধিকার বিস্তার করণে সক্ষম হইয়াছিলেন?—যতদিন আর্য্যগণের আহার বিশেষ পুষ্টিকর ছিল, যত দিন তাঁহাদের ভোজন পাত্রে বিবিধ জন্তুর মাংস শোভা পাইত, তত দিন তাঁহারা অতিশয় ক্ষমতাশীল জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অতএব স্পষ্ট দেখা গেল, যে পুষ্টিকর খাদ্যের উপরেই শারীরিক ও মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং এক্ষণে বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে বালকদিগকে মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া কত প্রয়োজন। বাঙ্গালী সমাজে মাংসাহার প্রচলন না হইলে, আমাদের সবিশেষ উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

এই বিষয়ের শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের কথা কিছু বলিব। এ বিষয়েও বালকদিগের আহার দূষ্য। তাহারা প্রায়ই প্রতি দিন এক প্রকার দ্রব্য আহার করে। এই প্রথা কখন প্রশস্য নহে। কেননা উপর্য্যুপরি এক দ্রব্য আহার করিলে সহজেই অতৃপ্তি অর্থাৎ বিতৃষ্ণা জন্মে। অনেকেই বোধ করি দেখিয়াও ভুলিয়া থাকিবেন, যে দ্রব্য সচরাচর না খাওয়া যায়, তাহা কোন দিন খাইতে পাইলে, অধিক পরিমাণে ও অধিক রুচি সহকারে খাওয়া যায়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করা কত আবশ্যক। পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, যত কেন উৎকৃষ্ট দ্রব্য হউক না, অথবা যত কেন উত্তম রূপে পাক করা হউক না, এমন কোন দ্রব্যই নাই, যাহা উপর্য্যুপরি আ-

হার করিলে রুচিমান্দ্য না হয়, এবং শরীর ক্রিয়া সকল সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইয়া শরীরের যথোপযুক্ত পুষ্টি সাধন করিতে পারে। অতএব মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন করা একান্ত বিধেয়। এক দ্রব্য একাদিক্রমে প্রত্যহ খাওয়া কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে দ্রব্য আহারে বিশেষ রুচি হয়, তাহা খাইতে পাইলে মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ জন্য রক্তপ্রবাহ প্রবল বেগে বহিতে থাকে বলিয়া, তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার অনেক সাহায্য করে। আর যাহা খাইতে রুচি হয় না, তাহা সহজে পরিপাক করাও দুষ্কর হইয়া উঠে।

কেবল যে খাদ্য দ্রব্য সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এমত নহে; আবার প্রতি দিন আহারের সময়ও বিবিধ দ্রব্য আহার করা উচিত, এক মাত্র দ্রব্যে আহার সমাপন করা ভাল নহে। কেননা তাহা খাইতে খাইতেই ভাল লাগে না। খাদ্য দ্রব্যের বৈচিত্র যত অধিক হইবে, ততই আহারে স্পৃহা বেশী হইবে, এবং তজ্জন্য যে উপকার অর্থাৎ সুচারু পরিপাক, তাহাও অতি সহজ ও অধিক হইবে, সন্দেহ নাই। কেনা জানে, যে এক প্রকার খাদ্য, যত ভাল রূপে পাক করা হউক না কেন, ক্রমাগত আহার করিলে কখনই তত ভাল লাগে না, এবং তজ্জন্য তত ভাল পরিপাক হয় না, যত বিবিধ দ্রব্য সেই পরিমাণে আহার করিলে, ভাল লাগে ও পরিপাক হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা "পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত" কেবল বিলাসের জন্য বিবেচনা করেন, এবং তাহা আমীরের বা নবাবের পক্ষেই শোভা পায়, ভাবেন। কিন্তু তাঁহারা যে দেহতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহা তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আহার বিষয়ে নবাব গোলাম নাই, কেননা আহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত; আর শরীর নবাব ও গোলাম, উভয়েরই তুল্য ভাবে রক্ষণীয়। সুতরাং যাহার যেমন সাধ্য, সে তদনুসারে বিবিধ দ্রব্য ভোজন করিবে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত শুদ্ধ রসনার তৃপ্তির জন্য নহে, তাহা শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের মধ্যে যে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে, আহার বিষয়েও তাহার সার্থক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাঁচফুলে সাজি ভরার ন্যায় উদর রূপ সাজি পূরণের জন্য পাঁচ রকম দ্রব্য আহার করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের বালকদিগকে এই প্রকার আহার প্রদানে প্রতিপালন ও পরিপোষণ করা অপরিহার্য্য রূপে বিধেয়। তাহাতে যদি কেহ অনেক এবং বৃথা কষ্ট বিবেচনা করেন, (বোধ হয় অনেকেই করিবেন) তবে তাঁহাকে আমরা এই বলিতে চাই, যে যাঁহারা ভবিষ্যতে স্বীয় সন্তানদিগের উন্নতি ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির কামনা করেন, তাঁহাদের যে সকল কার্য্যে বালকের শরীর সুচারু পুষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তৎসমুদায়কে কখন অবহেলা অথবা কষ্টকর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে।

আর এক কথা বলিয়াই শেষ করা যাইবে। যাঁহারা আমাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী বালকদিগের খাদ্য পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখনই একবারে হঠাৎ সমস্ত পরিবর্ত্তন করেন না। অকস্মাৎ কোন কাজই করা ভাল নহে। ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন কর,

এবং তাহাও অল্পং পরিমাণে। কেননা হয়ত বালকের না খাইয়া পেট মরিয়া গিয়াছে, সুতরাং হঠাৎ একবারে অধিক পরিমাণে গুরু দ্রব্য মাংসাদি খাইতে দিলে, উদরের এবং অন্যান্য পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। আরও এক কথা এই যে, যখন যে দ্রব্য খাইতে দেওয়া যাইবে, তাহাতে যেন ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। অতএব সংক্ষেপে আমাদের কথিত বিষয়ের স্থূল কথা গুলি পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে,—

১। বালকদিগের খাদ্য সবিশেষ পুষ্টিকর হইবে;

২। সেই খাদ্য প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইবে, অর্থাৎ তাহা খাইয়া যেন পেট ভরে;

৩। খাদ্য দ্রব্যের সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে;

৪। সেই খাদ্যের প্রতিবার আহারের সময় বৈচিত্র সাধন করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিবার আহারের বেলা বিবিধ দ্রব্য খাইতে দিতে হইবে।

শ্রী অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইংলণ্ড ও বঙ্গ।

কেন ভগ্নি দিবানিশি,
নিবিড় অরণ্যে পশি।
নিরন্তর অশ্রুজলে ভাসাইছ ধরা লো।
কালি হলে ভেবে ভেবে,
কি ভাবিছ নিশি দিবে,
তব ভাব বুঝা কিছু যায় নাহি পারা লো।।

২

যা চাও তা দিয়ে থাকি,
কিছুইত নাহি বাকি,
তবে কেন বঙ্গ বল অকারণ ভাব লো।
ইংলণ্ডের মত কেবা,
বিজয়ীর করে সেবা,
এত করে তবু তব পেলেম না বাভ লো।।

৩

আর কোন জয়ী হলে,
এত দিন ছলে বলে,
বুকে চড়ে তব মুণ্ড করিত নিপাত লো।
আমি বলে গেলে তরে,
অন্য হলে চুলে ধরে,
তোমার দেহের রক্ত শোষণ করিত লো।

৪

নিজ পুত্র পিছে করে,
তব পুত্রগণ তরে,
সতত করি যে যত্ন ঈশ্বর তা জানে লো।
কলিকালে কোন নারী,
বল গো এমন করি,
নিজপুত্র সমপালে পর পুত্রগণে লো।।

৫

ইংলণ্ডের কথা শুনে,
বঙ্গ মাতা সরোদনে,
কহিতে লাগিলা সতী মধুর বচনে।
যা কহিলে সত্য ভগ্নি,
কিন্তু মোর চিত্ত অগ্নি,
সর্ব্বদাই হুহু করে করিছে দাহন॥

৬

অকালে হারায়ে স্বামী,
হয়েছি দুখিনী আমি,
তাহে অধীনতা বেড়ি আছি পায়ে পরে।
তুমি হিত কর বটে,
কিন্তু দুষ্ট লোকে জুটে,
হিতে যে অহিত করে শোক বৃদ্ধি করে ॥

৭

ভেবেছিনু পুত্রগণে
বড় হয়ে, দিনে দিনে
আমার মনের ব্যথা দূর বুঝি করে।
কি বলিব বিধাতায়,
যেটী উপযুক্ত হয়,
অমনি অকালে তারে লয় কেশে ধরে ॥

৮

ভাল হবে করে মনে,
কতগুলি তব স্থানে,
পাঠাইনু তাই বুঝি এই শিক্ষা দিলে।
সাজাইয়ে হ্যাটে কোটে,
শেষে দিলে ন্যাজ এটে,
মড়ার উপরে খাঁড়া, দেখে প্রাণ জ্বলে ॥

৯

এই যে দুর্ভিক্ষে দেশ,
একেবারে হলো শেষ,
কে বলত এই ক্ষণে দেশ রক্ষা করে।
চেয়ে দেখ চারি ধার,
সবে করে হাহাকার,
কতলোক এই বারে অন্নাভাবে মরে ॥

১০

তব পাশে কাঁদিলাম,
এই জন্য বলিলাম,
রহিত করিতে কর বছরের তরে।
তুমি কি শুনিলে তাহা?
মুখে মুধু আহা! আহা!
ধন্যরে ইংরেজী স্নেহ! দণ্ডবৎ খুরে ॥

১১

মোর ধন মোরে দেবে,
মধ্যে হতে বাহবা নেবে,
তাহাতেও কৃপণতা? এত বড় দায়।
বুকে চড়ে রক্ত খাও,
দিতে হলে গালি দাও,
এমন দয়ালু ভগ্নি কে কোথায় পায় ॥

১২

মনে ভেবে ঠাহরাও,
কার ধন কারে দাও,
তাহলে এ বৃথামান মন হতে হরি।
তুমি ভগ্নি সব নেবে,
দুঃখী আমি অন্নাভাবে,
অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে অনাহারে মরি ॥

১৩

সাধ নাই তব হ্যাটে,
গাউন, বনেট, কোটে,
সব লয়ে মনোসুখে রাজ ভোগ খাও।
বেসি কিছু নাহি চাবো,
চাহিলেও নাহি পাবো,
সুধু মাত্র আমার ভাগের ভাগ দাও ॥

১৪

হাসিয়া ইংলণ্ড বলে, "দ্যাট্‌স্‌ ইয়র ডিউ।
বেঙ্গল কহিল তবে "অ্যামেন এণ্ড এডিউ ॥

ঔদাসীন্য।

আমরা অধিকাংশ সময়েই উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করি, অনেক কার্য্যই ভাল মন্দ উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া সম্পাদন করিয়া থাকি। অনেক বাক্য উদাসীন ভাবে প্রয়োগ করি। অনেক লোকের সহিত ব্যবহারে ও কথোপকথনে উদাসীন হই। কিন্তু এই ঔদাসীন্য কি? এ বিষয় অতি অল্প সময়ে বিবেচনা করি।

স্বপক্ষ, বিপক্ষ, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েরই দুই দিক আছে। কিন্তু এই দুইয়েরই গুণ বিশিষ্ট, অথচ দুইটীর মধ্যে একবারে কোন টীরই সীমার অন্তর্গত নহে, কতিপয় বিষয় লক্ষিত হয়। যেরূপ অল্প অন্ধকার হইলে পদার্থ বিলোকিত হয়, অথচ কি পদার্থ, নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না এবং ইহাকেই তাহার মধ্যস্থল কহে। তদ্রূপ উপরি উক্ত সমুদায় বিষয়েরও এক একটী মধ্যস্থল আছে, তাহাকেই ঔদাসীন্য বলা যায়।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যখন বস্তুর দুই দিক ব্যতীত নাই, তখন ঔদাসীন্য কোথা হইতে সমুৎপন্ন হয়? একথা এক রূপ সত্য বটে, কিন্তু উভয়েরই গুণ বিশিষ্টতাকে ঔদাসীন্য কহা যায়। যথা হঠাৎ অন্ধকার এবং হঠাৎ আলোক, আর হঠাৎ স্বপক্ষতা ও হঠাৎ বিপক্ষতা প্রভৃতি।

১। যখন দেশ মধ্যে এক জন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন নূতন মত বা সত্য প্রচলন করিতে যত্নবান্ হন, তখন এক দিকে নবানুরাগে বলীয়ান্ তাঁহার শিষ্যবর্গ শত শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও নূতন মতের অনুকরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না বরং ব্যগ্রতা সহকারে তাহা অবলম্বন করে এবং জন সাধারণ যাহাতে ঐ মতের পক্ষ-পাতী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও যত্নবান্ হয়। অপরদিকে প্রাচীন উৎসাহী বীর পুরুষগণ বহুকাল প্রচলিত পিতৃপিতামহাদির আদরণীয় রীতির পরিবর্ত্তন সন্দর্শনে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া নব্যদিগকে প্রাণপণে নিস্তেজ ও নিরুৎসাহী করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোক, মনুষ্য সমষ্টির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে কত অল্প দেখা যায়; হয়ত দশাংশও হইবে কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকই—উভয় পক্ষ হইতে উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করে। তাহাদিগের স্বাধীনতা নাই, চেষ্টা নাই, বল নাই ও তেজস্বিতা নাই। যেদিকে ঘটনাস্রোতঃ প্রধাবিত হয়, তাহারাও সেইদিকে গমন করে। বস্তুতঃ যখন দেশের কিয়দংশ লোক আপনাদিগের মত লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কালাতিপাত করে, সাধারণ লোক হয়ত, তখন উভয় পক্ষকেই উন্মাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহার কারণ কি? আমাদিগের বিবেচনায় অনভিজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও আলস্য।

এই কারণ ত্রয়ের মধ্যে অনভিজ্ঞতাই প্রধান বলিতে হইবে। যখন যৌবনকালসুলভ নিঃস্বার্থ দেশের হিতসাধনেচ্ছা বলবতী থাকে, তখন যুবকগণ উদাসীন লোক মাত্রকেই স্বার্থপর মনে

করেন, বাস্তবিক জন সাধারণ তাদৃশ হেয় বা নীচ নহে। অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগের মহৎকার্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং নবানুরাগসুলভ অধীরতা গ্রস্ত হইয়া তাঁহারা তদ্বিষয় সাধারণ্যে সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। এই জন্যই অজাত শ্মশ্রু সংস্কারকবর্গ প্রকৃত ইচ্ছা ও অসীম সাহসিকতা সত্ত্বেও স্বদেশের অতি অল্পই হিতসাধনে পারগ হন। এবং এই জন্যই প্রাচীনগণ তাদৃশ শ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়াও নব্যদিগের অপেক্ষা অশেষ গুণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারক সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন, কোন জাতির বাহ্য আচার ব্যবহারে বিরোধী হইলে তাহাদিগের মধ্যে নূতন মত প্রচলিত করা অতি সহজ ব্যাপার নহে। কারণ লোকে বাহ্য-দর্শনে আপনাদিগের আদরণীয় প্রথার বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিলে বিরুদ্ধাচারীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ইতস্ততঃ করে সুতরাং তাহার মত সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ থাকে। পক্ষান্তরে মত যতই কেন বিরোধী না হউক, যদি প্রচারক বাহ্যভাবে লোকের সহিত আনুগত্য করিতে পারিয়া তাহাদিগকে আপনার অভীষ্ট ভাব স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে অনেকে তাহার মতের অনুকরণ করে বা বীর্য্যশালী প্রাচীন মতাবলম্বীরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী হইলে, আমাদিগের দেশে সাধারণ্যে আদরপ্রাপ্ত হইয়াছে। এ দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত দুই এক জন শিক্ষিত যুবক ব্যতীত সাধারণ লোকের নিকট কিছুই আদর পাইতেছে না। বস্তুতঃ সাধারণ লোক তদ্বিষয়ে উদাসীন। কেন উদাসীন? ইহার প্রধান কারণ অনভিজ্ঞতা।

পল্লীগ্রামে সংকীর্ত্তনের দলাদলী বা বিগত পাবনার প্রজা বিদ্রোহেতে সাধারণ লোক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বোধ হয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে, এজন্য লোকে তাহার দিকে ধাবিত হয়। এ দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার পক্ষপাতীও হইতে দৃষ্ট হয় না।

২। অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অনেক লোক স্বার্থবশতঃ উদাসীন হয়। অস্মদ্দেশীয় প্রায় সমুদায় শিক্ষিত লোকই বিধবা বিবাহ গ্রহণের ও জাতিভেদ প্রণালী উন্মূলনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিয়া থাকেন; অথচ স্বার্থবশতঃ সমাজ বন্ধন ত্যাগ করিতে পারেন না। এই জন্য বিধবা বিবাহ চালাইতে বা জাতিভেদ উঠাইতে অগ্রসর হন না। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাঁরা স্বার্থবশতঃ উদাসীন এবং উদাসীন ভাবেই কার্য্য স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন।

৩। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বুঝিতে পারেন অথচ স্বার্থ হেতু উত্তেজিত হন না, কিন্তু একমাত্র মানব সুলভ আলস্য প্রযুক্ত নূতন মত অবলম্বন করিতে বা কার্য্য করিতে অগ্রসর নহেন। আমরা দিবা নিশি শ্রম করিয়া জ্ঞানাঙ্কুর লিখিতেছি; আমাদিগের বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে ক্ষমতা সত্ত্বেও অনেকে আমাদিগের সাহায্য করিতে চাহেন না, অথচ তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিভাশালী হয়।

আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয়, ইহার কারণ একমাত্র আলস্য।

সমাজে উদাসীনের ন্যায় অনিষ্টকর লোক আর নাই। উদাসীন শত্রু মিত্র উভয় অপেক্ষা অধম। শত্রু আমার ক্ষতি করিতেছে, তথাপি উদাসীন অপেক্ষা ভাল। যেহেতু শত্রু না থাকিলে কেহ সাবধান হইত না এবং তজ্জনিত অসংখ্য উন্নতি সাধন করিতেও পারিত না। আমরা শত্রুকে মনে মনে ঘৃণা করি এবং মনে করি, বিপক্ষবাদী না থাকিলেই ভাল হইত। বাস্তবিক এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। শত্রু না থাকিলে কে আমাদিগের দোষ দেখাইয়া দিবে? মিত্রের স্নেহের চক্ষু অন্ধ। আমার বক্র ভাবে পদ সঞ্চার, পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান উত্তরীয় ধারণ, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি সকলই বন্ধুর স্নেহের চক্ষে আমার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। যদিও এই সকল পূর্ব্ব সংস্কার ও স্নেহের ভিত্তি অতিক্রম করিয়া বন্ধু আমার দোষানুসন্ধান ও দোষ অনুভব করিতে পারেন, তথাপি চক্ষু লজ্জা বশতঃ ও আমার মন ব্যথিত হইবে, এই ভাবিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার দোষ আমাকে বলিয়া বা দেখাইয়া দেয়, এরূপ বন্ধু অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কেন আবার শত্রুর আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায়?

অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান আচার ব্যবহার ও সমাজ সংস্কর্ত্তা ইংলণ্ডে গমন করিয়া ক্রমাগত আত্ম প্রশংসা বাদ শ্রবণ করণান্তর হত বুদ্ধি প্রায় হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু কিয়দ্দিনের মধ্যে শত্রুদিগের নিকট পুনঃ২ নিন্দা বাদ শ্রবণ করিয়া এখন ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। আবার সম্মুখে প্রতিকূলাচরণ না থাকিলে, কাহারও মত দৃঢ়তর হইতে পারে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখনই কোন নূতন প্রকাশিত ধর্ম্মবাদ বা সত্য অনেক লোক দ্বারা অত্যাচরিত হইয়াছে, তখনই তাহা যারপর নাই তেজস্বিতার সহিত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিরো প্রভৃতি রোম সম্রাট্‌গণ, সাধ্যানুসারে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়দিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তন্মতাবলম্বী লোক ক্রমে নিস্তেজ না হইয়া কালে এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। চৈতন্য, নানক, মহম্মদ, রাম মোহন রায় প্রভৃতি সকলেরই শিষ্যগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বাক্য সপ্রমাণ হইয়া থাকে। শেষোক্ত মহাত্মার মতাবলম্বী শিষ্যবর্গ অধিক উৎপীড়িত হয়েন নাই বলিয়াই বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে ও সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছেন না। অতএব শত্রু যে উদাসীন অপেক্ষা উপকারী, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

সাংসারিক পক্ষে বিবেচনা করিতে হইলেও সাধু ও সংসারী উভয় অপেক্ষা উদাসীন অধিক হেয়। সাধু পরোপকারী লোক দ্বারা জন সমাজে যত হিত সাধিত হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। পক্ষান্তরে স্বার্থপর সংসারী লোকও যত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে সৎকার্য্যের ভাগই অধিক। হয় ত এ কথাতে কোন কোন ধর্ম্ম যাজক আমাদিগের মতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমরা কোন ক্রমেই একথা স্বীকার করিতে পারি না যে পাপীরও পাপানুষ্ঠান অপেক্ষা সদনুষ্ঠান।

একবারে স্বার্থপরায়ণ সংসারিদিগের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় স্ত্রীপুত্রের চিন্তাতেই ব্যস্ত। নিদাঘকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া অথবা পৌষমাসের দুর্ব্বিষহ শীতে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারী লোক কাহার জন্য দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে? সে আপনার স্বার্থ সাধন হেতু এরূপ শ্রম করে, এতদ্দ্বারা কি মানব সমাজের হিত সাধিত হয় না? আর উদাসীন লোক দ্বারা সংসারের কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হয়? সত্য বটে দুই এক জন স্ত্রী পুত্র বিহীন অসংসারী ব্যক্তি দ্বারা সংসারের কোন২ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কখন উদাসীন পদ বাচ্য নহেন।

আমরা এতক্ষণ যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যখন মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়, ওমার আবুসোকায়েল প্রভৃতি মক্কা বাসী বীর পুরুষগণ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে মক্কার দূরস্থ আরব দেশীয় অন্যান্য অনেক জাতি নূতন ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালে মহম্মদের এই সকল শত্রুবর্গ তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়া সাধ্যানুসারে ইস্লাম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন করণার্থ প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু উদাসীন জাতিগণ চিরকাল একই ভাবে কাটাইয়া গেল।

মধ্য সময়ে ইংলণ্ড দেশে যদি অষ্টম হেনরী পোপের বিরুদ্ধে গড়্গহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই তদীয় দুহিতা মেরী সংস্কারক দিগের এতাদৃশ বিরোধী হইতেন না। এবং সাধারণ্যে পোপের বিরুদ্ধে এত কুসংস্কারান্বিত হইত না।

দিল্লীর সম্রাটগণ, শিকদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ না করিলে হয়ত তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত না, বস্তুতঃ দিল্লীশ্বরদিগের নানক প্রতিষ্ঠিত নব ধর্ম্মের উপর অতিরিক্ত বিদ্বেষ ভাবই শিক জাতিকে যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ করিয়াছিল। যদি তাঁহারা ইহাদিগের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কোন ক্রমেই আমরা শিকদিগকে সৈনিক কার্য্যে সকল জাতি অপেক্ষা সাহসিকতা প্রকাশ করিতে দেখিতে পাইতাম না।

সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা যে ভগবানেরই ইচ্ছা এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মন কখন বিশ্রাম করে না। এমন কি সুষুপ্তি কালেও নহে, শরীর অনেক খন শ্রম করিলে অশক্ত হয় ও অধিক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু মন কখন ক্লান্ত বা বিশ্রামার্থ লালায়িত হয় না। ইহাতে কি প্রকাশ হইতেছে? সর্ব্বদা কার্য্য করা এবং বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত থাকাই বিশ্বপতির ইচ্ছা।

যে লোক সর্ব্বদা বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, সে কর্ম্ম হইতে কিছু দিনের অবকাশ পাইলে শীঘ্রই ত্যক্ত হয় এবং পুনর্ব্বার বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল নহে। পেন্সন লইয়া লোক অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এক বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ ধর্ম্ম, বিশেষ যৌবনকাল হইতে তাহা অভ্যস্ত হইয়া থাকে, বার্দ্ধক্যে শ্রমবিমুখ

হইয়া উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিলে অবশ্যই জীবন ক্লেশকর বোধ হয় এবং এই জন্যই পরমায়ুর হ্রাস হইয়া শীঘ্রই জীবন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব উদাসীন ভাবে থাকা মনুষ্যের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্দ্দশ পদী কবিতা।

সরস্বতীর প্রতি

শুভ শ্রীপঞ্চমী আজি! হে মাতঃ ভারতি!
মৃন্ময়ী প্রতিমা তব প্রত্যেক ভবনে,
পূজিতেছে বঙ্গবাসী আনন্দিত মনে;
কিন্তু হায়! কোথা তুমি? দেবি ভগবতি!
স্বাধীনতা সখী সঙ্গে তুমিও কি সতী
ত্যজিলে এ আর্য্য ভূমি? মূর্খপুত্রগণে,
আর কি দিবে না স্থান ও রাঙ্গা চরণে?
বিদেশীয় ভিক্ষা লতে যাদের কুমতি!
দয়া করি পুনরায় আপন ভাণ্ডার
খুলে দেহ দয়াময়ি, ত্যজি অভিমান;
উদয় করহ মাতঃ, সে দিন আবার,
যে দিনে বল্মীকি, ব্যাস, কবিন্দ্র প্রধান,
আর তব বর পুত্র কাব্য সুধাধার
কবি গুরু কালিদাস করিতেন গান।

কবিতার প্রতি।

অমৃত স্বরূপা তুমি এ মর্ত্ত্য ভুবনে,
কবির কোমল চিত্তপদ্মবিহারিণী,
কল্প লতা হয়ে তুমি তোষ জনগণে,
শশী হয়ে আলো কর, দুর্ভাগ্য যামিনী।
ভূলোক আনন্দময় তব আগমনে,
তুমি দেবি সকলের সন্তাপ-হারিণী,
কি দরিদ্র কিবা ধনী প্রত্যেকের মনে,
অপূর্ব্ব মোহন ভাব উদ্ভবকারিণী।
সকল রসের তুমি একই আধার,
যে যাহাতে অনুরত তাহারে যোগাও
তখন সে রস;—পরি নানা অলঙ্কার,
রসজ্ঞ জনের মন সুরসে রসাও
চির দিন বাঁধা রবে দাসত্বে তোমার
এ অধীন, যদি তুমি কৃপা দৃষ্টে চাও।

স্বাধীনতা।

কোথায় নিবাস তব স্বাধীনতা দেবী?
যাঁর অধিষ্ঠানে মর্ত্ত্য হয় স্বর্গ ধাম,
কর্ণে সুধা ঢালে যাঁর মনোহর নাম,
মানুষ অমর হয় যাঁর পদ সেবি।
কি রূপে তোমার গুণ বর্ণিবে এ কবি?
বন্দি বেড়ী খণ্ডে তব দৃষ্টি অভিরাম,
জীবন বৃথায় তার তুমি যারে বাম,
তুমি চিত্ত-সরসের সুখ পদ্ম রবি!
সন্ সন রবে, কিম্বা ঝর ঝর স্বরে,
স্বেচ্ছাচারী সমীরণ তব গুণ গায়;
গগন-বিহারী উচ্চ নব নীরধরে
স্তুতি করে ঘোর মন্দ্রে সর্ব্বদা তোমায়,
তোমার মঙ্গল গীত, বসন্তে, সাদরে,
পঞ্চমে কোকিল গায়, বসিয়া শাখায়।

সভ্যতার ইতিহাস।

মানসিক ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির একত্রউন্নতি।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। একটী সাধিত হইলেই অপরটী আপনা হইতেই হইয়া থাকে। যথা যে জাতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা আছে, তাহাদিগের ধর্ম্মভাব উন্নত, এবং যে জাতির ধর্ম্মভাব উন্নত, তাহাদিগের মানসিক উন্নতিও কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক এক কথাই ছিল। দার্শনিকেরাই ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত নামে খ্যাত হইতেন। বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্য্যগণ ও সক্রেটিস প্রভৃতি গ্রীসদেশের দার্শনিকবর্গ সকলেই এই সংজ্ঞার অন্তর্গত। এরূপ হওয়ার কারণ দুর্জ্জেয় নহে। মনোবৃত্তি পরিচালিত হইলেই লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হয়। এবং তাহার অনুষ্ঠান করা না করারও ফলাফল অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে পারে। আদিম কালে বালস্বভাব মনুষ্যের মন নানা রূপ কুতর্ক ও কুচিন্তা দ্বারা কলুষিত হয় নাই। সুতরাং যে বিষয়টী শিক্ষা হইত, তাহাই কার্য্যেও পরিণত হইয়া থাকিত। সেই জন্যই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক এক কথা ছিল। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণার্থ মনোবৃত্তি পরিচালনার নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং তাহা হইলেই লোকে জ্ঞানী হইয়া থাকে। এদিকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রচলিত না থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচলন থাকাতে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুমোদিত নানা বিষয় ও ভিন্ন সম্প্রদায়েরও অনেক বিষয় শিক্ষা করায় ভূরি ভূরি নূতন নূতন বিষয় অবগত ও জ্ঞানোপার্জ্জন হইয়া থাকে। এই কারণেই আধুনিক হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীলা, তাহারা কিয়ৎপরিমাণে মার্জ্জিতবুদ্ধিসম্পন্না।

এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তি।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি উভয়ের উন্নতি অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি একত্র অগ্রসর না হইয়া কেন বিচ্ছিন্ন লক্ষিত হয়? কেনই বা আজ কাল অনেক লোককে এক দিকে অযথা উন্নত এবং অপর দিকে একবারে অবনত দেখা যায়? কেন আজ কাল এত নাস্তিকতা প্রবল হইতেছে, সমাজ মধ্যে জড়তত্ত্বের অযথা প্রচলন ও নানা রূপ কুদর্শনের মতই ইহার কারণ মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বে কি কুদর্শনের মত আবিষ্কৃত হয় নাই? জড় দর্শন ও নাস্তিক দর্শন পূর্ব্বেও ছিল সত্য, কিন্তু আজ কালের ন্যায় তাহা সাধারণে পঠিত হইত না। এতদ্ব্যতীত পুরাকালে শাস্ত্রের উপর অবিচলিত ভক্তি থাকায় লোকে শীঘ্র এই সকল মতে বিশ্বাস করিত না। আর আজ কাল সভ্যতা প্রভাবে লোকের ভোজ্য ভোগ্যের প্রতি অত্যন্তানুরাগ লক্ষিত হইতেছে; সুতরাং একালের লোকের মন অধিক পরিমাণে তাহাতেই আশক্ত হয়। পক্ষান্তরে পুরাকালে ভোজ্য ভোগ্যও অতি সামান্য ছিল, লোকে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারিলেই, যথেষ্ট জ্ঞান করিত এবং এতৎ

কারণ বশতঃই লোকের মন অন্য বিষয়ে প্রধাবিত হইত।

এই সকল কারণ বশতঃ আদিম কালের সভ্যতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইয়া মানসিক ও ধর্ম্ম নৈতিক উভয়াত্মক ছিল। এবং আমরাও উভয়কে একত্র করিয়া বর্ণন করিব।

উপরি উক্ত যুক্তি পরম্পরা দ্বারা এ- গ্রীক ও রোমীয় কথা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পুরাকালে যে জাতি সভ্য পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের ধর্ম্মভাবও অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বথা এই সত্যের অনুযায়ী আচরণ দেখা যায় না। গ্রীক ও রোমীয়েরা বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের যারপর নাই দুর্গতি ছিল। এবিষয়ের কারণ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই পাইতে পারা যায়। এই জাতিদ্বয়ের উন্নতি অধ্যাত্মমূলক নহে।

এই জাতিদ্বয়, জড় বিজ্ঞান ও জড় তত্ত্ব অযথা পর্য্যালোচনা করাতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।* পক্ষান্তরে ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক, সুতরাং তজ্জন্য প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মের এতাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হয়। অপিচ যখন গ্রীস দেশে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের * আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন তাহাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মের ভাব উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সক্রেটিস্ বোধ হয়, প্রথমতঃ দর্শন শাস্ত্রের ধারাবাহিক প্রমাণ দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শিক্ষার ত্রুটিই ইহার একমাত্র কারণ। কতকগুলিন সত্য ঘটনা অভ্যস্ত থাকিলে কি হইবে? তাহার ব্যবহার ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মনোবৃত্তি মার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই সামান্য শিক্ষাদি সহ ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই সকল বিষয় তন্নং করিয়া মীমাংসা করা দুই এক পৃষ্ঠার কার্য্য নহে; সুতরাং অদ্যকার মত ক্ষান্ত হইলাম।

৭। উপসংহার। উপসংহার কালে আর অধিক বর্ণন না করিয়া আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি পুরাকালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং আগামী হইতে আমরা এই উভয়কে একত্র করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

* সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়াম হামিল্টনের ও এই মত। Hamiltons' Lactures on Metaph ysics vol. I. Lec. II.

* অনেকেরই মত, দর্শন শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে গিয়াছিল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ইতিবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্র। মূল্য ৵০ আনা। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুস্তক খানি ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারের কি উদ্দেশ্য, তাহা তিনিই জানেন। সমালোচক তাঁহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছে

অমৃতে গরল ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

চোকের জল ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে । সারণ গড়ের রাজবাটী দীপালোকে আলোকিত । রাজপুরনারীগণ নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন । কেহ২ বা গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত নিকটস্থিত সরোবরে গলদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া হংসিনীদলবৎ ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছেন, এবং পদের গতিতে সরোবরস্থিত কুমুদ বনকে ছিন্ন করিতেছেন । নিদাঘের ঈষদোষ্ম মৃদুমন্দ সমীরণ চতুর্দ্দিকে বহমান হইয়া খর-করতপন তাপিত নিভৃত স্থান আশ্রিত জীবগণকে বহির্দ্দেশে আহ্বান করিতেছে । অদূরে উচ্চতর বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর হইতে তারানাথ নীরবে উকি মারিয়া সরোবর স্থিত ললনাগণের জল ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছেন । পতিকে সমাগত দেখিয়া নিকটস্থিত নক্ষত্র পুঞ্জ আলিঙ্গন মানসে বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে, এবং দেখিতে২ চন্দ্রের শুভ্র উত্তরীয় বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে । পতি-সোহাগিনী সপত্নীর এরূপ স্পর্দ্ধা দৃষ্টে দুই একটী নক্ষত্র অদূরে আরক্ত নয়নে অশ্রুপাত করিতেছে, কেহ বা লজ্জায় মলিনা হইয়া মেঘ মধ্যে পলায়ন করিতেছে এবং কেহ২ বা শোক সন্তাপে তাপিত ও মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে । নিশানাথ প্রণয়নীগণের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে নিজ অঙ্কস্থিত নর নারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে । কুমুদিনীদূত চক্রবাক, কুমুদিনীর দুঃখজনক বার্ত্তা চন্দ্রকে বলিবার জন্য তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তার স্বরে চীৎকার করিতেছে ।

এমন সময়ে রাজা সুরেন্দ্র সিংহ ও রাণী হৈমবতী উভয়ে অন্তঃপুরস্থিত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে শিলাতলে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা সমীরণ সেবন ও নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন । হৈমবতীর শরীর মধ্যমাকৃতি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া কিঞ্চিৎ খর্ব্ব বোধ হইতেছিল । গণ্ডদেশ স্ফীত । চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল এবং প্রখর দৃষ্টিসম্ভূত ; তাহাতে কজ্জল ছিল । ললাটের উপরিভাগ দুই দিক কিঞ্চিৎ চাপা । ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, কিন্তু কোন হাসির চিহ্ন তাহাতে লক্ষিত হইতেছিল না । নাসিকাটী ঈষৎ চাপা । গাত্রে অলঙ্কার ছিল বটে, কিন্তু তাহা বস্ত্রের দ্বারায় আচ্ছাদিত । আমাদের দেশের সুন্দরীরা যেমন অলঙ্কার গায়ে দিলে, তাহা দেখাইবার মানসে গুমরে গাত্রে বড় কাপড় দেন না, তিনি সেরূপ ছিলেন না । গ্রীষ্মকাল বটে, তথাপি বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার গাত্র আচ্ছাদিত ছিল । তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান সপ্তবিংশ বর্ষ । শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল, তাতে আবার সন্তানাদি না হওয়াতে আরও ফাটিয়া পড়িতেছিল । ইনি রাজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী । সুতরাং ভিক্ষুকের স্বর্ণমুদ্রা দর্শনের ন্যায় তিনি অনিমিষ ও আগ্রহ-লোচনে হৈমবতীর মুখ পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যে২ কথায় "হুঁ" দিতেছেন ।

হৈমবতী কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অতি নিকট ।

আমি পুনঃ২ বলিয়া আসিতেছি যে এবারে রথ যাত্রা দেখিতেই হইবে, কিন্তু এ অভাগিনীর ভাগ্য ফলে সে কথা তুমি গ্রাহ্যই করিলে না। আমি যদি স্নেহের পাত্রী হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমার কথাতে কর্ণপাত করিতেন।”

রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া হৈমবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “কেন প্রিয়ে, আমি কোন্ দিন না তোমার কথা শুনিয়াছি? তুমি যে দিবস পুরুষোত্তমে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি সেই দিনই পুরীর রাজাকে একটী বিশ্বাসী লোককে প্রেরণ করিতে লিখিয়াছি। কি জন্য যে সে লোক এখনও আসিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না।”

হৈম। পুরীর রাজা যদি কোন লোক না পাঠাইয়া দেন, তবে কি আমাদের যাওয়া হইবে না?”

সুরে। হবে। কিন্তু একজন ঐ দেশী লোক সঙ্গে থাকা ভাল। কারণ কটকের পথ বড় কদর্য্য, এবং পথেও অত্যন্ত দস্যুভয়, এরূপ অবস্থায় একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে যাওয়া ভাল। তা দেখি, যদি কেহ নাই আইসে, তবে অগত্যা আমাদিগকেই যাইতে হইবে।”

হৈম। বিজয়কে আনিবার জন্য মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কেন?

সুরে। অনঙ্গ পুরের মন্ত্রীর পত্রে অবগত হইলাম যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার অনঙ্গপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুদায় লুণ্ঠন করিতেছে। বিজয়কে তদ্দেশ শাসনের জন্য প্রেরণ করিবার মনস্থ করিয়াছি।

হৈমবতী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তবে আমাকে এত আশা ভরসা দিয়া সন্তুষ্ট করিবার কি প্রয়োজন ছিল? অনঙ্গপুরের শাসন কার্য্য কি আমার ভ্রাতা জগৎ মোহনের দ্বারায় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইত না?”

সুরেন্দ্র সিংহ কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “হইতে পারিত; কিন্তু জগৎমোহন কোথায়?”

হৈমবতীর মুখ রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সক্রোধে বলিলেন, “একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কাহা কর্ত্তৃক জগৎ মোহন দেশান্তরিত হইয়াছে! এখন আমাকে ভুলাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ, জগৎ কোথায়?” বলিতে২ তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দুই চারি বিন্দু উষ্ম জল রাজার হস্তের উপর পতিত হইল। রাজার মুখ শুষ্ক হইল, অতি ত্রস্তে নিজ উত্তরীয় বসন দ্বারা রাণীর চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন এবং সান্ত্বনা করণাভিপ্রায়ে বলিলেন, “প্রিয়ে, ক্ষান্ত হও! আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিও না। জগৎকে আমি দেশান্তরিত করি নাই। জগৎ অন্যায়রূপে পুরনারীদিগের প্রতি বল প্রয়োগ করিত। সে দিন রাজকুমারী ক্ষীরোদবাসিনীর কক্ষদ্বারে নিশীথকালে অজ্ঞাতসারে গৃহপ্রবেশের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কে না জানে! তোমার ভ্রাতা, তাই রক্ষা হইল, অন্য কেহ হইলে আমি তদ্দণ্ডে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম। আমি কত বার জগৎকে মার্জ্জনা করিয়াছি, তাহা কি তুমি অবগত নহ? শেষবারেও আমি তাহাকে সামান্য অনুযোগ বই কোন রূপ শাস্তিই বিধান করি নাই। সে ইচ্ছা ক্রমেই দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে। এবং শুনিতে পাই, সে বনবিহারী

দস্যুগণের সহিত যোগ দিয়া আমার অনিষ্ট চেষ্টা পাইতেছে। যাহা হউক, সে যদি এখনও দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তোমার মনস্তুষ্টির জন্য এই দণ্ডেই তাহাকে ক্ষমা করি।”

হৈমবতী কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “কুমার বিজয় সিংহ আসিলে তাহাকে এক বার জগৎমোহনের অনুসন্ধানার্থে নিয়োগ করিলে হয় না?” “আচ্ছা দেখা যাবে,” এই বলিয়া রাজা আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া উদ্যান মধ্যে পদ চালনা করিতে লাগিলেন। হৈমবতী রাজার এরূপ আচরণ দৃষ্টে ঈষৎ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাজা যখন এই রূপ অন্যমনস্কভাবে উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কুমার বিজয় সিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার পদযুগল বন্দনা করিলেন। রাজা কুমারকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুমারের হস্ত ধরিয়া নিকটস্থিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া, কুমারের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা বিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কুমার মধুর বিনম্র বচনে একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া, অবশেষে তাঁহাকে রাজ সদনে আহূত হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন।

রাজা কহিলেন, “অনেক দিবস হইতে মনের ইচ্ছা যে, পুরুষোত্তমে গিয়া জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করি। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও এরূপ লিখিত আছে যে, রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। অতএব সেই রথযাত্রা দেখিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা। এই জন্যই পুরীর মহারাজের নিকট এক খানি পত্রও প্রেরণ করিয়াছি যে, তিনি এক জন পরিচিত ও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কি জন্য যে তিনি এপর্য্যন্ত কোন লোক কি তৎসম্বন্ধে এক খানি পত্রও পাঠাইলেন না, তাহা বলিতে পারি না।”

কুমার কহিলেন, “এক জন উড়িষ্যাবাসীকে তিনি ত পাঠাইয়াছেন।”

সুরে। কোথায়?

বিজ। চন্দ্রপুর হইতে আসিবার সময়ে রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি দস্যুগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আনয়ন করিয়াছি, অনুমতি হইলেই আপনার সাক্ষাতে আনয়ন করিতে পারি।

সুরেন্দ্র সিংহ আহ্লাদে ও আগ্রহ সহকারে বলিলেন, “তোমাকে আর যাইতে হইবে না, আমি যাইয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম করগে। আর জগৎমোহন এদেশ হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব তুমি কল্য প্রত্যূষেই তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হবে, এবং যেমন করিয়াই হউক, তাঁহাকে সন্ধান করিয়া আমার নিকট আনয়ন করিতে হইবে।” ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকলঙ্কিনীর কলঙ্ক।

রাজকুমার বিশ্রাম মানসে পূর্ব্বকার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু

গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখেন, গৃহের আর সে শোভা নাই; তাহা মলিন ও অপরিষ্কার। স্থানে স্থানে উর্ণনাভ স্বীয় জাল বিস্তার করিয়া স্থিরভাবে তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। কোথাও বা কপোত কপোতির পালকে ও বিষ্ঠাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিছু২ দুর্গন্ধও নিঃসৃত হইতেছে। ভিত্তিস্থিত প্রতিমূর্ত্তি গুলিতে উর্ণনাভের কারুকার্য্য লক্ষিত হইতেছে। গৃহতলে যে সকল গালিচা পাতা ছিল, তাহা একবারে স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। গৃহসজ্জার-উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী আর কিছুই নাই। কেবল এক খানি পর্য্যঙ্ক এক ধারে রহিয়াছে। তাহার উপরিস্থিত শয্যা দৃষ্টি করিলে, নিশ্চয় বোধ হয়, কেহ যেন এই দণ্ডে নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক তাহাই যথার্থ। কুমার যে অবধি রাজভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই হইতেই গৃহের শ্রী বিগত হইয়াছে। রাজপুত্রের হঠাৎ আগমন দর্শনে ভৃত্যেরা সত্বরে যতদূর সম্ভবে, গৃহ পরিষ্কার করিয়াছিল এবং শয্যাও নূতন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কাহার জন্য যত্ন করিবে?

একটী রজত নির্ম্মিত শামাদানের আলোকে গৃহ আলোকিত হইতেছে। রাজপুত্র কিঞ্চিৎকাল শয্যাতে উপবেশন করিয়া একান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে গৃহের চারিদিকেরই গবাক্ষ রুদ্ধ ছিল, সুতরাং রাজকুমার অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাঙ্গনসম্মুখস্থিত গবাক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া একদৃষ্টে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন।

নিদাঘের চন্দ্র কিরণে প্রকৃতির শোভা কি মনোহর! শ্যামল বর্ণের বিটপী পত্রের উপর চন্দ্র কিরণ পতনে পত্রগুলি নীলকান্ত মণির সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। কোথাও নিবিড় বিটপী পুঞ্জ শ্রেণী বদ্ধ ভাবে চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় রোপিত থাকাতে তন্মধ্যদেশ ঘোর অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, এবং বৃক্ষগাত্রে অসংখ্য খদ্যোতিকা হীরক খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। পুষ্পের মনোহর শোভা আর দেখা যাইতেছে না, কিন্তু সুমধুর সৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া স্ব স্ব উচ্চ কুলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মৃদুমন্দ মারুৎ প্রবাহে সরোবরের জল সমুদায় কম্পিত হইতেছে এবং তদুপরি চন্দ্র রশ্মি পতিত হওয়াতে অসংখ্য ভগ্ন কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মীনগুলি জলের উপরিভাগে মুখ তুলিয়া মৎস্য খাদকগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতেছে। স্থানে স্থানে প্রকৃতি দেবী ঝিল্লিরবে জগৎপাতার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। নিশা নাথ রজনীর বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সহাস্য মুখে প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

রজনীর এই রূপ স্তিমিত ভাব ও প্রকৃতির এই রূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে কাহার না মন আনন্দ রসে ভাসিতে থাকে? কাহার না মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হয়? রাজকুমার প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ তৎকালে মলিন ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং ভ্রূযুগ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত বোধ হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন। কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে?

তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে

শুভ্রবসন পরিহিতা একটী ললনা তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইল। চিন্তানিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এক দৃষ্টে রমণীর গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রমণী ধীরে২ রাজকুমারের শয়ন মন্দিরের দ্বারে আগমন করিলেন। এবং কিয়ৎকাল দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া পুনর্ব্বার গমনোন্মুখী হইলেন। দুই এক পদ গমন করিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডায়মানা হইলেন, তাঁহার তৎকালের অবস্থা দেখিলে সহজেই বোধ হইত, তিনি কিছু ভাবিতেছিলেন।

এতদ্দৃষ্টে রাজকুমার কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?" শব্দ লক্ষ্য করিয়া সুন্দরী সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কক্ষদ্বারে রাজপুত্রকে দেখিতে পাইয়া পুনর্ব্বার ধীরে২ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া, পুনরপি স্তব্ধ ও স্থির ভাবে অবস্থিতি করিলেন। রাজকুমার পুনর্ব্বার কহিলেন, "কে তুমি, কথা বল না ? নিশীথ কালে এখানে কি প্রয়োজন ?" উত্তর নাই। নীরব।

বিজয় সিংহ দ্রুতপদে সোপানমার্গে নিম্ন ভাগে আসিলেন এবং দ্বার দেশে আগমন করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সুন্দরী ত্রস্তভাবে গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য রাজপুত্রকে ইঙ্গিত করিলেন। রাজকুমার দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমার নিকট কি প্রয়োজন ?" অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উত্তর হইল, "উপরে চলুন, পরে বলিব।" রাজকুমার পুনর্ব্বার সোমানমার্গে আরোহণ করিলেন, সুন্দরী তৎ পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন।

সুন্দরী রাজকুমারের শয়ন কক্ষে গমন করিয়া মৃদুস্বরে কুমারকে কহিলেন, "বোধ করি, চিনিতে পারেন, হতভাগিনী অনঙ্গপুররাজদুহিতা।" বিজয় সিংহ চমকিত হইলেন, এবং অবাক হইয়া রাজকুমারীর মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রথম সন্দর্শনের সহিত বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যের কোন সাদৃশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সকলই নূতন বোধ হইতে লাগিল। এক্ষণে আর সে উজ্জ্বল ক্রোধব্যঞ্জক চক্ষু নাই, তাহা এক্ষণে প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় আর কেশরাশি ছিন্ন ভিন্ন ভাবে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত নহে, এক্ষণে তাহা বেণীবদ্ধ এবং তদুপরি বিচিত্র মস্তকাভরণ। রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় আর সেরূপ স্ফীত নহে, চিত্রকরের তুলির দ্বারা অঙ্কিত বোধ হইতেছে। মুখ মণ্ডল আর সেরূপ মলিন নহে, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মুখজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে আর সেরূপ কৃশাঙ্গী নহে, স্থূলকায়, অপেক্ষাকৃত নবযৌবনের সম্যক প্রভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সে উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, বিকৃত স্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সম্মুখে প্রশান্ত মূর্ত্তি, মধুর স্বর; চিত্তহারিণী সৌন্দর্য্য। রাজপুত্র অবাক।

ক্ষীরোদ বাসিনী পুনর্ব্বার ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আপনি এক দৃষ্টে কি দেখিতেছেন ? আপনি কি আমাকে এখনও চিনিতে পারেন নাই ?"

বিজয় সিংহ কহিলেন, "পারিয়াছি।" কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব। পরে বিজয় সিংহ বলিলেন, "এত রাত্রে একাকিনী এখানে আসিবার কারণ কি ?"

এ কি রূপ প্রশ্ন ? পাঠক, তুমি বিজয় সিংহের এরূপ প্রশ্নে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। কারণ, তুমি রসিকদাস।

"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা" তোমার ধর্ম্ম নহে। "পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাও ভাল," এটী তুমি বিলক্ষণ বুঝ। কিন্তু এ চোদ্দ আনাও নহে। সাড়ে ষোল আনা। তুমি বাঙ্গালী, শুভ দিনে, শুভক্ষণে, নবান্ন করার ফল তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। কিন্তু বিজয় সিংহ ইহার কিছুই বুঝিতেন না। অথচ তোমার ন্যায় কোমল প্রকৃতি নহেন। বীর পুরুষদিগের প্রকৃতি। অতএব তিনি যে এরূপ প্রশ্ন করিবেন, এ কোন্ বিচিত্র কথা! এরূপ প্রশ্ন অন্য কোন ললনার প্রতি হইলে তিনি কি করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ক্ষীরোদ বাসিনী তেজস্বিনী; বিশেষতঃ বিপদে পড়িলে কি না করিতে হয়? ক্ষীরোদ বাসিনী রাজকুমারকে কহিলেন, "আপনি আমাকে একবার মহারাষ্ট্রীয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, পুনরায় আর একটী নরপশুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলে চিরকৃতার্থ হই।"

বিজয় সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরপশু কে?"

ক্ষীরোদ বাসিনী উত্তর করিলেন, "জগৎ মোহন।" রাজকুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি রূপ?" রাজ নন্দিনী কহিলেন, "আপনি আমাকে অনঙ্গপুর হইতে এখানে পাঠাইয়া দিলে পর কতক দিন সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। কিন্তু কি কুক্ষণেই জগৎ মোহনের দৃষ্টিতে পড়িলাম, সেই আমার বিপদের সূত্রপাত হইল। সে আমার সহিত পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজ্ঞীও সেই জন্য আমাকে কত মত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। সেই হইতে তিনি আমাকে বিষ দৃষ্টিতে দেখেন, এবং কিসে আমার অনিষ্ট হয়, সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। এ দিকে জগৎ মোহন এত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না। এক দিন আমি গবাক্ষদ্বারে শুইয়া আছি। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে গবাক্ষের দ্বার উন্মুক্ত আছে, এমন সময়ে দেখি, একটী ভীমাকৃতি পুরুষ, গবাক্ষ দ্বার দিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া আমার দক্ষিণ বাহু সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। অমনি আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি শিহরিয়া উঠিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বসিলাম। দেখি জগৎ মোহন! আমি তদ্দৃষ্টে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পরিচারিকা দৌড়িয়া আসিল। জগৎ মোহন পলায়ন করিল।

প্রত্যূষে সেই কথা রাজ বাটী মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মহারাজ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহার উপর করিতে লাগিলেন? জগৎ মোহন তখন একবারে দেশ ত্যাগী হইয়াছেন। রাজ্ঞী আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া নানা রূপ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিলেন। এবং সেই হইতে দিবা নিশিই আমাকে সেই কথা উল্লেখ করিয়া গঞ্জনা দিয়া থাকেন। আমি কি করিব? ত্রিসংসারে আমার আপনার বলিবার কেহই নাই। আপনিই আমাকে একবার রক্ষা করিয়াছিলেন, এবারেও রক্ষা করুন। আপনি বনে জঙ্গলে যেখানে রাখিয়া ভাল বিবেচনা করেন, আমাকে সেই খানে রাখুন, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ যমপুরীতে আর তিলার্দ্ধও রাখিবেন না। আপনি যদি অন্য স্থানে রাখিবার উপায় না দেখেন, তবে কোন তপস্বীর আশ্রমে রাখিয়া

আসুন, আমি সেই স্থানে যাবজ্জীবন ঈশ্বর আরাধনায় মন নিযুক্ত করিয়া দিন যাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

গৃহীই হউন, বা বনচারীই হউন, বা যোদ্ধাই হউন, রমণীর দুঃখে ব্যথিত না হন, এমন লোক অতি বিরল। রমণীর চক্ষুর জলবর্ষণ দেখিয়া নিজ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন, এমন লোক বোধ হয়, পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। বিজয় সিংহ বীরপুরুষ বটে, কিন্তু ক্ষীরোদ বাসিনীর চক্ষুজল দৃষ্টে তাঁহার অন্তঃকরণ বিগলিত হইল। তিনি সজল নয়নে কহিলেন, "আমি কল্য বা পরশ্ব তারিখে জগৎ মোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব। একমাস কাল কোন রূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে, আমি পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কিসের অভাব? তুমি কিসের কাঙ্গালিনী? একাকিনী থাকিলে কষ্ট হইবে বলিয়াই তোমাকে এখানে পাঠান হইয়াছিল। এখানে যদি তদধিক কষ্টই হইল, তবে এখানে থাকার কি প্রয়োজন; নিজ রাজ্যে গমন করাই ভাল। আমি স্বয়ং তোমাকে অনঙ্গপুরের সিংহাসনে বসাইয়া জন্ম সার্থক করিব।"

তাঁহারা যখন এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। গোল যোগের কারণ জানিবার জন্য রাজকুমার গবাক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে ভৃত্য বর্গ ছুটা ছুটী করিতেছে। কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্ষীরোদ বাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছেন?" রাজকুমার অবাক্, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। ক্ষীরোদ বাসিনী, গবাক্ষদ্বারে যাইয়া সেই রূপ দেখিলেন। বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আমিই এই সমস্ত অনর্থের মূল।" ইহা বলিয়া তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার অবাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শত্রুকে মুক্তিদান।

বিষম বিপদ! কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? কে ইহার প্রকৃত উত্তর দান করিবে? কিসের জন্য এ কোলাহল হইতেছে? নিজের যাইয়া দেখা কি উচিত? না, অনিষ্টও ঘটিতে পারে। বিজয় সিংহ বড় বিপদে পড়িলেন। উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার গবাক্ষ দ্বারে, একবার দ্বার দেশে, একবার গৃহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ দুশ্চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। শরীর হইতে প্রভূত ঘর্ম্ম-রাশি নির্গত হইতে লাগিল। উপায়ান্তরবিহীন। এমন সময়ে একটী দাসী ত্রস্ত ভাবে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। এটী পূর্ব্ব পরিচিত। কুমারকে শৈশবকাল হইতে লালন পালন করিয়াছিল। দাসীর নাম যোগমায়া। সারণ গড়ে প্রথমে যে দাসীর সহিত পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ সেই দাসী। রাজকুমার দাসীকে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি? রাজকুমারী কোথায়?" যোগমায়া বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিল, "খবর মন্দ। রাজকুমারী, যখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিতেছিলেন, সেই সময়ে রাণী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; সেই জন্য আপনাদিগকে লাঞ্ছনা দিবার মানসে এইরূপ অনর্থক গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় রাজকুমারীর কক্ষ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং রাণীর দুরভিসন্ধি তত সুসিদ্ধ হয় নাই।”

রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ জানিতে পারিয়াছেন ?’

“হাঁ, তিনি সকলই শুনিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনই কথা বলেন নাই। যাহা হউক, তিনি কিছু বলুন বা না বলুন, কিঞ্চিৎ যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

“আপনার বিমাতা কাল-সাপিনী, সদাসর্ব্বক্ষণই ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিবার মানসে বেড়াইতেছেন, কিন্তু সুযোগ না পাওয়াতে এত দিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি আপনাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আপনি আর এক দণ্ডও এ যমপুরীতে থাকিবেন না। অন্য দেশে থাকিয়া দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে হলেও ভাল, তথাচ সর্পের গর্ত্তে বসতি করা কিছু নহে। বরং এসম্বন্ধে ক্ষীরোদবাসিনী যে কথা বলিলেন, তাহা করিলেও মন্দ হয় না।” রাজকুমার বলিলেন, “তিনি কি বলিলেন?”

যোগমায়া কহিল, “তিনি কহিলেন যে অনঙ্গপুর আজ পর্য্যন্তও করপ্রদ হয় নাই, এবং কাহার অধীনস্থও হয় নাই। সুতরাং রাজস্ব আমার সম্পূর্ণ অধীনেই আছে। অতএব যদি রাজপুত্র স্বীকার হয়েন, তবে আমি আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে অনঙ্গপুরের রাজাসনে উপবেশন করাই।”

রাজকুমারের মুখ গম্ভীর হইল, কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “সময়ে বিবেচনা করা যাবে।” যোগমায়া প্রস্থান করিল।

যোগমায়াকে অন্যান্য প্রশ্ন করিতেও রাজকুমারের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যোগমায়াকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, সুতরাং লজ্জা ক্রমে অনেক বিষয় বলিতে সাহসী হইলেন না। যোগমায়া গমন করিলে পর বিজয় সিংহ একাকী কক্ষ মধ্যে পদ চালনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নানাবিধ চিন্তাতে তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চক্ষে নিদ্রার লেশ মাত্র নাই, সুতরাং অনিদ্রার যন্ত্রণা চক্ষুতে অনুভূত হইতে লাগিল। চক্ষু মর্দ্দন করিতে২ জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তিমাকার ধারণ করিল। এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইল। গবাক্ষের নিকট যাইয়া পশ্চিমাকাশের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, রাত্রি অবসন্না প্রায়। গ্রীষ্মকালের রাত্রি কথা কহিতে২ যায়। শশধর প্রেয়সীকে বিগত যৌবনা দেখিয়াই হউক, অথবা প্রভাত হইলে লোকেরা তাঁহাকে প্রেয়সীর সহিত শয়ন দেখিলে, গঞ্জনা প্রদান করিবে, সেই ভয়েই হউক, অন্ধকার থাকিতে২ বিষণ্ণ বদনে দ্রুতপদে বন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অস্তাচলাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। শশীর পলায়ন দৃষ্টে বিহঙ্গগণ চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে কহিতে লাগিল, “ভয় কি ? এই দশা সকলেরই।” শশী এই কথা শুনিতে পাইয়াই যেন এক একবার মেঘ মধ্যে লজ্জায় লুক্কায়িত হইতে লাগি-

লেন। দুষ্ট লোক, ভিক্ষুক, উত্তমর্ণ, কসাই পাড়ার কুকুর কিছুতেই ছাড়ে না। পলায়নের চেষ্টা করিলেও পশ্চাৎ ধাবিত হয়। শশীর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়া উঠিল। ক্রমেই বিকট কোলাহল এবং তৎ সঙ্গে জনরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রাজকুমার নিশাবসান দৃষ্টে ধীরে২ কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং চিন্তা করিতে২ অন্যমনস্ক ভাবে একবারে সিংহ দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার সম্যক চেতনা হইল। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন স্থানে স্থানে প্রহরীগণ সুসজ্জিত হইয়া নীরবে পুরী রক্ষা করিতেছে। বিজয় সিংহ নিকটস্থিত একটী রক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুবর রায়ের কোন্ গৃহ?" প্রহরী শঙ্কিত চিত্তে ত্রস্তভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। রাজকুমার গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া নগর পালকে ডাকিতে লাগিলেন।

সিংহদ্বার দিয়া রাজ বাটী প্রবেশ করিতে হইলে, রায়জির গৃহ দক্ষিণদিকে থাকে। কক্ষটী ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র দ্বার ও বায়ু এবং আলো আসিবার জন্য পূর্ব্বদিকে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষছিল। গবাক্ষের নিকট রায়জির শয়নের জন্য একখানি দড়ীর ছাওয়া খাটিয়া ছিল। পশ্চিম দিকে এক খানি তক্তাপোশ, তদুপরি এক খানি কম্বল বিস্তৃত ছিল। ভিত্তির সঙ্গে এক গাছি দড়ি খাটান, তদুপরি রায়জির গেরুয়া বসন একখানি, একটী কাল রঙ্গের জামা ও পাকড়ীর লাল কাপড় এবং একখানা বনাত, ভিত্তির অন্য দিকে ঢাল ও এক খানি তরবার ঝুলান, তাহার নিকটে গোটাকত বর্ষা ও তৈলাক্ত একগাছি বাঁশের লাটী। রায়জির প্রত্যুষে উঠা অভ্যাস, একারণ রাত্রি থাকিতে জাগিয়া একটী পিত্তলের ফরসীতে দম্ কসিতেছিলেন। হঠাৎ দ্বারে আঘাত হইল, রায়জি কাষ্ঠের অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ খড়ম পায়ে দিয়া খকখক করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার গৃহপ্রবেশ করিলেন।

রায়জি হঠাৎ রাজকুমারকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে খাটিয়ার উপর বনাত খানি পাড়িয়া দিলেন। রাজকুমার উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরসিংহ মিশ্র কোথায়?" পাঠক মহাশয়ের সহিত মরা গলিতে যে উড়িষ্যা বাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তার নাম নর সিংহ মিশ্র। রায়জি কর জোড়ে উত্তর করিল, "গত রাত্রে তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।" রাজপুত্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি কোথায়?" "শুইয়া আছে," ইহা বলিয়া রায়জি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

বন্দীটী দস্যু, নর সিংহের অর্থাপহারকদিগের সঙ্গী, রাজপুত্র যাহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছিলেন, এ সেই দস্যু। বিজয় সিংহ রাজবাটী প্রবেশের সময় রায়জির হস্তে নর সিংহ মিশ্র ও বন্দীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। বন্দী তক্তাপোশের উপরে তখন পর্য্যন্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। রাজকুমারের আদেশ মতে রায়জি বন্দীর নিদ্রা ভঙ্গ করিল। বন্দী গাত্রোত্থান করিয়া রাজকুমারকে সম্মুখে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। রাজকুমার কহিলেন, "তোমার বন্দী হইবারই ইচ্ছা, না মুক্তি পাইবার বাসনা?"

বন্দী কর জোড়ে কহিল, "এ পৃথিবীতে স্বাধীনতা কে না প্রার্থনা করে?"

বিজয়। তবে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথার্থ উত্তর দাও।

বন্দী। অনুমতি হউক।

বিজয়। তোমরা কি কারণে মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া দস্যুতা অবলম্বন পূর্ব্বক বন মধ্যে বিচরণ কর?

বন্দী। গদ গদ স্বরে কহিল, "অদৃষ্ট লিপি।" রাজপুত্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমাদের নায়ক কে?

বন্দী। তাহাত কালই বলিয়াছি।

বিজয়। জগৎ মোহন?

বন্দী। হাঁ—

তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

বিজয়। তিনি কি জন্য দস্যুতা অবলম্বন করেন?

বন্দী। রাজ্যের অনিষ্ট সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য।

বিজয়। এরূপ উদ্দেশ্য কিসে হলো?

বন্দী। মহারাজের উপর ক্রোধ।

বিজয় সিংহের মনে ক্ষীরোদ বাসিনীর কথা উদয় হইল, বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তিনি এখন আছেন কোথায়?"

বন্দী কহিল, "থাকিবার নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ব্রহ্মদরণে থাকেন।"

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদরণ্য অতি প্রসিদ্ধ বন ছিল। বীর ঘরের পূর্ব্ব দিয়া যে নদী আসিয়া মহানদের সহিত সোহন পুরের নিকট মিলিত হইয়াছে, এই বন সেই সঙ্গম স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এস্থানে নানা জাতীয় উচ্চতরু ও ভয়ানক হিংস্র জন্তু বসতি করাতে লোকের অগম্য স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। দস্যুগণ ব্যতীত অন্য কেহই এ বনে আশ্রয় গ্রহণ করিত না। পথিকের পক্ষে পূর্ব্বে এই স্থান সমূহ সঙ্কটময় ছিল, কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য রাজ শাসনের অধীনে সে সকল বন ক্ষুদ্র২ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

বিজয় সিংহ কহিলেন, "তোমাদিগের বাড়ী কোথায়?"

বন্দী। আমাদের সকলের বাড়ী এক স্থানে নহে। আমার বাড়ী সোহাগ পুরের নিকট।

রাজকুমার মনেং চিন্তা করিলেন যে, যদি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে জগৎমোহনের অনুসন্ধান সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "যদি তোমাকে মুক্তি দেওয়া যায়, তবে কালে তোমার দ্বারা কোন উপকার হইলে তুমি কি তাহা সম্পাদন করিবে?"

বন্দী কহিল, "এমন কৃতঘ্ন পৃথিবীতে কে আছে যে উপকারী জনের প্রত্যুপকার করে না?"

বিজয়। কিসে তাহা বিশ্বাস হইবে?

বন্দী। ধনুর্ব্বাণ ব্যতীত আমাদের প্রিয়তম পদার্থ কিছুই নাই। আমি তাহার উপর শপথ করিয়া বলিতে পারি, প্রাণান্তে এ উপকার বিস্মৃত হইব না।

রাজকুমার বীর পুরুষ। যোদ্ধাদিগের অস্ত্র শস্ত্রের উপর যাদৃশ স্নেহ ও ভক্তি, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। অরণ্যচারী দিগের পক্ষে ধনুর্ব্বাণ যে কি বস্তু, তাহার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তোমাকে কোথায় পাওয়া যাইবে?" "সোহন পুরের নিকটস্থিত কোন এক স্থানে পরীক্ষিত সরদার বলিয়া

লেই লোকে বলিয়া দিবে, আমার বাসস্থান কোথায়।"

"সরদার" শব্দটী শ্রবণ করিয়া রাজ কুমার জানিতে পারিলেন যে অরণ্যে দলেং যে সকল দস্যু বিচরণ করে, তাহাদের প্রত্যেক দলেরই এক একজন অধ্যক্ষ থাকে, এব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন, কহিলেন "তবে কি জন্য এদেশে আসিয়াছিলে?"

পরীক্ষিত কহিল, "জগৎমোহনের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য।"

বিজয় সিংহ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রয়োজন সাধন হলো না, জগৎ সিংহ যদি দণ্ড দেন?"

পরীক্ষিত সদর্পে বলিল, "এ দাস অদ্য হইতে আর জগৎমোহনের ভৃত্য নহে, মুক্তি দাতার ভৃত্য।" বিজয় সিংহের মুখ প্রফুল্ল হইল, কহিলেন, "রায়জি, তুমি পরীক্ষিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া মুক্তি দাও।" ইহা কহিয়া তিনি রাজ সদনে বিদায় হইবার জন্য অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

——

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আশা মরীচিকা।

ভাল বাসার অদর্শন কি কষ্টকর! এক দিন এক বৎসরের ন্যায় বোধ হয়। বিজয় সিংহ একদিন মাত্র চন্দ্রপুর ছাড়া। কিন্তু শৈলবালার পক্ষে সুদীর্ঘ কাল বোধ হইতেছে, তিনি একান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছেন? তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সরোজিনী হাসিতেং গৃহ প্রবেশ করিলেন, এবং শৈলবালার তদবস্থা অবলোকন করিয়া ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন,

"কোথা হতে শিখেছিলে এত ভাবতে ধনী!
যৌবনেতে এত চিন্তা কিসের তরে শুনি?"

শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,

"বিধাতা দিয়েছে মোরে ভাবতে নিশি দিনে।
যার ভাবনা সেই বুঝে পর কি তা জানে?"

সরোজিনী পুনর্ব্বার হাসিতেং কহিলেন,

"অবাক্ কল্লে কথার ছলে আচ্ছা মেয়ে বটে।
নইলে কি কপাল গুণে মনোমত ঘটে?"

শৈলবালাও ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন,

"চোক উল্‌টে কথা বল কথা যে বড় চোকা।
গৃহির মন বোঝ বুঝ দ্বারে মেরে টোকা?"

সরোজিনী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,

"নিজ মন দিয়ে পরে যে জন দেখে পরে।
কে এমন আছে বল কথায় আটবে তারে?"

শৈলবালা হাসিতেং বলিলেন,

"মরুক যাক মজার কথা শোন মন দিয়ে।
বর পাত্র স্থির হয়েছে আমার হবে বিয়ে।"

সরোজিনী ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,

"দেখলি ভাই রাজপুত্রের কথা সত্য কি না?
আমি ত তা আগেই জানি তুই ত বলিস না।"

শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,

"ওগো সে আশাতে ছাই দাও সে গুড়েতে বালি
মিলেছে এক কোনা হাঁড়ি শিরে চুণ কালি।"

সরোজিনী সবিস্ময়ে কহিলেন, "বলছ কি? আমি ত তোমার কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছি না। সত্য করে বল, কি হইয়াছে।"

শৈলবালা কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র সারণ গড়ে গমন করিলে পর আমার যেন মনের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল, ভাবিলাম, বিমাতা না জানি—"এই কথাটী বলিতে না বলিতে সরোজিনী হাসিতেং ব্যঙ্গের

সহিত বলিলেন, "যা হউক, যে নিজের শরীরের যত্ন জানে না, তার আবার অন্যের জন্য মমতা!" সরোজিনীর এই কথাতে শৈলবালা লজ্জিত হইলেন, আর কথাটী বলিলেন না। সরোজিনী বুঝিতে পারিলেন; হাসি সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ তার পর?" শৈলবালা কম্পিত, ক্রোধের সহিত বলিলেন, "আমি তাহা বলিব না।" সরোজিনী শৈলবালার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমার মাথার দিব্য যদি না বল।" শৈববালা আর অভিমান করিয়া থাকিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "তাই আমি হেমলতাকে সারণ গড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। হেমলতা সেখান হইতে শুনিয়া আসিল যে রাণীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎমোহনের সহিত প্রথমতঃ অনঙ্গপুরের রাজ কন্যা ক্ষীরোদ বাসিনীর পরিণয়ের কথা উত্থাপিত হয়। কিন্তু ক্ষীরোদ বাসিনী তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, রাজ্ঞী আমার সহিত পরিণয় হইবার কথা উত্থাপন করেন এবং সে সম্বন্ধে পিতাকে অনেক বলেন, শুনিলাম, তিনি স্বীকারও হইয়াছেন।"

সরোজিনী কহিলেন, "ক্ষীরোদ বাসিনীর অস্বীকার হইবার কারণ কি?"

শৈলবালা। সোনা পাইলে আর কে রাং চায়? জগৎমোহনের চরিত্র ত সকলেই জানে?

সরোজিনী। তাহার আবার বিয়ে হবে! রাণীর ভাই তাইতে কেহ কিছু বলে না। অন্য হলে এত দিন কারাগারে যাইত। তার পরে এখন মহারাজার মত কি?

শৈলবালা। তাঁর ইচ্ছে যে রাজ পুত্রকে ক্ষীরোদ বাসিনীর সহিত বিবাহ দিয়া অনঙ্গপুরের রাজ-সিংহাসনে বসান।

সরোজিনী। রাজপুত্রের কি অভিপ্রায়?

শৈলবালা। তা তিনিই জানেন।

সরোজিনী। বেস, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হবে।

শৈলবালা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন কেন?

সরোজিনী। অবশ্য বলিবেন। তিনি তোমাকে যে ভাল বাসেন।

শৈলবালা। কিসে জানিলে তিনি আমাকে ভাল বাসেন?

সরোজিনী। ভাল বাসেন কি না, এক দিন হাতে হাতে ধরে দেখিয়ে দিব। ইহা কহিয়া তিনি হাসিতে২ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। শৈলবালা শয়ন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কি আমার?

শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা হইল না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শয্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন; একবার ভাবেন, একবার দ্বার পানে দৃষ্টি করেন। দ্বার অর্দ্ধ মুক্ত। কার জন্য দ্বার মুক্ত? কে আসিবে? কে তাঁহার চিত্তের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে? কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন? বিজয় সিংহ সারণ গড়ে, রাজচরণে বিদায় হইতেছেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

প্রণয়ীদের মন তাড়িত বার্ত্তাবহের তার সদৃশ। একদিকে নড়িলেই অন্যদিক কাঁপিয়া উঠে। শৈলবালা বিরহ কাতরা, এ কথা ত বিজয় সিংহকে কেহ বলিয়া দেয় নাই। অথচ তিনি উৎকণ্ঠা-

কুলিত চিত্তে ত্বরায় অশ্বারোহণে গমন করিলেন। কি অশ্ব চালনায় পটু! দেখিতেং মুহূর্ত্তেক মধ্যে চন্দ্রপুরে উপনীত হইলেন। যে পথে অন্য লোক যাইলে এক প্রহর হয়, যে পথে পূর্ব্বদিবস বিজয় সিংহের প্রায় ৪।৬ দণ্ড লাগিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ১ দণ্ডের পথও হইল না। কে এত শীঘ্র আনিল? প্রণয়ের এঞ্জিন!

বিজয় সিংহ মন্ত্রী ভবনে উপনীত হইয়া প্রথমেই শৈলবালার অন্বেষণ করিলেন, এক পদ দুই পদ, এদিক ওদিক করিতেং শৈলবালার শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন। দেখেন শৈলবালা শয্যায় শায়িত। স্ফাটিক শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে। শৈলবালাকে ডাকিলেন, উত্তর নাই। পুনর্ব্বার ডাকিলেন, আবার সেই রূপ নিস্তব্ধ। দীপ হস্তে করিয়া শয্যার নিকট গমন করিয়া, দেখেন শৈলবালা সজল নয়নে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে স্থির ভাবে অবস্থিত। এতদ্দৃষ্টে যে তাঁহার মনোমধ্যে কত দুশ্চিন্তার উদয় হইল, তাহা কে বলিতে পারে?

পাঠক, তুমি যদি সেই প্রসন্নবদন কমল লোচনাকে অকস্মাৎ বিবর্ণ মুখী ও বাষ্পাকুলিত নয়না দেখিতে, তাহা হইলে চিন্তিত হইতে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, হইতে না। কারণ তুমি বিজয় সিংহের মত কোন দিন বিপদে পড় নাই। কিন্তু বিজয় সিংহ বিমাতার ষড়চক্রে গৃহচ্যুত হইয়া দুঃখের সাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। শৈলবালাই সেই সাগরের মধ্যে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। তিনি যাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং যাঁহার যত্ন অবলম্বন করিয়া দিন দিন কুলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহাকে এরূপ শোক সন্তপ্ত দেখিয়া যে বিচলিত-চিত্ত হইবেন, এ কোন্ বিচিত্র কথা? বিজয় সিংহের মন যদিও চিন্তাযুক্ত হইয়াছিল, তথাচ তিনি সেভাব গোপন করিয়া শুষ্ক হাসির সহিত বলিলেন,

"কোন চিন্তা রাহু আসি, গ্রাসিছে ও মুখশশী,
কেন বা মলিন দেখি ও বিধু বদন।
কোন দুঃখে দুঃখী হয়ে রয়েছ শূন্যতে চেয়ে,
সত্য বল কি কারণে করিছ রোদন?"

শৈলবালার শুষ্ক হৃদয়ে অমৃত বারি সিঞ্চিত হইল, মৃদুস্বরে কহিলেন,

"যে কারণে কাঁদে প্রাণ বলিব কাহায়?
কি ফল হইবে বল বলিলে তোমায়?
আজ আছে কাল নাই কিছু হেন জনে।
বলিব না কোন কথা ভাবিয়াছি মনে॥"

রাজপুত্র দেখিলেন, তিনিই এ ঘটনার মূল। অতএব শৈলবালাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিবার মানসে ধীরে ধীরে পর্য্যাঙ্কের উপর উপবেশন করিলেন। শৈলবালা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব। রাজকুমার এক দৃষ্টে শৈলবালার বদন শশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টি প্রগাঢ় প্রণয় ব্যঞ্জক। শৈলবালা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা। অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কুমার কহিলেন, "বদন শশী হঠাৎ চিন্তা মেঘাবৃত হইবার কারণ কি?" শৈলবালা সে প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহারাজ কি জন্য স্মরণ করিয়াছিলেন?"

বিজয়। মাতুল মহাশয় পলাতকা, তাঁকে অনুসন্ধান করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিবার জন্যই আমাকে রাজ সদনে আহ্বান করিয়াছিলেন।

শৈলবালা। তবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে এত শৈথিল্য কেন ? '

বিজয়। আমি অদ্যই তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিতাম। কিন্তু তোমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, একবার দেখা না করিয়া কোথাও যাইব না, তজ্জন্যই অদ্য এখানে আসিলাম। কল্য প্রত্যুষে গমন করিব।

শৈলবালা। ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আবার কবে ফিরিবে ?"

বিজয়। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই সঙ্গে লইয়া ফিরিব। কত দিন হয়, তাহা বলা যায় না।

শৈলবালা। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বিজয় সিংহ কহিলেন, "আবার কাঁদিতেছ যে ?" "না।' এই কথাটী অতি মৃদুস্বরে শৈলবালা বলিয়া অশ্রু সম্বরণ করিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিলেন, যে "তোমাকে অনঙ্গ পুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল ?"

বিজয়। কাহার নিকট শ্রবণ করিলে ?

শৈলবালা। আমার পিতা বলিলেন। সত্য কি ?

বিজয়। হাঁ, সত্য।

শৈলবালা। অভিষেকের দিন স্থির হইয়াছে ?

বিজয়। না। বোধ হয়, আমি প্রত্যাগমন করিলেই হবে ?

"রাজনন্দিনী—" বলিতে২ শৈলবালার কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। আর বলিতে পারিলেন না। অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "কেন, আমি রাজা হইলে তুমি কি সুখী হও না ?"

শৈলবালা। হব না কেন ?

বিজয়। তবে যে—— ?

শৈলবালা। তবে কি ?

কুমার নিস্তব্ধ হইলেন। ভাবিলেন, স্ত্রীলোক স্বভাবত লজ্জাশীলা। বুক ফাটিয়া যায়, তবু মুখ ফোটে না। বিশেষতঃ শৈলবালা। এ কিছুতেই মনের কথা বলিবে না, অগত্যা কহিলেন, "কেন, সে ত তোমারই ভাল।" শৈলবালা সোৎসুখ চিত্তে বলিলেন, "আমার কিসের ভাল ?" কুমার শৈলবালার দিকে ঈষৎ হেলায়মান হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি পাটরাণী হবে।"

ছিন্ন ভিন্ন মেঘ যুক্ত আকাশে চন্দ্র যেমন এক মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া কিছু ক্ষণ আপন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য মেঘ মধ্যে লুক্কায়িত হয়, শৈলবালার মুখ চন্দ্রমাও সেই রূপ হইল। এতক্ষণ তাঁহার মুখ মণ্ডল চিন্তা মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মেঘাবৃত শশীর ন্যায় নীলিমা ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু যখন বিজয় সিংহ বলিলেন, "তুমি পাটরাণী হবে," তখন তাঁহার মুখজ্যোতিঃ মেঘ বিনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরে যখন ক্ষীরোদ বাসিনীর কথা মনে হইল, তখন পুনর্ব্বার তাঁহার বদন শশী চিন্তা মেঘে আচ্ছাদিত হইল। বিজয় সিংহ শৈলবালাকে পুনর্ব্বার চিন্তা সাগরে ভাসমানা দেখিয়া কহিলেন, "আবার কেন চিন্তাযুক্তা ?" শৈলবালা গদ গদ ভাবে অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন,——"আমার কথাটী বিজয় সিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল, কহিলেন, "মন্দিরের উপরিস্থিত লৌহ শলাকা যেমন প্রবল বাত্যাতেও সম-

ভাবে অটল থাকে, আমার এবাক্যও সেই রূপ জানিবা।” শৈলবালার মুখ প্রফুল্ল হইলে “রাত্রি অধিক হইয়াছে, এক্ষণে নিদ্রা যাও,” বলিয়া কুমার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। শৈলবালা ইষ্ট দেবকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুখের চিন্তা! বীর পুরুষেরা ত মিথ্যা বলে না। রাজপুত্র কি আপনার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবেন? শৈলবালা বালিকা, যৌবনে কেবল পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তৎকাল সুলভ আশা তাঁহাকে কথঞ্চিত আশ্বস্ত করিল। এখনও নৈরাশ্য যে কাহাকে বলে, ভাল করিয়া জানেন না। সহজেই রাজপুত্রের কথা বিশ্বাস করিলেন।

অনেক দুশ্চিন্তার পরে হঠাৎ আশ্বস্ত হওয়ায় সে রাত্রি নিদ্রা হইল না।

মসলাবাঁধা কাগজ।

৩য় সংখ্যা।

কেতকী এবং নদী।

দেখ, কেমন সুন্দর উদ্যান! সুন্দর সুকুমার কুসুম গুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের কি রমনীয়তা সম্পাদন করিয়াছে!—বনদেবী যেন কুসুমালঙ্কার পরিয়াছেন। কুসুমসৌরভ, সংসারশিক্ষাশূন্য শিশুর পবিত্র মুখে বিশ্বপাতার নামের ন্যায় দশ দিক আমোদিত করিতেছে—প্রাণ জুড়াইতেছে। কুসুম গুলি এখনও নিশাশিশিরসিক্ত হইয়া রহিয়াছে, কাহার বিরহে যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। সেই শিশিরস্নাত কুসুমের উপর বালসূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়াছে—কুসুম গুলি যেন কাঁদিতে২ হাসিতেছে। চিরবিরহিণী যেমন অকস্মাৎ পতিসমাগমে কাঁদিতে২ হাসে—দূর দেশে প্রিয়তমার হস্ত লিখিত প্রেম-লিপি পাইলে বিরহির হৃদয় যেমন কাঁদিতে২ হাসে—বয়ঃসন্ধিসময়ে নবোঢ়া বালা বিবাহের কথা শুনিলে যেমন কাঁদিতে২ হাসে—লজ্জাময়ী বঙ্গবালা স্বামীর অশ্লীল রসিকতায় যেমন কাঁদিতে২ হাসে, তেমনি হাসিতেছে। উদ্যান পার্শ্বে সংকীর্ণায়তন, মন্দগতি, স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট নদী মৃদু২ কাঁদিয়া যেন কোন নষ্ট ধনের অন্বেষণে যাইতেছে। সেই অনন্ত শোভার মধ্যে একটী পাখী বিদ্যাধরিবাঞ্ছিত স্বরলহরী বিস্তার করিয়া, যেন অনন্ত মাধুর্য্যের রচয়িতার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আর মন্দ পবন কি বলিয়া২ ঘুরিতেছে।

শুন দেখি কেমন সুন্দর গীত; মনুষ্যে সহস্র বর্ষ যত্ন করিয়াও কি অমন পারে? মনুষ্যে গায়—কিন্তু সে কি এমন? মনুষ্যের গীতে গায়ককে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কাছে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহার গান সর্ব্বদা শুনিতে ইচ্ছা করে, অবস্থাবিশেষে এবং স্থানবিশেষে হয়ত নাচিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু তবু কি এমন? এই স্থানে পাখীর ওই গীত শুনিয়া আপনাকে পৃথিবী হইতে বিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, বাল্যকালের সেই সকল সুখ স্বপ্ন মনে হয়, প্রণয়িনীর সমাধিগত মুখ মনে পড়ে, আদিম অসভ্যাবস্থা ফিরিয়া চাহিতে

ইচ্ছা করে ; বনে, উপবনে, নদীতীরে, গিরি সংকটে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় ; কুসুমকোমল শয্যা অপেক্ষা বৃক্ষতল সুখসেব্য বলিয়া বোধ হয় ; মনের বেগে সেই খানে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ইচ্ছা করে ; ওই স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট মৃদুকল্লোলিনী নদীতে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় ; পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় ; প্রাণ কাহার জন্য যেন এ মাংসাস্থিনির্ম্মিত পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইতে ব্যাকুল হয়।

মনুষ্য হৃদয়ে এ ব্যাকুলতা কেন ? এ কি পরলোকের অস্তিত্বের পরিচয় ? শেষে যেখানে যাইতে হইবে, সে কি এমনি স্থান ? এই স্থান সেই স্থানের মতন বলিয়া কি এই স্থান দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পিঞ্জর ভাঙ্গিতে চাহে ? হবে। মহাশ্বেতার আশ্রম দেখিয়া কপিঞ্জলের মনও এমনি হইয়াছিল। তোমার কি হয় না ?—এখানে একবার দাঁড়াইলে তোমার প্রাণ কি অমন করিয়া কাঁদে না ? যদি না কাঁদে, তবে তুমি অভাবুক—তোমার রসবোধ নাই। তুমি ফিরিয়া যাও—যাও আপনার সঞ্চিত ধন গণনা করিয়া জীবন কাটাও—তোমার ন্যায় পশুর জন্য এ স্থান নহে। তোমার পাদস্পর্শে এ দেবতাদুর্ল্লভ স্থান আর কলঙ্কিত করিও না।

এই উদ্যান সংসারের অনুরূপ। ওই দেখ, কেতকী কুসুম আপন সৌরভে সমস্ত উদ্যানকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। মূঢ়মতি একটী দ্বিরেফ, সৌরভে মাতিয়া, কুসুমের মধুর লোভে উহাতে পড়িবার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে। ওই কেতকী কুসুম ভোগ,—আর ঐ ভ্রমর মনুষ্য।

কেতকী প্রফুল্ল হইয়া সমস্ত উদ্যানকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। দূর হইতে সে সৌরভ দেববাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু নিকটে গেলে সে তীব্র, উগ্র সৌরভে নাসিকা জ্বলিয়া যায়। অমন সুগন্ধ কুসুম, কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা, উহার তলে সর্প—সকলে জানেন কেতকীবৃক্ষ আশীবিষের আশ্রয়। অমন কুসুম, কিন্তু বিধাতার কি নিষ্ঠুরতা ! কেবল কন্টক পরিপূর্ণ।

ভ্রমর দূরে হইতে সুগন্ধমুগ্ধ, মধু লোভপ্রমত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া উহাতে পড়িল। মধু কি পাইল না ? পাইল বৈ কি, কিন্তু তাহা বড় তীব্র, বড় উগ্র—তাহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক। মিষ্টত্ব আছে, কিন্তু সে মিষ্টতায় রসনা জ্বলিয়া যায়। ভ্রমর পড়িল—কন্টকে পাখা ছিঁড়িয়া গেল—যাতনায় ছট ফট করিতে লাগিল—সে শব্দে বৃক্ষমূলস্থ সর্পও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যাতনায়, ভয়ে ভ্রমর পলাইতে চাহে, কিন্তু কুসুমরজঃ চক্ষে লাগিয়া দৃষ্টিশূন্য করিয়াছে—অন্ধ ভ্রমর পথ দেখিতে পায় না। উড়িয়া যায়, কিন্তু যাইতে পারে না—আবার ঘুরিয়া তাহাতেই পড়ে—ছিন্ন পাখা আরও ছিঁড়িয়া যায়। আবার উড়িয়া যায়—আবার আর একটী কেতকীবৃক্ষে পড়িয়া ছট ফট করে। যাতনায় এবং সেই তীব্র সৌরভে ভ্রমর উন্মত্ত হইয়াছে, যতই পলাইবার চেষ্টা করে, ততই ঘুরিয়া২ তাহাতেই পড়ে। যখন আর উপায় নাই, তখন বুঝে যে দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে।

মনুষ্য ভোগ্যবস্তু দেখিয়া উন্মত্ত হয়, উন্মত্ত হইয়া তাহাতে গিয়া পড়ে। দূরে হইতে তাহাকে দূরত্ববশাৎ রমণীয়

বলিয়া বোধ হয়—দূরে সে সৌরভ সুখ-সেব্য বলিয়া বোধ হয়; মনুষ্য ব্যাকুল হইয়া তাহাতে গিয়া পড়ে। তাহার মধু আস্বাদন করিয়া বুঝে যে, এ মিষ্টতায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক। যখন সে উগ্রতেজে মস্তক ঘুরিয়া উঠে, যখন কন্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, যখন মূলস্থ সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠে, যখন যাতনায় বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তখন আপনার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করে। পলাইতে চাহে, কিন্তু আর পলাইবার শক্তি কোথা? পাখা ছিঁড়িয়াছে—রজোক্ষেপে চক্ষু অন্ধ হইয়াছে—কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য; উড়িতে চাহে, কিন্তু ঘুরিয়া আসিয়া আবার পড়ে।

ভ্রমরের কি নিষ্কৃতি নাই? আছে, কিন্তু যতক্ষণ উড়িবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ নহে, ততক্ষণ ঘুরিয়া২ কন্টকে পড়ে। যনং কন্টকাঘাতে পাখা একেবারে ছিন্ন, যখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, যখন আর উড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তখন কন্টক হইতে মুক্ত হইয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়া থাকে। কন্টক-হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু তখন মুক্ত হওয়া না হওয়া সমান—তখন মুক্তির অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল। তখন সেই ক্ষণসুখপ্রদ চিরদুঃখদায়ী বৃক্ষমূলে পড়িয়া কমলের মধুর জন্য পুনঃ২ করিয়া কাঁদে।

মনুষ্যেরও ভোগাশক্ত হইলে আর নিষ্কৃতি দেখা যায় না। যত দিন উড়িয়া পলাইবার ক্ষমতা থাকে, যত দিন উড়িয়া গেলে সুখের সম্ভাবনা থাকে, ততদিন কেহ পলাইতে পারে না। যখন আর সামর্থ্য নাই, ভোগাশক্তি শরীরকে এবং মানসকে দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে, তখন মনুষ্য এ কন্টকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পায়, কিন্তু সেই ভূত সুখ দ্রব্যের নিকট পড়িয়া ছট্ ফট্ করে। তুমি চিরকাল আমোদ আহ্লাদে জীবন নষ্ট করিয়া এখন বয়স গুণে এবং ভোগাশক্তিসম্ভূত রোগে শোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ—আর সে আমোদে অধিকার নাই—এখন নিবৃত্ত হও না কেন? যুবকদিগের সঙ্গে মিসিয়া উপহাসাস্পদ হও কেন? তাহারা, সুখে হোক দুঃখে হোক্, উপরে কুসুমের মধু লুটিতেছে, তুমি নিম্নে পড়িয়া কাঁদ কেন? বৃক্ষতলে পড়িয়াছ; কুসুমের অল্প২ সৌরভ আসিয়া নাসিকায় লাগিতেছে, তাহাতে দুঃখ বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। দুঃখের দিনে গত সুখের কথা মনে করার ন্যায় দুঃখ আর সংসারে কি আছে? তবে কেন? কেন—আর কি পলাইবার সামর্থ্য আছে? পলাইবার ক্ষমতা নাই, অন্য ফুলের মধু আস্বাদন করিবার অধিকার নাই, এখন একং বার কমলের স্নিগ্ধ সৌরভ এবং কন্টকবিহীন শোভা মনে পড়ে। এখন আর উড়িবার শক্তি নাই, এখন এক২বার সেই বাল্যকালের সরলতা এবং পবিত্র আমোদের জন্য চক্ষে জল আসে—এখন এক২বার নবীন যৌবন সময়ের সেই প্রণয়শীলতা, ক্রীড়াশীলতা, নিঃস্বার্থপরতা, স্ফূর্ত্তি, বিশ্বব্যাপিনী আশা মনে পড়ে, মনে পড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে—সেই যে সহজ প্রফুল্লচিত্তে পুনঃ২ শব্দ করিয়া কমলের মুখচুম্বন করিতে, তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে, কিন্তু সময়ে ইহা বুঝিলে কেমন সুখে জীবন যাইত?

কিন্তু সময়ে কেহ বুঝে না। ঐ বৃক্ষমূলে ছিন্নপক্ষ ভ্রমর পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, স্বচক্ষে দেখিতেছে, তবুত নির্ব্বোধ ভ্রমরের দল আসিয়া

ঐ কণ্টকে পড়িতেছে। উহারা কি বুঝিবে না? বুঝিবে—উহারাও আবার যখন ঐ বৃক্ষমূলে অমনি পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিবে, তখন বুঝিবে।

ছি, ছি ছি! ঠেকিলে অনেকেই শিখে, কিন্তু দেখিয়া কেহ শিখিতে চাহে না। চক্ষের উপর ভোগাশক্ত লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়াছি, তবু আবার তাহাতেই পড়িতেছি। যখন গত দিনের কথা মনে করিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে, তখন আমরাও বুঝিব। হায়, সময়ে যাহা শিখি, তাহা বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রাহ্য করিলে কবে শিখিতে পারিতাম এবং দুঃখের ভার কত লঘু হইত!

কিন্তু ঐ দেখ, একটী ভ্রমর কেতকীর মধু পান করিয়া অক্ষত উড়িয়া গেল। গেল, কিন্তু অমন ভ্রমরের সংখ্যা কত—অমন অদৃষ্ট কয়টীর? সংসারের সুখে মাতিয়া প্রাণ ধরিয়া তাহাতে জলাঞ্জলী দিতে পারে, প্রাণ ধরিয়া প্রিয়বস্তু বিসর্জ্জন দিতে পারে, এমন চিত্তজয়ী মহাত্মা সংসারে কয় জন? প্রাচীন আর্য্য নৃপতিগণ পারিতেন, প্রাচীন মুনিরা পারিতেন, সিলা পারিয়াছিলেন, পঞ্চম চার্লস্ পারিয়াছিলেন, প্রেমময়ী হিন্দুবালা পারে, কিন্তু এমন কয় জন পারে? ঐশ্বর্য্য সম্পদ, প্রেম, রমণী, সকলই এই কণ্টকাবৃত কুসুম। সকলেই তাহাতে পড়ে—অনেকেই অকর্ম্মণ্য হইয়া ছট্ ফট্ করে—কেহ কাঁটা ফুটিয়া মরে—কেহ সর্প দংশনে মরে—দুই একটী উড়িয়াও যায়। দুর্য্যোধন, রাবণ, জুলিয়স্ সিজর, আন্তনি, হানিবল ও নেপোলিয়ন সর্পদংশনে মরিলেন; লর্ড বাইরণ, সাফো, পাণ্ডু কাঁটা ফুটিয়া মরিলেন—পঞ্চম চার্লস্ উড়িয়া গেলেন—বিধবা বঙ্গাঙ্গনা উড়িয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে এ সুখ হয় না—তাহারা যাতনায় ছট্‌ফট্ করে। সহস্র২ লোকে ছট্ ফট্ করিতেছে আমরা দেখিতেছি—দুদিন পরে আমরাও করিব, লোকে দেখিবে।

উদ্যানের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রকায় স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট নদী কলহ করিয়া, বঙ্গ বিধবার ন্যায় আপন মনে মৃদু২ কাঁদিয়া২ কোথায় যাইতেছে। ঐটী রমণী। ঐ নদী পার্শ্ব দিয়া বহিতেছে বলিয়া উদ্যান এমন শীতল এবং তৃপ্তিকর। সংসার যে এত সুন্দর, এমন শীতল বলিয়া বোধ হয়, তাহার মূলাধার রমণী। মাতার স্নেহ, ভগিনীর আদর, গৃহলক্ষ্মীর প্রেম না থাকিলে সংসারে কি সুখ থাকিত? এ সকল যাহার আছে, তাহার পক্ষে সংসারে এবং স্বর্গে প্রভেদ কি? এ সংসারে ভালবাসাই এক মাত্র সুখের মূল—দ্বিতীয় মূল নাই। রমণীর ন্যায় ভালবাসিতে কে জানে? পুরুষের প্রণয় স্বার্থ-পর; রমণীই কেবল আপনা ভুলিয়া ভালবাসিতে পারে, রমণীই কেবল পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে—রমণী কেবল যাহাকে মন দেয়, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, রমণী কেবল হাসিতে২ জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিতে পারে।

তুমি পথিক, ভ্রমণ করিয়া২ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ—এক বার ঐ নদীতীরে বসিয়া স্বচ্ছসলিলকণবাহী সমীরণ সেবা কর, সকল শ্রম দূর হইবে। তুমি পুরুষ, সংসার যাতনায় বড় ক্লিষ্ট হইয়াছ, এক বার রমণীর শীতল স্নেহবারিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর, সকল দুঃখের শেষ হইবে।

তাকাইয়া দেখ, নদীজল মধ্যে এক খানি প্রস্তর পড়িয়া আছে, তাহা নিম্নের বালুকারাশি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। রমণী-হৃদয়ের কোথায় কি আছে, তাকাইয়া দেখ, সব দেখিতে পাইবে। রমণী কিছুই লুকাইতে জানে না—লোকে বলে মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না।

যাহা কিছু নদীর নিকটে থাকে, তাহারই প্রতিবিম্ব নদী বহন করে। সূর্য্যদেব জগৎ আলো করিয়া উদয় হইলে, নদী তাহার রূপ বুকে বহন করে—সে জগৎ-প্রফুল্লকর রূপে মাতিয়া নাচিতে থাকে। সূর্য্য অস্ত যায়—জগতের মুখ ম্লান হয়—নদীও ক্ষণেকের জন্য নৃত্য রাখিয়া শোক বসন পরিধান করে। তাহার পর চন্দ্রোদয় হইলে, নদী সে কমনীয় শীতল রূপে গলিয়া গিয়া তাহাও হৃদয়ে বহন করে—সে বিমল শোভা দেখিয়া কখন হাসে, কখন কাঁদে। চন্দ্র অস্ত যায়। নদী আবার দুঃখচিহ্ন ধারণ করে। কিন্তু তাহার মধ্যে এক বার যদি সমীরণ কাণের গোড়ায় প্রেমের গীত গাইল, তবেই আবার সে নদী হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহৃত হইতে থাকে। পশুটী পর্য্যন্ত নিকটে আসিলে তাহার প্রতিবিম্বও সে জলে দেখা যায়। আর তুমি,—তুমি, যে কূলে বসিয়া এই সকল দেখিতেছ তোমারও মুখের ছায়া সে জলে পড়িয়াছে। দেখ, আপনার মুখও দেখিতে পাইবে। যাহা কিছু নদীর কাছে আসে, তাহাই নদীহৃদয়ে স্থান পায়; যাহা কিছু সম্মুখে উপস্থিত, রমণী তাহারই অনুরাগিণী—মৃত্তিকার পুতুলটি হইতে দেবকান্ত যুবা পর্য্যন্ত সকলই রমণীর আদরের ধন। কিন্তু কতক্ষণ?—যতক্ষণ নিকটে উপস্থিত।

সকলেই জানেন, নদী নিম্নপ্রবণ। ক্ষণেকের জন্য যাহারই রূপে উল্লাসিত হোক, যাহারই রূপ হৃদয়ে করুক, গতি কিন্তু নিম্নদিকে। নদী, চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া আমোদিত হয়, কিন্তু তাহার মহিমা বুঝিতে পারে না—রমণীরও তাই।

তুমি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছ—নিদাঘ সন্তাপে শরীর জ্বলিতেছে, কিন্তু সাবধান, যেন সাহস করিয়া জলে পড়িও না—পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইবে। ঐ তীরে বসিয়া শীতল হও। পরে না হয়, এক অঞ্জলি জল পান করিও—ইচ্ছা হয়, অথবা নিতান্ত না থাকিতে পার, অল্প জলে স্নান করিয়া লইও; কিন্তু দেখো যেন অধিক জলে যাইও না, ডুবিয়া মরিবে—সাবধান, অধিক ক্ষণ জলে থাকিও না, কুম্ভীরে গ্রাস করিবে। তুমি সংসারে সংসার তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছ, রমণীর স্নেহে হৃদয় শীতল কর। রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া আপন হৃদয় দমন করিতে না পার, তবে না হয়, ভালবাসিও। ভাল বাসিও, কিন্তু সাবধান, যেন মজিও না—সাবধান, পাছে কুম্ভীরে গ্রাস করে, অথবা ডুবিয়া মর।

নদীতীরে বসিয়া শীতল হও—মন্দ২ প্রভাতসমীরণ তোমার কর্ণমূলে কি বলিতেছে, শ্রবণ কর, কিন্তু বায়ু যদি প্রবল বহে, তবে আর তথায় থাকিও না—পলাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। রমণীর স্নেহে শীতল হও। সে স্নেহের মন্দগীতিরূপ মন্দ সমীরণে জুড়াও, কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়লালসারূপ প্রবল বায়ু সে নদীকে

আকুল করিবে, তখন তাহার নিকটে থাকিও না—প্রাণ লইয়া পলায়ন করো। যদি থাক, তবে সৌভাগ্য-ক্রমে বাঁচিলে বাঁচিতে পার, কিন্তু হাবুডুবু খাইতে হইবে।

কল্লোলিনী কলকল রবে প্রধাবিত হইতেছে। রসিক চূড়ামণি পবন সময় বুঝিয়া তীরে তীরে প্রেমসংগীত গাইতেছে। প্রেমময়ী সেই প্রেমোচ্ছ্বাস, প্রেমভিক্ষা পরিপূর্ণ সংগীতের তালে২ নাচিতেছে—যমুনার কূলে শ্যামের বাঁশি শুনিয়া প্রেমকাঙ্গালিনী বৃন্দাবন-বিলাসিনীদিগের হৃদয় যেমন নাচিত, স্বামীর হৃদয় সংস্পর্শে প্রেমময়ী বঙ্গসতীর হৃদয় যেমন নাচে, আহারের কথায়—আমরা ব্রাহ্মণ—আমাদের হৃদয় যেমন নাচে, তেমনি নাচিতেছে। ক্রীড়াশীলা, পরিহাসরতা প্রতিধ্বনি, প্রভঞ্জনের পাগলামি দেখিয়া, নদীর রঙ্গ দেখিয়া, সেই গীতের অনুকরণ করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। বৃক্ষরাজি নিস্তব্ধ হইয়া সে সংগীত শুনিতেছে—মধ্যে২ আবার মস্তক নোয়াইয়া তাল দিতেছে। অদূরে একটা লঘুচেতা পাখী, লঘুচেতা বাঙ্গালী বাবুর ন্যায় খেমটা গাইতেছে। কি শোভা! নদীর কি শীতল শোভায় সমস্ত বনভূমি শীতল হইয়াছে—সে শোভা যে দেখে, তাহারই নয়ন জুড়ায়। আবার যখন বায়ু গর্জ্জন করিয়া উঠে, তখন? তখন নদীও সে মৃদু গীত রাখিয়া গর্জ্জন করে—নদী হৃদয়ে বিশাল তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়। জল আন্দোলিত হইয়া, অধঃস্থ পঙ্করাশিতে কলুষিত, পঙ্কিল, অসেব্য, অস্পৃশ্য হইয়া উঠে। তখন সে নদীতে কিছুরই প্রতিবিম্ব পড়ে না। নদীতরঙ্গ ঘনং কুলে প্রতিহত হয়—ইচ্ছা, কূল ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছা গমন করে। তীরমৃত্তিকা গলিয়া পড়িয়া জল আরও কলুষিত হয়। যে কেহ নিকটে যায়, সেই ডুবিয়া মরে। পবিত্র দাম্পত্য প্রণয় এবং পাপ তৃষ্ণায় এই প্রভেদ। প্রণয় এই মন্দ প্রভাত সমীরণ, পাপ তৃষ্ণা এই দুর্দ্দম প্রবল বায়ু। প্রণয়েও রমণী চঞ্চলা হয়, হৃদয় নৃত্য করে, কিন্তু সে আনন্দাতিশয্যের চঞ্চলতা, সে সুখাতিশয্যের নৃত্য। পাপতৃষ্ণায় চঞ্চলা হয়, হৃদয় নৃত্য করে, কিন্তু সে হৃদয়দাহের চঞ্চলতা, সে যাতনার নৃত্য। প্রণয়ের পবিত্র ভাবে হৃদয় শীতল হয়, পাপতৃষ্ণাপবনে যখন চিত্তবৃত্তি সকল বিলোড়িত হয়, তখন রমণী অস্পৃশ্য হইয়া উঠে।

কিন্তু ছি, নদীর কি অবিচার! মেঘ, নদীর জীবন—মেঘের প্রেরিত জলে নদী পুষ্ট হয়—নদীর প্রেরিত বারিকণায় মেঘ জীবন ধারণ করে, সেই মেঘ আকাশে দেখা দিলে নদীর মুখ ম্লান হয় কেন—মুখে কালিমা পড়ে কেন? পরস্পর পরস্পরের জীবন—এমন সুখের সম্বন্ধ যাহার সঙ্গে, তাহাকে দেখিলে মুখ ম্লান কেন?

আবার সূর্য্যদেবের অগ্নি তুল্য রশ্মি নদীহৃদয়ে পড়িয়া জলশোষণ করে, তবু নদী তাহাকে দেখিয়া হাসে, প্রফুল্ল হয়—উজ্জ্বল অলঙ্কার গুলি পরিয়া নাচিতে থাকে। যে রমণী হৃদয়ে বসিয়া হৃদয় শোণিত শোষণ করে, যাহার অনুরাগে শরীর শীর্ণ হয়, রমণী তাহাকে পাইলে হাসে, প্রফুল্ল হয়, কিন্তু যাহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ, তাহার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা কেন? অবৈধ প্রণয়ের গভীরতা যদি সকল সময়ে পবিত্র প্রণয়ে

থাকিত, তাহা হইলে সংসার কি সুখের স্থান হইত? সংসারে দেখিতে পাই, অনেক রমণী উপপতির জন্য সকল তুচ্ছ করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ অনুরাগ ভর্ত্তাকে দিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাও না কেন? সুসভ্য বিদেশিনীগণ, তোমরা বঙ্গসতীর কাছে প্রেমশিক্ষা কর না কেন?

মেঘ উদয় হইয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে—নদী ম্লানমুখী হয়। এ কি মেঘকে দেখিয়া, না সূর্য্যকে হারাইয়া? যাহাই হোক, নদীর ম্লান মুখ দেখিলে, মেঘ কত অশ্রুবর্ষণ করে—নদীহৃদয় তাহাতে প্লাবিত হইয়া যায়—কই তবুত নদী হাসে না?

নদী কোথায় যাইতেছে—যাক্, বেগরোধ করিবার চেষ্টা করিও না। ও বেগ রোধ হইবার নহে। রমণীর স্নেহের মুখে বাঁধ বাঁধিও না—বেগরোধ করিতে পারিবে না, কেবল লাভে হইতে এই হইবে, যে বেগ এক পথে যাইতেছিল, তাহাই পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।

নদীর কি সীমা আছে? নদী জলের কি পরিমাণ আছে? না। সীমা, গোড়ায় থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু মুখে নাই। নাই তাহাতেই ভারত-চন্দ্র * গাইয়াছিলেন—

"রমনীর কাছে, সীমাবদ্ধ সব আছে,
কেবল স্নেহের সীমা কেহ কভু পায় না"।

অনন্ত আকাশে অসংখ্য সৌরমণ্ডল।

আজি কালি প্রায় সকলেই অবগত আছেন, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তাহার ব্যাস ৮০০০ আট হাজার মাইলের কিছু কম, এবং তাহা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ক্রমান্বয়ে অধিক দূরে অবস্থিত গ্রহনামধারী কতিপয় পৃথিবীর মধ্যে একটী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির আবার পারিষর্দ্ স্বরূপ এক বা ততোধিক সংখ্যক উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র আছে। সূর্য্য সম্বলিত এই গ্রহ, উপগ্রহ এবং অপেক্ষাকৃত অসুপরিচিত ধূমকেতু নামধারী কতকগুলি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, এই সকলের সাধারণ নাম সৌরজগৎ। এই সৌরজগৎ আকাশের কতটুকু স্থান ব্যাপিয়া আছে?—যদি আমরা ধূমকেতুদিগের কক্ষা না ধরিয়া, শুদ্ধ য়ুরেন্স গ্রহের কক্ষাকে সৌরজগতের বহিঃসীমা বলিয়া গণ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সৌর জগৎ মণ্ডলে আকাশের যে অংশটুকু অধিকার করিয়া আছে, তাহার ব্যাসের পরিমাণ ৩৬০০০০০০০০ মাইলের কম নহে। এরূপ স্থান হইলে কত বড় হয়, তাহা সহজে মনে ধারণা করিয়া উঠা ভার; কেননা পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, অথবা আমরা এমন কোন পরিমিত দ্রব্য

*সুবিজ্ঞ সমালোচক এবং বিশুদ্ধরুচি পাঠক, আপনারা রাগ করিবেন না। আমিও জানি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠ করিলে নরকে যাইতে হয়, তাঁহার নাম মুখে আনিলে রসনা অপবিত্র হয়, "অবিনশ্বর আত্মা" কলুষিত হয়, কিন্তু এই মূর্খ লেখক তাঁহাকে 'ভারত-চন্দ্র' বলিয়াছেন। ইহাঁর কথা অবশ্য অগ্রাহ্য—আমরা বুঝি ভাল। আমি যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত করিলাম—মতামতের আমি দায়ী নহি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। চঃ

ব্যবহার করি না, যাহার সঙ্গে তুলনা করিলে উক্তরূপ স্থানের পরিমাণ হৃদ্গত হইতে পারে।—কিন্তু বোধ হয়, এরূপ গণনায় তাহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে,—কোন রেলওয়ে গাড়ীর বেগ যদি ঘন্টায় ৩০ মাইল করিয়া হয়, তবে এরূপ এক খানি গাড়ী দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত গমন করিলে, "এখান হইতে চন্দ্র লোকে গমন করিতে যত সময় লাগে, উক্ত ব্যাস পরিমিত স্থান গমন করিতে হইলে তাহার তদপেক্ষা ১৩৬৯৭ বৎসরেরও অধিক সময় লাগিবে; অথবা উক্ত গাড়ী ঐরূপ বেগে এখান হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যাইলে যত সময় লাগে, তদপেক্ষা তাহার ৩৪ গুণ অধিক সময় লাগিবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মতে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। তাহা হইলে যদি পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি উক্ত বেগ যুক্ত কোন রেলওয়ে গাড়ী সেই ব্যাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে আরম্ভ করিত, তবে প্রতিনিয়ত গমন করিয়াও অদ্যাবধি তাহার অর্দ্ধেক পথও অতিক্রম করিতে পারিত না!! এরূপ প্রশস্ত স্থানাবরোধক সৌর জগতের অন্তর্ভূত সূর্য্য চন্দ্র, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহদিগকে আপাততঃ পরস্পর অতিশয় দূরস্থিত বলিয়া জ্ঞান হয় বটে; কিন্তু যখন আমরা তাহাদের দূরত্বের সহিত আকাশের অন্যান্য সৌর জগতের দূরত্ব তুলনা করিয়া দেখি, তখন এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহদিগকে অনন্ত আকাশ সমুদ্রে অতি ঘন সন্নিবিষ্ট কয়েকটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র বিবেচনা হয়; কেননা অন্যান্য সৌর জগতের যে নক্ষত্রটী আমাদের অতি নিকট, তাহারই দূরত্ব এত অধিক যে য়ুরেন্স গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাহার সহিত উক্ত নক্ষত্রের দূরত্বের সংখ্যাদ্বারা তুলনা করিয়া উঠাই কঠিন!!

রজনী কালে সুনির্ম্মল গগন তলে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিলে কত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়। জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে উক্ত তারকাপুঞ্জের প্রত্যেকে এক একটী সূর্য্য; এবং যেমন আমাদের সূর্য্য একটী সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ, সেই রূপ তাহারাও এক একটী সৌর জগতের কেন্দ্র। সেই সৌর জগৎ সমূহ সাধারণতঃ আমাদের সৌর জগতের ন্যায়। উক্ত নক্ষত্রগণের আকার এবং আয়তন আমাদের সূর্য্যের ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা বড়; কিন্তু অধিকতর দূরত্ব হেতু তাহাদিগকে তত ক্ষুদ্র এবং অল্প তেজোময় দেখা যায়। কোন কোন গ্রহতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিত তাহাদের দুই একটীর দূরত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই দূরত্ব নক্ষত্র গণের দৃষ্ট এবং প্রকৃত স্থানের অন্তর (parallax) গণনা করিয়া ঠিক করিতে হয়; অর্থাৎ পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে একবার নিরীক্ষণ করিলে, সে সময়ে পৃথিবী যেখানে থাকে, সেখান হইতে পৃথিবী যখন তাহার কক্ষার ঠিক বিপরীত দিকে আইসে, তখন আবার তাহাদিগকে দেখিলে, উক্ত নক্ষত্রগণ যতটুকু স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই স্থানের পরিমাণ দ্বারা তাহাদের দূরত্ব গণনা করা যাইতে পারে। এমতে জানা যায়, পৃথিবী তাহার কক্ষার এক দিক্ হইতে ঠিক বিপরীত দিকে আসিলে, যদি কোন নক্ষত্র এক

সেকেণ্ড মাত্র স্থান পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের ২০০,০০০ গুণের কম নহে; অর্থাৎ তাহার দূরত্ব প্রায় ১৯,২০০০০০০০০০০০ মাইল। কিন্তু আমরা যে অতিশয় উজ্জ্বল সিরিয়ুস্ (sirius) নামক নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাকে এক সেকেণ্ড পরিমিত স্থানও ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় না; সুতরাং তাহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, তাহার দূরত্ব উক্ত পরিমাণের দুরত্ব অপেক্ষাও অধিক। এক্ষণে বিবেচনা কর, আমাদের সৌর জগতের বিস্তার কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য। এই বিষয় ক্ষণিক চিন্তা করিলে বিস্ময় এত অধিক হয়, যে তাহা অন্তরে ধরে না। তখন মনোমধ্যে সহজেই এই বোধ হয়, যে বুঝি মনুষ্যের জ্ঞানের চিরকাল অতীত থাকিবে বলিয়াই, তাহারা এত অধিক দূরে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য দুরাকাংক্ষ, একারণ তাহাদের দূরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে, এবং স্থল বিশেষে কৃত-কার্য্যও হইয়াছে। অধ্যাপক হেণ্ডরসন (Henderson) centaur নামক নক্ষত্র পুঞ্জের অন্তর্গত আল্ফা নামা নক্ষ-ত্রের ভ্রষ্ট স্থানের পরিমাণ গণনা করিয়া ঠিক করিয়াছেন; তাহা ঠিক এক সেকেণ্ড সুতরাং তাহাকে নানা কারণে আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হইলেও, তাহা ১৯০০০০০০০০০০০০ মাইলের ন্যূন দূরে অবস্থিত নহে। পণ্ডিতবর বেসেল (Bessel) ৬১ সিগ্নি (Cygni) নামক নক্ষত্র সম্বন্ধে কহিয়াছেন, যে উক্ত নক্ষত্রকে এক সেকণ্ডের এক শত ভাগের ৩১ ভাগ সময়ে" সেকেণ্ড পরিমিত স্থান ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়; সুতরাং উক্ত নক্ষত্র, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূরে, তদপেক্ষা প্রায় ৬,৭০,০০০ গুণ অধিক দূরে অবস্থিত। এই ত দুই একটী অতি নিকটস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব! তবে যে অ-সংখ্য নক্ষত্র মালা নেত্রগোচর হয়, তাহারাই বা কত দূরে, এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্বই বা কত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; তাহা হইলে আকাশের কতদূর বিস্তৃতি, তাহা যৎকিঞ্চিৎ অনু-মান করিতে পারিবে, কিন্তু কখনই মনে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিবে না। মানবমনঃ এত ক্ষুদ্র—আকাশ এত বি-স্তৃত, অসীম।

আবার এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যাই বা কত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। সহজ চক্ষে প্রায় সচরাচর তিন সহস্র নক্ষত্র দেখা যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ সাহায্যে উক্ত সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়, এবং যন্ত্র যত উৎকৃষ্ট হয়, নক্ষত্র সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। সার উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে তাঁহার দূরবী-ক্ষণের দৃষ্টি ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ৫০ সহস্র নক্ষত্র চলিয়া গিয়াছে। আমরা রজনীকালে আকাশমণ্ডলে যে শুভ্রবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় এক চিহ্ন দেখিতে পাই, (যাহাকে আমাদের দেশের ইতর লোকেরা জাঙ্গাল বলিয়া থাকে) তাহা বাস্তবিক কি? বিজ্ঞবর প্রাচীন পণ্ডিত দিমক্রাইটস (Democritus) প্রথম সন্দেহ করেন, যে উক্ত ছায়াপথ কেবল কতক গুলি অতি সূক্ষ্ম তারকাস্তবক মাত্র। অধুনা তাঁহার সেই কথা নব্য জ্যোতি-র্ব্বিদগণের দূরবীক্ষন সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ হইতেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় হর্শেল আকাশকে

তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ, এই সত্যলব্ধ হইয়াছে, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ সৌরজগতের অংশস্বরূপ,সেই রূপ উক্ত সৌর জগন্মণ্ডল সমূহ আবার নাক্ষত্রিক জগতের (astral systems) অংশ স্বরূপ। যেমন পৃথিবী আদি গ্রহগণ তাহাদের উপগ্রহগণের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তেমনই এই অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডল গ্রহগণকে সঙ্গে লইয়া অপর কোন বৃহৎ নক্ষত্র মণ্ডলের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে; অথবা পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধানুসারে এই অসীম আকাশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এরূপ নাক্ষত্রিকজগৎ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলির আকার প্রকারাদি কতক নিশ্চিত হইয়াছে। আমাদের সৌর জগৎ যে নাক্ষত্রিক জগতের অন্তর্গত, জ্যোতির্ব্বিদেরা কহেন, তাহার আকার বিস্তৃত আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায় (Oblong flattish form); তাহার মধ্যস্থল শূন্য, এবং তাহার এক দিকের প্রান্ত দুই ভাগে বিভক্ত। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে কতকগুলি তারকা ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে; তাহারাই ছায়াপথ আকারে দেখা যায়। আমাদের সূর্য্য উক্ত ক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে ভিতর দিকে অবস্থিত; একারণ আমরা সেই দিকের ছায়াপথ অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই, এবং উত্তর দিকে তত ভাল দেখিতে পাই না, কেননা সে দিকে মধ্যস্থলের শূন্যের মধ্য দিয়া দেখিতে হয়, সুতরাং দৃষ্টি ভাল খোলে না। শুদ্ধ এই নয়। আমরা সহজ চক্ষে নক্ষত্র মণ্ডল সকলকে স্থির ও নিশ্চল দেখিতে পাই; কিন্তু এই জগতে সকলই চঞ্চল, সকলই অস্থির—গতিবিহীন কিছুই নাই। কিন্তু সেই চাঞ্চল্য, সেই অস্থৈর্য্য, সেই গতি, মানবীয় কার্য্যের ন্যায় বিশৃঙ্খল এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নহে। সকলই নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী। অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই, যে আমাদের সৌর জগৎ যেং নিয়মের বশীভূত, সেই সমস্ত নিয়মই এই অনন্ত বিশ্বকে আয়ত্তে রাখিয়া চালাইতেছে!—আমাদের সৌর জগতের গতির নিয়ম যেরূপ ঠিক, সেই সকল নিয়মানুসারেই উক্ত নভোমণ্ডল-পর্য্যটক জ্যোতিষ্কগণ গমন করিতেছে। আমাদের সূর্য্যের গতি যে রূপ, উক্ত সুদূরস্থিত নক্ষত্রগণকেও সেই রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতে দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা এ রূপ কারণ সকল লক্ষ্য করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে শুদ্ধ আমাদের সূর্য্য নহে, আমাদের সূর্য্য যে নাক্ষত্রিক জগতের অন্তর্গত, সেই জগতের অন্যান্য সূর্য্যও উক্ত ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে 'পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে' প্রতিনিয়ত ঘুলিতেং গমন করিতেছে এবং অঙ্গুরীয়াকৃতি উক্ত চক্রের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ যাইতেছে ও আসিতেছে। এই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তনের ব্যত্যয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক মসোত্তি (Mossotti) বলেন, এই সৌরমণ্ডল সকল ঘুরিতে ঘুরিতে, তাহাদের গতি এবং যে যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানের অনুসারে, কেহ বা বৃত্তের কোন দিকে অধিক দূরে, কেহ বা অল্প দূরে গিয়া পড়ে, সেই সকল সূর্য্য বৃত্ত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গিয়া পড়ে এবং

একটী। যদি ইহা হয়, তবে এমত এক সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে আমরা আমাদের নাক্ষত্রিক জগতের এরূপ এক-স্থলে উপস্থিত হইব, যেখানে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আরও ঘনসন্নিবিষ্ট; সুতরাং সে সময়ে আমাদের রজনীকাল আরও অধিক সংখ্যক নক্ষত্রালোকে সমুজ্জ্বল হইবে !!—কিন্তু সেই সময় আসিবার পূর্ব্বে যে কত অসংখ্য যুগ অতীত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? ১৭৮৩ অব্দে সার উইলিয়ম হর্শেল নক্ষত্রগণের সম্বন্ধে আমাদের সৌরজগতের আর এক গতির কথা প্রথম প্রকাশ করেন। তৎপরে M. Argelander নামক পণ্ডিতের গণনা দ্বারা সেই মত দৃঢ় এবং প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে সূর্য্য হর্কিউলিস্ (Hercules) নামক নক্ষত্র পুঞ্জের অন্তর্গত এক স্থানের দিকে নিয়ত গমন করিতেছে, সুতরাং উহা ক্রমশঃ উপরোক্ত আয়ত ক্ষেত্রের ভিতরকার সীমা হইতে আরও অভ্যন্তরভাগে গমন করিতেছে। এরূপ গতির কারণ কি ? ইহারা নিয়ত ধাবমান হইয়া কোথা যাইতেছে ? এ সকল ব্যাপার বুদ্ধির অগম্য। এ রূপ অনন্ত আকাশে এ প্রকার গতি, বহু বহু কাল অতীত না হইলে, এমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, যে তাহা আমাদের মত এই ক্ষুদ্র গ্রহবাসী লোকের জ্ঞানগোচর হইতে পারে, এবং ঘটিলেও সে পরিবর্ত্তনের সাধারণ প্রকৃতি বুঝিয়া উঠা কঠিন।

অনন্ত আকাশে অসংখ্য নাক্ষত্রিক জগতের অস্তিত্বের আশাতীত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা যখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে যেটী আমাদের জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সেটীও এত দূরে অবস্থিত, যে তাহাই মনে ধারণা করিয়া উঠা যায় না; তখন যে ঐ অনন্তস্থানের মধ্যে আরও কতশত জগন্মণ্ডল থাকিবে, তাহাই আদৌ অসম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ তাহার চাক্ষুষ প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। আমাদের সৌরজগতের যে পার্শ্বে নক্ষত্র পুঞ্জ অতীব বিরল, প্রথমে হর্শেল সেই ভাগে তাঁহার সুন্দর যন্ত্র হেলাইয়া যখন তাহার দ্বারা দর্শনশক্তির প্রবলতা সাধন করিলেন, তখন আকাশের সেই ভাগে অদৃষ্ট পূর্ব্ব নক্ষত্র মণ্ডল সমূহ দেখিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে আমাদের সৌরজগতের ন্যায় জগন্মণ্ডল শূন্যমার্গে ঝুলিতেছে, দুলিতেছে জ্বলিতেছে! প্রথমে সে গুলিন গগনতলে সংলগ্ন অতিক্ষীনকায় বিরল সন্নিবিষ্ট বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহার বোধ হইয়াছিল; কিন্তু দূরবীক্ষণের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে, দেখিতে পাইলেন, সে গুলি মেঘ খণ্ড নহে; উজ্জ্বল তারকামণ্ডল; কিন্তু এত ক্ষুদ্র যে বোধ হইল যেন গগন তলে কে কতগুলে অতিসূক্ষ্ম হীরকচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, নিশাগমনে তাহাই জ্বলিতেছে! তখন তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যে বুঝিতে বোধ হয় সক্ষম হইবে না।—তৎপরে যখন Earl of Rosse তাঁহার সুবিখ্যাত দূরবীক্ষণ সহযোগে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাহাদের আরও আশ্চর্য্য২ আকৃতি দেখা গেল। হর্শেল যাহাদিগকে জালের ন্যায় অস্পষ্ট দে-

খিয়াছিলেন, তাহা তখন স্পষ্ট নক্ষত্র-পুঞ্জ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আবার যেগুলি হর্শেলের দৃষ্টিতে গোলাকার বোধ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি আর সে আকারে দেখা না গিয়া রসের দূরীক্ষণদ্বারা দেখাতে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট দেখা গেল; কেহ বা যুগ্ম বলিয়া জানা গেল, কোনটী বা তিনটীতে একটী হইয়া রহিয়াছে দেখা গেল!—এই সকল জগন্মণ্ডলের রচনা প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার; তাহাদের দূরত্বও তদ্রূপ; অর্থাৎ সকল-গুলি সমদূরবর্ত্তী নহে।—হর্শেল যত-গুলিকে দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে, তাহার দূরত্ব, তিনি গণনা করিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন, যে সিরিয়ুস (sirius) নক্ষত্রের দূরত্ব, (২০০০০০০০০০০০০০ মাইল) অপেক্ষা ৩৫ সহস্র গুণ অধিক! এই নক্ষত্রপুঞ্জ আমাদের সৌরজগৎ হইতে যত দূরে, আবার তাহাদের মধ্যেও পরস্পরের দূরত্ব যে তাদৃশ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব জ্যোতি-র্ব্বিদেরা যে অনুমান করেন যে, এমনও নক্ষত্র থাকিতে পারে, যাহার আলোক পৃথিবীতে সৃষ্টি অবধি অদ্যাপি আসিয়া পহুঁছে নাই, (আলোক প্রতিমিনিটে ১২০০০০০০ মাইল গমন করে,) তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশে কত নক্ষত্র কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।—তাহা কি ধারণা করিয়া উঠা যায়?

বিশ্ব কীদৃশ অদ্ভুত—আকাশ কতদূর ব্যাপ্ত—কত সহস্র সৌরজগতই তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে,—হে অতীব ক্ষুদ্র ধরণীতল বাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য! একবার মনে ভাবিয়া দেখ, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনন্ত আকাশ—এত অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীই বা কোথা হইতে আসিল, তাহাও একবার ভাব, ভাবিয়া অবাক্ হও!!

গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা।

"সুখে থাক, সুখে রাখ।"

এই বিশ্বমধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাহার গৌরবের ইয়ত্তা করা আমাদের সাধ্য নহে। আমরা অতি সামান্য সামান্য পদার্থের অসাধারণ ক্ষমতা ও উন্নতি প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হই ও প্রশংসা করি। একটী ক্ষুদ্র বট বৃক্ষের বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া ক্রমে তাহা প্রকাণ্ড কাণ্ডাদি সমন্বিত বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, আশ্চর্য্য হইয়া তাহা দেখি; এবং যে ক্ষুদ্রতম বীজের অন্তর্গত স্বাভাবিক ঐন্দ্রজালিক শক্তির দ্বারা এই আশ্চর্য্য কাণ্ড সম্পন্ন হয়, তাহা ভাবিয়া আরও বিস্মিত হই। কিন্তু মনু-ষ্যের যে স্বাভাবিক শক্তির বলে সেই বৃক্ষজনক বীজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বীজহইতে এই অত্যদ্ভুত মানবদেহ উৎপন্ন হয়, এবং বর্দ্ধিত হইয়া এতাদৃশ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে তাহা কল্পনাও নির্ণয় করিতে অক্ষমা, যখন আমরা সেই শক্তি বিষয় চিন্তা করি, তখন আর আমাদের আশ্চর্য্য অন্তরে ধরে না—অসীম হইয়া উঠে। প্রকৃতির কৃতির মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বা-পেক্ষা ক্ষমতাশালী ও উন্নত—তাহার

ক্ষমতার এবং উন্নতির সহিত আর কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। যে জিনিসটীর গঠনে যত অধিক সময় ও যত্ন আবশ্যক করে, যাহার গঠন প্রণালীতে যত অসীম নৈপুণ্য ও বিচিত্র উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, যদি সেই জিনিসটীর তত অধিক মূল্য হয়, তবে মনুষ্য একটী অমূল্য সৃষ্টি। কত শত সহস্র বৎসরের ক্রমশঃ উন্নতির পর, জীবনী শক্তি এই অদ্ভুত আকারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয় ও অগনীয়—অনন্তকাল উন্নতির পরিমাণ ব্যতিরেকে এরূপ সৃষ্টি কখনই সম্ভব নহে।

মনুষ্যের অসীম শক্তির বিষয় কিরূপে সহজে বোধগম্য হইতে পারে? আমাদের এক একটী ক্ষুদ্র অংশে এরূপ কত জীবনী এবং নাশিনী শক্তি সকল নিহিত রহিয়াছে, যে তাহাদের একটী মাত্র ভাল রূপ বুঝিতে হইলে এক জন মনুষ্যের আজীবন পরমায়ুঃ আবশ্যক করে। সেই শক্তি সমূহের সমষ্টি মনুষ্য,—এত পূর্ণ, এত উন্নত, এবং এত বিবিধ গুণসম্পন্ন, যে তাহাকে (মনুষ্যকে) একটী ক্ষুদ্র বিশ্বস্বরূপ বলা যাইতে পারে। মনুষ্য স্বয়ং জাগ্রত স্বভাব অথবা মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি স্বরূপ,—স্বভাব যেন আপনাকে আপনি জানিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। মনুষ্যকে দেখিলে বোধ হয়, যে প্রাণী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উন্নতি তাহাতেই সম্পাদিত হইয়াছে,—তাহার পর আর কিছুই উন্নতি হইতে পারে না ও হইবার আবশ্যকও করে না। কারণ যে ক্ষমতা ইতর প্রাণীদের নাই, মনুষ্যে তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। মনুষ্য অসীম উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম। প্রকৃতির অনেক গুপ্ত কথা মনুষ্য তাহার গর্ভ হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে, এবং কালে মনুষ্য যে তাহার (প্রকৃতির) সমস্ত গোপনীয় কথা গুলি জানিতে পারিবে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তখন প্রকৃতি তাহার এরূপ বশীভূতা হইবে, যে মনুষ্য তাহাকে ন্যায়সঙ্গত যে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তখনই তাহার সরল উত্তর পাইবে। মনুষ্যের পর আর উন্নতি সম্ভবে না, এ কথা বলিবার আর এক কারণ এই, যে এ পর্য্যন্ত যত ইতর প্রাণী জন্মিয়াছে, ও জন্মিয়াছিল, তাহাদের গঠন প্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, যে তাহারা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্য আকারের অনুরূপ হইবারই চেষ্টা করিয়াছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে এ কথা বলিয়া দিতেছে।

অতএব যদি আমরা মনুষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবে না দেখিয়া, আধিদৈহিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব, যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এই বিশ্ব মধ্যে অনন্যসাধারণ ও অনন্যপ্রাপ্য; এবং তিনি স্বভাবের শোভনতম বিকাশস্বরূপ। যদি আকাশের উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্রাবলী এবং পার্থিব চতুষ্পার্শ্বস্থ সামান্য সামান্য বস্তুগণকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, তবে তৎ সমুদায় অপেক্ষা স্বাভাবিক গৌরব গুণে আমাদের বুদ্ধির সম্যক্ অগম্য মনুষ্যকে দেখিয়া, কত অধিকতর আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইতে হয়!! যে ব্যক্তি মনুষ্যের অনির্ব্বচনীয় গৌরব মনোমধ্যে বিশেষ রূপে ধারণা করিতে পারে না, সে কখন স্বভাবের গৌরবও সম্যক্ অবগতি করিতে সক্ষম হয় না; কেননা মনুষ্য

স্বভাবের অবতার স্বরূপ। আমরা কল্পনা বলে যত কেন উন্নত জীবের সৃষ্টি করি না, তথাপি সেই কল্পিত বস্তু, ধর্ম্মে বল, ক্ষমতায় বল, গৌরবে বল, যে কিছুতে বল, কখনই বিশ্বের যাবতীয় শক্তির আধারস্বরূপ মনুষ্যের তুল্য হইবে না। তাহার সাক্ষীস্বরূপ ঈশ্বরের ভাবনা করিয়া দেখ,—মনুষ্য ঈশ্বরকে ভাবনা করিতে গিয়া, আপনারই প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ফেলিয়াছে, এবং তাহাতে আপনার যে সমস্ত গুণ, তাহাই আরোপিত করিয়া প্রকারান্তরে আপনাকেই পূজা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। এখানেও মনুষ্য আপনা ছাড়া অন্য জীবের কল্পনা করিতে শক্ত হয় নাই।

যখন আমরা এ রূপ মনুষ্যের অবস্থা কি রূপ, তাহা চিন্তা করি, এবং তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে যে সকল অতীব বিস্ময়কর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখি; বিজ্ঞানে, শিল্পে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং মানসিক এ প্রাকৃতিক রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, যে রূপে বিবিধ স্বাভাবিক পদার্থকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য স্বায়ত্ত করিয়াছেন, এবং তিনি সৃষ্টির অপর সকল প্রাণীর উপর আপনার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছেন;—যখন এই সমুদায় একবার চিন্তা করিয়া দেখি, তখন সহজেই মনোমধ্যে এই আশা সঞ্চারিত হয়, যে ব্যক্তি এরূপ করিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই স্বকীয় গৌরব উত্তম রূপ অবগত আছেন, এবং তাঁহার ইতর প্রাণীসুলভ কোন রূপ সামান্য অভাবই নাই—তিনি স্বীয় উন্নতিগুণে সকল অভাবের অতীত, এবং তাঁহার জীবন সদা সুখ সচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে অবশ্যই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যখন আমরা মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখনই আমাদের সেই মহতী আশা চূর্ণ হইয়া যায়,—আমরা সেই রূপ সুখ সচ্ছন্দতা দেখিতে পাই না। তখন দেখিতে পাই, এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও, মনুষ্য এ রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এবং চতুর্দ্দিকে এরূপ মহানিষ্টক আপদ বিপদে পরিবেষ্টিত, যে তাহাতে এরূপ গৌরবশীল জীবের অন্তর হইতে গৌরব ও স্বাধীনতাকে যে কোথায় তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই। তাহাতে তাঁহাকে এ রূপ সাহসহীন ও হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, যে তিনি সৌভাগ্যের প্রভু না হইয়া তাহার দাস হইয়া পড়িয়াছেন।

মনুষ্য স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা বলে যত কিছু রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা প্রধান রত্ন। অপরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরের অনুগ্রহের প্রত্যাশী না হইয়া স্বীয় ক্ষমতাতে আপনার ভরণ পোষণ ও রক্ষণ করাই সকল প্রকার সুখের মূল, ইহা হইতেই গৌরব ও স্বাধীনতা সুখের বোধের উদ্রেক হইয়া থাকে, আর তাহাতেই বাস্তবিক সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করা যায়। সমাজ সংস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই রূপ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আপনার ভরণ পোষণের জন্য পরভাগ্যোপজীবী না হইয়া স্বয়ং সেই গুলি উপার্জ্জন করিবে, এবং এই অত্যাবশ্যক বিষয় নির্ব্বাহ কালে, কোন ব্যক্তির প্রতিবেশীকে যত টুকু পরিমাণে তাহার অধীন হইতে হইবে,

সে ব্যক্তিও ততটুকু পরিমাণে তাহার প্রতিবেশীর অধীন হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষত্ব রূপ সমাজের প্রধান বন্ধন অবশ্যই থাকিবে; কেননা তাহা ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। কিন্তু এই সাহায্য সাপেক্ষত্ব উভয়ের অথবা পরস্পরের মধ্যে যতদূর সমভাবে থাকিতে পারে, ততদূর থাকিবে, অর্থাৎ তুমি তোমার উপকারের জন্য যতটুকু আমার সাহায্য লইবে, আমাকেও ততটুকু পরিমাণে সাহায্য করিবে, অথবা অন্যবিধ কোন উপায়ে সেই সাহায্যের প্রতিদান করিবে। এ রূপ না হইলে কখনই সুখসচ্ছন্দভাজনক স্বাধীনতাবিধান করা যাইতে পারে না। সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রের অপরতন্ত্রতার উপরই সামাজিক স্বাধীনতা বা রাজ্যাদি সংস্থাপিত হইতে পারে; কেননা পরতন্ত্রতা মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে এত প্রতিকূল, যে রাজ্যে পরতন্ত্রতারই শ্রীবৃদ্ধি, সেখানে অসন্তোষ ও গোলযোগ নিত্যই ঘটিয়া থাকে। লোকে যেমন নিজে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারে, অপরে, ইচ্ছা থাকিলে ও ইচ্ছা করিলেও সে রূপ পারিয়া উঠে না। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যখন এক জন অপরের সম্পূর্ণ অধীন হয়, তখন সেই অধীন ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তি ক্ষমতা প্রকাশ করিবে এবং প্রায়ই ক্ষমতার অসাধু প্রয়োগ দ্বারা অধীনের অসন্তুষ্টি জন্মাইবে। ইহার উদাহরণের এই দেশে অসদ্ভাব নাই। অনেক বাঙ্গালিগৃহে দেখা যায় যে এক জন মাত্র উপার্জ্জনকারী, আর কতকগুলি দূর অথবা নিকট সম্পর্কীয় অলস ব্যক্তি তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত উক্ত এক ব্যক্তির অনুগ্রহের সম্পূর্ণ প্রত্যাশী। এরূপ গৃহে কে কবে সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেখিয়াছে? সামান্য সংসার সম্বন্ধে যে রূপ, বৃহৎ রাজ্য অথবা সমাজ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুতরাং যে রাজ্যের নিয়মানুসারে এক দল লোক অপর এক দলের সম্পূর্ণ অধীন হয়, সে রাজ্যের নিয়ম নিশ্চয় ভ্রমমূলক ও অশুভকর। এই নিমিত্ত দেখা যাইতেছে যে, সকল সভ্যজাতির মধ্যে প্রাচীন ধরণের অধীনতা ঘুচাইয়া, ক্রমশঃ বিশ্বব্যাপিনী অপরতন্ত্রতার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি, যদি দরিদ্রের প্রতি দান ও দয়া প্রকাশ করা শুদ্ধ আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যশালী দিগেরই হাতে থাকে, আর সেই দরিদ্রেরা তাহাদের উপকারীর কোন প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া, কেবল চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশেই বদ্ধ থাকে, তবে সেরূপ দাতব্যে প্রয়োজন নাই—সেরূপ জঘন্য পরতন্ত্রতা জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দরিদ্রেরও উচিত নহে। সকলেই পরস্পরে দিবে ও লইবে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বাঞ্ছনীয় নিয়ম; যেখানে দাতা প্রতিগ্রহীতার মধ্যে এ রূপ ক্ষমতা দেখা যায়, সেই খানেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং প্রণয় (ভ্রাতৃভাব) দেখা যায়। কিন্তু যেখানে উপকার করিবার ক্ষমতা সমস্তই এক জনের হাতে, সেখানে সহজেই মনুষ্যের স্বাভাবিক অপরতন্ত্রতা বৃত্তি প্রবলা হইয়া উঠে; সুতরাং সে স্থলে অতিশয় উপকার এবং সাধুব্যবহার দ্বারাও লোকের কৃতজ্ঞতালাভ বা সন্তোষ উৎপাদন করিবার আশা করা যায় না। অপিতু পরতন্ত্র ব্যক্তি কখনই সাধু

ব্যবহারের প্রত্যাশা করিতে পারে না; কেননা মনুষ্যের মধ্যে সমানভাবে অপরতন্ত্রতা জন্য পরস্পর আদর ও সম্মানই এই প্রকার ব্যবহারের মূলীভূত। যেখানে তাহা না থাকে, সেখানে সাধুব্যবহারও থাকিতে পারে না। ইংরাজেরা যে শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়া এত গৌরব ও প্রতিপত্তির ভাজন হইয়াছেন, এবং স্বদেশের এত উন্নতি করিয়াছেন, এই অমূল্য অপরতন্ত্রতার প্রতি গাঢ়ানুরাগই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহাদের অশেষ গুণের মধ্যে এই একটী অত্যুৎকৃষ্ট গুণ। এই গুণ থাকাতেই তাঁহারা অনেক সামাজিক বিঘ্নাদিসত্ত্বেও দেশের এত উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে অপরতন্ত্রতার নাম গন্ধও নাই। রাজনৈতিক অপরতন্ত্রতার ত কথাই নাই। সামাজিক স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতাও একবারে নাই বলিলেই হয়। যদিও আজি কালি সমাজ-সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তথাপি বাঙ্গালি সমাজে এখনও এত সংস্কারার্হ বিষয় বাকি রহিয়াছে যে, যে কিছু উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কিছুই নহে বলিলেই চলে। বাস্তবিক যদি আমরা সামাজিক সকল বিষয়ের ভাল রূপ পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে আমাদের কেহই প্রকৃত স্বাধীন বা অপরতন্ত্রভাবে জীবন ক্ষেপণ করেন না। আমাদের দেশে অপরতন্ত্রতার প্রতি লোকের অনুরাগ নাই। আমাদের দেশে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সহজে পাঁচজনকে ন করে। এই জন্য লোকে অলস। এইটী সমাজের একটী প্রধান দোষ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

আদৌ অসংখ্য দরিদ্র ভিক্ষুকদিগের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ও তাহারা এত অশেষ কষ্ট সহ্য করে, যে তাহাদের কষ্ট মানব জাতির একটী প্রধান কলঙ্ক স্বরূপ। তাহাদের কোন কাজ জুটে না, সুতরাং তাহাদের জীবন অন্যের দাতব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে,—তাহারা নিতান্ত পরপিণ্ডোপজীবী,—যতক্ষণে পাইবে, ততক্ষণে খাইবে। তাহারা একান্ত অসহায় ও দীনহীন; সর্ব্বদা লজ্জা ও অবমাননার যন্ত্রণা সহ্য করে; সুতরাং তাহাদের মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে; এবং সর্ব্বদা তাহারা আপনাদের অদৃষ্টের নিন্দা করে। সর্ব্বদা পরপ্রত্যাশী হইয়া কাল কাটাইলে মনুষ্যের অপরতন্ত্রতা আর কোথায় থাকে? যখন আমরা আমাদের সহোদরকল্প মানবগণকে এই রূপ ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিতে দিবা রাত্র দেখিতেছি, যখন আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের উপায় করিতে পারিতেছি না, তখন তাহাদের এই কষ্টে ও যন্ত্রণায় আমাদেরই কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করা উচিত; তাহাদের লজ্জা ও অপমান আমাদেরই লজ্জা ও অপমান বলিয়া বোধ করা উচিত।

তৎপরে যদি শ্রমোপজীবী (মজুর) দিগের অবস্থা কি রূপ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলেই সহজেই বোধ হইবে যে তাহাদের মধ্যেও প্রায় কেহই স্বাধীনতা বা অপরতন্ত্রতা সুখভোগ করে না। এক্ষণে আমাদের মধ্যে

কর্ম্ম কাজের এরূপ প্রতিযোগীতা হইয়া উঠিয়াছে, যে সামান্য একটী কাজের জন্য এত লোক লালায়িত হয়, যে শ্রমী-দিগের দৈনন্দিন আহার সংগ্রহের নিমিত্তও সাধ্যাতীত পরিশ্রম না করিলে চলে না; আর তাহাদিগকে নিয়োক্তা দিগের সামান্য সন্তোষ বা অসন্তোষের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে হয়। তাহারা অভাব ও রিক্তহস্ততার ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল; এবং অনেক সময়ে তাহারা সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়াও আপনাদিগকে নিতান্ত দরিদ্রতার হস্ত হইতে মুক্ত ও স্বভাব নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে না। যাহারা চারিটী পেটের ভাতের জন্য শরীর ক্ষয় করিয়াও দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতে বাধ্য, এবং এরূপ পরিশ্রম করিয়াও যাহাদের কপালে কখন২ অর্দ্ধাশনও ঘটিয়া উঠে না, তাহাদিগকে কখনই স্বাধীন বলা যায় না। যেখানে এইরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতে হয়, সেখানে ধনী লোকেরই কাজ করি, আর দুরাচারদাস-স্বামীরই কাজ করি, তাহাতে কিছুই বিশেষ নাই; কেননা দাসত্বাবস্থার সঙ্গে এ অবস্থার কিছু প্রভেদ নাই। কুলী ব্যবসায়ীরা এক বার বিবেচনা করুন, যে তাঁহারা প্রলোভন দেখাইয়া সরল-চিত্ত লোকদিগকে বিদেশে লইয়া গিয়া, কি অসহ্য যন্ত্রণাই দিয়া থাকেন! দাসব্যবসায় আবার কাহাকে বলে? যখন এরূপ ঘৃণিত ব্যবসা আমরা আমাদের চক্ষের উপর চলিতে দেখিতেছি, এবং দেখিয়া শুনিয়াও তাহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি না, তখন যে আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য পদবীতে গণ্য করিতে কিছু মাত্র লজ্জা ও সংকোচ বোধ করি না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহারা এরূপ কঠিন পরিশ্রম সহকারে ও এতাদৃশ বিবিধ নীচ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য, তাহারা যে মনুষ্যত্বের গৌরব কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। আরও অধিক কষ্টকর এই যে, এই শ্রমোপজীবীরা আবার ধনী লোকদিগের সম্পূর্ণ অধীন; তাঁহাদের সন্তোষাসন্তোষের উপর তাহাদের জীবন নির্ভর করে; কেননা এক্ষণে সামান্য লোকের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহ করা এরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, একটী কাজ ছাড়িয়া দিলে আর একটী জুটাইয়া লওয়া এরূপ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে নিয়োক্তৃগণের অল্প মাত্র অসন্তোষ শ্রমীদিগের সর্ব্বনাশের কারণ; সুতরাং সহস্র কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহাদিগকে ধনীদিগের মন যোগাইয়া থাকিতে হয়; কাজেই দরিদ্রদিগকে ধনীদিগের এত অধীন হইতে হয়। কিন্তু এরূপ থাকা কখনই উচিত নহে; কেননা সকল মনুষ্যেরই পরস্পরকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। প্রধান রাজসচিবই হউন, আর একজন সামান্য হাটুরেই হউক, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, মনুষ্যমাত্রেই সমভাবে স্বাভাবিক গৌরবশীল ও শ্রদ্ধাস্পদ। অতএব শুদ্ধ যে এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবে, তাহা কখনই সাধু সম্মত হইতে পারে না। কেননা কেবল মনুষ্যই স্বয়ং আমাদিগের সম্মাননার্হ, তাহার দৈব-ঘটিত পার্থিব অবস্থা বা পদ কখনই শ্রদ্ধেয় নহে। অতএব যতদিন অত্যধিক লোক সংখ্যা হেতু সামান্য লোকেরা তাহাদের জীবিকার নিমিত্ত ধনশালী-

গণের অনুগ্রহের সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে, তত্তদিন কখনই পরস্পরের মধ্যে যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিবে না, ও হইবে না; এবং সকলের মনে স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতাজন্য সুখানুভব হইতে পারিবে না, সুতরাং অসন্তোষ ও অসুখ অবশ্যই ফলিবে।

অন্যের কথা কি, অপেক্ষাকৃত ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও সম্যক প্রকারে অপরতন্ত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা, এ অবস্থাতেও জীবিকা-নির্ব্বাহ, (অর্থাৎ কর্ম্মকার্য করিয়া আত্ম-পোষণ) অথবা বিবাহ করিয়া পরিবার পোষণ করিবার কষ্টও অত্যন্ত অধিক—এত অধিক, যে এক জন মনুষ্যের পরিশ্রমে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে দাসবৎ পরিশ্রম করিতে হয়; আর পরিশ্রমবিমুখ হইলে, নিশ্চয় পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়।

যদিও পুরুষের অবস্থা এই রূপ অত্যন্ত হীন ও পরতন্ত্র, তথাপি অস্মৎ সমাজের স্ত্রী লোকদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। প্রায়ই স্ত্রীলোকেরা ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পুরুষের এত অধীন, যে অনেকে বিবেচনা করেন, স্ত্রীলোকদিগের তদবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সবিশেষ উপযুক্ত। কিন্তু এইটী বিষম ভ্রম; এই ভ্রম হইতেই অসংখ্য দুঃখ ও ক্লেশের উৎপত্তি। স্বভাবের উদ্দেশ্য যে কখন এরূপ নহে, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি আমরা ইতর প্রাণীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করি, তবেই দেখিতে পাইব, যে স্ত্রীজাতি কখনই পুরুষের অধীন নহে,—বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহাদের স্ত্রীজাতি সচরাচর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, এমন কি, অনেক স্থলে পুরুষাপেক্ষা অধিক বল-যুক্ত, এবং পুরুষদিগের ন্যায় সমান স্বাধীন ভাবে জীবন ক্ষেপণ করে। যখন ইতর প্রাণীদের মধ্যে স্বভাবের এরূপ মঙ্গলকর নিয়ম প্রচলিত দেখিতে পাই, তখন যে তদপেক্ষা সমধিক উন্নত মনুষ্যের মধ্যে সে নিয়ম প্রচলিত থাকিবে না, এবং স্বভাবের সেরূপ উদ্দেশ্য হইবে না, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। বাস্তবিকও স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অনধীনে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম—অর্থাৎ তাহাদের স্বীয় ক্ষমতা ও নীতিসঙ্গত পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে সবিশেষ পারগ। নিঃসন্দেহ স্বভাবের অভিপ্রায়ও তাই। আমরা সেই শুভকর অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করিয়াই, স্ত্রী সমাজে এত পরতন্ত্রতা ও অসুখ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অসীম দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাশীল; তবে দুই এক সামান্য বিষয়ে কিছু খাট বটে। তাহা হইলেও এরূপ অতি অল্প কার্য্য আছে, যে কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত হইতে না পারে, অথবা নিযুক্ত হইলে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে না পারে। অতএব যখন দেখিতেছি যে স্বভাবতঃ স্ত্রীলোক সকল কার্য্যেই পটু, তখন তাহাদের সেই পটুতা প্রদর্শন করা যে স্বভাবের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে আর কিরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে? কেননা স্বভাব-প্রদত্ত আমাদের যে সমস্ত ক্ষমতা আছে, তৎসমুদায়েরই চালনা করা নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আজি কালি দুই এক জন বিশিষ্ট লোক স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন বটে; তথাপি এখনও তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন

নাই বলিলেই চলে। এখনও স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ দাসীবৎ পরতন্ত্রাবস্থায় বঙ্গসমাজে অবস্থিত রহিয়াছেন। ভরসা ও প্রার্থনা করি, ঐ সকল মহাত্মাদের প্রশংসা চেষ্টা শীঘ্র সফলা হউক, এবং আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আর পুরুষের দাসী না হইয়া তাহার মিত্র হউন। আহা, সেই সুখের দিন কবে হইবে?

অতি তুচ্ছীকৃত উদরান্নের জন্য লালায়িত বেশ্যা হইতে রাজরাণী তুল্যা কুলকামিনীদের পর্য্যন্ত সকল পদবীর স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যদি একবার সমালোচনা করিয়া দেখা যায়, তবে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে এই সৃষ্টির রাজ্ঞী হইয়াও তদুপযুক্ত অপরতন্ত্রতা কোন স্ত্রীলোকই ভোগ করিতে পান না। তাঁহাদের স্বীয় গৌরব ও স্বাধীনতা জন্য সুখ কিছু মাত্র নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনন্যসহায়া স্ত্রীলোকেরা, পুরুষদিগের অপেক্ষা, সৌভাগ্যের অধিক অধীন। স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইতে পারে, এরূপ কর্ম্ম অস্মৎ সমাজে অতি অল্প আছে। তাহার মধ্যেও আবার সকল স্ত্রীলোক সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না; এবং যে সকল কার্য্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক নিয়োগ্য, তাহাও অতি হেয় ও সামান্য। আমাদের দেশের জাতিভেদই ইহার প্রধান কারণ। যদি সেই অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা হয়, তবেই তাহার অনেকের বাড়ীতে পাচিকা-রূপে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শূদ্রার পক্ষে আবার এ সৌভাগ্যও সহজে ঘটিয়া উঠা ভার। তাহার পক্ষে অতি জঘন্যা সেবিকাবৃত্তিই অধিক সুলভ। কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল কার্য্যও ক্রমে এত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, যে এতাদৃশ কোন একটী সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত একটী লোকের প্রয়োজন হইলে, অনেক লোক আসিয়া জুটে—সুতরাং বেতনাদিও তৎপরিমাণে কম হইয়া যায়; এমন কি, স্থল বিশেষে এত কম হইয়া উঠে, যে তাহাতে তাহার জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে;—আবার তাহার সঙ্গে সেই অনাথার যদি দুই একটী অপোগণ্ড শিশুকে লালন পালন করিতে হয়, তবেত তাহার কষ্টের একশেষ হইয়া পড়ে। সুতরাং এ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভার হইয়া উঠিলে, অগত্যা তাহাদিগকে মজুরি, ময়দাপেষা, দাল ভাঙ্গা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রগাঢ় পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে হয়; তাহাতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করাতে শরীর বিশ্রী ও মুখ নিরানন্দ হয়।

এই সকল ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিবার ভয়েই, অনেকে অসহায় স্ত্রীলোকদিগের প্রধান সহায় গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। অতএব যদি আমরা কাহাকে এই কারণে এরূপ করিতে দেখি, তবে আমাদের আশ্চর্য্য না হইয়া ও তাহাকে ঘৃণা ও ভর্ৎসনা না করিয়া, বরং তাহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও তাহার দুঃখ বিমোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

মহাপুরুষ।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

মনুষ্য সমাজে সকলের অবস্থা সমান নহে; বিদ্যা বুদ্ধি পদ প্রভৃতি নিমিত্তে সমাজে কেহ বড়, কেহ ছোট প্রভৃতি বলিয়া চিরকালই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এক জন উদরান্নের জ্বালায় ব্যাকুল, সর্ব্বদাই পরের পদ সেবা করিতেছে, অপর ব্যক্তি রাশীকৃত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া সহস্র সহস্র দীন ও অনাথ লোকের প্রতিপালন করিতেছেন; কাজেই দরিদ্র ভিক্ষুকের নিকট তিনি দেবকল্প, তাহার সন্দেহ কি। এই রূপে দরিদ্রের নিকট ধনী, মূর্খের নিকট পণ্ডিত, নির্ব্বোধের নিকট বুদ্ধিমান প্রভৃতি মহাপুরুষ বলিয়া জগতে চিরকাল পরিচিত।

নিতান্ত আদিম অবস্থায়ও সমাজ মধ্যে মহাপুরুষের অভাব ছিল না—যখন মানবগণ গৃহের অভাবে পর্ণ কুটীর বা ভূগর্ভবাসী ছিল, তখনও সমাজে মহাপুরুষ ছিলেন, বরং তৎকালে জনসাধারণের তাদৃশ বিচারশক্তি না থাকায় তখনকার মহাপুরুষেরা অনেকে দেবতা, দেবপুত্র বা দেবানুগৃহীত বলিয়া সমাজে আদৃত হইয়া গিয়াছেন।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান লোকের স্বভাব, মহৎ লোকের দ্বারা জগতের উপকার হয়, যাঁহারা জগতের ভাল করেন, তাঁহারা মহৎ। এই শ্রেণীর যাহা দ্বারা মানুষে যত উপকার পায়, তাহার প্রতি তত কৃতজ্ঞ, তাহার সুখ্যাতি প্রচারে তৎপর। আবার দেখ, পরের নিকট নিজের সুখ্যাতি শুনিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক। এই ইচ্ছা এত তেজস্বিনী যে লোকে পরবর্ত্তী লোকের নিকট প্রশংসা পাইবে বলিয়া নিশ্চয় জানিলে বর্ত্তমান লোকনিন্দা অনায়াসে সহ্য করিয়া যার পর নাই, আয়াসসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিধাতা যদি আমাদের মনোমধ্যে উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি না দিয়া একমাত্র যশঃস্পৃহা ও কৃতজ্ঞতা দিতেন, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে মহাপুরুষের অভাব হইত না। যশের ইচ্ছায় যাঁহারা অনেক জাতির মঙ্গল সাধন করেন, তাঁহারাই যখন মহাপুরুষ, তখন একমাত্র উপকারের ইচ্ছায় নিঃস্বার্থ ভাবে যদি কেহ সমাজের ভাল করেন, তিনি কত মহৎ, একবার বিবেচনা কর।

কিন্তু কে কি ভাবে কার্য্য করে, অনেক সময়ে তাহা জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদ বা জেন্দা ভেস্তার সময়ের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর মনুষ্য সমাজের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়,কিন্তু সৃষ্টির অচিন্ত্য কৌশলের সহিত উপমায় এখনও জ্ঞান বিষয়ে মানব জাতির শৈশবাবস্থা। এপর্য্যন্তও যখন একটী সামান্য বৃক্ষপত্র বা একটি বালুকাকণার সম্পূর্ণ তত্ত্ব নির্ণয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্র ভাল রূপে উত্তর দান করিতে পারে না, তখন কবে যে মানবগণ সমস্ত জড় জগতের বিষয় অভিজ্ঞ হইবে, তাহা কল্পনায়ও আসে না। আবার প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর দুর্ব্বোধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় মনোবিজ্ঞান

শাস্ত্র যে এখনও গর্ভাবস্থায় আছে, তাহা বলা বাহুল্য। যত দিন এই শাস্ত্রের একটা কূল কিনারা না হইতেছে, তত দিন কে কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

যদিও পূর্ব্বাপর কার্য্য পর্য্যালোচনায় লোকের অভিপ্রায় অনেক জানা যাইতে পারে (যথা বিষপ্রদায়ী ব্যক্তির প্রাণ হনন অভিপ্রায় ছিল।) বিচারক বিষ প্রদানের বা ভক্ষ্য মধ্যে বিষ মিশানের প্রমাণ পাইলেই তৎপ্রদাতার মারিবার ইচ্ছা অনুমান করেন, এই অনুমানও অন্যায় নহে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যের সকল কার্য্য দৃষ্টে এরূপ অনুমান অখণ্ডনীয় হয় না। লোকে এক মাত্র হিংসাপরবশ হইয়াই সুস্থ ব্যক্তির আহারে বিষ মিশায়। মানুষের হিংসা ভিন্ন এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহাতে ঐ রূপ বিষদান হইতে পারে; কিন্তু যেখানে দুইটি প্রবৃত্তির অভিন্ন ফল হয়, তথায় কার্য্য দৃষ্টে স্বভাব অনুমান নিতান্ত অসাধ্য, তুমি চিরকাল লোকের ভাল করিয়া আসিতেছ; হইতে পারে, একমাত্র পরোপকারই তোমার ইচ্ছা; এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে লোকের নিকট পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষী বলিয়া খ্যাত হওয়ার বাসনাই তোমার সকল কার্য্যের নিয়ামক। এদিগে যশঃ, অভিমান, উপচিকীর্ষা যাহার বশে, কেন তুমি লোকের উপকার কর না, লোকে তোমার নিকট সমান রূপেই উপকার পাইবে; লোকে তোমার মনের ইচ্ছা অল্পই জানিবে, তোমার কার্য্য ভাল হওয়া চাই—কাজ ভাল হইলেই সমাজ তোমাকে ধন্যবাদ দিবে; সুতরাং অভিমানী যশঃ স্পৃহ বা নিঃস্পৃহ উপচিকীর্ষাপরায়ন ইহাদের মধ্যে যিনি সমাজের যত উপকার করিবেন, সমাজে তিনি তত মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

আবার এই মহত্ত্ব স্থাপন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পাত্রবিশেষে বদ্ধ, কেহ পরিবারের উপর, কেহ জ্ঞাতিবর্গের উপর, কেহ বা স্বজাতি বা স্বদেশের উপর, কেহ বা সমস্ত মানব জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারে ব্যগ্র; কিন্তু কেহই প্রথমোক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত স্থানে মহত্ত্ব স্থাপনাভিলাষী নহে। দয়া দ্বারাই হউক বা বিদ্যাবুদ্ধিতে হউক, বা যাহাতেই হউক, নিজ বাড়ী, নিজগ্রাম, নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেহ পার্য্যমাণে ভিন্ন গৃহে, ভিন্ন গ্রামে, বা ভিন্ন দেশে প্রাধান্য স্থাপনে ব্যগ্র হয় না। তবে যে খানে নিজের পরিবারে, গ্রামে বা দেশে প্রাধান্য লাভের উপায় নাই, সেখানে লোকে যথালাভ বলিয়া অগত্যা ভিন্ন স্থানে প্রধান হইবার চেষ্টা পায়। তবে এক বিষয়ে এই নিয়মের বর্জ্জিত বিধি আছে, যুদ্ধ করিয়া যিনি প্রধান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অবশ্য ভিন্ন জাতির মুণ্ডপাত করিতে হইবে।

স্বজাতি বা স্বদেশের নিকট যশঃ স্পৃহা লোকের এত প্রবল যে, লোকে তদর্থে অনর্থক ভিন্ন দেশের সর্ব্বনাশ বা অন্য জাতির শিরঃ চ্ছেদনেও পরাঙ্মুখ হয় না। আর্য্য ঋষিদিগের "ত্বচং কৃষ্ণা মবম্বয়ৎ" মুসলমান দিগের কাফরের সহিত ব্যবহার এবং ইংরেজদিগের মুখবিনির্গত সুমিষ্ট "নিগার" শব্দ ও কার্য্য বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালাবধি নানা দেশে বহু

সংখ্যক প্রধান লোক আবির্ভূত হইয়া গিয়াছেন। বল বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি, উৎসাহ, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুন গুলি প্রাধান্য লাভের উপায়; এই সকল গুন প্রভাবে কেহ যুদ্ধে, কেহ গ্রন্থ প্রচারে, কেহ কবিত্বে, কেহ বা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু মানব সমাজের উন্নতির সহিত যেমন নানা বিধ শাস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, নানা প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত ও নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, প্রাধান্য লাভের উপায়ও তেমন অনেক পরিমাণে নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে। আদিম কালে প্রধানের সংখ্যা অল্প ছিল; অথচ প্রাধান্য লাভের দ্বারও প্রশস্ত; মানবগন জগতের বিষয় অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ.সুতরাং কি কবিত্ব,কি বিজ্ঞান,কি গ্রন্থ প্রচার, যিনি যে পথে চলুন না কেন, যত্ন করিলে অনায়াসে প্রাধান্য লাভ হইত। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য সমাজে বাস করিলে সাংসারিক কার্য্যেই অনেক সময় অতিবাহিত হয়, পরে যৎকিঞ্চিৎ কাল যে অবকাশ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা পূর্ব্বতন লোকের ন্যায় গ্রন্থাদি প্রচার করিয়া প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় কি না, সন্দেহ। অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এক্ষণে কি উপায়ে প্রাধান্য বিস্তার করেন, আমরা অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন তাহার বিশেষজ্ঞ নহি। আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভের উপায় কি?

পূর্ব্বতন অথবা ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণ এমন কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই যে, আমরা দ্বিদলসার পুষ্ট মস্তিষ্ক চালনায় তাঁহাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারি; বাঙ্গালা সাহিত্যে যে আশা ছিল, তাহারও পন্থা কয়েক জন লোকের দ্বারা রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সমাজ সংস্করণেরও কিছু দেখা যায় না, বিধবা বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণের উদ্যোগও হইয়া গেল। (এই দুইটী বিষয় সহজ ছিল বটে,) ইংরেজী হইতে বিজ্ঞানের অনুবাদও দুঃসাধ্য, বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ সহজ নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগতে নানা বিষয়ে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রাধান্য সম্বন্ধে বাঙ্গালায় কোন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না? পূর্ব্বাচার্য্যেরা একমাত্র বিদ্যা বুদ্ধি বা পরহিতৈষা দ্বারা প্রধান হইতেন, এখনও এই কয়টি উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে, না কিছু আবিষ্কৃত করিতে হইবে?

ইতিহাস পাঠ দ্বারা মনুষ্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং ঐ অভিজ্ঞান নানা বিষয়ে প্রয়োগ দ্বারা নিজের সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। যে দোষে রোম নগর বিনষ্ট হইল, যে প্রথা প্রচলিত থাকায় মুসলমান সমাজ ক্রমে বুদ্ধহীন হইতেছে, তাহা অবগত থাকিলে নিজ সমাজে সেই দোষ প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। যদি ঐ সকল দোষ হিন্দু সমাজে থাকে, তবে তাহার উৎপাটন করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সমাজ সংস্কারক যে তদর্থ নিতান্ত সচেষ্ট থাকিবেন, বলা বাহুল্য। প্রাধান্য লাভ সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠে কি কোন নূতন উপায় পাওয়া যায়?

মহাভারতে দেখ, নিমেষ মধ্যে দশ সহস্র রথীর সংহার কর্ত্তা ভীষ্ম দেব, বিচিত্রযোধ দ্রোণাচার্য্য ও শূরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে নিপাত করিতে না পা-

রিলে অর্জ্জুন কখনও প্রধান বীর বলিয়া গণ্য হইতেন না। গ্রীক দেশীয় প্রসিদ্ধ বীর আলেকজাণ্ডারের ভুবনবিখ্যাত কীর্ত্তি ও দারায়ুসের সর্ব্বনাশ হইতেই প্রথমে উদ্ভুত হয়। ওয়াটর্লুর রঙ্গাঙ্গনে বীর সিংহ নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে পরিক্লান্তাবস্থায় আক্রমণ পূর্ব্বক হস্তগত করিয়াই ডিউক অব ওয়েলিংটন সার্থক-জন্মা হইয়াছেন। এই সকল উদাহরণপাঠে আমরা এই সত্যটি লাভ করিতে পারি যে, অন্যের প্রাধান্য বিলোপ করিতে না পারিলে খ্যাতি লাভ হয় না।

কেবল যুদ্ধ বিষয়েই যে এই নিয়মের প্রয়োগ হয়, এ রূপ নহে। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও এই উপায়টি মন্দ নহে। এ দেশের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বাগ্‌ যুদ্ধ প্রভাবেই (যদিও এক খানা সামান্য পত্র লিখিতে অনেকের ১২॥০ গণ্ডা বর্ণাশুদ্ধি হয়) বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন। এই খ্যাতি প্রতিপত্তির উপর তাঁহাদের জীবনোপায়েরও অনেক নির্ভর করে।

অন্যান্য জাতির অপেক্ষা উন্নতি সম্বন্ধে আমরা অগ্রগণ্য। যিনিই কেন যাহা বলুন না, বাঙ্গালীরা যেমন শীঘ্র শীঘ্র উন্নত হইতেছে, পৃথিবীতে অতি অল্প জাতির সেরূপ অবস্থা। আমাদের যৌবন অল্প বয়সে উপস্থিত হয়। আমরা অল্প দিনে শিক্ষিত হই। অল্প বয়সে আমরা প্রিয়তমা পত্নীর চাঁদমুখ দর্শন দ্বারা নয়ন ও মন শীতল করি। ১৫।১৬ কি ১৭ বৎসর বয়সে আমরা পুত্রের মুখ দেখিয়া পুন্নাম নরকের ভয় হইতে রক্ষা পাই (গৃহিণীরা আরও সৌভাগ্য শালিনী, কেননা তাঁহারা ১৩।১৪ বর্ষে সন্তান প্রসব করেন।) ২।১টি লেকচার শুনিয়াই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। এবং অল্প বয়সেই আমরা বৃদ্ধ হইয়া এই দুঃখময় পাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ ধামে গমন করি।

বিদ্যা বা গ্রন্থ প্রচার বা অধ্যয়ন সম্বন্ধেও আমাদের এই রূপ উন্নতি। অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা কেমন উন্নত হইয়াছে, সাহিত্যের আর প্রয়োজন নাই, বলিলেই হয়। সাংসারিক কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত জড় বিজ্ঞান সমালোচনার আবশ্যক। বাণিজ্য প্রভাবে ও ইংরাজদিগের অনুগ্রহে অনেক দিন যাবৎ আমাদের দেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ্ হইয়াছে, সুতরাং অনর্থক মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া জড় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন? বাঙ্গলায় এমন শব্দ নাই যে, তদ্দ্বারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র প্রকৃত রূপে রচিত হইতে পারে, সুতরাং যাবৎ ভাষা শব্দ বহুল না হইতেছে, তাবৎ মনোবিজ্ঞানে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। (ইহারা সন্তরণ শিক্ষা করিয়া জলে নামিবেন) তবে নভেল প্রভৃতি গ্রন্থের দরকার, তাহা সৌভাগ্য ক্রমে অনেক সুপণ্ডিত প্রচার করিতেছেন।

" জলও তরল রমণীহৃদয়ও তরল "

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কি শারীরিক কি মানসিক, আমাদিগের সকল বৃত্তিই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করে। প্রাধান্য লাভেচ্ছা যে এই রূপ অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়া সহজ হইবে, তাহার সন্দেহ কি। বিজ্ঞানে আমরা হাত দেই না, সুতরাং তদ্দ্বারা আমরা প্রধান হইতে ইচ্ছা করি না (পারি কোথায়?) শারীরিক বীর্য্যে আমরা এত উন্নত যে শীঘ্র বৃদ্ধ হই, বিশেষতঃ রাজপুরুষেরা আমাদিগকে সৈন্য দলে গ্রহণ করেন না, সুতরাং আমরা যুদ্ধ বিষয়িণী কীর্ত্তি লাভের অভিলাষী

নহি ; এক মাত্র সুলেখক বা দেশহিতৈষী বা ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া পরিচিত হওয়াই আমাদের প্রাধান্যের উপায়।

পরিপক্ক ফল যেমন কিছু দিন পরে রূপান্তর হইয়া এক প্রকার অদ্ভুত স্বাদ-বিশিষ্ট হয়, আমাদিগের বিদ্যার পরিণামও ঠিক সেই রূপ। বিশেষতঃ সাংসারিক কার্য্যে আমরা এত ব্যস্ত যে নির্দ্দোষ রচনা পূর্ণ হিতগর্ভ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা কীর্ত্তি লাভ সাধ্যায়ত্ত নহে। আবার অল্প দিন হইল বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকে সে পথে কন্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন গ্রন্থ লিখিয়া যশ লাভও সহজ নয়।

যদি এই গ্রন্থকারদিগের প্রাধান্য বিলোপ করিতে পার, তুমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী হইবে। ইহাদের কীর্ত্তি বিলোপের দুই উপায়। ১ম এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা। ২য় ইহাদেব গ্রন্থে দোষারোপ।

সৌভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক পাঠকই পরানন্দাপ্রিয় ; যত নির্দ্দোষ বিষয় হউক না কেন, তুমি যদি দোষ প্রদর্শন করিতে পার, কতকগুলি লোক তোমার পিছে থাকিয়া গোলে হরিবোল দিবেই দিবে। এইরূপ ২।৪টী নিন্দা, ২।৪টী শ্যামী বামীর প্রস্তাব ক্রমাগত লিখিলে তুমি বিখ্যাত লেখক হইবে; তোমার প্রতিপক্ষকে লোকে আর তেমন ভাল বাসিবে না। কিন্তু নিন্দা গুলি এমন ভাবে হওয়া চাই যে তাহা যেন সামান্য লোকের চক্ষে "ভুল প্রদর্শন, দ্বারা দেশের অনিষ্ট সাধন হইতেছে ; তুমি কেবল দেশীয়দিগের হিত কামনায় নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অনুরোধে দোষ গুলি প্রদর্শন করিলা।" এরূপ বোধ হয়। নতুবা তুমি নিন্দা করিবার জন্য দোষ দেখাইতেছ না।

জীবিত গ্রন্থকার দিগকেই যে আক্রমণ করিবে, এরূপ নহে ; মৃত গ্রন্থকারগণও যেন তোমার নিকট অব্যাহতি না পান। "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে," লেখকের সহস্র গুণ থাকুক, তুমি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না; "কদর্য্য রুচি এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা দেশের লোকের রুচি মন্দ হয়" প্রভৃতি সুমিষ্ট রচনা-বলিতে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে। অথচ স্বয়ং "আশমানীর মুখামৃত দিগ্‌গজের মুখে ঢালিয়া দিয়া" দেশের বিশুদ্ধরুচি প্রবর্ত্তক বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিও। ফল কথা এই, বড় লোককে, আক্রমণ না করিলে অন্য উপায়ে সহজে বড় হওয়া যায় না।

গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রাধান্যের উপায় যেরূপ, ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধেও তদনুরূপ। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, দুই সূর্য্য এক আকাশে উদয় হইতে পারে না। তুমি যে দলভুক্ত, যদি সেই দলে অপর কোন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন, দল পরিত্যাগ কর, নুতন দলের সৃষ্টি কর। প্রধান ব্যক্তি তোমার পরমোপকারী গুরু হইলেও, তাঁহার স্বভাব দেববৎ হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত তোমার প্রধান হইবার সহজ উপায় আর নাই। যদি ত্যাগের হেতু গুলি বিবেচনা পূর্ব্বক বিন্যাস করিতে পার, তাহা হইলে লোকেও তোমাকে অকৃতজ্ঞ বলিবে না। তুমি প্রধানের দোষ অনুসন্ধান কর, অনেক যত্নে অবশ্য কিছু পাইবে, "দৃষ্টং কিমপি লোকে স্মিন্ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং" দোষ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাই গুরুতর বলিয়া

ঘোষণা পূর্ব্বক তুমি তাহাকে ত্যাগ করিও, বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করিয়া প্রধান হও। তোমার দলভুক্ত লোককে বুঝাইয়া দিবে, পরিত্যক্ত দলের প্রধান ব্যক্তির এই২ দোষ আছে; তাঁহার সংসর্গে থাকিলে মনের বিশ্বাস অনুসারে কর্ম্ম করা যায় না; নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছ।

সমাজ-সংস্কার—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বড় লোকের দোষ দেখাইলে বড় হওয়া যায়। দোষ দেখান অপেক্ষা লোককে সহজে বড় হইতে দিব না, মনে যদি এই বাসনাও প্রবল রাখিতে পার, ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পার, তাহাহইলেও প্রাধান্য লাভ সহজ হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তি দেশের কুপ্রথা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইল, দেশের লোকেও এই প্রথার অপকারিতা স্বীকার করে, হয় ত ঐ ব্যক্তির উদ্যোগেই এই প্রথা রহিত হইবে। তুমি এত কাল নিশ্চেষ্ট ছিলে অথবা এই প্রথার দোষ দেখাইতে, লোকের মন ফিরাইতে পার, তোমার এমন সাধ্য নাই। এখন উপায় কি, একজন লোক প্রধান হইল, বিষয়টী যদি চাপা থাকিত, তবে হয় ত তুমি উদ্যোগ করিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে। এখন সে আশাও গেল। এখন কর্ত্তব্য যে, যাহাতে এই প্রথা দূর না হয়, যাহাতে প্রস্তাবকারী অপ্রতিভ হয়, তাহার চেষ্টা দেখ। যদি এই প্রথা থাকা কর্ত্তব্য বলিলে লোকে তোমার প্রতি বিরক্ত হয়; তবে তুমিও লোকের সঙ্গে বলিতে থাক, এই প্রথা দূর হওয়া উচিত। কিন্তু প্রস্তাবকারকের প্রদর্শিত উপায় উৎকৃষ্ট নহে। যদি প্রস্তাবকারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, তৎক্ষণাৎ বলিবে শাস্ত্র দিয়া বুঝান ভাল হয় নাই, শাস্ত্রের প্রতি আর এখনকার লোকের অনুরাগ নাই। যদি রাজ ব্যবস্থার প্রার্থী হইয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ বলিবে, ইহাতে সমাজের স্বাধীনতা লোপ পায়, সমাজ মধ্যে রাজ ক্ষমতা প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে; যদি রাজ ব্যবস্থার নিমিত্ত শাস্ত্র দেখান হয়, ও তাহার উত্তর দিতে তোমার সাধ্য না থাকে, তবে তাহা চেপে যাও। ফল কথা, তোমার উদ্দেশ্য থাকিবে, যাহাতে প্রস্তাবকারী সফলযত্ন না হয়। কিন্তু বাহিরে এমন ভাবে কথা বলিবে যে, লোকে তোমাকে একজন সমাজ হিতৈষী মনে করে। এমনও বলিতে পার, এই প্রথা এক্ষণে (বহুল প্রচলিত থাকিলেই) "আপনা হইতেই লোপ পাইতেছে, যত্ন করার প্রয়োজন নাই।" যদি কোন প্রকারে প্রস্তাবকারীকে অপ্রতিভ করিতে পার, তবেই লাভ। কেননা এতদুপলক্ষে তোমার রচনা সকল জনসমাজে প্রচার হইয়া তুমি গণ্য মান্য হইলে, অথচ সমাজ শোধনের আশায় যে ব্যক্তি যত্ন করিতেছিল, সে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। যদি সে দেশ মধ্যে পূর্ব্বাবধি প্রধান বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও লাভ, কারণ প্রধানের প্রতিবাদ করিয়া প্রধানকে অপ্রতিভ করিয়া তুমি প্রধান হইলে।

সদসদ্বিবেচনা।

ইতর জন্তু প্রবৃত্তির দাস, মনুষ্যের সদসদ্বিবেচনা আছে; বাহ্য জগৎ দর্শনে জন্তুদিগের মনে যে ভাব উদয় হয়, তাহারা তাহাই করে; মনুষ্য যদিও সময়েং প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া তরঙ্গাকুলিত-নদী-ক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তথাপি ইচ্ছা করিলে আপনার বশে থাকিতে পারে,—তাহার স্বাধীনতা আছে। এক জনের কার্য্য-যন্ত্রের ন্যায়—যন্ত্রীরূপ প্রবৃত্তি যে দিকে লইয়া যায়, সে সেই দিকেই যায়। অপর সময়ে জন্তুসদৃশ ও সময়ে অন্যরূপ। ঘোটক তৃণ দেখিলেই আহারার্থ মুখোত্তলন করে, ঘোটকী দেখিলেই সঙ্গম নিমিত্ত রব করে, কশাঘাত করিলেই ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সাধ্যানুসারে দৌড়ায়, কিন্তু মনুষ্য ক্ষুধায় শীর্ণ কলেবর হইয়াও মিষ্টান্নের বিপণি সমক্ষে উপনীত হইলে মূল্য প্রদানের শক্তি আছে কি না, বিবেচনা করে। কামানলে শরীর দগ্ধ হইয়া ভস্মপ্রায় হইলেও নরনারীর প্রতি দষ্টিপাত সময়ে ধর্ম্মভয়, লোকভয়, ব্যাধিভয় ও রাজভয় বশতঃ শিথিল হয়, অন্নদাতা বা শিক্ষাদাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইলেও পাছে তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়, এই জন্য নিরতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হয়। মনুষ্যের ঈদৃশ প্রকৃতি বিরোধী কার্য্যের কারণ একমাত্র সদসদ্বিবেচনা।

যদিও মনুষ্য সময়ে সময়ে সদসৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া একমাত্র প্রকৃতির বশেই কার্য্য করে ও তদ্রূপ কার্য্য স্বভাবজাত, তথাপি তাহা কখন মনুষ্যোচিত বলা যায় না। কারণ সেই প্রবৃত্তির সাম্য হইলে, পরক্ষণে গত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। স্বভাব হইতে অনুতাপ উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর নহে। একথা দৃষ্টি-সাপেক্ষ ও দৃষ্টি-নিরপেক্ষ উভয় বিধ যুক্তি দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়; বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ স্বভাব বশতঃ সমস্ত দিবস গান করিয়াও অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছে, সাগরগর্ভে মৎস্য, কুম্ভীর প্রভৃতি নানা বিধ জলচরগণ সুখে সন্তরণ দিয়া কেবল নীর-সাগরে নহে, সুখ সাগরে ভাসিতেছে, উপবনে মেষশাবক মনের সুখে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, বেড়াইতে বেড়াইতে মাতার স্তন্য পান করিয়া আনন্দসলিলে নিমগ্ন হইতেছে, প্রকৃতির অবস্থাতে সকলই সুখ, কেবল সুখ-দুঃখ নাই। তবে ভবিষ্যতে অনুতাপের জনয়িতা প্রবৃত্তির বশে কার্য্য কিরূপে মনের স্বভাবসিদ্ধ বলা যাইতে পারে? যাহা অস্বাভাবিক অর্থাৎ নিয়মের ব্যভিচার, তাহা লইয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য কি? এবিষয় আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক মাত্র হওয়ায় সংক্ষেপে বর্ণন করা হইতেছে।

বীজ বৃক্ষের মূল। কিন্তু জল ও সূর্য্য রশ্মির সাহায্য ব্যতীত বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। আবার শত শত শাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূল সেই ক্ষুদ্র বীজ। বীজ রোপিত না করিয়া সহস্র কলসী সুবাসিত কুসুম সৌরভ পরিপূরিত বারি সেচন করিলেও বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় না। সেই রূপ প্রবৃত্তি মানবের কর্ম্মবৃক্ষের মূল, কিন্তু সদসৎবিবেচনা কর্ম্ম কাণ্ডের

উৎপত্তির পক্ষে অনিবার্য্য আবশ্যক। বীজ রোপণ করিয়া যথোচিত জল সেচন না করিলে বৃক্ষ স্বাভাবিক তেজস্বিতা-বিশিষ্ট হইতে পারে না। সেই জল সদসৎ বিবেচনা শূন্য হইয়া কেবল প্রবৃত্তির বশে কার্য্য করিলে তাহাও মনুষ্যোচিত গুণ-বিশিষ্ট হয় না। বট বৃক্ষের বীজ যথোচিত তাপ ও বারির সাহায্য ব্যতীত যে বৃক্ষ প্রসব করে তাহা, হয়ত বর্দ্ধিষ্ণু আকন্দের সদৃশও হয় না। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য মনুষ্যের কার্য্য সময়ে সময়ে পশু অপেক্ষাও অধম। কামাতুর হইলে কখন কখন লোকে অস্বাভাবিক আত্মজা সহবাস জন্যও লালায়িত হয়, কিন্তু কোন কোন পশুও ঈদৃশ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হয় না। পক্ষান্তরে বৃক্ষ বীজের ন্যায় প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যদি মানব শরীর এই রূপ নিয়মাধীন হইয়াও ক্ষুৎপিপাসার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট না হইত, যদি শরীরে সারাংশের ন্যূনতা হইলেই ক্ষুধা (অর্থাৎ অভাব রোধের যন্ত্রণা ও সেই যন্ত্রণা নিবারণের ইচ্ছা) ও জলীয় ভাগের অল্পতা হইলে তৃষ্ণানুভব না হইত, তাহা হইলে একমাত্র সদসৎ বিবেচনা-পরায়ণ হইয়া কয় জন লোক আহার করিত? সুতরাং হইতে পারে যে, অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য হইয়া উঠিত। যদি ইচ্ছাজনিত যন্ত্রণা মানব-হৃদয়ে এতাধিক প্রবল না হইত, তাহা হইলে কে দারপরিগ্রহ করিয়া ও সন্তানোৎপাদন করিয়া আপনাকে তাহাদিগের ভরণ পোষণ জন্য আয়াস স্বীকারে নিপাতিত করিত? স্বার্থ মনুষ্যের এতই প্রবল যে, এই ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেক লোকে শীঘ্র বিবাহিত হইতে সম্মত হয় না। তখন এ ক্লেশও না থাকিলে কয় জন তাদৃশ শোণিত শোষণকর গুরুতর শ্রম সাপেক্ষ ভার গ্রহণ করিয়া দিবানিশি চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইত? পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত হইলেও লোকে একটী পয়সা ব্যয় করিতে চাহে না, সে স্থলে পর দুঃখ কাতরতা প্রবৃত্তি না থাকিলে আমরা কয় জনকে পরদুঃখ নিবারণের জন্য প্রাণ পণ করিতে দেখিতাম?

পক্ষান্তরে সদসৎজ্ঞান না থাকিলে লোকে হয়ত ব্যাধির সময়েই গুরুতর আহার করিয়া আরও পীড়িত হইত এবং পীড়িত হইয়া গতাসু হইত। অন্যের সুমিষ্ট আহার্য্য দেখিলেই পশুর ন্যায় লোলুপ হইয়া তদ্দিকে ধাবিত হইত। সুন্দরী রমণী দেখিলেই মাথা ঘুরিয়া যাইত এবং তাহা হইতে কত সমাজ অনিষ্টকর ব্যাপার সংঘটিত হইত; পরের দুঃখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইত এবং হয় ত লোকে তাহাতেই সর্ব্বস্ব দান করিয়া হাতে ভিক্ষার ঝুলি সার করিত। ভিক্ষান্ন রাখার ঘটি পর্য্যন্ত থাকিত না।

এই সদসৎ বিবেচনা প্রবৃত্তির দোষ ও গুণ। এবং এই সকল দোষ ও গুণকে সামঞ্জস্য করিয়া সুফল উৎপাদন জন্য বিধাতা মানবকে উভয় বিধ গুণ বিশিষ্টই করিয়াছেন। আবার প্রবৃত্তিগণ পরস্পর বিরোধী। পরস্ব দেখিয়া বিমোহিত হইলে লোভ তাহা হরণ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ভয় ও দয়া নিবারণ করে। আমরা মনোমধ্যে সর্ব্বদাই এক প্রবৃত্তির সহিত অন্য প্রবৃত্তির বিবাদ বিসম্বাদ অনুভব করি। এই জন্যই ইতস্ততঃ উপজনিত হয়। রণ ক্ষেত্রে এই মুহু-

র্ত্তেই যে বীর পুরুষ অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র শত্রুর শিরশ্ছেদন করিলেন, পরক্ষণেই শোক সন্তপ্ত চিত্তে তিনি তাহাদিগের জন্য অনুতাপ করেন। প্রবৃত্তি এই রূপ শুভাশুভের মূল ও পরস্পরবিরোধী ; সুতরাং ইহাদিগের উপর এক জনের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে মহানিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন, এক গৃহে দশ জন প্রত্যেকেই দ্বন্দ্বপ্রধান হইলে সেই বংশের কি রূপ শুভ হয় ? সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর মনুষ্যকে কখন ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থাতে নিপাতিত রাখেন না। তিনি অবশ্যই ইহার কোন প্রতিবিধান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অনেক মত আছে, আমরা এক একটী করিয়া তাহার প্রধান প্রধান গুলি নিম্নে সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ন্যায়ান্যায় বিচারের মত সম্বন্ধে দার্শনিক দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; ফলসাপেক্ষ ও ফল নিরপেক্ষ মতবাদী। প্রথমোক্ত পণ্ডিতেরা কার্য্যের ফলাফল অর্থাৎ ফলের গুণ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ন্যায় অথবা অন্যায় আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। শেষোক্ত দার্শনিকগণ বলেন, কার্য্যে নৈসর্গিক ন্যায়ান্যায় বিচারের কোন সংস্রব নাই। প্রথমোক্তদিগের মতে যে কার্য্য এক সময়ে ন্যায়সঙ্গত হয়, ফল বিবেচনাতে তাহা আবার অন্যায় আখ্যাও প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শেষোক্ত দিগের মতে ফল যাহাই কেন হউক না, ন্যায় অন্যায় অচলের ন্যায় অটল ও অপরিবর্ত্তন-

।

সক্রেটিস।

বোধ হয়, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ গ্রীস দেশীয় এই বিখ্যাত নাম শ্রুত হইয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত এতই অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল যে, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করা নিরর্থক ও সময়ের অপব্যয় মাত্র। সুতরাং আমরা সক্রেটিস্ হইতেই প্রস্তাবারম্ভ করিলাম।

সক্রেটিসের মতও এতৎ সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ও ভ্রমসঙ্কুল। সক্রেটিস্ বলেন, প্রকৃষ্ট সমাজ বিজ্ঞান, * অথবা "প্রকৃষ্ট সুখাধিবাসপদ্ধতি" ন্যায়ান্যায় বিবেচনার উপায়।

কি রূপে সমাজে সদ্ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়ও ন্যায়ান্যায় বিচারের ক্ষমতার সদৃশ কঠিন। সুতরাং ন্যায়ান্যায় বিচারের উপরে কি রূপে সমাজে সদ্ব্যবহার করা যায়, একথা পূর্ব্ব বাক্যের দ্বিরুক্তি মাত্র। এতদ্দ্বারা তাহার অভিজ্ঞানের কোনই পথ মুক্ত হইল না।

সমাজে কি রূপে ভাল ভাবে থাকা যায়, এজ্ঞান কখন স্বতঃসিদ্ধ নহে ; সুতরাং তাহা শিক্ষিতব্য। কি উপায়ে তাহা শিক্ষা করা যায়, সক্রেটিস্ এ বিষয়ে কোনই কথা বলেন না। কেবল তাঁহার উক্ত ধর্ম্মের লক্ষণে † বুঝা যায় যে তিনি জ্ঞানেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আরও কহেন, লোকে কখন জ্ঞানকৃত পাপ করে না। যেহেতু যদি সুখই লোকের চরম লক্ষ্য হয়, পাপ হইতে কখন সুখোৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং লোকে কি রূপে জ্ঞানকৃত পাপানুষ্ঠান করিবে। লোককে অসৎ-

* যদ্দ্বারা ভাল ভাবে সমাজে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

† জ্ঞানই ধর্ম্ম, মূর্খতাই পাপ, সৎকর্ম্মেই সুখোৎপত্তি।

কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বলিলে তাহাকে সেই কর্ম্মের দোষ বুঝাইয়া দিতে হয়।

বোধ হয়, কুসংস্কারপ্রধান সময়ে সক্রেটিস জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং জ্ঞান ও সৎকর্ম্মশালী হইয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি এবম্বিধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনো বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিজের মনের দ্বারাই সমস্ত মনুষ্যের মন বিচার করিতে হয়, প্রত্যক্ষ * দর্শনের † উপায় নাই। এই জন্যই মনোবিজ্ঞানে এত মত ভেদ দেখা যায় এবং এই জন্য প্রখর বুদ্ধিমান লোকও মনোবিজ্ঞান লিখিবার সময়ে নানা রূপ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। মনে যাহা দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাহা সম্ভবপর হউক বা নাই হউক, লোকে তজ্জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। সরল প্রকৃতি সক্রেটিস যদিও অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তথাপি স্বয়ং যে উপায়ে পুণ্যপদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথাচরণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সুতরাং এই অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সক্রেটিসও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানই ধর্ম্মের মূল।

জ্ঞানের দ্বারা ন্যায়ান্যায় বিচার হইতে পারে কি না, আমরা তদ্বিষয় এই প্রস্তাবের স্থানান্তরে আলোচনা করিব। এক্ষণে এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে জ্ঞান শব্দের অর্থ কি? এবং প্রকৃত জ্ঞানই বা কাহাকে বলে? আমরা যাহা জ্ঞান বলি, অন্যে তাহা অজ্ঞান বলে। অন্যে যাহা অজ্ঞান বলে, আমরা তাহাকে জ্ঞান শব্দে ব্যাখ্যা করি। বস্তুতঃ এই মহীমণ্ডলে আমরা কোন ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ জ্ঞানবান্ দেখিতে পাই না। সাধারণ লোকে যাহাকে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া জানে, আমরা অবশ্য কোন না কোন বিষয়ে অন্য এক জনকে তাহা অপেক্ষা বিশেষ অভিজ্ঞানশালী দেখিতে পাই। মনুষ্যের জ্ঞান একাবস্থাস্থিত নহে, অদ্য যাহার যে বিষয়ে অনভিজ্ঞতা আছে, হয় ত কল্য সে ব্যক্তি তাহা শিক্ষা করিতে পারে। মনুষ্য প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্নতিশীল। জ্ঞান (মনুষ্যের অনুকৃতি স্বরূপ) ও উন্নতিশীল; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন বেশ ধারণ করিতেছ, সে কি রূপে একাবস্থাস্থিত ন্যায়ান্যায় বিচারের উপায় স্বরূপ হইবে?

সক্রেটিস উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন; এবং তিনিই দেবতাদিগের ইচ্ছাই ন্যায়, এই বিশ্বাসবিরুদ্ধ বাক্য প্রথম উচ্চারণ করিয়াছেন। তথাপি কুসংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া বলেন যে, বিপদকালে দেবতাদিগের সাহায্য প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং দেবতাদিগের প্রত্যাদেশ সাপেক্ষ হওয়া উচিত।

সমাজে ভাল করিয়া বাস করা সম্বন্ধে সক্রেটিস বলেন যে, কৃষক উৎকৃষ্ট রূপে কার্য্য করুক এবং চিকিৎসক ঔষধের গুণ পরীক্ষাতেই জীবন যাপন করুক। তাঁহার এই বাক্যের দ্বারা বোধ হয়, তিনি কর্ম্মের ফলাফল দেখিয়া তাহার ন্যায়ান্যায় স্থির করিতে উপদেশ দেন। সুতরাং যদিও 'দেবতাদিগের ইচ্ছাই ন্যায় নহে' ইত্যাকার বাক্যদ্বারা তাঁহাকে ফল নিরপেক্ষ মতবাদী বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি কার্য্যতঃ প্রখর বুদ্ধি ও জ্ঞানশালী হওয়ায় ফলাফল বি-

* Perception. † Induction.

বেচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে ফল-সাপেক্ষ মত বাদী নামেই অভিহিত করিলাম।

প্লেটো।

সক্রেটিসের তিরোভাব হইলে পর, তাঁহার শিষ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্লেটো, আপনার দর্শন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে* ন্যায়ান্যায় বিচারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও তাঁহার গুরু সক্রেটিসের ন্যায় অতি অস্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন, যদিও প্লেটো এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যে ন্যায়ের ভাব মনুষ্যের হৃদয়ে স্বাভাবিক নিহিত এবং অন্যায়ের ভাব শারীরিক ব্যাধির ন্যায় অপ্রাকৃতিক। এবং কার্য্য নির্দ্দেশ সময়ে আমরা শুভাশুভ ফল বিবেচনা করি না, তথাপি সাকল্য বিবেচনা করিতে হইলে তিনিও সক্রেটিসের ন্যায় ফলসাপেক্ষ মতাবলম্বী। তাঁহারও মতে সুফল প্রসূন কার্য্যই ন্যায়সঙ্গত, অন্যথা ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে কার্য্য হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ। এই মতের প্রতিকূলে আমরা একটী মাত্র যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি যে, শুভাশুভ কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? তাহা অবশ্যই বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের ফল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মত দেন, অতএব শুভাশুভ সুতরাং ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধেও মতভেদ হওয়া সম্ভবপর। বাল্যকালে যাহা শুভ বলিয়া প্রতীতি হয়, পরিণত বয়োবুদ্ধিতে তাহা অনেক সময় কুফল প্রসূন বলিয়া অনুভূত ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞান, বয়ঃক্রম ও অবস্থা ভেদে ন্যায়ান্যায় নির্দ্দেশও পৃথক হইয়া থাকে। যে মত এরূপ অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহা কখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের পথ হইতে পারে না।

* Chiefly in his Theory of Ideas and in his Theory of man and Society.

সাইনিক।

সক্রেটিসের শিষ্য আন্টিস্থিনিস কর্ত্তৃক এ সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। ডায়জনিস্, ষ্টিল্পন, মেনিডিমস্, মনিমস ও ক্রেটিস এই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ লোক।

আন্টিস্থিনিস সক্রেটিসের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অনেক অংশে তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ন্যায়ান্যায় নির্দ্দেশ করিবার উপায় সম্বন্ধে তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদিগের সক্রেটিস সহ অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। সাইনিকেরা বলেন, "দেশীয় আচার ব্যবহার অনুসারে চলাই ন্যায়সঙ্গত" ইহাই ধর্ম্ম এবং ইহার অন্যথাচরণই পাপ।

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য নিয়ম। বোধ হয় আন্টিস্থিনিস ও তাঁহার শিষ্যবর্গ উৎসাহ বিহীন অলসস্বভাব ও অতি ভীরু কাপুরুষ ছিলেন; অন্যথা কখনই এরূপ অদ্ভুত কাপুরুষজনোচিত মত উচ্চারণ করিতেন না। হয় ত আলস্য ও নিরুৎসাহ নিবন্ধন সাধারণ লোকের মত স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে অশেষ ক্লেশে পাতিত করিতে সাহস হইত না। এই জন্যই এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অথবা শিষ্যদিগকে স্বদেশীয় মত বিরুদ্ধ উপদেশ দেওয়াতে সক্রেটিসের প্রাণহানি হইতে দেখিয়া জীবন নাশাসঙ্কায় পাছে শত্রুগণ, তাঁ-

হাকে সক্রেটিসের শিষ্য সুতরাং তন্মতাবলম্বী বলিয়া আক্রমণ করে, এতন্নিবন্ধন এরূপ ভীরুতাসূচক উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

কত দেশে কত গর্হিত আচরণ প্রচলিত আছে, তাহা শ্রবণ মাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তদনুসারে চলা ধর্ম্ম, এবাক্য অপেক্ষা আর কি প্রলাপ উক্তি মনে ধারণা করিতে পারা যায়?

আবার মানব জাতির উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র দেশীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াই জাতি সাধারণের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার, লুথার কর্ত্তৃক তাহার সংস্কার, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার, চৈতন্যের আবির্ভাব প্রভৃতি দেশ বিশেষের উন্নতির যেং প্রধান সোপান দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণপূর্ণ। পণ্ডিতাগ্রগণ্য কার্লাইন বলেন, "মহাপুরুষদিগকে চিনিবার প্রধান নিদর্শন এই যে, তাঁহারা তাৎকালীক দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহার ধী।"

সময়ে সময়ে প্রত্যেক জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রণালী এরূপ কদর্য্য হইয়া উঠে যে, তন্মধ্যে এক জন আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সংস্কারক আবির্ভূত না হইলে তাহারা পশুর মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। ইতিহাসে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি থাকিলেই ইহার ভূরি পরিমাণে নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন বঙ্গদেশে কর্ম্ম কাণ্ড প্রধান হইল, ভক্তির লেশ মাত্র থাকিল না, মদ্যপান, যোনিপূজা প্রভৃতি গর্হিত আচরণ মুক্তি পথের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইল। তখনই মহাত্মা চৈতন্য খড়্গহস্ত হইয়া অনেকাংশে তাহার অপনয়ন করিলেন, এবং সেই সকল গর্হিত আচরণের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ভক্তিরসে বঙ্গদেশকে সিক্ত করিলেন। কেবল এই কয়েকটী কেন, পৃথিবীর যে কোন উন্নতির বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সমুদায়ই প্রাচীন আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্ত হইয়া নূতন বেশ ধারণই ইহার প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ, মানবাত্মা উন্নতিশীল। মনুষ্যের আচার ব্যবহার আত্মার কার্য্য মাত্র, সুতরাং, তাহাও উন্নতিশীল। অতএব একথা কি রূপে বলা যাইতে পারে, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উন্নতি সাধন জন্য যত্নশীল না হইয়া সাধারণ স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ন্যায়সঙ্গত?

তৃতীয়তঃ, সমাজ মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ আচরণ প্রচলিত থাকার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এক জন বলেন, পীপিলিকার জীবন বধও মহাপাপ, অপর ব্যক্তি বলেন, নর বলি দেওয়াই মুক্তি পথের অদ্বিতীয় উপায়। ইহার মধ্যে এক্ষণে কোন্‌টী অবলম্বনীয়?

চতুর্থতঃ, এক বস্তু কখন পরস্পর বিরুদ্ধ গুণশালী হইতে পারে না। এক স্থান একই সময়ে আলোক ও অন্ধকার দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে এক কার্য্য একবার ন্যায়সিদ্ধ, একবার অন্যায় নামে অভিহিত হইতে পারে না। কিন্তু এমন অনেক দেশাচার আছে, যাহা এক দেশে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীতি আছে, অথচ দেশান্তরে যার পর নাই ন্যায়বিগর্হিত আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

অরিষ্টটল।

গ্রীসদেশে সক্রেটিসের পরে অরিষ্টটলের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অরিষ্টটলের মতে মহৎ লোকদিগের মতই ন্যায়ান্যায় বিচারের আদর্শ। আমাদিগের দেশীয় "মহাজন যেন গতঃ সপন্থাঃ" মতের সহিত ইহার মতগত বিশেষ ঐক্য আছে। বস্তুতঃ অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে কৃতবিদ্য ধীশক্তি সম্পন্ন লোকের বিচার অনুসারে কায করাই কর্ত্তব্য, এবাক্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধ্য বিষয় সম্বন্ধে এই নিয়ম বর্ত্তে। যে বিষয় জ্ঞানাবিষ্কৃত, তাহা জ্ঞানীরা ভাল অবগত আছেন। সুতরাং জ্ঞানীদিগের নিকট তদ্বিষয় উপদিষ্ট হইতে পারা যায়। কিন্তু যে বিষয় জ্ঞানের তাদৃশ আবশ্যক নাই, তাহা কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, উভয়ের দ্বারা প্রায় তত্তুল্য রূপে সম্পন্ন হয়।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, কেবল বুদ্ধি প্রভাবে যাঁহারা নৈতিক মীমাংসা করিতে যান, তাঁহাদিগের মধ্যে ভয়ানক মত বৈষম্য উপস্থিত হয়। বিভিন্ন মহাপুরুষ পরস্পর বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সুতরাং কোন্‌টী অবলম্বনীয় ও কোন্‌টী পরিত্যজ্য তাহা মীমাংসা করিতে হইলে পথ প্রদর্শক মহাপুরুষদিগের মধ্যে ইতর বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। সুতরাং, অরিষ্টটলের মত অতি অস্পষ্ট।

কর্ণের উক্তি।*

ওহে দ্রোণাচার্য্য,হেন না বলিও আর,
শুনি তব বাক্য অঙ্গ জ্বলিছে আমার,
যদি মনে ভয় পাও, আপনি পলায়ে যাও,
কি কারণে অকারণ করিছ জল্পনা?
ভয়ার্ত্তের রণবেশ সুধু বিড়ম্বনা।

২

আচার্য্যের কি আবার শৌর্য্য অহঙ্কার,
হীন বীর্য্য ব্রাহ্মণের ভিক্ষা মাত্র সার,
যথা রাজ সভা মাঝে. পণ্ডিত মণ্ডলী সাজে,
সেই স্থানে আচার্য্যের হয় যে শোভন,
যুদ্ধ বেশ ভিখারীর অসাধ্য সাধন।

৩

শিশু পাঠশালা মাঝে বালক নিকটে,
কথঞ্চিৎ আচার্য্যের শোভা হয় বটে,
আগে না ভাবিয়া মনে,কেন বা আসিয়া রণে,
পড়িয়াছ এই বার মরণ সঙ্কটে,
অর্থ লোভী ব্রাহ্মণের এই শেষে ঘটে।

হইবেক এই যদি পাণ্ডব অর্জ্জুন,
আজি তারে দেখাইব এ হস্তের গুণ,
নিক্ষেপিয়া এক শর, কাঁপাইব চরাচর,
ভূধর সাগর সর্ব্ব ফেলিব উলটি,
মম সহ যুদ্ধে কিহে আটিবে কীরিটি?

৫

অপাণ্ডবা আজি পৃথ্বী করিব নিশ্চয়,
এই দেখ দশ দিক করি অগ্নিময়,
বিজয় ধনুকধারী. বিনাশি সকল অরি,
সসাগরা ধরা আজ করিব বিজয়,
কোন্ ছার তব শিষ্য বীর ধনঞ্জয়?

৬

শরানলে চন্দ্র সূর্য্য পড়িবে ভূতলে,
হাহাকার করাইব দেবতা মণ্ডলে,
পদ ভরে ধরাতল, করিবেক টলমল,
রক্তেতে কর্দ্দম ময় করিব হে মাটি,
কপিধ্বজ রথচূড়া ফেলাইব কাটী।

* উত্তর গোগৃহে বীরবর কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে ভর্ৎসনা করিয়া এই রূপ বলিয়াছিলেন।

উথলিবে পয়োনিধি গভীর নির্ঘোষে,
অনন্ত পাতাল তবে কাঁপিবেক ত্রাসে,
দিগঙ্গনা স্থান ছাড়ি, ভূমে যাবে গড়াগড়ি,
ঘন ঘন ভূকম্পনে কাঁপিবে ধরণী,
দিবসে তামসময়ী হইবে রজনী।

৮

যথা ইচ্ছা তথা তুমি করহ গমন,
বৃদ্ধের যুদ্ধের সাজে নাহি প্রয়োজন,
ভিক্ষা ঝুলি কক্ষে করে, ফের গিয়া ঘরে২,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে গিয়া ডাক তারস্বরে,
তোমার কি সাজিবেক সম্মুখ সমরে?

৯

ওহে সেনাগণ কেন বিষণ্ণ বদন?
গুরুর গৌরব আর কর অকারণ,
জান না কি এর মাঝে কর্ণ বীর যুদ্ধে সাজে,
দ্বিতীয় শমন প্রায় আছে অগ্রসর,
উঠ উঠ বীর দাপে উঠ রে সত্বর।

১০

অম্বুধি অতল জলে কে হবে মগন,
জ্বলন্ত অনলে কেবা করে আলিঙ্গন,
পতঙ্গ আনন্দ ভরে, অনলে পুড়িয়ে মরে,
হইয়াছে আজি বুঝি সেই উপক্রম,
কাল চক্রে পাণ্ডবের আসিয়াছে যম।

১১

নহে কেন এ দুস্তর সেনা সিন্ধু পারে,
উত্তরিতে তৃণ ভেলা এনেছে উত্তরে,
উত্তাল তরঙ্গ বলে, ডুবিবে অতল জলে,
বিন্দুমাত্র চিহ্ন কেহ না পাবে কোথায়,
পড়িলে সূচিকা জলে পাওয়া কি তা যায়?

১২

ত্রিলোকে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিব হে আজ,
ভীত হবে যক্ষ রক্ষ দেবতা সমাজ,
অকালে প্রলয় কাল, কালের আসিবে কাল,
তাই বলি বিশ্ব সৃষ্টি করিব বিনাশ,
লঘু পাপে গুরু দণ্ড এই সে তরাস।

১৩

কাকেরে কামান সন্ধি কে করে বিধান,
করী পদে কেবা মর্দ্দে পিপীলিকা প্রাণ.
কদলে অশনি পাত, রম্ভা বনে মহাবাত,
তাই বলি মনে মনে হই হে কুণ্ঠিত,
পার্থ সনে রণে তেই হয়েছি শঙ্কিত।

১৪

কোন গুণে তব গুণ শুনি লোক মুখে,
বীরের মরিতে ভয় মরি এই দুখে,
কুঠারে বিদারি বক্ষ, দেখাইব দেখ যক্ষ,
নরকুলে রুদ্রতেজা বীরের বড়াই,
আমি নাকি হীন বীর্য্য অর্জ্জুনে ডরাই?

১৫

সবে যাও দ্রোণ দ্রৌণী গাঙ্গেয় শৌবল,
একা আমি থাকি এই রণ রঙ্গ স্থল,
বিরাট করিয়ে জয়, পাণ্ডব করিয়ে ক্ষয়,
এনে দিব মিত্রবরে উত্তরা সুন্দরী,
মর্ত্তে দিবে নিত্য সুখ হস্তিনা নগরী।

১৬

দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত চারু ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
সখার হইবে রাজ্য ছিল মনস্কাম,
এত দিনে আশালতা, হইলেক মুকুলিতা,
তিন যুগে নর ভাগ্যে এসুখ কোথায়?
ত্রিদেবে দেবের ভাগ্যে ঘটে উঠা দায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চন্দ্রাবতী নাটক।

সুরচিত নাটকের উদ্দেশ্য রস ও ভাবের সমুদ্দীপন। যে নাটকদ্বারা এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যদি পাঠক নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের কথোপকথনে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া তদেকাকার চিত্তবৃত্তি হইয়া যান, তবেই লেখক সফলপ্রয়াস হইলেন। আমাদিগের আলোচনীয় গ্রন্থে এই গুণের যথোচিত সদ্ভাব নাই। তথাপি গ্রন্থখানি পাঠ করিলে রচয়িতার লিপি নৈপুণ্যের

প্রমাণ পাওয়া যায়; উপাখ্যানটী সুকৌশলে গঠিত বটে, কিন্তু ইহা আখ্যায়িকার (নবেলের) যত উপযোগী, নাটকের পক্ষে তত নয়; কারণ গল্পের জটিলতা প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক হইয়াছে।

কোন কোন স্থলে গ্রন্থখানি বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের রুচির পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটী স্থলের উল্লেখ করিতেছি।

চন্দ্রা। সে কেন হয়নি সই এ বনের ফুল।

ইন্দু। তাহালে কি করিতে?

চন্দ্রা। তুলে গাঁথিতাম হার, দোলাতাম অনিবার, বুকে রাখি ঢাকিয়া বসনে। গুঁজিতাম চুলে, শুঁকিতাম কভু তুলে, চুসিতাম কখন যতনে। কভু ঝোলাতাম কাণে করি চারু দুল।

আবার চন্দ্রা। সে কেন হয়নি সই পদ্মের মৃণাল।

ইন্দু। তাহলে কি হতো?

চন্দ্রা। কখন মরালমত জড়াইয়া মনোমত ইত্যাদি।

আবার চন্দ্রা। সে কেন হয় নি সই এ মধু মলয়।

ইন্দু। তা হলে কি হতো?

চন্দ্রা। প্রতিবার নিশ্বাসেতে, তুলিতাম হৃদয়েতে, ইত্যাদি।

এপ্রকার রচনা বোধ হয় এখনকার লোকের তত ভাল লাগে না।

গ্রন্থখানির যে যে স্থল আমাদের মনোনীত হয় নাই, তাহা যেমন প্রদর্শন করা হইল, তেমনই ইহার গুণাংশ বলিতে গেলে ইহাঁর ভাষা বিশুদ্ধ ও সুললিত হইয়াছে। পাঠক যেখানেই ইচ্ছা দেখুন, এই গুণ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন।

অনেক কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে যাত্রার অনুরাগ জন্মিয়াছে। যাত্রাতে গানই অধিক।

নাটকখানী আমাদিগের দেশীয় নাট্যশালার উপযোগী হইয়াছে। কারণ ইহাতে নাটকোচিত নানা বিধ গুণের সহিত বাঙ্গালিদের চিরপচিত প্রণালীর কয়েকটী গান আছে। লেখকের লিপি নৈপুণ্যের পরিচয় স্থলে আমরা নিম্ন লিখিত স্থলটী উদ্ধৃত করিলাম।

গোবিন্দপুর কার্য্যালয়।

(মাধবেন্দ্র রায় ও সুরেশ আসীন)

মাধ। (ভগ্নকণ্ঠে) সুরেশ, তুমি কি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছ?

সুরে। না, মহাশয়, আমি সত্যই বল্‌ছি।

মাধ। এ যে আমার বিশ্বাস হয় না! আমার অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হবে, আমার দুষ্কর্ম্মের কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে যে, আমি আবার প্রিয়-পুত্রের মুখাবলোকন কর্‌বো! আমি আবার আমার মন্মথকে ফিরে পাব! হা পুত্র! তুমি এমনো নৃশংস নরাধম পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছিলে? তুমি এমনো স্নেহহীন অপদার্থ পিতার সন্তান হয়ে জন্মে ছিলে? তোমার মত সৎ-পুত্রের কি এমন পামর পিতা হওয়া উচিত?—

সুরে। মহাশয়, আর শোক করবেন না? ধৈর্য্য ধরুন!

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গৌড়েশ্বর নাটক, ধ্রুবচরিত ও নলদময়ন্তী কাব্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, সময়ান্তরে সমালোচন করিব।

নববর্ষ।

১—১

এস হে উৎসাহে নবীন দণ্ডধর ;
লভ হে অভ্যুদয় সহিত চণ্ডকর।
পরিহরি মৎসর,
হে তরুণ বৎসর,
প্রজাদের মঙ্গল করহ নিরন্তর।
দেশের রিষ্টি নাশ,
করিয়া বার মাস,
কর হে সকলের মানস-পদ্মে বাস।
প্রভুর অত্যাচার,
দুঃখীর অশ্রুধার,
দাসের লৌহ-ভার
হর অবনীশ্বর।
ধরায় কীর্ত্তি যদি রাখিবে অনশ্বর।

১—২

গাও হে সবে মিলি নূতন মঙ্গল ;
সেতারা, সপ্তস্বরা,
মন্দিরা, তানপুরা,
বাজাও মধুভরা
বাঁশরী হর্ষে।
উৎসবে দেহ টীকা নবীন বর্ষে।
মাগধ বন্দিগণে,
গাও হে এক মনে
তরুণ নৃপ গুণ নব প্রবন্ধে।
ছড়াও সেফালিকা,
বকুল মল্লিকা,
ভরিয়া দশ দিশি সুরভী গন্ধে।
ছড়াও সুকোমল
বিমল শতদল ;
প্রকাশ অকাতরে মনের কুতূহল।

১—৩

গতাব্দের তরে করি না রোদন,
তারি অত্যাচারে ঝরিছে নয়ন ;
তাহারি দৌরাত্ম্যে, মাইকেল কবি,
কাব্য-কমলের তেজোময় রবি,
আর দীনবন্ধু নাট্যাকাশ-শশী
গেল অস্তাচলে, হৃদে দিয়া মসী।
সেই দুরাচার বঙ্গ বক্ষঃহার,
সর্ব্ব গুণাধার বিদ্যা পারাবার,
দ্বারকা নাথেরে করেছে সংহার।
যে আসনে বসি, নব বর্ষ রাজ!
করো না কদাচ তেমন কুকায।
বঙ্গের ভাণ্ডারে যেই রত্নগণ
এক্ষণে করিছে জ্যোতিঃ বিতরণ ;
এই ভিক্ষা চাই যেন না হারাই
এসবার মধ্যে একটী রতন।

২—১

এস হে আহ্লাদে নবীন ছত্রপতি!
তোমারে সম্মান করিতে ব্যগ্র অতি,
নগর গৃহান্তরে,
উপবন প্রান্তরে,
উৎসব করে সবে পুলকিত অন্তরে।
অলস পরিহর,
রাজার কার্য্য কর,
বিচার তৌল দাঁড়ি সমান ভাবে ধর,
জাতি বা বলোপরি,
কিছু না লক্ষ্য করি,
বিধান অনুসরি
রাখ হে ন্যায়ে মতি,
হরিবে যদি তুমি প্রজার দুর্গতি।

২—২

যুবতীগণে এস পরি অলঙ্কার ;
রূপেতে করি চূর্ণ রতি-অহঙ্কার।
ভূষিতা পুষ্প মালে,
কাজল বিন্দু ভালে,
পা ফেল তালে তালে
বীণার সঙ্গে।
রাজার মন তোষ রস তরঙ্গে।
ভ্রমর গুঞ্জরে,
রসাল মুঞ্জরে,
সৌরভে সদাগতি সুমৃদু সঞ্চরে
কোকিল কলরবে,
জাগায় মনোভবে,
আহা কি সুখ আজি লোকের অন্তরে।
হৃদয় অন্ধকার
কাহার নাহি আর ;
হেরিয়া নব ভূপে সুখের নাহি পার।

২—৩

উত্তর পশ্চিমে শুন হাহাকার !
দীন দুঃখিগণ করিছে চিৎকার।
দুর্ভিক্ষ্য রাক্ষস, মহা ভয়ঙ্কর,
মৃতান্ধের সুত, যমের কিঙ্কর,
প্রকাণ্ড উদর, শীর্ণ কলেবর,
কোটরে নিহিত আঁখি-শনৈশ্চর,
বিলোল রসন,
আরক্ত দর্শন,
ঘোর বিবসন
বিকট দর্শন
গ্রাসিতে তাদিগে ধাইছে ভীষণ।
সে সব প্রজারে নব দণ্ডধর,
রক্ষা করিবারে হও অগ্রসর ;
অকাল রাক্ষসে করিয়া সংহার !
করহ সত্বর তাদিগে উদ্ধার।
অন্ধকারময় তাদের হৃদয়,
আশায় উজ্বল কর পুনর্ব্বার।

৩—১

হে নব পার্থিব ! তোমার আগমনে,
প্রজারা আগ্রহে নবানুরাগ মনে,
তব মুখ ঈক্ষণ
করিছে প্রতিক্ষণ,
করিবারে লক্ষণ শুভাশুভ লক্ষণ।
দুর্ব্বল জনে মনে
সর্ব্বদা ভয় গণে,
প্রভুরা রুষ্ট হন কি জানি কোন ক্ষণে।
সাহস বাহুবল
নাহিক সম্বল,
কেবল অশ্রুজল
ঝরিছে সংগোপনে।
আশ্বাসো এ সবারে সাদর সম্বোধনে।

৩—২

সুখের পূর্ব্ব দিনে দুঃখ অনুচিত ;
সুধায় তীব্র বিষ কোরো না মিশ্রিত।
দেখহ চারু রূপ
আগত নব ভূপ,
নবীন রসকূপ
সহাস আস্যে।
উৎসব কর সবে সুখে প্রকাশ্যে।
হরষে নিমগণ
হইয়া জনগণ
কুসুম বরিষণ কর নৃপাঙ্গে।
সকল রামা মিলি
দেহ হুলা হুলি
জানায়ে কুতূহল বাঁকা অপাঙ্গে।
বিষাদ তরোহিত
করিয়া, সুবিহিত
পুলক প্রেম রসে পূর্ণ কর চিত।

৩—৩

জননী জনম ভূমির সন্তাপ
দেখে এত দিন করেছি বিলাপ,
আমোদ প্রমোদে, শয়নে স্বপনে,
পুনঃ পুনঃ তাহা ফুটে উঠে মনে ;
গাহিতে চাহিলে সুমঙ্গল গীত,
শোক ধ্বনি নাহি হয় অন্তর্হিত।
দুঃখী আর্ত্তস্বরে
হৃদয় বিদরে,
শরীর শিহরে,
অন্তর গুমরে,
আনন্দের গান মুখে না নিঃস্বরে।
তবে যদি তুমি নবীন ভূপতি,
করুণা করিয়া আমাদের প্রতি,
হরি উপদ্রব দৌরাত্ম্যকলাপ,
করহ শীতল হৃদিগত তাপ,
বিদায় সময়ে সুমধুর লয়ে
তব গুণ গান করিব আলাপ।।

বঙ্গ বিজেতা

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুরে আগমন।

While the ploughman near at hand
Whistles o'er the furrowed land.
And the milkmaid singeth blithe,
And the mower whets his scythe,
And every shepherd tells his tale
Under the hawthorn in the dale,
Milton.

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দু রাজ্যের নাম লোপ হইল। সেই অবধি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগাণ অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা কখন দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা সময় পাইলে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলেই কখন কখন সেনাপতিগণ আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা স্থির করিতেন, কখন বা কোন সেনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটী উৎকৃষ্ট জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আবার আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে জমী বিভাগ করিয়া দিতেন। কালক্রমে এই প্রকার রাজ্যতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতেন। বঙ্গ দেশীয় হিন্দুগণ সাহস ও যুদ্ধকৌশলে ন্যূন হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ; এ জন্য পাঠান অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদিগকেই জমীদার করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিতেন এবং তাঁহাদিগকেই বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র করিতেন। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা এক জন হিন্দু রাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংশ রাজা বঙ্গ দেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, ও তাঁহার বংশ সর্ব্ব শুদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গ দেশে রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দেশে হিন্দুদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। দেশস্থ জমীদার জায়গিরদার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন; প্রধান প্রধান জমীদারদিগের কিছু কিছু সৈন্য থাকিত ও যুদ্ধ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাগণ তাঁহাদিগকে স্ব২ দলভুক্ত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন।

দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমীদারদিগের অধীন থাকিত। জমীদারগণ সচ্চরিত্র ও সদয় হইলে কৃষকদিগের আনন্দ; জমীদার প্রজাপীড়ক

হইলে তাহাদিগের আর নিস্তার থাকিত না। পরাক্রান্ত জমীদারগণ প্রায়ই আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিতেন, তাহাতেও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইত। ফলতঃ সে সময়ে যে জমীদার বিশেষ বুদ্ধিকুশল হইতেন, তিনি ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য জমীদারের নিকট হইতে জমী লইয়া আপন অধিকার বাড়াইতে পারিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন। অধিক কি, তৎকালে তাঁহারাই প্রজাগণের "বাপ মা" ছিলেন। প্রজারা কি হারে কর দিবে, তাহা তাঁহারাই নির্দ্ধারিত করিতেন, তাঁহারা যাহা চাহিতেন, তাহা দিতে অসম্মত হওয়া কোন প্রজার সাধ্য ছিল না। তাঁহারা অবিচার করিলে সুবিচারের সম্ভাবনা ছিল না। ফলতঃ জমীদারেরাই প্রজাদিগের পালনকর্ত্তা ও বিচারপতি ছিলেন, তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গ দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পর বৎসরই আকবর সাহ এই দেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর বেষ্টন ও অধিকার করিয়া মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইম খাঁ নাম মাত্র সেনাপতি ছিলেন, ক্ষত্রিয়চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনিই দায়ুদ খাকে বার বার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয় লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদ খাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিলেন ও কেবল উড়িষ্যা মাত্র আপন অধীনে রাখিলেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদ খাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গ দেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬খ্রীষ্টাব্দে আকবর সাহ হোসেন কুলী খাঁকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন; তিনি নাম মাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্ব্বেসর্ব্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করেন। সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হয়েন ও পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়। দিল্লীশ্বর হোসেন কুলী খাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন, ও টোডর মল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। হোসেন কুলী ও তৎপরে মজফ্‌ফর খাঁ চারি বৎসর কাল বঙ্গ দেশ শাসন করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল ও মজফ্‌ফর খাঁ নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আকবর সাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশ দুই বার জয় করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সেই শত্রুসংকুল দেশ দিল্লীর অধীনে রাখিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ১৫৮০খ্রীষ্টাব্দে টোডর মল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গ দেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীর পুরুষ তৃতীয় বার বঙ্গদেশ জয়, ও দুই বৎসর কাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত

হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে পাঠক মহাশয়, বোধ হয়, বিরক্ত হইবেন না।

এক দিন প্রাতঃকালে এক ব্রহ্মচারী নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ রুদ্রপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র সকল দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছিল। প্রভাত বায়ু রহিয়া২ শস্য ক্ষেত্রের উপর খেলা করিতেছিল। শস্য আনন্দে যেন তাহার সঙ্গে২ নৃত্য করিতেছিল। বহু দূরে প্রান্তর সীমায় দুই একটী পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছিল, কুটীরাবলি দেখা যায় না, কেবল নিবিড় হরিৎবর্ণ বৃক্ষাবলি নয়নগোচর হইতেছিল। আকাশ অতি নীল, পক্ষী সকল গান করিতেছিল। কৃষকগণও পল্লীগ্রামহইতে আসিতে২ মনের উল্লাসে গান করিতেছিল। ব্রহ্মচারী যাইতে২ একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুদ্রপুর আর কত দূর?" কৃষক উত্তর করিল, "অধিক দূর নাই, প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।"

সেই ক্ষেত্র হইতে একজন ভদ্রোচিত বেশে ব্রহ্মচারীর নিকট আসিতে২ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, রুদ্রপুরে যাইতেছেন? আমি তথাকার লোক; চলুন, একত্রে যাই, আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমার নাম শিখণ্ডিবাহন, ইচ্ছামতী নদীতীরে আমার আশ্রম; তোমার নাম কি?"

"আমার নাম নবীন দাস; এই স্থানে আমার কিছু জমী আছে, সেই জন্য আমি আসিয়াছিলাম।"

শি। এবার শস্য হইয়াছে?

ন। ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখন দেখি নাই। বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই। তবে—

শি। তবে কি?

ন। অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে? মোগল পাঠানে যেরূপ যুদ্ধ, কি হয়, কে জানে? যেস্থান দিয়া একবার সেনা যায়, সে স্থান যেন মরুভূমি হইয়া পড়ে।

ক্ষণেক পর নবীন দাস আবার বলিতে লাগিল, "আমাদের জমীদারপুত্রের কি হইয়াছে, শুনিয়াছেন?"

শি। না; কি হইয়াছে?

ন। তিনি এক প্রকার উন্মত্তের মত হইয়াছেন, কারণ কেহ জানে না। তাঁহার পিতা তাঁহার আরোগ্যের জন্য কত যত্ন করিলেন, কোন ফল হইল না। আপনি ঠাকুর লেখা পড়া জানেন, আপনি কিছু স্থির করিতে পারেন?

শি। শাস্ত্রে উন্মত্ততার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করে,—বন্ধুর বিয়োগ, রমণীর প্রেম—

ন। না, সেরূপ নহে; আমাদের জমীদারপুত্র কত প্রকার বিহ্বল কথা বলেন, কিছু ঠিকানা থাকে না। বোধ হয়, অনেক লেখা পড়া শিখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন।

শি। কি বলেন, বলিতে পার?

ন। কখন বলেন, বৈরনির্যাতন পরম ধর্ম্ম, কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন,—কেও প্রেমদাস শর্ম্মা! ঠাকুর প্রণাম।

এই বলিয়া নবীনদাস পথের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট এক মলিনবসন যুবা-পুরুষকে সম্বোধন করিল। যুবক কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ আপন নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া উঠিয়া পথিকদিগের সঙ্গে চলিলেন। নবীনদাস বলিতে লাগিল,—

"ইনি আমাদের গ্রামের পাগ্‌লা ঠাকুর। তবে পাগলা ঠাকুর! অনেক দিন দেখি নাই কেন? আমাদের গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? আর এখনই বা ভূমিতে উপবিষ্ট কেন?" প্রেমদাস উত্তর করিলেন, "সমস্ত রাত্রি চলিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলাম।" নবীন পাগলকে আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা আরম্ভ করিল,—

"শুনিয়াছি, আমাদের জমীদারপুত্র কথন২ বলিতেন, বৈরনির্য্যাতনে পরম সুখ, কথন বলিতেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন, কথন বলিতেন, বন্ধু হত্যার মত পাপ নাই, আবার কথন বলিতেন, প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

শিখণ্ডিবাহন অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহা পাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।"

ন। তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

এই বলিয়া নবীন দাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল, "তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুর গিয়াছিলাম, দেখিলাম, দুই চারি জন প্রজা খাজানা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমীদারপুত্র সুরেন্দ্র নাথের বয়স ৫।৬ বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন ও প্রজাগণের হস্তে দুইটী করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজানা দিয়া চলিয়া গেল।"

প্রেম দাস অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

"তাহার পর প্রজারা হঠাৎ কেন খাজানা দিল, মুদ্রাই বা কোথা হইতে পাইল, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে প্রজারা গৃহে ফিরিয়া গেলে পর শিশু অতি ভয়েং পিতার নিকট আপন কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। আমি দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে২ তিন জনই রুদ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নানা প্রকার বৃহদাকার বৃক্ষে গ্রাম আচ্ছাদিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সূর্য্য রশ্মি পত্রের ভিতর দিয়া শুষ্ক পত্র রাশি ও গ্রাম্য পথের উপর পতিত হইতেছে। ডালে২ নানা প্রকার সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে,—কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙ্গা, পাপিয়া, ঘুঘু, সকলেই নিজ নিজ স্বরে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। মোগল পাঠানের জয় বিজয়ে তাহাদের বিশেষ চিন্তা বা ক্ষতি লাভ নাই,—সম্পূর্ণ উদাসীন, উচ্চে বসিয়া রহিয়াছে! মধ্যে২ গ্রাম্য সরোবরে পদ্ম ও শালুক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে২ বৃক্ষতলে দুই একটী কুটীর দেখা যাইতেছে, স্থানে২ দুই এক জন কৃষক গান করিতে২ মাঠে যাই-

তেছে, তাহাদের গৃহিনীগণ মৃণ্ময় কলস কক্ষে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া জল আনিতে যাইতেছে।

শিখণ্ডিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্বেতা নামে এক ব্রাহ্মণী এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নিবাস কোথা?"

প্রেমদাস শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "চল, আমি দেখাইয়া দিতেছি।" কিছু পথ লইয়া গিয়া দূর হইতে মহাশ্বেতার ঘর দেখাইয়া দিলেন। শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার ঘরে অতিথি হইলেন, আর প্রেমদাস তাঁহার চিরপরিচিত সরল স্বভাব বন্ধু নবীন দাসের বাটীতে অতিথি হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনী।

She stole along, she nothing spoke,
The sighs she heaved were soft and low
And naught was green upon the oak,
But most and rarest mistletoe:
She kneels beneath huge oak tree
And in silence prayeth she.

Coleridge.

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। আজি শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী; কিন্তু মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন; ক্ষেত্র, গ্রাম, অটবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। খদ্যোৎমালা বৃক্ষলতাদির নিবিড় অন্ধকার রঞ্জিত করিতেছে। ইচ্ছামতী নদী বিপুলকায় হইয়া তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতেছে। ও সেই তরঙ্গমালা নিশাবায়ুবেগে অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইতেছে। নিবিড় নিকুঞ্জ বনের ভিতর দিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে,—বায়ুর শব্দ ও তরঙ্গের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। সমগ্র জগৎ সুপ্ত।

এ প্রকার গভীর অন্ধকারে, এই শীত বায়ুতে একাকিনী কোন্ শুভ্রবসনা নদীজলে অবগাহন করিতেছেন? ইনি ব্রতাবলম্বিনী! অন্ধকারে ইহাঁর শুভ্র বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। স্নানান্তর বনপুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। পরে নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন বটবৃক্ষতলে এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিলেন।

মন্দিরের ভিতর একটী অল্পায়ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবপ্রতিমা ও একটী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ রমণীর শুভ্র বসনে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। রমণী অনেক কাল যৌবনাবস্থা অতিবাহন করিয়াছেন; বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক হইবে, শীর্ণ কলেবর ও দুই একটী শুভ্র কেশ দেখিলে হঠাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক বোধ হয়। যদি তাঁহার শ্বেত বসন না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকারে ঘাটে স্নান করিতে দেখিলে, কৃষকপত্নী বলিয়াও বোধ হইতে পারিত। মন্দিরাভ্যন্তরে দীপালোকে তাঁহার মুখ অবলোকন করিলে সে ভ্রম আর থাকিতে পারে না। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘায়ত অথচ কোমলতাশূন্য নহে। ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত; কিন্তু চিন্তারেখায় গভীরাঙ্কিত। গুচ্ছং শ্বেত কৃষ্ণ কেশ রাশি কপোলে, হৃদয়ে ও গণ্ডে লম্বিত রহিয়াছে। নয়নে যে সমুজ্জ্বলতা, তাহা প্রায় নবীনার নয়নেও দেখা যায় না। কিন্তু সে যৌবনের সমুজ্জ্বলতা নহে, হৃদয়ের সমুজ্জ্বল চিন্তাগ্নি যেন নয়ন দিয়া বিস্ফুলিঙ্গরূপে বহির্গত হইতেছে। ওষ্ঠ অতি সুচিক্কণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপ্রকাশক। সমস্ত শরীর গম্ভীর ও উন্নত; ও বিধবার শ্বেত বস্ত্রে

আবৃত হইয়া অধিকতর গাম্ভীর্য ধারণ করিয়াছে। রমণী পুষ্প সকল প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

অনেক ক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল, ও রহিয়া২ বটবৃক্ষের ভিতর দিয়া ভীষণশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে২ কবাট ঝন্২ করিয়া উঠিতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়, কিন্তু রমণীর মুখ মণ্ডলের স্থির ভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। স্থির ভাবে, মুদিত নয়নে, নিস্পন্দ শরীরে প্রায় এক প্রহর কাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি কামনা, কি বিষয়ে আরাধনা করিলেন, অনুভব করিতে আমরা সাহস করি না।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবা মাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সেই ঘনান্ধকার নিশীথ সময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতরা না হইয়া ধীরে২ রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; উভয় পার্শ্বে কেবল নিবিড় বন ও তাহার পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের পত্র রাশি অন্ধকারে দ্বিগুণ নিবিড় বোধ হইতেছে। সেই বৃক্ষ তলে স্থানে২ এক একটী কুটীর দেখা যাইতেছে। কুটীরবাসীগণ সকলেই সুপ্ত; জীব জন্তুর শব্দ মাত্র নাই। এই প্রকারে মহাশ্বেতা কতক পথ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিলেন। দ্বার ভিতর হইতে উদ্ঘাটিত হইল; মহাশ্বেতা প্রবেশ করিলে ভিতরে প্রদীপ হস্তে এক অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাশ্বেতা কি চিন্তা করিতে২ আসিতেছিলেন; অল্প বয়স্কার মুখ দেখিবামাত্র সহসা সকল চিন্তা দূর হইল, ও পবিত্র স্নেহ ভাব বদন মণ্ডলে বিকাশ পাইতে লাগিল। বলিলেন—"সরলা, এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখনও জাগিয়া আছ? যাও মা, শোও গে যাও।" এই বলিয়া সস্নেহে সরলার মুখচুম্বন করিলেন। সরলা উত্তর করিল, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, তা মা, আমি জানিতাম না; ব্রহ্মচারী ঠাকুর মহাভারতের কথা কহিতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলাম। আমার বোধ হয়, মহাভারতের কথা শুনিলে আমি সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারি।"

"না মা, সমস্ত রাত্রি জাগিলে পীড়া হইবে," এই বলিয়া মাতা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মুখচুম্বন করিলেন। সরলা প্রদীপ লইয়া যখন শয়নগৃহে যাইতেছিল, তাহার মাতা অনিমেষ লোচনে অনেক ক্ষণ তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও অর্দ্ধস্ফুট বচনে বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব, বিধাতা কি বনশোভার নিমিত্ত এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল্য পুষ্প সৃজন করিয়াছিলেন?" বলিতে২ যে ঘরে ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সরলা শয়নগৃহে যাইয়া প্রদীপ রাখিল। মাতা শয়ন করিতে আসিবেন বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল না, প্রদীপও নির্ব্বাণ করিল না। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, কিন্তু এখনও যৌবন সম্যক রূপে আবির্ভূত হয় নাই, মুখ দেখিলে এখনও বালিকা বলিয়া বোধ হয়। অব-

য়ব বা মুখে বিশেষ রূপের ছটা বা লাবণ্য কিছুই ছিল না; কবিগণ যে রূপ তন্বঙ্গী রূপসীদিগের বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন, আমাদের সরলার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কিছুই ছিল না। তবে শরীর কোমলতা-পূর্ণ, ও মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় মধুরিমা ও সরলতা বিরাজমান, —দেখিলেই বোধ হয়, যেন বালিকাহৃদয়ে কুটিলতার লেশ মাত্র নাই, কেবল সুশীলতা ও সরলতা ও মানব-সাধারণের প্রতি পবিত্র প্রেম এবং স্নেহরাশি বিরাজ করিতেছে। বিশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার মাতার মত নয়ন দুটী সমুজ্জ্বল; সমুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, সরল, ও কোমলতা পূর্ণ। ওষ্ঠদ্বয় বিশেষ সুচিক্কণ নহে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, পরিমল মিষ্টতার আধার আর সদা সুহাসিতে বিকাশিত। গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ বদন মণ্ডলের সরল কিশোর ভাব অধিকতর বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্ব অঙ্গ কোমল ও সুস্নিগ্ধ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পুনরায় মুকুলিত হইয়া কোরক ভাব ধারণ করিল।

যে কুটীরে মাতা ও কন্যা বাস করিতেন, সে কুটীর অতিশয় সামান্য। পল্লীগ্রামের অন্যান্য ঘর যে প্রকার, একুটীরও সেই প্রকার। ক্ষুদ্র একটী পাকশালা ও একটী গোশালা ছিল, এতদ্ভিন্ন দুইটী বড় ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একটীতে মাতা ও কন্যা ও একমাত্র দাসী শয়ন করিত, ও অপরটীতে দিনের বেলা কর্ম্ম কার্য্য হইত, ও কোন অতিথি আসিলে তাহাতেই শয্যা রচনা হইত। গোশালায় দুই তিনটী গাভী থাকিত, প্রাঙ্গণে একটী গোলা ছিল, তাহাতে কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত। গৃহ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়ত বাগান ছিল, তাহাতে কতকগুলি ফল বৃক্ষ ছিল ও সরলা কতক গুলি পুষ্পের চারা রোপণ করিয়াছিল। যদিও কুটীর সামান্য, তথাপি কোন আগন্তুক আসিলেই অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেন যে, কুটীরবাসিনীগণ নিতান্ত সামান্য লোক নহেন। গৃহের মধ্যে সকল দ্রব্যই এমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে কি গ্রামে কি নগরে, প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। বসন যৎসামান্য, কিন্তু অতি পরিছন্ন; ঘরগুলিও যৎসামান্য কিন্তু যৎপরোনাস্তি পরিস্কৃত; প্রাঙ্গণে তৃণ মাত্র নাই। কুটীরবাসিনীদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া প্রথমং গ্রামবাসীগণ নানা প্রকার আলোচনা করিত। এক্ষণে ছয় সাত বৎসরাবধি তাঁহাদিগকে সেই গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া সকলেই নূতন অনুভবে বিরত হইল, সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, মহাশ্বেতা কোন ধনাঢ্যের বনিতা হইবেন। ধনাঢ্য বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করাতে পূর্ব্ব স্ত্রী জ্বালাতন হইয়া স্বীয় কন্যাকে লইয়া নিভৃতে এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

এদিকে মহাশ্বেতা বহু সম্মান করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মচারীকে আহার করাইয়া আপনিও কিছু জলযোগ করিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে এক আসনে উপবেশন করাইয়া আপনি ভূমিতে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইতে লাগিল, আমরা তাহার কিয়দংশ বিবৃত করিব।

শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি, আমি ধর্ম্ম পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে

আসিতেছি, তিনি সম্প্রতি তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি সাত বৎসর হইল, ধর্ম্ম-পিতা তীর্থে গিয়াছিলেন, তখন মোগল পাঠানের মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। সাত বৎসরে হিমালয় হইতে কাবেরী তীর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন।"

ম। পিতার সার্থক জীবন!

শি। অবশেষে মুঙ্গেরের নিকট কোন গ্রামে ধ্যান করিতে২ সহসা তাঁহার স্বপ্ন হইল যে,রক্তস্রোতে এক মহা অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, তিমিরে এক মহাতেজঃ লীন হইয়াছে। স্বপ্নের মর্ম্ম কিছু২ অনুভব করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে আমার প্রমুখাৎ তোমার ভয়ানক ব্রতের বিষয় শুনিয়া ধর্ম্মপিতা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্রতের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এ ব্রত হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভগিনি, এখনও ক্ষান্ত হও।

মহাশ্বেতা বলিলেন, "ভ্রাতঃ, এ অনুরোধ হইতে আমাকে মার্জনা করুন। এব্রত আমার প্রাণের অংশ স্বরূপ ও জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে। এত শোক, এত মনস্তাপ সহ্য করিয়া যে আমি জীবিত আছি, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও যে আমি সচ্ছন্দে আছি, সে কেবল এই ভীষণ বৈরনির্যাতন ব্রতের নিমিত্ত। যে দিন ব্রত উদ্যাপন করিব, সে দিন আমাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।"

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রত ত্যাগের অনুরোধ হইতে একবারে নিরস্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "বৈর নির্যাতনের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছ?"

"প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া নিশা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিব,—যত দিন মহাদেব শত্রু নিপাত না করেন, তত দিন কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে,—সপ্তম বর্ষের মধ্যে শত্রু নিপাত না হইলে, কুমারী কন্যার সহিত চিতারোহণ করিব।"

অনেক ক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার ব্রত কি, তাহা আমি অবগত আছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈর নির্যাতন সাধনের জন্য এই ব্রত ধারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছ?"

মহাশ্বেতা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "যিনি এই বিপুল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা লাভ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?"

সরলস্বভাব ব্রহ্মচারী মহাশ্বেতাকে উপরি উক্ত ভীষণ ব্রত হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আর এক বার চেষ্টা করিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আপনি পূর্ব্ব কথা সকল জানিলে এ প্রকার অনুরোধ করিতেন না,—আমি নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আর মহাত্মা চন্দ্রশেখরকেও এই সকল কথা জানাইবেন।"

পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে২ মহাশ্বেতার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ মণ্ডল বিকৃতি ধারণ করিল, শরীর কন্টকিত হইল, উজ্জ্বল চক্ষু আরও ধক্২ করিয়া

জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, ঘরের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতেছে, ও মহাশ্বেতার সামান্য কুটীরকে বেগে আঘাত করিতেছে, কিন্তু স্মৃতিজাত প্রবল চিন্তা বায়ু তদপেক্ষা শত গুণে বেগে মহাশ্বেতার হৃদয় কন্দর আঘাত করিতেছিল। শিখণ্ডিবাহন এই প্রকার বিকৃতি অবলোকন করিয়া মহাশ্বেতাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইতে নিরস্ত হইতে বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন—"আমি পাপীয়সী বটি; যে পরের অমঙ্গলের জন্য সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রত ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে পাপীয়সী নহে ত কি? কিন্তু সামান্য অত্যাচারে আমি পাপ ব্রত অবলম্বন করি নাই। শ্রবণ করুন।"

সরলচিত্ত শিখণ্ডিবাহন অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সভ্যতার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

কোন্ দেশে প্রথমতঃ দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিজ্ঞান শাস্ত্রের ধারাবাহিক নিয়ম জানিবার পূর্ব্বেই মানবগণ অত্যাবশ্যকীয় শিল্পকৌশলের কথঞ্চিত ভাগ অস্পষ্ট রূপে অবগত ছিল। এবং সেই সকল শিল্পপ্রণালী উদ্ভাবন হইলে বহুকাল পরে অক্ষর সৃষ্টি ও লিপিবদ্ধ করণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সুতরাং তৎসমুদয়ের কোনই ঐতিহাসিক নিদর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই। তবে এ কথা বলা অন্যায় নহে যে, সর্ব্ব প্রথমে যে জাতি সভ্য-পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেই পূর্ব্বে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম সভ্যজাতিই বা কোন্টী, তাহা কে নিসংশয়ে বলিতে পারে? এ বিষয় লইয়া অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তথাপি সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, মিসর, ফিনিসিয়া, কাল্‌ডিয়া ও ভারতবর্ষ অগ্রে সভ্যপদবী মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনন্তর গ্রীস, পারস্য চীন ও রোম উন্নত হইযাছিল। গ্রীস দেশের অভ্যুদয়ের সময় হইতেই রোমীয়গণ আপনাদিগের সভ্যতার বীজরোপণ করেন। রোম ধ্বংসের পর আরব, এবং আরবের পর অধুনাতন ইউরোপীয় জাতি সকল উন্নত হইয়াছে।

ফিনিসীয় ও ক্যাল্‌ডীয়গণ মিসর দেশের উপনিবাসী মাত্র। এবং এ কথা অনেকে বলে, ভারতীয়গণও ইহাঁদিগেরই শাখানির্ব্বিশেষ। সুতরাং সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে হইলে আদৌ মিসর দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা অত্যাবশ্যক।

মিসরের উন্নতির ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, এবং আমরা তাহা অতি অল্পই অবগত আছি; তথাপি প্রাচীন গ্রীক ও ইদানীন্তন ইউরোপীয় কতিপয় লেখকের গ্রন্থ

হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিসর দেশ সমমণ্ডলের সীমার মধ্যবর্ত্তী। মিস্রীয়গণ তথাকার আদিম নিবাসী, অথবা অন্য কোন স্থানের উপনিবাসী মাত্র, একথা কেহই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন না। কেবল তাহাদিগের মস্তকের গঠনাদি দেখিয়া এই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাহারা ককেসীয় জাতি।

কোন কোন মতে ইথিয়পীয়া মিসর অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। কিন্তু ইথিয়পীয়া কোন্ দেশ, তাহা কেহই অদ্যাবধি সিদ্ধান্ত করেন নাই। মিসরের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দেখিয়া তাহাকে কেহ কেহ কৃষ্ণদেশ বলিয়া থাকে, এবং ইথিয়পীয়া শব্দেও কৃষ্ণদেশ বুঝায়; সুতরাং ইথিয়পীয়া যে মিসরের নামান্তর নহে, তাহাই বা কি রূপে বলিতে পারি? মিসরের ইতিহাসলেখক উইলকিন্সন সাহেব বহুবিধ তর্ক ও মত প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মধ্য এসিয়াবাসিদিগের এক শাখা ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনাতে এ সমুদয় অনুমান মাত্র; যে কালের কোন ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ অপ্রাপ্য, অনুমান ও যুক্তির দ্বারা সমুদয় নিশ্চয়ীকরণ অসম্ভব। যাহা হউক, এই সকল যুক্তি ও তর্কবিতর্ক না লিখিয়া আমরা মিসর সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করা যাইতে পারে, মিসরও এক কালে নিতান্ত হীনাবস্থায় ছিল, এবং অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু সেই উন্নতির সোপান ও প্রকৃত ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং আমরা তাহা বর্ণন করিতে অপারগ। কিন্তু মিসর দেশীয় কোন কোন ভগ্নাবশেষ শিল্প কার্য্যে উত্তর দেশের প্রাধান্য চিত্রিত দেখিয়া অনুভব হয় যে, উত্তর দেশই এমত উন্নত হইয়াছিল।

বোধ হয়, প্রথমতঃ মিসরে ধর্ম্ম যাজকদিগের প্রাধান্য ছিল। দেবতারা রাজত্ব করিতেছেন এবং যাজকেরা স্বয়ং দেবতনয়, এই জনপ্রবাদ প্রচার করিয়া একাধিপত্য করিতেন। অসভ্যদিগের নিকট যে বুদ্ধি বা ক্ষমতা প্রভাবে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিতে পারে, সেই মহা মান্যের পাত্র ও বিস্ময়ের আকর হয়। এ দিকে স্বার্থপর যাজকগণও প্রভুত্ব লাভ হেতু যাহা কিছু বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবন করিতেন, সমুদয়ে ধর্ম্মের ভাণ করিতেন। অপিচ নিতান্ত মূর্খ লোক কোন বুদ্ধির অগম্য কার্য্য যে আপনার ন্যায় স্থূলশরীরী মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা শীঘ্র বিশ্বাস করে না। সুতরাং স্বার্থসাধন হেতুই হউক, বা সাধারণ্যে প্রচারের জন্যেই হউক, তাদৃশ অসভ্যাবস্থাতে আবিষ্কারকগণ একমাত্র দেবতাদিগের আদেশ ব্যতীত স্বয়ং কর্ত্তৃক বলিলে কখনই ফল লাভ করিতে পারিত না।

এদিকে ইহ জীবনের অস্থিরতা দেখিয়া পরলোকের চিন্তা মনোমধ্যে স্বভাবতঃ উদিত হয়, সুতরাং যাহার উপদেশে মৃত্যুর পর শুভ হয়, (ধর্ম্মযাজকের) তাহার প্রতি ভক্তির ভাব নৈসর্গিক। এই জন্য প্রাচীন কালে অনেক দেশে ধর্ম্মযাজক প্রধান জাতীয় এক ব্যক্তি ছিল। মুষা প্রভৃতি যিহূদীয়গণ, রোমান

কাথলিকদিগের পোপ, মহম্মদ, আবুবেকার, ওমর প্রভৃতি ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী, স্বর্গীয় দূত ও খলিফাগণ, সকলেই এই সীমার অন্তর্গত। প্রাচীন ভাগবতেও ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। যদিও ক্ষত্রিয়গণ রাজা, তথাপি ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ছিলেন। রাজা সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ বিকট বেশধারী কোন ঋষি তথায় আসিলে, তাঁহার নিকট রাজাকে নতশির হইতে হইত। অদ্যাপি ভারতবর্ষে ধর্ম্মযাজকদিগের কিরূপ একাধিপত্য, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত ও কারণ পরম্পরায় মিসরে আদিম অবস্থার যাজকদিগের একাধিপত্য প্রাকৃতিক সম্ভবপর বলিয়া প্রতীত হয়।

এই রূপ কালে যাজকগণ ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া যে সকল কৌশল ও জ্ঞান বিস্তার করেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় লোক ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে। কিন্তু অগ্নির ন্যায় সত্যও আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে সভ্যতা-প্রভাবে যখন সমাজস্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ীগণ উন্নত হয়, তখন প্রাধান্যেচ্ছু বা সত্যপরায়ণ বীর পুরুষগণ যে যাজকদিগের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এক জন বিশেষ ক্ষমবান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলেই যাজকদিগের পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হয়, এবং সমাজ এক ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রাচীন ভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং মধ্য সময়ে লূথরের জন্মই ইহার দৃষ্টান্ত। কথিত আছে, মিনিস্ নামক এক ব্যক্তি প্রথমতঃ ধর্ম্ম যাজকদিগের আধিপত্য বিদূরিত করিবার জন্য মিসরে রাজা হইয়াছিলেন। এই মিনিসকে, এবং কিরূপেই বা ইনি এতাধিক ক্ষমবান হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। মিনিসের বংশের পরে আরও সপ্তবিংশ রাজ বংশ মিসরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, খ্রীষ্টের এক বিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে চিরপস নামক এক জন ভূপ মিসরের সুপ্রসিদ্ধ প্রথম পিরামিড প্রস্তুত করেন। চিরপস কর্ত্তৃক ঐ মন্দির প্রস্তুত হউক বা না হউক, মন্দির যে অতি প্রাচীন কালে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এবং তৎকালে মিস্রীয়গণ নির্ম্মাণবিদ্যাতে যার পর নাই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তৎকালে সাধারণ লোকেরা নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল এবং রাজা তাহাদিগের উপর একাধিপত্য করিতেন। কিন্তু তৎকালে অবশ্যই মিসরে কৃষি এত অধিক উন্নত হইয়াছিল যে, অল্প সংখ্যক কৃষক দ্বারা অধিক সংখ্যক লোকের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত, অন্যথা বিংশতি সহস্র লোক বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রম করিয়া কি রূপে জীবন ধারণ পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে, এ রূপ মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত রহিলেন। এই মন্দির সন্দর্শন করিয়াই এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কালেই মিসর দেশে অনেক সংখ্যক লোক আহার্য্যাহরণ ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং অতি প্রাচীন

কালেই মিসরে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত ও বাধামুক্ত হইয়াছিল।

এই প্রথম মন্দির ব্যতীত মিসর দেশে আরও দুইটী বৃহৎ মন্দিরের ভগ্না-বশেষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বৃহৎ অট্টা-লিকা, কৃত্রিম ঝিল ও নদী প্রভৃতি নির্ম্মাণ-বিদ্যার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-সহ ইউরোপায় নির্ম্মাণবিদ্যা তাদৃশ উন্নত হইয়াছে কি না, সন্দেহ।

বাইবেলের পুরাতন ভাগ পাঠ করিলে মিসর দেশের কোন সময়ের কিছু কিছু ভাব অবগত হওয়া যায়। ইব্রাহীম প্রভৃতি কতিপয় যীহুদীয় স্বদেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মিসরে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইব্রাহীমের * বনিতা পরম রূপ লাবণ্যবতী ছিলেন। পাছে এই রমণী ইব্রাহিমের বনিতা বলিয়া প্রকাশ হইলে মিসরাধিপতি প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাকে অপহরণ করেন, এই আশঙ্কাতে ইব্রাহীম বনিতাকে ভগিনী বলিয়া অভি-হিত করিয়াছিলেন। এ রূপ ঘটনা নি-তান্ত অপ্রচলিত থাকিলে কদাপি ইব্রা-হীম পূর্ব্বেই তাহার শঙ্কা করিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্বতন মিসরাধিপতিগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কিন্তু বাইবলে অনেক স্থলে মিসর দেশ শিল্প ও দর্শন বিদ্যার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই জন্যই মুষা প্রভৃতিকে জ্ঞানবান বর্ণন ছলে, লিখিত আছে যে, তাঁহারা মিসরের সমুদয় বিদ্যায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইহার দ্বারা বোধ হয়, মিস্রীয়-গণ তৎকালীন পার্শ্ববর্ত্তী জাতিচয়ের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে যার পর নাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এ বিষয়ে অস্পষ্ট ইতিহাস ঘটিত প্রমাণ ব্যতীত বেনী হাসান * স্থিত প্রতিমূর্ত্তি নিচয় দেদীপ্যমান সাক্ষী রূপে বিরাজিত রহি-য়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তি সকল দৃষ্টি করিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, মিস্রীয়গণ সূত্র প্রস্তুত, কাচ প্রস্তুত, বাসন প্রস্তুত, স্বর্ণ অলঙ্কার এবং এই রূপ শিল্প নৈপুণ্য-জাত নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় অবগত ছিলেন। এবং ব্যায়াম ও শতরঞ্চ প্রভৃতি নানা রূপ মানসিক ও শারীরিক বল সাপেক্ষ ক্রিয়ার পদ্ধতিও জানিতেন। এই বেনীহাসানে যে সকল মন্দিরাদি প্রস্তুত আছে, তাহাতে গ্রাণাইট প্রভৃতি প্রস্তর দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয়, মিস্রীয়গণ প্রস্তরাদি ব্যবহার করিবার নিয়মও উদ্ভাবন করি-য়াছিলেন। এবং এই সকল মন্দির দেখিয়া হয় ত, কালে ইউরোপীয়গণ ডোরিক পদ্ধতির নির্ম্মাণকৌশল উদ্ভা-বন করিয়াছেন।

ডয়ডি যাস্‌সে একটি ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই ফলকে মিসরাধি-পতি আমন্মপুবি কর্ত্তৃক পন্ট দেশীয়-দিগের বিজয় চিত্রিত আছে। এই ডয়ডি যাস্থ সহর সংস্থাপনে স্পষ্টই বোধ হয় যে, লোহিত সাগরের তীর-বর্ত্তী ইন্নমের দুর্গ এই সময়ে, অথবা ইহার পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং ইন্নমের দুর্গ নির্ম্মাণ দ্বারাই বোধ হয়, ইহার পূর্ব্ব হইতেই মিস্রীয়গণ আরব দেশের সহিত বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন।

কোন জাতি সাধারণের বিশেষ উন্ন-

* The date is supposed to be 1942 B. C

* নীলনদের পূর্ব্ব তীর।

তির কারণ দেখিলে বোধ হয়, তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী বিশেষ ভাব প্রবল হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত, আরব, মিসর, ফিনিসী, গ্রীস, রোম, মধ্য সাময়িক আরব ও পর্টুগাল-নিবাসিগণ সকলেই এই বাক্যের উদাহরণ স্থল। কথঞ্চিৎ রূপে আহার্য্যাহরণের ক্লেশ হ্রাস হইলে মনুষ্য স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতা বশতঃ এক একটী বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মালোচনা, পারস্যবাসিরা রাজত্ববিস্তার, মিস্রীয়গণ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি, ফিনিসীয়গণ ধনসঞ্চয়, গ্রীকেরা মনোবৃত্তি পরিচালনা, রোমীয়গণ স্বাধীনতা, চীনগণ শিল্পনৈপুণ্য, আরবীয়গণ ধর্ম্ম প্রচার এবং পর্টুগাল বাসিরা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থাহরণে নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য এতদ্দ্বারা পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল ধর্ম্মেরই অনুশীলন করিয়াছেন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন নাই; অথবা পর্টুগাল বাসিরা ঈশ্বরতত্ত্বে একবারে অন্ধ হইয়া বাণিজ্য কার্য্যেই রত হইয়াছিল। আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, ধর্ম্ম আর্য্যজাতি এবং পাণ্ডিত্য পর্টুগাল দিগের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য ছিল। এবং তাহাতেই তাঁহারা সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এই রূপে মিস্রীয়দিগের মধ্যে আমাদিগের বিবেচনাতে গৌরবাকাঙ্ক্ষা অথবা চিরস্মরণীয় হওয়ার ভাব সমধিক প্রবল ছিল। বোধ হয়, এই চিরস্মরণীয় হওয়ার ইচ্ছাপরায়ণ হইয়াই মিস্রীয়গণ অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভরূপ এই সকল পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং জাতীয় গৌরব রক্ষা হেতুই, বোধ হয়, ইস্রায়েল বংশীয় উপনিবাসিদিগকে এতাধিক ঘৃণা করিতেন। ইস্রায়েলীয়গণ বহুকাল মিসরে বাস করিয়া নানা সদ্ব্যবহার দ্বারা ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া মেমফাইট বংশীয় রাজাদিগের সময়ে কুশলে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু যখনই থিবীর বংশ সিংহাসনাধিরূঢ় হইল, ভূপালগণ সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই উৎপীড়ন কালেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কারকর্ত্তা মূষা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং রাজার উৎপীড়ন নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তিনি সহচরবর্গ সহ মিসর হইতে পলায়ন করিয়া পূর্ব্ব পিতামহদিগের বাসস্থান যিরুশালমে প্রত্যাগত হয়েন। এই ঘটনা তৃতীয় টথমিসের সময়ে হইয়াছিল।

এই বংশীয় টথমিস ভূপালদ্বয়ের কর্ত্তৃত্ব কালীয় কএকটী মন্দির অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার গাত্রস্থিত চিত্রাদি দেখিয়া অনুভব হয় যে, তৎকালে দর্শন, ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনোপযোগী ডিঙ্গা, সূত্র বস্ত্র এবং নির্ম্মাণ বিদ্যা সম্বন্ধীয় খিলান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ টিথমস ও চতুর্থ টিথমসতনয় অমনকের রাজত্ব ও নানা রূপ মন্দিরাদিনির্ম্মাণ দ্বারা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। শেষোক্ত মহিপালের রাজত্বকালে জগদ্বিখ্যাত স্ফিনিক্স বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অমনকের মৃত্যু হইলে তাঁহার তনয়দ্বয় চতুর্থ আমুনক ও আস্মুন টুপ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ আমুনটা এতাধিক ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন যে, স্বয়ং রাজা নাম ধারণ বা মন্দিরাদিতে জ্যেষ্ঠের নাম সহ আপনার নাম খচিত করিতে দেন নাই। অন্যান্য

দেশের ন্যায় মিসরেও রাজ সিংহাসন সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠত্বাধিকার প্রচলিত ছিল। তথাপি কি জন্য দুই ভ্রাতা এক কালে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। হয়ত, কনিষ্ঠ তাঁহার মন্ত্রিমাত্র ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ স্নেহাধিক্য বশতঃ কনিষ্ঠকেও রাজাসনের সহভাগী করিয়াছিলেন। এই সময়েও পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপালগণের সময়ের ন্যায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সময়ে, ১৪০৬ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে লৌহের ব্যবহার উদ্ভাবিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা এ বাক্যে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে পারি না। কারণ, লৌহের সাহায্য ব্যতীত মিস্রীয়গণ কি রূপে নির্ম্মাণ বিদ্যা ও খোদকারিতে এতাধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল? লৌহময় লাঙ্গলের ফলক অভাবেই বা কি রূপে এত দূর কৃষি কার্য্যে উন্নত হইয়াছিল? হয় ত এই সময়ে গ্রীসদেশে লৌহময় অস্ত্র প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট উপায় অথবা নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়া লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং সুকুমারমতি তৎকালীন অধিবাসিগণ তাহাকেই লৌহের আবিষ্কার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যদি সত্য সত্যই এই সময়ে লৌহ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, মিস্রীয়দিগের বুদ্ধিকৌশল আরও ধন্যবাদের পাত্র। যেহেতু তাহারা লৌহময় অস্ত্র সাহায্যব্যতীত এত বড় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও খোদকারীর এতাধিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এই তৃতীয় আমুনাকের সময়ের খোদকারী দেখিলে পূর্ব্ব ভূপালদিগের সাময়িক ভাস্কর্য্য অপেক্ষা তাহা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, যদিও ইহাঁর রাজত্ব সময়ে লৌহ আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, লৌহ বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট অস্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া তদ্দ্বারা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

তৃতীয় আমনকতনয় বিনিস ও বিনিসের পর তাঁহার তনয় সিরি মিসরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভূপতি কেবল নির্ম্মাণ বিদ্যারই পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত নৃপতি নির্ম্মাণ বিদ্যা ও যুদ্ধ বিদ্যা, এ উভয়েতেই নিপুণ ছিলেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত মিসর দেশীয় যেং ভূপতির রাজত্ব বর্ণন করিলাম, সকলেই এক ভাবে নির্ম্মাণ বিদ্যাতে নিপুণ ছিলেন। এবং ইহাতেই বোধ হয়, এক মাত্র চির স্মরণীয় হওয়ার ইচ্ছাই তাঁহাদিগের মধ্যে সমধিক রূপে প্রবল ছিল, এবং এই চিরস্মরণীয় হওয়ার ইচ্ছাতে নিরূপিত স্ফিনিস্ক প্রভৃতি বৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল বিনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মিসর দেশ আদিম কালে এতাধিক উন্নত হইয়াছিল।

একতা।

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

একতা কথাটী শুনিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার ফলগুলি বড়২। একতার কত ফল, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য অনেক আয়াস পাইবার প্রয়োজন করে না। কেননা তাহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। আমাদের দেশের পুরাণরচয়িতারা সুন্দ উপসুন্দ প্রভৃতির গল্পচ্ছলে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিজাতীয় ইতিহাস রচয়িতারাও উদাহরণ দিতে ত্রুটি করেন নাই। সামান্য একজন স্কুলের ছাত্রও হোরেটি (Horati) এবং কোরেটি (Curati) দিগের যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবগত আছে। অনেক ইতর প্রাণীদের মধ্যেও এইরূপ একতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল সামান্য মনুষ্য ও জন্তুদের কথা।—এস্থলে একটী চমৎকার উদাহরণ মনে পড়িতেছে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে এক স্থলে ঐক্যের উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা দেখা যায়। খ্রীষ্টীয়ান মহাশয়গণ ক্ষমা করিবেন; আমি কিন্তু বাইবেলের সেই অংশের এই রূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করি। অংশটী এই —বাইবেল গ্রন্থে জলপ্লাবনেরপর বাবিল নগরে এক অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণের কথা আছে। আমি তাহাকে একতা প্রশংসা সূচক একটী মনোরম আখ্যায়িকা বলিয়া বিবেচনা করি। গল্পটীর সত্যাসত্যের বিষয় বলিতে পারি না; কিন্তু তৎপাঠে এই বুঝা যায়, যে সামান্য মনুষ্য একতা সূত্রে বদ্ধ হইলে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও বিচলিতচিত্ত হয়েন। ইহা অপেক্ষা একতার প্রশংসা আর কি হইতে পারে?

এই একতা পরম ধন। যে সমাজ এই ধনে ধনী, তাহার সকল অভাব বিমোচিত হয়। আর যেখানে ইহার অভাব, সেখানে সকলই বিশৃঙ্খল, সকলই অভাব। কি দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গ সমাজে এই পরম ধনেরই অভাব দেখা যায়। এই জন্যই বাঙ্গালির এত দুর্দ্দশা। আরও আক্ষেপের বিষয় এই, যে একতা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য কোন চেষ্টা নাই, বরং অনেক স্থলে একতা ছেদেরই চেষ্টা দেখা যায়। সেই চেষ্টা বশতই বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার জন্মিতেছে,—আসাম ও উড়িয্যা প্রভৃতি বাঙ্গালার অংশ, বঙ্গ হইতে পৃথক হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের লোক এক 'বাঙ্গালী' নামে আখ্যাত হইলে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব স্নেহ মমতা পরস্পরের মধ্যে জন্মিবার আশা করা যাইতে পারিত, তাহার মূলচ্ছেদ হইবার বিশেষ চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইয়াছে? এই সকল কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?—ইহার প্রধান কারণ দেশের কতিপয় প্রধান২ লোক এবং সাময়িক পত্রাদির সম্পাদকদিগের মধ্যে মতভেদ ও পরস্পর ঈর্ষ্যা। যাঁহাদের দ্বারা দেশের অশেষ হিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে দেখিলে কি মনে হয়? তাঁহারা যদি এক বাক্য হইয়া এবিষয়ে মনোযোগ করেন, তবে অনায়াসেই দেশ মধ্যে ঐক্য স্থাপন হয়। তাহা হইলে আজি ভাষা লইয়া বিবাদ, কালি ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ ইত্যাদি সকল বিবাদই ভঞ্জন হইয়া যায়। বিশেষতঃ সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণের এবিষয়ে একান্ত চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

কেননা তাঁহারাই দেশের মুখ-স্বরূপ, এবং সুশিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল সম্প্রদায়েরই পরিচালক (leader) বলিয়া গণ্য। সুতরাং তুচ্ছ বিষয়ের কতকগুলি মতভেদ লইয়া পরস্পর কলহ পরিত্যাগ করিয়া, যত দিন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যে বদ্ধপরিকর না হইতেছেন, তত দিন কোন ফলেরই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, মধ্যে২ একতা একতা করিয়া বাতুলের প্রলাপের ন্যায় অনেক গোলমাল ও আন্দোলন শুনা যায় সত্য; কিন্তু কই যত গর্জ্জে, তত (কি ? কিছুত) বর্ষে না!

এই একতা হীনত্ব যে মহানর্থের মূল, তাহা বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক করে না। ইহাই বাঙ্গালীর ভীরুস্বভাবের এক প্রধান কারণ। এবিষয়ে বাঙ্গালীর বাল্য শিক্ষার দোষ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই," এই ভয়ানক প্রবাদই সেই দূষিত শিক্ষার সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে দেশের লোকেরা স্বীয় সন্তানগণকে এরূপ শিক্ষা দেয়, তাহারা যে পরের বিপদ পড়িলে আপনার ন্যায় সাহায্য করিবে, তাহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যে দেশের লোকের মধ্যে এই একতা নাই, তাহাদের অনন্ত দুঃখ নিশ্চিত। সুতরাং যত দিন বাঙ্গালী এই একতা হারে বদ্ধ না হইতেছে, ততদিন তাহার শুভ ঘটিবার কোন প্রত্যাশা নাই। ঐক্য না থাকাতেই যে দুই এক জন লোকের মনে পরের মহাবিপদের সময় সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারাও অগ্রসর হইতে পারেন না। কেননা তাঁহারা ভাবেন যে, সেখানে সাহায্য করিতে গেলে তাঁহাদের পক্ষ কেহই সমর্থন করিবে না; সুতরাং সেরূপ সাহায্যে কোন ফলই ফলিবে না; লাভের মধ্যে 'মুখরস্তত্রহন্যতে' হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিরত হন। বাস্তবিকও এরূপ অনেক আপদ বিপদ আছে, যাহাতে এক জনের সাহায্যে বিশেষ কিছুই উপকার হইতে পারে না; কিন্তু যদি সেই সাহসী পুরুষের আর দশ জন সহায় থাকে, তবে তিনি অনায়াসেই সহায়তা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমাদের দেশে এরূপ একতা-সূচক দুই একটী প্রবাদও আছে। যেমন "দশের লাঠি একের বোঝা।" কিন্তু এই প্রবাদটী সাহস প্রকাশ সূচক কার্য্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া, অস্মদ্দেশীয় ভিক্ষুকদিগের দ্বারাই উক্ত হইয়া থাকে "দশে মিলি করি কাজ, হারিলেও নাহি লাজ," —এই একটী একতা-সূচক প্রবাদ। কিন্তু সৎকর্ম্মে এবং প্রকৃত বীরত্ব প্রকাশের স্থলে এই প্রবাদ অনুসারে কার্য্য না করিয়া, লোকে যখন অসৎ ও লজ্জাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য অথবা অবমানিত হয়, তখনই উক্ত প্রবাদটী আবৃত্তি করিয়া আপনাদের মনকে প্রবোধ দেয়! ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই' প্রভৃতি উক্ত সকল প্রবাদই সহ্য এবং ভাল জ্ঞান করিতে পারি, যদি বাঙ্গালি ভায়া স্বদেশ প্রচলিত একটী প্রবাদের প্রকৃত মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। সে প্রবাদটী এই;—"মহিষের শিঙ বাঁকা, যুঝিবার বেলা একা।" যে বাঙ্গালি এই প্রবাদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তিনি ধন্য,—তিনিই বাস্তবিক আর্য্য-

বংশসম্ভূত। তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করি। বাস্তবিকও এই শেষোক্ত প্রবাদটী বাঙ্গালির পক্ষে যে কত উপযোগী ও বাঙ্গালি স্বভাবের কত পরিচায়ক, তাহা বলা যায় না। তুমি স্বার্থপর হও, তুমি আত্মসুখে রত থাক, তুমি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীগণ হইতে পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহাও কর,—তুমি যাহা ইচ্ছা কর, সকলই সহ্য করিতে পারিব; কিন্তু হে বাঙ্গালি! বিপদের সময় তোমার প্রতিবেশীকে ফেলিয়া পালাইও না;—তখন বাঁকা মহিষের শিঙের ন্যায় তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে এক হইয়া যুঝিতে প্রবৃত্ত হও। কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, অন্ততঃ তুমি সেই সময়েও একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া তোমারই মুখোচ্চারিত প্রবাদের মত কার্য্য কর, তাহা হইলেই চারিতার্থ হইব, তাহা হইলেই বাঙ্গালী নামের গৌরব রক্ষা হইবে, তাহা হইলেই তোমার ও দেশের মঙ্গল হইবে! যদি তুমি এরূপ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পদধূলি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব হে বাঙ্গালি! তোমার নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, যে অন্ততঃ তুমি ঐ প্রবাদানুসারেও তোমার দেশবাসীদিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর।

গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা।

যদিও মানব সমাজে অতি দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অতিশয় হীন ও নিরুপায়, তথাপি কোন২ বিষয়ে গণিকাদিগের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা অধম। মনুষ্যসমাজে এমন কোন অবস্থার লোকই নাই, যাহারা বারাঙ্গনাদিগের ন্যায় সকল লোকের হেয় এবং তুচ্ছীকৃত। এমন কি, কারাগারস্থ ভয়ানক দুরাচার পাপী লোকেরাও তত অবজ্ঞাত এবং অশ্রদ্ধীকৃত নহে। যদিও এই দুর্ব্যবহৃত যোষাগণের মধ্যে কেহ২ সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করে বটে; কিন্তু তাহাদের সে সুখ অচিরস্থায়ী, এবং তাহা এরূপ উপায়ে সাধিত হয়, যে তাহাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং তৎসঙ্গে২ তাহাদের স্বাভাবিক গৌরব ও স্বর সম্ভ্রমও ঘুচিয়া যায়।

আবার ধনশালিদিগের ঘরের স্ত্রীলোকের অবস্থা আরও মন্দ—এত মন্দ যে, যে সকল অধম স্ত্রীলোক কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অপেক্ষাও মন্দ। তবে কেবল যাহারা অতিশয় দরিদ্র ভাবাপন্ন, অথবা গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে সমাজ মধ্যে অতিশয় হেয় হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ ভাল বটে। কিন্তু তাহা হইলেই যে যথেষ্ট হইল, এমন নহে। কেননা উক্ত বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের কখনই এমন স্বাধীনতা জন্মিতে পারে না—তাহাদিগকে নিতান্ত হেয় পরাধীনতা জন্য ক্লেশ নিয়তই সহ্য করিতে হয়। আদৌ বিবেচনা কর, অস্মৎ সমাজের উচ্চাবস্থার স্ত্রীলোকেরা, যাহাতে তাহাদের অবস্থোচিত মানসিক উন্নতি, ধৈর্য্য

এবং গৌরব বিধান হইতে পারে, এরূপ কোন উপযুক্ত শিক্ষাই পায় না। এক সেই শিক্ষাভাবেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা হীনাবস্থ করিয়া রাখে। দ্বিতীয়ঃ, সেই শিক্ষা যাহাতে বহুল প্রচার এবং সুশৃ-ঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার সদুপায়ও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; কেননা অনেকেই অদ্যাবধি তাহার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন নাই। তাহারও কারণ এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক স্বার্থপর; নিজের লাভ না বুঝিলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হইবে না। স্ত্রীশিক্ষায় যে কি স্বার্থ লাভ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বুঝিলাম, আমার পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইলে, সে অর্থোপার্জ্জন করিবে; কিন্তু আমার পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে কি লাভ হইবে? সে কিছু 'চাকরি' করিতে যাইবে? না; 'স্ত্রীলোকে চাকরি করিতে যাইবে না,'—পুরুষের এই ভাবনাই বাঙ্গালী স্ত্রীর অশেষ দুঃখ, অসৌভাগ্য ও হীনা-বস্থার কারণ। এ ভাবনা কেন হয়?—বঙ্গ সমাজে বড় ঘরের স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইতে পারে, এরূপ কার্য্য প্রায় নাই, এই জন্য। স্বার্থপরতা সম্বন্ধে এতদূর। আবার কুসংস্কারও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বা-ধীনতার আর একটী প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক এত প্রবল, যে শুদ্ধ ইহারই কারণে উক্ত দুই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে বহুল প্রচার ও উন্নতি হইতেছে না, ইহা বলিলে অত্যুক্তি দোষে পড়িতে হয় না। কেননা এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী ঐ সকল বিষয়ের আবশ্যকতা বুঝিয়াও, কুসংস্কারের কেবল প্রবলতা বশতঃ, তদ্বিষয়ের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন। একদিন কোন এক আত্মীয় বন্ধুর সহিত স্বাধীনতা বিষয়ক কথোপকথন হইতেছিল; তিনি শেষে বলিলেন, "হাঁঃ তাহা ভাল বুঝি ও স্বীকার করি; কিন্তু আগে জীবনের কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাই, পরে আমাদের পুত্র পৌত্রেরা যাহা খুসি, তাহা করিবে।"—কতদূর কুসংস্কারের প্রবলতা! স্ত্রীশিক্ষার আব-শ্যকতা প্রতিপাদন করা যদিও আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমরা একটী কথা বলিব। বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিৎদিগের মত এই যে সমস্ত মানসিক গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ (প্রায় সমস্তই) মাতা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবিষ-য়ের প্রমাণের জন্য তাঁহারা বলেন, যে পৃথিবীতে যত বড় লোক জন্ম গ্রহণ করি-য়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকের মাতা অতিশয় গুণশালিনী ছিলেন। যদি একথা সত্য হয়, (এবং আপাততঃ সত্য বলিয়াই বিশ্বাস্য,) তবে দেখ, শুদ্ধ একমাত্র বুদ্ধিবান পুত্র লাভের জন্যই স্ত্রীশিক্ষার (অর্থাৎ মাতার বুদ্ধির উৎক-র্ষতা সাধনের) কত প্রয়োজন!

এক্ষণে বক্তব্য বিষয়। যদিও দুই একটী স্ত্রীলোক আজি কালি স্বেচ্ছা বশতঃ স্বামী প্রভৃতির অনুরোধে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কেননা তাহা নিরুদ্দেশ্য এবং অসু-কার্য্যে প্রযুক্ত। তাঁহারা লেখা পড়া শিখিলে, হয়ত দূরস্থ স্বামিকে যে দুই এক খানি পত্র অথবা দুই একটী কবিতা লেখেন, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থ-কর্ত্রী স্বরূপ যশোলাভ করিতে ব্যগ্র হন। সেই অবধি উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়। এবিষয়ে

তাঁহাদের দোষ নাই। আমাদের সমাজেরই সম্পূর্ণ দোষ। কেননা তাঁহাদের সেই শিক্ষা যাহাতে উত্তম কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া শুভ ফলপ্রসূ হইতে পারে, সমাজ তাহার কোন উপায় করিয়া রাখে নাই। সেই সকল স্ত্রীলোক অনায়াসে শিক্ষয়িত্রী স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার সম্বন্ধে অনেক (অসাধারণ) সুবিধা করিতে পারেন। কিন্তু হতভাগা বঙ্গ সমাজের নিয়ম কি কঠিন!—বাঙ্গালীর 'মেয়ের' পায়ে লৌহ অপেক্ষা কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত শৃঙ্খল পরাইয়া রাখিয়াছে। তাহাকে বাটীর বাহির হইতে দিবে না! এখানেও কুসংস্কার দারুণ প্রবল। অনেকেই ভাবেন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বহুল প্রচার হইলে, স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবে অনেক দোষ ঘটে। কি বিষম ভ্রম! এবিষয়ে অধিক কথা বলিবার আমাদের অবকাশ নাই। তবে বাল্যাবধি স্ত্রীলোকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা দিলে কি রূপ ফল ফলে, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলে, আমরা ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।* বঙ্গ সমাজে প্রচলিত ঐ সকল ভয়ানক অনিষ্টকর কারণ বশতঃ শতং বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাহাদের স্বীয় ভরণ পোষণের জন্য পুরুষের নিতান্ত অধীন। তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যার পরিচালনা, পরিমার্জ্জনা করিবার সুযোগ হয় না বলিয়া, সেই বুদ্ধি বিজন বন মধ্যগত ভূগর্ভনিহিত হীরক রত্নের ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। যে বুদ্ধি অশেষ সুফল প্রসূ হইতে পারিত, সেই বুদ্ধি অতি অকিঞ্চিৎকর 'সুচিক্কণ কেশ বন্ধন' কার্য্যাদিতে নৈপুণ্য প্রকাশে নিয়োজিত হইয়া থাকে; অথবা (আজি কালি) যিনি বড় বুদ্ধি ও কার্য্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন, তিনি হয়ত স্বামির নিমিত্ত এক যোড়া কারপেটের পাদুকা বুনিয়া দিলেন। বাল্যাবস্থা হইতে এই সকল কার্য্যে পারগতা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সতত ব্যাপৃত থাকেন। পরে যৌবনের পূর্ব্বে (অনেকেই বাল্যাবস্থাতেই) তাঁহাদিগকে এক গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল—সে কার্য্য দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন। এবিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরাধীনতা। কেননা বাঙ্গালী দম্পতী প্রায়ই বিবাহের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকেন, আর তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, যখন ইচ্ছা ও যাহার সঙ্গে ইচ্ছা, যোজনা করিয়া দেন। তাহাতে ভবিষ্যতে দম্পতীর সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে কি না, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও বিচার করা হয় না। এবং সে বিষয় বিচার করিবার জন্য, যাঁহারা সেই চির-বন্ধন বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদিগকেও সুযোগ দেওয়া হয় না। কেবল দুই একটী আপাততঃ সুখকর (কিন্তু হয়ত পরিণাম বিষময়) পার্থিব (আধ্যাত্মিক নহে) বিষয় (যথা বিভব সম্পত্ত্যাদি) বিবেচনা করিয়াই উক্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। তাহাতে পাত্র কি কন্যা, কেহই কোন মত প্রকাশ করিতে পারে না, পায় না। এরূপ কার্য্যে স্বাধীনতা কোথায়? যে দেশে এরূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত, সে দেশের আর অধিক

* *The rise of the Dutch Republic, (condition of the Dutch in the sixteenth Century)*, by J. L. Motley.

কলঙ্ক কি হইতে পারে? [ভবিষ্যতে বঙ্গীয় বিবাহ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার অভিপ্রায় আছে, সেই প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিবার বাসনা রহিল] ।

যাহা হউক, ঐরূপ কার্য্যে যদিও উভয় পক্ষেরই স্বাধীনতা প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় না বটে ; কিন্তু তাহাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করে। তাহার যদি কোন বিষমান্তঃকরণ পুরুষের সহিত সম্মিলন হয়, (এবং তাহা হইবারই এরূপ স্থলে অধিক সম্ভাবনা) তবে আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। সে সময় তাহাকে স্বামির মতের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া চলিতে হয়। যে কার্য্য তাহার মতে ভাল বোধ না হয়, তাহা তাহার বিপরীত মতাবলম্বী (হয়ত নির্ব্বোধ ও মূর্খ) স্বামির মতে ভাল বোধ হইতে পারে, সুতরাং সে গৃহিনী হইয়াও গৃহের ব্যবস্থা করিতে পারে না—কেননা স্বামী অসন্তুষ্ট হইবে। স্বামীর প্রসাদ ভিন্ন তাহার গতি নাই, সুতরাং তাহাকে আজীবন সেই বিপরীত মতের পোষকতা করিয়া কাল যাপন করিতে হয়। তজ্জন্য অসন্তুষ্টি জন্মিলেও প্রকাশ করিবার উপায় নাই—বরং স্বামির সমস্ত কার্য্যেই বাহ্যিক প্রিয়তা দেখাইয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না! কি ভয়ানক কথা!—এইরূপ অপ্রাকৃত ভাল বাসা সংস্থাপন এবং বিপরীত মতাবলম্বী পুরুষের সতত সন্তোষ সম্পাদন চেষ্টাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বভাবের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার মানসিক স্বাধীনতাও একবারে ঘুচিয়া যায়। তাহাতে তাহাকে সম্পূর্ণ কপট, হীনচেতা এবং হেয় করিয়া তুলে। সুতরাং এপ্রকার অস্বাভাবিক পরতন্ত্রতা, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অসুখের কারণ হইয়া পড়ে।

বিশেষতঃ সেই হতভাগিনী বঙ্গবালার অবিবাহিতাবস্থা একবার মনে করিয়া দেখ। মনে কর, তাহার বিবাহের সময় (বঙ্গবাসীর মতে—স্বভাবের মতে নয়) উপস্থিত। সে সময় হয়ত তাহার জ্ঞানোদয়ই হয় নাই, সে যে কি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। অথবা যদি কিছু জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে সে এপর্য্যন্ত বুঝিল, যে তাহাকে এমত এক জনের সহিত মিলিতে হইতে হইবে, যাহার অনুগ্রহ,সন্তোষ এবং ইচ্ছার উপর সমস্ত সুখ নির্ভর করে। কিন্তু সে সেই অপরিচিতের সহিত মিলিতে প্রস্তুত কি না, তাহাতে তাহার ভাবী মানসিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারিবে কি না, তাহা তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, অপর কেহও ভাবিল না, সে নিজেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। বলিলে সমাজে তাহাকে যৎপরোনাস্তি লজ্জা দিবে, হয়ত যাহাদের তাহার সুখ সচ্ছন্দতা বিধান করা কর্ত্তব্য, সেই পিতা মাতারই নিকট কত ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে। তখন সাহস মানসিক স্বাধীনতার সহ অন্তর পরিত্যাগ করিল। তখন সে ভাবিতে বসিল যে, সে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছে (সে শিক্ষার মধ্যে অধিকাংশ উপরোক্ত প্রকার নৈপুণ্য) তাহার কোনটীতে তাহার ভাবি 'কিম্ভুত কিমাকার' স্বামির চিত্ত সন্তুষ্ট করিবে ; সেই ভাবনার সঙ্গে২ সে আপনার মানসিক সুখে জলাঞ্জলি দিল। তখন তাহার

মনে যে সকল স্বাভাবিক সদ্গুণ ছিল, যাহা উপযুক্ত অবস্থাতে পড়িলে, সম্যক রূপে ব্যক্ত হইয়া রমণী স্বভাবের অশেষ শোভা সম্পাদন করিতে পারিত; সেই গুলিকে সে 'তুষের আগুনের' ন্যায় মনের মধ্যে চাপা দিয়া নিবাইতে বাধ্য হইল।

পরে সে যখন পরের স্ত্রী হইল, তখন সম্পূর্ণ পুরুষের অধীন। সুতরাং পরাধীনতার জন্য যে দারুণ কষ্ট, তাহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হইল। তখন আর স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিবারই ক্ষমতা রহিল না। সর্ব্বতোভাবে পুরুষের মনঃ যোগাইয়া কাল কাটাইতে হইবে। পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিবে, স্বাধীনতা (যথেচ্ছাচারিতার নামান্তর) সম্বন্ধে তিনি সিংহের ন্যায় সকল অংশ গ্রহণ করিবেন; আর তাঁহার রমণী বিনা অনুমতিতে সময়ে আহার করিতে পারিবে না। পুরুষ স্ত্রীকে হেলাই করুন, আর তুচ্ছতাচ্ছল্যই করুন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য কায়মনোবাক্যে পুরুষের সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আজ্ঞা বহন করা—বাল্যাবধি সে এই উপদেশ পাইল, পুরুষও চিরকাল সেই রূপ প্রত্যাশা করিল। কি কঠিন নিয়ম? কি ভয়ানক পরাধীনতা? যে ভদ্রলোকেরা স্বীয় উদারতা বশতঃ বিবাহিত স্ত্রীকে বাস্তবিক মনের সহিত ভাল বাসেন, এবং প্রকৃত সাধু ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে এই বলিতে চাই, তাঁহারা আমাদের উপর রাগ করিবেন না; কেননা এস্থলে আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না। আমরা সাধারণ লোকের কথা বলিতেছি; সাধারণের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। অতএব দুই এক স্থলে বিশেষ বিধি দেখা যায় বলিয়া, সাধারণ বিধিকে কখন খণ্ডন বা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে লোক গ্রাসাচ্ছাদনের এবং ভালবাসার জন্য অপরের সম্পূর্ণ অধীন, সেখানে সে অধীন ব্যক্তি কখনই স্বীয় স্বাধীনতা, সম্ভ্রম এবং সুখ রক্ষা করিতে পারে না। অন্যত্র যে নিয়ম, স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও তাই। স্ত্রীলোকও ঐ সকল বিষয়ের জন্য পুরুষের অনুগ্রহের (দাতব্যের) উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। সেই দাতব্যকেই পুরুষ 'ভালবাসা' আখ্যা দিয়া 'গিল্‌টী' করিয়া থাকে; সেটী কেবল স্বীয় লজ্জাকর ব্যবহার রূপ সুলভ মূল্যের ধাতুটীকে ঢাকিবার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা দাতব্য ভিন্ন কিছুই নহে। অতএব এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের সুখ কখনই হইতে পারে না। কেননা যেখানে অপরতন্ত্রতা নাই, সেখানে স্বাধীনতা ও গৌরব জন্য সুখও থাকিতে পারে না।

স্ত্রীলোকের এই রূপ অবস্থাতে শুদ্ধ যে তাহারই কষ্ট হয়, এমত নহে। তজ্জন্য পুরুষকেও বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। আদৌ দেখ, তাহাকে দুই জনের ভরণ পোষণের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। একারণ তাহার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি যে কেহ স্নেহের সামগ্রী থাকে, তাহারা তাহার গলগ্রহের স্বরূপ বোধ হয়। অনেকে বলিবেন, কেন আমাদের স্ত্রীলোকেরা সংসার গোছাইয়া রাখে, এবং সন্তান সন্ততি মানুষ করে। এই ত এক গুরুতর ব্যাপারে তাহারা নিযুক্ত থাকিয়া পুরুষের সাহায্য করিতেছে? সত্য বটে, তাহারা এই রূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু স্ত্রীলো-

কের স্বাভাবিক ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, সে কার্য্য তাহার অনুপযুক্ত বলিয়া সহজেই প্রতীত হইবে। তবে এক্ষণে বঙ্গের মূর্খ স্ত্রী সমাজের পক্ষে এরূপ কার্য্য বিলক্ষণ গুরুতর বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে বটে; কেননা বাঙ্গালি গৃহিণীকে অনেক বালক বালিকা মানুষ করিতে হয়। কিন্তু যখন বঙ্গ সমাজের এরূপ শুভদিন উপস্থিত হইবে, (আশা আছে, সে দিন শীঘ্রই হইবে) যে বঙ্গবাসীরা স্বভাবের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সতর্ক হইবেন, তখন আর বাঙ্গালী গৃহিণীকে অধিক সন্তান লালন পালন করিতে হইবে না। তখন তিনি বাকী সময় কি কার্য্যে ক্ষেপণ করিবেন, সমাজে তজ্জন্য কি ব্যবস্থা আছে বা হইতেছে?

এস্থলে আরও বলা কর্ত্তব্য, যে যাঁহারা বিবেচনা করেন, মাতা কেবল পুত্র পালন কার্য্যেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহারা বিষম ভ্রান্ত। কেননা সেরূপ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলে, বালক ও মাতা উভয়েরই স্বভাব অতিশয় হীন হইয়া যায়। কারণ সন্তান লালন পালনের প্রধান কৌশল এই, যে যদি আমরা আমাদিগের বালকদিগের সুখী এবং সচ্ছন্দ রাখিতে ইচ্ছা করি, তবে তাহাদিগকে অধিকাংশ সময় সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে যাপন করিতে দিব। তাহারা বয়োবৃদ্ধের নিকট অধিক সময় না থাকে। কেননা সে তাহাদের প্রকৃত সহচর নহে। সমানে সমানে হইলে সকল অবস্থার লোকই সুখী ও প্রফুল্ল হয়, এবং সমান পদবীস্থ লোকের নিকট হইতেই অনেক স্থলে অধিক শিক্ষা লাভ হয়। এই কারণেই ভদ্র লোকের ছেলেদের অপেক্ষা ছোট লোকের ছেলেদের অধিক হৃষ্টান্তঃকরণ দেখা যায়; কেননা তাহারা অধিকাংশ সময় মাতার নিকট যাপন না করিয়া, সমবয়স্কদিগের নিকটই অতিবাহিত করে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যেমন বালকের সহচর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীও সেই রূপ সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিতে পারে না। তাহাতে বালকের ও মাতার উভয়েরই মানসিক শক্তির হীনতা জন্মে। তবে বহুদর্শীতা লাভের নিমিত্ত, সকল বয়সের ও সকল অবস্থার লোকের পরস্পর সম্মিলন মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়াই সকল সময় বিষমবয়স্কের সহিত অতিবাহিত করা, কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বড় মানুষের ঘরের স্ত্রীলোক অপেক্ষা মজুরদিগের ঘরের বিবাহিতা স্ত্রীরা অনেক অংশে স্বাধীন ভাবে জীবন ক্ষেপণ করে। তাহারা বসিয়া খাইয়া স্বামীর উপার্জ্জিত ধন ক্ষয় করে না; বরং অনেক স্থলে কাজের সময় স্বামীর সাহায্য করে। তাহারা রন্ধন, বস্ত্রক্ষালন তণ্ডুল প্রস্তুত করণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকে; সুতরাং ধনশালিদিগের স্ত্রীলোকের ন্যায় শুদ্ধ এক এক বার শিশু সন্তান লইয়া আদর করিয়া সময় কাটায় না। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে; ইহাই যে আমাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রার্থয়িতব্য অবস্থা, তাহা নহে। এখানেও স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন; কারণ সাধারণতঃ পুরুষই পরিবার পোষণকর্ত্তা; আর সকলে তাহার প্রত্যাশী।

পরিবার পোষণের প্রধান ভার তাহার উপর থাকে বলিয়া, পুরুষকে কষ্টও বিস্তর সহ্য করিতে হয়। কেননা এমন কত শত যুবা অবিবাহিত শ্রমোপজীবী আছে, যাহারা হয় ত তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিষ্ঠ ; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে লড়াই দিয়া তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়! একারণ সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়াও অল্প মাত্র ফল লাভ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ সে যে পরিমাণে শ্রম করে, তৎপরিমাণে মজুরি লাভ হয় না। পরিবার পোষণেরও তাদৃশ কষ্ট হইয়া থাকে। হয় ত দুই তিন দিন অতি অল্প উপায় হইল ; তৃতীয় দিবসে বেলা চারিটার সময় মজুরি করিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী কিছুই আহারের সংস্থান করিয়া রাখে নাই,—কেননা পয়সা ছিল না। তখন পুরুষ ক্ষুধায় আতুর হইয়াছে, সুতরাং হঠাৎ ক্রোধে অন্ধ হইল। কে না দেখিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সে তাহার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতেছে। এরূপ আচরণ পুরুষে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে ; স্ত্রীও তাহা সহ্য করে! কারণ কি ?—স্ত্রীর শরীরে কি তাদৃশ বল নাই ? তাহা নহে। স্বামীর প্রতি গাঢ়ানুরাগ আছে বলিয়াই কি এই প্রহার অতি মিষ্ট বোধ হয় ? কখনই নহে। তবে কি ?—পুরুষ এরূপ অবস্থায় ভাবে, যে তাহার স্ত্রী তাহার গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ রূপে তাহার অধীন ; স্ত্রীও উক্ত পরতন্ত্রতা বিশেষ রূপে অবগত আছে, এবং জানে যে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলে আপনার আরও দুর্দ্দশা ঘটিবেক। এই কারণেই একজন প্রহার করে, অপর জন সহ্য করে। যখন স্ত্রীলোক আর পুরুষের এরূপ পরতন্ত্র না থাকিবে, তখন স্বামির স্ত্রীর প্রতি এরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নও ঘুচিয়া যাইবে ; কিন্তু পরতন্ত্রতা না ঘুচিলে, ইহা কখনই যাইবে না। মজুরদিগের ত কথনই নাই—মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যেও যাঁহাদের অবস্থা সমধিক উন্নত নহে, তাঁহাদিগকেও অনেক স্থলে স্ত্রীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে না দেখা যাউক, তথাচ অনেক সময়ে স্ত্রীকে নিতান্ত গলগ্রহ ও ভার বলিয়া বিবেচনা হয়, সুতরাং প্রহারের পরিবর্ত্তে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। সেরূপ অবস্থায় যে দম্পতীর মধ্যে পবিত্র প্রণয় থাকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এখানেও স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন বলিয়া সেই সমস্ত তাচ্ছিল্য ভাব সহ্য করে, এবং ক্রমশঃ তাহার অন্তর গৌরব বিহীন ও অতিশয় হীন হইয়া পড়ে। কি আশ্চর্য্য, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও লোকে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ বিবাহ রূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং আপনারাও পশ্চাৎ বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করে ও মনঃপীড়া পায়। এই রূপ অসাময়িক বিবাহ * যতদিন আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি নাই। যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহারা উক্ত প্রকার আচরণকারী স্বামীদিগকে স্ত্রী পীড়ন জন্য যথোচিত নিন্দা করিতে পারেন,—সেরূপ স্বামীদিগকে পশু, বানর প্রভৃতি মিষ্ট আখ্যায় অভিহিত করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইতে পারে

*পরিবার পোষণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করাকেই এখানে অসাময়িক বিবাহ বলা যাইতেছে।

বটে; কিন্তু উক্ত পুরুষেরা যে এরূপ নিন্দা, এরূপ আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, নিন্দা করিবার সময় তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, যে সে দোষ ঐ সকল পুরুষের নহে; আমাদের সমাজেরই সম্পূর্ণ দোষ। এরূপ দুষিত সমাজের অন্তর্গত থাকাতেই তাঁহারা সেরূপ করিতে অপরিহার্য্য রূপে বাধ্য হইয়াছেন। সমাজের ঐ সকল দুষিত নিয়ম পরিবর্ত্তন কর, দেখিবে, উক্ত অত্যাচার সকলও হ্রাস হইয়া আসিবে। যত দিন তাহা না করিবে, ততদিন এই সকল ব্যবহার, এই সকল কাণ্ড চক্ষে দেখিতে হইবে; মানবদুঃখে কাতর দয়াবানদিগকেও মন কষ্ট পাইতে হইবে। এই সকল বিষয় একবার স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, উক্ত নিরুপায় পুরুষদের কলঙ্ক অনেক হ্রাস হইতে পারে।

অতএব দেখা গেল যে জীবন ধারনের প্রধান উপায়, কেবল দৈনিক আহারের নিমিত্তই আমাদের সমাজের কত অসংখ্য লোক অন্য অন্য লোকের দাসের ন্যায় অধীন ও পরতন্ত্র। একথা একবার ভাবিয়া দেখিলে সৃষ্টির দেবতা স্বরূপ মনুষ্যকে ইতর প্রাণীদিগের অপেক্ষাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হীনাবস্থাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কেননা পশুরাও অতি সহজে এবং অপরতন্ত্র ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জীবন রক্ষার জন্য যত কিছু দ্রব্যের আবশ্যক, তাহার মধ্যে আহার সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, ইহা বোধ হয়, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম, সুতরাং যদি সেই আহারেরই অভাব হয়, তবে তাহার অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ ও কষ্ট কি হইতে পারে! যখন কোন মনুষ্যকে এইরূপ প্রয়োজনীয় আহারের প্রচুর পরিমাণ সংস্থানের জন্য অনুচিত পরিশ্রম এবং অসামান্য কষ্ট ও অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তখন তাহাকে কখনই স্বীয় গৌরব রক্ষা করিয়া অপরতন্ত্র ভাবে জীবন রক্ষা করিতে বলা যায় না, এবং এই খাদ্যের সংস্থানের জন্য যখন তাহাকে অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন সে ওরূপে জীবন যাপনের প্রত্যাশাও করিতে পারে না।

অমৃতে গরল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ যাত্রা।

ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, যদিও ভারতবাসীদিগের মধ্যে কোন কালেই বাণিজ্যের তত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই, তথাচ তাঁহারা একেবারে যে বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাহা কেহই বলিতে সাহসী হয়েন না। "বাণিজ্যে বসতেলক্ষ্মী" এ কথার অর্থ ভারতবাসীরা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ অন্তর্ব্বাণিজ্যেতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বহির্ব্বাণিজ্যেতেও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আর্য্যেরা আধুনিক সমুদ্র গমন ভীরু মনুষ্যদিগের ন্যায় দাসত্ব-বৃত্তি অবম্বলন করিতেন না। তাঁহারা স্বাধীনচেতা ছিলেন। সমাজকে তত ভয় করিতেন না কিম্বা সমুদ্র গমনে

ভীত ছিলেন না। ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সে কালে যদিও এক্ষনকার মত সমুদ্র গমনোপযোগী কোন বাষ্পীয় জলযান ছিল না, তথাচ আর্য্যেরা এক রূপ অর্ণব পোত নির্ম্মাণ করিতেন, যদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রেতে গমনাগমন করা যাইত। অধুনা সেরূপ পোত চট্টগ্রাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশীয়েরা তাহাকে শুলুক বা শুলক কহে।

সারণ গড় হইতে শ্রীক্ষেত্রে জল পথে গমন করিতে হইলে প্রথমতঃ মহানদী দিয়া পোত বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতে হইত এবং তথা হইতে ক্রমান্বয়ে সাগর উপকূল দিয়া উত্তর মুখে গমন করিলে শ্রীক্ষেত্রে গমন করা যাইত। এই নিমিত্ত কেহই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে সাহসী হইতেন না। যে রূপ পোতের কথা আমরা প্রথমে উল্লেখ করিলাম, সেই রূপ পোতারোহণেই লোক যাতায়াত করিত।

মহারাজ সুরেন্দ্র সিংহ ক্ষেত্রাধিপতি প্রেরিত লোক মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে চারিখানি শুলুক সুসজ্জীভূত করিতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রী রাজাদেশ শ্রবণ মাত্রে অনতিকাল মধ্যে পোত সুসজ্জীভূত করিয়া সারণ গড়ের বন্দরে রক্ষিত করিয়া নরপতিকে সম্বাদ করিলেন।

এই বন্দরটী সারণ গড়ের রাজধানী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ছিল। এই স্থানে নানা স্থানের বণিকগণের বাণিজ্য পোত প্রভৃতি নির্ম্মিত, সংস্কৃত ও রক্ষিত হইত। নদীতটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল, তমাল ও অশ্বত্থ প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ ছিল। মধ্যে২ সূত্রধার কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পকারদিগের উপনিবেশ। ইহার পশ্চিমেই গঞ্জ বা বাজার। যদিও বহুমূল্য কোন সামগ্রী তথায় পাওয়া যাইত না, তথাচ আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ধান, চাউল, যব, গম প্রভৃতি শস্যের আমদানী ও রপ্তানী থাকাতে স্থানটী বহু জনাকীর্ণ ছিল। এমন কি, গভীর রজনীতেও লোক কোলাহল ও কারখানার ঠক্ ঠক্ শব্দ শ্রবণ গোচর হইত। কিন্তু কাল চক্রের কি অদ্ভুদ গতি! অধুনা সে স্থানের চিহ্নটী মাত্র লক্ষিত হয় না, সমস্ত নদী গর্ব্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সারণ গড় ও চন্দ্রপুরের নীচে দিয়া যে নদী প্রবাহিত ছিল, সেইটী মহানদীর শাখা মাত্র। এই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে বড় বড় পোতাদি গমনাগমন করিতে পারিত না। কারণ সে সময় নদীতে যদিও প্রবাহ থাকিত, কিন্তু জলের অল্পতাহেতু এবং মধ্যে মধ্যে গুল্ম চড়া থাকাতে অনেকেই বোঝাই নৌকা কিম্বা বড় বড় পোতাদি লইয়া যাতায়াত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। এবং এই সকল অসুবিধা নিরাকরণনিমিত্তই মহানদীর তীরে একটী বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সমস্ত আয়োজন হইলে রাজা সুরেন্দ্র সিংহ সপরিবারে শিবিকারোহণে এই বন্দরে আগমন করিলেন। এবং মন্ত্রীকে পুনর্ব্বার রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য সতর্ক হইতে বলিয়া নৌকারোহণ করিলেন।

চারি খানি শুলুক। বড় খানিতে

রাজা ও রাজ্ঞী আরোহণ করিলেন, দ্বিতীয় খানিতে রাজ কুমারী ক্ষীরোদ বাসিনী ও তাঁহার সহচরীগণ। তৃতীয় খানিতে পরিচারক বর্গ ও ক্ষেত্রাধিপতির প্রেরিত লোক নর সিংহ মিশ্র। এবং অবশিষ্ট খানি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে পরিপূরিত ছিল।

সকলে পোতারোহণ করিলে পর কর্ণধার সুবাতাস দেখিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকা গুলি দেখিতে২ দৃষ্টি পথের অতীত হইল।

এদিকে কুমার বিজয় সিংহ শৈলবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রত্যুষে অশ্বারোহণে একাকী জগৎমোহনের অনুসন্ধানার্থে বহির্গত হইলেন।

দিন যায় আবার দিন আইসে, সে দিন গত হয়, আবার নূতন দিন আইসে। জগৎ পিতার অক্ষয় ভাণ্ডার। কিছুই ফুরায় না। দিনও ফুরায় না। কিন্তু মনুষ্য জীবনের দিন ফুরাইতেছে। তুমি দেখিলে এক দিন হাসিতে খেলিতে গত হইল। আজ যে কর্ম্ম করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তোমার আলস্য বশতঃ তাহা সম্পন্ন হইল না, মনে করিলে কাল করিব, না হয় পরশ্ব করিব, আবার এদিন আসিবে। কিন্তু আজ যে দিবস বৃথা গত হইল, সে দিন যে তোমার সীমাবিশিষ্ট জীবনের এক দিন ক্ষয় হইল তাহা ভ্রমেও তুমি মনে করিলে না! তোমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হইল, ক্রমেই যে তুমি শেষের সে দিনের নিকটবর্ত্তী হইতেছ, তাহা তুমি মনেও একবার ভাবিতেছ না,—তোমার বয়স বৃদ্ধি হইতেছে। শৈলবালা প্রাসাদোপরি পালঙ্কে উপবেশন করিয়া বিজয় সিংহের জন্য নেত্রনীরে ভাসিতেছেন, আশা সুন্দরী তাঁহার কর্ণে মৃদুস্বরে কহিতেছেন "এদিন যাবে, রবে না। তুমি রাজপুত্রের অঙ্কবাহিনী হইয়া সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করিবে।" শৈলবালা শুনিয়া আশ্বস্ত হইতেছেন, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু ভাবিতেছেন না, তাঁহার দিন গত হইতেছে। বিজয়সিংহ ঐ আশয়ে গমন করিতেছেন। তিল২ করিয়া জগৎ মোহনের অনুসন্ধান করিতেছেন। ভাবিতেছেন, যত শীঘ্র পাই, ততই ভাল। পাইলে রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং সত্বর চন্দ্রপুরে যাইয়া শৈলবালার বদন সুধা পানে চিত্ত-চকোর চরিতার্থ করেন। কায়মনে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার নিকট সময় অমূল্য, কিন্তু তথাপি দিন বসিয়া থাকিবার নহে, দিন যাইতেছে। পোড়া রূঢ়া ক্ষীরোদবাসিনী বাতায়নে একান্ত মনে বসিয়া নদী তীরের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেছেন, এবং কত কি ভাবিতেছেন। একদিন তাঁহার নিকট এক মাসের ন্যায় বোধ হইতেছে তথাচ তাঁহার দিন যাইতেছে। দিন যায়, কিন্তু কাহার ও বা সুখে কাহার বা দুঃখে দিন যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

দিন যায়। পাঠক! এই বেলা চল, তোমাকে একবার জগৎ মোহনের সহিত পরিচিত করিয়া দিই। জগৎ মোহন রূপে গুণে, "নদের চাঁদ," "ছোঁদল কুত কুত," কি "বিদ্যা দিগ্‌গজের' ন্যায় ছিলেন না। কিম্বা আরব্য উপন্যাসের "কুব্জ অশ্বপাল," সেক্স পিয়রের "ক্যানিবেলে" বা "ডন কুইক ঝোটের" মতও

নহে। বরং সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ওয়েভারলির "ল্যাম বরণির" সহিত কতক কতক তুলনা অনুভব করা যায়। জগৎ মোহন সুন্দর পুরুষ ছিলেন। কিন্তু কলিকাতার লোণা জল পায়ী লম্বোদর বাবু কিম্বা প্লীহা অগ্রগাস-বিশিষ্ট উত্তরের চেলে মহাজনদিগের ন্যায় তাঁহার রঙ্গ তত ফরসা ছিল না। চক্ষু দুইটী মধ্যমাকৃতি, তত বিশাল নহে, কিন্তু কুটিল দৃশ্য বিশিষ্ট। নাসিকাটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সুন্দর পুরুষ মাত্রে-রই ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, কাহারও বা ঘোর রক্তবর্ণাভা বিশিষ্ট এবং কাহার কাহার ঈষৎ রক্তিমাভা-বিশিষ্ট। কিন্তু জগৎ মোহনের ওষ্ঠদ্বয় এতদুভয় বর্জ্জিত। বরং অল্প অল্প কালিমাযুক্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা অনেক তাম্রকুট পায়ীদিগের সেরূপ বর্ণের ওষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের অন্যান্য অবয়বে প্রকৃত বীর পুরুষদিগের অঙ্গের সহিত বড় বৈষম্য দেখা যাইতনা।

জগৎ মোহন কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন না অথচ বীর পুরুষদিগের ন্যায়-ও তাঁহার প্রকৃতি ছিল না। তিনি, মূঢ়, ও কর্কশ স্বভাবাপন্ন ছিলেন এবং লাম্পট্য দোষে দূষিত হইলে যে সকল দোষ স্বভাবে অর্শে তাহা সকলই তাঁহাতে বিদ্য-মান ছিল। শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা সে শক্তি পরিচালিত হইত না। তিনি বাক্‌পটু ছিলেন কিন্তু রুক্ষভাষী। লোক বিগর্হিত কোন কার্য্য করিতে সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করিতেন না।

"ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান" এই মহা বাক্যটীর আধিপত্য সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক। এক্ষণেও অনেক বড় লোকের পশুশালা তত্ত্ব করিলে এরূপ জানোয়ার দুই চারিটী দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ মোহনও তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি মহারাজ সুরেন্দ্র সিংহের আলয়ে অবস্থান করিয়া রাজভোগ আহার করিতেন এবং পরের অনিষ্ট করিতেন। কিন্তু ভাগ্যপ্রতিকূলতা বশতঃ এক্ষণে দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া অরণ্যে দস্যুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধির প্রভাবে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।

জগৎ মোহন অরণ্য মধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছেন; কিঞ্চিৎকাল পরে নিকট-স্থিত একটী সহচর মৃদুস্বরে কহিল "মহা-শয়! আর ভাবিলে কি হইবে, এখন অন্য উপায় স্থির করুন।" জগৎ মোহন তাহার কথার উত্তর না দিয়া অন্য এক-জনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন, "পরীক্ষিত! তুমি কি সত্য সত্যই আমাদের মতে চলিবে না?"

দস্যুর নাম পরীক্ষিত। দস্যু কহিল, "মহাশয়! আমার দ্বারা কিছুতেই এ গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। পেটের দায়েই হউক কি প্রলোভনে পড়েই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই কি আমি উপকারী জনের—উপকারী কি? প্রাণ দাতার প্রাণ নষ্ট করিতে পারি? নষ্ট করা দূরে থাকুক বরং আপনারা যদি তাঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন, তবে আমি আপনাদিগের সমভিব্যাহারে যাইব না,

অপিচ তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রসর হইব।

অন্য কোন ব্যক্তির মুখ হইতে এবম্বিধ গর্ব্বিত বচন নিঃসৃত হইলে জগৎ মোহন তদ্দণ্ডেই তাহার সমুচিত শাস্তি দিতেন কিন্তু পরীক্ষিত সামান্য দস্যুগণের ন্যায় ছিল না। দস্যুগণের মধ্যে তাহারও বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং জগৎ মোহন ক্রোধান্বিত না হইয়া কিঞ্চিৎব্যাঙ্গের সহিত কহিলেন, "বিজয় সিংহ কি তোমাকে কোন ললনার লোভ দেখাইয়াছে?" পরীক্ষিতের চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল, কহিল "আপনার ন্যায় আমার মন স্ত্রীলোকের দাসত্ব করিতে চায় না। লোকে আপনার মত পৃথিবীকে দেখে। আমি আপনার ন্যায় নারীর জন্যে বনবাসী হই নাই, অত্যাচারীগণ কর্তৃক বনবাসী হইয়াছি। দস্যুবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছি কিন্তু— ধর্ম্মকে এক কালে বিসর্জ্জন করি নাই। আমি আপনার আদেশ মত সে দিবস সেই উড়িয়ার উপর আক্রমণ করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিজয় সিংহের হস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলাম। আমি বন্দী, তিনি বিচার কর্ত্তা। ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিতেন। কিন্তু নিজ দয়াগুণে আমার প্রতি কোন রূপ দণ্ডাজ্ঞাই প্রদান না করিয়া আমাকে মুক্তি দিলেন। আমি এখন কোন্ প্রাণে সেই প্রাণদাতার প্রাণ বিনষ্ট করিব?"

পরীক্ষিতের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই জগৎ মোহন আরক্ত নয়নে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন "আমি কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিনা। আজ পর্য্যন্তও জগৎ পরাধীন হয় নাই। যদি প্রাণ এই দেহে থাকে, তবে দেখিতে পাইবে, বিজয় সিংহের রক্ত দ্বারা এই হস্ত চিত্রিত হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সময় অন্য একটী পরিচারক তথায় প্রবেশ করিল এবং জগৎ মোহনকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র প্রদান করিল। জগৎ মোহন পত্রবাহককে কোন কথা না বলিয়া অনিচ্ছুক ভাবে পত্র খানি খুলিলেন এবং নীরবে পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক পৃষ্ঠা পড়া হইল, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পাঠ করিতেই তাঁহার মুখ মণ্ডল ঈষৎ রক্তিম হইল এবং ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে পাঠ সমাপ্ত হইল, কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন; সঙ্গিগণ এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে জগৎ মোহন পুনর্ব্বার পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে বৃহদরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হও, আমিও তোমাদিগের অনুগমন করিতেছি।" ইহা কহিয়া তিনি পত্র খানি উষ্ণীষ মধ্যে রাখিলেন। অসাবধান বশতঃ পত্র পড়িয়া গেল, কেহ দেখিতে পাইল না।

ইতি মধ্যে অদূরে মনুষ্যের কণ্ঠ স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। একটী পরিচারক তাঁহার আদেশ ক্রমে দেখিয়া আসিয়া কহিল "মহাশয়, কয়েক জন লোক বনাভিমুখে আগমন করিতেছে। বিশেষ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না, পরিচ্ছদ দৃষ্টে বোধ হইল, তাহারা সন্ন্যাসী হইবে।" জগৎ মোহন কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন। এক জন দস্যু কহিল, "আমরা এক দল অস্ত্রধারী, পথিকেরা নিরস্ত্র,সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই।"

এতচ্ছ্রবণে জগৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "ভয় কিসের ?—কিন্তু এখানে আর অনর্থক থাকিবারও ত কোন কারণ দেখি না। বরং সকাল সকাল গমন করাই ভাল।" সঙ্গীগণ কেহই একথার প্রতিবাদ করিল না। সকলেই জগৎ মোহনের সমভিব্যাহারে গমন করিল।

সূর্য্য ঘড়ি।

দ্রাঘিমার দূরত্বের পরিমাণানুসারে স্থানীয় সময়ের পরিবর্ত্তন।

১। পৃথিবী দিন রাত্রি মধ্যে একবার স্বীয় সমুদায় অবয়ব পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়াতে ২৪ ঘন্টা কাল অতীত হয়। ভূগোলবেত্তারা গণনাদির সুবিধার জন্য পৃথিবীকে ৩৬০ সমান অংশ বা ডিগ্রিতে ভাগ করিয়াছেন; সুতরাং পৃথিবী ১৫° পনের অংশ প্রতি ঘন্টায় ১° এক অংশ প্রতি ৪ মিনিটে, ও ১´ এক কলা প্রতি ৪ সেকেণ্ডে ঘুরিতেছে। এই হেতু এক কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অগ্র পশ্চাৎ সময়ে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ১৫° অংশ অন্তর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে স্থিত স্থানের সময়ের এক এক ঘন্টা করিয়া প্রভেদ হয়; অর্থাৎ এক স্থানের বেলা দুই প্রহর হইলে তৎপূর্ব্বে ১৫° অন্তর স্থিত স্থানের বেলা অপরাহ্ন ১ ঘটিকা হইবে, এবং পশ্চিমে ১৫° অন্তর স্থিত স্থানের বেলা পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইবে।—যথা পিকিন কলিকাতার পূর্ব্ব দিকে ২৮° ১১´ অন্তরে স্থিত, অতএব কলিকাতার সময়ের ১ ঘন্টা ৫৩ মিনিট অগ্রে পিকিনে সূর্য্যের উদয় হইবে, সুতরাং কলিকাতায় বেলা ঠিক দুই প্রহর হইলে পিকিনে বেলা অপরাহ্ন ১টা ৫৩ মিনিট হইবে; এবং লণ্ডন কলিকাতার ৮৮° ২২´ অপরাহ্ন অন্তর পশ্চিমে স্থিত, অতএব কলিকাতার সময়ের ৫ ঘন্টা ৫৩ মিনিট পরে তথায় সূর্য্যের উদয় হইবে, সুতরাং কলিকাতার ঠিক দুই প্রহর বেলার সময় লণ্ডনে বেলা পূর্ব্বাহ্ন ৬ ঘটিকা ৭ মিনিট হইবে।

২। কলিকাতার সময়ের সহিত অপর প্রধান২ স্থানের সময়ের যে কি কি প্রভেদ অর্থাৎ কলিকাতার পূর্ব্ব বা পশ্চিম স্থিত স্থানের দ্রাঘিমার দূরত্বের পরিমানানুসারে কত সময় অগ্রে বা পরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়, তাহার নির্ঘন্ট লঘিমা এ দ্রাঘিমাসহ পর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল।

৩। এই নির্ঘন্টের সময়ের প্রভেদের সারিতে যে যে স্থানের যত সময়ের প্রভেদের সহিত যোগের (+) চিহ্ন আছে সেই সেই স্থানে কলিকাতার তত সময় অগ্রে সূর্য্যের উদয় হইবে; আর যে যে স্থানের যত সময়ের প্রভেদের সহিত বিয়োগের (—) চিহ্ন আছে সেই সেই স্থানে কলিকাতার তত সময় পরে সূর্য্যের উদয় হইবে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে।

৪। এই নির্ঘণ্টের মধ্যের সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবকলন ;—

উ=বিষুব রেখার উত্তর স্থিত লঘিমা।

দ=উহার দক্ষিণ স্থিত লঘিমা।

পূ=ইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রিনিচ নগরের পূর্ব্ব স্থিত দ্রাঘিমা।

প=উহার পশ্চিমস্থিত দ্রাঘিমা।

কলিকাতার সময়ের সহিত স্থান বিশেষের সময়ের প্রভেদের নির্ণয়ের নির্ঘণ্ট।

নগরের নাম	লঘিমা		দ্রাঘিমা		কলিকাতা হইতে অপর স্থান বিশেষের সময়ের প্রভেদ	
					ঘণ্টা	মিনিট
উত্তমাশা অন্তরীপ	দ ৩৪°	২২	পূ ১৮°	২৯	৪	৩৯—
এডিন্‌বরা	উ ৫৫	৫৭	প ৩	১০½	৬	৬—
কনষ্টান্টিনোপল	,, ৪১	০	পূ ২৮	৫৯	৩	৫৭—
কন্যাকুমারী অন্তরীপ	,, ৮	৬	,, ৭৭	৩০	০	৪৩
কলিকাতা	,, ২২	৩৩	,, ৮৮	১৭	০	০—
কাণ্ডী, সিংহলদ্বীপের অন্তর্গত	,, ৭	২০	,, ৮০	৪৮	০	৩০—
কায়রো	,, ৩০	২	,, ৩১	১৫	৩	৪৮—
কিটো	দ ০	১৪	প ৭৮	৪৮	১১	৮—
কেপ্‌টাউন	,, ৩৩	৫৬	পূ ১৮	২৮	৪	৩৯—
গোয়াটিমালা	উ ১৪	৩৭	প ৯০	৩০	১১	৫৮—
জিব্রাল্টার	,, ৩৬	৭	,, ৫	২১	৬	১৫+
জেডো	,, ৩৫	৪০	পূ ১৩৯	৫০	৩	২৬—
নব ইয়ার্ক	,, ৪০	৪২	প ৭৪	১	১০	৪৯—
পারিস্	,, ৪৮	৫০	পূ ২	২০	৫	৪৪+
পিকিন্	,, ৩৯	৫৪	,, ১১৬	২৮	১	৫৩—
বোম্বাই	,, ১৮	৫৬	,, ৭২	৫৩	১	২—
বোগদাদ	,, ৩৩	১৯	,, ৪৪	২৪	২	৫৬+
বোর্ণিয়া	,, ৪	৫৬	,, ১১৪	৫০	১	৪৬—
মক্কা	,, ২১	২৮	,, ৪০	১৫	৩	১২—
রায়ো জেনিবা	দ ২২	৫৪	প ৪৩	১৫	৮	৪৪—
লণ্ডন	উ ৫১	৩০	,, ০	৫	৫	৫৩—
লিস্‌বোন্	,, ৩৮	৪২	,, ৯	৮	৬	৩০—
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত	দ ৩৩	৫২	পূ ১৫১	১৭	৪	১২+
সেন্ট পিটার্সবর্গ	উ ৫৯	৫৬	,, ৩০	১৯	৩	৫৩—

সদসদ্বিবেচনা।

ষ্টোইক্‌স।

খ্রীষ্টের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস-দেশে সানিক সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতবর ক্রেটিদের জিন নামক এক জন শিষ্যের দ্বারা ষ্টোইক্‌স মত উদ্ভাবিত হয়। খ্রীষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ষ্টোইক্‌সেরা রোমনগরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মতে মানব সমাজের হিতার্থে কার্য্য করাই ধর্ম্ম। স্বার্থ একবারে ত্যজ্য। মনুষ্য স্বাধীন; ইচ্ছা করিলেই সমুদায় ভাবকে দমন করিতে পারে। সুতরাং স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া সার্ব্বভৌম মঙ্গলসঙ্কল্প হওয়া সম্ভবাতীত নহে।

কোমটী আপনার দর্শনের মূল মত বোধ হয়, ষ্টোইক্‌সদিগের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ইহাঁদিগের ন্যায় পরোপকার ব্রতের গুণ ব্যাখ্যা করিতে আর কোন সম্প্রদায়িদিগকে দেখা যায় না।

গ্রীসদেশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের ন্যায় ষ্টোইক্‌সেরা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মত ব্যক্ত করিতেন। সদসৎ বিবেচনার উপায় নির্দ্ধারণই আমাদিগের আলোচ্য বিষয় হওয়াতে আর আর মতের ব্যাখ্যাদি এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এতৎ সম্বন্ধে এসম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কোন স্পষ্ট মত বা ভাব প্রকাশ করেন নাই। তথাপি মহৎলোকের নির্দ্দিষ্ট পথ অথবা মানব সমাজের উপকার সাধনই বোধ হয়, ন্যায়ান্যায় বিচারের মাণদণ্ড ছিল।

"মহৎলোকের নির্দ্দিষ্ট পথ" নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ মহৎলোক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এবিষয় আবার ন্যায়ান্যায় বিচারসাপেক্ষ। যেহেতু কার্য্যের ন্যায়ান্যায় দেখিয়াই কর্ত্তা ভাল মন্দ বিশেষণে অভিহিত হয়। সুতরাং ন্যায়ান্যায়ের প্রাক্‌জ্ঞান না থাকিলে, মহৎ ও নীচ লোক নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু ষ্টোইক্‌সেরা মহৎ লোকের কার্য্য দ্বারা ন্যায়ান্যায় ব্যবধান করিতে বলেন। সুতরাং ইহাতে ন্যায় শাস্ত্রোক্ত ইতরেতর আশ্রয় দোষ * আরোপিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে সমুদায় মহৎলোকের কার্য্যই পূর্ণ, একথা বলাতে ষ্টোইক্‌সদিগের মত নিতান্ত বাতুলের ন্যায় বোধ হয়। মনুষ্যের কার্য্য পূর্ণ, একথা শুনিলে, বোধ হয়, আজ কাল বিদ্যালয়ের এক জন দ্বাদশ বর্ষীয় ছাত্রও উপহাস করিবে। আমরা এই মতের প্রতিকূলে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, মহৎলোকেরা পরস্পর বিরোধী। অর্থাৎ এক জন যাহাকে সৎজ্ঞান করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, অপরে তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

অতএব কার্য্যের প্রত্যক্ষ ও গূঢ় উভয়বিধ ভাবকে কি রূপে সমভাবে ন্যায়সঙ্গত বলা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, মানব সমাজের উপকার সাধনই যদি ন্যায়ান্যায়ের মূল হয়; তাহা হইলে জ্ঞানকেই ন্যায়ান্যায়ের মূল বলা যাইতে পারে। যেহেতু এক মাত্র জ্ঞান দ্বারাই উপকার সাধনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতে পারে। জ্ঞান, ন্যায়ান্যায়ের মূল হইতে পারে না,

* Petitio Principii

আমরা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি।

অতএব সদসৎ বিবেচনা সম্বন্ধে ষ্টোইক্‌সদিগের মত ভ্রমসঙ্কুল ব্যতীত কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ বা পরিষ্কৃত বলিয়া বোধ হয় না।

সুখবাদ।

খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস-দেশে পণ্ডিতবর ইপিকিউরস্ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। ইপিকিউরসের শিষ্য লুক্রিসিয়সের লিখিত গ্রন্থ হইতে আমরা সুখবাদ মতের বিষয় অবগত হই। কথিত আছে,—ইপিকিউরস তিন শত গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার লিখিত তিন খানি লিপি ব্যতীত তন্মধ্যে আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই মতে সুখ ভোগই জীবনের কার্য্য। যাহাতে দুঃখ নাশ হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় করাই পরম পুরুষার্থ। ষ্টোইকসেরা যেরূপ কঠোর-বাদ প্রচার করিয়া মনুষ্যকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কেবল দেব ভাবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহাঁরা একবারে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া কি রূপে দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত হয়, তাহার প্রতিই দৃষ্টি করিতেন।

ইপিকিউরসের মতে **কার্য্যকে কারণ** এবং **কারণকে কার্য্য** রূপে পরিণত করা ব্যতীত অন্য দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, পরম পুরুষার্থ হইতেই প্রকৃত সুখ উৎপন্ন হয়। সংসারের দুঃখাতীত অটল অচলের ন্যায় ঈশ্বরে নিমগ্নচিত্তলোকের কোনই দুঃখ নাই। কিন্তু এ স্থলে **ধর্ম্মজ্ঞান** কারণ এবং **পরমসুখ** কার্য্য, কিন্তু ইপিকিউরস পরম সুখকে কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রতাদৃশ গুরুতর ভ্রম জালে পতিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই পরবর্ত্তী সুখবাদিগের মধ্যে এতাধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বেচ্ছাচার লোক দেখা যায়। বস্তুতঃ এ সম্প্রদায়সংস্থাপনকর্ত্তা ইপিকিউরস সন্ন্যাসির ন্যায় সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হইয়া অতি ক্লেশে (সাংসারিক পক্ষে) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তথাপি তাঁহার শিষ্যদিগের অপরিমিতাচার দেখিয়া আমরা কখন তাহাদিগের উপর অধিক দোষারোপ করিতে পারি না। কেননা মনুজবৃন্দ স্বভাবতই প্রায় সমধিক ভোগ সুখে আসক্ত হয়, আবার যৌবনকালে ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হইয়া মানবগণকে প্রায়ই অসৎ পথে চালিত করে; অধিকন্তু সম্মুখে নানাবিধ প্রলোভন মনুষ্য মণ্ডলীকে কুকর্ম্মাভিমুখে লইয়া যায়। ধর্ম্ম-ভয়, লোক-ভয়, রাজ-ভয় প্রভৃতি গুরুতর কশাঘাত তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। তাহার উপর আবার যদি তাহার (কুকর্ম্মের) অনুকূলে দুই একটী যুক্তি বা মহাজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই মনুষ্য সৎপথে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় যে অপূর্ণ মানব পাপাসক্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি কেহ এ রূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও সাধু থাকিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অতি ভক্তিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই। এ রূপ অবস্থায় সাধু থাকা অত্যুত্তপ্ত আকোর নিক্ষিপ্ত ধাতুর কঠিন থাকা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়। আপনার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখিলেই এ বিষয় সহজে বোধগম্য হইতে পারে। যখন প্রলোভন, কোন বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্যের দিকে আত্মাকে আকর্ষণ করে, তখন কত কুটিল যুক্তির দ্বারা আমরা তৎকার্য্যের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিতে সযত্ন হই।

অতএব এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে,মানবপ্রকৃতিপরবশ হইয়া পরবর্ত্তী সুখবাদিগণ যার পর নাই ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া মানব প্রকৃতি কতদূর নিম্নগ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(১) সুখবাদিগণ বলেন যে, সুখ উদ্দেশ্যে চারিটী গুণের আবশ্যক, যথা অভিজ্ঞান, সাম্য, গাম্ভীর্য্য এবং ন্যায়। কোন প্রকারের সুখ, **পরমসুখ** বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা অভিজ্ঞান দ্বারা নির্দ্দেষ্টব্য। সুতরাং সুখবাদ মতে বিজ্ঞতাই সদসদ্বিবেচনার মূল। অভিজ্ঞান, জ্ঞান ও বহুদর্শন, এই দুই হইতে উৎপন্ন সুতরাং **সদসদ্বিবেচনাও** জ্ঞান এবং বহুদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান সদসদ্বিবেচনার মূল হইতে পারে না; অতএব এক মাত্র **বহুদর্শনই** সুখবাদ মতে সদসৎ বিবেচনার মূল। কিন্তু ভাল মন্দ দুই রূপ প্রত্যক্ষ না করিলে কখন অভিজ্ঞান জন্মে না। সুতরাং পুনঃপুনঃ অসদাচরণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে কিরূপে প্রকৃত সুখোৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যদি পুনঃ২ অসদাচরণ না করিলে সৎনির্দ্দেশ করিতে না পারা যায়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তাকে পূর্ণ ও পবিত্রবলা যাইতে পারে না।

বোধ হয়, পাঠকগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরকে পূর্ণ ও পবিত্র স্বরূপ বলিতে অস্বীকার করিবেন না; সুতরাং আমরা আপনাদিগের নিকট নিঃসঙ্কোচিতচিত্তে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সুখবাদের অভিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

(২) প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি ন্যায়াচারণ না করিলে সমাজে সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং পরম সুখের ব্যাঘাত হয়। অতএব ন্যায়ানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, ন্যায়াচরণ সময়ে কয় জন লোক এ রূপ মনে ভাবিয়া থাকে? বস্তুতঃ অনেকেই উদ্দেশ্যবিরহিত হইয়া এক মাত্র স্বভাববশতঃই সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব সুখবাদ মত কেমন করিয়া সত্য বলা যাইতে পারে?

নীয় প্লেটনীক।

খ্রীষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে প্লটিনস্ নামক একজন দার্শনিক কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সদসৎ বিবেচনা সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট মত অর্থাৎ সতের ভাব আত্মার স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মা পতিত হইয়া জড়দেহসহ সংযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মাকে অগ্রে জড়গুণ অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়-জনিত সুখ দুঃখাতীত ভাবে সংস্থাপন করিতে হইবে। তখন স্বতঃই তাহার সদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

এই সময় হইতেই প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত যত দার্শনিকই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলের মতই পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের ও বাইবেলের রূপান্তর মাত্র। অতএব আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া আগামী হইতে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মত সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

মহম্মদের মত।

সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ পরলোক গমন করিলে, কয়েক বর্ষ পরে তদীয় অভিপ্রায় সকল লিপিবদ্ধ হয়। তিনি শিষ্যদিগকে মৌখিক উপদেশ দিতেন, যখন যে শিষ্য নিকটে অবস্থিতি করিতেন, তিনিই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, লিখিত উপদেশ গুলির অধিকাংশ তাঁহার পত্নী আয়েসার গৃহিত একটী সিন্দুকে নিবদ্ধ ছিল। কতক গুলি উপদেশ সামান্য রূপে জনশ্রুতিতেও ছিল। পরে মহম্মদের ও তাঁহার সমকালীন শিষ্যবর্গমধ্যে অধিকাংশের পরলোক গমনের পর, যখন ঐ সকল উপদেশাবলী লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, তখন মুসলমানেরা উহা সংগ্রহের নিমিত্ত উদ্যোগী হন, এবং আয়েসার গৃহস্থিত সিন্দুকে ও শিষ্যবর্গের মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া কোরাণ নামক মহাগ্রন্থ হয়। এই সংগ্রহ কার্য্য খলিফা আবু বেকারের সময়ে আরম্ভ হইয়া উমারের সময়ে শেষ হয়।

মনুষ্যের আকৃতিতে যেমন সাম্য ও বৈষম্য, উভয় ভাব লক্ষিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরগত অভিন্নাকৃতি সত্ত্বেও যেমন তাহাদের পার্থক্য দেখা যায়; মানসিক ভাব সম্বন্ধেও তদনুরূপ; দুই ব্যক্তির অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ঐক্য ও কিয়ৎ পরিমাণে অনৈক্য। একবারে সকল বিষয়ে এক রূপ অভিপ্রায়সম্পন্ন দুই জন লোক জগতে নাই।

মহম্মদের মত সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। কতক গুলি সমুদয়, কতক বা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কতক বা জনশ্রুতিতে ছিল। তিনি জীবিত থাকিয়া এই সমুদয় অভিপ্রায় গ্রন্থবদ্ধ করিলেও অবশ্যই অনেক স্থানে তাঁহাকে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে হইত। একবারে সমুদয় অপরিবর্ত্তিত বা অসংশোধিত অবস্থায় পুস্তকনিবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং যখন তদীয় দেহত্যাগের পরে ঐ সকল উপদেশ সংগৃহীত হইল, তখন অবশ্যই যে অনেক স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অন্যায় নহে।

বিশেষতঃ যে স্থলে তাঁহার মতের সহিত সংগ্রহকর্ত্তার মতের একতা হয় নাই, সে স্থলে যে সংগ্রাহকের মতই প্রবল হইয়াছে, ইহাও বলা বাহুল্য। লোকে যতই কেন প্রত্যাদেশবাদী হউক না, প্রত্যাদেশের সত্যতা সম্বন্ধে স্বীয় বুদ্ধি পরিচালন করিয়া থাকে; সুতরাং দুই এক স্থলে গুরূপদেশও শিষ্য বিশেষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া রূপান্তরিত হয়। ফলতঃ কোরাণের সমুদয় ভাগ মহম্মদের মতানুযায়ী নহে; অবশ্য অধিকাংশ স্থান সাধারণতঃ মহম্মদের মতানুযায়ী, কিন্তু স্থান বিশেষে মহম্মদের উপদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া সঙ্কলিত হওয়া কোথাও বা তাঁহার উপদেশ গুলি অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিপরীত ভাবে নিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতি বাক্যে যে প্রকার বক্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার, মহম্মদের দেহ ত্যাগের পর যে তদীয় কোন উপদেশই এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

ফলতঃ যে সকল উপদেশ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই অর্থান্তর সংঘটনের বিশেষ সম্ভাবনা।

এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম আল, কোরাণ; আল শব্দে ঐ, কোরাণ শব্দে গ্রন্থ। আল কোরাণ, ঐ গ্রন্থ উহা ১১৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। সমুদয় কোরাণের সমালোচন করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে, সংক্ষেপতঃ মহম্মদেব মত বলাই আমাদের অভিপ্রায়।

একেশ্বরবাদই কোরাণের প্রধান উপদেশ, সুতরাং মহম্মদের প্রথম উপদেশ

১। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, অতএব মনুষ্য মাত্রের ধর্ম্মও এক।

এস্থলে বক্তব্য যে মহম্মদ বাণিজ্যাদি উপলক্ষে অনেক সময় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রধান প্রদেশে গমনাগমন করিতেন, এবং খ্রীষ্টীয় বাইবেল হইতেই কোরাণের অধিকাংশ সংগৃহীত। অথচ মহম্মদের খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন না করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচারের কারণ কি? খ্রীষ্টধর্ম্মে একেশ্বরবাদের অভাব নাই এবং কোরাণের উপদেশ অপেক্ষা বাইবেলের উপদেশ কোন ক্রমে হীনও নহে, বরং অনেক স্থান বিশেষ আদরণীয়।

বোধ হয়, খ্রীষ্টীয়ানদিগের ত্রিত্ববাদ দেখিয়া মহম্মদ খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। যদিও খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় ত্রিত্ববাদকে একেশ্বরবাদ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন, কিন্তু সকল সময়ে সকলে এই অভিন্ন ভাব ধারণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, এই ত্রিত্ববাদকে একেশ্বরবাদে পরিণত করা এত কঠিন যে, অনেক অভিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ানও ভিন্ন মতাবলম্বিকে এই ভাব বুঝাইয়া দিতে সহজে কৃতকার্য্য হন না। এই রূপ ত্রিত্ববাদ থাকাতেই ইয়ুনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ানগণ ও নিউমান্ প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতদিগের শিষ্যেরা খ্রীষ্টীয়ান-সন্তান হইয়াও প্রকৃত বাইবেল গ্রন্থ হইতে এত দূরে রহিয়াছেন। বোধ হয়, মহম্মদের জ্ঞানেও এই ত্রিত্ববাদ একেশ্বরবাদের বিরোধী বোধ হইয়াছিল, এবং তন্নিমিত্তই তিনি পুনঃ পুনঃ একেশ্বরবাদ কীর্ত্তন করিয়া অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করেন।

মহম্মদের দ্বিতীয় উপদেশ।

"ঈশ্বরের পূজা কর ও তাঁহার উপর নির্ভর কর।" মনুষ্য অপূর্ণ জীব; সকল সময়ে স্বীয় ক্ষমতার প্রতি নির্ভর করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ ভৌতিক বা সামাজিক নিয়ম দ্বারা আমাদের সুখ দুঃখের অধিকাংশ সংঘটিত হয়, অথচ আমরা বহু যত্ন করিয়াও তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। আবার মনুষ্য মাত্র ভাবী দর্শনে অন্ধ অথচ ভাবি ঘটনার উপর তাহার সুখ দুঃখের নির্ভর; এই সকল কারণেই মন স্বভাবতঃ অপরের আশ্রয় গ্রহণে ব্যাকুল হয়। আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলেই ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে ইচ্ছা হয়। অপরন্তু যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রদান করিতে পারেন। মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার পূজা করিতে স্বভাবতই অভিলাষ জন্মে। মহম্মদও সেই সাধারণ প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়াছেন।

৩ উপদেশ। পরে পুনর্ব্বার নূতন

দেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

যদিও ঈশ্বরের ভাব এবং স্বীয় আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা নিরাকার পদার্থের ভাব কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান এত অল্প যে এই রূপ নিরাকারের ভাব অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুরুহ। জড় পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। তৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অজড় বা চিন্মাত্র জ্ঞান তেমন নহে; উহা একমাত্র স্বীয় আত্মায় অনুভূত হয়। আবার পরলোকে জীবাত্মা কি রূপে অবস্থিতি করিবে, তাহা নিজের মনে ধারণ করাই কঠিন; তৎ সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ দেওয়া অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদিগে সংসারে দেখিতে পাই, আত্মা দেহের আশ্রয় ব্যতীত কোন ব্যাপারই সাধন করিতে পারে না। আবার পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার হইবে, ইহাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস আছে। মহম্মদের পক্ষে ঈশ্বরের নিকট জীবাত্মার দোষ গুণের বিচার সম্বন্ধে শিষ্যদিগকে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়াও নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছিল। সুতরাং মহম্মদকে অবশ্যই এই সকল বিষয় প্রগাঢ় রূপে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। তিনি বহু চিন্তার পরে যাহা খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন। বিনা শরীরে ঈশ্বরের নিকট কথা বার্ত্তা হইতে পারে না—সুতরাং মৃত্যুর পর নূতন দেহ ধারণ না হইলে ঈশ্বরের নিকট নিরবয়ব আত্মার অবস্থিতি অসম্ভব মনে করিয়া তিনি পুনঃ দেহ ধারণ বিষয়ক উপদেশ করিয়াছেন। ফলতঃ পরলোকের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মনুষ্য নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলেই যে নিজের মানসিক ভাব অনুসারে পরলোকের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৪ উপদেশ। বিচারের দিবস এঞ্জেল (দেবতা) পরিবৃত হইয়া জগদীশ্বর বিচারাসনে বসিবেন ও প্রত্যেকের সওয়াল ও জওয়াব শুনা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইল, আমরা পরলোক সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ, অথচ পরলোকের প্রকৃতি উত্তম রূপে অবগত হইতে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা। যাহা লাভের উপায় নাই, তাহা লাভ করিতে চেষ্টা হইলেই মনে কল্পনার প্রভাব বৃদ্ধি পায়; যখন কোন উপায়েই তাহা সুলভ হয় না, তখন কল্পনা দ্বারা সেই বাসনা পূর্ণ হয়। এদিগে প্রত্যেক পদার্থের অতীত বিষয় কল্পনাতেও আসে না, সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের ক্ষুদ্রতাদোষ অপূর্ণতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক মূল পদার্থকে আশ্রয় করিয়া কল্পনা দ্বারা তদপেক্ষা বৃহৎ, নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ এবং অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট পদার্থের নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। সংসারে কোন রাজা বা বিচারক একাকী নির্জ্জনে বসিয়া কোন অপরাধির বিচার করেন না—তিনি অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া প্রকাশ্য রূপে বিচার দান করেন। যিনি এই রূপ না করিয়া একাকী আপন ইচ্ছায় অপরাধির দণ্ড দেন, লোকে তাঁহার প্রশংসা নাই।—সুতরাং মনুষ্য অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে সুবিচারক জগদীশ্বর অবশ্যই প্রকাশ্য বিচারে দোষীর দণ্ড দিবেন, ইহাই বিশেষ যুক্তি-

সিদ্ধ। আবার দোষীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে না দেওয়া অন্যায়, যে বিচারক এই নিয়মের অন্যথাচরণ করেন, তিনি সমাজে নিন্দিত। সুতরাং পরম সুবিচারক ঈশ্বর অবশ্যই পাপিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দিবেন, অতএব পরকালেই উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে।

৫ম। অনন্তর (সওয়াল জওয়াবের পর) পরস্পর পরস্পরকে প্রতিহিংসা করিবে।

প্রতি হিংসা মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক। ইহ কালে এরূপ মনুষ্য বিরল, যিনি কোন সময়েও প্রতিহিংসা করেন নাই। অদ্যাপি যে মানব সমাজে হত্যাকারীর প্রাণ দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, প্রতিহিংসা বৃত্তিকে তাহার অন্যতর নেতৃ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হয়। লোকে লোভ বা অন্য কোন দুষ্প্রবৃত্তি প্রযুক্ত অনর্থক নিরীহ ব্যক্তির প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে সমাজ শুদ্ধ সকলেই দোষীর দণ্ড দান নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। অথচ অনেক সময়ে, মনুষ্য সমাজে দোষী ব্যক্তির সমুচিত দণ্ড হয় না; যেখানে দোষীর দণ্ড হয় না, লোকে তথায় বিচারকের নিন্দা করিয়া থাকে। আবার মনুষ্যের পরোক্ষ জ্ঞান অন্যের উপর নির্ভর করে, প্রমাণের অভাবে অনেক সময়ে সমাজ মধ্যে অপরাধির সমুচিত দণ্ড হয় না। ঘোর অপকর্ম্ম করিয়াও লোকে, নির্দ্দোষের ন্যায় নির্মুক্ত থাকে। এদিগে ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, জগতের সকল ব্যাপার সর্ব্বদা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতেছে। তিনি মহান্ ন্যায়বান্ বিচারক, সুতরাং তাঁহার নিকট কোন পাপ গোপন থাকিবে না এবং অবশ্যই পাপির দণ্ড হইবে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই মনুষ্যে পরলোকেও পাপির দণ্ড হইবার আশা করে।

পরন্তু জাতি বিশেষের প্রবৃত্তি বিশেষ প্রবল। সকল জাতিতে সকল প্রবৃত্তি সমান রূপ দেখা যায় না। আর্য্য জাতির ক্ষমাপরতা, গ্রীকদের স্বদেশ গৌরব, আরব জাতির প্রতিহিংসা প্রসিদ্ধই আছে। যে জাতির যে প্রবৃত্তি প্রবল, তাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রও সেই ভাবে গঠিত। মনু, অপকারী শত্রুও শরণাগত বা পলায়নপর হইলে তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের পরকালে দণ্ড বা পুরস্কার নানা রূপ আছে, কিন্তু প্রতিহিংসা নাই। আরবেরা প্রতিহিংসা-প্রধান জাতি, তাহাদের মধ্যে এমনও দেখা গিয়াছে যে দুই দলে বিরোধ উপস্থিত হইলে যাবৎ এক দল সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল না হইয়াছে, তাবৎ বিবাদের অবসান হয় নাই। এই জাতির মধ্যে যে পরকালেও প্রতিহিংসার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫ উপদেশ। পরীক্ষা। এইরূপ প্রতিহিংসার পরে জীবাত্মা সকল "আলসারাও" নামা এক সেতুপার হইবে।

এই সেতুর প্রশস্ততা তরবারির অগ্র ভাগের ন্যায়। পুণ্যাত্মারা দক্ষিণ ও পাপিগণ বাম হস্তের উপর ভর দিয়া এই সেতু পার হইবে। সেতুর নিম্নস্থ স্থান ভয়ানক কন্টকময়, সাধুরা নির্ব্বিঘ্নে উহা পার হইয়া স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। দুরাত্মারা স্খলিত হইয়া অধঃপাতিত হইবে।

মহম্মদ মমজীয় জাতির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মমজীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে

এই রূপ পরীক্ষার উল্লেখ আছে; বোধ হয়, উহা হইতেই তিনি স্বীয় শিষ্যবর্গকে প্রোক্ত রূপ পরীক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। ফলে দোষাদোষের বিচার করিতে হইলেই প্রকৃত পক্ষে দোষ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা জন্মে, আমরা পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা যেরূপ দোষ সাব্যস্ত করিয়া থাকি, অনেক সময়ে তাহা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া সন্দেহ হয়, এই ভ্রান্তিবশতঃ জনসমাজে অনেক সময়ে প্রকৃত দোষী মুক্ত পায় অথবা নির্দোষের দণ্ড হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই রূপ ভ্রম সঙ্কুল প্রণালীতে বিচার করিবেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; সুতরাং তাঁহার দোষ নির্ব্বাচনের রীতিও অলৌকিক ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। আবার আমরা মনে যতদূর কল্পনা করিতে পারি, তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা বা সদ্গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অতএব মমজীয় জাতির পরীক্ষা প্রণালী যে মহম্মদ স্বীয় বক্তৃতা মধ্যে নিবেশিত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

৬ উপদেশ। সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত নরক।

সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু পুণ্য পাপেরও লঘু গুরু ভেদ আছে। অতএব পুরস্কার ও দণ্ডের লঘু গুরু থাকা আবশ্যক। এক তণ্ডুলের দাতা এবং চির প্রতিপালক বা জীবনরক্ষাকর্ত্তা সমাজে তুল্য সৎকর্ম্মান্বিত বলিয়া পরিগণিত হন না, অবশ্য প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত ব্যক্তি সমাজের নিকট অধিকতর আদৃত হন। এই রূপে সামান্য তস্কর অপেক্ষা নরঘাতকের গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই মূল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই মহম্মদ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মতও মমজীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত।

৭ উপদেশ। মধ্যস্থান (এরাক)।

মহম্মদ বলেন, যাহাদের পুণ্য পাপ কিছুই নাই (যথা শিশু উন্মাদ প্রভৃতি) তাহারা স্বর্গ ভোগ বা নরক যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইয়া মধ্য স্থানে থাকিবে।

পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের দণ্ড দানের ব্যবস্থার পর সহজেই মনে হয় যে, যাহারা না পুণ্যবান্, না পাপী, তাহাদের গতি কি হইবে? এই প্রশ্নের উদয় মনোমধ্যে হওয়াতে তিনি এরাক নামক স্থানবিশেষ ইহাদের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানটি স্বর্গ ও নরকের মধ্য স্থান। বোধ হয়; নিষ্পাপ শিশুদিগের পরকাল চিন্তা করিয়াই মহম্মদ এরাকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতটীও মমজীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সমীরণ।

হে সমীরণ, তোমার কি ক্লান্তি বোধ হয় না? তুমি দিবানিশি বহিতেছ, বার মাস বহিতেছ, তবু তোমার ক্লান্তি বোধ হয় না? দেখ, কমলিনীকান্ত সমস্ত দিন আকাশে ভ্রমণ করিয়া দিবাবসানে সাগরে ডুব দিয়া বিশ্রাম করিতে যান, তাঁহার ক্লান্তি বোধ আছে; তোমার কি ক্লান্তি বোধ নাই? আমি দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বত্র বিরাজ কর। তুমি আকাশে মেঘ মাথায় করিয়া বেড়াও, কলিকাতার বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তায় ধুলা মাথায় করিয়া বেড়াও, নদীর কোলে ঢেউ খেলিয়া বেড়াও, আমবাগানে গাছের শুষ্ক পত্র উড়াইয়া বেড়াও, কুঞ্জবনে নানা ফুলের সৌরভ চুরি করিয়া, আবার সেই সৌরভ নানা স্থানে ছড়াইয়া বেড়াও; হে অঞ্জনারঞ্জন, তবু কি তোমার ক্লান্তি বোধ হয় না? হে সমীরণ, তুমি বড় ক্রীড়াপর, আমি যখন কবিতা রচনা করিতে বসি, তখন আমার কাগজ উড়াইয়া আমাকে বিরক্ত কর, যুবতীরা যখন গঙ্গাস্নান করিয়া কলসী কাঁকে, এলোকেশে, মরাল গমনে পথ চলিয়া ঘরে আইসেন, তখন তুমি তাঁহাদের এলোকেশ উড়াইয়া খেলা কর, কমলিনী যখন সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়া অনন্য দৃষ্টিতে আকাশ মার্গে সতৃষ্ণ নয়নে সুর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে, তুমি তখন সরোবরের জলে ঢেউ তুলিয়া তাহাকে জলে ডুবাইয়া ধরিয়া খেলা কর, পুষ্পিতা মাধবী যখন রসালের গলা জড়াইয়া থাকে, তুমি সজোরে তাহাকে রসালচ্যুত করিয়া বিরহ দুঃখ অনুভব করাও, কুলবতীরা যখন প্রদীপ জ্বালিয়া, তোমার ভয়ে বসনাঞ্চলে প্রদীপ ঢাকিয়া, গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করেন, তুমিই না তখন প্রদীপ নিবাইয়া তাঁহাদের অপ্রস্তুত কর? এ তোমার কি খেলা? দেখ, তুমি পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া গুম২ শব্দ কর, পত্রহীন বৃক্ষের শাখায়২ বেড়াইয়া মর্ মর শব্দ কর, আর কৃষ্ণ যখন নৌকায় করিয়া ব্রজকামিনীদিগকে যমুনা পার করাইতেছিলেন, তখন তুমিই না যমুনার কালো জলে ঢেউ তুলিয়া নৌকা ডুবাইয়া তামাসা দেখিয়াছিলে? ছি, তুমি বড়ক্রীড়াপর।

না, সমীরণ, তুমি ক্রীড়াপর নহ; আমার ভ্রম। তুমি এই রূপে সকলকে সন্তুষ্ট কর। দেখ, ইংরাজেরা শীত-প্রধান দেশবাসী; এদেশের গ্রীষ্ম তাহাদের অসহ্য; এই জন্য তুমি খস্ খসের সুগন্ধি বহন করিয়া গৃহস্থিত ইংরাজের প্রাণ জুড়াও, কবিরা যখন চিন্তা করিতে২ ক্লান্ত হইয়া প্রদোশকালে গবাক্ষ দ্বারে বইসেন, তখন তুমি সংকীর্ণ গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কবিদের প্রাণ শীতল কর, পথিক যখন মার্ত্তণ্ড তাপে ক্লান্ত হইয়া বটবৃক্ষতলে শয়ন করে, তখন তুমি মন্দ মন্দ বহিয়া তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর কর; আমি যখন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ভাগীরথীতীরে বসিয়া, কৃতপাপ স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া "তুমি ত জীবনের আধার, ডাকি তোমারে" বলিয়া সেই অনাথনাথকে ডাকি, তখন তুমি নদীজলে সিক্ত হইয়া মন্দ২ বহিয়া আমার শরীর শীতল কর।

হে সমীরণ, তুমি কত কাল এই ভাবে বহিতেছ? আমি ত জন্মাবধি তোমাকে এই ভাবে বহিতে দেখিতেছি। যখন বাল্যকালে ধূলা খেলা করিতাম, যখন স্বাধীনতা, দাসত্ব, অসভ্যতা, সভ্যতা, ইহার কিছুই জানিতাম না, তখন তোমাকে এই ভাবে বহিতে দেখিয়াছি, যখন যৌবনে পৃথিবীর সকলই মনোহর দেখিতাম, যখন তোমার ন্যায় আমার আশা অসীম ও অনন্ত ছিল, তখনও তোমাকে এই ভাবে বহিতে দেখিয়াছি, এখন যে বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল আশা, সকল কামনা—মনেই উদয় ও মনেই লীন হইয়াছে,—মেঘ ধনু যেমন আকাশে উদয় ও আকাশেই লীন হয়, তদ্রূপ লীন হইয়াছে,—এখনও তোমাকে সেই ভাবে বহিতে দেখি। তুমি অনেক দিনের। বল দেখি, যখন আর্য্যেরা এই ভারতবর্ষে একাধিপতি ছিলেন, তখন কি তুমি এই ভাবে বহিতে? যখন আর্য্য ঋষিরা তপোবনে তপস্যারত ছিলেন, তখন কি তুমি এই ভাবে বহিতে? যখন নিভৃতাশ্রমে কবিপিতা বাল্মীকি মধুর রামায়ণ রচনা করিতেন, তখন কি তুমি তাঁহার তালপত্র উড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতে? যখন রাঘবজীবন সীতা পতিবিরহে অধোবদনে অশোকতলে বসিয়া কাঁদিতেন, তখন কি তুমি এই ভাবে মন্দ২ বহিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গ শোকতপ্ত হৃদয় শীতল করিতে? যখন প্রাচীন ভারতে শাক্য সিংহ নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন, তখন কি তুমি এই ভাবে মন্দ২ বহিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোতঃ বৃদ্ধি করিতে? যখন চৈতন্য দেব বঙ্গের ঘরে২ বেড়াইয়া ভক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেন, তখন কি তুমি এই ভাবে বহিতে? হে পবন, প্রাচীন ভারতের কথা কে বলিবে? ইতিহাস সকল কথা বলে না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা কি আমাদের ন্যায় দুর্বল, আমাদের ন্যায় হীন সাহস, আমাদের ন্যায় দাসত্বপ্রিয় ছিলেন? হে প্রভঞ্জন, তুমি কি সিন্ধুতীরে যবনের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলে? দেখ, যখন যবন সিন্ধুনদ পার হইতেছিল, তখন তুমি কেন প্রচণ্ড রূপে বহিয়া সসৈন্যে যবনকে সিন্ধু জলে ডুবাইলে না?

হে পবন, তুমি জগৎপ্রিয়। তুমি সকলকে ভালবাস, সকলে তোমাকে ভাল বাসে। তুমি সকলের মনোরঞ্জন কর, তাই সকলে তোমাকে ভাল বাসে, তুমি সকলের উপকার কর, তাই সকলে তোমাকে ভাল বাসে। আমি তোমার মতন হইতে চাহি, কিন্তু পারি না; আমি ইচ্ছা করি, সকলকে ভাল বাসিব, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পারি না! একবার মনে করি, লোকের মনোরঞ্জন করিলে লোকের ভালবাসার পাত্র হওয়া যায়, কিন্তু সে ভ্রম। তাহাতে ব্যক্তিবিশেষ সন্তুষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হয়। তোমার মতন কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে লোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারা যায় না। কিন্তু আমি লোকের প্রিয়পাত্র হইতে চাহি না, লোককে আমার প্রিয়পাত্র করিতে চাহি; তাহা পারি না। আমি দেখিয়াছি, পরকে—যে আমাকে শত্রু ভাবে, তাহাকে—ভাল বাসিলে যে সুখ, এমন সুখ আর জগতে নাই। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়াই প্রকৃত সুখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর আপনার দুঃখে কাঁদিব না; আপনার দুঃখে কাঁদিলে

পরের দুঃখে কাঁদিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমার মত এই, যে আপনার দুঃখে কাঁদে, সে কাপুরুষ, আর যে পরের দুঃখে কাঁদে, সে বীরপুরুষ। পরের উপকার অন্য প্রকারে করিবার ক্ষমতা আমার নাই, হইবেও না; পরের উপকার করিয়া যে সুখ লাভ, তাহা আমার ভাগ্যে নাই; অতএব পরের দুঃখে কাঁদিয়া যে সুখ, তাহা আমি ভোগ করিব। পরকে, শত্রুকে, আত্মবৎ প্রেম করিয়া যে সুখ, তাহা আমি ভোগ করিব। পরের চক্ষের জল মুচাইয়া যে সুখ, তাহা আমি ভোগ করিব। শশীর বিরহে দিবাভাগে কুমদিনী যখন সরোবরে মলিন বদনে ভাসিতে থাকে, তখন তাহাকে মৃদুমন্দ দোলাইয়া তাহার কানে, কানে তুমি কি কথা বল? আমাকে বলিয়া দেও, আমিও এ জগতের নিরাশ লোকের কানে কানে সেই কথা বলিয়া তাহাদের সান্ত্বনা করিব। বাঙ্গালী বিধবা বাতায়নে বসিয়া দেশাচার-পীড়নে যখন নীরবে রোদন করেন, তখন বাতায়ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার কানে২ তুমি কি বল? আমাকে বলিয়া দেও, আমিও রোদন পরায়ণদিগকে তাহাই বলিয়া সান্ত্বনা করিব। বাঙ্গালিযুবক যখন সমস্ত দিন দাসত্ব করিয়া, প্রভুর কটু বাক্যে জ্বালাতন হইয়া, সায়ংকালে ভাগীরথীর বাঁধা ঘাটে বইসেন, তখন মৃদু-মন্দ তাঁহার চারিদিকে বহিয়া কি মোহিনী শক্তিতে তুমি তাঁহার তাপিত প্রাণ জুড়াও? আমাকে বল, আমিও সেই রূপে অনেকের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে চাহি।

হে সমীরণ, কবিরা তোমাকে শব্দবাহী বলেন; তাহা সত্য। আমি যখন গৃহছাদে নিশীথকালে চন্দ্র কিরণে বসিয়া ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হই, তখন তুমি দূরবীণার শব্দ বহিয়া আমার কর্ণকুহরে বর্ষণ কর। বসন্ত-কালে যে কোকিল পঞ্চমে গাহিয়া, ভাবুকের ভাবনা, বিরহীর বিরহ, দুঃখির দুঃখ ও সুখির সুখ বৃদ্ধি করে, তাহাও আমি তোমার প্রসাদে শুনিতে পাই। দূরে পুত্র শোককাতরা জননীর রোদন ধ্বনি সেই নিশীথকালে তুমি আনিয়া আমার কানে ঢালিয়া দিয়া থাক। অতএব হে পবন, যথার্থই তুমি শব্দবাহী। তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি যে প্রতি নিশীথে নদীতটে বা বৃক্ষতলে বসিয়া কাতর স্বরে সেই দয়াময় জগৎ পিতাকে ডাকি, তুমি কি আমার সেই কাতর শব্দ তাঁহার কাছে বহন কর? তিনি জানেন, তুমি জান, আর আমি জানি, আমি তাঁহার কাছে কত কাঁদি। হে পবন, আমার রোদন ধ্বনি কি তাঁহার কাছে বহন কর না? তুমি এত শব্দ বহন কর, আমার কাতর শব্দ কি বহন কর না? হে সমীরণ, তুমি সকলের উপকার কর, আমার একটী উপকার করিবে? আমার হইয়া তাঁহার কাছে কাঁদিবে, আমার হইয়া তাঁহাকে ডাকিবে? দেখ,

"শত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতু বরে,
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।"

আমি অতি দুরাচার, অতএব আমার হইয়া তাঁহাকে ডাক, আমার রোদন ধ্বনি তাঁহার কাছে বহন কর।

উমি চাঁদ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

গৌড়েশ্বর নাটক—শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত। এই দৃশ্য কাব্য খানি বীর ও করুণরস প্রধান। নাটক খানির দোষ গুণ বিচারের পূর্ব্বে উপাখ্যানটীর সার ভাগ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর চন্দ্রকেতুর দুই মহিষী বিজয়া ও কুন্তলা, বিজয়ার গর্ব্ভে সুধীর ও রঘুবীর নামে দুই পুত্র জন্মে। উভয়েই বীর ও ধার্ম্মিক। রাজার দ্বিতীয়া মহিষী কুন্তলার গর্ব্ভজ পুত্র বলরাম বীর, কিন্তু রাজ পুত্রোচিত গুণগ্রামবিহীন। সুধীর ও রঘুবর কোন যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানী আসিলে তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করা হইল, এবং সুধীরকে যুবরাজ পদে অভিষেক করার কল্পনা হইল। কিন্তু সপত্নীদ্বেষ পরবশ কুন্তলা ও রাজ মন্ত্রী সুরথী উভয়ের ষড় যন্ত্রে তাহা হইল না। পরন্তু সুরথী কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর দাসী দ্বারা বিজয়া মহিষীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে, এবং সুধীর ও রঘুবরকে বিপন্ন ও বধ করিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের উভয়কে অপর এক যুদ্ধে পাঠাইয়া আবশ্যক মত সৈন্য প্রেরণ করিল না, কারণ তাহাতে যদি তাঁহারা শত্রু হস্তে নিহত হন। কিন্তু বীর দ্বয় পুনর্ব্বার রণবিজয়ী হইয়া আসিয়া জানিতে পারিলেন যে কুন্তলা ও মন্ত্রী তাঁহাদের জননীকে বধ করিয়াছেন। এ দিকে কুন্তলা অনান্য চেষ্টায় বিফল হইয়া এক বীর মেলায় রঘুবরকে একটা ভয়ানক সিংহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা রাণী ও মন্ত্রীর কুপরামর্শে ভুলিয়া বলরামকে রাজ পদে অভিষেক করিয়া সুধীর ও রঘুবরকে পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে রাজা অযত্নে বহু কষ্ট ভোগ করিয়া মৃতুগ্রাসে পতিত হইলেন। বলরাম ও রঘুবর উভয়েই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হত হইলেন। সুধীর এই সমুদয় শোকে অভিভূত হইয়া সেনাপতিকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থে প্রস্থান করিলেন। তারাদাসী উন্মত্তা হইয়া জলমগ্ন হইয়া মরিল।

এই নাটক খানির উপাখ্যানটী মন্দ নহে। উহার কতক অংশ রামায়ণের ন্যায়, কতক ভাগ প্রহ্লাদ চরিত্রের ন্যায়। লেখক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র স্থির রাখিতে অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। যদি ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালীতে কিছু কিছু দোষ না থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থ খানি উৎকৃষ্ট পদবাচ্য হইত। ইহার অমিত্রাক্ষর কবিতা গুলি আমাদের তত ভাল লাগিল না। গদ্য ভাগ স্থানে স্থানে অতি উত্তম হইয়াছে। গ্রন্থকার স্থল বিশেষে রস ও ভাববিশেষ উদ্দীপনে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কুন্তলার দাসী তারা বিষ দান করিয়া যে অন্তর্দাহ ভোগ করিয়াছিল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল।

তারা। কৈ আমি কি করিলাম। কৈ আমি কি করলাম, রাণী মা মা দেখ, ও কে রাণী মা?

কুন্তলা। কি লো তারা কি?
চুপ, চুপ, ছোট করে।

তারা। ঐ শুনছ না এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছে—" তারা তুই কি

কর্‌লি”—যখন বিজয়ার বাটায় আমি পান রাখিলাম ও তখনি আমার পাছে থেকে দুপদুপ করে এল, আমি শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে ফিরে তাকালাম, ও অমনি ধপ করে আমার বুকের মধ্যে গিয়ে সোর করে জিজ্ঞাসা কর্‌লে রাণী মা।

কুন্তলা। যা, তুই অমন করে ভাবিস কেন ও কিছুই না, সব মিথ্যা চিন্তা আর ভয় মিলে এ বিভীষিকা দেখাচ্ছে।

* * * *

এ নাটকে রঘুবরের চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ আছে। যথা সোর করে। যাঁহারা কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতার ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা না করেন, তাঁহাদের রচনায় এরূপ দোষ আছে।

সতীনাটক—শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত। মনোমোহন বাবু বহু কালের পুরাতন উপাদান দ্বারা রামাভিষেক, এবং সতীনাটক দুইখানি অভিনব প্রণালীর দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সতীনাটক প্রণীত হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। দক্ষ প্রজাপতি জামতা শম্ভুর নিকট হইতে আশানুযায়ী সম্মান লাভ করিতে না পারায়, তাঁহার অবমাননা করিবার নিমিত্ত দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তদীয় দুহিতা শিবাবমাননা জন্য জনকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রবোধার্থে অনিমন্ত্রিতা হইয়াও পিতৃভবনে গমন করেন। তথায় পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া বিষাদে সমাধিস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি তিনি সতী কুলের অগ্রগণ্য এবং পতিব্রতাদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকার যথাসম্ভব হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া অতি মনোরম নাটক রচিত হইয়াছে।

মনোমোহন বাবু নাট্যোল্লিখিত পৃথক পৃথক ব্যক্তি সকলের চরিত্র আদ্যোপান্ত সমভাবে রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। নারদ, শান্তিরাম, মঘা, অশ্লেষা প্রভৃতি কএকটি চিত্র উত্তম চিত্রিত হইয়াছে।

সতীনাটকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম কএকটী গান থাকায় গ্রন্থখানি অভিনয় পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

আমরা পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

নারদ— উল্লাসের কারণ শোভা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য! এ পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্ব মনোহর স্থান, কল্পনায় কি স্বপ্নেও দেখা যায় না! এখানে চিরবসন্ত বিরাজমান, নিবিড় বনের মাঝে২ যক্ষ রক্ষ সিদ্ধাচারণগণের উপবন; দেবকন্যা, আর গন্ধর্ব্বীগণের বিহার সরোবর; আর ভগবতীর লীলাকুঞ্জ গুলি কি চমৎকার! উত্তরে যক্ষ রাজপুরী, তার শোভার ইয়ত্তা নাই। তার পর কিন্নর নগর, অতি মনোহর, আবার সূর্য্যলোক স্পর্শী অসংখ্য চূড়ায় প্রত্যেকটি নব নব সৌন্দর্য্যের আধার—শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণে আর বিবিধ গৈরিক ধাতুস্রাবে মণ্ডিত। * * *

নেপথ্যে গীত।

নলিনী লো এতো নহে পিরীতি বিধান;
নহে পিরীতি বিধান; কভু নহে পিরীতি
বিধান।

ভুলাইয়ে নিজ পতি, পরেরি সম্মান ;
রাখ পরেরি সম্মান !
গগনে তপন বঁধু, হেসে তারে তোষেস্থধু ;
তব মুখ-মধু, কিন্তু তব মুখ-মধু, মধু করে দান ;
কর মধু করে দান। ১ ॥
সতী-রাজ্যে বাস কর,অসতী রো রীতি ধর,
তোরে স্থানান্তর, তাই তোরে স্থানান্তর,
করি অপমান ;
ওলো করি অপমান। ২ ॥
ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পূজিব ভবানী ভব,
মেলি সখী সব, আজ মেলি সখী সব,
করিব প্রদান ;
পদে করিব প্রদান। ৩ ॥

শান্তি। গান শুনে গা চম্‌কে উঠে।
ভাবের কদম্ আপ্‌নি ফুটে।
গান শুনে গান আস্‌ছে ঠোঁটে
পাগলের জিভ্ আপ্‌নি ছোটে।

গীত।

ঘর দেখ্‌তে কাণা তুমি, পর্ দেখ্‌তে খোলা আঁখি দুটো !
পরের দোষ আকাশ-যোড়া, আপনার দোষ ছোট।
কালী দিয়ে আপ্‌নার কুলে, অসতী কয় পদ্ম ফুলে,
মরি হায় রে হায় !
চালনী বলেন ধুচুনী ভাই, তুমি কেন ফুটো ?

নার। (সহাস্যে) বেস গেয়েছ শান্তি রাম ! এখন আমার পালা ! এই বীণা যন্ত্রের সঙ্গে শিবগুণ গাইতে গাইতে, চল কৈলাসনাথকে দর্শন করে কৃতার্থ হইগে

(নেপথ্যাভিমুখে গমন)

শান্তি। তবে ঠাকুর সোজা চল ;
বাঁকা পথে কেন বল ?

নার। দেবতার সম্মুখ দে যেতে নাই, শান্তিরাম ! পার্শ্ব দে যাওয়াই উচিত !

শান্তি। ঘুরে ঘুরে অত ঘুরে ?

নার। কি করি ?

শান্তি। তাঁর কাছেতে যাব যখন,
বলে দেও কি কর্ব্বো তখন ?

নার। গিয়ে প্রণাম করে, করযোড়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াবে, কোনো কথা কৈও না !

শান্তি। আর যা বলুন কর্ত্তে পারি ;
মুখ্ বোজার দুখ্ সইতে নারি !

নার। না শান্তিরাম তা হবে না; তুমি পাগল, কি বল্‌তে কি বল্‌বে, শুনে হয় তো রাগ ক'র্ব্বেন !

শান্তি। এই তো ঠাকুর, কাজের বেলা,
কথায় কাজে, হয় না মেলা !
কাল্ বলেছ "পঞ্চানন,
পাগল পেলে তুষ্ট হন !"
সেই সাহসে যাচ্ছি রুকে।
এখন ধোকালাগাও বুকে !

নার। (সহাস্যে) না শান্তিরাম,কোন চিন্তা নাই ! যিনি ভোলানাথ, ভুতনাথ, নিজে পাগল, তিনি কি তোমার মতন পাগল পেলে রুষ্ট হন ?

শান্তি। রুষ্ট তুষ্ট আর বুঝিনে !—
তাগ্ পেয়েছি লাগ্ ছাড়িনে !
ঠাকুর পাগল, ভক্ত পাগল ;
ভজ্‌বো চরণ বাজিয়ে বগল !
ভবের ভাবে গাব গান।
নাচ্‌বো কাছে মজিয়ে প্রাণ !
বাজিয়ে গাল্ দিব তাল্।
খসে পড়্‌বে বাঘের ছাল !
তাতেও ফিরে নাহি চান্,
জটা ধরে মার্ব্বো টান্ !

(উভয়ের নেপথ্যাভিমুখে প্রস্থান)

(নেপথ্যে—বীণাধ্বনিসংযুক্ত গীত)

রাগিণী টড়ী—তাল ঢিমা তেতালা।

জয় হর শশিশেখর!
জয় যোগীশ্বর, ত্রিপুর-তনুহর,
সর্ব্বগুণাকর, স্বয়ম্ভু শঙ্কর!
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন সুবেশকারি,
বৃষেশ-বাহন পিনাকধারি,
পিশাচ মণ্ডিত শ্মশানচারি,
ভূতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর! ১॥
ব্যোমকেশ শিরে পাবনবারি,
কৈলাস-কানন শৈল-বিহারি,
তুমি আশুতোষ কলযহারি,
তুমি বারাণসী-সরসী-ভাস্কর! ২॥

(শিব সন্নিধানে নারদ ও শান্তি-রামের প্রবেশ।)

(নারদ-কর্ত্তৃক স্তব।)

জয় ভবেশ ভৈরব, ভবান্ধ বান্ধব,
ভয়ার্ত্ত রৌরব-ভীতি-হর।
জয় ভবাব্ধি-ভেলক, ভুব্যাদি পালক,
সর্ব্ব ভূতাত্মক, ভূতেশ্বর॥
জয় ত্রিপুর তারক, ত্রিপুর হারক,
ত্রিপুর ঘাতক ত্রিলোচন।
জয় ত্রিদশ বন্দিত, ত্রিগুণ বর্জ্জিত,
তমোগুণান্বিত, নিরঞ্জন॥
জয় সর্ব্ববিধায়ক, সর্ব্ব সুরক্ষক,
সর্ব্ব সংহারক, শুভঙ্কর।
জয় যোগী জনার্চ্চিত, জগজ্জনাশ্রিত,
আত্ম যোগান্বিত, যোগীশ্বর॥
জয় নিত্য নিরুদ্যম, নির্ব্বেদ নির্ম্মম,
জিতেন্দ্রিয়োত্তম, কামান্তক।
জয় দুর্নীত বঞ্চক, দুর্গতি খণ্ডক,
শ্রীদুর্গা-রঞ্জক, বিনায়ক॥
জয় দ্যুলোক দুর্ল্লভ, সল্লোক সল্লভ,
ভক্তস্য বল্লভ, ভক্তাশ্রয়।
জয় জন্ম জরাচ্যুত, ইন্দ্র ব্রহ্মাচ্যুত,
মৃত্যুপতিস্তুত, মৃত্যুঞ্জয়॥
জয় জটা-জুটাবৃত, জহ্নু কন্যা ধৃত,
পূত নীরামৃত গঙ্গাধর।
জয় পিনাক-সায়ক, ত্রিশূল-ধারক,
শশাঙ্ক-ভালক, দিগম্বর॥
জয় ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, ভুজঙ্গ ভূষণ,
বৃষভ বাহন, ভূতিম্বর।
জয় লীন নিভান্বিত, শিরাস্থি বেষ্টিত,
কণ্ঠ বিভূষিত, মনোহর।
জয় তন্ত্র প্রকাশক, যন্ত্রাদি কারক,
সুতান গায়ক, রাগেশ্বর।
জয় সঙ্গীত নায়ক, ডিণ্ডিম বাদক,
ভোরঙ্গ ঘোষক, শৃঙ্গধর॥
জয় শ্মশান গৌরবে, পিশাচ তাণ্ডবে,
কবন্ধ উৎসবে, মহোৎসাহী।
জয় শান্তরসাস্পদ, পাদ শতচ্ছদ,
ধ্যায়তি নারদ, পরিত্রাহি!

শিব। (চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) কেও নারদ, এস এস বসো। (শান্তিরামের প্রতি কটাক্ষ)।

নার। (করযোড়ে) এঁর নাম শান্তি রাম; নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরক্ত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক! প্রভো! এমন সঙ্গীলাভে কে না ধন্য হয়।

শিব। (সহাস্যে) তোমার যদৃচ্ছা! এক্ষণে সংবাদ কি?

নার। প্রভুর আশীর্ব্বাদে অমরাবতী এক্ষণে উৎপাত-শূন্য। সৌরলোক, চান্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক প্রভৃতি দ্যুলোক সমভাবাপন্ন। শিবলোকের সব মঙ্গল তো?

শিব। (সহাস্যে) ভিক্ষাজীবীর আর মঙ্গলামঙ্গল কি?

শান্তি। আছে আছে আছে!
নইলে কেন নন্দী আমায় আসিতে
দেয় না কাছে?

শিব। ও কি বলে ?

নার। নন্দী ওরে রোধ করেছিল, আমার অনুরোধে শেষ ছেড়ে দিলে !

শিব। শান্তিরাম কি ক্ষিপ্ত ?

নার। নির্লিপ্ত বটে !

শান্তি। ক্ষিপ্ত লিপ্ত বুঝিনে ;
গুপ্ত আছে হৃদ্‌-মাঝারে তারে আমি ছাড়িনে।

নার। শান্তিরাম ! অধিক কথায় বিরক্ত করো না।

শিব। কেন মন্দ কি ?

ধ্রুবচরিত্র নাটক—শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত, কলিকাতা ৩৩৮ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রিট কলম্বিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৮০ আনা।

অধুনাতন বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে নিমাই বাবু নিতান্ত অপরিচিত লোক নহেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী দ্বারা যে বঙ্গভাষা কিয়ৎপরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। আমরা তাঁহার প্রণীত যে যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, কোন খানিই অপাঠ্য নহে। উপস্থিত গ্রন্থখানিও পূর্ব্বগুলির অনুরূপ। নিমাই বাবুর লেখা সুললিত অথচ ব্যাকরণা-শুদ্ধি পরিপূর্ণ নহে। উপাখ্যানটী মূল বিষ্ণুপুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়া নূতন অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। আমরা গত বার চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, ধ্রুবচরিত্র সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। অর্থাৎ ইহা নাটক না হইয়া আখ্যায়িকা হওয়া উচিত ছিল।

নিমাই বাবুর একটী বিশেষ প্রশংসা এই যে তাঁহার উপাখ্যান ইংরাজী হইতে চুরি করা নহে অথচ অপ্রাকৃতিক ও নহে, আমাদিগের বিবেচনাতে নাটক পরিত্যাগ করিয়া আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করিলে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, এ নাটক অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, এবং আমাদিগের অধিকাংশ পাঠক হয়ত ইহা পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং সবিস্তার সমালোচন অনাবশ্যক।

বঙ্গ বিজেতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনীর পূর্ব্ব কথা।

But o'er her warrior's bloody bier
The lady dropped nor flower nor tear,
Vengence deep brooding on the slain
Had locked the source of softer woe,
And burning pride and high disdain
Forbade the rising tear to flow.

Scott.

"আমার স্বামী রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশের ভূষণ ছিলেন। পাঠান দায়ুদ খাঁর সহিত যৎকালে মোগলদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আকবর সাহ্ স্বয়ং যে সময়ে পাটনা নগর বেষ্টন করেন, ও গঙ্গার অপর পার্শ্বস্থ হাজীপুর নগর অধিকার অভিলাষ করিয়া আলম খাঁকে প্রেরণ করেন, রাজা সমরসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তিনিই সেই নগর হস্তগত করিবার প্রধান কারণ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে পাটনা হস্তগত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমনের সময়ে আমার স্বামীকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন ও রাজা উপাধি দেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সাগরতরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। তরীয়াঘড়ী জয় করিয়া পরে বঙ্গদেশের রাজধানী তণ্ডা নগর হস্তগত করিল। তথা হইতে মনাইম খাঁ টোডরমল্লকে অল্প সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়নপর দায়ুদ খাঁর পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন,—রাজা সমর সিংহ সানন্দ-চিত্তে টোডরমল্লের সহিত শত্রুপরিপূর্ণ বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। তণ্ডা হইতে বীরভূম, বীরভূমি হইতে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর হইতে কটক—টোডরমল্ল যেখানে২ গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই আমার স্বামী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মত সঙ্গে২ ছিলেন। যে২ যুদ্ধে টোডরমল্ল জয়লাভ করিয়াছিলেন, রাজা সমর সিংহ সেই২ যুদ্ধে আপনার নৈসর্গিক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে বীরত্ব ও সাহসের কি এই পুরস্কার?

"পরে কটকের নিকট যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মনাইম খাঁ স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন। মোগলেরা প্রায় পরাস্ত হইয়াছিল। মনাইম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলম খাঁ যুদ্ধে নিহত হন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল ও রাজা সমরসিংহ ভয় কাহাকে বলে, জানিতেন না। রাজা টোডর মল্ল বলিলেন, 'আলম খাঁর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি; মনাইম খাঁ পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতেই বা আশঙ্কা কি; সাম্রাজ্য আমাদের হস্তে আছে, আমাদের হস্তেই থাকিবে।' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমর সিংহ সিংহের মত লম্ফ দিয়া শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মোগল সৈন্য বঙ্গদেশীয় জমীদারের সাহস দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, দায়ুদ খাঁ পরাস্ত হইলেন। তৎপরেই যে সন্ধিস্থাপন হইল, সেই সন্ধি সংস্থাপনের সময়ে মনাইম খাঁ দায়ুদ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, প্রায় এক বৎসর আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আমা-

দের কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে অধিকতর সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন।'

"পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, 'প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোড়র মল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমিদার রাজা সমরসিংহ।' এই কথা উচ্চারিত হইতে২ সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্লাবিত হইল; সেই জয়ধ্বনি বায়ু মার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল; চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিতেছিলাম,—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল! অদ্য কি না সেই সমর সিংহের বিদ্রোহ অপবাদে শিরশ্ছেদন হইল। দেব দেব মহেশ্বর! ইহার কি ইহকালে প্রতিহিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই?"

ছিন্নতার বীণার মত সহসা মহাশ্বেতার গম্ভীর শব্দ থামিয়া গেল। শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি! পূর্ব্ব কথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি? বিশেষ রাজা সমর সিংহের যশোবার্ত্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছেন, সমর সিংহের পত্নীর সে কথা বিবরণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আবশ্যক কি?"

"সমর সিংহের পত্নী নহি, এক কালে সমর সিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয় বিধবা!—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।"

শিখণ্ডিবাহন আবার নিস্তব্ধ হইলেন। মহাশ্বেতা বলিতে লাগিলেন,—

"এক পাপাত্মা জমীদার, আমি তাহার নাম করিব না, এই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁর সহিত যোগ দিয়া সমর সিংহের প্রাণ বধ করিতে যত্ন করিয়াছিল। টোডর মল্ল আমার স্বামীকে এত ভাল বাসিতেন যে, যুদ্ধের পর সেই জমীদারের প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। জমীদার ভয়ে আমার স্বামীর চরণে লুটাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল,—উদারচেতা রাজা সমর সিংহ শত্রুকে ক্ষমা করিলেন; রাজা টোডর মল্লের নিকট আবেদন করিয়া নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ জমীদারকে বাঁচাইয়া দিলেন। সেই পাষণ্ড সেই অবমাননাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া রাখিল,—আমার স্বামির বিস্তীর্ণ জমীদারি দেখিয়া তাহার লোভ হইল। টোডর মল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিতে না করিতে, সেই জমীদার সুযোগ পাইয়া কতক গুলি জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে, রাজা সমর সিংহ বিদ্রোহী, পাঠানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন! এই মিথ্যা অপবাদে স্বামির প্রাণ দণ্ড হয়,—সেই জমীদার ব্রাহ্মণ-তনয়—চণ্ডাল-তনয়—সুবাদারের প্রিয়পাত্র রাজাধিরাজ দেওয়ান হইলেন।"

শিখণ্ডিবাহন বিস্মিত হইলেন, মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি বঙ্গদেশের দেওয়ান রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্র রায় পাপিষ্ঠ নরহত্যাকারী!" বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। মহাশ্বেতা বলিলেন, "আমি যে কথাটী বলিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই।

"আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই ঘটনার দুই বৎসর পরে টোডর মল্ল বঙ্গদেশে আর একবার আসিয়াছিলেন। রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পুনরায়

পরাস্ত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্যের নাম লোপ করিলেন। যুদ্ধের পরেই পামর দেওয়ানকে আমার স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পামর সত্য বলিতে ভয় পাইয়া বলিল, 'রাজা সমর সিংহ সর্প-দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।' সে সত্য কথা, কিন্তু সাধারণ সর্পের এত খলতা নাই। মানবদেহাবলম্বী কাল সর্প নহিলে এত বিষ ধারণ করিতে পারে না। আমি স্বামীর নিকট বিষম অঙ্গীকারে বদ্ধ আছি। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আপন অদৃষ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। এক দিন আমাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যার সময় তথায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণেশ্বরি! তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে, দিতে স্বীকার করিবে?' আমি বলিলাম, 'নাথ! রমণীর স্বামীকে অদেয় কি আছে?' তখন তিনি আমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলেন। ঘোর অন্ধকার, সন্ধ্যাকালে প্রবল প্রবাহিনী গঙ্গার সৈকতে উপবেশন করিয়া উভয়েই অনেকক্ষণ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া রহিলাম। পরে প্রভু তরঙ্গ অপেক্ষা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'আমি শুনিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার বিনাশ সঙ্কল্পে সফল হইয়াছে। যোদ্ধার মরণে ভয় নাই, কিন্তু পাপিষ্ঠকে দণ্ড দিবার কেহ রহিল না, এই জন্য দুঃখ হয়। ভ্রাতা কি সন্তান নাই, কেবল শিশু কন্যা আর তুমি স্ত্রীলোক। অঙ্গীকার কর, স্ত্রীলোকের যতদূর সাধ্য, তুমি বৈরনির্য্যাতনে যত্নবতী হইবে। আমি অঙ্গীকার করিলাম, 'স্ত্রীলোকের যতদূর সাধ্য, বৈরনির্য্যাতনে যত্নবতী হইব।' সে সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম না, কেননা হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি কালাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল,—সে কালাগ্নি এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই,—সে ব্রত এখনও সফল হয় নাই।"

শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রত ভঙ্গের চেষ্টা করা বৃথা। অগ্নি রাশিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করা মাত্র। বলিলেন—

"তবে আমি ধর্ম্ম পিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব।" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "হাঁ বলিবেন; আরও বলিবেন যে, পক্ষিশাবক ব্যাধ কর্ত্তৃক আহত হইলে আপনার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, কিন্তু মানিনী ফণিনী পাদাহত হইলে, আঘাতকারীকে দংশন করিয়া হর্ষে—হেলায় প্রাণ ত্যাগ করে।"

বলিতে২ মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, মহাশ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত। শিখণ্ডিবাহনের বোধ হইল যেন, তিনি সে প্রকার উন্নতকায় গম্ভীরাকৃতি রমণী কখন দেখেন নাই। অন্ধকারে তাঁহার হৃদয়ে যেন কিছু২ ভয় সঞ্চারও হইতে লাগিল। মহাশ্বেতা ধীরে২ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। প্রভাতের আলোকচ্ছটা সহসা তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ অরুণ কিরণে সুবর্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে২ নানা পক্ষী নানারঙ্গে গান করিতেছে।—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা ও অমলা।

We Hermia, like two artificial gods
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key;
As if our hands our sides, voices and minds
Had been incorporate. So we grew together
Like to a double cherry seeming parted;
And yet a union in partition,
Two lovely berries moulded on one stem.

Shakespeare.

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ শব্দ করিবার অনেক পূর্ব্বেই সরলা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘর দ্বার প্রাঙ্গণ, সকল পরিষ্কার করিল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজকুমারীর কি এ সকল কাজ সাজে? সরলা যে রাজকুমারী, তাহা সে জানিত না। পিতার মৃত্যুর সময় সে অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল,—তখনকার কথা প্রায় একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাতাও এ কথা তাহাকে কখন বলেন নাই। প্রতিদিন কৃষক কুমারীদিগের কর্ম্ম করিতে২ আপনাকেও কৃষককুমারী বলিয়া মনে করিত। তাহার বালিকাহৃদয়ে অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ বা অভিমানের লেশ মাত্র ছিল না। চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া মাতাকে ভাল বাসিবে, কৃষকপত্নীদিগের সহিত আলাপ, সহবাস করিবে, সামান্য কর্ম্ম করিয়া আপন ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ অভিলাষ তাহার সরলান্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না।

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া সরলা মৃৎকলস লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। প্রতিদিনই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার স্নান সমাপন হইত। পথিমধ্যে এক কুটীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, “সই!” কেহ উত্তর দিল না। পুনরায় ডাকিল, “সই অমলা!” “যাই লো!” এই বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। ক্ষণেক পরে এক ষোড়শ বর্ষীয়া প্রখরনয়না, চঞ্চলহৃদয়া রমণী বাহিরে আসিল। তাহার পরিধান এক রাঙ্গাপেড়ে শাটী, কক্ষে কলস, হাতে শাঁকা, পায়ে মল। আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া ও চিম্‌টী কাটিয়া বলিল, “তোর যেমন আক্কেল, আমার ঘরে স্বামী, তাতে আবার বৃদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না; প্রভাত না হইতে২ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস।” এই বলিয়া সরলাকে আবার চিমটী কাটিল ও হাসিতে২ গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল, “তা, মার কেন সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি।”

অ। “তা না হইলে আসিতে না?”

স। “আসিতাম।”

অ। “কেন আসিতে?”

স। “তা জানি না, কিন্তু তুমি আসিতে না বলিলেও আসিতাম।”

অ। “কেন সই, কারণ বলিতে হবে।”

স। “সত্য বলিতেছি, কারণ আমি

জানি না, কিন্তু তুমি না বলিলেও আসিতাম। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখ খানি মনে পড়ে। যদি এক দিন তোমায় না দেখি, তাহা হইলে আমার সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে মন থাকে না। রোজ দেখি কি না, অভ্যাসের দরুণ বোধ হয়, এরূপ হয়।"

অমলা স্থিরলোচনে সরলার মুখ খানি নিরীক্ষণ করিল,—সরলা প্রেম রাশিতে টল মল করিতেছে,—হঠাৎ মুখ ফিরাইল। সরলা বলিল, "তোমার চক্ষুতে জল কেন সই?"

অ। "ও কিছু নয়,—একটা পোকা পড়িয়াছিল বুঝি। আর শুনিয়াছ, জমীদারের কাছারির নূতন খবর শুনিয়াছ?"

স। "না; কি খবর?"

অ। "আমাদের জমীদার কোন বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের মত, আর চক্ষু দুটী যেন,—যেন,—যেন সই তোর চক্ষুর মত।"

স। "তামাসা কর কেন সই? তার পর?"

অ। "তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।"

স। "কেন?"

অ। "কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগ্রামে কোন এক গরিব ব্রাহ্মণীর মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা, সেই মেয়ে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন?"

স। "আবার তামাসা! আচ্ছা, বাপ বল্‌ছেন এক জনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর এক জনকে বিবাহ কর্‌বেন?"

অ। "তা যার যাকে মনে ধরে, বাপ যাহাকে বিবাহ কর্‌তে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে?"

স। "কেন ধর্‌বে না?"

অ। "তুই যেমন টেবু, তোকে আর কত শিখাব। বলি, মাকে বল বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখ্‌বি।" এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে২ উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে যাইয়া এক অপরূপ দর্শন দৃষ্ট হইল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘায়ত ছিন্নবসনা এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে। তাহার গল দেশে অস্থি মালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান। দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে গা?"

সে উত্তর করিল, "আমার নাম বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।" অমলা বলিল, "হাঁ হাঁ, আমি বিশু পাগলীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না?"

বি। "আসিয়াছিলাম।"

অ। "তুমি না হাত দেখিতে জান?"

বি। "জানি।"

অ। "আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি।" পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পর বলিল;—

"তুমি দেওয়ানের গৃহিণী হইবে।"

অ। "দূর পাগ্‌লী, আমার স্বামী বর্ত্তমান; বলে কি না দেওয়ানের স্ত্রী হবে।

আমার দেওয়ান উজিরে কায নাই, আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক। এখন বল দেখি, আমার সইয়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের ভাবনায় সইয়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।”

পাগলিনী অনেক ক্ষণ সরলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে২ তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল ;—

“তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ রাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত, তাহার পর কি আছে, বলিতে পারি না। তিন দিন মধ্যে ভীষণ ঝড় আসিবে, অদ্যই এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর !”

সরলা ভীতচিত্তা হইল। অমলা প্রিয় সখীর এই রূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল, “ধান ভানিতে শিবের গীত,—আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সইয়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো, আমি মাগীকে জব্দ করি।”

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিলে, পাগলিনী ধীরে২ দূরে চলিয়া গেল। দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর !” অনন্তর অদৃশ্য হইল।

এ দিকে অন্যান্য কৃষকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য সুন্দরী আসিয়া ঘাট আলো (অন্ধকার ?) করিয়া বসিল। নানা প্রকার কথা বার্ত্তা, ও রঙ্গরসে ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল ; গ্রাম্য সুন্দরীরাও আনন্দে কল্ কল শব্দে গল্প আরম্ভ করিলেন, গল্পের মধ্যে অল্প বয়স্কারা স্বামির কথা ও প্রাচীনারা পরনিন্দার কথা আনিলেন। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ২ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামির সহিত পাঠক মহাশয় অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীন দাস সে গ্রামের এক জন মহাজন ছিল, ও অনেক প্রকার ব্যবসায়ও করিত। তাহার স্বভাব অতি শান্ত ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। ৪০।৫০ বিঘা জমী, ২০।২৫ টা গরু, ৪।৫ খান লাঙ্গল ও বাটীর মধ্যে আট দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও শুনা যাইত যে, নগদ কিছু টাকা মাটীতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশম বর্ষীয়া অমলাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে “বৃদ্ধ স্বামী,” বলিয়াই ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভার্য্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। “বৃদ্ধ স্বামীর,” সেবা শুশ্রূষা করিত, কিন্তু দিবা রাত্রি উপহাস করিতেও ক্ষান্ত থাকিত না। তথাপি “বৃদ্ধ স্বামী,” বলিয়া অমলার চিত্তে কোন প্রকার অসন্তোষ ছিল না, যাহা কপালে ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল

এপ্রকার পত্নী পাইয়া "বৃদ্ধ স্বামীরও" স্নেহের ও সুখের সীমা ছিল না।

সরলার রুদ্রপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। দুঃখের সময়ে সরলার নির্ম্মল বালিকা মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ একবারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভাল বাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট যাইত। কত দিন তাহারা দুই জনে মধ্যাহ্নে একত্র একটী বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কত দিন নিশি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা অমলার সহিত নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প শুনিত, দুই জনের বিচ্ছেদ হইবার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল,—"মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?"

মহাশ্বেতা। "না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে,— সূর্য্য উঠিয়াছে।"

সরলা। "হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগ্‌লী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল" এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিশুপাগলিনীর জন্য অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না। মহাশ্বেতা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

সরলা পাকশালায় যাইয়া স্বহস্তে অন্ন ও অন্যান্য সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিল। কর্ম্ম লাঘব করিবার জন্য দুই বেলার অন্ন একবারেই প্রস্তুত করিত। এক মাত্র দাসী—দাসীর নাম চিন্তা; রুদ্রপুরে আসিয়া অবধি মহাশ্বেতা এই দাসীকে রাখিয়াছিলেন।

মহাশ্বেতা ব্রহ্মচারীকে সম্মান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। তাহার পর বাটীর সকলে ভোজন করিলে মহাশ্বেতা শয়নাগারে গমন করিলেন, সরলা দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দৈনিক কার্য্য কি? অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যা জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে কার্য্য করিতে পারেন, সরলা তাহাই করিত। গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ অন্তরে হাট হইতে চিন্তা তুলা ক্রয় করিয়া আনিত, সরলা তাহাতে সুতা কাটিয়া হাটে পাঠাইয়া দিত। মাতার নিকট সরলা অতি সুন্দর চিত্র ও সূচি কার্য্য শিখিয়াছিল, তদ্দ্বারা অনেক প্রকার অতি সুন্দর২ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রস্তুত হইলে সরলা অমলাকে দিত, ও অমলা স্বামীর দ্বারায় নগরে পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয় করাইত। অমলা অতিশয় স্নেহবতী ও অতিশয় চতুরা, কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে, বা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইলে, অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া, অধিক মূল্য সরলাকে দিত। সরলা তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন গৃহের নিকটবর্ত্তী দুই চারিটী আম্র, কাঁঠাল ও নারিকেল ও অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, তাহার ফল বিক্রয় করিয়াও

কিছু২ পাওয়া যাইত। রাজা সমর সিংহের দুহিতা সানন্দচিত্তে এই সকল সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত,—এত যত্নের সহিত করিত যে, তাহাতে যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তিন জন স্ত্রীলোকের অনায়াসে জীবন ধারণ হইত। সরলার সঙ্গে২ চিন্তাও কর্ম্ম করিত, ও হাটের দিন চিন্তা হাটে যাইয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিত।

আজি হাটের দিন। আহারান্তে চিন্তা নানা প্রকার দ্রব্য লইয়া হাটে চলিল। হাটের দিন চারিদিকের অনেকানেক গ্রাম হইতে অনেক লোক ক্রয় বিক্রয়ার্থ হাটে সমাগত হইতেছে। চারিদিকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল মনুষ্যের সমাগম, দূর হইতে যেন সমুদ্র তরঙ্গের মত শব্দ শুনা যাইতেছে। নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, নানা প্রকার বস্ত্রাদি, নানা প্রকার গ্রাম্য শিল্পদ্রব্য পথের দুই পার্শ্বে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দলে২ বিক্রেতাগণ মিষ্টালাপ ও গল্প করিতেছে, ক্রেতা দেখিতে পাইলেই উচ্চৈঃস্বরে নিজ দ্রব্যের প্রশংসা করিতেছে। দলে২ ক্রেতাগণ এ স্থান হইতে ও স্থানে, এ বিক্রেতা হইতে ও বিক্রেতার নিকট গমন করিতেছে, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে মূল্য কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। দলে২ গ্রামবাসীগণ এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছে, কখন২ দ্রব্যের মূল্য জানিতেছে;—ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই, অথচ দ্রব্য দেখিবার ও দর করিবার ইচ্ছা টুকু আছে। দুই একজন ভিক্ষুক সময় পাইয়া হরিনাম করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে; দুই একজন সাপুড়িয়া ও বাজীকর, রাস্তার নিকট নিজ২ নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে, অনেকে তাহাই দেখিতেছে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীত্যনুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। চিন্তাও অনেক রাত্রি না হইলে হাট হইতে রুদ্রপুরে পঁহুছিতে পারিত না। কুটীরে সরলা একাকিনী কায করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি বশতঃই হউক বা অনেক ক্ষণ একাকানী বলিয়াই হউক, সরলার মুখ মণ্ডল যেন কিছু ম্লান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া গাঢ়ভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয় আকাশ যেন অল্প২ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। পাঠক মহাশয় কখন সায়ংকালে দূর হইতে দুঃখজনিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সহসা আপন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত বোধ করিয়াছেন? সরলার হৃদয় সন্ধ্যাকালে যেন আপনা হইতেই সেই প্রকার দ্রবীভূত হইতেছিল। কখন প্রবাসে, বন্ধুশূন্য বিজনে পাঠক মহাশয় নির্জন নিঃশব্দ প্রান্তরাভিমুখে বিমর্ষ ভাবে অবলোকন করিয়া বসিয়াছেন? সরলার অন্তঃকরণ সেই রূপ বিমর্ষ ভাবে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই পরিতপ্ত ও ভারগ্রস্ত। সম্মুখে অনবরত চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে,—সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মৃদুস্বরে এক২ বার গান করিতেছে। অতি মৃদু গুন২ শব্দে গীত একটী খেদের গান এক বার, দুই বার, তিন বারে সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"সরলা!"

যিনি ডাকিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয়,

বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও ম্লান। কেশবিন্যাসে কিছুই যত্ন নাই, সুতরাং নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মুখ মণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য, অথবা দুঃখ, অথবা চিন্তায় চতুঃপার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, উচ্চ, বক্ষঃ আয়ত বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজঃ ব্যঞ্জক; আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গান গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিস্পন্দ শরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনিমিষ লোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তুকের হৃদয়ে কোন শোক চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল; ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইতেছিল; এক২ বার দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। আগন্তুকের সহিত পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই পরিচিত আছেন। তাঁহার নাম প্রেমদাস। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রেমদাস সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—

"সরলা!"

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া বলিল, "কে ও, প্রেমদাস?" প্রেমদাস আবার বলিলেন,—

"সরলা! তোমার সংসারে কি এত বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাইতেছ,—ইহার কারণ আছে বটে।"

সরলা আরও কুণ্ঠিত হইল, বলিল,—

"না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই,—আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটী ভিন্ন আর গান জানি না, সেই জন্য আমি ঐটী বার বার গাইতেছিলাম। অমলা আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটী মনে লাগে, যখন একাকিনী থাকি, তখন বসিয়া২ গাই। আমি কি জানি যে তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ?" এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল।

প্রেমদাস দেখিলেন, সরলা লজ্জিত হইয়াছে, অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন,

"একাকিনী এতক্ষণ কায করিতেছ কেন?" সরলা বলিল,—"আজি চিন্তা হাটে গিয়াছে, সেই জন্য দুই জনের কায আমিই করিতেছি। তুমি বস, মা পূজা করিতে গিয়াছেন, দুই প্রহর রাত্রির আগে আসিবেন না।" এই বলিয়া সরলা প্রেমদাসকে আসন আনিয়া দিল।

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা যেরূপ ম্লান হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল; কখন আপন কার্য্যের কথা কহিতেছিল; কখন আপনি যে সুন্দর২ চিত্র আঁকিয়াছিল, তাহাই প্রেমদাসকে দেখাইতেছিল; কখন ক্ষুদ্র উদ্যানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। প্রেমদাস আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিলেন। ক্রমে২ নিবিড় বৃক্ষাবলির ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ

সুবর্ণ বর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমেং বৃক্ষ পত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল আকাশে স্বর্ণ আলোক বিস্তার করি-লেন। সে আলোকে সরলার সুগোল শরীর প্লাবিত করিল; সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোর ভাব বর্দ্ধন করিল; স্মহাস-পরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল; শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আপ্লুত করিল। সরলা কখনও পুষ্প চয়ন করিয়া প্রেমদাসকে দিতেছে, কখন বা আনন্দোৎফুল্ল নয়নে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ও সেই সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছে। কতকগুলি সুগন্ধ পুষ্প চয়ন করিয়া এক ছড়া সুন্দর মালা রচনা করিল। "দেখ দেখি, কেমন সরস মালা গাঁথিলাম!" বলিয়া লীলা ক্রমে সেই মালা প্রেমদাসের মস্তকে জড়াইয়া দিল। মালা স্রস্ত হইয়া গলায় পড়িল। প্রেম দাস বলিলেন, "সরলা, আমাকে কি মাল্য দান করিলে?" সরলা কুণ্ঠিত হইল, চক্ষুর পাতা দুখানি ধীরেং পতিত হইল, মুখে আর কথা সরিল না। প্রেমদাসেরও মুখে কথা নাই, সস্নেহ নয়নে সেই সুবর্ণ পুত্তলীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূ যুগল, সেই প্রেম প্লাবিত নয়ন, সেই স্মিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহনমুখমণ্ডল, সেই বালিকার সরল হৃদয় আলোচনা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলি-লেন, "সরলা!"

প্রেমদাসের গম্ভীর ভাবে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়াছে।

প্রেমদাস পুনরায় বলিলেন, "সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।" সরলার প্রফুল্ল নয়নে এক বিন্দু জল আসিল, বলিল, "কেন? তুমি কি আর রুদ্রপুরে থাকিবে না?"

প্রে। "না; আমি আর রুদ্রপুরে থাকিব না, কারণ বোধ হয়, তুমি পরে জানিতে পারিবে।"

স। "কেন, সই কি তোমাকে বাড়ীতে রাখিতে পারে না? তুমি কেন আমা-দের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে মা সম্মত হবেন। আমরা যাহা উপা-র্জ্জন করি, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হবে না, সচ্ছন্দে থাকিবে। তুমি আমাদের বড়ী থাক।"

প্রেমদাসের চক্ষু জলে প্লাবিত হইল। মুখ ফিরাইলেন, অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন; কহিলেন, "সরলা! তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম।—আমার খাইবার কষ্ট কিছু নাই। তোমার সই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন; না করিলেও আমার অন্য স্থানে খাইবার সংস্থান আছে। আমি অন্য কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।"

স। "নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে?"

প্রেম। "সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে?"

স। "কষ্ট হইবে না? আমাদের আর কে আছে বল?"

প্রেমদাস পুনরায় মুখ ফিরাইলেন। রাজা সমরসিংহের দুহিতার বান্ধবের মধ্যে এক কৃষকপত্নী অমলা আর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। প্রেমদাস অতি কষ্টে অশ্রু-বেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনরায় কহি-লেন, "সরলা, তোমার মনের কষ্ট

দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু আমি কোন প্রকারে আর এগ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও, যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব, না হয়, এই শেষ।"—

প্রেমদাসের মুখ হইতে আব কথা বাহির হইল না,সরলার প্রশান্ত নীলোৎপল সদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টস্ টস্ করিতে লাগিল। প্রথমে একটী দুইটী বড় অশ্রু বিন্দু বদন মণ্ডলে পড়িল, শীঘ্রই দরবিগলিতঅশ্রুধারা বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। সরলা প্রেমদাসকে ভ্রাতার মত ভাল বসিত, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাল বাসা আপন হৃদয়কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না। বলিল, "যাইবে?" যে কাতর স্বরে এই কথাটী উচ্চারিত হইল, সে কেবল রমণীকণ্ঠ হইতেই সম্ভবে। স্নেহার্দ্র প্রেম পরিপূর্ণ রমণীহৃদয় হইতেই সে স্বর বহির্গত হয়। সরলা সেই স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবে?" প্রেমদাস আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরলার অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া স্বর্গীয় প্রেমময় মুখ মণ্ডল দেখিয়া, স্নেহ মাখা কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইল। দুইটী হাতে সরলার দুইটী হাত ধরিয়া রহিলেন; দুই জনেরই শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল; অশ্রু ধারায় মুখ মণ্ডল ভাসিতে লাগিল।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উদ্যানে, চন্দ্রালোকে উভয়ে অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া—উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া, পরস্পরের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—পরদর্শন সুধা পরস্পর যেন সতৃষ্ণ নয়নে পান করিতে লাগিলেন;—পরস্পরের বদন মণ্ডল দেখিয়া যেন হৃদয়ের যাতনা কিছু২ শান্ত হইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে প্রেমদাস স্নেহ ভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, পাপের দণ্ডের জন্য যাইতেছি। ভগবান অবশ্যই আমাকে সাহায্য করিবেন। যদি তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয়? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।"

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "যদি আইস, কবে আসিবে?"

প্রেম দাস বলিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজি পূর্ণিমা, আজহইতে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে, প্রেম দাস আর এ জগতে নাই।"

"যদি না হয়, তবে জানিবে, সরলাও আর এ জগতে থাকিবে না।"

এই কথা বলিতে২ দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা বুঝিল, চিন্তা আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। প্রেমদাস অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবান্, সহায় হও যেন এই রমণী রত্ন লাভ করিতে পারি। যদি না পারি, এই পূর্ণচন্দ্র সাক্ষী রহিলেন, অদ্য হইতে সপ্তম পূর্ণিমাতে আত্মবিসর্জ্জন করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর পরিত্যাগ।

And there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
That ne'er might be repeated. Who could guess
If e,er again should meet those mutual eyes
Since upon a night so sweet such awful morn could rise!

Byron.

প্রেমদাস যে যথার্থ প্রেমের দাস, তাহা পাঠক মহাশয় অবগত হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন আর কিছু বিশেষ পরিচয় দিতে আমরা অভিলাষ করি।

রাজা সমর সিংহ বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের সম্পৎকালে পরম বন্ধু ও বিপৎকালে এক মাত্র অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বী জমীদারদিগের বঙ্গদেশে গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপৎকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এপ্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছাপুরের প্রজারঞ্জন জমীদার নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী রাজা সমর সিংহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমর সিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন, ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

রাজা সমর সিংহের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ বিধবা রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে এই বিবেচনায় আন্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানব-হৃদয়ে স্নেহরজ্জু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে২, সপ্তাহে২, মাসে২ নগেন্দ্র নাথ আপনার উন্নতিপথে ধাবিত হইতে লাগিলেন; যাহাতে আপনার ধন মান ক্ষমতা বর্দ্ধন হয়, যাহাতে বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে২, সপ্তাহে২, মাসে২, অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্যার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্যা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্মরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয় নগেন্দ্র নাথকে কৃতঘ্ন পামর বলিয়া মনে করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যদি নগেন্দ্রনাথ কৃতঘ্ন হয়েন, তবে এই বিপুল সংসারে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন লোক কৃতঘ্ন। পাঠক মহাশয়! এই অখিল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয় জন উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আপন পথে কাঁটা দেন,—কয়জন পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে আপন স্বার্থ সাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতি-

দ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কতদিন থাকে,—মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কত দিন থাকিতে পারে? পাঠক মহাশয় যদি নগেন্দ্র নাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকেন, তবে নগেন্দ্রনাথ কৃত অপরাধ হইতে আপনি নিরস্ত থাকুন। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব আপনার মুখ চেয়ে আছে, তাহাদিগকে আশ্রয় দান করুন; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা দানে ধাবমান হউন। যদি স্বার্থের মত পরের কার্য্য সাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন, যদি পরোপকারস্বরূপ মহা ব্রতে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে আপনি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন,—৯৯ জনের মধ্যে পরিগণিত হইবেন না।

এক্ষণে আমরা আর এক জনের কথা বলিব। তিনি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন। নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় উদার-চরিত্র পুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সাধনে এত দূর বিমুখ, যে অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত,—স্বার্থ সাধনে তৎপর হইলেই লোক জগতে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবান জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না;—উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল বাসিতেন; কখন২ কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন;—সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে২ ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গোশালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন, দিনে২ বৎসরে২ যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথা বার্ত্তা শুনিতেন,—অমুক গ্রামে একটা পুষ্করিণী খনন হইতেছে; অমুক গ্রামে ধান্য দুর্মূল্য হইতেছে;—এস্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক;—ওস্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী; সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধন মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন; আপন কুল গৌরব বিস্মৃত হইতেন;—সেই ধান্য ক্ষেত্রবেষ্টিত, আম্র কাননশোভিত কুটীরাবলি নিবাসীদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন। এরূপ লোককে সকলেই পাগল বলিবে না ত কি?

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্র নাথ আপন পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অনেক দিন অনুসন্ধানের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী তীরে চন্দ্র শেখরের আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয় দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায়ও গর্ব্বিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে

সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্র নাথ বার২ উপরোধ করিলেন কিন্তু মহাশ্বেতা বার২ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রাজা সমর সিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায়ও মাননীয়,—পরের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করে না।" এ কথায় সুরেন্দ্র নাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন, "আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রত্যুপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমার জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি অর্থ গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি?" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "তবে তোমার জমীদারির মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে২ তাহার খাজনা দিব, আর কোন নদীতীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেও, তথায় এই শিবপ্রতিমা প্রতি রাত্রে পূজা করিব। ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।" সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায়ই থাকিতেন।

যে সময় সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের আশ্রমে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্ম বেশ—তখনই তিনি প্রেমদাস নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন,—ছদ্ম বেশেই তাঁহার সহিত সেই নিস্তব্ধ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতী তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন; কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন; কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এই রূপে ছয় বৎসর অবধি প্রেমদাস ও সরলার মধ্যে সোদর সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমা রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই।

প্রেমের কি প্রবল পরাক্রম! যে সরলার বালিকাহৃদয়ে কখনও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, আজি সেই সরলার হৃদয় চঞ্চল হইল। বাল্যকালাবধি সুরেন্দ্রনাথ যে পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—আজি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রেমব্রত অবলম্বন করিলেন। আজি তিনি পরোপকারী সুরেন্দ্রনাথ নহেন, ঘোর স্বার্থপর প্রেমদাস।

প্রেম পরায়ণতা আর স্বার্থপরতা কি এক? যে পবিত্র প্রেমের উপরোধে লোকে প্রণয়িনীর উপকারার্থ আত্ম বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়, সে পবিত্র প্রেম কি স্বার্থপরতার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?—কবিগণ যাহাই বলুন, প্রণয়ীগণ যাহাই বলুন, আমাদের অভিপ্রায় এই, সেই পবিত্র প্রেম স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ভাব অবলম্বন করিয়া তুমি জগতের উপকার হইতে বিরত হইলে,—যে ভাবে অন্ধ হইয়া তুমি সমগ্র জগতে কেবল আপন প্রণয় পাত্রের প্রতিকৃতি দেখিতে পাও,—যাহার প্রভাবে তুমি বিবেচনা কর যে, এই সুন্দর নভোমণ্ডল, সুন্দর বৃক্ষলতাদি, নয়নরঞ্জন পুষ্পচয় কেবল তোমাদের প্রণয় ও সুখ বর্দ্ধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে,—যে ভাবের প্রভাবে তুমি আত্মসুখ ও আপন প্রণয়িনীর

সুখ ভিন্ন আর সকলই ভুলিলে,—সে ভাব স্বার্থপরতা নহে ত কি ?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রেমদাস তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রেমদাস বলিলেন ;

"আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধন সাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না।"

মহাশ্বেতা। "পাইবে না।"

প্রে। "আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি অদ্যই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

মহা। "আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন। কিন্তু, তুমি বালক,—সেই চতুর বুদ্ধিকুশল পামরকে কি রূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর।"

প্রেম। "অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয়।"

মহা। "অবশ্যই তোমার জয় হইবে,—ধর্ম্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে,—কেহ আর দেবদেবীর আরাধনা করিবে না।"

প্রেমদাস ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের যদি সর্ব্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্র বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানব জাতি কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিত না। যখন চারিদিকে পাপের গৌরব দেখিতেছি,—যখন অত্যাচারী নরাধম ও কপটাচারীগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য্যলাভ করিতেছে, যখন পরম ধার্ম্মিক পবিত্রচেতাঃ পরোপকারিগণ নিষ্পীড়িত ও পদদলিত হইতেছেন,—তখন আর সংসারের ছারখার হইবার বাকী কি ? অধুনা কয় জন দেবদেবীর উপাসনা করিয়া কার্য্য সাধন করিতে তৎপর হয় ?—আর কত সহস্র২ লোক পাপাচরণ করিয়া পাপ বুদ্ধিকৌশলে সফল যত্ন হয়। যদি সদাই ধর্ম্মেরই জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচরণ এ সংসার হইতে একবারে দূরীভূত হইত। তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে ? ভগবানের লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে ?"

মহাশ্বেতা দেব দেবীর প্রতি বড় ভক্তি করিতেন, এই কথায় তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ হইল, কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল। কিন্তু অনেকক্ষণ চিন্তিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে ? ভগবানের লীলা-খেলা কে বুঝিতে পারে ?"

পরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা প্রেমদাসকে বলিলেন। প্রেমদাস বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এই পাগলিনী মানুষী কি যোগিনী কি প্রেত-কন্যা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় নাই।"

মহাশ্বেতা। "কখন মিথ্যা হয় নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিল। আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম। সেই বীর পুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতি পথে অদ্যাপি জাগরিত রহিয়াছে। বলিলেন, 'ঘোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমর

সিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই,—আজি পামর সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি?' সুরেন্দ্র নাথ! পূর্ব্ব কথা আর তোমাকে কেন বলি? যে হুতাশন আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে, তাহা অন্তরেই থাক।"

প্রেমদাস বলিলেন, "সে বার ভিন্ন আরও দুই তিন বার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাই সত্য হইয়াছে। আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।"

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্ত পাগলিনী দুই তিন বার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখন মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পামর সতীশচন্দ্র আবার সমর সিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মানুষী হউক বা প্রেতকন্যা হউক, জানিতে পারিয়া, সতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিল। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অদ্যই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ,—উপায়ান্তর নাই।"

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন,—আমার আলয়ে আপনাকে আহ্বান করিতে আর ভরসা করি না?"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "চন্দ্রশেখরের আশ্রমে পুনর্ব্বার যাইব।" প্রেমদাস কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা, সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকা মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্তরোপিত পুষ্পচারা সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষীদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আম্র বৃক্ষের নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না;—সন্ধ্যায় অমলার সেই সুমধুর হাস বিকাসিত মুখ আর দেখিতে পাইব না।—অমলার কথা স্মরণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল, বলিল,

"মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া আইসি?" মহাশ্বেতা বলিলেন, "যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আইস।"

সরলা বিদায় লইতে চলিল।

অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, "সই।" প্রফুল্লবদনা অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি তামাশা করিবে, বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠ হাসিতে বিস্ফারিত; বলিল, "এত রাত্রিতে?" আর কথা বাহির হইল না। সরলার মুখ পানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল; অধরের হাসি শুখাইয়া গেল, দেখিল, সরলার নয়নযুগল জলে ছল২ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহ ভরে হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সই, কি হইয়াছে?"

সরলা উত্তর করিল, "মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অদ্যই চলিয়া যাইব,—তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা," বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মুখ লুকাইয়া দর বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার

হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার স্বরভঙ্গীতে সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। অমলা কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মনেং প্রতীতি হইল, প্রিয় সখীর সহিত চির বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। তখন অমলাও চিত্ত সংযম করিতে পারিল না। সরল চিত্তা সরলাকে অমলা কনিষ্ঠ সোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করিত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাকে সোদর অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিত। এখন, সহসা সেই প্রিয় সখীর সহিত চির বিচ্ছেদ হইল। সহসা ছয় বৎসরের প্রণয়ের কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। অমলা অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল। কিন্তু সরলাকে রোদন করিতে দেখিয়া শীঘ্রই আপন চিত্ত সংযত করিল, সরলাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেই খানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তাহার জন্য চিন্তা কেন? এক্ষণ এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?"

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "তাহা আমি জানি না; মা তাহা বলেন নাই। কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী তীরে চন্দ্র শেখরের আশ্রমে যাইতেছি।"

অম। "কেন যাবে, জান না?—আমি বলিব?"

সর। "বল।"

অম। "তোমার মা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন!"

সরলা অগত্যা দুঃখ ভুলিয়া গেল, একটু হাসিল। অমলা পুনরায় বলিল,—

"তা বনাশ্রম আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমায় দেখিয়া আসিব। দেখিও বিবাহের সময় আমি উপস্থিত হইয়া 'উলু' দিব।"

এই প্রকারে অনেক ক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। কেহ আর কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না,—ছাড়িলে যেন দুই জনেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। অথচ অমলার কথায় সরলার হৃদয় কিছু শান্ত হইয়াছে;—অমলার অধরে হাসি, চক্ষে ক্রন্দন,—হৃদয়ে কি তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, পাঠক মহাশয় বুঝিবেন।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল, দাঁড়াও সই, আমি শীঘ্রই আসিতেছি,—বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। যখন পুনরায় বাহিরে আসিল, সরলা দেখিল, তাহার বসন সিক্ত হইয়াছে ও চক্ষু দ্বয় রক্ত বর্ণ। আসিয়া সরলার কাপড়ের অঞ্চলে কি বাঁধিয়া দিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিলে সই?"—অমলা উত্তর করিল,

"ও কিছু নহে, পথে ক্ষুধা পাইবে, সেই জন্য কিছু মুড়ী আর ফুট্ কড়াই আঁচলে বাঁধিয়া দিতেছি।—আমার মাথা খাও, ফেলিয়া দিও না," এই বলিয়া কাপড়ে ২০ টী রৌপ্য মুদ্রা বাঁধিয়া দিল। অমলা আবার বলিল,

"স্বামী পাইলে আমাকে মনে থকিবে ত?"

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায় হইল। অমলা বলিল, "কাঁদিও না সই, আমি জানি, তুমি সইকে ভুলিবে না, কিন্তু পাছে ভুলে যাও, তাই আমার একটী চিহ্ন তোমার গায়ে বাঁধিয়া দি" এই

বলিয়া আপন গলদেশ হইতে সোণার চিক লইয়া সরলার গলে পরাইয়া দিতে গেল। সরলা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে অমলা বলিল, "যদি না লও, তবে আমি জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ;—যদি আমাকে কখন ফিরাইয়া দিতে চাহ, তবে জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ।" সরলা নিরুত্তর হইল। অমলা তাহাকে সেই চিক পরাইয়া দিতে লাগিল।

পরাইয়া দিতে২ অমলা সেই পূর্ণচন্দ্রের আলোকে সরলার বালিকা মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলবেষ্টিত মুখ খানি দেখিতে লাগিল, সেই নীলোৎপল সদৃশ প্রেম বিস্ফারিত নয়ন দুটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, সেই সুমধুর ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠ দুই খানি দেখিতে লাগিল। মনে২ ভাবিল, এই প্রেম পুত্তলীকে কি আর কখন হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পাইব না? মনে এই ভাবনা উদয় হওয়ায় আর চিত্তসংযম হইল না।

চিক পরাইবার ছলে অমলা সরলাকে আপন হৃদয়ের উপর আনিল, স্নেহ ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। নয়নের নিকট নয়ন লইয়া আসিল, কম্পিত অধরৌষ্ঠে কম্পিত অধরৌষ্ঠ স্পর্শ করিল। সরলা দেখিল, চিক পরান আর শেষ হয় না, দেখিল, আপনার কাপড় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "সই কাঁদিতেছ?" অমলা বলিল, "আমি কাদিতেছি না, তুমি কাঁদিতেছ?—আমার ঘুম পাইয়াছে, আমি শুইগে যাই"—এই বলিয়া বেগে গৃহের ভিতর চলিয়া গেল। সরলা ধীরে২ আপন কুটীরাভিমুখে চলিল। অল্প দূর যাইয়া অমলার গৃহের দিক হইতে অতি মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। রমণীকণ্ঠনিঃসৃত হৃদয়বিদারক মৃদু রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইল। সরলা কিছু বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সই ত ঘুমাইতে গেল, ক্রন্দন করে কে? ভাবিতে২ দ্রুত পদে আপন গৃহাভিমুখে গমন করিল।

এদিকে প্রেমদাস নৌকা ঠিক করিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও প্রেমদাস সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন, দ্রব্যাদির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত শিবপ্রতিমা, আর দুই একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন কিছুই লইলেন না। নৌকা ধীরে ধীরে ইচ্ছামতী নদী দিয়া চলিতে লাগিল। কোন২ স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়াছে, উভয় পার্শ্বে প্রান্তর, অটবী, ও গ্রামস্থ বৃক্ষলতাদি চন্দ্রালোকে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন২ স্থানে নদী এমন সংকীর্ণ হইয়াছে যে, উভয় পার্শ্বস্থ বংশশাখা লম্বিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার নিবিড় পত্ররাশির মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া স্থানে২ ইচ্ছামতীর স্বচ্ছ সলিল উজ্জ্বল করিতেছে। ইচ্ছামতীর নীল জল কল্ কল্ করিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরী তরং করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সরলা এই প্রকার শোভা সন্দর্শন ও শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিতে২ শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। প্রেমদাস্ নিকটে উপবেশন করিয়া আপন অঙ্কে সরলার মস্তক স্থাপন করিলেন, সমস্ত রাত্রি আপনি অনিদ্র হইয়া সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকদীপ্ত সেই নির্ম্মল মুখ মণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। চক্ষুর জ্যোতিঃ এক্ষণে স্তিমিত; নিবিড় কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত পত্রগুলি

নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে নৌকা ইচ্ছামতীতীরস্থ আশ্রমে লাগিল। আরোহীগণ নামিলেন। ধীরে২ পথ অতিবাহন করিয়া চন্দ্রশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসীগণ আগ্রহ পূর্ব্বক রমণীগণকে আহ্বান করিলেন। প্রেমদাস সরলার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন, "আজি হইতে সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যদি তোমার সহিত না সাক্ষাৎ করি, তবে জানিবে, প্রেম দাস এ জগতে নাই;—সে পর্য্যন্ত আমাকে মনে রাখিও।" সরলার কোন উত্তর নাই, অতি কাতর সজল নয়নে প্রেম দাসের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার অর্থ এই, "শরীরে যত দিন জীবন থাকিবে, তুমি স্মৃতি পথে জাগরিত থাকিবে।" দেখিতে২ প্রেমদাস দৃষ্টির অগোচর হইলেন। সরলা অনেক ক্ষণ শূন্য হৃদয়ে সজল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, অনেক ক্ষণ পর শূন্য হৃদয়ে আশ্রমাভিমুখে ফিরিল।

বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

যে মহাপুরুষের মতানুযায়ী ধর্ম্ম অদ্যাবধি আশিয়া খণ্ডস্থ নানা স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে, সেই ভুবনবিখ্যাত বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের উত্তর সীমাস্থ নেপাল রাজ্যের তুষার সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত সমূহের নিকটবর্ত্তী কপিলবাস্তু নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গৌতম বংশোদ্ভব এবং কপিলবাস্তু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মাতা মাধবী, শুপ্রবুদ্ধ নামা রাজার কন্যা। তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য ও সত্যানুরাগ প্রভৃতি অশেষ বিধ গুণ ছিল। বুদ্ধদেবের পিতৃ বংশ ক্ষত্রিয়, পৈতৃক নামানুসারে বুদ্ধদেব শাক্যনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ বাল্যকালে পিতৃগৃহে "সিদ্ধার্থ," নামে আখ্যাত হইতেন, কিন্তু যৌবন কালে বুদ্ধ নামে আপনাকে পরিচিত করেন। তদীয় ধর্ম্মপরায়ণা মাতা তাঁহার জন্ম গ্রহণ করিবার সপ্তদিন পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা নবজাত পুত্রের অসহায় অবস্থা দর্শন করিয়া মৃত পত্নীর এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া তদীয় হস্তে শিশু পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। এপ্রকার কিংবদন্তী যে, তিনি পত্নীর মৃত্যুর অগ্রেই তাঁহার ভগিনীকে স্ত্রীর ন্যায় গ্রহণ করেন। রাজনিয়মানুসারে বুদ্ধ দেবের পিতা অতি অল্প বয়সে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার্থে সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সিদ্ধার্থ অনতিবিলম্বে স্বকীয় অসাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি দর্শাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। কিঞ্চিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তিনি সহাধ্যায়িগণের সহিত ক্রীড়া না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন নিবিড় গহনের মধ্যস্থিত নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। কপিলবাস্তুর অধিপতি পুত্রের এই প্রকার অবস্থার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত শীঘ্র তাঁহার উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিতে কৃত সং-

কম্প হইলেন। যখন রাজার প্রধান সপ্ত মন্ত্রী তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, তখন তিনি উহার কোন উত্তর না দিয়া কিয়দ্দিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বিবাহ তাঁহাকে চিত্তের অস্থিরতা ও চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইবে না, জানিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। বহুদর্শী মন্ত্রিবর্গ মৌনং সম্মতি লক্ষণং জানিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর দণ্ডপানির গোপনাম্নী ভুবনমোহিনী দুহিতার সহিত বিবাহ স্থির করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে দণ্ডপাণি সিদ্ধার্থকে মনুষ্যত্ববিহীন ও সহজজ্ঞান শূন্য স্থির করিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবিধ গুণ সম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে অসাধারণ মানসিক বুদ্ধি ও শারীরিক বল বীর্য্যসম্পন্ন জানিতে পারিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের শুভ বিবাহ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু সিদ্ধার্থ পূর্ব্বকার ন্যায় গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। তিনি স্বীয় বন্ধু বর্গকে বলিতেন, "পাপময় পৃথিবীতে কিছুই স্থির নহে, কিছুই সত্য নহে, সকলই অসত্য; জীবন, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষনোৎপন্ন অগ্নি কণার ন্যায়, প্রজ্বলিত হইবার মুহূর্ত্তেক পরেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। কে জানে, কোথা হইতে এই জীবন আসিল ও কোথায় গমন করিবে। ইহা বীণা শব্দের ন্যায়—জ্ঞানী পণ্ডিতগণের ইহার আগমন ও প্রতিগমনের স্থান নির্ণয় করা বৃথা।" কপিলবাস্তুর রাজা স্বকীয় পুত্রের এতাদৃশ মানসিক অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা ও সাধ্যানুযায়ী যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তাঁহার যৌবন কালের কয়েকটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

এক দিন সিদ্ধার্থ রাজবাটীস্থ বহু দাসবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নগরের উত্তর দ্বার দিয়া সন্ধ্যাকালীন স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবনার্থ আপনার উদ্যানাভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে এক রুগ্ন, জরাতুর শ্লথচর্ম্ম বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীরস্থিত অস্থি ও শিরা সকল বহির্দ্দেশ হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তাহার দন্তপাটি দ্বয় শীতে কম্পমান হইতেছে, গাত্রে এক জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং অনাহার জন্য বাক্যস্ফুট করিতে পারিতেছে না। হস্তস্থিত যষ্টীর উপর ভর দিয়া একং পদ করিয়া অগ্রসর, আবার ক্ষীণতা হেতু পুনরায় ভূতলশায়ী হইতেছে। রাজপুত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মানুষ কে? দেখ উহার শরীর রুগ্ন হইয়াছে, বৃদ্ধাবস্থা উহার শরীরস্থ রক্ত মাংসকে শুষ্ক করিয়াছে, অস্থি ও শিরা সকল গাত্রাবরণ চর্ম্মের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বৃদ্ধাবস্থা হেতু উহার মস্তকস্থিত কেশ সমূহ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, উহার জীবনের চরম দশা উপস্থিত। দেখ, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, প্রত্যেক পদনিক্ষেপে পদ স্খলিত হইতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা কি উহার দরিদ্রতা হেতু হইয়াছে, না মনুষ্য মাত্রকেই এই

প্রকার অবস্থায় পতিত হইতে হয়? সারথি উত্তর করিল "কুমার, ঐ ব্যক্তির জীবনের চরম দশা উপস্থিত হইয়াছে, উহার উত্থান ও বুদ্ধিশক্তি সমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট পরম্পরা উহার মানসিক শক্তি ও বলকে নিঃশেষ করিয়াছে, এবং উহার বন্ধুগণ নিবিড় গহন মধ্যস্থিত শুষ্ক ও পুরাতন বিটপীর ন্যায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এ ব্যক্তির ঐ প্রকার অবস্থা, পরিবারস্থ দরিদ্রতা হেতু হয় নাই, পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন কাল, প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এবং বৃদ্ধাবস্থায় উহা নিপতিত হয়। আপনার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা, মাতা, জ্ঞাতিবর্গ, বন্ধুবর্গ সকলেই ঐ অবস্থার অধীন, ইহা পৃথিবীস্থ সকল ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট চরম দশা।" রাজপুত্র উত্তর করিলেন,"হায়, মনুষ্যগণ কি এত অজ্ঞান, এত হীনবুদ্ধি ও এত মূর্খ যে, বৃদ্ধাবস্থাকে নিকট দেখিয়াও, তাহার কষ্ট সমূহ সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়াও যৌবন কালের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়? আমিও ঐ বৃদ্ধাবস্থার অধীন, আমিও উহার ন্যায় শ্লথচর্ম্ম ও হীনবল হইব, তবে ক্ষণস্থায়ী সুখে মনঃসংযোগ করিয়া কি ফল?" এই বলিয়া তিনি সারথিকে যান প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে অন্য এক দিন যখন তিনি সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালীন সমীরণ সেবন করিবার নিমিত্ত নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া নিজ উদ্যানাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে এক জ্বরপ্রপীড়িত রুগ্ন মনুষ্যকে সন্দর্শন করিলেন। তাহার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, গাত্রময় কর্দ্দম লিপ্ত রহিয়াছে,বন্ধুবিহীন, অর্থহীন ও বাসস্থানশূন্য হইয়া রাজমার্গের এক পার্শ্বে পতিত। নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ, বাক্যস্ফুট করিতে অক্ষম ও আপনার শরীরের শোচনীয় অবস্থা এবং অন্তিমকাল সম্মুখীন দেখিয়া সময়ে২ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। রাজপুত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার আশানুযায়ী উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সকরুণ ভাবে বলিলেন, "হায়, মনুষ্য শরীরের সুস্থাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। কোন্ জ্ঞানী এই ব্যক্তির এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও বলিতে পারেন যে, মনুষ্যবর্গ সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে।" এই প্রকার নানা প্রকার খেদোক্তি করিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ সারথিকে রথ রাজবাটী অভিমুখে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

আর একদিন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া নিজ উদ্যানাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে খট্টোপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত এক মৃতদেহ দর্শন করিলেন। পশ্চাৎ২ মৃত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কেহ২ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে২ গমন করিতেছে। কয়েকটী স্ত্রীলোক আপন২ আলুলায়িত কেশ পাশ ক্ষোভের সহিত উৎপাটন করিতেছে। তাহাদিগের মস্তক সকল ধুলিময়, গাত্র কর্দ্দমাক্ত; বক্ষস্থলে করাঘাত করিতেছে ও ভুমিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, ও মধ্যে২ হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ লোক সমুহের মধ্যে খেদ, দুঃখ ও সংসারের অনিত্যতার ভাব উদয় করিয়া দিতেছে। হায়,

সেই দুঃখ দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বুদ্ধদেব এই সময়ে নিজ সঙ্গিগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! সে যৌবন কুসুম লইয়া কি হইবে, যাহা বার্দ্ধক্যরূপ প্রবল প্রতাপ সম্পন্ন বায়ুতে অচিরাৎ স্খলিত হইবে? সে স্বাস্থ্য লইয়া কি হইবে, যাহা নানা রোগ দ্বারা অনতিবিলম্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই জীবন লইয়া কি হইবে, যেখানে মানুষের আত্মা এত অল্পকাল বাস করিতে পারে। যদ্যপি বৃদ্ধাবস্থা না থাকিত, যদ্যপি মনুষ্যবর্গের রোগ, শোক, দুঃখ, মোহ না থাকিত, তাহা হইলে এরাজ্য কি সুখেরই হইত।" এই বলিয়া যুবরাজ সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় যান প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আর এক দিন যুবরাজ নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া তদীয় পিতা দ্বারা সংস্থাপিত উপভোগার্থ নানা সুখপ্রদ সুস্বাদু ফল মূল পরিপূরিত উদ্যানের সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থির-মনঃ-সম্পন্ন—সুন্দর দেহ সম্পন্ন—দুর্দ্দান্ত ষড়রিপুজিত, নতমস্তক, ধার্ম্মিকের ন্যায় কেশ, ও ভিক্ষা পাত্র হস্তে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া যুবরাজ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? সারথি উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! ইনি এক জন ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী, ইনি সমুদায় পার্থিব সুখ—বৃথাভোগ সুখ— ও সংসার বাসীগণের সর্ব্ব সময়ের সখা যে "আশা," তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ও পরিশেষে সংসার রূপ মোহ মায়া হইতে অবসৃত হইয়া কঠোর সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি দুর্দ্দান্ত রিপুগণকে শাসন ও বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ক্ষুধানিবারণার্থ ইহাঁর বহুমূল্য উপাদেয় খাদ্যবস্তু প্রয়োজন করে না, ভিক্ষা দ্বারা ও ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন।" যুবরাজ সিদ্ধার্থ ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, ইহাই সর্ব্বোত্তম, ইহাই প্রশংসনীয়, ইহাই অনুধাবনীয়; সন্ন্যাসী জীবন সকলের পক্ষে শ্রেয়, ইহা সর্ব্বকালে, সর্ব্ব সময়ে, বিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিগণ দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। ইহাই আমার আশ্রয় স্থান, ইহাই পৃথিবীস্থ সমুদায় জীবগণের আশ্রয় স্থান। ইহাই আমাদিগকে সত্য জীবনাভিমুখে লইয়া যাইবে। ইহাই আমাদিগকে সুখ ও পরম সত্য প্রদান করিবে। এই বাক্যাবলি উচ্চারণ করিয়া যুবরাজ চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া নিজ বাসাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই দিন শর্ব্বরী আগমনে বুদ্ধদেব আপনার পিতা ও সহধর্ম্মিণীর নিকট নিজ কঠোর ও বিষম অভিপ্রায়—পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করণাভিপ্রায়—উত্থাপন করিলে তদীয় পিতা ইহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে নানা উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদীয় অনুপম রূপ লাবণ্য সম্পন্না দণ্ডপাণিনন্দিনী গোপা নাম ধর্ম্মোন্মত্তা সহধর্ম্মিণী নানা প্রেমসূচক সদুপদেশ ও বিচ্ছেদ নিমিত্ত নানা হৃদয় বিদারক খেদ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কিছুই বুঝিলেন না দ্বিপ্রহর রজনী কালে—নিদাঘ নিশীথ সময়ে তিনি নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজ বাটীর

দ্বারবান ও রক্ষকগণকে সুষুপ্তাবস্থায় দর্শন করিয়া সহধর্ম্মিণীর হৃদয়বিদারক খেদ বাক্য, পিতার প্রেম ও স্নেহপূর্ণ বাক্যাবলী তাচ্ছল্য করিয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া সুখের আলয় সুরম্য রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজ অশ্বালয় হইতে এক বায়ুবেগগামী বলবান সুশ্রী তুরঙ্গমোপরি আরোহণ করিয়া কেবল উক্ত ঘোটকের রক্ষককে সমভিব্যাহারে সমস্ত রাত্রি নিবিড়—নিশাচর পরিপূরিত—বিপদ পরিপূর্ণ গহন মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া ঊষা সময়ে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, ও অশ্বরক্ষককে নিজ বহুমূল্য স্বর্ণ-হীরা মুক্তা সম্বলিত গাত্রাভরণ সকল দান করিয়া কপিলবাস্তুনগরে পুনঃপ্রেরণ করিলেন। "ললিত বিস্তার" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে এক সুবিখ্যাত পুস্তক আছে, তল্লেখক বলেন, যে স্থানে বুদ্ধদেব উক্ত অশ্ব রক্ষকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই স্থানে অদ্যাবধি একটী কির্ত্তীস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। হিরন্থ সাং নামক চীন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বুদ্ধ ধর্ম্মাশক্ত ভুবন বিখ্যাত পর্য্যটনকারী বলেন, "আমি যখন কুশি* নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, সেই সময়ে পথি মধ্যে একটী নিবিড় ঘন সন্নিবিষ্ট বিটপি সমুদায় পরিবেষ্টিত গহনের প্রান্ত-ভাগে একটী কীর্ত্তি-স্তম্ভ দর্শন করিয়াছি। ইহা ঐ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। বুদ্ধদেব এই স্থান হইতে সর্ব্ব প্রথমে বৈষাল (Vaisali) নামক নগরে গমন করিয়া এক জন সুবিখ্যাত সন্ন্যাস ধর্ম্মব্রতী তিন শত শিষ্য পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট গমন করিলেন। ঐ পণ্ডিত যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা করিয়াছিলেন কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহার নিকট হইতে নিজ আশানুরূপ কোন ফল পাইলেন না এবং অনতিবিলম্বে হতাশ্বাস হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্কট সঙ্কুল জলধি রূপ-সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় তিনি তাঁহার নিকট দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে তিনি মগধ দেশীয় রাজধানী রাজগৃহ নামক নগরে সাত শত শিষ্য পরিবেষ্টিত এক ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারও নিকট হইতে হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থানে তিনি নিজ মতানুযায়ী পঞ্চ শিষ্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং ষষ্ঠ বৎসর কাল উক্ত রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামসন্নিহিত নিবিড় গহন মধ্যস্থিত এক নির্জ্জন ও লোকালয়শূন্য স্থানে বাস করিয়া দৃঢ় ও কষ্টসহ তপস্যাতে মন সংযোগ করিয়া এবং স্থির চিত্তে ও অচঞ্চলমনা হইয়া ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী ষড়রিপুচয়কে দমন করিলেন। ষষ্ঠ বৎসর কাল কঠোর তপস্যা ব্রতে জীবন অতিবাহিত করিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তাপস-ব্রত আত্মাকে শান্তি এবং মনকে পরিশুদ্ধ না করিয়া তদ্বিপরীতে ধর্ম্ম পথের ব্যাঘাত ও বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে। এই প্রকারে নানা আন্দোলন আলোচনার পর তাপস-ব্রতের কঠোর নিয়মাদি পরিত্যাগ করিলেন। তদীয় পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী নির্দ্দেশ

* কুশিনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে পঞ্চাশত ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল। ঐ নগর এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

করিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধদেব এই প্রকারে সঙ্গীগণ দ্বারা অবমাননীয় রূপে পরিত্যক্ত হইলে খেদ বা কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। এক্ষণে তিনি ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের সংকীর্ণ মত সমূহ ও কঠোর তাপস-ব্রত মনুষ্যবর্গকে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না, এই ভাব তাঁহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল। এই রূপে বহু দিনের পর যথার্থ মুক্তির পথ কি, চিন্তা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তাঁহার বর্ত্তমান জ্ঞান ও মত সত্য। এই সময় হইতে তিনি বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী) নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম পৃথিবীস্থ মনুষ্যবর্গের নিকট প্রচার করিবেন কি স্বয়ং সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা সুখে অতিবাহিত করিবেন। মনুষ্যবর্গ অজ্ঞানকূপে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ও মিথ্যা ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেছে, দেখিয়া তিনি সাধারণ্যে নিজ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই রূপে বুদ্ধদেব এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন, যে ধর্ম্ম অদ্য পর্য্যন্ত পঁয়তাল্লিশ কোটি পাচলক্ষ মনুষ্য বিশ্বাস করিয়া থাকে।

তৎপরে বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের তৎকালীন বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনার প্রধান স্থান বারাণসী নগরে গমন করিলেন। এবং এই স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত পঞ্চ শিষ্যকে নিজ মতানুযায়ী ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রথমে দীক্ষিত করিলেন। এই প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থে আরও সহস্র সহস্র নগর বাসী তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিল। যৎকালীন তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা সহকারে নিজ ধর্ম্মের নামকে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি মগধ রাজ্যাধিপতি দ্বারা তদীয় রাজধানী রাজগৃহ নামক নগরে আহুত হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি রাজাজ্ঞা পালন করিলেন, এবং ঐ রাজ্যস্থ অতুল প্রতাপসম্পন্ন যুবরাজ দ্বারা অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। তিনি উক্ত রাজ্যবাসীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সহস্র সহস্র লোক " কালান্তক " নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজপ্রদত্ত মঠে উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ মঠে কয়েকটী গভীর ভাব, রসও নীতি পরিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। মগধ রাজধানীর চতুর্দ্দিকস্থ পঞ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর শিখরাবলীর মধ্য ভাগে "গৃধিনী শিখর" নামে পর্ব্বত মাঝারে তিনি কয়েটী সদুপদেশ পরিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাঁহার তিনজন সুবিজ্ঞ শিষ্য শারিপুত্র কাত্যায়ন ও মদগালহনা (Maudgalyana) তাঁহার সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। বুদ্ধদেব এই প্রকারে কয়েক বৎসর মগধাধিপতির সহিত বন্ধুত্বভাবে অতিবাহিত করিলেন; কিছু দিন পরে ঐ মগধাধিপতি জেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক হত হইলেন।—এই সময়ে বুদ্ধদেব শ্রবাস্তি নামক স্থানে মগধরাজ্যস্থ অনাথপিণ্ডদা নামক এক অতুল বিভবশালী বণিক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক সুপ্রশস্ত রাজ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাতে নিজ শিষ্যগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক যে সমুদায় সদুপদেশ ও বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মোপদেশ এই কোশল রাজধানী শ্রবাস্তি নামক নগরে

প্রদত্ত হইয়াছিল। এই স্থানে কোশল-রাজ তাঁহার মতানুযায়ী ধর্ম্ম পরতন্ত্র হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বুদ্ধদেব বহু দিন নানা স্থানে, নানা দেশে নিজ ধর্ম্ম প্রচারার্থ পর্য্যটন করিয়া নিজ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানে প্রচার করিলেন। এই সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি নিজ পিতার রাজধানী কপিলবাস্তু নগরে গমন করিলেন; কথিত আছে, গমন কালীন তিনি পথিমধ্যে কতগুলি আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পিতৃ রাজধানী কপিলবাস্তু নগরে গমন করিয়া শাক্যবংশোদ্ভব সমুদায় পরিবারকে তিনি নিজ ধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে তদীয় সহধর্ম্মিণী এবং পিতৃব্য বধূ তাঁহার নব-প্রবচলিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল নিজরাজ্যে বাস করিয়া পুনর্ব্বার তিনি মগধরাজ্যে গমন করেন। মগধের বৃদ্ধ অধিপতি বুদ্ধদেবের সাতিশয় অনুরাগী ও প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম তিনি সর্ব্ব প্রথমে গ্রহণ করিয়া রাজপরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট করান বলিয়া তাঁহার প্রতি বুদ্ধদেব কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন। মগধাধিপতির পুত্র নিজ বৃদ্ধ পিতাকে নৃশংস ও নিষ্ঠুরের ন্যায় হত করিয়া পিতৃহত্যা পাপে কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বুদ্ধদেব উক্ত রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে বৃদ্ধ মগধাধিপতির পুত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ ও পিতৃ হত্যার নিমিত্ত বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে কয়েক বৎসর বাস করিয়া প্রত্যাগমন কালীন তারকামণ্ডলী বেষ্টিত চন্দ্রদেবের ন্যায় কোটি কোটি নিজ ধর্ম্মমতানুযায়ী মনুষ্য-বর্গে পরিবৃত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, মগধ রাজধানী রাজগৃহ নামক নগরের প্রান্তভাগ বাসী সুস্নিগ্ধ পবিত্র গঙ্গানদীর তটে উপস্থিত হইয়া তিনি এক খানি শ্বেতকায় প্রস্তরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত রাজধান্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "এই সুরম্য এবং আমার সাতিশয় আদরণীয় নগরের প্রতি আমার কোপ-দৃষ্টি"। বাস্তবিক বুদ্ধদেবকে আর উক্ত নগরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। পথিমধ্যে তিনি ভাইরালি নামক নগর দর্শন করিয়া কুশি নগর নামক নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে তদীয় শারিরীক বল নিস্তেজ ও অক্ষম হইয়া পড়িল। তিনি অসংখ্য শিষ্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক নিবিড় জনমানব শূন্য অরণ্যে বিশ্রামার্থ বাস করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু ঐ দিবস সায়ংকালে দিন মণি অস্তাচলে গমন করিলে সুস্নিগ্ধ সর্ব্বজন সুখানন্দ প্রদায়িনী সুশীতল চন্দ্রমা তারকা মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশের নীলবর্ণ ক্ষেত্রোপরি আবির্ভূত হইলেন। বুদ্ধদেব এক বিশাল শাল তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম কালীন স্বয়ং আপনার জীবাত্মাকে ধুলিময় দেহ হইতে অপসারিত করিয়া লইলেন। এই প্রকারে বুদ্ধদেব ৭০ বৎসর বয়ক্রম কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, অসাধারণ ভক্তি ও প্রেম সহকারে নিজ ধর্ম্মানুরোধে নানা রূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে ধর্ম্মপ্রচারানুরোধে পরিভ্রমণ করিয়া এবং উপযুক্ত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া এই অসার সুখ দুঃখময় মানব-লীলা পরিত্যাগ করিলেন।

প্রলীয়মান নক্ষত্র।

প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই কি অদ্ভুত, কত বিচিত্র, তাহাদের অদ্ভুততার ও বৈচিত্রের পরিসীমা নাই। যে দিকে দেখ, যাহা কিছু দেখ, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সকলই আশ্চর্য্যজনক বোধ হইবে। সহজ চক্ষে ভূগর্ভ নিহিত স্তর মধ্যগত বিবিধ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অবশেষ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ কর, তাহাদের ক্রম-লব্ধ উন্নতাবস্থা দেখিয়া না বিস্মিত হইয়া থাকিতে পারিবে? আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সাগর প্রবাহের দ্বারা সঙ্ঘটিত স্থল ও জল ভাগের বিনাশ, ভূ-কম্প সমুৎপাদিত উন্নত পর্ব্বতরাজী; যাহা কিছু দেখিবে, সকলই বিস্ময় জন্মাইতে ক্ষান্ত থাকিবে না। আবার সহজ চক্ষে যাহা না দেখা যায়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, অনুবীক্ষণ লও, একখণ্ড ক্ষুদ্র কাচে তোমার জিহ্বা অল্প মাত্র সংলগ্ন করিয়া, তাহা নিরীক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, কত কীটাবলি কাচসংলগ্ন তোমার মুখামৃত মধ্যে বিচরণ করিতেছে; তাহা দেখিয়া যখন তোমার সুন্দর আনন কত অসংখ্য কীটের আবাসস্থান বলিয়া জ্ঞান হইবে, তখন কি বিস্মিত হইবে না? ঊর্দ্ধে দেখিতে ইচ্ছা—দূরবীক্ষণ লও, অনন্তনীল নভস্তল ভেদ করিয়া তোমার সম্বর্দ্ধিত দর্শনশক্তিকে পরিচালিত কর, দেখিতে পাইবে, যে খানে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, সেখানে অসংখ্য হীরক খণ্ড জ্বলিতেছে! যাহাকে তুমি নক্ষত্র বলিয়াই ঠাহরিতে পার নাই, যাহাকে অতিশ্লথ বায়ুভরে আকাশপথে নীয়মান সুক্ষ্মতম মেঘখণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, হয়ত সেই মেঘ অসংখ্য তারকান্তরক, তাহাদের মধ্যে হয় ত কাহাকে যুগ্ম, কাহাকে বা ত্রিনয়নাকৃতি দেখিতে পাইবে। ইহা কি আশ্চর্য্যজনক নহে? এতদ্ব্যতীত আরও কত কত অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করা যায়, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রনিচয়ের সকল গুলি এক বর্ণের নহে। ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্র নক্ষত্র সমূহেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গগণমণ্ডলে যে সকল তারকা অতিসমুজ্জ্বল দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে Arcturus, (আর্কটুরস, Pollux, (পোলক্) Antares (আন্তোরিস্) প্রভৃতির বর্ণ লোহিত; Sirius, (সিরিয়স্) Vega, (বেগা) Regulus (রেগুলস্) প্রভৃতির বর্ণ শুভ্র; Procyon, (প্রোসিয়ন্) Atair, (আটায়র) ধ্রুব নক্ষত্র (Pole Star) প্রভৃতির বর্ণ পীত; Castor (কাষ্টর) ঈষৎ সবুজ বর্ণ। সার জন হর্শেল লিখিয়াছেন, যে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ৭৬টী নক্ষত্র দেখা যায়, তাহারা পদ্মরাগমণির ন্যায় রক্তবর্ণ। শুদ্ধ এই নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কখন কখন অতিশয় উজ্জ্বল থাকে, আবার কোন সময় তদপেক্ষা অনেক ঔজ্জ্বল্য বিহীন দেখা যায়। এই রূপ উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি, নক্ষত্র বিশেষে, বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে হইয়া থাকে,—সকলের এক সময়ে হয় না। কেহ কেহ বা আবার মধ্যে মধ্যে, অদৃশ্য হইয়া যায়; এবং কিছুকাল পরে আবার আমাদের নয়ন

পথের পথিক হয়। Cetus (সিটস)নক্ষত্র পুঞ্জের Mira Ceti (মিরা সিটাই) নামক নক্ষত্র, প্রতি ৩৩১ দিনে অর্থাৎ ১১বৎসরে ১২ বার ২য় শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল থাকিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু পুনরুজ্জ্বল হইলে সকল সময়ে এক প্রকার জ্যোতির্বিশিষ্ট হয় না,এবং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি সমভাবে হয় না। হেবেলিয়েস (Hevelius) বলেন, ইহাকে মধ্যে ৪ বৎসর দেখাই যায় নাই। গামা হাইড্রি (Hydræ) নামক নক্ষত্র ৩৯৯৪ দিনের মধ্যে দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া থাকে। পার্সিউস (Perseus) পুঞ্জের মধ্যে আল্‌গোল (Algol) অথবা বিটা-পার্সিয়াই (B. Persei) নামক যে নক্ষত্র আছে, তাহার তিরোভাব এবং আবির্ভাব বড় চমৎকার। সার জান হর্শেল তাহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—২দিবস ১৪ঘন্টা কাল ইহার আকৃতি ২য় শ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় থাকে; তৎপরে ইহার জ্যোতিঃ হঠাৎ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়; এবং প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে এত হ্রাস হইয়া যায়, যে তখন ইহাকে ৪র্থ শ্রেণীর নক্ষত্র বলিয়া জ্ঞান হয়; তৎপরে আবার ৩।০ ঘন্টার মধ্যে জ্যোতির্বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমে পূর্ব্বমত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। এইরূপ জ্যোতিহ্রাসবৃদ্ধি হইতে ইহার ২দিন ২০ঘন্টা ৪৮মিনিট কাল লাগে। আরও কত নক্ষত্র আছে, তাহাদেরও নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসিওপীয়া (Cassiopeia) নাম নক্ষত্রের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনে ২২৫ দিন লাগে, এবং ৩৪ সিগ্নাই (Cygni-র) ১৮বৎসর। আর্গো (Argo) পুঞ্জের ইটা নামক নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন বড় বিচিত্র। এই নক্ষত্র অত্যাশ্চর্য্যজনক বাষ্পাকার পদার্থে পরিবেষ্টিত। সার জন হর্শেল দেখিয়াছিলেন, ১৮৩৭। ৩৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে, ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যে প্রধান নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। শেষোক্ত বৎসরে ইহা উপরোক্ত Arcturus (আর্কটুরস) নক্ষত্রের ন্যায় হইয়াছিল, এবং তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হইয়াছিল, যে তাহাতে তাহার পার্শ্বস্থিত বাষ্পাকৃতি পদার্থকে অনেক বিলুপ্ত করিয়াছিল। পরে ক্রমে হ্রাস হইয়া পুনরায় প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র রূপে পরিণত হইল, এবং আবার বাড়িতে লাগিল। কি কারণে এই রূপ নাক্ষত্রিক হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে?—(১) কেহ কেহ বলেন, এই রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহারা স্ব স্ব মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, ইহাই উপলব্ধি হয়। কেননা যদি কোন জ্যোতিষ্কমণ্ডলের একার্দ্ধ অপরার্দ্ধ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হয়, এবং তাহা স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, তবে অনন্ত আকাশস্থ অন্য কোন গ্রহনক্ষত্রবাসী দর্শকের নেত্রে কখন উজ্জ্বলতর দিক, কখন বা অল্পালোক বিশিষ্ট পার্শ্ব অবশ্যই পড়িবে। (২) গুড্রিক (Goodrick) অনুমান করেন, যে উক্ত জ্যোতিষ্কগণের চারি পার্শ্বে কোন বৃহৎ নিরালোক অস্বচ্ছ পদার্থ আবর্ত্তন করিয়া বেড়ায়; তাহারাই যখন আমাদের এবং উক্ত জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই সেই নক্ষত্রগণের আলোক কিয়ৎ পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে সুতরাং, সে সময় আমরা নক্ষত্রদিগের আলোক

হ্রস্ব হইতে দেখিতে পাই।(৩) সার জন হর্শেল এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার পিতা আমাদের সূর্য্যের এক কালে অধিকতর উজ্জ্বল্য থাকার যে মত প্রচার করেন, তাহা দৃঢ়ীভূত করিয়া লিখিয়াছেন, যে যদি উক্ত সুদূর পর্য্যটক নক্ষত্রগণ বাস্তবিক আমাদের সূর্য্যের সহিত সমপ্রকৃতিক হয়, তবে যখনই আমরা উক্ত নক্ষত্রগণের এই প্রকার আলোক পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করি, তখনই আমাদের সূর্য্যেরও তাদৃশ পরিবর্ত্তন বিশ্বাস্য বলিয়া জ্ঞান হয়—তখন যে আমাদের সূর্য্য পূর্ব্বে এক সময়ে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ও তাপ বিশিষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অল্প অবকাশ থাকে। সূর্য্যের এক সময়ে তাপাধিক্য ছিল, যদি একথা প্রকৃত হয়, তবে সে সময়ে আমাদের পৃথিবীর তাপও অধিকতর ছিল, তাহাও স্বীকার্য্য। তিনি আরও বিবেচনা করেন, যে অনন্ত নভোস্থলে নিরালোক ঘনপরমাণু সমূহ, বাষ্প পুঞ্জের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া আছে; তাহার দ্বারাই উক্ত জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে২ আবৃত হওয়ায় উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

আবার এই সকল জ্যোতিষ্কগণের বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সকলে চিরকাল এক বর্ণের থাকে না। সিরিয়াস (Serius) নামক যে নক্ষত্রের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা এক্ষণে অতি শুভ্র বর্ণ, কিন্তু এক কালে তাহা শোণিত বর্ণ ছিল। আমরা যুগ্ম প্রভৃতি তারকামণ্ডলের কথা বলিয়াছি; তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তন করে। এই জন্য এবং তাহাদের অধিক দূরত্ববশতঃ তাহাদিগকে সহজ চক্ষে একটী তারকা বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রূপ যুগ্মতারকা মণ্ডলের মধ্যে প্রায়ই দুইটীকে বিভিন্ন বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে দুই বিপরীত বর্ণের মিশ্রণে শুভ্র আলোক উৎপন্ন হয়, সেই রূপ দুই বর্ণ বিশিষ্ট দেখা যায়, সুতরাং সহজেই প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। যেমন বিবেচনা কর, একটী সবুজ বর্ণের হইলে, তাহার সহচর রক্ত বর্ণের হইবে; একটীর কমলা নেবুর ন্যায় বর্ণ হইলে, অপরটীর বর্ণ "ব্লু" হইবে। যুগ্মতারকা মণ্ডলের মধ্যে (আল্বিরিও) Albireo এবং (আল্মাক) Almach, এতদুভয়কে অতি সুন্দর বিপরীত বর্ণাবিশিষ্ট দেখা যায়। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কি বিবেচনা হয়?—যাহা দ্বারা অনন্ত বিশ্বগর্ভ নিহিত জ্যোতিষ্কগণের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, ও ঘটিবে, এরূপ কোন আশ্চর্য্যজনক অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক কার্য্য আজিও তাহাদের মধ্যে চলিতেছে বলিয়া কি বোধ হয় না?

আরও কত অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করা যায়। অনেক জ্যোতিষ্কমণ্ডল একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তাহাদের আর দেখা যায় না!—জ্যোতিষ্কের প্রলয়?—বিশ্বাস হয় না। পুরাণ রচয়িতারা প্রলয় কালীন দ্বাদশাদিত্য উদয় কল্পনা দ্বারা, উনবিংশ শতাব্দীতে তোমার শিক্ষিত মনকে কি তাহা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে নীত করিয়াছেন? ধ্বংসপরিশূন্য পরমাণু সমষ্টি সংঘটিত গ্রহনক্ষত্রাদি বিনষ্ট হইবে, প্রলীন হইবে, তাহার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না!—একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অঙ্গুলি

বিশিষ্ট চতুর্ভুজ, অতি সূক্ষ্ম মুখকোণ,, অপরিস্ফুট শব্দকারী, অনুন্নিন্ন জ্ঞান, সংস্কারবশে কার্য্যকারী বানরাকৃতি জন্তু,—এই কয়েকটী বিষয় লইয়া, কি কি অবস্থায়, কোন্ কোন্ কারণে, কত দিনে, একটী পূর্ণাবয়ব, দ্বিভুজ, চতুর, সরলাকৃতি, বাক্‌পটু ও সুতার্কিক উন-বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতরূপে পরিণত হইতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা সুসপন্ন বিশ্বাসে, পিথাগোরসের ৪৭ প্রতিজ্ঞা উপপাদনে যত ধৈর্য্য ও বুদ্ধি আবশ্যক করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সহিষ্ণুতা অবলম্বনে বুদ্ধি ব্যয় করিতে বরং ইচ্ছা করিবে, তথাপি এরূপ নাক্ষত্রিক প্রলয় বোধ হয় বিশ্বাস্য জ্ঞান করিবে না। কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য নহে। নাক্ষত্রিক প্রলয় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হর্শেল সাহেব আর ৪২ বর্জিনিস্‌কে দেখিতে পান নাই। একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে? —কখন কখন একবারে কতকগুলি তারকা দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া, অতি উজ্জ্বল কিরণ দানে আমাদের রজনীকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে, তাহার পরে এক কালেই প্রলীন হইয়া গিয়াছে। এই সকল কার্য্য নূতন নহে, কত কাল ধরিয়া হইতেছে, ও হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে হিপ্পার্কস এই রূপ এক আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে নাক্ষত্রিক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৩৮৯ খ্রীঃ অব্দে আল্‌ফা আকুইলি নামক নক্ষত্রের নিকট আর এক অভিনব তারকা হঠাৎ দেখা যায়; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, পরে অদৃশ্য হইয়া কোথায় গেল। ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে সর্প (Serpentarius) পুঞ্জের মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা এক বৎসর যাবৎ দেখা গিয়াছিল। ১৬৭০ অব্দে হংস্য (Swan) পুঞ্জের শীর্ষ দেশে এক অভিনব নক্ষত্র দৃষ্ট হয়; তাহা কিছু দিন পরে অদৃশ্য হয়, পুনরায় দেখা যায়, তখন বিবিধ রূপ আলোক-পরিবর্ত্তন (হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি) দেখাইয়া, দুই বৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। এ পর্য্যন্ত এই রূপে যত নত্রক্ষকে প্রলীন হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে Cassiopea কাসিওপীয়া নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে এক তারকা দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্ময়কর।* সেই নক্ষত্র শীঘ্র শীঘ্র সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতে লাগিল,—এমন কি, শেষে বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরে তাহার জ্যোতি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। দাহ্যমান পদার্থে যে সকল বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনই উক্ত নক্ষত্রে ক্রমে২ লক্ষিত হইয়াছিল, এবং এক বৎসর চারি মাস পরে, স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াই (ভস্মীভূত হইয়া?) অদৃশ্য হইয়া গেল! যে নক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সে দাহন কি রূপ বিস্ময় ও ভয় জনক, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! মনে ধারণা হয়?

এখন বোধ হয়, অনুমান করা যাইতে পারে, যে অনন্ত ব্যোমচারী গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের প্রলয় সম্ভব কি না?

* Whewelly on Astronomy and General Physics, p. 272.

আমরা যে সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহার মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ মণ্ডলী আছে, তাহাদের কক্ষা মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গৃহের কক্ষার মধ্যবর্ত্তী। সেই ক্ষুদ্র গ্রহগণ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অনেকে বলেন, যে তাহারা পূর্ব্বে একটী গ্রহ ছিল; কিন্তু কোন সময়ে হয় কোন ধূমকেতুর সহিত মিলিত হওয়াতে, তদাঘাতে, অথবা আভ্যন্তরীন আগ্নেয় উৎপাতে, সেই আদিম গ্রহ চূর্ণীকৃত হইয়া, এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ রূপে পরিণত হইয়াছে, যে অতি উত্তম দূরবীক্ষণ সহযোগেও তাহাদের সকলকে ভাল দেখা যায় না। * আমাদের পৃথিবী এক কালে জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রলয়ের হেতু কি? অনেকে বলেন, পৃথিবীর অন্তর্গত আগ্নেয় ক্রিয়ার দ্বারাই সেই ঘটনা ঘটা সম্ভব। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আরও বলেন, (বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎপণ্ডিত এম্ ডি লাক্ [M. De Luc] এই মতে বিশ্বাস করিতেন) যে ঐ জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী জল মগ্ন হইয়া যায় নাই; কেবল জল ও স্থল ভাগের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল মাত্র। অর্থাৎ এক্ষণে পৃথিবীর যে অংশ সাগর জলে নিমগ্ন আছে, তাহাই পূর্ব্বে পৃথিবীর স্থল ভাগ ছিল; এবং যাহা এক্ষণে স্থল হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বে জলে আবৃত ছিল; কিন্তু উক্ত বিপর্য্যয় ঘটিবার সময়, জল স্থল, স্থল জল, হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * আল্পিস ও হিমালয় পর্ব্বত শৃঙ্গ মধ্যে যে সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত অস্থি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহার এই কারণ—তাহারা পূর্ব্বে সাগর জলে নিমগ্ন ছিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে, যখন প্রলয় অসম্ভব নহে, তাহা বিবিধ প্রকারে ও কারণে সংঘটিত হইতে পারে, বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন বিস্ময় উদ্বেল হইয়া অন্তর ক্ষেত্র অতিক্রম করে; তখন যে এই সমস্ত গ্রহ ও জ্যোতিষ্কগণ কালে লয় পাইতে পারে, তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অল্প মাত্র অবকাশ থাকে। তখন 'যথায় উৎপত্তি, তথায় নিবৃত্তি,' এই কথাই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে।

* Lardner's Meuseum of Sciene, vol I. p. 64.

* Schlegel's Philosophy of History. p.82..

রায় বসন্ত।

বাঙ্গালার যত কিছু অভাব আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকদিগের প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ জীবনীর অপ্রাপ্তি, একটী সর্ব্বপ্রধান অভাব।) কোন্ সময়ে কোথায় কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পিতামাতার নাম কি ছিল, ইত্যাদি অনেক অত্যাবশ্যক বিষয় অনেক কবির সম্বন্ধেই জানিবার কোন উপায় নাই। এমন কি, কাহার পর কে, অনেক স্থলে তাহাই নির্ণয় করা দুষ্কর। যেখানে কবি নিজে পরিচয় দিয়াছেন, সেই খানেই তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাও সামান্য মাত্র। প্রকৃত জীবনী অবগত হওয়া দূরে যাউক, যদি তাঁহারা স্ব স্ব রচিত কবিতার শেষে নিজ নামের 'ভণিতা' না দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত এত দিন লোপ পাইত; এবং কোন্ কবিতা কাহার্ রচনা, তাহাও নির্ণয় করা দুর্ঘট হইত। অস্মদ্দেশে প্রকৃত ইতিহাস ও জীবন বৃত্তের অভাব অনেক অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং আমাদের উন্নতির পক্ষেও বিষম প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যাধ্যায়ীদিগকে এই সকল অভাব জন্য কষ্ট পদে২ সহ্য করিতে হয়। আমরা কোন বিশেষ অভিপ্রায়ের জন্য প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের রচনা সমূহ সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক খানি হস্ত লিখিত পুস্তকে, আমরা 'রায় বসন্ত' নামের ভণিতা যুক্ত কয়েকটী কবিতা দেখিলাম। আমাদের যত দূর স্মরণ আছে, কোন মুদ্রিত পুস্তকে আমরা সেই কবিতা গুলি দেখি নাই। সুতরাং সে গুলিকে নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। এই "রায় বসন্ত" কে?—উক্ত কবিতা গুলি পাঠে বোধ হয়, তিনি এক জন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। কিন্তু উক্ত কবিতা গুলিতে তিনি নিজে কোন পরিচয় দেন নাই; সুতরাং তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত কোন কথা অবগত হওয়া বড় দুষ্কর। "রায় বসন্ত" বিরচিত কবিতা আর অতি অল্প মিলে। আমরা পদকল্প লতিকাতে তাঁহার রচিত একটী মাত্র কবিতা দেখিয়াছি। তাহাও নিম্নে যথা স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

যে হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে কবিতা গুলি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বিস্তর ভ্রম ও বর্ণাশুদ্ধি লক্ষিত হয়। সুতরাং পাঠের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকিবেক বলিয়া সহজেই সন্দেহ জন্মে। এমন কি, অনেক স্থলে তাহাতে যে পাঠ দেওয়া আছে, তাহা রাখিলে অর্থ বিশদ হয় না। একারণ আমরা দুই এক স্থলের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। কিন্তু হস্ত লিখিত পুস্তকের পাঠ লোপ না পায়, এই আশায়, যে স্থলে পাঠের পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, তাহার নিম্নে টীকাকারে হস্ত লিখিত পুস্তকের পাঠও দেওয়া গেল। পাঠক মহাশয় স্বীয় রুচি অনুসারে তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া লইবেন।

এক্ষণে কবিতা গুলি। সেগুলি সংখ্যায় দশটী—

১।

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥

শপত স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ান-মণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মরি যে কেবল তনু ভিন। (ক)
পরাণে মরয়ে যেন জল বিনু মীন॥
* * * * * (খ)
কি করিবে গুরু ভয় গৃহের করম।
ত্যজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজেই মজিলাম এমন চরিতে।
রায় বসন্ত কহে যে হয় উচিতে॥

২

অহে নাথ মোর আর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল, মরি তোমার বালাই লৈয়া,
মনে সাধ আর নাহি তায়॥ ধ্রু॥
যে তুমি পরাণ ধন, মিলল নয়ন মনঃ,
এ বড়ই বিষম বিবাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
কারে ঘটে হেন পরমাদ॥
গৃহে গুরু গঞ্জন, কত নিন্দে বন্ধুগণ
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কে আপন, কেবা ভিন, না বুঝিয়ে দোষগুণ,
এ দুঃখ দহনে দহে মোর॥
তুয়া সুখে সুখী হই, এ সকল দুঃখ সহি,
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ, চান্দের কলঙ্ক যেন,
অপযশ গোকুল সমাজ॥

৩

সখিগণ কহে নাথ কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনির ঘরেতে পয়ান॥
দারুণ নগরের লোক কিনা জান তুমি।
ক্ষণেক ধৈরয ধর এ লালস ক্ষেমি॥
কত গুরু গঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা॥
তোমার পিরীতে ধনি সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য কাহিনী॥

৪। (ক)

সুন্দরি, স্বরূপহি করবি পয়ান।
যে মোর বচন হিত, তাহে নহে পরতীত,
বুঝি হেন আন অবধান।
তোহারি পিরীতি আশে, ত্যজি সুখ গৃহবাসে
সার মোর ভেল বনবাস। (খ)
সহজহি তোমা বিনে, উৎপত মোর প্রাণে,
ধিক্ রহ পর—আশ।
বিশেষে বদন সখি, বিরস অধিক দেখি,
হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
রায় বসন্ত কয়, হিয়ায় কি হেন সয়,
সজল নয়ান ভেল রাই।

৫

বিভাষ রাগ। (গ)

প্রাণনাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন।
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ ত্যজি গুরু জন। (ঘ)
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।
নয়ান-পুতলি মোর তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে দুহুঁ এক মন।

৬।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।

(ক) এই পংক্তির পাঠ হস্ত লিখিত পুস্তকে এই রূপ আছে :—
না দেখিলে মরিরে কেমনে তনুহিঁ ভিন।
(খ) * * এই চিহ্নিত স্থানে হস্ত লিখিত পুস্তকে এই রূপ দুই পংক্তি লেখা আছে ;—
তোমার পিরীতে আমি হইলাম বিনি
মুলে বিকাল্যাও আর কি দিবা নিছনি॥
কিন্তু ইহার কোন অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য না হওয়াতে মূলে উদ্ধৃত হইল না।

(ক) এই কবিতার অর্থ সকল স্থলে সুসংলগ্ন হইতেছে না।
(খ) "সাধ মোর ভেল বনবাস,"—হস্ত লিখিত পুস্তকে এই পাঠ দেওয়া আছে।
(গ) পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতা চতুষ্টয়ে এবং পরের লিখিত কয়েকটীতেও কোন রাগ তালাদির উল্লেখ নাই।
(ঘ) "বুঝিয়া করিনু পণ তেজি গুরুগণ।" হং লি পুস্তকে এইরূপ পাঠ আছে।

জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ-পুতলি তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ অভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন।
নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে পহুঁ প্রেম-রাশী।

৭

অহে রাই, যে কহিলে হয়।
তোর লাগি মোর প্রাণ স্থির নাহি রয়।
ধৈরয ধরিল নহে ঝুরি দিন রাইতে।
হিয়ার পুতলি কান্দে তোমার পিরীতে।
কহিতে নিয়ত মোর গদ গদ ভাষ।
রহি রহি নয়নের নীর পরকাশ।
মুরলীর গান মোর তুয়া অনুরাগে।
রায় বসন্ত কহে উচিত সোহাগে।

৮

আর না কহিও বান্ধু বিদগধ রাজ।
এবে সে সকল দূরে গেল লোকলাজ।
শুনিতে পরাণ মনে হিয়া মোর কাঁপ।
মরিব তোমার লাগি জলে দিয়া ঝাঁপ। (ক)
* * * * (খ)
* * * *
মনের মনোরথ যত সাধ মোর।
রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি ভোর।

৯

অহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার।
গুরুজন ভয়ে দিনু তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান।
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার।
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে এই কথা সার।

১০

বেলাবেলি।

শ্যাম বন্ধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারে খার।
না যাইব ঘরে বন্ধু রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদীর বচনে।
তুয়া পায়ে সঁপিয়াছি তনুমন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন।
অন্তরে বাহিরে বন্ধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার।
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলে তুমি হইল তাহাই।

অতঃপর দেখা যাউক, এই রায় বসন্ত কে? কিছু দিন গত হইল, কোন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও গোবিন্দদাসের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এই কথা গুলি লেখা হইয়াছিল ;—বিদ্যাপতি যশোহর জিলার অন্তর্গত ভূর্শুটুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। জাতি ব্রাহ্মণ। বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম 'রায় বসন্ত।' 'বিদ্যাপতি' এবং 'কবিরঞ্জন,' তাঁহার উপাধি মাত্র। তিনি শকাব্দা ১৩৫৫ শাকে (খ্রীঃ ১৪৩৩ অব্দে) জন্ম গ্রহণ করিয়া, ১৪০৩ শকাব্দায় নবদ্বীপে পরলোক গমন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'বসন্ত সুকুমার কাব্য।'—সুতরাং বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম যদি 'বসন্ত রায়' হয়, তবে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে উপরে 'রায় বসন্ত' ভণিতাযুক্ত যে দশটী কবিতা উদ্ধৃত হইল, তাহা বিদ্যাপতির রচনা। কেননা বিদ্যাপতিই রায় বসন্ত। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে রায় বসন্ত নামক অন্য

(ক) 'মরি তোমার লাগি জলে দিব ঝাঁপ'—হং লিং পুং।

(খ) * * * এই চিহ্নযুক্ত স্থানে হং লিং পুস্তকে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি আছে ; কিন্তু তাহার কোন অর্থ বোধ না হওয়াতে মূলে উদ্ধৃত হইল না ;—

পিরীতি আরতি নীতি অশেষ দুলাল।
সে মোরে হইল এবে কাল বেয়াল।
কেমনে করিব বন্ধু কর উপদেশ।
তোমার মিলন পুনঃ মিতুই সন্দেশ।
এঘর করণ মুক্তি বাসিয়ে জঞ্জাল।
শকট করণে যেন কাঠিন সঞ্চার। (অবিকল উদ্ধৃত)

কোন কবির অস্তিত্বের প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য। বিশেষতঃ রায় বসন্ত যে এক জন পুরাতন কবি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে ;—

(সারঙ্গ)

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশুপাখী শিখীকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান।
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু অনুলেপন ঘনসারে চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনী বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক।
অতি কোমল চরণ তল শীতল
জিতালি শরদরবিন্দ।
রায়বসন্ত মধুপ আনন্দিত, নিন্দিত
দাস গোবিন্দ। (পদকল্পলতিকা)

এই কবিতা পাঠে জানা যাইতেছে, যে রায় বসন্ত গোবিন্দদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেননা ইহাতে রায় বসন্ত ও গোবিন্দ দাস দুই নামেরই ভণিতা দেওয়া আছে; কিন্তু রায় বসন্তের নাম আদিতে থাকায় বুঝা যাইতেছে, যে রায় বসন্তই ঐ কবিতার আদি রচয়িতা ; গোবিন্দদাস বোধ হয় উক্ত কবিতার সংস্করণ করেন ; সুতরাং সংস্করণ কালে তিনিও নিজ নাম উক্ত কবিতার শেষে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এবিষয় অসম্ভব নহে ; এবং ইহার টীকা নিম্ন লিখিত বিবরণে দেখা যাইতেছে ;—বিদ্যাপতির নামের ভণিতাযুক্ত এমন অনেক কবিতা আছে, যাহার শেষে আবার "গোবিন্দদাস রসপূর" বলিয়া ভণিতাও দেখা যায়। সে স্থলেও যেমন, এখানেও তেমন। ইহাতে আর কিছু বোধ হউক বা না হউক, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী। তিনি রায়বসন্তেরও পরবর্ত্তী, সুতরাং রায়বসন্তকে আধুনিক বলিয়া সন্দেহ করিবার অধিক কারণ দেখা যায় না। আরও দেখ গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির মৃত্যুর ৮৬বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং রায় বসন্ত গোবিন্দদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে, অবশ্য ১৪৮৯ শকাব্দার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, রায় বসন্ত এবং বিদ্যাপতি যে এক ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অল্পমাত্র অবকাশ থাকে।

কিন্তু উপরোদ্ধৃত কবিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। উক্ত দশটী কবিতা প্রায়ই এক ধরণে রচিত। কিন্তু বিদ্যাপতির অন্যান্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করিলে, ঐ কবিতাগুলি বিদ্যাপতির লেখনী নির্গত বলিয়া বোধ হয় কি না?—বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর ব্রজবোলী কথাই অধিক ; কিন্তু তাঁহার রচিত বাঙ্গালা গীতও অনেক গুলিন আছে। আমাদের উদ্ধৃত দশটী কবিতার ভাষা বাঙ্গালা, সুতরাং বিদ্যাপতির বাঙ্গালা কবিতার সঙ্গে এই দশটী কবিতার তুলনা করিলে, উহাদিগকে বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচয় দিতে বড় ইচ্ছা হয় না। কেননা বিদ্যাপতির কি বাঙ্গালা, কি ব্রজবোলী কবিতা, সমস্তেরই রচনা অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিশিষ্ট, ভাব অতিশয় প্রগাঢ়। কিন্তু উক্ত কবিতা গুলিতে তাদৃশ কোন গুণ লক্ষিত হয় না। সুতরাং এবিষয় কিরূপে মীমাংসা করা যায়। সেগুলি কি বিদ্যাপতির প্রথম রচনা বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে?

উক্ত হস্ত লিখিত পুস্তকে আমরা বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত আর একটী কবিতা দেখিলাম। সে কবিতাটী অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সুতরাং সেটীকে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

(পুরবী)

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি সরোরুহ ভরই।
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ।
কি হেরিনো অপরূপ গোরি।
পৈঠাল হৃদয় যাহা মোরি।
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ।
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার।
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ।
হের ইথে সোধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর।
পুনঃ কিয়ে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব।
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি।

এই কবিতা দৃষ্টে পাঠকের গোবিন্দদাসের একটী কবিতা মনে পড়িতে পারে। সেটী ইহারই অনুকরণ। যদি মনে না পড়ে, তবে নিম্নে দেখুন;—

(বড়ারী)

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতিঃ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমক মোতি হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই।
দেখ সখি কোধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি কেলি।
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙুরি লোল।
তাঁহা তাঁহা ছলই কালিন্দীহিল্লোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পরই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরি মধুরিম হাস।
তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান।
চিহ্নিত রাই চিহ্নই নাহি জান॥

শেষোদ্ধৃত কবিতাদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছুই বক্তব্য নাই। তাহারা নিজ গুণে পাঠকের নিকট পরিচিত হইবে। কেবল এইমাত্র বলিতে চাই, যে অলংকার প্রিয় পাঠক একবার

যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙুরি লোল।
তাঁহা তাঁহা ছলই কালিন্দী হিল্লোল।

এই দুই পুংক্তিতে "ছলই কালিন্দী" হিল্লোল পদত্রয়ের সার্থকতাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবেন। শুদ্ধ এই দুই পুংক্তির সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার কারণ একখানি প্যাম্ফলেট লেখা যাইতে পারে।

অমৃতে গরল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গোদের উপর বিষফোঁড়া।

আষাঢ় মাস। বর্ষা ঋতুর সঞ্চার। জলের রঙ্ ঈষৎ রক্তিম। যৌবন সুলভ চঞ্চল ভাব। শুভ্রবেশধারী বাবুগণের মধ্য দিয়া বারাঙ্গণা কুল যেরূপ হাস্য-বদনে হস্ত নাড়িয়া ঘুরিয়া২ চলিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকস্থ বাবুরা যেমন হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ নদীর স্রোত-বেগে ঘুর্ণিত হইতে২ শ্বেতবর্ণ বালুকা রাশির মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল এবং তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণ একভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে-ছিল। বর্ষাকাল। আকাশ মণ্ডল সত-তই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। আমরা যে দিবসের কথা বলিতেছি, সে দিবস গগণ মণ্ডল নীলিমায় আবৃত ছিল। বায়ুর ঈষৎ প্রবলতা অনুভূত হইতেছিল। আমাদের শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীর নৌকা পাইল ভরে নক্ষত্র বেগে ধাবিত হইতে-ছিল।

কোন দ্রুতগামী শকটের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিলে যেমন অগ্রসর হইতেছি কি না, তাহা ভাল রূপ উপলব্ধি হয় না, অথচ উভয় দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে বোধ হয়, যেন দুই পার্শ্বের বৃক্ষলতাদি নিকট হইতে দূরে দৌড়ি-তেছে এবং আকাশের মেঘরাশি যেন নিকটাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। রাজ নন্দিনী ক্ষীরোদ বাসিনীর মনোমধ্যেও ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। নৌকা তীরের মত চলিতেছে, তথাচ তাঁহার নিকট কটকের রাস্তা ফুরায় না, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মাতৃভূমি যেন দ্রুতপদে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিতেছে। এদিকে নবং চিন্তা মেঘ যেন দ্রুতগতিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে।

সখীগণ নৌকা মধ্যে নানাবিধ কথা বার্ত্তা কহিতেছে। তিনি একান্তে নীরবে উপবেশন করিয়া আছেন। তিনি ভাবি-তেছেন, ইতিমধ্যে অগ্রবর্ত্তী নৌকার মাঝি উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মাধব! পশ্চি-মের এই মেঘ খানা কেমন কেমন বোধ হচ্যে। বেলাও নাই। শীঘ্র২ কিনারায় চল, আজকের রাত্রিটে এই চড়াতেই দেখে শুনে নৌকা লাগান যাক।"

ক্ষীরোদ বাসিনীর নৌকার মাঝির নাম মাধব। মাধব প্রত্যুত্তরে "আচ্ছা" বলিয়া তীরাভিমুখে নৌকা ফিরাইয়া দিল।

বর্ষাকালের মেঘ; দেখিতে২ মেঘখানা উঠিয়া আসিল। সমস্ত আকাশ একবারে ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। চতু-র্দ্দিক হইতে প্রভূত বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। প্রবল-তর বেগে বাত্যা বহিতে লাগিল। এক২ কণা বালুকা যেন এক একটী শিলা খণ্ডের ন্যায় আসিয়া গাত্রে বিদ্ধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক দেখিতে২ ঘোরান্ধ-কারময় হইয়া উঠিল। মাল্লাগণ নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতে২ নৌকা মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবল তরঙ্গমালা একের উপর আর আসিয়া নৌকাতে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকা মধ্যে রোদন ধ্বনি উঠিল।

ক্ষীরোদবাসিনী ভয়ে হতচেতনা হইয়া পড়িলেন।

এই সময় অপর একখানি পোত নক্ষত্রবেগে আসিয়া তাঁহার নৌকার গায়ে আঘাত করিল। প্রবলাঘাতে দুই খানি নৌকাই অর্দ্ধচূর্ণ হইয়া জল উঠিতে লাগিল এবং অর্দ্ধজলে নিমজ্জিত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে রহিল। মাঝিরা বুঝিতে পারিল নৌকা তটে আসিয়াছে। হো হো শব্দ করিতে২ দুই নৌকার লোক নামিয়া নিকটে আশ্রয় পাইবার মানসে ধাবিত হইল। কেহ রাজনন্দিনীর কথা একবার মুখেও আনিল না। শুদ্ধ একটী লোক রাজনন্দিনীর জন্য ব্যস্ত। সে এদিক ওদিক ক্ষীরোদবাসিনীকে না পাইয়া অবশেষে নৌকা মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় দেখিয়া কায়মনে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সময় একভাবে থাকিবার নহে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঝড় বৃষ্টি থামিল। আকাশ পরিষ্কার হইল, চন্দ্র উদয় হইল। ক্ষীরোদবাসিনীরও চৈতন্য হইল। তিনি সচেতন হইয়াই দেখিলেন তাঁহার নিকট একটী পুরুষ বসিয়া আছে। সভয়ে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কে তুমি?" পুরুষটী উত্তর করিল, "আমি নরসিংহ।"

রাজনন্দিনীর মনে মনে আসার সঞ্চার হইল, কহিলেন "কে,ক্ষেত্রবাসী?" তিনি নরসিংহকে ক্ষেত্রবাসী বলিয়া ডাকিতেন। উত্তর "হাঁ—ভয় নাই।"

"আর২ সকলে কোথায়?"

"ঝড় বৃষ্টির জন্য ডাঙ্গায় গিয়াছে; এখনই আসিবে।"

"আর২ সকল নৌকা কোথায়?"

"আমাদের নৌকা ত ইহারই পার্শ্বে —আর দুখানি কোথায়, তাহা বলিতে পারি না।"

ক্ষীরোদবাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

উভয়েই নীরব। এমন সময় অদূরে ক্ষেপণীর শব্দ শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। ক্ষীরোদ বাসিনী কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "ক্ষেত্রবাসি! ও কিসের শব্দ শুনা যাইতেছে?" নরসিংহ কিঞ্চিৎ-ক্ষণ এক মনে শব্দ শুনিয়া কহিল "ও জেলেরা মাছ ধরিতে যাইতেছে।" রাজ-নন্দিনী পুনর্ব্বার কহিলেন, "ওরা ত দস্যু নহে?" নরসিংহের হৃদয় গ্রন্থি শিথিল হইল, সভয়ে কহিলেন, "কৈ? কে—ও—না।' ইহা কহিয়া তিনি ধীরে২ গবাক্ষের দ্বারে মুখ দিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালেও দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া নৌকারোহণে দস্যু বৃত্তি করিত। যদি কোন যাত্রীর নৌকা হীনবল কিম্বা বিপদাক্রান্ত দেখিত, তবে অমনি তাহার উপর আক্রমণ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিত। বিশেষতঃ প্রবল ঝড় বৃষ্টির পর এক২বার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দেখিত। যদি কোথাও কোন নৌকা জল মগ্ন কিম্বা ভগ্নাবস্থায় দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আসিয়া সকল লুণ্ঠন করিয়া লইত। অদ্যও সেই অভিসন্ধি করিয়াই ইহারা বহির্গত হইয়াছিল। এক্ষণে যাত্রীদের নৌকার সন্ধান পাইয়া এই দিকেই আগমন করিতেছিল।

তাহারা ক্রমে২ যখন নৌকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের কথা বার্ত্তা শ্রবণে ও ভাব-ভঙ্গী দৃষ্টে তাহারা যে দস্যু, ইহার আর অণুমাত্র

সন্দেহও ক্ষেত্রবাসীর মনে রহিল না। নরসিংহ সভয়ে গবাক্ষের নিকট হইতে আগমন করিয়া ক্ষীরোদ বাসিনীর কর্ণের নিকট আসিয়া কহিল "মা! ইহারা নিশ্চয়ই তস্কর।" ক্ষীরোদ বাসিনী পূর্ব্বেই অনেকটা জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তত ভীতা না হইয়া আত্ম রক্ষার্থে এক খানি অস্ত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৌকা জলে প্রায় ডুবু২, সুতরাং খুঁজিয়া কোন অস্ত্রই পাইলেন না। কেবল ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন।

তস্করগণ মার্ মার্ করিয়া নৌকার উপর উঠিল এবং নৌকা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জল নিমজ্জিত দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে লাগিল। নরসিংহ নৌকার দরজার এক পার্শ্বে ছিল, তাহার সম্মুখ দিয়া এক জন দস্যু ক্ষীরোদ বাসিনীর অলঙ্কারের বাক্সটী লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কটি দেশ স্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা দস্যুকে আঘাত করিল। ছুরিকা খানি দস্যুর বক্ষদেশ ভেদ করাতে সে অনতিকাল মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল।

এই ব্যাপারে নৌকা মধ্যে হুল-স্থুল পড়িয়া গেল। দস্যুগণ জানিতে পারিল, নৌকা মধ্যে লোক আছে। তাহারা চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নরসিংহ নিকটেই ছিল, সুতরাং তাহাকে অনুসন্ধান করিতে আর বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না। নরসিংহ আত্ম রক্ষার্থে প্রাণ-পণে যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বিফল হইল। তস্করগণ তরবারি দ্বারা নরসিংহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

এক জন দস্যু বলিয়া উঠিল যে, "এই-দিকে একটী স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে; কিন্তু মৃত কি জীবিত, তাহা বলিতে পারি না।" দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গমন করিল এবং ক্ষীরোদ বাসিনীকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া ধরা ধরি করিয়া সকলে বাহিরে আনিল। চন্দ্রের আলোকে সকলে জানিতে পারিল, সুন্দরী কোন রাজকুলনারী—অসামান্যা রূপসী। একজন দস্যু কহিল, "স্ত্রীলোকটী মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছে।" অন্য এক জন কহিল, "ইহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিবার কোন আবশ্যক নাই। বরং সঙ্গে লইয়া গিয়া আমাদের প্রভুকে দিলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি স্ত্রীলোক বড় ভাল বাসেন।"

পরিশেষে এই যুক্তিই স্থিরীকৃত হইল। দস্যুগণ সুন্দরী লইয়া আপন নৌকাতে গমন করিল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

পাঠক! তুমি ক্ষীরোদ বাসিনীকে দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছ? না, তোমার ভয় হইতেছে? এমন সুহৃদ কে আছে যে রাজনন্দিনীকে এই বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার করে? এক জন আছেন। তিনি কে? বিজয় সিংহ। তিনি কত বার ক্ষীরোদ বাসিনীকে দুর্গমে রক্ষা করিয়াছেন, এসময় থাকিলে কি রক্ষা করিতেন না? করিতেন। কিন্তু তিনি কোথায়? পাঠক! চল যাই এক বার দেখিগে বিজয় সিংহ এই ঝড় বৃষ্টিতে কি করিতেছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষে বিষে নির্ব্বিষ।

একে সমস্ত দিবস অনাহারে পথশ্রম,

তাহাতে এই ভয়ানক ঝটিকা ও বৃষ্টি। বিজয় সিংহের শরীর শিথিল ও ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিতেছে। অশ্ববর ক্লান্ত, তথাপি দুরন্ত প্রান্তর অতিক্রম করিবার জন্য প্রাণপণে দৌড়িতেছে। বিজয় সিংহও নিকটে গ্রাম পাইবার মানসে অশ্বের গতি রোধ করিতেছেন না। দূরবর্ত্তী পল্লীর প্রতি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিলে যেমন ধূম্রময় বোধ হয়, সেই রূপ বিজয় সিংহের মনে বোধ হইতে লাগিল। কুমার অনুমিত গ্রামাভিমুখে প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অশ্ব যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই রাজকুমারের ভ্রম বিদূরিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে খানি একটী গ্রাম বলিয়া বোধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল। বিজয় সিংহ তখন হতাশ্বাস হইয়া অশ্বের গতি রোধ করিলেন। আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুমান করিলেন, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, নিকটে যে গ্রাম আছে, এমন বোধ হইল না। কেবল সম্মুখে বৃহৎ অরণ্য, কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তাহার সীমা নিরূপণ করা যাইতেছে না। ধূমরাশি পরিবৃত প্রকাণ্ড পর্ব্বত মালার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বিজয় সিংহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হতাশ্বাস ভাবে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিলেন। অশ্ববর আপন ইচ্ছা মত ধীরে২ চলিতে লাগিল।

এই সকল প্রাণীদিগের এক প্রকার শক্তি আছে, যদ্দ্বারা তাহারা এই রূপ বিপদে লোকালয় অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারে। বিজয় সিংহ তাহা বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন এবং তন্নিমিত্তই অশ্বকে আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলেন। অশ্ব প্রথমতঃ ধীরে২ বন অতিক্রম করিতে লাগিল। পরে কিঞ্চিদ্দূর গিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। অশ্বের গতিতে বিজয় সিংহ বুঝিতে পারিলেন, নিকটে লোকালয় আছে; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন, অদূরে চন্দ্রের জ্যোতিতে দেখিতে পাইলেন, একটী পুরাতন জীর্ণ দেব মন্দির এবং তন্মধ্য হইতে অল্প অল্প দীপালোক নির্গত হইতেছে। বিজয় সিংহের মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনর্ব্বার অশ্বের বলগা দৃঢ় রূপে ধারণ করিলেন এবং অশ্বকে মন্দিরাভিমুখে চালিত করিলেন।

ক্রমে অশ্ব মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল। মন্দির হইতে অস্ফুট রোদন ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং মন্দির মধ্যে কিরূপ প্রকৃতির লোক আছে, জানিবার নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র বাতায়নের নিকট গমন করিলেন। সর্ব্বনাশ। কি দেখিলেন? তিনি মন্দির মধ্যে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, একটী বামাচারী বেশধারী যুবা পুরুষ একটী সুন্দরী ললনার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং সুন্দরী আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। এতদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে যুগপৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ও ক্রোধের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারে করাঘাত করিয়া

বলিতে লাগিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ, পথিককে দ্বার খুলিয়া দাও।" কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর বা দ্বার মুক্ত করিয়া দিল না। তখন তিনি সজোরে দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। পুরাতন দ্বার তাঁহার ভীম পদাঘাত সহ্য করিতে পারিল না। দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমারকে অনধিকারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বামাচারী বেশধারী পুরুষ আরক্ত নয়নে কহিলেন, "তুই দুর্ব্বৃত্ত কে? কি জন্য তুই বল প্রকাশ করিয়া আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিস্।" রাজকুমার কোন উত্তর করিলেন না এক দৃষ্টে প্রশ্নকারীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন সুন্দরী ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া অনিমিষ লোচনে কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বামাচারী পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে তুই কথা বলিতেছিস্ না যে?" কুমার বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "কে—মামা?—তোমার এই কর্ম্ম?"

বামাচারীর হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। বিজয় সিংহের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। চিনিতে পারিলেন। বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া মন্দির হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। বিজয় সিংহ অবাক। সুন্দরী আশ্চর্য্যান্বিতা।

অনন্তর বিজয় সিংহ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, "পথিক প্রগল্ভার ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইতেছে, ক্ষমা করিবেন।" বিজয় সিংহের এবম্বিধ বাক্যে সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "এ হতভাগিনীর জন্য আপনি অনেক বার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আপনিই ক্ষমা করিবেন।" বিজয় সিংহ অপেক্ষাকৃত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সুন্দরীর মুখপানে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু গৃহস্থিত দীপালোকের রশ্মির ন্যূনতা নিবন্ধনই হউক অথবা নিবিড় কেশরাশি দ্বারা সুন্দরীর মুখাবরণ হইয়াছিল, সেই কারণে হউক, ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু কোথাও যেন দেখিয়াছেন এই রূপ বোধ হইতে লাগিল।

রাজকুমারের ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া সুন্দরী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, আপনি চিনিতে পারেন নাই। অভাগিনী অনঙ্গপুর রাজ দুহিতা।" বিজয় সিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কে, ক্ষীরোদ বাসিনী?" ক্ষীরোদ বাসিনী কহিলেন, "এমন্দ ভাগিনীর নাম আপনি মুখে আনিবেন না?" বিজয় সিংহ কহিলেন, "তুমি কেমন করিয়া নরাধম জগৎ মোহনের হস্তগত হইয়াছিলে?" ক্ষীরোদ বাসিনী সরোদনে কহিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার সময় যে ঝড় হয়, সেই ঝড়ে আমাদের নৌকা জলমগ্ন হয়। যে স্থানে নৌকা জলমগ্ন হয়, সে স্থান তটের অতি নিকটবর্ত্তী বিধায় মাঝিরা ও অন্যান্য সঙ্গিগণ তীরে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, আমি তখন ভয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে পারি নাই। কতক্ষণ যে সে অবস্থায় ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, চেতন হইয়া দেখিলাম, নরসিংহ—সেই উড়িষ্যাবাসী আমার নিকটে বসিয়াছে। প্রশ্নে জানিতে পারিলাম, তাহাদের নৌকাও জলমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, আমারা কিছু

কাল এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় এক দল দস্যু নৌকারোহণে আমাদিগের নৌকারদিকে আসিতে লাগিল। তখন ঝড় থামিয়াছিল, চন্দ্রও উদয় হইয়াছিল। আমরা প্রথমতঃ দস্যুগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে তাহারা ধীবর হইবে, কিন্তু যখন তাহারা আমাদের নৌকার উপর উঠিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল,তখন আমাদের সে সন্দেহ দূরীভূত হইল,আমি নৌকার এক পার্শ্বে লুক্কায়িত রহিলাম। ক্রমে যখন দস্যুগণ দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে, সেই সময় নরসিংহ এক জনকে ছুরিকাঘাত করে, দস্যু তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। দস্যুগণের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, তাহারা সাবধানে তখন নৌকা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নরসিংহ দ্বারের নিকটে ছিল, দস্যুরা অগ্রে তাহার মস্তক চ্ছেদন করিল। আমি তদ্দৃষ্টে অচেতন হইয়া পড়িলাম, পরে কি হইল বলিতে পারি না, চেতন হইয়া দেখি আমি এই মন্দির মধ্যে আছি, দুরাত্মা আমার পার্শ্বে বসিয়াছে। নরাধম আমার প্রতি অত্যাচার করিবার নিমিত্ত যে রূপ বল প্রয়োগ করিতেছিল, তাহা ত আপনি স্বচক্ষেই দৃষ্টি করিয়াছেন।” ইহা বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিজয় সিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “ভাল, মহারাজ যে নৌকায় ছিলেন, সে নৌকার কি হইয়াছে?”

ক্ষীরোদ। “তাহা বলিতে পারি না।”

বিজয়। “অন্যান্য সকলের কি হইয়াছে?”

ক্ষীরোদ। “তাহাও জানি না।”

বিজয় সিংহ পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “রজনীও অবসান প্রায়, এক্ষণে আর এখানে বিলম্ব করা বিধেয় হয় না। কারণ জগৎমোহন যদি সঙ্গিগণ সহ এখানে উপস্থিত হয়, তবে প্রাণ রক্ষা করা সঙ্কট হইবে—”

জগৎমোহনের কথা কর্ণগোচর হইবা মাত্র ক্ষীরোদ বাসিনী সভয়ে রাজকুমারের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। কুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “ভয় কিসের? যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তোমার এক গাছি কেশও নষ্ট হইবে না। এক্ষণে যদি শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আইস।” ক্ষীরোদ বাসিনী যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজয় সিংহ অগ্রে অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন, রাজকুমারী তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যুপকারিতা।

রজনী অবসান প্রায়। নিশানাথ পশ্চিম গগনে মলিন বদনে অবস্থিতি করিতেছেন। দুই একটী পক্ষী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে। ফেরুপাল তখন পর্য্যন্তও ঘোর রবে চীৎকার করিতেছিল। কুমার বিজয় সিংহ ও ক্ষীরোদ বাসিনী উভয়ে দ্রুত পদে বনভাগ অতিক্রম করিয়া নদীতীরে নৌকাভিমুখে আগমন করিলেন। ভগ্ন নৌকা যেমন তেমনই রহিয়াছে, কিন্তু জন মানব নাই। তরঙ্গিণী শান্তভাব ধারণ করিয়া কল্ কল্ শব্দে গমন করিতেছে। নদীতটে

শিবাগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বিজয় সিংহ নদীতটে কিঞ্চিৎ কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজনন্দিনীকে বলিলেন, "আর বৃথা এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? সকলই শেষ হইয়াছে। এক্ষণে চল লোকালয় অভিমুখে গমন করি।" বিজয় সিংহের এবম্বিধ কাতরতা দৃষ্টে ক্ষীরোদ বাসিনী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুমার তাহা জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর তাঁহারা তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন এবং বৃহদরণ্যের নিকট দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নীরবে গমন করিতেছেন, ইতি মধ্যে বন মধ্য হইতে একটী বর্ষা নক্ষত্রবৎ বেগে আসিয়া রাজকুমারের দক্ষিণ জানুতে শেলসম বিদ্ধ হইল। কুমার বর্ষার প্রবল আঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন। রাজনন্দিনী ভয়ে মৃত প্রায় হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অবাক ও গতিশক্তি রোধ, এমত সময় অরণ্য মধ্য হইতে দস্যুগণ বহির্গত হইয়া বিজয় সিংহকে আক্রমণ করিল। এক জন বলিয়া উঠিল, "বিজয়কে প্রাণে বধ করিবার আবশ্যক নাই। দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আড্ডাতে লইয়া চল।" অনুচরবর্গ সরদারের আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কথিত পুরুষ তখন ক্ষীরোদ বাসিনীর নিকট আগমন করিয়া কহিল, "সুন্দরী, এখন তোমার নাগর রক্ষা করে না?" ইহা বলিয়া বজ্র মুষ্টিতে ক্ষীরোদ বাসীনীর হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। সুন্দরীর অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইলেন। দস্যুগণ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে "কালী মায়ের জয়" বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। শব্দে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইল। রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ দূরে আর এক দল দস্যু ছিল, "কালী মায়ের" নাম শ্রবণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। এই শেষোক্ত দলকে আসিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের অধিনায়ক কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন এবং কম্পিত হাস্যের সহিত পরবর্ত্তী দলাধীপের প্রতি কহিলেন, "পরীক্ষিত. আজ কোথায় ছিলে?" পরীক্ষিত সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কহিলেন, "কি শীকার করিলেন?" সরদার কোন কথা না বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা রাজপুত্রকে দেখাইলেন। পরীক্ষিত রাজকুমারকে চিনিতে পারিয়া আরক্ত নয়নে কহিলেন, "জগৎমোহন! তোমার মনে যাহা ছিল, তাহাই করিলে?"

জগৎমোহন গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "এখনও মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।" "যদি রাজকুমারের প্রাণ বিনষ্ট না করিয়া থাক, তবে তাঁহার প্রাণটী আমাকে ভিক্ষা দাও।" ইহা কহিয়া তিনি রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরীরের আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কুমার জীবিতই আছেন কিন্তু ক্ষতদেশ হইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইতেছে। এতদ্দৃষ্টে তিনি স্বীয় উষ্ণীষ দ্বারা দৃঢ়রূপে ক্ষতদেশ বন্ধন করিলেন এবং রাজপুত্রের হস্তের বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিলেন।

পরীক্ষিত যখন এই রূপ রাজকুমারকে

লইয়া ব্যস্ত, সেই সময় জগৎমোহন ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে রাজকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। একটী ভৃত্য জগৎমোহনের পলায়নের কথা পরীক্ষিতকে বলিয়া দিল। শ্রবণ মাত্রে সরদার কতিপয় চর সমভিব্যাহারে জগৎমোহনের অনুসরণ করিলেন।

জগৎমোহন বেসি দুর যাইতে পারিলেন না। পরীক্ষিত তাঁহাকে গিয়া ধরিলেন এবং তারস্বরে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তুই ভাবিয়াছিস অসহায়া এই রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবি? তাহা কখনই হইবে না, অগ্রে পরীক্ষিতের প্রাণ বিনষ্ট কর্, পশ্চাৎ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস্।" ইহা কহিয়া তিনি জগৎমোহনের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল উভয়েই সমান ভাবে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সমস্ত রজনী মধ্যে জগৎমোহনের বিশ্রাম ছিল না, এজন্য তিনি অবশেষে কাতর হইয়া ধরাতে পতিত হইলেন। তখন সরদার গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "অদ্য তোর জীবন রক্ষা করিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার যদি কখন তোকে এই বন মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা হইলে, তোর প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়িবে।" ইহা কহিয়া তিনি রাজকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষিত দেখিলেন, সমূহ বিপদ। বিজয় সিংহ ও ক্ষীরোদ বাসিনী উভয়েই জ্ঞানশূন্য। এই রূপ অবস্থায় কোন ক্রমেই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া তিনি এক জন অনুচরকে গ্রাম হইতে দুই খানি শিবিকা লইয়া আসিতে বলিলেন এবং অন্যান্য সঙ্গীগণ সহ রাজকুমারদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বৃহদরণ্য হইতে সোহনপুর প্রায় এক ক্রোশ দূরে। তখন বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল। প্রেরিত চর কিঞ্চিৎ কাল পরে দুই খানি শিবিকা লইয়া আসিল। তখন ক্ষীরোদ বাসিনীর মূর্চ্ছা অপনীত হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুত্র তখন পর্য্যন্তও সুস্থ হইতে পারেন নাই, বেদনাতে এক রূপ অধীর হইয়াছিলেন। পরীক্ষিত রাজকুমারকে ধরাধরি করিয়া শিবিকাতে উঠাইলেন এবং ক্ষীরোদ বাসিনীকে অন্য এক শিবিকায় উঠিতে বলিলেন। ক্ষীরোদ বাসিনী যদিও জানিতেন না কোথায় যাইতেছেন, তথাচ প্রাণদাতার কথা লঙ্ঘন করিলেন না, তিনিও আস্তে আস্তে শিবিকায় উঠিলেন। বাহকগণ শিবিকা লইয়া সোহনপুর অভিমুখে চলিল। পরীক্ষিত অনুচরবর্গকে তথায় রাখিয়া শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণ কুণ্ডল।

সোহনপুরের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরীক্ষিতের বাড়ী ছিল। বাড়ী খানির চতুর্দ্দিক মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। মৃত্তিকার দেয়াল উপরে বিচালির ছাউনি। বাটীর চতুঃপার্শ্বে আম্রের বাগান। কিঞ্চিৎ উত্তরে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহার চারি ধারে তালবৃক্ষ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে রোপিত ছিল। পরীক্ষিতের সংসার শূন্য। আত্মীয়গণের মধ্যে এক বৃদ্ধা জননী, তাহার নাম দক্ষিণা, দুইটী অল্প বয়স্ক পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছিল।

এতৎ ব্যতীত তাহার বাটীতে একটী মাত্র ভৃত্য ছিল। পরীক্ষিত দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিত বলিয়া পল্লীর অন্যান্য লোকে প্রায় তাহার বাটীতে আগমন করিত না।

পরীক্ষিত যে সময় শিবিকাসমভি-ব্যাহারে বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সময় প্রায় দুই প্রহর বেলা। পরী-ক্ষিতের মাতা তখন রন্ধন করিতেছিল। দক্ষিণা পুত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল। পরীক্ষিত জননীকে কহিল, "আমার সঙ্গে একটী ভদ্র লোক ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। ভদ্র লোকটী পীড়িত। তুমি তাঁর জন্য শীঘ্র একটী বিছানা প্রস্তুত করিয়া দাও, অন্য কার্য্য সকল পরে হইবে।" বৃদ্ধা পুত্রের কথা ক্রমে সত্বর একটী গৃহ পরিষ্কার করিয়া একখানি খাটের উপর নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। নর সিংহের দুহিতা তখন পিত্রালয়েই ছিল, সে বৃদ্ধার অনেক সাহায্য করিল।

শয্যা প্রস্তুত হইল, কুমারকে বক্ষে করিয়া শয়ন করাইল। বিজয় সিংহ তখন পর্য্যন্তও চৈতন্য লাভ করিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদ বাসিনী পরী-ক্ষিতকে ডাকিয়া কহিলেন, "সরদার! তোমাদের এখানে ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায়?"

পরীক্ষিত কহিল, "এ গ্রামে চিকিৎসক নাই বটে, কিন্তু সোহনপুরে গেলে অনেক চিকিৎসক পাওয়া যাইতে পারে।"

ক্ষীরোদ। "তবে স্নান ভোজনান্তে তুমি একবার যাইয়া এক জন চিকিৎ-সককে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

পরীক্ষিত। "আপনার আহারের কি-রূপ হইবে?"

ক্ষীরোদ। "আমি আর দিনমানে আহার করিব না। রাত্রিতে যা হয় এক রূপ করা যাবে। তুমি সত্বর আহার করিয়া লও।"

পরীক্ষিত। "আমিও এখন কিছু খা-ইবনা। রাজকুমার অজ্ঞানাবস্থায় রহি-য়াছেন, আপনি তাঁহার নিকট বসিয়া একটু শুশ্রূষা করুন, আমি শীঘ্র একবার সোহন পুরে যাইয়া একজন চিকিৎসক লইয়া আসি।"

ক্ষীরোদ। "সোহন পুর এখান হইতে কত দূর হইবে?"

পরীক্ষিত। "বেসি দূর নহে, আধ ক্রোশ খানেক হবে।"

ক্ষীরোদ। "আচ্ছা তবে শীঘ্র যাও।"

পরীক্ষিত সোহন পুরে গমন করিল। ক্ষীরোদবাসিনী রাজপুত্রের নিকট বসি-য়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষি-তের তনয়া তাহার সাধ্যমত আনুকূল্য করিতে লাগিল। ক্ষীরোদবাসিনী মৃদু-স্বরে কহিলেন, "তোমার নাম কি বাছা?"

পরীক্ষিতের তনয়া বিনম্র বচনে উ-ত্তর করিল, "আমার নাম সুদেবী।"

ক্ষীরোদ। "তোমার বিবাহ হয়েছে কোন্ গ্রামে?"

সুদেবী। "এই নিকটে। সোহন পুরের কাছে।"

ক্ষীরোদ। "কত দিন শ্বশুর বাড়ী যাও না?"

সুদেবী। "প্রায় ছ সাত মাস হবে।"

ক্ষীরোদ। "এর মধ্যে কি যাবে?"

সুদেবী। "নিতে না এলে আর যাব না।"

ক্ষীরোদ। "ভালই সে, আমি যে বিপদে পড়েছি, তোমরা কাছে থাকিলেও অনেক সাহায্য পাবো।"

সুদেবী। "ভয় কি? বিপদ কিসের? সামান্য একটু ঘা হয়েছে বৈত নয়? দুই এক দিন ঔষধ দিলেই আরাম হবে।"

ক্ষীরোদ। "সে এখন বিধাতার ইচ্ছা।" তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সুদেবী কহিলেন, "আপনারা দুইটী স্ত্রী পুরুষে কোথায় যাইতেছিলেন?" ক্ষীরোদবাসিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও অন্য মনস্ক ভাবে কহিলেন, "সদ্দার ত এখনও আশ্চে না?" সুদেবী ক্ষীরোদবাসিনীর মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "এই এল বলে—"

তাঁহারা যখন এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময় চিকিৎসক সঙ্গে করিয়া পরীক্ষিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমারী চিকিৎসককে দেখিয়া ত্রস্তভাবে পালঙ্কের উপর হইতে নামিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে দাঁড়াইলেন। চিকিৎসক রোগীর নিকট বসিয়া পীড়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পীড়া পরীক্ষান্তর ঔষধাদি প্রদান করিয়া যখন চিকিৎসক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনী পরীক্ষিতকে ডাকিয়া তাহার হস্তে একটী স্বর্ণের কুণ্ডল দিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে অর্থাদি নাই, তুমি এই কুণ্ডলটী চিকিৎসককে দিয়া বলিয়া দেও, যে পর্য্যন্ত রোগ আরাম না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি যেন প্রত্যহ এক একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখেন। পরে আরোগ্য হইলে তাঁহাকে উচিত পুরস্কার প্রদান করিব।" পরীক্ষিত রাজকুমারীর এবম্বিধ আচরণে বিস্মিত হইয়া কহিল, আপনি কুণ্ডল পরিধান করুন,আমার নিকট অর্থ আছে, চিকিৎসককে যাহা দিতে হয়, তাহা আমি দিতেছি।

ক্ষীরোদবাসিনী কহিলেন,"সদ্দার, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া আপন আলয়ে আনিয়া স্থান দান করিয়াছ, এঋণ কিছুতেই শোধ করিতে পারিব না, তুমি দুঃখী লোক, তোমার অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা দিতেছি, তাহা ধর, প্রাণ বাঁচিলে অনেক অলঙ্কার হইবে। পরীক্ষিত অগত্যা ক্ষীরোদবাসিনীর হস্ত হইতে কুণ্ডলটী গ্রহণ করিয়া চিকিৎসককে প্রদান করিলেন। চিকিৎসক হৃষ্টমনে প্রস্থান করিলেন।

মালবাধীশ্বর পাঠান সুলতান বাহাদুর সাহ কর্ত্তৃক চিতোর অধিকর।

১

বাহাদুর সাহ,* গুজ্জরাধিপতি,
পূর্ব্ব সুলতানের স্মরিয়া দুর্গতি,
সে অখ্যাতি রণে ঘুচাতে সম্প্রতি,
চিতোরের প্রতি সদলে চলে।
পৃথ্বীরাজ বীর নাহি সেথা আর,
* মজফ্‌ফর সাহ বন্দী ছিল যার;
† সঙ্গা রাণা গত ভবনদী পার,
কাঁপিত মালোয়া যাঁহার বলে॥

২

বিক্রম আদিত্য মিবারের রাণা,
করিছে এখন অত্যাচার নানা;
এ সময়ে তার রাজ্যে দিলে হানা,
রক্ষিবার তার নাহি উপায়।
এই আশা করি সহ মহোৎসাহ,
চলিল সমরে বাহাদুর সাহ,
নিদাঘ দহনে যেন বারি বহে,
বিজুলী পতাকা উড়ায়ে যায়॥

৩

করিবারে হিন্দু গর্ব্ব ছারখার,
মহম্মদী দিন ‡ করিতে প্রচার।
অহংকার করি বান্দি তরবার,
পাঠান পদাতি চলিল দাপে।
চলিল সংগ্রামে মাতঙ্গের দল,
ভীমাকৃতি যেন সচল অচল;
অশ্ব দড় বড়ি, বাদ্য কোলাহল,
সে সব হুঙ্কারে ভূধর কাঁপে॥

৪

ভয়ঙ্কর ইন্দ্র বজ্রের সমান,
চলিল প্রকাণ্ড ফিরিঙ্গি কামান;*
মহা শব্দে যায় ধরা কম্পমান,
অগ্নিময় গোলা উপরে যাহা।
সে গোলার কাছে কোথা অগ্নিবাণ,
ধনঞ্জয় যাহা করিত সন্ধান?
দুর্গের প্রাকার করি চূর্ণমান,
বিপক্ষ বিনাশে অমোঘ তাহা॥

৫

দেখি কাৎভাবতী † পুরী আক্রমণ,
দেবলাধিপতি ত্যজিয়া ভবন,
আইল যবনে করিতে দমন,
পঞ্চ শত "হারা" সেনার সঙ্গে।
আইল "দেওরা" সৈন্য অগণন,
"শনিগরা" দল সমরে ভীষণ,
আর২ কত রাজপুতগণ
আসিয়া মাতিল রণ তরঙ্গে।

৬

সৈংহিকের যথা ব্যাদিয়া বদন
গ্রাসে দিন মণি, গগন ভূষণ
তেমতি যাবন অলীক ভীষণ
ঘেরিল চিতোর অমোঘ বলে।
লৌহ শর জালে ঢাকিল অম্বর,
চপলা চমকে অসি ভয়ঙ্কর,
"অলি, অলি, অলি," "হর, হর, হর"
ভয়ানক ধ্বনি হয় দুদলে॥

* মজফ্‌ফর সাহ।
† রাণা সংগ্রাম, যাঁহাকে রাজপুতনায় সঙ্গা বলে, চিতোর তাঁহার রাজধানী ছিল।
‡ দীন। ধর্ম্ম।

* পোর্টুগীজ তোপ।
† কাৎভাবতী দুর্গবতী, চিতোরের নাম।

৭

আহবে অটল হারা বংশ মণি,
যবনের বল তৃণ তুল্য গণি,
বর্ষি ভল্লরাশি, যেন দীপ্তাশনি,
করিতে লাগিল বিপক্ষ হত।
প্রাণপণে করি অনেক যতন,
দূর্গ প্রবেশিতে না পারে যবন;
রিপু অস্ত্রাঘাতে হইল পতন
হয় হস্তী, আর পদাতি কত।

৮

এমন সময়ে ভিরিঙ্গি নিষ্ঠুর,
যে প্রাচীরে ছিল হারা বংশী শূর,
তারি নিম্নে খনি সুরঙ্গ সুদূর,
বারুদ পুরিয়া পলিতা দিল।
হল সেথা যেন শত বজ্রাঘাত,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা অকস্মাৎ,
উড়িল প্রাচীর পঞ্চাশত হাত,
ঘোরতর ধূমে ভূমি ব্যাপিল।

৯

কোথা গেল হায় বুন্দি রাজসুত?
কোথা সে সকল "হারা" রাজপুত?
ছিল যারা সবে যুদ্ধে যম-দূত,
পবন-বিক্রম, যবন-ভয়।
উড়ে গেছে তাঁরা প্রাচীর সহিত,—
একটীও হায় নাহিক জীবিত,
লয়ে গেছে আসি তাদিগে ত্বরিত
স্বর্গ ধামে সুর যুবতী চয়॥

১০

উড়িল প্রাচীর দেখি, কুতুহলে
চলিল যবন মহা কোলাহলে
বরষায় বাঁধ ভাঙ্গি কলকলে
নদীর প্রবাহ বহে যেমন।
হেন কালে চন্দাবতের * প্রধান
"সট্টু" আর "দুদু" মহা বলবান
নদীস্রোত-রোধী পর্ব্বত সমান
রোধিল তাদিগে লয়ে স্বগণ॥

১১

কঠোর রাঠোর কুলের নন্দিনী,
নাগ-কন্যা যেন দনুজ-নাশিনী,
দেব-দ্বিষ-দল-দলনোৎসাহিনী
"জোয়াহির বাই" নৃপ-জননী।
তড়িল্লতা সম রূপ দীপ্তিময়,
সেই রূপ তাঁরে দেখে হয় ভয়,
অগ্রসর হয়ে, লয়ে সৈন্যচয়,
বামী চড়ি তিনি যান আপনি।

১২

নিমেষের মধ্যে হলো মহামার;
দুই দলে মিলে ছাড়ে হুহুঙ্কার;
চমকে বল্লম, চক্র, তলবার;
বহে ঘোর রক্ত প্রবাহ তায়।
দীর্ঘ শ্মশ্রু-ধারী যবনের শির
পড়ে কত রণে, কবন্ধ শরীর
করে ধড় ফড়; কত ক্ষত্র বীর
ত্যজে ধরাধাম অস্ত্রের ঘায়॥

১৩

এমন সময়ে ফিরিঙ্গি কামান
জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরির সমান
কাঁপায়ে অবনী, মৃত্যু মূর্ত্তিমান
বর্ষিল লৌহের গোলা সকল।
সে সব গোলায় ক্ষত্রবীর কত
নিহত হইল, হইল আহত,
বলিতে না পারি; কিন্তু অস্তগত
হল তৎক্ষণাৎ তাদের বল।

* "চন্দাবত" বংশ ক্ষত্রিয়ান্তর্গত।

১৪

রাজ মাতা হায় ভূতলে পতিতা,
পল্লবিতা লতা যেন উন্মূলিতা;
তাঁর সঙ্গে বুঝি হৈলা অন্তর্হিতা
ভারতের লক্ষ্মী সমর ঘোরে।
হেরি হেন বীরাঙ্গনার মরণ
কে পারে করিতে অশ্রু সম্বরণ?
কিন্তু বৃথা শোক তাঁহার কারণ,
গিয়াছেন যিনি অমর পুরে।

১৫

অদ্যাপি ভারতে সুকীর্ত্তি তাঁহার
আছে দীপ্যমান, অদ্যাপি সবার
মানস আকাশে যেন সুধাধার
জাগিছে তাঁহার বীর চরিত্র।
কিন্তু তাঁর যশে হইয়া মোহিত,
ভুল না সে সব ললনা চরিত,
যাঁরা কর্ণাবতী * রাণীর সহিত
(সতীত্বে অনুপ, রূপে বিচিত্র)

* শিশু রাণার মাতা।

১৬

দেখিয়া যবন-সেনা আগুয়ান,
তাদের দৌরাত্ম্য হতে পরিত্রাণ
পাইতে, জীবন করি তুচ্ছ জ্ঞান,
রাখিতে নির্ম্মল আপন মান,
নেত্র হতে দূর করিয়া অস্রু
চন্দনের চিতা জ্বালি অভ্রভ্র,
ক্ষত্রিয়ানী ত্রয়োদশ সহস্র
জ্বলন্ত অনলে ত্যজিল প্রাণ॥

১৭

চিরস্থায়ী কীর্ত্তি তাঁদেরি ধরায়;
মহিমা তাঁদের কবিগণে গায়,
স্বাধীনতা দেবী আপন গলায়
সে সব রতন ধরেন হর্ষে।
তাদৃশী বীরতা, সাহস তেমন,
পুরুষের মধ্যে বিরল এখন।
লজ্জা হয় মনে করিতে স্মরণ
কি ছিল কি হল ভারতবর্ষে॥

° অস্রু—অশ্রু।



বঙ্গ বিজেতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলা।

Now naught was heard beneath the skies,
The sounds of busy life were still,
Save an unhappy lady's sighs,
That issued from the lonely pile.

Mickle.

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ভীমকান্তি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। যমুনা নদী চতুর্দ্দিকে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের চারিদিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। সম্মুখে যত দূর দেখা যায়, মনোহর হরিৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু এখনও পশ্চিম মেঘে রক্তিমার আভা দেখা যাইতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্ত প্রবাহিনী নদীর নির্ম্মল বক্ষে সেই আভা প্রতিফলিত হইতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে; অবতরণ করিয়া সায়ংকালীন নিস্তব্ধতাকে অধিকতর মনোহারিণী করিতেছে। দূরস্থ দুই একটী বট বৃক্ষের ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে; সন্ধ্যাকালের রমণীয় নীলিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অধিকতর রমণীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রান্তরে শব্দ মাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বায়ু হিল্লোলে দূরস্থ পল্লীর ক্রমশঃ মন্দীভূত রব শ্রুত হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত গৃহাভিমুখগামী কৃষকদিগের শ্রমাপনোদন গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

দুর্গের পশ্চাৎভাগ এ রূপ নহে। তথায় একটী প্রশস্ত আম্র কানন; উহা এত প্রশস্ত যে দুর্গ হইতে সেই আম্র বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সায়ংকাল যেমন ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে লাগিল, সেই আম্র বৃক্ষের ভিতর পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা দেখা দিতে লাগিল; নিকটে, দূরে, উচ্চে, নীচে, সেই খদ্যোৎমালা খেলা করিতে লাগিল। উদ্যানের ভিতর সুন্দর সরোবর, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, সরোবরের চারিদিকে নানা প্রকার কীট পতঙ্গ স্ব স্ব রবে সায়ংকালের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে দুর্গের উচ্চ প্রাসাদ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত,—কেবল একমাত্র গবাক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। সেই গবাক্ষপার্শ্বে এক অল্পবয়স্কা রমণী আসীনা;—হস্তে গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

রমণী গগনমণ্ডলের ললাটস্থ এক মাত্র উজ্জ্বল তারার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও সুন্দর সীমন্তে এক মাত্র উজ্জ্বল হীরক খণ্ড ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

রমণী কি চিন্তা করিতেছেন?—কে বলিবে, কি চিন্তা করিতেছেন? একি প্রেমের চিন্তা? প্রেমের চিন্তাতে বদনমণ্ডল ম্লান হয়, নম্র হয়,—এ রূপ গর্ব্ববিস্ফারিত হয় না।

রমণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইবে,—যৌবনে সর্ব্ব অঙ্গ অনুপম অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়াছে; কিন্তু এ সাধারণ নারী জাতির সৌন্দর্য্য নহে,—অলৌকিক উদার স্বভাব ও চিত্তোন্নতি-

ব্যঞ্জক। সে রূপরাশির সম্মুখে দাঁড়াইলে সহসা প্রেমের সঞ্চার হয় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঞ্চার হয়। শরীর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ. উন্নত ও দীর্ঘাকৃত অথচ কোমলতা-পরিপূর্ণ। ললাট অতি সুন্দর, সুবঙ্কিম, অথচ উচ্চ ও প্রশস্ত; সে রূপ প্রশস্ত পরিস্কার ললাট পুরুষের কদাচিৎ দেখা যায়, স্ত্রীলোকের কখনই সম্ভবে না। নয়নের স্থির উজ্জ্বলতা, ওষ্ঠের সুচিক্কনতা, সমস্ত বদনের উন্নত ও গম্ভীর ভাব, হৃদয়ের মহত্ত্ব ও চিত্তের ঔদার্য্য ও মহাশয়ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সমস্ত অবয়বের ভাব ভঙ্গী দেখিলে হঠাৎ প্রতীয়মান হয় যে, এ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী তন্বঙ্গী মানুষী নহেন,—কোন যোগপরায়ণা স্বর্গবাসিনী মানবজাতির উন্নতি সাধনার্থ এই মর্ত্ত্য জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

সেই নিস্তব্ধ সায়ংকালে গবাক্ষ পার্শ্বে বসিয়া রমণী সেই সুন্দর নির্ম্মল আকাশ পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রমণীর বদন মণ্ডলও অপরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল। রজনী গভীর হইতে লাগিল; আকাশের বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল;—রমণীর হৃদয়েও যেন চিন্তা রজনী গভীর হইতে লাগিল, তাঁহার প্রশস্ত ললাটও যেন ক্রমশঃ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত হইতে লাগিল; নয়ন হইতে তীক্ষ্ণতর উজ্জ্বলতর জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে এক জন পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, " বিমলে! " বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা, সতীশচন্দ্র, আসিয়াছেন।

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে না; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল; ললাট চিন্তা রেখায় অঙ্কিত; শরীরের চর্ম্ম শিথিল; সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষীণ; তথাপি চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতির্ম্ময়, ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তা মগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্য সহকারে ডাকিলেন, "বিমলে!"

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদন মণ্ডলে গম্ভীর ভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃ স্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "বিমলে! এত কি দুঃখ হইয়াছে যে, মৌনভাবে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আপনি কল্য দুর্গ ত্যাগ করিবেন,—কত দিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কত দিন এই প্রকাণ্ড দুর্গ শূন্য থাকিবে;—সে চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে,—আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না।"

পিতা উত্তর করিলেন, "সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি?"

বিমলা। "পিতা, আপনি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন তাহা জানি,—পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে না।"

সতী। "তবে চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত প্রতি বৎসরই একবার সুন্দরপুর হইতে রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন?"

বিম। 'প্রতি বৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে, কেন জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন. কোথাও যাইবেন না।"

শেষ কথা গুলি অতি অর্দ্ধস্ফুট মৃদু স্বরে উচ্চারিত হইল,—শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন,

"বিমলা কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ, আমাকে যাইতেই হইবে, যাইবার সময় রোদন করিও না।"

বিমলা উত্তর করিলেন, "পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্য রজনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল, যেন স্বর্গীয় মাতা দেখা দিলেন,—সাশ্রুলোচনে যেন অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই" বলিয়াই সহসা অন্তর্হিত হইলেন। এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখ খানি,—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটী দেখিতে পাইতেছি। কি পাপ করিয়াছি, বলিতে পারি না, কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না;—আবার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাগত, ভগবানই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর আপনাকে পাইব না।"

এই বলিয়া বিমলা বাস্পোৎফুল্ল লোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন বদন মণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থির ভাব থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতারও মুখ মণ্ডল সহসা বিকৃতি ধারণ করিয়াছিল। স্বপ্ন কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন,—যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব্বকথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন গূঢ় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই ক্ষণেই আরম্ভ হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার সান্ত্বনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্ত সংযম করিয়া স্থির ভাবে বলিতে লাগিলেন,

"বিমলা। এ সকলই তোমার মিথ্যা ভয়। দিবাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর, তাহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহা চিন্তার কারণ কি?"

বিমলা ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, 'পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব, আপনার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই। আপনিই সে মহা চিন্তার কারণ। অদ্য প্রায় এক মাস হইতে আপনাকে কোন গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন২ সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপনার আহারের সময় খাদ্য দ্রব্যে মন থাকে না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না, যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন পরিপূর্ণ। আমি কতবার দিবাযোগে লুকাইয়া আপনার কক্ষে গিয়াছি, যত বার যাই দেখি আপনি

সেই চিন্তায় মগ্ন, নিশিযোগে আমি কতবার আপনার শয়ন ঘরে গিয়াছি যখন যাই দেখি কোন কুস্বপ্নে আপনার ললাট কুঞ্চিত ও সমস্ত বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি ঘোর চিন্তায় আপনাকে এপ্রকার যাতনা দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও দৈনিক শ্রমের পর রজনীতে বিশ্রাম লাভ করে, বঙ্গ দেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?”

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন, পিতা স্থির ভাবে তাঁহার কথা গুলি শ্রবণ করিতেছেন,—পুনরায় বলিতে লাগিলেন,

“গত এক মাস অবধি আপনার নিকট এত চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে আসিয়া এবং গুপ্ত ভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবা রাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্য্যের ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সুশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্য ও সে পরামর্শ রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের কবাট বন্ধ করিয়া কতক গুলি নিভৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয় কেন? বালিকার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা মার্জ্জনা করুন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, কপটাচারী খল স্বভাব সর্পেরই বক্র গতি; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি সরল, যাঁহার চরিত্র সরল, যাঁহার উদ্দেশ্য সরল তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা, বালিকার কথায় অবধান করুন, কপট লোকের পরামর্শ ত্যাগ করুন, ধর্ম্মের পথ,—সরল পথ অবলম্বন করুন, তাহা হইলে কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা থাকিবে না। পাপ পথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্ম পথ নিরাপদ ও নিষ্কন্টক।”

বলিতে২ বিমলার উদার ললাট ও বদন মণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন যুগল হইতে উজ্জ্বলতর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। বিমলা অতিশয় পিতৃবৎসল কন্যা কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নৈসর্গিক গৌরব ও ধর্ম্মবল বিরাজ করিত। সেই গৌরবের আবির্ভাব হইলে জনাকীর্ণ রাজ সভায় যিনি শতসবার বাক্‌পটুতার জন্য প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন, সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকার কথায় তিনি নিরুত্তর হইলেন।

“পাপ পথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কন্টক” এই কথা অর্দ্ধস্ফুট বচনে উচ্চারণ করিতে করিতে সতীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে।

Try what repentance can: What can it not?
Yet what can it when one cannot repent?
O wretched state! O bosom black as death!
O limed soul that struggling to be free,
Art more engaged. Help angels, make assay!
Bow stubborn knees! and heart with strings of steel,
Be soft as sinews of the new born babe,
All may be well.

Shakespeare.

সতীশচন্দ্র বাহিরে আপন কক্ষে যাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “শকুনিকে ডাকিয়া দে,” ভৃত্য অগ্রে প্রভুর সেবা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু

সতীশচন্দ্র তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিয়া বলিলেন, "আগে শকুনিকে ডাক," ভৃত্য বেগে প্রস্থান করিল।

বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারু চিত্র শোভিত বস্ত্রে মণ্ডিত; প্রতি দ্বারে প্রতি বাতায়নে সুগন্ধ পুষ্প মালা লম্বিত রহিয়াছে; স্থানে২ স্তুপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ দীপ জ্বলিতেছে; দীপের চতুঃপার্শ্বে আবার পুষ্প গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশন স্থান মহার্হ রক্ত বস্ত্রে মণ্ডিত,—সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত, মহাধনসম্পন্ন রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষণ্ণ বদন কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

পাঠক মহাশয় যদি "বিষয়ী" লোক হয়েন, বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখী মনে করে, আপনি কি যথার্থই সেই রূপ সুখ ভোগ করেন? বলুন দেখি, জগৎ সংসারের সুখ বর্দ্ধন করিয়া উদারচরিত্র লোকে যেরূপ সুখ সম্ভোগ করেন, আপনার ধন সঞ্চয়ে কি সেই প্রকার নির্ম্মল সুখ লাভ হয়? প্রেম পাত্রের মুখাবলোকন করিয়া প্রেমিকের হৃদয় যেরূপ উল্লাসিত হয়, প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিলে কবির অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দিত হয়, উচ্চ পদ লাভে কি আপনার মন সেই রূপ উল্লাস প্রাপ্ত হয়,—কাব্য রসে বা বান্ধবসদালাপে অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়, কেবল ধন সঞ্চয়ে হৃদয়ের কি সে রূপ জন্মে? যদি না হয়, তবে দিনে২, সপ্তাহে২ মাসে২ কেবল ধন সঞ্চয়ে কেন বিব্রত রহিয়াছেন?—তদপেক্ষা মহত্তর সুখে কেন একবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন? আর যদি হয়, তবে বলুন, আমরাও "বিষয়ী" লোক হইবার চেষ্টা করিয়া দেখি!

পাঠক মহাশয় যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠক্ খানার ঝাড় লণ্ঠনের প্রতি নয়ন পাত করিয়া থাকেন,—যদি কখন অর্থের আবাস স্থানকে সুখের আবাস স্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন এক বার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,—লোভ দূর করি।

সেই কক্ষে একাকী বসিয়া কিছু ক্ষণ সতীশচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের হৃদয় পাপে কলুষিত পাপান্ধকারে আবৃত, সেই পাপ রাশির মধ্যে একটী মাত্র পুণ্য ছিল,—বিমলার প্রতি নির্ম্মল অপত্য স্নেহ সূক্ষ্ম জ্যোতি রেখার ন্যায় সেই পাপান্ধকারের মধ্যে দেখা যাইত। কন্যাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কন্যাকে অতি স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেন, স্ত্রী বিয়োগের পর অবধি কন্যার সহিত অনেক সময়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন,—বিষয় কর্ম্মের কথাও কন্যার সহিত আলোচনা করিতেন, এই জন্যই কন্যাও কখন২ পিতাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে সাহস করিতেন। বিমলাও অতিশয় স্নেহবতী কন্যা, পিতার সুখবর্দ্ধন ভিন্ন তাঁহার আর কোন লালসা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত স্নেহ-

বতী হইয়াও বিমলা উন্নত চরিত্র ধর্ম্ম পরায়ণা ও মানিনী—পিতাকে কপটাচারী দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইতেন। আলোকের উদয়ে অন্ধকার লীন হয়, সত্যের ও সরলতার সম্মুখে পাপ ও কপটতা স্বভাবতঃ ভীত হয়, সরলা বিমলার সম্মুখে সতীশচন্দ্র নিরুত্তর হইতেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্র কতদূর পাপে কলুষিত, তাহা বিমলা জানিতেন না; ভক্তি ভাজন পিতার চরিত্রে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বিমলার নির্ম্মল অন্তঃকরণে একবারও স্থান পায় নাই; তথাপি পিতার আচার ব্যবহার দেখিয়া সম্প্রতি বিমলার চিত্ত সন্দেহ দোলায় দুলিত হইয়াছিল ও সেই সন্দেহ তাঁহার যার পর নাই যাতনার কারণ হইয়াছিল।

কখন২ একটী ঘটনাতে বা একটী কথাতে বা একটী সঙ্গীতে সহসা আমাদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়, সাগর তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত চিন্তা লহরীতে সহসা হৃদয় প্লাবিত হয়; বহু কালের বিস্মৃত কথা সহসা স্মরণ পথে উদয় হয়। স্নেহবতী কন্যার সস্নেহ তিরস্কার বচনে যেন সেই প্রকার হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশব কালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্য কালে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যা লাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারন করিয়াছিল, সেই বিদ্যা লাভের আরম্ভ কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজি তিনি বঙ্গদেশের এক জন প্রধান লোক,—লক্ষ২ মুদ্রার অধিপতি।—সেই লক্ষ২ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবন কাল সমাগত। সেই যৌবন কালে তাঁহার স্মৃতি পথে কি গভীর পাপ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধন দর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ! উচ্চাভিলাষ মনুষ্যের গৌরবের কারণ হয়, অনিষ্টেরও কারণ হয়, তাঁহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জন মহানুভব বীর পুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যত্ন বিফল হইল, মহানুভব বীরপুরুষ পামরকে মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু অচিরাৎ আপন শোণিতে সেই মহৎ পুণ্য কর্ম্মের প্রতিফল পাইলেন। সমরসিংহের শোণিতাপ্লুত ছিন্নশির দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্ন মস্তক বিকৃতি ধারণপুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন, সম্মুখে আর চাহিতে পারি-

লেন না, দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। রে মূর্খ! স্মৃতি দীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না। ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে? সহস্র বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাহা করিব। ভগবন্ সহায় হও, এখনও বালিকার কথা শুনিয়া কার্য্য করিব, এখনও ধর্ম্মপথে ফিরিতে চেষ্টা করিব। সত্য কথা স্বীকার করিব, পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎকর শোণিত দিয়া সমর সিংহের রক্ত প্রবাহ বর্দ্ধন করিব।"

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "একি? অন্ধকারে একাকী বসিয়া আছেন কেন?"

সতীশচন্দ্র অতিশয় গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "আলোক সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গ প্রায়।"

শকুনি একথার উত্তর করিতে পারিলেন না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায় কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শকুনি! তোমার পরামর্শেই আমি এত দূর কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল? আমার পরকাল অনেক দিনই গিয়াছে এক্ষণে ইহকালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই পাপ রাশিতে, এই বিপদ রাশিতে তুমিই আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ, এক্ষণে আর কি করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উন্নতিশালী লোকের সর্ব্বনাশ কল্পনা কর; আমিও, এ ঘোর পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।"

শকুনি প্রভুর গম্ভীর স্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই। দুই চারি কৈতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর করিলেন।

"প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহ ভাজন হওয়া ভিন্ন আমার অন্য অভিলাষ ছিল না,—যদি সর্ব্বনাশ যথার্থই উপস্থিত হয়, প্রভুর সর্ব্বনাশের ভাগী হওয়া ভিন্ন, আমার দ্বিতীয় অভিলাষ নাই।"

স। "শকুনি! তোমার কথা অতি মিষ্ট,—বিধাতা এমন বিষপাত্র ক্ষীর দ্বারা আবৃত করিয়াছেন?"

শ। "আমি পাপিষ্ঠ বটে, তা না হইলে প্রভু ভক্তির এই ফল ফলিবে কেন?" এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটী অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন।"

"তুমি আমার উন্নতি চেষ্টা কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু পাপ পথে সর্ব্বদাই বিপদ। শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ ছিল না?"

শকুনি দেখিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি, আমি জানি না।"

স। "জান না,—বঙ্গচূড়ামণি, রাজা সমরসিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?"

শ। "রাজাজ্ঞায় তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।"

স। "ভাল, তাঁহার জমীদারী এক্ষণে কে পাইয়াছে?"

শ। "সুবাদার স্নেহ বশতঃ যাহাকে যে দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।"

স। "শকুনি! আর আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। অদ্য আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, ও তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারি না। অদ্য বালিকার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত কথোপথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন, অবশেষে বলিলেন, "পাপ পথে সর্ব্বদাই বিপদ, সেই বিপদ আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।"

শকুনি উত্তর করিলেন, "বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ানের কি বালিকার কথায় ভীত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ?"

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বালিকা যদি সত্য কথা কহে, তবে সে কথা বালিকামুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপ পথে সর্ব্বদাই বিপদ, তাহা আমি এত দিনে জানিলাম।"

শ। "যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ কি, আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

স। "আজি ছয় বৎসর হইল, যখন রাজা টোডর মল্ল প্রথম বার বঙ্গ ও বিহার দেশ জয় করিয়া কটকের নিকট দায়ুদ খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।"

শ। "দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহার দেশের সেনাপতি মনাইম খাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।"

স। "সত্য, কিন্তু সে আমাদেরই পাপ ষড়যন্ত্রে। তাহার দুই বৎসর পর, যখন রাজা টোডর মল্ল রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয় বিস্মৃত হও নই।"

শ। "তাহার পর।"

স। "তাহার পর বঙ্গদেশে দুই জন সুবাদার হইয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেনকুলী খাঁর নিকট অনেক যত্নে সত্য গোপন ছিল,—মজফ্ফর খাঁ আপন কার্য্যেই ব্যস্ত, এই জন্যই এত দিন পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে টোডর মল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।"

স। "যে কৌশলে এত দিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে ব্যর্থ হইবে কেন?"

স। যে কৌশলে হোসেন কুলী ও মজফ্ফর পরাস্ত হইয়াছিলেন, দূরদর্শী টোডর মল্ল তাহাতে পরাস্ত হইবেন না,—তুমি রাজা টোডর মল্লকে জান না।"

শ। "কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।"

স। "সত্য, কিন্তু সে বার দুই এক মাসের জন্য আসিয়াছিলেন,—এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন।" শকুনি! আমাকে

নিবারণ করিও না, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, —তিনি একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি আর এ পাপ সংসারে থাকিব না,—যোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।"

শ। "তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয় সুহৃদ সমরসিংহের হত্যাকারককে রাজা টোডর মল্ল অতি শীঘ্রই জল্লাদ হস্তে সংসার ত্যাগ করাইবেন।"

এই ব্যঙ্গ বাক্যে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য। গুপ্ত কথা অপ্রকাশ থাকার সম্ভবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণ রক্ষার কিছুই সম্ভাবনা নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন।

"শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ; কিন্তু যদি তুমি মূর্ত্তমান পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক য়।'

শ। "আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না। কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভু! আমার কথা অবধারণা করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনার নিকট পণ করিতেছি, যদি এ কথা না গুপ্ত রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিব।"

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করে;—সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। দুঃখের সময় আশা কুহকিনীরূপে আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সুখের সময় সেই আশা আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানব হৃদয়ও অতি চমৎকার, আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময় হৃদয়ে ধর্ম্ম ভয় প্রবল হয়,—বিপদের শান্তি হইলে, পীড়ার আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে, ধর্ম্ম ভয়ও ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমে কুহকিনী আশা কানে কানে বলিতে লাগিল, "ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?" সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, বিপদ না আসিলেও না আসিতে পারে, ভাবিতে২ বিপদভয় অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে২ ধর্ম্মভয়ও চলিয়া গেল। মানব হৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্ম্ম ভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "শকুনি তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?"

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "আশু কি বিলম্বে, গুপ্ত কথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ভবাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশঃ, আপ-

নার সাহস কে না প্রশংসা করে? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার, আপনার গৌরবের মত কাহার গৌরব? আপনার অধিকারের মত কাহার অধিকার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা কি বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।"

সতীশচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। মনে২ ভাবিতে লাগিলেন "যথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম,—বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম!" এই প্রকার ভাবিতে২ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন। শকুনি তাঁহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন,—মনে২ বলিতে লাগিলেন "হাঁ! শকুনি শর্ম্মার হাত হইতে এখনই নিস্তার পাইবে? এখন হইয়াছে কি?' প্রকাশ্যে বলিলেন, "রুদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?"

স—"না। সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে, সমরসিংহের বিধবা শুনিয়াছি ভয়ানক স্ত্রীলোক. টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয় ত সেই একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।"

শ। "সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার অগ্রেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে।"

স। "তবে কি আমরা যে চর ইচ্ছাপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয়া আনিতে পারিয়াছে?

শ। "না, এখনও পারে নাই, সে কার্য্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।"

স। "পারে নাই কেন?"

শ। "শুনিলাম, তাহারা দুই এক দিন পূর্ব্বেই সমাচার পাইয়াছিল, সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।"

স। পিশাচী! আমার সকল কর্ম্মেই বাধা দেয়, তাহাকে ধরিয়া আনাইতে পার না?"

শ। "চেষ্টার ত্রুটি নাই কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদিগের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে, না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছে না কেন?'

স। "তবে এক্ষণে উপায় কি"?

শ। "চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন, শকুনি শর্ম্মার মন্ত্রণা হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ভাবিলেন ' তোমারও নিস্তার নাই।"

সতীশচন্দ্রও শয়ন কক্ষে গমন করিলেন; সন্ধ্যাকাল অবধি মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। উন্নত চরিত্র বিমলার তিরস্কার, আপন হৃদয়ের ভীরুতা, পূর্ব্ব কথা স্মরণ, শকুনির সান্ত্বনা, সমরসিংহ, সমরসিংহের বিধবা, পাগলিনী, ইত্যাদি সমস্ত কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে।

Is there in human form, that bears a heart,
A wretch! a villain! lost to love and truth?
* * * *
Curse on his perjured arts! dissembling smooth!
Are honor, pity, conscience, all exiled?
Is there no pity, no relenting truth?
Burns

পর দিন প্রাতে দেওয়ানজি মহা সমারোহে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কন্যার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন, "পিতা, আপনি চলিলেন, অনুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর মন্দিরে যাইয়া আপনার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে তিন দিন অবস্থিতি করিতে হইবে।" পিতা সম্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কন্যার নিকট বিদায় লইলেন। কন্যার চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া যাইবার সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, বিমলা মনেং বলিতে লাগিলেন, "এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহ নাই, আপনি না থাকিলে এসংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্ম পথে আপনার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র ত উদার ও অকপট, কুক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।"

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিল, "আপনি অগ্রসর হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি।" সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করি।" শকুনি বলিল, "ভৃত্যের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভবে, প্রভুর কার্য্য সমাধা করিতে ত্রুটি করিবে না"—সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনেং বলিতে লাগিল "বুদ্ধিখানা তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।"

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ। শকুনি দেখিতে সুশ্রী ছিল, ও অল্প বয়সে অনাথ ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সেই দিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিয়াছিল, সতীশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আহুতি দিতে লাগিল; আহুতি পাইয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে চলিল। এই ঘোর মদে মত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইলেন, একবারে অন্ধপ্রায় হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল পথে লইয়া যাওয়া দুরূহ নহে, সৎপরামর্শ হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল; প্রভুকে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল। অবশেষে এমন ঘোর পঙ্কে নিমগ্ন করিল যে, তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা মনুষ্যের

সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমেং ভ্রম দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তখন পশ্চাৎ তাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্ব পরেই,সতীশচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শকুনির বিনীত ভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরামর্শে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন। দিনং তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন, আপনার পুত্র নাই বলিয়া শকুনিকে পুত্রের মত ভাল বাসিতেন। কখন তাহাকে পোষ্য-পুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে মান হানি হইবে, এই ভয়ে শকুনিকে গৃহজামাতা করিতে পারেন নাই। ক্রমে কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষ সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, কন্যার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য হইবে, এই জন্য বিবাহের বিলম্ব হইতে লাগিল, এই জন্য শকুনিকে জামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন এই সঙ্কল্প আবার দূর হইল। পাপ এরূপ ঘৃণার পদার্থ যে এক জন পাপী অন্য জনকে ভাল বাসিতে পারে না, সতীশচন্দ্র শকুনিকে আর ভাল বাসিতে পারিলেন না। উন্নত চরিত্রা ধর্ম্মপরায়ণা দুহিতাকে, কুটিল স্বভাব, কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন, এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। মনেং ভাবিলেন, "আমি পাপিষ্ঠ বটে,কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরায়ণ সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু আমার স্নেহের পুত্তলি বিমলাকে নরকে ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্ম পথে থাকুক।" সতীশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের নিকট একটী কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের শিরশ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পাপের সীমা ছিল,—তাঁহার চরিত্রে দুই একটী সদ্‌গুণও ছিল, তাঁহার হৃদয়ে দুই একটী মহানুভব লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। শকুনির এসমস্ত কিছুই ছিল না, কেবল ঘোর স্বার্থপরতা, ও দুর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত, তাহার দুর্দ্দমনীয় বেগবতী মনোবৃত্তি একটীও ছিল না; তাহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শান্ত;—সকল প্রবৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অনুচারিণী। সুতরাং তাহার গভীর মন্ত্রণা প্রকাশ বা নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, কিছুতেই বিচলিত হইত না। ঊর্ণনাভ যেরূপ বৃক্ষ পত্রগুলি দেখিয়াং ধীরেং জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অন্য লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি ধীরেং আপন সূক্ষ্ম মন্ত্রণা

জাল বিস্তার করিত। সে মন্ত্রণা জাল এমন সূক্ষ্ম, এমন দুর্লক্ষ্য ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য ভেদ করে। প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বদ্ধ ও মানব জাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি, উচ্চাভিলায প্রভৃতি যে সকল দুর্দম বেগবতী মনোবৃত্তিতে অনেককে বিচলিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিষ্ফল হইত না।

সতীশচন্দ্র শকুনিকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু স্বার্থপর বলিয়া জানিতেন না। মনে ভাবিতেন, শকুনি যতই পাপ মন্ত্রণা করুক না কেন,কেবল আমারই উন্নতি সাধন উহার উদ্দেশ্য। এই মহা ভ্রান্তি বশতঃই সতীশচন্দ্র এখনও শকুনিকে অল্প পরিমাণে ভাল বাসিতেন, এ মহা ভ্রান্তি তাঁহার শীঘ্রই দূর হইবে।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে,—সেটী মিথ্যা কথা। শকুনির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,—যে রূপ অসঙ্খ্য চর, মহাশ্বেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে। সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে মুঙ্গেরে না যাইতে হয়, এই জন্য। তবে যে এত দিন তাঁহাকে ধরা হয় নাই, তাহা শকুনির বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালের এক অংশ। সে মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য? পাঠক মহাশয়! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে,তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়

চতুর্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পরিচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গপদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে,—মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুর দিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখ মণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থ সাধন হইলে স্বার্থপরলোকের যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেই রূপ আনন্দের লক্ষণ। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছে।—

"এই সুবিস্তীর্ণ জমীদারি, এই প্রশস্ত দুর্গ, ঐ অন্তঃপুর বাসিনী সপ্তদশ বর্ষীয়া সুন্দরী, শীঘ্রই নব স্বামী গ্রহণ করিবে, সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ, শীঘ্রই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে; কল্লোলিনী যমুনা শীঘ্রই শকুনির গৌরবগীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব; এই দলিত, মৃত পতঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্য বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক বালিকার স্বপ্ন মাত্র! তোমার রূপ লাবণ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না;—আমার নিকট রূপ লাবণ্যের আদর নাই; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপ লাবণ্যের অভাব কি? তবে তোমায় দলিত না করিব কেন? সতীশচন্দ্র, সাবধান! আজি তোমাকে যম মন্দিরে প্রেরণ করিলাম;—যে রূপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্ত কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে;—অধিকন্তু শকুনির

দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী? তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চির কালই জয় হউক।"

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষ পার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ দিকে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে; চক্ষুদ্বয় এখনও জলে ঢল ঢল করিতেছে; অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত ও কম্পিত, উন্নত বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে; বস্ত্র অশ্রু জলে প্লাবিত হইয়াছে। বিমলার উন্নত আকৃতি বিষাদে অধিকতর উন্নত দৃষ্ট হইতেছে, উজ্জ্বল মুখ মণ্ডল উজ্জ্বলতর রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন না,—তাঁহার হৃদয়ের যে গম্ভীর বিষণ্ণ ভাব, তাহা বালিকার উচ্চ রোদনে প্রকাশ পায় না; নিঃশব্দ অলক্ষিত, অবারিত অশ্রুজলে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

দেখিয়া শকুনি আপন চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আনিয়া আপনিও বাহিরের ঘরেরগবাক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইল। দুঃখের সীমা নাই, অশ্রু বিন্দুতে বদন মণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে। বিমলা চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন, শকুনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ঘৃণায় ভ্রূকুটী করিয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলার মন হরণ করিবার জন্য শকুনির এই প্রথম উদ্যম—নিস্ফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপাসকে উপাসকে।

Enamoured, yet not daring for deep aw
To speak her love:—and watched his nightly
sleep,
Sleepless herself, to gaze upon his lips
Parted in slumber, whence the regular breath
Of innocent dreams arose: then when red
morn
Made paler the pale moon, to her cold home
Wildered and wan and panting, she returned
Shelly.

চতুর্বেষ্টিত দুর্গ হইতে মহেশ্বর মন্দির অধিক দূর নহে, সন্ধ্যার সময় বিমলা শিবিকা আরোহণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক, ও অনেক সংখ্যক দাস দাসী চলিল। বঙ্গ দেশের দেওয়ানজীর একমাত্র দুহিতার যেরূপ সমারোহে যাওয়া উচিত সেইরূপ সমারোহে বিমলা মহেশ্বর মন্দিরে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিভৃতে দুই একটী প্রাচিনা স্ত্রীলোকের সহিত যাইবেন,কিন্তু পিতার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

মহেশ্বর মন্দির অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। অনেক দূর দেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে দিন দিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্র কন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন, যুবতীগণ পুত্র আকাঙ্ক্ষায় মহেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেন; চিররোগীগণ রোগ শান্তি কামনায় এই মন্দিরে আসিতেন, যোদ্ধাগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানাবিধ প্রকারের লোক নানাকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল, মন্দিরের অট্টালিকাসমুহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির,

তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ উজ্জ্বল উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই অট্টালিকা শ্রেণী প্রকাণ্ড চক্রাকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। তাহার মধ্য স্থানে উন্নত মহেশ্বর মন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং, মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই চক্রাকৃতি সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারি দিকে চারিটী সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধন গৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদ ব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্ম বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে, মহেশ্বরের সম্মুখে উচ্চ কে, নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি? সকলই সমান।

যদিচ চারি দিকের সৌধ বেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসক আসিত, এমত নহে; নানা প্রকার লোকে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক বালিকার জন্য নানা প্রকার ক্রীড়া দ্রব্য, যুবক যুবতীদিগের জন্য নানা প্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য-দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতাগণ তথায় দিবা নিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। সে পবিত্র ভূমিতে স্ত্রীলোকে সকলের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যুবতীগণ দ্রব্যাদি ক্রয়ার্থ সেই বহু জন সমাকীর্ণ স্থানে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; সামাজিক নিয়ম সমুদায় সেই দেব মন্দিরে প্রবল ছিল না।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীর সহিত মহেশ্বর মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে২ রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গিগণ তাঁহাকে সে রাত্রিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অদ্য শয়ন করিব না,—যদি করি, নিদ্রা হইবে না," এই বলিয়া বিমলা একাকী ধীরে২ মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশ পটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্র কীরণে রৌপ্য মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়ন পথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে,—যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব

হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানেং বৃক্ষ পত্রের মধ্যে পুঞ্জং খদ্যোৎমালা নয়ন রঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়াং বহিতেছে, ও নিকটস্থ উচ্চ ঝাউ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর সুদূর সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় ভীমকান্ত রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই, কেবল স্থানেং পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখনং দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থ গ্রামবাসিদিগের গীত গান বায়ু পথে আরোহণ করিয়া কখনং কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে, সেই দূরে গীত গান শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ শান্ত পথে যাইতেং বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল; প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও গভীর ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটী করিয়া লোক সমবেত হয়, মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমাদের জীবনও এই রূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরেং চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তি সমূহের দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—যেন জগৎ সংসারকে গ্রাস করিতে আসিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—বারি বিন্দুর মত অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধুম ধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন? কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশির বিন্দু মুহূর্ত্ত মধ্যে মনুষ্য পদে দলিত হইবে, বা প্রাতঃকালের রবিকিরণ স্পর্শে শুখাইয়া যাইবে, তাহার হীরক খণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিতেং বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা রব শুনিতে পাইলেন, সেই ঘণ্টা রব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল,—নিস্তব্ধ-নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টা রব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল;—কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দী-ভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল;—উপাসকদিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন, মন্দিরের উচ্চ চূড়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে,—বিমলার হৃদয়ও আকাশের দিকে ধাবমান হইল। যে গান গীত হইতেছিল, বিমলা সপ্তস্বরে সেই গীতের সহিত যোগ দিলেন, তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল। সেই পবিত্র প্রেম ও উল্লাসই

যথার্থ উপাসনা। উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না, —প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, বা বিশুদ্ধ পবিত্র চিন্তায় মগ্ন হইয়া যদি হৃদয় পবিত্র প্রেম ও উল্লাসে প্লাবিত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের উপাসনা বলে,—যদি তাহাতে হৃদয় শান্ত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের শান্তি কহে।

বিমলা দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিলেন, এক দিকে গায়ক ও বাদ্যকর বসিয়া রহিয়াছে,—তাহারাই গীত আরম্ভ করিয়াছিল। যথার্থ উপাসকের হৃদয় সে গীতের যে অর্থ ও মহিমা গ্রহণ করে, যাহারা গাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয় জন সে অর্থ বুঝিতে পারে? অন্য এক দিকে দেবদাসীগণ নৃত্য করিতেছে, —পূর্ণযৌবনসম্পন্না রূপলাবণ্যবিভূষিতা দেব দাসীগণ তালে তালে নৃত্য করিতেছে। সেই পবিত্র দেব মন্দিরের দেব দাসীদিগের কয় জনের হৃদয় পবিত্র? বিমলা এ সকল পশ্চাতে রাখিয়া পূজা স্থানে গমন করিলেন।

মহাদেবের প্রতিমার নিকটেই পূজা স্থান। তথায়ই উপাসকগণ সমবেত হন। যখন বিমলা আসিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিলেননা, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা ছিলেন, দেবালয়ের পুরোহিত ও পূজকগণ তাঁহাদিগের কাহাকে কাহাকেও পূজা করাইয়া দিতেছেন। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহর কাল পূজা করিতে লাগিলেন। মুদিত নয়নে নিষ্পন্দ শরীরে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদন মণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহই নাই, পিতাই এক মাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, পবিত্র প্রেমস্রোত, অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধাস্রোত, সেই এক মাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা,—বিমলা পিতার জীবনেই জীবন ধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার যে উদ্ঘাটিত হইবে তাহাতে বিস্ময় কি? সেই পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিতে করিতে যে বিমলার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এক প্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্য ফুল্ললোচনে মন্দিরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রতিমার সুবর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার দেখিতে লাগিলেন; সম্মুখে স্তবকে স্তবকে সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূতন বোধ হইতে লাগিল। বিমলা এরূপ সুনির্ম্মিত প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণ মণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন, কখন কখন ভিত্তির উপর সুবর্ণ ও দ্বিরদরদে ভাস্কর কার্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন ; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন ; কখন দুই এক জন দেব দাসীকে মন্দির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

এক পার্শ্বে এক মাত্র উপাসক নিদ্রিত রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইলেন, নয়ন আর সে দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন গাঢ় চিন্তায় বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত,বদন মণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদর্প প্রকাশক। প্রশস্ত স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া যজ্ঞোপবীত লুটাইয়া পড়িয়াছে, বাহু যুগল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমলার বোধ হইল যেন কোন বীর পুরুষ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া দূর দেশ যাত্রা করিতেছেন, পথি মধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। শ্রান্তি বশতঃ বা অন্যস্থান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা হৃদয়েও বীর ভাবের অভাব ছিল না ; সুতরাং উপাসকের এই অলৌকিক বীর আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, শরীর সহসা কন্টকিত হইল। কি কারণে তাঁহার মনে চাঞ্চল্য হইল,বিমলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না,কিন্তু অনিমেষ লোচনে সেই বীর পুরুষের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আরও অগ্নি অভিমুখে পতঙ্গবৎ আকৃষ্ট হইতে লাগিল শরীর অধিকতর অবসন্ন হইতে লাগিল,—কলের পুত্তলীর মত এক দৃষ্টে সেই উপাসকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক মহাশয় কখন কি প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়িয়াছেন? কখন কি কোন রমণী রত্ন দেখিবামাত্র আপনার হৃদয় সহসা চঞ্চল হইয়াছে, শরীর কন্টকিত হইয়াছে, নয়ন আকৃষ্ট ও নিমেষশূন্য হইয়াছে? কখন চঞ্চল নয়ন দুখানি দেখিয়া আপনার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইয়াছে,—সুধা পরিপূর্ণ স্মিতপ্রফুল্লওষ্ঠ দুখানি দেখিয়া কোন সুন্দরীকে স্নেহের পুত্তলী, প্রেমের পুত্তলী বলিয়া গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে বিমলার মনোগত ভাব কিছু২ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ভাগ্যে এ প্রকার কখন ঘটে নাই, সুতরাং আমরা বিমলার হৃদয়চাঞ্চল্যের কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, বিমলাকে অবোধ বালিকা বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপাসকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিতেই দেখিলেন সম্মুখে উজ্জ্বল নয়না তন্বঙ্গী দণ্ডমান রহিয়াছেন চারি চক্ষুর মিলন হইবা মাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল। অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হইলে, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাত প্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি

নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই এক জন করিয়া লোক বাহির হইতেছে। বিমলার লোকের সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া অভ্যাস নাই, কুঞ্চিত হইয়া দ্রুতবেগে বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাচীনাগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন এতক্ষণ কি করিতেছিলেন তখন বিমলা কি বলিবেন,— এতক্ষণ কি উপাসনা করিতেছিলেন?

বিমলার অন্যান্য চিন্তা হইতে লাগিল। এ বীর পুরুষ কে? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন? এমন ভাগ্যবান্ বীর পুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে? যদি কিছু থাকে তাহা বিমলা কর্ত্তৃক দত্ত হইতে পারে না?" ধন ঐশ্বর্য্য, ভূমি, বিমলার ত কিছুরই অভাব নাই, এই বীর পুরুষের কামনা কি বিমলা সিদ্ধ করিতে পারেন না?—রে অবোধ! এ পুরুষ তোমার কে, যে তুমি তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছ? এ প্রশ্ন সহসা বিমলার হৃদয়ে উদিত হইল, তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না, ও চিন্তা দূর করিলেন।

ক্ষণেক পর আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আচ্ছা উহার নিবাস কোথায়? উহার পিতা মাতা কে, উহার কি বিবাহ হইয়াছে?—রে অবোধ! যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার কি? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না।

বিমলা যদি আপন হৃদয় বুঝিতে পারিতেন, তবে উত্তর করিতে পারিতেন, তবে বলিতেন, উনি আমার

হৃদয়ের হৃদয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকে প্রেমিকে।

Amid the jagged shadows,
Of mossy leafless boughs.
Kneeling in the moonlight,
To make her gentle vows;
Her slender palms together prest,
And heaving some times on her breast;
Her face resigned to bliss or bale,—
Her face, O! call it fair not pale,—
And both blue eyes more bright than clear,
And each about to have a tear.

Coleridge.

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিবার জন্য বিমলা আপন শয়ন ভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা বড় অধিক নিদ্রা হইল না, যে পরিমাণে নিদ্রা হইল, তাহা স্বপ্ন পরিপূর্ণ। সেই দেবপ্রাঙ্গন সেই চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেব মন্দিরে মহেশ্বরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বার২ সেই উপাসককে দেখিতে লাগিলেন, কখন নিদ্রিত, কখন বা উপাসনায় মগ্ন,কখন উপাসনান্তে দণ্ডায়মান, কখন বীর পুরুষের ন্যায় তরবারি হস্তে গর্জ্জন করিতেছেন। শেষবার যে স্বপ্ন দেখিলেন, সে অতি ভীষণ, বোধ হইল যেন আপনি উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বর চরণে পুষ্প না দিয়া মকরধ্বজ চরণে পুষ্প দিতেছেন। যতবার মহেশ্বরচরণে পুষ্প দিতে যান, ততবারই সেই পুষ্প কন্দর্প চরণে পতিত হয়। কিছুতেই মহেশ্বর পূজা করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মহেশ্বর মূর্ত্তিমান হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। বিভূতিবিভূষিত; কেশে গঙ্গা কল২ করিতেছে;

ললাটে চন্দ্র ধক্২ করিতেছে, ফণীন্দ্র সকল তেজে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মহেশ্বর আজ্ঞা দিলেন, "রমণীর হৃদয় পাপে কলুষিত, হৃদয় ভেদ কর।" তৎক্ষণাৎ সেই অপরিচিত উপাসক তরবারি দ্বারা রমণীর হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। বিমলা চিৎকার শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

জাগিয়া দেখিলেন, গৃহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে; প্রাঙ্গণে লোকের সমাগম হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে; ভয়ানক স্বপ্ন বশতঃ তাঁহার স্বাভাবিক গৌর বদন রক্তশূন্য হইয়া, অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে, বক্ষঃস্থলে ঈষৎ ঘর্ম হইয়াছে। বিমলা আলুলায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বদ্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, "পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে; আমি পিতার মঙ্গলার্থ এই মন্দিরে আসিয়া অপরিচিত পুরুষের বিষয় চিন্তা করিয়াছি, সেই জন্যই এই অনিষ্টসূচক স্বপ্ন। আমি এ চিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিব,—আবশ্যক হয়, হৃদয় সমেত উৎপাটিত করিব।" এই বলিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্যমনস্কার ন্যায় হইয়া রহিলেন। স্বপ্ন কথা তাঁহার বার২ মনে পড়িতে লাগিল। চিন্তা করিলেন "যদি আমি পাপীয়সী হই, সেই মহাত্মা আমার হৃদয় ছেদন করিবেন কেন" অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কাহাকেও মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এমন লোক পাইলেন না। ভবিষ্যতে তাঁহার কপালে কি আছে বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে বিমলা উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও তিনি অন্যমনস্কা হইয়া থাকেন, উপসনার সময় তাঁহার চিত্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিল। দ্বিগুণ ভক্তির সহিত বিমলা ঈশ্বর আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিলেন, তৎপরে আপন পাপ ক্ষয় কামনায় পূজা করিতে লাগিলেন। বিমলার মহেশ্বর প্রতি অচলা ভক্তি, পূজা করিতে২ তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত শ্রদ্ধাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উঠিবামাত্র পুনরায় সেই অপরিচিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন। বিমলার চিত্ত সংযমের ক্ষমতা ছিল, অদ্য তিনি চিত্ত কথঞ্চিৎ সংযত করিয়াছিলেন। ক্ষণেক মাত্র বিমলা সেই উপাসকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অবনত মুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই দিনই সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন, দুই দিনই সুন্দরী এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে ক্ষণেক মাত্র চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই জানিতেন যে, দেব মন্দিরেও কুলটা কামিনী কুকামনায় যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু বিমলার আকৃতি ও মুখের ভাব দেখিয়া সেরূপ চিন্তা যুবকের মনে একবারও স্থান পায় নাই। তাঁহার হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এই হইল যে, এই রমণীর কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। কিন্তু লজ্জায় অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। একবার ইচ্ছা হইল

নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অপরিচিতা তরুণী ভদ্র কন্যার সহিত কি রূপে বাক্যালাপ করিবেন। দুই দিনের কথা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন, "যদি আমি না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ গূঢ় কথা অব্যক্ত থাকিবে,—বোধ হয়,যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, নিস্ফল হইবে।"

ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপনার সহিত কথা কহিতেছি ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনার কিছু বক্তব্য আছে,—যদি থাকে, আজ্ঞা করুন।"

বিমলার কর্ণে অমৃত বর্ষণ হইল, বোধ হইল,এরূপ সঙ্গীত পরিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে কখন প্রবেশ করে নাই। তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যাকালের চিত্ত সংযম একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বলুন, আমি শুনিতেছি,—এখানে আর কেহই নাই।"

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিলেন,—"নাম এক্ষণে অজ্ঞাত থাকিবে,—আমাকে অধুনা প্রেমদাস শর্ম্মা বলিয়া জানিবেন।"

পাঠক মহাশয়, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুকে অনেকক্ষণই চিনিয়াছেন। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপসানার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

প্রে। "সংক্ষেপে বলিতেছি—কোন অনাথা আশ্রয় হীনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

বি। "ধন দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে?"

প্রে। "না। কিন্তু আপনি অপরিচিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।"

বি। "তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব?"

প্রে। "বিচার। আমি মুঙ্গের যাত্রা করিয়া বিচার প্রার্থনা করিব। কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনি অবশ্যই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন।"

বিমলা মুঙ্গের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল, সতেজে প্রেমদাসকে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় বীর পুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন দাসীর একটী ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।"

প্রে। "রমণি! আমার ক্ষমতা নাই কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইব।"

বি। "মুঙ্গেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদ্জালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন পাইবেন।"

প্রেমদাসের মুখ গম্ভীর হইল, ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, "এই রমণী আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন;—মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জানেন; আমার ব্রতের বিষয়ও অবগত আছেন;—সেই ব্রত ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।" তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

"এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপন্নের বিপদ্ শান্তি করাই বীর পুরুষের কার্য্য আর যদি কখন তাঁহাকে অসৎলোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন সে জঘন্য মিথ্যা কথা,—শকুনির প্রতারণা"—

প্রে। "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন,—শকুনি কে?"

বি। "শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী,—সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীর পুরুষ! এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।

প্রেমদাস এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন,—কিঞ্চিৎপরে বলিলেন "যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দ্দোষী হয়েন তবে আমি আপনার অনুরোধে নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কি রূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন।"

বিমলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "প্রেমদাস! আপনি আমাকে আপনার নাম বলেন নাই, আমার নামও আপনার নিকট অবিদিত থাকিবে। এক্ষণে আপনি বলুন দেখি কোন্ ভাগ্যবতীর প্রেমের দাস হইয়াছেন?"

প্রে। "এখনও আমি কাহারও দাস হই নাই,—আমি অবিবাহিত।"

বিমলার শরীর সহসা পুলকে কন্টকিত হইয়া উঠিল। কেন হইল,—কে বলিবে কেন হইল,—আশা মায়াবিনী। বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন।

"আমাকে ভিখারিণী বলিয়া জানিবেন" বলিয়া বিমলা আবার একটু হাসিলেন।

বিমলার সুমধুর হাস্য দেখিয়া প্রেমদাস অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন,—বলিলেন।

"ভিখারিণি! এবার বল দেখি তোমার আবার ভিক্ষা কিসের?

'নরত্নমন্বিষ্যতি, মৃগ্যতেহি তৎ।'

বিমলার মুখ লজ্জায় আরও অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল,—চক্ষুর পাতা দুখানি পড়িয়া গেল,—মুখ আরক্ত হইল। গদ গদ স্বরে বলিলেন।

"একটী ভিক্ষা ত বলিয়াছি,—সতীশচন্দ্রের রক্ষা,—বিধাতা যদি সময় দেন তবে অন্য ভিক্ষাটী অবকাশ মতে বলিব"

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিলেন। সে সৌন্দর্য্য প্রেমদাসের হৃদয়ে অনেক দিন অঙ্কিত রহিল।

—০—

একাদশপরিচ্ছেদ।

নাবিক।

How he heard the ancient helmsman,
Chant a song so wild and clear,
That the sailing sea bird slowly,
Poised upon the mast to hear,

Till his soul was full of longing,
And he cried with impulse strong—
" Helmsman! for the love of heaven,
Teach me, too, that wondrous song!"
Longfellow.

গঙ্গানদীর উপর মুঙ্গেরের ভীমকান্ত দুর্গ শোভা পাইতেছে। কলং শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে. একং বার দুর্গের উপর বলে আঘাত করিতেছে,—আবার ফেনময় হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। স্থানেং ভীষণ আবর্ত্ত দেখা যাইতেছে,—সেই আবর্ত্তে তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু আসিতেছে বেগে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। কোথাওং পাড়ের মৃত্তিকা রাশি ভীষণ শব্দে জলে পতিত হইতেছে,—বারিরাশি কিঞ্চিৎ মাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানেং শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে,—সেই চরে নানা প্রকার পক্ষী বিচরণ করিতেছে,—কোথাও বা তরীবাসীগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে সেই তরী হইতে অসংখ্য দ্বীপ তারকজ্যোতিরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝক্ মক্ করিতেছে। আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে,—গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে,—নগর ক্রমে নিঃস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে এক জন যুবা পুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত প্রেমদাস।

প্রেমদাস অদ্যই মুঙ্গেরে পঁহুছিয়াছেন,—নিবিড় চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তা কি, পাঠক মহাশয় অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

অনেক দিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি এই রূপ মধ্যেং গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তথাপি পিতা তাঁহার জন্য কতই চিন্তা করিতেছেন সন্দেহ নাই। কবে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন?—যে রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনও কি গৃহে ফিরিয়া যাইবেন? প্রেমদাসের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সাহসী,—তিনি সমস্ত জগৎকেই আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতেন,—মানব জাতিকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি প্রবাসে আসিয়া পিতৃগৃহের জন্য এক বারও চিন্তা হয় না এমন হৃদয়ই নাই। প্রেমদাসের হৃদয়েও একং বার চিন্তা হইত।

কি করিতেই বা আসিয়াছেন? এই প্রশ্নেরও সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা সাধন জন্য। সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে। আপনি আশ্রয়হীন সহায়হীন, সম্পত্তিহীন অপরিচিত লোক হইয়া কি রূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন। রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই,—কি রূপে বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন?

আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণেই সক্ষম হয়েন, মানসও করেন, —অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস

করিবেন কেন? মান্যবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে এক জন অপরিচিত জমীদার পুত্র যাহা বলিবেন তাহা কি বিশ্বাসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার করিতে সম্মত হইলেও প্রেমদাস এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে,সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর মন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছিলেন প্রেমদাস তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী! সে কি সম্ভবে? যাহা হউক নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল সে শকুনিই বা কোথায়? প্রেমদাস যত ভাবিতে লাগিলেন,ততই অধিকতর ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। অনেক ক্ষণ একাকী সেই গঙ্গার তীরে পদচারণ করিতে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন "এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না। মুঙ্গেরে কিছু দিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।"

এই সকল চিন্তা ক্রমে অবসান হইতে২ প্রেমদাসের অন্যরূপ চিন্তা আসিতে লাগিল। বেগ প্রবাহিণী, কল্লোলিনী, অসংখ্য ঊর্ম্মিরাশি বিভূষিতা গঙ্গা নদীর দিকে যতই দেখিতে লাগিলেন প্রেমদাসের হৃদয়ে নব নব ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। শাস্ত্রে এই পাবনী নদীর মহিমা শুনিয়াছেন, কাব্যে গঙ্গার সৌন্দর্য্য বিষয় পাঠ করিয়াছেন, পুরাণে পুরাবৃত্তে সহস্র বার এই সুখদায়িণী, কলুষধ্বংশকারিণী নদীর স্তুতি পাঠ করিয়াছেন, লোক মুখে ও জনশ্রুতিতে এই নদীর অসংখ্য গুণ গান শুনিয়াছেন। যখন এই সমস্ত বিষয় প্রেমদাসের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, যখন সেই অনন্ত বীচিমালার সুশ্রাব্য গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, যখন সেই অগাধ, অসীম জলরাশিরদিকে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, যখন নিশার আগমনে শশধর উদিত হইয়া সুন্দর ঊর্ম্মিশ্রেণীকে নবোঢ়া বধূর ন্যায় সস্নেহে চুম্বন করিয়া সুবর্ণরাশি দ্বারা অলঙ্কৃত করিল, তখন প্রেমদাসের হৃদয় এক অভিনব উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল, অভিনব আনন্দে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের সমুদয় নীচাশয়, ক্ষুদ্র ভাব অন্তর্হিত হইতে লাগিল, মহৎ ভাব মহৎ আশয় জাগরিত হইতে লাগিল, সেই সায়ংকালীন অগাধ জলরাশির মহত্ত্ব, প্রেমদাসের হৃদয়ে অভিনব মহত্ত্বের ভাব উদ্রেক করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্দ লোচনেপ্রকৃতির শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সহসা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে প্রেমদাসের চিন্তা ভগ্ন হইল,—চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রালোকোজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে,—তাহার এক মাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না জানি না, কিন্তু প্রেমদাসের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়যন্ত্র সেই

সময়ে প্রকৃতির অনন্ত সঙ্গীতে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং অনুরূপ ভাবোত্তেজক সামান্য সঙ্গীতকেও তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীত বলিয়া বোধ করিলেন। সেই নাবিককে ইঙ্গিত করাতে সে নৌকা তীরে আনিল, ও প্রেমদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া, তাহাকে কিছুক্ষণ তরী সঞ্চালন করিতে বলিলেন, আর সেই গীত গাইতে আজ্ঞা করিলেন।

সেই গান এক বার, দুই বার, তিন বার গীত হইল। গঙ্গার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে নাবিক জিজ্ঞাসা করিল।

"মহাশয়! আপনাকে অগ্রে কখন এই নগরে দেখি নাই, আপনি কি সম্প্রতি আসিয়াছেন?"

প্রে "আমি অদ্যই আসিয়াছি?"

না। "আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়?"

প্রে। "আমাকে প্রেমদাস বলিয়া জানিবে, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায়।"

না। "নদীয়া জিলার কোন গ্রামে?"

প্রে। "ইচ্ছাপুর গ্রামে?"

না। "ইচ্ছাপুর গ্রামে! আপনি কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

প্রে। "কেন, তুমি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলে নাকি?"

নাবিক। ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, যেন কোন কথা লুকাইবার চেষ্টা করিল, পরে বলিল, "আমাদের কার্য্য বশতঃ সকল স্থানেই যাইতে হয়,—বৎসর২ বাদা হইতে চাল আনিতে যাইতাম। আপনার পিতার নাম কি? হইতে পারে আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি।" প্রেমদাস আপন পরিচয় সকলের নিকট লুকাইয়া রাখিতেন,—গুপ্ত ভাবেই দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেন,—কিন্তু নাবিকের নিকট পিতার নাম লুকাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না,—ভাবিলেন, আমি অনেক দিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই মাঝি সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল সংবাদ দিলেও দিতে পারে। বলিলেন, "ইচ্ছাপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা।" নাবিক শুনিয়া সহসা চমকিত হইল। পুনরায় চিত্তসংযম করিয়া বলিতে লাগিল, "হা নগেন্দ্র নাথ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ! তাঁহার অন্নে আমি কত দিন পালিত হইয়াছি।"

প্রে। "তুমি তাঁহার বাটীতে চাকর ছিলে নাকি?"

না। "অদ্য প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল আমি তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি,"—কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আপনার কি তখন প্রেমদাস নাম ছিল?"

প্রে। "তোমার নিকট আর লুকাইবার আবশ্যক কি,—প্রেমদাস আমার কখনই নাম নহে,—চির কালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ,—তবে অজ্ঞাতরূপে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, এই জন্য মধ্যে২ প্রেমদাস নাম ধারণ করি," "সুরেন্দ্রনাথ!" এই কথা মাত্র উচ্চারণ করাতে নাবিকের চক্ষে জল আসিল,—বলিতে লাগিল।

"আমি আপনাকে কত খেলা দিয়াছি, কতবার ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন

করিয়াছি,—যখন আপনার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর তখন আপনাকে ত্যাগ করিয়া আইসি। আপনার কি আমাকে মনে পড়ে ?

প্রেম দাসের বাল্যাবস্থায় বাড়ীতে যত ভৃত্য ছিল তাহাদের একে২ স্মরণ করিতে লাগিলেন,—কিন্তু এ নাবিক কখন ভৃত্য ছিল, স্মরণ করিতে পারিলেন না,—অথচ নাবিকের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

না। "এক্ষণে আমার পূর্ব্ব অন্ন দাতার সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্র নাথ ভাল আছেন ?"

প্রে। "আছেন।"

না। "তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে কোথায় ?"

প্রে। "আমার জ্যেষ্ঠের অনেক দিন হইল কাল হইয়াছে ?"

না। "তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না ?"

প্রে। "হাঁ।"

না। "তাঁহার কাল হয় কি রূপে ?"

প্রে। "ইচ্ছাপুরে বড় ব্যাঘ্রের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে।"

না। "মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন ?"

প্রে। "তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু বার্ত্তা শুনিয়া, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।"

নাবিক এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল,—দরবিগলিত অশ্রু ধারায় বস্ত্র সিক্ত হইল,—বলিতে লাগিল, "হায় মাতা ঠাকুরাণী!—আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন মাতা পুত্রকে কখন সেরূপ স্নেহ করে নাই। হা বিধাতঃ! আমার কি মৃত্যু নাই।"

প্রেমদাসের হৃদয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল। ভৃত্য কি কখনও প্রভুর জন্য এত ক্ষুন্ন হয় ? একবার ভাবিলেন অনেক দিনের ভৃত্য, হইলেও হইতে পারে, আর বার ভাবিলেন, নাবিকের ক্রন্দন সমস্তই প্রতারণা, নাবিক নগেন্দ্রনাথকে কখন জানিত না, অধিক অর্থ পাইবার জন কপট কৌশলে সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কপট দুঃখ দেখাইতেছে। কখন বা ভাবিলেন, অধিক অর্থ পাওয়া অপেক্ষাও কোন গভীরতর পাপ অভিসন্ধি থাকিতেও পারে। তৎক্ষণাৎ আবার মনে হইল এ মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ স্বর আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, নাবিক অবশ্যই পুরাতন ভৃত্য হইবে।

নাবিক সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক ভাব কিছু২ বুঝিতে পারিল। কিছু কষ্টে আত্ম সংযম করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল।

অনেক ক্ষণ অন্য কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নাবিক নীচ ব্যবসায়ী হইয়াও ভদ্রলোকের মত আলাপ পরিচয় শিখিয়াছে,—অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ বুদ্ধিও প্রদর্শন করিতেছে, ও অনেক প্রকার লোকের সহিত সহবাসে বিলক্ষণ সংসার জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। দুই এক ঘন্টা কথোপকথনে মনুষ্য হৃদয়ের গুপ্তচারী প্রবৃত্তি সকলের বিশেষ জ্ঞান প্রকাশ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই কথোপকথনে অতিশয়

সন্তুষ্ট হইলেন,—মনে যে শংসয় হইয়াছিল তাহা একেবারে দূর করিলেন, নাবিকের উপর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

নাবিক মধ্যে২ আপনার বিষয় ও দুই একটী কথা বলিতে লাগিল, মানব জাতির আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের কথা বিস্তর বলিতে লাগিল,—সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ হইতে লাগিল। নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখনং চন্দ্রকে ঈষৎ আবরণ করিতেছে আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্য জ্যোতি নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটী তারা লজ্জাবতী নব বধুর ন্যায় কখনং মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিস্তব্ধ, কেবল কখনং দূর হইতে একটী গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা বারিতেও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গায় আর একটী নৌকাও চলিতেছে না। কেবল সুরেন্দ্র নাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর শব্দে ভাসিতেছে।

হঠাৎ নাবিক আপন কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন বৃক্ষের মধ্য হইতে একটী আলোক নির্গত হইতেছে। নাবিক অনেক ক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আমার গৃহ,আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।"

নাবিকের গম্ভীর ভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্র নাথ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন দেখিলেন তাহার চক্ষু অশ্রুবিন্দুতে টস্ টস্ করিতেছে। সুরেন্দ্র নাথের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। স্নেহপূর্ব্বক সেই জল মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নাবিক তোমার হৃদয়ের ভাব আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল,—যদি আমার সাধ্য থাকে তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি কে যথার্থ করিয়া বল, সামান্য লোকের হৃদয়ে এরূপ ভাব থাকিতে পারে না,—সামান্য লোকের এরূপ সুবুদ্ধি, এরূপ কথোপকথনের ক্ষমতা সম্ভবে না।"

নাবিক আপন শরীর হইতে উত্তরীয় খুলিয়া ফেলিয়া আপন যজ্ঞোপবীত দেখাইল। বলিল "আমি এক্ষণে দরিদ্র মাঝি বটে কিন্তু আমি ব্রাহ্মণতনয়। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অনুগ্রহ বোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।"

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুই জনে নিঃশব্দে সেই তরী চালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

মসলা বাঁধা কাগজ

৪ র্থ সংখ্যা।

ধর্ম্মের বিচার।

রজনী গভীরা। পৃথিবী নিঃশব্দ,যেন অপাপবিদ্ধ,সংসার শিক্ষাশূন্য শিশুর ন্যায় স্নেহময়ী জননীর বক্ষে নিদ্রিত রহিয়াছে। কেবল মধ্যে২ চণ্ডালের হাড় সন্ সন্ শব্দে উড়িয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ পেচক গম্ভীর ধ্বনি করিতেছে; ক্বচিৎ একটা ক্ষুধাতুর কুকুর সাধারণ সমালোচকের ন্যায়, পেটের জ্বালায় চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করতঃ লোকের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে, এবং আপনার নীচতার পরিচয় দিতেছে। নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে; বৃক্ষশিরে কৌমুদী হাসিতেছে; চন্দ্রকরস্পর্শে পৃথিবী হাসিতেছে,আর দূরাগত সঙ্গীত শব্দ শুনা যাইতেছে। সঙ্গীত ধ্বনি অনেকদূর হইতে শুনা যায়, তাহাতে রজনী গভীরা। সুকণ্ঠজাত সঙ্গীত সকল সময়েই মধুর, তাহাতে রজনী গভীরা। মৃত্যুর কথায় সকল সময়েই ভয় হয়, তাহাতে রজনী গভীরা। আকাশ ব্যাপিয়া সঙ্গীত শব্দ যে দিক হইতে আসিয়া হৃদয়ে ডুবিতেছিল সেই দিকে কর্ণ ফিরাইয়া শুনিলাম।—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।" গায়ক থামিল কিন্তু হৃদয় থামিল না। ধমনী মধ্যে শোণিত স্রোতঃ যেন অপেক্ষাকৃত ধীরে২ বহিতে লাগিল। এমন সময়ে এমন গম্ভীর কথা শুনিলে কার মন না চিন্তামগ্ন হয়? আমি ভাবিতে লাগিলাম—শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর দিনই বটে; কিন্তু ভয়ঙ্কর বলি কেন? যাহা বিশ্বব্যাপী, অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয় তাহাতে ভয় কি? কি ভয়, কেন ভয়, তাহাত জানিনা; কেবল জানি যে মৃত্যুর নাম শুনিলেই হৃদয় অবসন্ন হয়। বোধ হয়, বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য—মৃত্যুর আনুসঙ্গিক আড়ম্বরই ভয়ের কারণ। এ কথা মনে না লাগে সেই সকল একবার মনে করিয়া দেখ—দেখ হৃদয় পর্য্যাকুল হয় কি না? একবার মনশ্চক্ষে দেখ;—তুমি মৃত্যুশয্যায় শয়ান রহিয়াছ, পার্শ্বে বসিয়া তোমার পুত্রকন্যা অবিরল নয়ন জলে ভাসিতেছে; তোমার হতভাগিণী জননী শিরে করাঘাৎ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হাহাকার করিতেছেন; তোমার বন্ধুবান্ধব বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়া আছেন; প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীগণ আপন২ কোন প্রকার ক্ষতির উল্লেখ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন—কেহ বলিতেছেন, "আহা! লোকটি বড় ভদ্র ছিল, অর্থাৎ তোমাকে তিনি অনেকবার কটূক্তি এবং আপমান করিয়াছেন, তুমি বিনাবাক্য ব্যয়ে সহ্য করিয়াছ,—আর কে তেমন করিবে? ইত্যাদি। আর ঐ যে একটি বিশুষ্কমুখী যুবতী নিস্তব্ধ হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া আছে; মুখে কালিমা পড়িয়াছে; চক্ষের জলে সর্ব্বাঙ্গ স্নাত করিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে এক একবার তোমার ব্যাধিক্লিষ্ট মুখপানে তাকাইতেছে, আবার গণ্ড বহিয়া, বক্ষ ভিজাইয়া অশ্রুধারা বহিতেছে,—ও কে? তোমার আসন্ন বৈধব্য দুঃখিনী প্রণয়িণী। যাহার মুখ ম্লান

দেখিলে এক দিন জগৎ শূন্য দেখিয়াছ, মনে করিয়াছ যদি প্রাণ পর্য্যন্ত দিলে মুখ প্রসন্ন হয়, তবে তাহাই করি, তার এই দশা। সে ঐ আজি হইতে সংসারের সুখের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইল—এই সকল মনশ্চক্ষে দেখ। দেখিয়া যদি তোমার হৃদয় অবসন্ন না হয়, তবে তুমি মনুষ্যকুলের কলঙ্ক; হয় মনুষ্য নাম তোমার অযোগ্য, নয় তুমি মনুষ্য নামের অযোগ্য—তুমি দেবতা অথবা পিশাচ।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য স্বার্থপর—আপনার সুখের শেষ হইল বলিয়াও বটে। এখন তুমি—

" সুখস্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
সব জনমের মত ফুরাবে ;"

লোকে এমনই হাসিবে কাঁদিবে, চলিবে ফিরিবে; কোমল আকাশে শীতল চাঁদ, বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ পাখী, এই আমোদ এই আহ্লাদ সব থাকিবে, কেবল আমি থাকিব না—হয়ত কোথাও থাকিব না। আজ আমি এই সুখের মধ্যে এক জন, কালি আমি কেহই নই, কিছুই নই।

এই দুঃখময় সংসারে কত দুঃখ সহ্য করিয়াছি, এই মজার সংসারে কত সুখভোগ করিয়াছি—কতবার কঁদিয়াছি কতবার হাসিয়াছি। সুখের স্থান, দুঃখের স্থান উভয়ই মনুষ্যের প্রিয়। বাল্যকালে স্নানাহার ভুলিয়া, পিতা মাতার স্নেহগর্ভ ভর্ৎসনা ভুলিয়া, গুরু মহাশয়ের বেত্র ভুলিয়া যে সকল স্থানে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতাম তাহার জন্য কাঁদি ; যে স্থানে প্রাণের অধিক ধনের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সংসার অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, সে স্থানের জন্যও কাঁদি। সুতরাং এই সংসার পরিত্যাগ করিতে চাহি না—পরিত্যাগের কথা মনে হইলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু মরিলে কি হয় ? সকলের মুখেই শুনিতে পাই, পাপীর নরকবাস এবং পুণ্যাত্মার স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু স্বর্গ এবং নরক কি তাহা অদ্যাপি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ ইহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন না। সকলেই বলেন আত্মা অভৌতিক এবং নিরাকার ; যাহা অভৌতিক তাহার শাস্তি কি রূপে হইতে পারে তাহা আমাদের স্থূল বুদ্ধির অগোচর। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বা উক্ত হইয়াছে তাহা অবশ্য অনুমান মাত্র, কিন্তু কোন অনুমানই পরিষ্কার এবং যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীরাই আজ্ কাল্ আমাদের দেশের মুখপাৎ—অন্ততঃ তাঁহারা ঘরে ঘরে আপনাদিগকে ইহাই বলিয়াই জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরলোকসম্বন্ধে ইহাঁদের মত, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, আমরা স্থির করিতে পারি নাই। নানা মুনির নানা মত। ইহাঁদের নির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্মপুস্তক নাই সুতরাং নির্দ্দিষ্ট মতও নাই। যাহার যাহা মনে আসে সে তাহাই বিশ্বাস করে এবং যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া তাহা সমর্থন করে। যে ধর্ম্মের মূলে এমন কোন ধর্ম্মপুস্তক নাই যাহা লোকে ঈশ্বরলব্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে, যে ধর্ম্ম কেবল যুক্তি এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম যে কতদূর প্রবল হইবে তাহার পরিচয় ইতিহাস দিতেছে।

আমরা এক্ষণে সে কথার আলোচনা করিব না।

উপস্থিত বিষয়ে ভয়ানক মতভেদ। কেহ বলেন মৃত্যুর পরই বিচার হইয়া স্বর্গ নরক বিহিত হইবে ; কেহ বলেন স্বর্গ নরকবিধানের পর বিচার হইবে ; কেহ বলেন বিচার হইবে না। কেহ পুনর্জ্জন্ম মানেন ; কেহ বলেন, যে পুনর্জ্জন্ম মানে সে ঘোর মূর্খ। কোন্ মত ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত তাহা কেহই জানে না। যে মতেই বিশ্বাস কর না কেন, কোন না কোন ব্রাহ্ম গালি দিবেনই। এদিকে সীলা, অপরদিকে চ্যারিব্ডিস্—ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুম্ভীর—যে দিকে যাও, বিপদে পড়িতে হইবেই। তবে যদি ব্রাহ্ম হইয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষে থাকিতে পার, তবেই মঙ্গল।

এক দিবস এক জন ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে অথবা নরকে থাকে ; কিন্তু যাহা নিরাকার তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকা কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অবস্থিতি কল্পনা করিলেই যে আকার নির্দ্দেশ করা হয়, অবস্থিতি কল্পনা করিলেই যে ভৌতিক হইয়া দাঁড়ায়, অবস্থিতি কল্পনা করিলেই যে আত্মা আর আত্মা থাকে না, ইহা কেহই ভাবেন না। পাপীর আত্মা অনন্ত কাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, নরকে পচিবে ;—যাহা অভৌতিক তাহার পচন কি প্রকার ? নরকাগ্নি কি প্রকার অগ্নি ? অভৌতিক এবং নিরাকার অগ্নি না কি ? আর পুণ্যবানের আত্মা পরম সুখে স্বর্গে থাকিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের প্রেমপরিপূর্ণ জ্যোতিঃ অবলোকন করিবে এবং ঈশ্বরের গুণগান করিবে। জ্যোতির মধ্যে কি প্রকারে প্রেম থাকে তাহা যিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার বুদ্ধির এবং দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার সহস্র প্রশংসা করি, কিন্তু আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া স্বীকার করিতেছি, ততদূর তীক্ষ্ণতা আমাদের নাই। আত্মা জ্যোতির্দর্শন করে, বিভূ গুণ গান করে ;—আত্মারও শরীরের ন্যায় চোক মুখ আছে না কি ?

এই রূপ নানা বিষয় ভাবিতে২ নিদ্রা আসিয়া, চক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ইন্দ্রিয়গণকে অকর্ম্মণ্য করিল। নিদ্রার ঘোরে একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম।

আমি কোন পর্ব্বতশিখরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছি। অকস্মাৎ দেখিলাম, অদূরে এক প্রশান্ত মূর্ত্তি। সম্ভাষণ অভিলাষে মন্দ২ পাদবিক্ষেপে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম দেবমূর্ত্তি। সভয়ে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলাম। দেবতা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "প্রতিনিবৃত্ত হও ; তোমার এস্থানে আসিবার অধিকার নাই।" সে গম্ভীর শব্দে শরীর কন্টকিত হইল। আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কোন স্থান ?।" দেবমূর্ত্তি কোন উত্তর না দিয়া ভ্রূকুটী করিলেন। ভয়ে প্রাণ যেন সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু কৌতূহল কেমন প্রবল, এ স্থানের পরিচয় না জানিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। অনেক অনুনয় করায় দেবমূর্ত্তি বলিলেন "এ মৃত ব্যক্তির বিচার স্থান ; তুমি ত্বরায় পলায়ন কর।" বিচার দেখিতে নিতান্তই ইচ্ছা হইল, অথচ অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে কৌতূহল ভয়কে পরাজিত করিল

—সহসাগত ভাব, বদ্ধমূল ভাবের নিকট কতক্ষণ তিষ্ঠিবে? ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, এক বার যত্ন করা উচিত। দেবমূর্ত্তি এবার কিছু ক্রুদ্ধভাবে হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা যাইতে বলিলেন। আমি সভয়ে অথচ মনে মনে সাহস করিয়া, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া বদ্ধকর-পুটে অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম —বিচার দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া যত-দূর সাধ্য কাতরতা প্রকাশ করিলাম। দেবশরীরে দয়ার সঞ্চার হইল। অনেক ক্ষণ আমার মুখপানে তাকাইয়া বলি-লেন "নিতান্ত দেখিবে।" তখন আমি, বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠশা-লার ছাত্রের ন্যায়, ইন্‌স্পেক্‌টরের নিকট মডেল্ স্কুলের পণ্ডিতের ন্যায়, ভিক্ষা-প্রার্থী কন্যাদায়ের ন্যায়, দাওরার আ-সামীর ন্যায়, সাহেব মুনিবের কাছে বাঙ্গালী কেরাণীর ন্যায়, চতুর্থ পক্ষের যুবতী ভার্য্যার নিকট বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য স্বামীর ন্যায়, দীনভাবে, ক্ষীণস্বরে বলি-লাম "অনুমতি পাইলে দাস চরিতার্থ হয়।"

দেবমূর্ত্তি "আইস" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি পশ্চাৎ২ চলিলাম। কিছু দূর গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখিতে পাইতেছ ?।" আমি এ দিক উদিক তাকাইয়া বলিলাম 'না।' দেবতা সস্মিত মুখে আমার চক্ষে একবার পদ্ম-হস্ত বুলাইলেন। দেবকরসংস্পর্শে আ-মিও যেন দেবত্ব পাইলাম—পার্থিব ভাব দূর হইয়া দিব্য চক্ষু হইল। তখন দেখিলাম, অদূরে অত্যন্ত লোকের জনতা। নিকটস্থ হইলে "এই খানে বিচার দেখ; আমি আবার আসিয়া অন্যান্য স্থান দেখাইব" বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া সকল দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম সম্মুখে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধপ্রভ সিংহাসন। তাহাতে স্বয়ং ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তির উদ্রেক হয়। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়—শরী-রের লাবণ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার পার্শ্বে, সিংহাসনের অতি নিকটে কয়েক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আকৃতি দেখিয়া এবং ভাবগতিকে বোধ তাহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ অনুচর। পুরোভাগে, কিঞ্চিৎ দূরে নানা বেশের, নানা বর্ণের, নানা দেশীয় লোক—একে২ সিংহাসনের নিকটে আসিয়া আত্ম কর্ম্ম বিবৃত করিতেছে; যে স্বর্গের উপযুক্ত সে স্বর্গে প্রবেশ করিতেছে,যে পাপী সে নরকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কেহ বা পৃথি-বীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হই-তেছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক স্বর্গে যাইবার উপায় নাই। কেমন ঈশ্ব-রের অভাবনীয় আশ্চর্য্য নিয়ম, বিচারা-সনের সম্মুখে দাঁড়াইলে, আর মিথ্যা কথা মুখ হইতে নির্গত হয় না—সত্য কথা আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে।

সকল কথা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য সিংহাসনের অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম,—

একজন গৌরবর্ণ পুরুষ অগ্রসর হই-লেন। তাঁহার শরীর স্থূল, উদর অসা-ধারণ স্ফীত, নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেও কষ্ট হইতেছে। পায়ে ইংরেজী জুতা, বিলাতী ষ্টকিং পরিধান নবাবী আমলের

ইজের, গায়ে একটী সাহেবী কামেজ, তাহার উপর চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গীর ন্যায় চোস্ত চায়নাকোট্, তাহার উপর শান্তিপুরে অতি সুক্ষ্ম উড়ানী। মস্তকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালীন পাগড়ি। বেশ এবং শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ করিলাম, ইনি বাঙ্গালী বাবু হইবেন। তিনি বাজখাঁই শুরে আরম্ভ করিলেন "আমি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর যথেষ্ঠ উপকার করিয়াছি। দেশে এবং বিদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজপুরুষদিগের হাতে উপাধি প্রাপ্তি কামনায়—বিষ্ণু —দীন প্রজাদিগের কষ্ট বিমোচনার্থ লক্ষ২ মুদ্রা অর্পণ করিয়াছি। ভিক্ষুক চাকর এবং নির্ধন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কাহারও উপর কখন জ্ঞানকৃত অত্যাচার করি নাই—এমন কি, গৃহিণী ব্যভিচারিণী জানিয়াও কোন মন্দ কথা বলিয়া তাঁহার মনে অনর্থক কষ্ট দিই নাই। দানাদি প্রায় অন্তঃপুরেই, বীরত্ব প্রকাশ প্রায় গৃহিনীর নিকটেই হইত। বেশ্যা, দ্রাক্ষরস এবং ব্যসন ছাড়া আর কোন বিষয়েই আসক্তি ছিল না। ধর্ম্মেও বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল; সনাতন আর্য্যধর্ম্ম রক্ষণার্থ ধর্ম্মসভায় নিয়মিত রূপে চাঁদা দিয়াছি এবং সভার অধিবেসন দিনে পুত্র পৌত্রাদি সঙ্গে করিয়া সভাস্থ হইয়া সকলের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়াছি। মাতৃ শ্রাদ্ধে এবং পিতৃ শ্রাদ্ধে বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় করিয়া প্রতিনিধির দ্বারা শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ক্রটি হয় নাই। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়াছি এবং প্রতি তীর্থে রীতিমত ক্রিয়াকলাপও করিয়াছি; তবে রক্তমাংসের শরীর, বৃন্দাবনে ব্রজবালা এবং কাশীধামে কুমারীদিগকে দেখিয়া মন কেমন চঞ্চল হইয়াছিল। আত্ম-দমনে অক্ষম ছিলাম না, কিন্তু প্রাণ যায়। মহামহোপাধ্যায় সর্ব্ব শাস্ত্র বিসারদ পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইলাম। তাঁহারা বলিয়া দিলেন "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—মনের অনল নিবাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। এ স্থলেও শাস্ত্র মানিয়াছি। দেবতায় অচলা ভক্তি;—পূজার উপলক্ষে যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে সেই বাড়ীতেই একটি করিয়া প্রণামীর টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি; সমকক্ষ লোক হইলে স্বয়ং গিয়া প্রণামীর সঙ্গে একটী করিয়া প্রণামও বাদ যায় নাই—মস্তক অবশ্য ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধেই থাকিত, নহিলে চুলে ধুলা লাগে এবং ভুঁড়ি ফাটিয়া যায়। একবার চিকিৎসককে উৎকোচে বশীভূত করিয়া সদ্য প্রাণান্তক হলাহলের দ্বারা কোন সম্পন্ন আত্মীয়ের মৃত্যু সংসাধিত করিয়া, তাঁহার বিধবা স্ত্রী এবং নিরাশ্রয় সন্তানদিগকে পথের ভিখারী করিয়া দিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরেই ভক্তিভাবে একটি শিবস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলাম"। এই বলিয়া বাবু নিরস্ত হইলেন। ধর্ম্ম আরক্ত লোচনে পার্শ্বস্থ একজন অনুচরের প্রতি তাকাইলেন অমনি সে, বাবুকে লইয়া গিয়া নরকে ফেলিল। দেবদূত তাঁহাকে যখন লইয়া যায় তখন তিনি স্বভাব গুণে অনেক বার চক্ষু রক্তিমাবর্ণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না।

তদনন্তর দীনভাবে, সভয়পাদবিক্ষেপে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইল। এ ব্যক্তি সিংহাসনের অতি নিকটে আসিয়া

বলিল "প্রভো! আমায় নরকে ফেলিবেন না। আমি মহাপাপী, কিন্তু আমি আমার দুষ্কৃতের জন্য অন্তরের সহিত চিরদিন অনুতাপ করিয়াছি। কপালের দোষে সংসারে নির্ধন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম পুণ্য উপার্জ্জনের উপায় ছিল না। কিন্তু এক দিন ভিক্ষা লব্ধ তণ্ডুল মুষ্টি পাক করিয়া আহারে বসিব, এমন সময় একজন আমা অপেক্ষাও দিন হীন দুর্ভাগা আসিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে একবার আমার পানে, একবার প্রস্তুত অন্নের পানে চাহিতে লাগিল। তখন আমি ক্ষুধায় চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি, কর্ণে তালা ধরিয়াছে, কিন্তু দেখিলাম আমার অপেক্ষা ইহার প্রয়োজন অধিক, দেখিলাম আহারাভাবে ইহার শরীর আমার অপেক্ষা শত গুণ শীর্ণ; প্রস্তুত অন্নের অর্দ্ধ আপনি খাইলাম, অর্দ্ধ আগন্তুককে দিলাম। কিন্তু দীন হীনের পুণ্যের উপায় যেমন অল্প, তেমনি পাপেরও প্রলোভন, অবসর এবং সামর্থ্য অল্প। এক দিন এক নির্ধন ব্যক্তি কোন দুর্দ্দান্ত ধনবান জমীদারের ষড়যন্ত্রজালে পড়িয়া ফাঁসী যাইতেছিল। বিচক্ষণ হাকিম উৎকোচ পাইয়া জমীদারের অনুকূল ছিলেন। আমি বিলক্ষন জানিতাম সে নির্দ্দোষী, অথচ মিথ্যা কথা না বলিলে তার প্রাণ রক্ষা হয় না; আমি মিথ্যা বলিলাম। কিন্তু প্রভো! আমি ইহার জন্য অনুতাপ করিয়াছি"—ইহার বাক্য শেষ না হইতেই ধর্ম্ম বলিলেন "অনুতাপের আবশ্যক ছিল না, তুমি যাও।" স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইল।

তৎপরে এক জন হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ গোস্বামী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শরীর বিলক্ষণ মাংসল এবং সবল। পরিধান পট্টবস্ত্র, পট্ট বস্ত্রের উত্তরীয়; দক্ষিণ হস্তে হরিনামের ঝুলি, দ্বাদশাঙ্গে গোপীমৃত্তিকার তিলক; কেশগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল এবং যত্নবিন্যস্ত। একটী চৈতন্যও আছে, কিন্তু বিশেষ প্রনিধান না করিলে সেটি দৃষ্টি গোচর হয় না—যেন অগত্যা রাখিয়াছেন। অঙ্গ মার্জ্জিত এবং গন্ধদ্রব্য সুবাসিত; অধরৌষ্ঠ নিরন্তর স্মিতরঞ্জিত, নয়ন লোলাপাঙ্গবীক্ষণরত, দৃষ্টি চঞ্চল এবং মদন লালসা ব্যঞ্জক। ইনি নির্ভয়ে এবং সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি নিত্যানন্দ বংশীয়। এ জীবন বিষ্ণুসেবায় এবং সাধুসেবায় অতিবাহিত করিয়াছি। উপদেশ, দীক্ষা, শাসন এবং কখন২ দৃষ্টান্তের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের শিক্ষা দিয়াছি। অবশ্য ধর্ম্মের সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারি নাই, ধর্ম্মের সকল উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু যতদূর পারিয়াছি করিয়াছি। অনেকবার শিষ্যালয়ে কৃষ্ণের প্রধান২ লীলার অভিনয় করিয়াছি। একবার কেবল কলিকাতার এক পাষণ্ডের বাটীতে গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে হইয়াছিল। কখন যদি কোন শিষ্য কোন আয়াস সাধ্য সৎকর্ম্মের উদ্যম করিয়াছে তাহা হইলে দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাহার শ্রম লাঘব জন্য বলিয়া দিয়াছি 'কোন আবশ্যক নাই; সংকল্পিত কার্য্যে যে ব্যয় স্থির করিয়াছ তাহার দশগুণ অর্থ ভক্তিভাবে ইষ্টদেব গৃহপ্রতীষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলেই বিনাশ্রমে আকঙ্ক্ষীত ফললাভ হইবে।' শিষ্য ইতস্ততঃ করিয়াও অবশেষে আমার পরামর্শই গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইত, কারণ ভজনামৃতে স্পষ্ট লেখা রহীয়াছে,

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টেন কশ্চন।"

এই রূপ অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছি। একবার কেবল কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে বন্ধুপক্ষে কিঞ্চিৎ আমোদ করিয়া এক জন যবনী নৃত্যকীকে লইয়া আমোদ করিতে প্রথম নম্বর এক্লার ঝোঁকে, লক্ষ্মীনারায়ন-শিলার মস্তকে মন্টীথের দোকানের বুটসমন্বিত পাদস্পর্শ হইয়াছিল এবং বাইজী ঠাকুরদের সিংহাসনের উপর ঢলিয়া পড়িয়া উদরস্থ সুরাসিক্ত গো এবং কুক্কুট মাংস তুলিয়া বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া ফেলিয়াছিল। আর একবার এক অনাথা বিধবাকে প্রতারণা জালে বদ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রাপ্ত অর্থের সহস্রাংশের দ্বারা তুলসীর মালা ক্রয় করিয়া সাধুগণকে বিতরণ করিয়াছিলাম।" গোস্বামী প্রভু থামিবামাত্র দূতেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ড নামক নরকে নিক্ষেপ করিল।

তদনন্তর এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বর্ষাকালীন ভেকের ন্যায় লম্ফে২ বিচারাসনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "প্রভো, আমি সংসারে থাকিয়া শতং ছাত্রকে বিদ্যা দান করিয়াছি। যেখানে সভা হইয়াছে সেইখানেই শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছি। আবশ্যক হইলে হাতাহাতি, অবশেষে লাঠালাঠি পর্য্যন্ত করিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়াছি। বড়২ লোকের বাটীতে দুর্গা পূজায় চণ্ডীপাঠে ব্রতী হইয়া মধ্যে মধ্যে একেবারে তিন চারি পাতা উল্টাইয়াছি সত্য, কিন্তু সে কেবল অধিক ক্ষণ পড়িতে হইলে পাছে অভক্তি জন্মে এই ভয়ে; এবং প্রাতঃস্নানে অত্যন্ত ক্লেশ হয় বলিয়া হস্তমৃত্তিকা করিতে২ কপালে ঊর্দ্ধরেখা টানিয়া যাইতাম, অবশ্য কর্ম্মকর্ত্তা মনে করিতেন—এ গঙ্গা মৃত্তিকা। দায়ভাগের ব্যবস্থা লইতে আসিলে, যে পক্ষ অধিক টাকা দিয়াছে তাহারই অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়াছি, নহিলে ব্রাহ্মণী 'অলঙ্কার২' করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতে দেন না। এক দিবস ব্রাহ্মণী কঙ্কনের জন্য ধূম লাগাইলেন। হাতে টাকা নাই, কি করি? অগত্যা চতুষ্পাঠীস্থ এক জন ছাত্রের বুচকি খুলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে কয়েকটী টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। কি করিব প্রভো, সেঁকরা ডাকিয়া কঙ্কন তৈয়ার করিতে না দিলে আমার প্রাণ বাঁচিত না—রাত্রে ব্রাহ্মণী আমাকে একা ঘরে পাইবামাত্র কীচক বধ করিতেন। এক বার কেবল প্রধান বিদায়ের লোভে এক জন নব্য বাবুর বাটীতে পেঁয়াজ দিয়া কুক্কুট মাংস ভোজন করিয়াছিলাম, কিন্তু বাটী আসিয়াই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুঁথি দেখিয়া দশবার গায়ত্রী পাঠ করিয়াছিলাম। আর এক দিন এক ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে বিরাট পাঠের ভার লইয়া, কার্য্য দিনে পুঁথি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পাছে কার্য্য অঙ্গহীন হয়, অতএব শৃঙ্গারতিলক পড়িয়া কার্য্য সমাধা করিলাম।" দেবদূতেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া দ্বিতীয় কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।

তদনন্তর শোনিতাক্ত কলেবর অন্য এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল "প্রভো-আমি ঘোর নারকী। যৌবনাবস্থায় অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম।

এক দিবস একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানকে বক্ষে করিয়া যাইতেছিল; শিশুর গায়ে দুই একখানি অলঙ্কার ছিল; লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উভয়কেই বধ করিয়া অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিলাম। কিন্তু মৃত্যুকালে সেইশিশু যে কাতর দৃষ্টিতে আমা পানে চাহিয়াছিল এবং কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, সে কাতর দৃষ্টি, সে মর্ম্মভেদী স্বর আর ভুলিতে পারিলাম না। সেই দিন হইতে কৃত পাপের জন্য অনুতাপ হইল। মনে করিলাম, আজি হইতে প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, প্রায়চিশ্চত্ত করিবার সময় পাইলাম না। সেই সময়ে বিদেশীয় শত্রুগণ, জন্ম ভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার জন্য সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিল। আমরাও সশস্ত্র সজ্জিত হইলাম। যতক্ষণ ধমনীতে শোনীত ছিল, শরীরে সামর্থ্য ছিল, ততক্ষন প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-শোনিত দ্বারা মাতৃভূমির ধার শুধিয়া, রণসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম। প্রভো, অধমের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন, আমি প্রায়শ্চিত্তের সময় পাই নাই।” স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল। ধর্ম্ম সসম্ভ্রমে বলিলেন “যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।” স্বর্গের নবতিতম দ্বার মুক্ত হইল। ইহা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। হায়, এ পৃথিবীতে কেবল বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ সুখ নাই।

তদনন্তর এক জন যুবা অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মমতে * বলিতে লাগিলেন “আমি বাল্যকালে অবশ্য হিন্দু ছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে উইল্‌সনের বাড়ীর মহাপ্রসাদ এবং করিম্‌বক্‌সের দোকানের কুক্কুট মাংস ব্যতীত এ বাঙ্গালী জন্ম পবিত্র করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, যখন বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অপার মহিমা বলে লেখাপড়া না শিখিয়াও পণ্ডিত হওয়া যায়, তখন সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম। আমি মাতৃভূমির মহান্ মঙ্গল সাধন করিয়াছি, কারণ কেহ বুঝিতে পারুক্ বা না পারুক্ আমি সভায় বক্তৃতা করিতাম এবং ইংরেজ ও হিন্দুদিগকে গালিগালাজ করিতাম। ধর্ম্মে একান্ত অনুরাগ ছিল, কারণ নিয়ম মত শ্মশ্রু রাখিয়াছিলাম, এবং যত দিন কর্ম্ম স্থানে থাকিতাম, তত দিন যজ্ঞোবীত থাকিত না, কিন্তু বাটী ফিরিয়া গেলে গোময় সেবন করিতে হইত, নহিলে গৃহিণী ঘরে লইতেন না। সমাজেও প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পরে আধ্ ঘন্টাকাল কোন ক্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতাম; অবশ্য মধ্যে মধ্যে আড় চক্ষে চাহিয়া দেখিতাম, আর সকলে চক্ষু খুলিয়াছে কিনা? পণ্ডিত বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল, কারণ যে ইংরেজী জানে না তাহার কাছে ইংরেজী ছড়াইতাম এবং মধ্যে মধ্যে পদ্য লিখিয়া, গৃহিণীর নাম দিয়া সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিতাম। চস্‌মা এবং শ্মশ্রুর বলে সমাজের উপাচার্য্য হইয়াছিলাম। আমার বাসার অনতিদূরে একটী সুন্দরী বেশ্যা থাকিত;

* “ব্রাহ্মমতে।” আমি এ শব্দটীর এই রূপে অর্থ করিয়াছি, যথা ‘বিকৃত স্বরে সহস্র রকম অঙ্গভঙ্গী এবং মুখভঙ্গীর সহিত, এবং কথিত বাক্য গুলির অর্দ্ধেক ‘বোধ হয়।’ কেহ যদি ইহার অপেক্ষা সদর্থ করিতে পারেন তাহা হইলে আমার নিকট পত্র লিখিলে অনুগৃহীত হইব।—চঃ

সমাজে যাতায়াত সময়ে এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় শীতল করিতাম। এমন সুন্দর রূপ ঈশ্বর সেবায় না লাগে ইহা অতি দুঃখের বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ রাত্রে, উপাসনার পর, অন্ধকারে প্রচ্ছন্নবেশে, গোপনে তাহার গৃহে যাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে এতদূর অনুরাগ যে তাহাকে মাসিক কিছু কিছু বেতন পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আমি ইহার প্রমাণ দিতে পারি। সেই যুবতীর গৃহের ভিত্তিতে, দ্বারে, কবাটে, চৌকাটে, খাটের বাজুতে "ওঁ তৎসৎ" লেখা আছে। অবশেষে কতক গুলা দুষ্ট ছোঁড়া জুটিয়া———"। আর বলিতে হইল না। ভীষণ নরকাগ্নি পর্ব্বত কম্পিত করিয়া ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। সভয়ে দেখিলাম, সেই তরল অগ্নি মধ্যে হস্ত পরিমিত আগ্নেয় কীট মুখব্যাদান করিতেছে এবং সর্পবৎ গর্জ্জন করিতেছে। ব্রাহ্ম মহাত্মা ব্যাকুল ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সেই অগ্নি আসিয়া ইহাঁকে গ্রাস করিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। তখন ধর্ম্ম বিচারাসন হইতে বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ইহার মধ্যে যত উকীল, মোক্তার, গুরু, পুরোহিত, রেলওয়ে কর্ম্মচারী এবং বাঙ্গালী হাকিম আছে, তাহাদের কথা শুনিবার আবশ্যক নাই। ইহাদিগকে কুম্ভীকুণ্ড নামক নরকে নিক্ষেপ কর"। দেবদূতেরা তাহাই করিল।

তদনন্তর রুক্ষকেশী, জীর্ণ মলিন বসনা শীর্ণদেহা, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি একটী হিন্দুবালা মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপে আসিয়া, প্রভাতের মলিন শশাঙ্কের ন্যায়, প্রদোষ কমলিনীর ন্যায়, নিদাঘ-সন্তপ্ত কুসুমের ন্যায় সিংহাসন সমীপে দণ্ডায়মান হইল—বোধ হইল যেন বিরহ, দেহ বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উন্মাদিনী অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"আমি বাঙ্গালীর মেয়ে; কিসে পাপ হয়, কিসে পুন্য হয় তাহা বলিতে পারি না। অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হওয়া আমাদের দেশাচার বিরুদ্ধ এবং নিন্দাজনক, সুতরাং বঙ্গ মহিলার জীবনে, ঘটনা অতি অল্প। এক দিনের কার্য্য বলিলেই সমস্ত জীবনের কার্য্য বলা হয়। আমার জীবনে, মনে করিয়া রাখিবার উপযুক্ত কোন ঘটনাই ঘটে নাই। তবে ইহা বলিতে পারি যে, যত দিন সংসারে ছিলাম তত দিন স্বামীর শ্রীচরণ ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। প্রাণপণে স্বামীর সেবায় যদি পুণ্য থাকে, তবে অবশ্য পুণ্যোপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু কপালের দোষে, যে নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া সংসার সাগরে জীবন পোত বাহিতে ছিলাম, সে স্নিগ্ধপ্রভ নক্ষত্র ডুবিল; যে লতার দ্বারা সংসারে মন বাঁধিয়াছিলাম, সে লতা ছিঁড়িল—স্বামীর মৃত্যু হইল। যাঁহাকে সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখিয়া, সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়াও আশা মিটিত না, অন্তর তৃপ্ত হইত না—সেই জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণের নিকট প্রাণ ধরিয়া জন্মের শেষ বিদায় লইতে পারিলাম না। রমণীর একমাত্র দেবতার স্বরূপ যে স্বামী, তাঁহার চরণ ধূলি শরীরে মাখিয়া, তাঁহার ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ বুকে করিয়া, পরমানন্দে জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিয়া সকল যাতনার শেষ করিলাম"।

পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর কথা শেষ হইতে না হইতে অমরগণ তাঁহার মস্ত-

কোপরি চন্দনসম্পৃক্ত কল্প দ্রুম প্রসূন বর্ষণ করিলেন। দেবদূতেরা সসম্ভ্রমে স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুর বীনার সঙ্গে মধুর কণ্ঠ মিসাইয়া মধুর সঙ্গীত গাইল। সপ্তর্ষিগণ তারস্বরে শ্রুতিপাঠ করিলেন। ধর্ম্ম স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া পথ প্রদর্শক হইলেন। দেবগণ মঙ্গলধ্বনি করতঃ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সাধ্বী স্বর্গে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বপরিচিত সেই দেবতা আসিয়া আমায় ডাকিলেন। আমি ত তাঁর কৃপায় তাঁর সঙ্গে স্বর্গ প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, কুসুমাস্তৃত পথের উভয় পার্শ্বে মন্দাকিনীজলপূর্ণ সারি২ স্বর্ণকলস, তদুপরি অম্রশাখা। দিব্যাঙ্গনাগণ চামর ব্যজন করিতেছে, আর সাধ্বী ধীরে২ অগ্রসর হইতেছেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহন করিয়াছি বলিয়া মনে২ একটু গৌরব হইল।

আমার প্রদর্শকের নিকট স্বর্গের অন্যান্য স্থান দেখিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। যাইতে২ ফ্রান্‌সিস্কো ডি কুইভিডো ভিলেগস্ নামক এক জন হিস্পানীয় কবির 'ভিজন্স্ অব্-হেল' নামক গ্রন্থের একটী কথা মনে হইল। কবি, নরকের অন্যান্য স্থান দেখিয়া রাজকারাগার দেখিতে চাহিলে, কারাধ্যক্ষ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। কুইভিডো বলিলেন "রাজকারায় বোধ হয় অতি অল্প লোকই আছে?" কারাধ্যক্ষ বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন "কি! অল্প লোক! রাজা মাত্রেই ঐ স্থানে আছে।" এই কথার সত্যাসত্য জানিবার জন্য দেবতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "রাজা মাত্রেই যে নরকে যায় তাহা নহে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত দুই চারি জন রাজা স্বর্গেও আসিয়াছে, কিন্তু হিন্দু রাজ্ঞী ব্যতীত অন্য জাতীয় কোন রাজ্ঞী কখন স্বর্গে আইসে নাই।" স্বর্গের অন্যান্য অনেক স্থান দর্শন করিলাম; দেখিলাম, স্বর্গে পুরুষের ভাগই অধিক, স্ত্রীলোক অতি অল্প। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখিলাম সকলেই হিন্দুরমণী। অন্য জাতীয়— একটীও স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম না। জন্মভূমির মঙ্গলসাধনে বদ্ধপরিকর ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ, তোমাদিগকে বলি, 'স্ত্রী স্বাধীনতা২' করিয়া চীৎকার না করিয়া, একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না? ইংরেজ রাজপুরুষ, তোমাকেও সানুনয়ে বলি, ব্রাহ্ম মহারথীদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া হতভাগিনী ভারতের মাথা না খাইলে কি তোমার তৃপ্তি হয় না?

আর এক স্থানে দেখিলাম অপূর্ব্ব দেবসভা হইয়াছে। তথায় দেবগুরু বৃহস্পতি ভারতের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে একটী রচনা পাঠ করিতেছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাও শুনিলাম। তাহার যতদূর স্মরণ আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে। যদি স্মরণ করিয়া লিখিতে পারি ত সময়ান্তরে পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

স্বর্গ হইতে বহির্গত হইলাম। বাহির হইয়াই সভয়ে শুনিলাম, ভীষণ আর্ত্তনাদ গগণভেদ করিয়া উঠিতেছে। দেবতা, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কোন পাপী ঘোর নরক যাতনায় চীৎকার করিতেছে। দেখিতে ইচ্ছা হয়, আইস।"

নরকের অনেক স্থান দেখিলাম। দেখিয়া আবার আমার সঙ্গী দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভো, নরক স্বর্গের এত নিকট কেন?" দেবতা বলিলেন "নরক যে স্বর্গের অতি নিকট, এ সিদ্ধান্ত কি এতকাল পৃথিবীতে থাকিয়াও করিতে পার নাই—।"

উঃ কি ভয়ঙ্কর! আবার সেই ভীষণ আর্ত্তনাদ। সেই ভীম মর্ম্মভেদী চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া বাতায়ণ পথে দেখিলাম, আমার শয়ন মন্দিরের নিকটস্থ কাঁঠাল গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির বিন্দু পড়িতেছে। এক নিশা পাপে অতিবাহিত হইল, এক দিন পাপে অতিবাহিত হইতে চলিল, সময়ের পক্ষ হইতে একটী পালক খসিল, মনুষ্যের পরমায়ুর এক দিন কমিল, মানব মৃত্যুর দিকে এক পদ অগ্রসর হইল, যৌবন সহচরী কুহুকিনী আশার এক বিন্দু শুকাইল, এই জন্যই যেন বৃক্ষ রোদন করিতেছে। এক জন রজক একটি মৃতপ্রায় গর্দ্দভের পৃষ্ঠে রাশীকৃত কাপড় চাপাইয়া, তাহাকে উৎসাহ বাক্যে সত্বর গমনে অনুরোধ করিতেছে—গর্দ্দভ যেন মানুষ! এবং চলিতে২ গাইতেছে—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায়গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলোনা;
শরমে মরম কথা কওয়া গেল না।"

✓চণ্ডীদাস।

✓কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আদি কবি, চণ্ডীদাস ঠাকুর, বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর নামক গ্রামে, বিদ্যাপতির ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩৩৯ শকাব্দায় জন্ম গ্রহণ করেন।/ তিনি দুর্গাদাস বাইচির পুত্র। জাতি বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, এবং উক্ত গ্রামে যে বিশালক্ষ্মী নামে দেবী আছেন, চণ্ডীদাস তাঁহারই উপাসনা করিতেন। পরে সেই "বাশুলি-আদেশে" তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন। রামী নামে এক রজক-কন্যা তাঁহার উপনায়িকা ছিল। তিনি ১৩৯৯ শকে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "গীত চিন্তামণি।"

✓আমরা চণ্ডীদাসকে 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদি কবি' বলিলাম। বাস্তবিক তাই। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কবি ভাষায় কৃষ্ণলীলাদি বর্ণন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। এই কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক;—উভয়েই এক বিষয়ক গীত রচনা করেন, উভয়েই বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কবি, সুতরাং তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে। আমরা দুঃখিত হইতেছি, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। কেননা যখন বিদ্যাপতি নিজে চণ্ডীদাসকে প্রধান কবি বিবেচনা করিয়া, তাঁহার দর্শন জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাসও যখন বিদ্যাপতিকে আপনা অপেক্ষা কখন হীন কবি বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ

করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুহুঁ জন পিরীতি
প্রেম-মুরতি-ময় কাঁতি।
যে করিল দুই জন, লীলা গুণ বর্ণন,
নিতি নিতি নব নব ভাঁতি ॥
দোঁহার রসিকপন, শুনি শুনি দুঁহু জন,
দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জগি।
দুঁহু গুণে শুনি চিত, দুঁহু উৎকণ্ঠিত,
দুঁহু দোঁহা দরশন লাগি ॥
নিজ নিজ গীত, লেখি বহু ভেজল,
তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধা কানুক প্রেমরস কৌতুক,
তাহে মগন ভৈ গেল ॥
নিজ নিজ সহচর, রসিক ভকত বর,
তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবীন পরম সুখ পাওন,
আনন্দ প্রেম অপার ॥
রূপ নারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিব সিংহ।
মিলন ভাবি দুঁহু করু বর্ণন,
তছুপদ-কমলকভৃঙ্গ ॥

পুনশ্চ—

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ, নারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চল লহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহু জন, দুঁহু গুণ গাওত,
দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি ॥
দৈবহি দুঁহু দোহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহা নাম, শ্রবণে তঁহি জানল,
রূপ নারায়ণ সোই ॥

তথা—

সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝহি,
বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবি, রঞ্জনে মিলল,
পুলক কলেবর গীর ॥
দুঁহু জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ, নারায়ণ কেবল,
দুঁহুক অবশ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ ইত্যাদি

কেমন সুখের মিলন, কেমন প্রেমের মিলন, অনুরোধ করিতেছি, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

যদিও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কবিত্ব-শক্তির তারতম্য নির্দেশ করা আমাদের পক্ষে বৃথা বাচালতা প্রকাশ করা মাত্র হয় বটে, তথাপি তাঁহাদের গীত রচনা প্রণালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে সাহস করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির রচনায় ব্রজ বোলীর ভাগ অধিক—চণ্ডীদাসের গীতে বাঙ্গালার আধিক্য। বিদ্যাপতির যেমন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনা আছে;—চণ্ডীদাসেরও তেমনি গুটীকত ব্রজবোলী কবিতা আছে। উভয়েই এক-বিষয়—রাধাকৃষ্ণ লীলা—বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সহজেই তাঁহাদিগের পরস্পরকে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তাহার উপায় নাই। তবে বোধ হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতি কবিতা-সরোবরে অগাধজলসঞ্চারী রোহিত সদৃশ আর, চণ্ডীদাস সেই সরসী নীরে ভাসমান বিকসিত কমল তুল্য;—বিদ্যাপতির রচনায় কিছু সংস্কৃত আমিষের গন্ধ কয়, চণ্ডীদাসের রচনা আভ্যন্তরীন্ সৌরভ বিস্তার করিয়া আপনিই দিগন্তবিচারী ভ্রমরদিগকে ভুলাইয়া আনে;—বিদ্যাপতি অগাধ-জল-তলস্থ রোহিত, সহজে ধরা যায় না কিন্তু একটু যত্নে ধরিয়া খাইতে পারিলে বড় মিঠা লাগে; ভাব বড় প্রগাঢ়, কিন্তু আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে বড় সুন্দর, বড় মিষ্ট;—আর

চণ্ডীদাস ?—চণ্ডীদাস জলের উপরে টলটলায়মান প্রফুল্ল কমল, মধুভরে আপনিই ঢলিয়া পড়িতেছে, মধু উথলিয়া উঠিতেছে, ভ্রমরের মধু সঞ্চয়ে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না ; পাঠ মাত্রেই চিত্ত হরণ করে।—বিদ্যাপতি পণ্ডিত,—চণ্ডীদাস প্রকৃতির পুত্র।—চণ্ডীদাসের কবিতার মধ্যে একপ্রকার অপূর্ব্ব হৃদয়গ্রাহীত্ব আছে, তাহা অন্যান্য কবির রচনায় সচরাচর দেখা যায় না।)—পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই চণ্ডীদাসের অনেক কবিতার সহিত সুপরিচিত থাকিতে পারেন ; তথাপি নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ দর্শনে সখী-
দিগের পরস্পর উক্তি ঃ—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায় ॥
রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥ ধ্রু ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসাঞা পরে ॥
বয়েসে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধু বালা।
কিবা অভিলাষ, বাঢ়য়ে লালস,
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে ॥

পুনশ্চ—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যাথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি অন্তরে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু হাত তুলি ॥
এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

তাই বটে। যাহাকে ভাল বাসি, তাহারত সব ভালই ; আবার তাহার মতন পৃথিবীতে যত কিছু আছে, তাহাও ভাল লাগে।

নিম্নোদ্ধৃত গীত রাধিকার নিজের উক্তি ; ইহাতে 'কি হইল অন্তরে ব্যথার,' টীকা আছে ঃ—

সোই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতরে দিয়া, মরমে পসিল, গো,
আকুল করিয়া মোর প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে, গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল, গো,
কেমনে পাইব, সেই, তারে ॥
নাম পরতাপে যার, ঐ ছল করিল, গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া, গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায়, গো,
কি করিব কিহবে উপায়।

* * *

নীচের লিখিত গীতটী আক্ষেপানুরাগ ব্যঞ্জক,—কিন্তু অনুরাগের পরাকাষ্ঠা সূচক ঃ—

কি মোহিনী জান, বন্ধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু, বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপনা কৈনু পর ॥
বন্ধু, তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥
তোমারে বুঝাই, বন্ধু, তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জুয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভক্ষিমু গরলে ॥
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ ॥
খাইতে সোয়াথ নাহি, নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুঃখ ॥
চণ্ডীদাসে কহে, রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥

সেই ভাবে মুরলীর প্রতি আক্ষেপ ঃ—
সখী সম্বোধনে।

সজনি লো সই।
খানিক বৈসহ,শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥ ধ্রু ॥
শ্যামের বাঁশীটী, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস্ব হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নী,
কেন বা এমতি হৈল ॥
যাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধিরে করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরি,
মানয়ে যেমন দাসী ॥

পুনশ্চ।

সখি হে, বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥ ধ্রু ॥
কালার লাগিয়া হাম, হব বনবাসী
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী,
অন্তরে অসার বাঁশী, বাহিরে সরল।
পীবয়ে অধর সুধা, উগারে গরল ॥

সখী প্রতি আক্ষেপ, যথাঃ—
দেখিলে কলঙ্কী-মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এদেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কালা গুণ গাণ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কালা অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
চণ্ডীদাসে কহে কেনে হইলে উদাস।
মরণের সাথি যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥

নিম্নলিখিত গীত প্রেমের প্রতি আক্ষেপসূচক ঃ—

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতের কথা ॥ ধ্রু ॥
সোই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কান্দিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া, কুলেতে দাঁড়াঞা,
যে ধনি পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যে গতি হইয়া,
পরাণ সংশয় দেখি ॥

এই রূপ গীত অনেক উদ্ধৃত করা যাইত; কিন্তু আর আবশ্যক নাই। এক্ষণে সম্মিলনের পর কৃষ্ণ প্রতি রাধিকার কয়েকটী নিবেদনের উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।—

শুন শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদিয়ে তুয়া পায় ॥
কি জানি কিক্ষণে, কুমতি হইল,
গরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায় হারয়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥

জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণ সম,
পরাণ বন্ধুয়া তুমি ॥
সখীগণ কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরল দে।
হামারি গরব, তুহু বাড়াওলি,
অব টুটাওব কে ॥
তুহারি গরবে, গরবিনী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
পিরীতি কিসের দুখ ॥

পুনশ্চ—

বঁধু! কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলই জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজ পুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোরে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি।
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক আর ॥

অপরঞ্চ—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে;
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া, একমন হইয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, স্মরণ লইলাম,
ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণ নাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয়, পরেশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

প্রভাত কমল।

১

যামিনী বিগতা প্রায়; কাননে কোকিল
ডাকিছে সঘনে;—শুনে জুড়ায় শ্রবণ;—
গাহিছে মধুর রবে ক্ষুদ্র-তরু-শাখে
দয়েল বুল্‌বুলি ফিঙ্গে; আরো কত ডাকে
পাখী কত জাতি তারা; আকুল পবন
সে স্বর-লহরী-মাঝে;—সরসী সুনীল,—
তাহারি উরসে শেষে,
পাগল পবন মেশে,
খেলায় তরঙ্গ-লীলা সরসী-হৃদয়ে;
দোলায় কমল-কলি, চুম্বি কোলে লয়ে।

২

বড় ভাল বাসে বালা সরসী জননী,
আপনা পরাণ দেয় তুষিতে কমল;—

জানে না, ভাবে না,—নহে, ক্ষমতা-অধীন
আছে হেন আভরণ সাজা'তে নবীন
তনয়া রূপসী—রূপ অমল ধবল !
পাইলে সুন্দর কিছু যতনে অমনি
সাজায় হৃদয়-ধনে ;—
আনন্দে আকুল প্রাণে
সখা সমীরণে ডাকি বলে কানে কানে।
কি বলে আনন্দ-কথা তাহারাই জানে !

৩

অই দেখ শোভে বালা নলিনী সুন্দরী
গলায় তারার মালা,—উজ্জ্বল, মধুর,—
দোলায় সে হার তার আনন্দে সরসী ;
ধরিয়ে গগন-চাঁদে আপনি রূপসী
টিপ্ দেয় পদ্ম-ভালে।—চন্দ্রমা চতুর
স্থির নহে এক ঠাঁই, ফেরে ধীরি ধীরি
কমলিনী চারি-ধারে ;—
আবার সরসী তারে
ধরিয়ে যতনে রাখে সে ভাল-উপরে।
আবার সুধাংশু তার ভ্রমে ধারে ধারে !

৪

কে না তোরে বাসে ভাল,সরসী জীবন !
সাজা'তে নলিনী কার সাধ নাহি হয়—
দেখ লো সরসি ! তোর হৃদয়-রতনে
আপনি অমর-বাল', দেখ লো, যতনে
মাথায় শিশির বিন্দু ;—শিশির ত নয়,
মৃদু বিন্দু ধারে যেন,সুধা-বরিষণ !—
সুধার আধার চাঁদ,
পাতিয়ে মোহন ফাঁদ,
ডাকে লো মানিনি ! তোরে, করে সম্ভাষণ—
"এস লো শোভিবে হেথা নন্দন-কানন।"

৫

বিহঙ্গ-ঝঙ্কার, ক্রমে প্রাণী-কোলাহল
বাড়িতে লাগিল ; মরি, এক দুই করি
আকাশের তারাগুলি আকাশে মিশিল !
মলিন গগন-চাঁদ—সে সাধ ঘুচিল !—
উদিল পূরবে রবি ; চির সহচরী,
হাসিল জগতে ঊষা ; জগত পাগল
আনন্দে অধীর হ'য়ে,
প্রকৃতি সতীরে ল'য়ে,
মনোহর বেশে দোঁহে গগন-ভূষণে
ভূষিল, পূজিল রবি অশেষ যতনে।

৬

হাসিল জননী-কোলে স্নেহের পুতলি।
হাসিল সরসী-হৃদে নলিনী সুন্দরী !—
নাহি সে কিশোর ভাব, পূর্ণিত যৌবন,
হৃদয়ে না ধরে হাসি, প্রফুল্ল বদন !—
হাসিল সরসী তবে,—আনন্দ সম্বরি,
কাঁদিল জননী পুনঃ ;—কেমনে কি বলি !
হরষে বিষাদে শেষে
সমীরণে ডাকে পাশে,
বলে সখে দেখ'সিয়ে নলিনী-রতনে ;
আন বর বিভা দিব মনোমত ধনে।

৭

না বলিতে সমীরণ, অনুচর গণে
ধাইল চৌদিকে বহি বিবাহ-বারতা,
ছড়াইল ফুল-মধু কানন-ভিতর।
পূরিল সুগন্ধে বন, গগন, প্রান্তর !
সুদূরে ভ্রমর এক শুনিল সে কথা,
নলিনী-প্রণয়-আশে ধাইল কাননে।
মধুর কানন মাঝে,
সকলি মধুর সাজে ;—
তার মাঝে কি মাধুরী ভ্রমর-ঝঙ্কার !
বাজিল হৃদয়-তার অবলা বালার।

৮

সহসা সরসী-জল করিয়া আঁধার,
ভীষণ মুরতি নর বাহু প্রসারিল।
কাঁপিল জননী-হিয়া ; কাঁপিল অবলা,
ভাসিল নয়ন-নীরে, কাঁদিল সরলা ;
ক্ষোভে রোষে মধুকর কাঁদিতে লাগিল।
পাষাণ-অধম নর !—না হ'ল সঞ্চার
হৃদয়ে দয়ার লেশ ;
—তত সাধ,—এই শেষ,—
ছিড়িল নলিনী বলে, মৃণালী ডুবিল,
শিহরিল অলি, ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

ঝঙ্কারিল অলিবর, করুণ নিস্বনে
কহিল নিঠুরে পুনঃ—"জানিয়ে ভুলিলে

অলি বিনে সরোজিনী বরে না অপরে।"
হাসিল পামর তবে, গরবে ভ্রমরে
না দেখিল আখি মেলি!—ক্ষোভে, রোষে
মিলে
জ্বালিল দ্বিগুণ জ্বালা মধুকর-মনে।
মাতিয়ে সাহসে তবে
ভীম ঘোর গুঞ্জ রবে
ধাইল মানব-পানে।—ভীষণ নিনাদ,—
করাঘাতে ম'লো অলি,—ঘুচিল বিষাদ!

১০
অরে দুষ্ট কি করিলি?—দেখ্ না চাহিয়ে
নাহি সে সুষমা আর, কাঁদে নত-শিরে
কমলিনী তোর করে!—কি দোষ পাইয়ে
বধিলি অবলা বালা, বধিলি অলিরে?
দেখ্ রে সরসী কাঁদে হৃদয় ব্যথায়!
এক বার না ভাবিলি,
কি করিতে কি করিলি,—
কাঁদাইলি কুল-বালা, কাঁদালি আমায়,
কাঁদালি সরসী সতী, কাঁদালি সমীরে!

জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

প্রথম প্রস্তাব।

ভূ-তত্ত্বই পৃথিবীর প্রকৃত ইতিবৃত্ত। অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কিরূপে পৃথিবীর পঞ্জর প্রথমে সৃষ্ট হইল, তৎপরে কত অপরিমেয় সময় অতীত হইল, যে সময় উক্ত পঞ্জরের উপরি-ভাগে কত শত পরিবর্ত্তন হইল, এবং ক্রমে তাহাতে উদ্ভিদ ও জন্তুনিচয় দেখা দিল, এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করিয়া, যখন মনুষ্য এই পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমিতে প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে, অথবা প্রবেশ মাত্র করিয়াছে, সেই সময়ে তাহার ইতি-হাস এক প্রকার সমাপ্ত হইল।

এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, এই অপরিচিত সময়ের মধ্যে জড়পদার্থময় পৃথিবীর যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তৎসমস্তই সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়মা-নুসারে। অদ্য যে কারণে আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে, এবং বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড সকল কম্পিত হইতেছে, দশ শত বা দশ সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে সেই কারণে প্রকাণ্ড পর্ব্বত শ্রেণী সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, মহাদেশ সকল উত্তোলিত হইয়াছে, বিস্তীর্ণ ভূভাগ সকল অতল-জলধি-তলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। যে কারণে আদিম পর্ব্বতস্থ পদার্থ সকলকে বিসংলগ্ন করিয়া, সেই চূর্ণ দ্বারা সমুদ্র তলে নূতন স্তর সকল সৃষ্ট হইয়া জল স্থল, ও স্থল জল হইয়া-ছিল; যে কারণে অনবরত-বাহিত পর্ব্বত বিচ্যুত মৃৎকণ দ্বারা নীল নদের ও গঙ্গা নদীর মুখের নিকট মিশর ও বঙ্গদেশ বিনির্ম্মিত হইয়াছে; সেই সকল কারণের কার্য্য অদ্যাপি পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা দেখিবার ইচ্ছা জন্মিলে, ভারি বৃষ্টির পর কোন ক্রমনিম্ন লাঙ্গলাকৃষ্ট ক্ষেত্রের নিম্নদেশে দৃষ্টিকর, দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া গঙ্গা নদী ও নীল নদ বৃহৎ রাজ্য সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। অঙ্গার জন সময়ের সৈকত প্রস্তর সমূহে যে সকল চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন সকল তরঙ্গ ধৌত বালুকা-ময় উপকূলে আজিও প্রকৃতি আঁকিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অপর কথায় কাজ কি, তরঙ্গ পরিত্যক্ত দৃঢ় সংলগ্ন

বালুকাক্ষেত্রে বায়ুভরে বক্রগতি বৃষ্টিধারা পতনে যে সকল চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সকল চিহ্ন প্রাচীন স্তর সমূহে যেন খোদিত লক্ষিত হয়। যেখানে দেখ, যাহা দেখ, সর্ব্বত্র, সকলেতেই, দেখিতে পাইবে, সেই একই প্রকৃতি, (অর্থাৎ সেই একই স্রষ্টা, প্রকৃতির হাত দিয়া, বা প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা) চিরকাল একই কার্য্যে বস্ত ;—এই ক্ষণে যে ভাবে, যে কারণে, বায়ু বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, জলের ন্যূনতা স্ফীততা হইতেছে, আমরা এই পৃথিবীর অধিবাসী হইবার অচিন্ত্য যুগ পূর্ব্বাবধি, ঠিক সেই ভাবে, সেই কারণে, প্রকৃতি ঐ সকল কার্য্য সাধন করাইয়াছে। সেই রূপ যদি আমরা প্রাচীন কালের সূচ্যাকৃতি পত্রধারী বৃক্ষ সকল পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাইব, আমাদের জন্মের কত শত যুগ পূর্ব্বাবধি এই পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু পরিবর্ত্তন হইত। আমরা প্রতিনিয়ত এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি বলিয়া, আপাততঃ ইহাদিগকে সামান্য ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি ; কিন্তু এই সকল সামান্য কাণ্ড দ্বারা স্রষ্টা এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তিনি কখনই অসম্মানার্হ নন। প্রকৃতির কার্য্যে বাস্তবিক কিছুই বড় বা ছোট, মহৎ বা তুচ্ছ নাই। যখন আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমাদের সঙ্গে তুলনা দ্বারা ঐ সকল কার্য্য বিবেচনা করিতে যাই, তখনই বড় ছোট ভাল হয়। তাহাতে আমাদেরই হীনত্ব বিশেষ অনুভূত হয়। সুতরাং তাহা না করিয়া, যদি সেই আদি কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সকল বিষয় অবলোকন করি, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে,—বিশ্বের সকলই অদ্ভুত, সকলই সমভাবে সম্মানার্হ—উপাস্য!

দেখা গেল, স্রষ্টা, সংপ্রতি আমাদের চক্ষের উপর যে প্রকার কৌশলে ও উপায়ে প্রাকৃতিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, যখন তাঁহার কার্য্য অবলোকন করিতে কেহই বিদ্যমান ছিল না, তখনও তিনি ঠিক সেই সকল উপায়ে ও কৌশলে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বহুকাল ব্যাপিয়া তাহাতে অসংখ্য উপায় ও বিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। সমস্ত কার্য্যই চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া আসিতেছে। একথা বলাতে স্রষ্টার মহিমার লেশমাত্রও হ্রাস হয় না ; তাহাতে তাঁহার অসম্মান করাও হয় না ;—আমরা একথা বলিতে পারি বলিলে অসঙ্গত হয় না। কোন নিউটন এবং কোন লপ্লাসের গণনা হইতে, অথবা কোন মার্চ্চিসন এবং কোন লায়লের দৃঢ় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হইতে, এইরূপ উপলব্ধি করিতেই আমরা সমর্থ ও যোগ্য।

ভূ-রচনার এই সকল পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে গেলে, তাহার সঙ্গে২ আর কতকগুলি বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, সেগুলিকেও না ভাবিয়া থাকা যায় না। যখনই আমরা ভূ-স্তর রচনার বিষয় চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি, তখনই দেখিতে পাই যে তাহার সঙ্গে২ এক অতি বৃহৎ সজীব পদার্থ সম্প্রদায় (উদ্ভিদ এবং জন্তু) উৎপন্ন হইয়া, এক্ষণে যে২ আকারে তাহাদিগকে পৃথিবীর উপরিভাগে দেখিতে পাই, সেই২ আকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের অস্তিত্ব দেখিলেই, মন

সহজে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে;—কেমন করিয়া এই জীবদল প্রথমে উৎপন্ন হইল? এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর হইতে পারে;—

১। আমরা দেখিয়াছি যে পৃথিবীর রচনাগত যে কিছু পরিবর্ত্তন, সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে, ও ঘটিতেছে, তাহার ব্যত্যয় কোথাও লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং জীবোৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে; তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। অথবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবোৎপত্তি অস্বীকার করিলে, এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়;—যে স্রষ্টা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই পৃথিবী বিরচিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনিই জীবসৃষ্টির বেলায় সে নিয়ম অবলম্বন না করিয়া, অন্য উপায়ানুসারে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন; কিন্তু সেই উপায় কি, তাহা, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিয়া, বরং তাহা আমাদের বুদ্ধির ও ক্ষমতার অতীত বিবেচনা করিয়া, তাঁহারই ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় উত্তর সম্বন্ধে এই বক্তব্য, যে সেরূপ বিশ্বাস কেবল বালকের পক্ষেই শোভা পায়। কেন না বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছে যে প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহার, কোন কারণ বশতঃ, আমরা পরীক্ষা করিতে, তথ্যানুসন্ধান করিতে বিরত থাকিব;—বরং প্রাকৃতিক কার্য্যের আলোচনা ও তত্তানুসন্ধান দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করাই স্বভাবের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। কেন না তজ্জ্ঞানের সহিতই আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতার সম্যক্ সংশ্রব আছে। উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। বিবেচনা কর, তাড়িত;—তাহা দেখিয়া আমরা তাহাকে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট দেবতার ক্রোধাগ্নি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার ক্রোধ শান্তির জন্য পূজা স্বস্ত্যয়নাদি বিধান করিব, ইহা কখনই মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব ও সঙ্গত নহে;—আমরা সেই তাড়িতের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহাকে আর দেবক্রোধাগ্নি বিবেচনা না করিয়া, আমাদের নভোমণ্ডলের মান্য ও স্থৈর্য্য বিধানকারী ব্যাপার বুঝিয়া, তাহাকে স্বায়ত্ত করিয়া লৌহ শলাকাদ্বারা যথেচ্ছা নীত করিব, ইহাই স্বভাবের অভিপ্রেত। আরও দেখ, এক সময়ে যে সকল বিষয় (উপরোক্ত দৃষ্টান্তও ইহার মধ্যে গণ্য) মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য বলিয়া জ্ঞান হইত, এক্ষণে তাহা অতি সহজ ও সরল হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিলে, সহজেই এই বিশ্বাস হয় যে, প্রকৃতির এমন কোন গোপনীয় ক্রিয়াই নাই, এক সময়ে না এক সময়ে আমরা যাহার রহস্য ভেদ করিতে পারিব না। অতএব প্রাণী সৃষ্টি সম্বন্ধে ওরূপে নিশ্চিন্ত থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষনে প্রথম বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, যে কারণে এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যে সকল নিয়মে তাহা অদ্যাপি চলিতেছে, সেই সকল নিয়মাবলী অনন্ত নভোমণ্ডলবিচারী অসংখ্য সৌরজগতেও লক্ষিত হইয়া থাকে;—যে নিয়মে নেপ্‌চুন গ্রহ তাহার কক্ষায় থাকিয়া সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করি-

তেছে, সেই নিয়মেই সিরিয়স্ নক্ষত্রকে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াছে ইত্যাদি। সকল কার্য্যই অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। সমস্ত ব্যাপার পরমাণু-ন্যস্ত আদিম শক্তিদ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। কোথাও তাহার ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। পৃথিবী রচনা সম্বন্ধেও সেই নিয়ম অক্ষুণ্ন। সেই সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সাগর ভূধরাদির সৃষ্টি হইয়াছে, নিয়ত আগ্নেয়িক কার্য্য সমূহ চলিতেছে;—এবং সেই সকল নিয়মেই পৃথিবীকে প্রাণীদিগের বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আরও দেখ, পৃথিবী রচনার সঙ্গে প্রাণী সৃষ্টির কত নিকট সম্বন্ধ। এত নিকট যে, একটীর সঙ্গে অপরের অতি গূঢ় সংস্রব ও সাপেক্ষত্ব বিদ্যমান্;—সাময়িক সম্পর্কও বিস্তর; অর্থাৎ যখন একের এমত অবস্থা হইয়াছে, যে অপরটী আসিয়া মিলিতে পারে, তখনই সে আসিয়া তাহার সঙ্গে জুটিয়াছে। যখন পৃথিবীর সজীব পদার্থের জীবন ধারণোপযোগিনী অবস্থা হইল, তখনই যেন প্রাণী আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং একবার প্রবেশ করিয়া, উভয়ে একত্রে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য এক নিয়ম, এবং প্রাণী সৃষ্টির ও পরিবর্ত্তনের জন্য অন্য নিয়ম কল্পনা করা, কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে, স্রষ্টার নিয়মসমূহ অতি বিস্ময়কর বিবেচনা করিতে হইবে। যিনি একই নিয়মে অনন্ত সংখ্যক পৃথিবী পরিপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, তিনিই, যখন সেই সকল পৃথিবীমধ্যগত সমুদ্র মধ্যে প্রথম সামান্য উদ্ভিদ ও কীটাণু সৃষ্টি করিলেন, তখন তাঁহার সেই চির প্রচলিত নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, অপর অভিনব কৌশল অবলম্বন করিলেন, একথা বলিলে, যে মহীয়সী বুদ্ধির কৌশলে এই ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত হইয়াছে, সেই বুদ্ধির গৌরবের হানি, এবং এবম্ভূত বুদ্ধিমান পুরুষকে মনুষ্য পদবীতে অবনত করা হয় মাত্র। অপর এই দুই মতের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ,—কোন্‌টী ধর্ম্মনীতি সঙ্গত ও সম্ভব বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথম মতানুসারে, এই বিশ্বে যাহা কিছু হইতেছে, তৎ সমস্তই সেই একই ঐশী ইচ্ছার ক্রম প্রকাশ্য কার্য্য স্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; তাহাতে বড় ছোট সজীব নির্জ্জীবের প্রতি বিশেষ বিশেষ নিয়ম আবশ্যক করিতেছে না।

দ্বিতীয় মতের পোষকতা করিলে, ঈশ্বরের কার্য্য মনুষ্যের কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান হয়; আজি এক বিষয় সাধনের জন্য এক মত বা উপায় অবলম্বন করিলাম, কল্য যে কাজ করিতে হইবে, সে কার্য্যে সে উপায় খাটিল না; স্বতন্ত্র উপায় অলবম্বন করিতে হইল, নহিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এবং এই রূপ নূতন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য শুদ্ধ যে স্রষ্টার দুই একবার ব্যস্ত থাকিলেই চলিবে, তাহা নহে; যতবার যত কিছু করিতে হইবে—প্রত্যেক স্তর রচনার সময়, প্রত্যেক নূতন পদার্থ সৃষ্টির সময়, একটা না একটা নূতন কৌশল করিতে হইবে। যখন মৎস্য সৃষ্টির আবশ্যক, তখন এক কৌশল; সরীসৃপের জন্য আর এক নূতন উপায়; পক্ষী সৃষ্টির সময় অপর কোন অভিনব প্রকার ঐশী ক্ষমতার প্রকাশ—এমন কি, প্রত্যেক জাতীয় নূতন২ কীটাণু সৃষ্টির সময়েও স্রষ্টার

ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশের আবশ্যক হইবে। যে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ এক-বার ইচ্ছামাত্রে অনন্তস্থান মধ্যগত অসংখ্য পৃথিবীর সৃষ্টির উপায় সকল নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যেক কীটাণু সৃষ্টির সময় নব নব কৌশল উদ্ভাবিত করা কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা কর। কিন্তু এই মতে বিশ্বাস করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা ভাবেন যে, উভয় সজীব ও নিৰ্জ্জীব পদার্থের রচনা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়াছে বলিলে, ঈশ্বরের গোরবের হানি হয়। কিন্তু এরূপ ভাবনার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই বুঝিবার জন্য অনেকে ভাল করিয়া চেষ্টা করেন না, এই জন্য। ইহা দ্বারা, যে "প্রকারে" স্রষ্টা স্বীয় ক্ষমতা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেবল যে তাহাই বুঝায়, ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং একথা ভাল করিয়া বুঝিলে, বিশ্ব-রচয়িতার যে প্রকৃতির কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছা আছে, তদ্বিষয়ে কোন মতেই সন্দেহ জন্মিতে পারে না। ইহাতে স্রষ্টার মহিমার হ্রাস না হইয়া, বরং শত সহস্র গুণে, অসংখ্য গুণে, বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। কেননা তাহাতে এই বুঝায় যে বিশ্ব-রচয়িতা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় নহেন, যে কার্য্য বিশেষ সাধনের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে মতের ও উপায়ের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি স্বীয় মহীয়সীর বুদ্ধি গুণে এককালে সমস্ত নিয়ম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন,—সেই পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক নিয়মাবলীর মতে বিশ্বের সমস্ত কার্য্যই চলিয়াছে, চলিতেছে, ও চলিবে। সে নিয়ম এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, যখন যে প্রকার আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল নিয়ম দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহার ব্যত্যয় কখন হইবে না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে নিয়ন্তা স্বয়ং সেই সকল নিয়মের আত্মা স্বরূপ অন্তর্ভূত থাকিয়াই, তাহাদিগকে চালাইতেছেন; তাহা না হইলে সেই নিয়মসমূহ মুহূর্ত্ত মাত্রও কার্য্যকর হইতে পারিত না। অপিচ এই মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, তাহা যদি কোনটীতে আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে অধিক চরিতার্থ করে, তাহা বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, তবে নিশ্চয়ই বোধ হইবে, যে উপরোক্ত (১) সংখ্যক মতই অধিক গ্রাহ্য; কেননা তাহাতেই ঈশ্বরের মহিমা অধিকতর বৃদ্ধি করে, এবং তাঁহার ক্ষমতাকেও অসীম বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়া দেয়। ডাকক্তার বকলও বলেন, "সৃষ্টির প্রারম্ভে ভৌতিকপদার্থসমূহ যে সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা এপর্য্যন্ত যত কিছু প্রাকৃতিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে, এবং করিতেছে ও করিবে, তৎসমস্তই যদি সেই আদি-লব্ধ গুণের দ্বারা হয়, তবে এপ্রকার আদিম ব্যবস্থা, এক জন বুদ্ধিমান্ স্রষ্টার অস্তিত্ব অপ্রতিপাদন না করিয়া, বরং সেই রচয়িতার যে কত দূর আপন বুদ্ধি কৌশল, যে বুদ্ধিবলে অসংখ্য অসংখ্য ভবিষ্যৎ কার্য্যের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভেই এককালে নির্ণয় করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ ও প্রতিপন্ন করে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়।"

বঙ্গবিজেতা ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

নাবিকের পূর্ব্ব কথা ।

How sweet the days that I have spent,
In yon sequestered bower,
Those citron trees, still sweet of scent,
Had then some magic power.
Or some fair spirit did reside,
In that sweet purling brook,
Which runs by yon green mountain side,
Now haunted by the rook.
No charm was in the spicy grove,
No spirit in the stream,
O 'twas the smile of her I love,
Now vanished like a dream!

I. C. Dutt.

কোন২ মর্য্যাদাগর্ব্বী লোক বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের উপর রুষ্ট হইবেন। ভ্রুকুটী করিয়া বলিবেন "কি! সম্ভ্রান্ত জমীদারপুত্র হইয়া সামান্য জেলে মাঝির সহিত বন্ধুত্ব! এই কি তাঁহার মান সম্ভ্রম, এই কি তাঁহার কুল মর্য্যাদা! কোথায় উন্নতিশালী লোকের সহিত যত্ন সহকারে আলাপ পরিচয় করিবেন, কোথায় বড় লোকের সহিত আলাপ করিয়া আপনি দেশের মধ্যে এক জন বড় লোক হইতে চেষ্টা করিবেন,—পিতার নাম রাখিবেন, কুলের নাম রাখিবেন, তা নয় কেবল ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর যত চাষা মজুরের সহিত আলাপ করিতেছেন! ছোঁড়া অধঃপাতে গিয়াছে। আর যে তাঁহার চরিত্রের বিষয় লিখিতেছে, সেও অধঃপাতে গিয়াছে।"

এইরূপে তিরস্কার করিলে আমরা যে কি উত্তর দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, ভয়ে একেবারে নিরুত্তর! অগত্যা স্বীকার করিব আমাদের সুরেন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি কিছু অল্প বটে,—বোধ হয় যথার্থই তিনি মর্য্যাদা রাখিতে জানেন না,—নাম কিনিবার যে সহস্র কৌশল আছে তাহা তিনি জানেন না। বড় লোকের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া বড় লোকের সহিত আলাপ করা, বড় লোকের সভায় উপস্থিত থাকা, আলাপ না থাকিলেও অন্য লোকের নিকট বড় লোকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া, অন্তরে বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না থাকুক, মুখে গাম্ভীর্য্য টুকু ধারণ করা, সম মর্য্যাদার লোকের সহিত কথা না কহা, কিম্বা গর্ব্বিত ভাবে কথা কহা, অধিক মর্য্যাদার লোকের সহিত লোকের সম্মুখে সমানের মত কথা কহা, অন্তরালে খোসামোদ করা, ক্ষমতা না থাকিলেও লোকের নিকট ক্ষমতা আছে বলিয়া পরিচয় দেওয়া, মান না থাকিলেও লোকের নিকট মানীর ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গী করা, বিষয় ও ধন না থাকিলেও বিষয়ী ও ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, সতর্ক ভাবে যথার্থ যে সম্পত্তি আছে তাহা গুপ্ত করিয়া তাহার দশ গুণ সম্পত্তি আছে, আচার ব্যবহার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করা, ৪০ টাকা আয় থাকিলে ১১০ টাকা আয় আছে বলিয়া প্রচার করা, ২৫ টাকার দ্রব্যকে নগদ ৪০ টাকার ক্রীত দ্রব্য বলিয়া জানান,—এইরূপ সহস্র মহা কৌশল সুরেন্দ্রনাথ জানিতেন না। সে নির্ব্বোধ বালক! ভাবিত সৎকর্ম্ম করিলেই মানব জাতির যথার্থ মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতি নির্ব্বোধ! যে সৎকর্ম্ম করিতেন তাহা লোককে জানান চাই—তাহার দশ গুণ

অধিক করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করা চাই, তাহা হইলেও কিছু হইত। তা নহে গোপনে সৎকর্ম্ম করিলে কি হইবে? ছোঁড়া যথার্থ অধঃপাতে গিয়াছেই বটে!

আর আমাদের উপর যে ক্রোধ করিতেছেন সে অসঙ্গত ক্রোধ। সুরেন্দ্রনাথ যদি নির্ব্বোধ হয়েন, আমাদের কি দোষ? সুরেন্দ্রনাথের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমরা লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও অপ্রস্তুত হইয়াছি,—কিন্তু তজ্জন্য যাহা ঘটিয়াছে তাহার অন্যরূপ লিখিব কিরূপে। যাহা২ ঘটিয়াছে আমরা ঠিক তাহাই লিখিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ মাঝির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। এ যথার্থ ইতিহাসে কি আমরা কাল্পনিক কোন কথা বানাইয়া লিখিতেছি? রামঃ!

রহস্য দূরে যাউক যাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, মিথ্যা বাহ্যিক মান মর্য্যাদার প্রতি আমাদের দেশীয় লোকের যে আস্থা আছে, তাহা হইতে শত সহস্র অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ধনী ও মানী লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যেরূপ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের জীবনের এক মাত্র চেষ্টা হইয়া উঠিয়াছে, যথার্থ পুণ্য কর্ম্ম সাধনে, ও মানসিক উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে আমাদের যদি সেরূপ যত্ন থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ এত দিনে গৌরবে প্লাবিত হইত। মনুষ্য হৃদয়ের যথার্থ মর্য্যাদার উন্নতি সাধন না করিয়া উপরি উক্ত কৌশল দ্বারা সংসারে মর্য্যাদার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা পাইলে অন্তঃকরণের ঔদার্য্য ও সারল্য নষ্ট হয়, মহৎ প্রবৃত্তি সমূহের হানি হয়, ও সমস্ত জীবন প্রবঞ্চনা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর সমাজে নাম কিনিবার তৃষ্ণা দিন২ এত প্রবল হইতেছে কেন? কে বলিবে কেন?

ধনের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য হৃদয়ে অবশ্যই হইতে পারে, কেননা ধন থাকিলে অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু ধন না থাকিলেও ধনী বলিয়া পরিচয় দিবার ভয়ানক ইচ্ছা কি জন্য? আমরা ইহার উত্তর দিতে পারি। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের সমাজে ধনের অত্যন্ত মর্য্যাদা,—দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যা বুদ্ধিও সহস্র সদ্গুণ অপেক্ষা আমাদের দেশে ধনের মর্য্যাদা অধিক;—সেই মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য ধন না থাকিলেও লোকে ধনী বলিয়া পরিচয় দেয়। এই বিজাতীয় ধন মর্য্যাদা হইতেই আমাদের সমাজে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, ইহারই কারণ আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক ধনলিপ্সা দশ গুণ প্রবল হইয়া অন্যান্য উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে দলিত করিয়া ফেলে,—ইহারই কারণ যৌবনাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমরা ধনী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সহস্র প্রবঞ্চনা শিখিয়া থাকি। পাঠক মহাশয় আমাদের এই সমস্ত আলোচনায় বিরক্ত হইবেন না, এই বাহ্যিক মর্য্যাদা প্রাপ্তির চেষ্টা হইতে আমাদের সমাজে ও আমাদের হৃদয়ে যে ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ও নাবিক এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় জেলেমাঝিদিগের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য কুটীরাবলী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এই কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালের অন্ন ছিল, সেই অন্ন

উভয়ে আহার করিলেন, পরে নাবিক আপনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল;—

"যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে তাহা ত্যাগ করুন,—এই দর্পেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্ব্বী ছিলাম। শুনিয়াছি অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি না সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমি এক দিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম। এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

"বাল্যাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত। কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অন্যায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত; পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম; সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না; ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সময়ে২ আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সমস্ত পাঠশালার ছাত্রের সম্মুখে বলিলেন, 'এই বালক বেত্রাঘাতে ক্রন্দন করে না, কিন্তু অদ্য যদি না ক্রন্দন করাই, তাহা হইলে আমি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিব।' এই বলিয়া তিনি আমাকে বেত্রাঘাত প্রভৃতি সহস্র রূপে যাতনা দিলেন, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, মুখ দিয়া বাক্য বাহির হয় নাই, চক্ষু হইতে জল বাহির হয় নাই। অবশেষে গুরুমহাশয় ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বলিলেন "অগ্নি দিয়া উহাকে দাহন কর।" এক খণ্ড অগ্নি আনীত হইয়া আমার শরীরে স্থাপিত হইল, আমি যাতনায় অস্থির হইলাম, তথপি কথা কহিলাম না,—মুহূর্ত্ত মধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জল সেচনের দ্বারা আমি শীঘ্রই চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। সেই অবধি আমার পড়া সাঙ্গ হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না। আমি জন্মের মত মূর্খ রহিলাম।

"আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন, ও আমাকে এরূপ ভাল বাসিতেন যে কখনও তাঁহার একটী কথাতেও আমার মনে বেদনা জন্মে নাই। [বলিতে২ বক্তার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল]। আমিও তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতাম সন্তানে মাতাকে সেরূপ ভাল বাসে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি; গুরুর অবাধ্য হইয়াছি; কিন্তু কস্মিন্‌কালেও মাতার একটী কথা অবহেলা করি নাই। গৃহের সমস্ত লোকে উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম,—হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।" বলিতে২ বক্তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া অনবরত অশ্রু বিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তোমার মাতার কাল হইয়াছে?"

নাবিক উত্তর করিল "শুনিয়াছি তাঁহার কাল হইয়াছে।"

ক্ষণেক ক্রন্দনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল।—

"আমার পিতাও আমাকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব রুক্ষ ছিল।—আমার এ বিজাতীয় ক্রোধ কতক অংশে আমি তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।—বিশেষতঃ সংসার চিন্তায় জ্বালাতন হইয়া অনেক সময়ে তিনি মিথ্যা ক্রোধ করিতেন। আমাকে যথার্থ ভাল বাসিতেন; আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত; আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যাইত; কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এক২ বার তাঁহার নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইত; শরীর কম্পিত হইত; অনেক সময় অকারণে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন। এক দিন আমাকে নির্দ্দোষে নির্দ্দয় হইয়া প্রহার করিলেন ও বলিলেন 'তোর মুখ আর আমি দেখিতে চাহি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা,' চলিলাম, বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

"প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম; হৃদয়ে হুতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হুতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা সকলই দগ্ধ করিল। সেই হুতাশনে আমার ভাবী সংসার সুখ, পিতা মাতার আশা ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি সকলরূপ স্নেহ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

"কেবল ইহাও নহে। পিতৃদত্ত কোন দ্রব্যই আমার সঙ্গে লইব না, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। রাত্রিকালে ছদ্মবেশে ভিক্ষা করিয়া একখানি ছিন্ন বস্ত্র পাইলাম তাহাই পরিধান করিয়া আপন বস্ত্র পিতৃ গৃহের সন্নিকটে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলাম। মনে করিলাম পিতার নিকটে আর আমি ঋণগ্রস্ত নহি। রে মূঢ় অন্তঃকরণ! আশৈশব যত্ন সহকারে, স্নেহ সহকারে, অর্থ সহকারে পিতা যে মানুষ করিয়াছিলেন সে ঋণ কোথায় যাইবে?

"তাহার পর দশ বৎসর আমার জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় আমার জীবনের দশ বৎসর বহিতে লাগিল, প্রচণ্ডতা আছে কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই, কাহারও অপকার নাই। নির্জ্জন প্রাণীশূন্য পর্ব্বত পার্শ্বে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ আমার হৃদয়ের দুর্দ্দমণীয় প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জ্জনের শ্রোতা নাই;—সে গর্জ্জনে কেহ ভীত হয় নাই, কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতাল প্রবাহিনী, ভৈরব কল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার ন্যায়, পাতাল হইতেও অধিক অন্ধকার পরিপূর্ণ আমার হৃদয় কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃশ্য অন্ধকার আচ্ছন্ন।

"দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকার রাশি সহসা আলোক ছটায় চমকিত ও উদীপ্ত হইল"। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।—যে কথা বলিতে হইবে তাহা যেন একবার হৃদয় মধ্যে আলোচনা

করিয়া লইল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দ নেত্রে সেই অপূর্ব্ব উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্য মনে তাহার গম্ভীর ও উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। সেও ক্ষণেক পর আরম্ভ করিল।

"যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাগ্রগণ্য (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন) সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম না, যে প্রেম মানব হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে,—যে প্রেম জীবনের অংশ স্বরূপ দেহে আত্মার স্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হইবে, সেইরূপ প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম; চিন্তা বলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেম প্রতিমাকে জাগরিত করিয়া কখন২ প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারই সহিত কাল হরণ করিতাম,—সে কাল্পনিক জগতে যে অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম সুখ তাহা এ জগতে কোথায় পাইবেন? সে সুখে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া আমি উন্মত্তপ্রায় হইতাম; সহসা সে জগৎ সুন্দর জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; প্রেমপ্রতিমা পুনর্ব্বার শূন্যে লীন হইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম।

"দিন দিন এই রূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবামানে অর্দ্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম।—সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্র বৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্রব্যাদি,—তন্মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণ কেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ কান্তি মুখ মণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটী অল্প প্রেম হাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমর কৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল২ করিতেছে। সহসা কল্পনাশক্তি ছিন্নতার বীণাসম নীরব হইত। আমিও মূর্চ্ছিত হইতাম।

"সুরেন্দ্রনাথ! কতরূপ যে কল্পনা করিতাম তাহা বলিতে জীবন শেষ হইবে, অদ্য রাত্রির কথা কি? বলিতে আমার কষ্ট হইবে না, কেননা আমার কল্পনাই জীবন, কিন্তু আপনাকে কি জন্য কষ্ট দিব। একটী মাত্র কথা বলি,—যত কল্পনা করিতাম, নানারূপ ভিন্ন জগতে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন অবস্থায় সেই একই প্রেম প্রতিমা বিরাজ করিত। ক্রমে আমি উন্মত্ত প্রায় হইলাম।

"এক দিন নিশাবসানে ঐরূপ কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া এই গঙ্গা তীরে ঐ নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি। কত ক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল মস্তকে ও মুখে কে জল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছেন, বোধ হইল তুলা রাশিতে আমার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করিবেন না,—সেই প্রেম প্রতিমা! যাঁহাকে সহস্রবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম তিনি আমার মস্তক আপন ক্রোড়ে রাখিয়া আমাকে নিঃশব্দে ব্যজন করিতেছেন।"

উভয়েই অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল।

সুরেন্দ্র নাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। যদিও আপনি সরলার প্রেম পাশে বদ্ধ ছিলেন তথাপি এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন "এই নাবিকের কল্পনা শক্তি যেরূপ উত্তেজিত দেখিতেছি, নিশ্চয়ই পরে যে রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রতিমার সহিত পূর্ব্বকার প্রেম চিন্তার যোগ করিতেছে।" সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তার বেগ দেখিয়া কিছু বলিলেন না। সেও অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল।

"সুরেন্দ্রনাথ! আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেই রমণী ব্রাহ্মণ কন্যা, ও অবিবাহিতা। পাণি গ্রহণ করিলাম, তাহার পর দুই বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, সেরূপ পূর্ব্বেও কখন হয় নাই। কিন্তু সে কথা আর কি জন্য বলি? আপনার যেরূপ পবিত্র হৃদয় অবশ্যই পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে জানিয়াছেন,—যদি না জানেন শীঘ্রই জানিবেন,—আপনি ভিন্ন অনেকেই পবিত্র প্রেমের প্রভাব জানিয়াছেন,—কিন্তু আমার মত গাঢ় প্রেম মানবজাতির মধ্যে কেহ কখন জানেন নাই, জানিবেন না।

"ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম। শরৎকালের উষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয় আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, আমাদের হৃদয়ে প্রেম তদপেক্ষা নিস্তব্ধ, শান্ত ভাবে বিরাজ করিত। সেই রমণীকে আমি সন্ধ্যা বলিতাম, কেননা, তাহার প্রকৃতি সন্ধ্যার ন্যায় ম্লান, নিস্তব্ধ ও চিন্তাশীল। আমি তাহাকে প্রেম প্রতিমা বলিতাম, কেননা, তাহাকে দেখিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিমা আমার হৃদয়ে জাগরিত ছিল, আমি তাহাকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেননা, ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে"—

আর কথা সরিল না। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন নাবিক উন্মত্তের ন্যায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণই নাই। অনতি-বিলম্ব পরই সেই নিঃস্পন্দ শরীর মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাহাকে চৈতন্য দান করিলেন। পরে অন্য কথা কহিতে২ রাত্রি অনেক হইল। দুই ভ্রাতার মত দুই জন এক শয্যায় শয়ন করিলেন,—অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ বিজেতা।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his sea
To give the world assurance of a man.

Shakespeare.

মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাঁহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই,—দুই চারি জন অতি বিশ্বাসী

যোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি মৃদুস্বরে যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় এক জন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল,

"মহারাজ! এক জন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অনুমতির জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন"

টো। "তাঁহার বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা কর।"

সৈ। "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বলিলেন 'মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।' "

টো। "হিন্দু কি মুসলমান?"

সৈ। "ব্রাহ্মণ তনয়।"

টো। "কোন দেশীয়?"

সৈ। "জন্ম বঙ্গ দেশে।"

টো। "বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ পুত্র,—অথচ অশ্বারোহী! আসিতে দাও।"

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্লের মত সর্ব্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারত ভূমিতে অনেক পুন্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয় কুলে অনেক সময়ে অনেক বীর পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণবশতঃ তাঁহার কতকগুলি দেব প্রতিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না, জল গ্রহণও করিতেন না। সুতরাং দেব প্রতিমা নষ্ট হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কোন কার্য্যই করিবেন না, ও কয়েক দিন অনাহারে রহিলেন। আকবর সাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজেল প্রভৃতি আকবরের মুশলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে "গোঁড়া" হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহানুভব দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন,—যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল,—তিনি সেই পদ ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানব লীলা সম্বরণ করিবেন এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যানুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। ফলতঃ তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ লোক ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে আর দেখা যায় না।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও যুদ্ধ কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথম বার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয় বার হোসেন কুলী খাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুই বারই জয় লাভ হয়। এমন কি প্রথম বার যখন কটকের যুদ্ধে মনাইম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র

হইতে পলায়ন করেন, রাজা টোডরমল্ল অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়াই জয় লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বার তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে,—তিনি যে স্থানে যাইয়াছিলেন,—সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট্ প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয় তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার যুদ্ধে সেনাপতি ভিজার খাঁ পলায়ন তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয় লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অঙ্কশায়ী হইলেন। আকবর সাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবর সাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব স্থিরীকরণ ভার রাজা টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে যে উপায় দ্বারা বঙ্গ দেশের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহার মধ্যে হিন্দুদিগকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়াই একটী প্রধান। শাসন কর্ত্তাদিগের ভাষা শিখিলে শাসিতদিগের অবশ্যই উন্নতি হইয়া থাকে, এক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া আমাদের যেরূপ উন্নতি সাধন হইতেছে, তৎকালে পারস্য শিখিয়া অনেকাংশে সেইরূপ ফল হইয়াছিল।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্রজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন পালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করেন, ও প্রথমে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচ কর্ম্ম হইতে তিনি রত্ন পরিপূর্ণ আকবর সাহের সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সমগ্র জীবন চরিত জানিতে চাহেন তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করুন।

তাঁহার বঙ্গদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় বার আগমনের বৃত্তান্ত, প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার তৃতীয় বার আগমনের কথা বিবৃত হইতেছে।

যদিও টোডরমল্ল অনেক বার বিপদাকীর্ণ রঙ্গক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি এরূপ বিপজ্জালে কখন বেষ্টিত হয়েন নাই। আরব বাহাদুর, শরফুদ্দীন হোসেন, মাসুমী কাবুলী প্রভৃতি অনেক বিদ্রোহী ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চশত হস্তী, ও অনেক রণপোত ও কামান লইয়া মুঙ্গের বেষ্টন করিয়াছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহির্গত হইলেই তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই শত্রুর সহিত যোগ দিবেক এরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। বিশেষ মাসুমী ফরঙ্খুদী নামক একজন সেনাপতি সুযোগ পাইলেই

বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিবে, রাজা টোডরমল্ল তাহা জানিতেন। এ অবস্থাতে তিনি অগত্যা দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ও অতিশয় যত্ন ও বুদ্ধি সহকারে দুর্গের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রুদিগের আচরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। দুর্গের ভিতর প্রচুর খাদ্যও ছিল না, সুতরাং মধ্যে২ যৎপরোনাস্তি অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদ রাশিতে বেষ্টিত হইয়াও রাজা টোডরমল্লের অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হীনজ্যোতি হয় নাই, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দিন২ দুর্গের প্রাচীর দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন; দিন২ সৈনিকদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন; দিন২ আপন নৈসর্গিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণ পুত্রকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল।—তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল্ল জিজ্ঞসা করিলেন " যুবক! তোমার নাম কি "? যুবক উত্তর করিলেন " প্রেমদাস শর্ম্মা "।

টো। " নিবাস কোথায় "?

প্রে। "নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি ইচ্ছাপুর গ্রামে।"

টো। "তোমার প্রয়োজন কি?"

প্রে। " অধুনা আপনার অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করা।"

রাজা টোডরমল্ল কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে যুবকের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদার ভাব ভিন্ন কিছু মাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষনেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি ইহার অগ্রে কোথায় কত দিন কর্ম্ম করিয়াছিলে?

প্রে। "অদ্যই প্রথম অসি হস্তে করিলাম" বলিয়া কোষ হইতে এক বার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদীক খাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন "যুবক! তুমি যেরূপে অসি ধারণ করিলে, আমার স্থির বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।"

তারসন খাঁ নামক অপর একজন সেনাপতি মৃদুস্বরে রাজাকে বলিলেন, "যুবক যে অদ্য প্রথমে অসি ধারণ করিয়াছে, আমার কখনই বিশ্বাস হইতেছে না। মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্তচর,— ইহাকে জল্লাদ হস্তে অর্পণ করুন।"

রাজা টোডর মল্ল কাহারও কথার উত্তর না দিয়া বার২ যুবকের উপর তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন,—তাঁহার আকৃতি বা মুখভঙ্গীতে কোন রূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

"তুমি কখনও সৈনিকের কার্য্য কর নাই,—তুমি ব্রাহ্মণ তনয়, তবে এ কর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছ কি জন্য?"

প্রে। " আমার একটী ভিক্ষা আছে,—আপনাকে প্রভুভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা করিব,—এক্ষণে সে ভিক্ষা করা বৃথা হইবে।"

তারসন খাঁ পুনরায় বলিলেন "মহারাজ! দেখুন আমার কথা সত্য কি না, আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে অস্বীকৃত হইতেছে।"

প্রেমদাসের উত্তরে রাজা টোডর-

মল্লের অন্য রূপ বিশ্বাস হইল,—তিনি ভাবিলেন গুপ্তচরের কথায়, বা আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে কখন ক্রটী হয় না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শত্রুরা আমাদের সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের এক জন নহ, আমি কি রূপে জানিব ?"

প্রে। "ভদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রের সত্য কথার উপর বোধ হয় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

টো। "অনেক সময় অভদ্র লোকও ভদ্র লোকের বেশ ধারণ করে ;—অনেক সময় ভদ্র বংশীয় লোকও কপটাচারী হয়।"

প্রে। "আমি অনেক পাপ করিয়াছি, কপটাচরণ কখন করি নাই,—আমাদের বংশে সে দোষ নাই"—ক্রোধে প্রেমদাসের স্বর বদ্ধ হইল।

সাদীক খাঁ বলিলেন "মহারাজ! এ লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহা হইলে, আমি দায়ী হইব, আর কি বলিব। আমাদিগের শিবিরে মাসুমী ফরঙ্খুদীর ন্যায় লোক আছে,—আর আপনি ইহাকে লইতে সন্দেহ করিতেছেন ?"

রাজা ওষ্ঠের উপর একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সাদীক খাঁর উপর তিরস্কার দৃষ্টি করিলেন। সাদীক খাঁ লজ্জিত হইলেন। রাজা পুনরায় প্রেমদাসকে বলিলেন,

"যুবক! তোমার কথা উদার চেতা বীর পুরুষের ন্যায়, কিন্তু অনেক সময় গভীর খলতা বাহ্যিক ঔদার্য্য অবলম্বন করে।"

প্রেমদাসের মুখ ক্রোধে রক্তিমা ধারণ করিল, চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ধীরেং বলিলেন "যদি আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় দিন প্রণাম করিয়া চলিয়া যাই।"

টো। "যাও।"

প্রেমদাস প্রস্থান করিলেন। টোডরমল্ল অবিলম্বে তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া সম্মানপুরঃসর পঞ্চশত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপদ।

Brutus—Do you know them?
Lucius—No Sir: their hats are plucked about their ears
And half their faces buried in their cloaks,
That by no means I may discover them
By any mark of favour.
Brutus—Let them enter
They are the faction. O Conspiracy!
Sham'st thou to shew thy dangerous brow by night,
When evils are most free? O then by day
Where wilt thou find a cavern dark enough
To hide thy monstrous visage?
Shakespeare.

এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া প্রেমদাস দিনেং অতি শতর্কতা ও প্রভুভক্তি সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন যে কার্য্য করিতে রাজা আদেশ দিতেন, প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিতেন। আপন কায়িক পরিশ্রম বা বিপদ বা সময় অসময় কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। একদা রাজার আদেশানুসারে ছদ্মবেশে শত্রুর শিবির পর্য্য-

বেক্ষণ করিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"বৎস প্রেমদাস, তুমি যে এই বয়সে এরূপ নিঃশঙ্ক হইয়াছ, তোমার কি জীবনে কোন সুখ নাই যে জীবন তুচ্ছজ্ঞান কর।"

প্রে। "মহারাজ! যে দিন সৈনিক হইলাম, সেই দিনই রাজ কার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি,—তবে যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত থাকি, তবে সে আপনার আশীর্ব্বাদে আর পিতার পুন্য বলে।"

টো। "তোমার পিতা জীবিত আছেন?"

প্রে। "আছেন।"

টো। "তোমার ভ্রাতা ভাগিনী কয় জন?"

প্রে। "আমার এক জন জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার কাল হইয়াছে, এক্ষণে আমিই পিতার এক মাত্র সন্তান জীবিত আছি।"

টোডরমল্লের মুখ গম্ভীর হইল। বলিলেন "বৎস যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়, তবে তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে? আমারও পুত্র আছে, সেই জন্যই এই ভাবনা আসিতেছে। ধারুর বয়ঃক্রম তোমারই মত; তাহার সাহস তোমারই মত; তোমারই মত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; মরণকে ভয় করে না। যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে। তথাপি রাজ কার্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে। তোমার পিতাকে লিখিও যে ধারুর পরমায়ু শেষ হইলে সে যুদ্ধেই নিহত হয়, ইহা অপেক্ষা টোডরমল্লের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই।"

প্রেমদাস নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

টোডরমল্ল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পিতা ভিন্ন তোমার আর কে প্রিয় বান্ধব আছেন?"

প্রেম দাসের সরলার কথা মনে আসিল। লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। একবার ভাবিলেন এই সময়ে সরলার কথা সমস্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করি। সে কথা মুখে আনিতেছিলেন এমন সময়ে টোডর মল্ল বলিলেন

"লজ্জা কি? তোমাদের এ বয়সই প্রেমের সময়। কিন্তু জানিও প্রেম কেবল কিছু দিনের স্বপ্ন মাত্র,—প্রেম কেবল আত্মসুখসাধনের একটী উপায় মাত্র। সে আত্ম সুখে মগ্ন হইয়া জীবনের গুরুতর, মহত্তর কার্য্য বিস্মৃত হইও না,—মানব সাধারণের সুখ সাধনে পরাঙ্মুখ হইও না।"

এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন, প্রেমদাসও নানা বিষয় চিন্তা করিতে২ আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যে দিন এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সেই দিনই সেনাদিগের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের বড় কষ্ট হইয়াছিল। অনেক সৈনিক পুরুষ একেই টোডরমল্লের বৈরাচরণ করিবার মানস করিয়াছিল, তাহাতে আবার এই কষ্ট হওয়াতে সুযোগ পাইবার আশা করিয়াছিল। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এরূপ সতর্কতা ও বুদ্ধি সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, উপরি উক্ত সৈনিকগণ আপন স্বার্থ সাধনের কোন সুযোগই পাইল না। রাজা টোডরমল্ল দিন২ সেনাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন; দিল্লী হইতে অর্থ

আসিলেই সেনাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন, সদর্পে সকলের সম্মুখেই বলিতেন,—"আমরা কখনই জঘন্য পাঠানদিগকে জয় লাভ করিতে দিব না, দিল্লীশ্বরের অবশ্যই জয় হইবে।" সেনাপতির, এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া সৈন্যগণ উৎসাহ পরিপূর্ণ হইত। বিরুদ্ধাচারী সৈনিকগণ শিবির মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার কোন সুযোগই না পাইয়া একেং শত্রুর নিকট পলায়ণ করিবার মানস করিল।

শত্রুরাও নিতান্ত জঘন্য বা হীন বল নহে। প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে বঙ্গদেশের সুবাদার মজফর খাঁর নিধন প্রাপ্তির পর সমস্ত বঙ্গ দেশ পাঠান সৈন্যে প্লাবিত হয়। যে দেশ টোডরমল্ল ক্রমান্বয়ে দুই বার জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দিল্লীশ্বরের কনা মাত্র স্থল রহিল না। সেই সমগ্র সৈন্য একীকৃত হইয়া মুঙ্গেরের নিকটে আসিয়াছিল,—ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে ছিল। সাগর তরঙ্গের মধ্যে পর্ব্বত শিখরের ন্যায় সেই পাঠান সৈন্যের সম্মুখে রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—কি রূপে সেই ক্ষুধাক্লিষ্ট বিদ্রোহোন্মুখ সৈন্য লইয়া সেই শত্রুরাশিকে পরাজয় করিবেন তাহা টোডরমল্লের বিশ্বাসী সেনাপতিগণও অনুভব করিতে পারিতেন না। কেবল মাত্র রাজা টোডরমল্লই নিঃশঙ্কচিত্তে এই বিপদরাশি সত্ত্বেও বিজয় লাভের স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিপদ রাশিতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্থৈর্য্যের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে নাই।

প্রেমদাস শিবিরে আসিয়া নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া একবার, দুইবার তিনবার পাঠ করিলেন মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পত্রে এই রূপ লিখিত ছিল।

"তোমার বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া
"চমৎকৃত হইয়াছি। ভারৎবর্ষে যাহাকে
"কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে
"নাই তুমি তাহার চক্ষে ধুলী দিয়াছ।
"আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব,
"কেননা যে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে
"ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অদ্য এক
"প্রহর রজনীতে শ্মশান ঘাটে দেখা
"হইবে"।

এ পত্রের কিছুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। "ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই"—সে কে? বোধ হয় রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাহার চক্ষে ধুলা কে দিয়াছে? "পতনোন্মুখ গৃহ কি? প্রেমদাসের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহী কর্ত্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে,—শ্মশান ঘাটে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাওয়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাইতেও পারেন। নিরূপিত সময় শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই তাঁহার এক মাত্র সহায়।

রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। নীল মেঘ আকাশে উড়িতেছে; একং খানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিম দিকে রাশীকৃত হইতেছে; সেই পশ্চিম দিক হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে; বিদ্যুতালোকে

শ্মশানের ভয়ানক বস্তু সকল এক একবার দেখা যাইতেছে। কোথাও২ সম্প্রতি শবদাহ হইয়াছে, ভস্মরাশির মধ্যে অগ্নি এক এক বার দেখা যাইতেছে; কোন স্থানে বা শব এখনও দাহ হইতেছে; উজ্জ্বল অগ্নি শিখা চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে নানা রূপ অপরূপ ছায়া দেখা যাইতেছে,—নিকটস্থ বৃক্ষরাশীর মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানা রূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই পৈশাচিক শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রেমদাসের স্বভাবতঃ সাহসী হৃদয়ও এক২ বার স্তম্ভিত হইতেছিল। যত পদচারণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর ততই কন্টকিত হইতে লাগিল। কখনং দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন,—অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে গমন করিয়া কখনও বা দেখেন ধূম রাশি উত্থিত হইতেছে, কখনও বা বোধ হয় যেন সেই আকৃতি ধীরে২ যাইয়া বৃক্ষের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগণমণ্ডল ক্রমশঃই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশঃই শ্মশান ও বৃক্ষের উপর দিয়া ভীষণতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল; গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্র মাত্র দৃষ্টি গোচর হইতেছে না;—দূরে শিবাগণ মুহুর্মুহু বিকট শব্দ করিতেছে;—যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যে দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটা ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। প্রেমদাস তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু যত বার সেই দিকে নয়ন পাত করেন, তত বারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেমদাস অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে আগমন করিলেন; বোধ হইল যেন, সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। প্রেমদাস সে দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোধ হইল যেন জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া দেখিলেন, সেই দুই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

" ভগবান সহায় হউন " এই কথা বলিয়া প্রেমদাস অসি হস্তে ধীরে২ সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন। অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে২ ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল।—আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাসশব্দ শ্রুত হইল।

" ভগবান সহায় হউন " বলিয়া সেই জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে এরূপ নিবিড় অন্ধকার যে, চারি হস্ত দূরে কোন দ্রব্যই লক্ষিত হয় না। প্রেমদাসের সমস্ত শরীর কন্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম বহির্গত হইতেছে। সর্ব্ব অঙ্গ, হস্তের অসি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। সেই হাসির শব্দ লক্ষ করিয়া যাইতে লাগিলেন। হটাৎ তাঁহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

প্রেমদাস চহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে, তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য।

তাহারা ইঙ্গিত করিয়া প্রেমদাসকে সঙ্গে২ আসিতে বলিল। প্রেমদাস তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মনুষ্যর সহিত অনেক্ষণ নীরবে যাইতে লাগিলেন। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার। নিঃশব্দে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখ মণ্ডল হইতে আবরণ তুলিয়া লইল,—সেই সময়ে বিদ্যুত দেখা দিল। বিদ্যুতালোকে প্রেমদাস তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। হুমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

প্রেমদাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

"এত রাত্রিতে এই ভয়ঙ্কর বেশে এ স্থানে আপনারা কি করিতেছেন"

হুমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি প্রেমদাসের সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম"।

প্রেমদাস ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন।

"আমি আপনাদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই"

হুমায়ুন সেই রূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন।

"তাহা হইলে বোধ করিব, আমরা যে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সেনাপতি প্রেমদাস তাহা সমাধা করিতে অক্ষম"।

প্রেমদাস সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—"কার্য্যকালে প্রেমদাস অক্ষম কি সক্ষম তাহা অন্য লোকে বিবেচনা করিবেন। ভাল শ্মশান ভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে কি সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়? আপনারা পিশাচের রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন কি জন্য"?

হুমায়ুন আবার সেই রূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "সেনাপতি প্রেমদাসের যে অসাধারণ সাহস আছে, তাহা আমাদের শিবিরে অবিদিত নহে। তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলাম। পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস আবশ্যক হয়"।

প্রেমদাস অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি"?

হুমায়ুন বলিলেন "তাহা কি জানেন না? উপহাস করিতেছেন কেন? আপনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, আপনি গূঢ় মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন সে কার্য্য কি আবার আপনি জানেন না? আপনার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে পারে নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন। আপনি চিরজীবী হউন, এক দিন বঙ্গদেশের গৌরব স্থল হইবেন।"

প্রেমদাস, বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তর্খান বলিতে লাগিলেন,

"যথার্থই হুমায়ুন ও আমি কত বার অন্তরালে আপনার কৌশলের ধন্যবাদ করিয়াছি। শিবিরে আমাদের মত অনেক জনই বিদ্রোহোম্মুখী সেনাপতি আছেন। ত্রিংশৎসহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি মাসুমী ফরাঙ্খুদীও বিদ্রোহ তৎপর। কিন্তু রাজা টোডর-

মল্ল আমাদিগের সকলের অন্তরের ভাব জানিয়াছেন, আমাদিগের সকলেরই উপর এরূপ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা কামনা সিদ্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি কি কুহুকে, কি মহা কৌশল যন্ত্রে যে রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ধন্য আপনার বুদ্ধি বল!"

প্রেমদাস অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি যদি আপনাদিগের কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝিয়া থাকি।

তর্খান পুনরায় বলিতে লাগিলেন। "আর উপহাস করিতেছেন কেন। আমরা কতবার শিবিরে সমবেত হইয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছি; কতবার মদ্যপান করিতেং আপনার জয়ধ্বনি করিয়াছি; কত বার মনেং অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যে দিন আমরা বিদ্রোহী হইব, সে দিন প্রেমদাস আমাদের বিদ্রোহ সেনাপতি হইবেন।"

তর্খান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু প্রেমদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

"আমি বিদ্রোহী নহি,—আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন, আমি গুপ্ত চর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহ কামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা ঘোরতর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর আপনারা যদি বিদ্রোহী হয়েন, তবে আমাকে বিদায় দিন। আমার সহিত আপনাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এই ক্ষণেই রাজা টোডরমল্লকে সর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত করাইব। কুক্ষণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি পড়িয়াছিল।"

হুমায়ুন দিউয়ানা ও তর্খান ফার্ম্মিলীর মুখ গম্ভীর হইল, উভয়ই ভাবিতে লাগিল, "কি! আমরা এত দিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাসুমী ফরাঙ্খুদী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ জানেন না?" উভয়ই কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন। প্রেমদাসও শস্ত্র বিষয়ে অপটু ছিলেন না, কোষ হইতে অসি বহির্গত করিলেন। এমত সময়ে হুমায়ন সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমাদিগের নিকট বিদ্রোহ মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। তাহা সম্ভব বটে, এত দূর মন্ত্রণা গোপন রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলে, রাজা টোডরমল্লকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট অবিশ্বাসের কিছুই কারণ নাই; আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আবশ্যক নাই; আপনি একর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বাবধি আমরা বিদ্রোহোন্মুখ। এই দেখুন পাঠানদিগের নিকট হইতে আমরা কএক খানি পত্র পাইয়াছি।"

প্রেমদাস ক্রোধে ও বিস্ময়ে অন্ধ হইলেন, বলিলেন "পামর মুসলমান! কাপুরুষ বিদ্রোহি! তোর পাপের সমুচিত দণ্ড দিব। আমার ইচ্ছা হইতেছে, খড়্গাঘাতে তোর শিরশ্ছেদন করি,—কিন্তু শত্রুর সহিতও অন্যায় যুদ্ধ করিব না,—তোর অসি বাহির কর।"

দুই জনে তুমুল সংগ্রাম হইল। অসির ঝন্ ঝনা শব্দ সেই নৈশ অন্ধকার বন মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রেমদাস হুমায়ুন অপেক্ষা অনেক

বলিষ্ঠ ছিলেন, ও অল্প দিন মধ্যে চমৎকার অস্ত্র চালন শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল; রক্তে শরীর ভাসিয়া যাইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন। তখন "প্রেমদাস সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পামর! এক্ষণে রাজা টোডরমল্লের নিকট যাইয়া কি ক্ষমা প্রার্থনা করিবি? না এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদন করিব?"

এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত না হইতেই, তর্থান হটাৎ পশ্চাৎ দেশে আসিয়া প্রেমদাসকে আক্রমণ করিল।

যখন প্রথমে প্রেমদাস ও হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্থান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্থান ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন,—কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লম্ফ দিয়া প্রেমদাসকে আক্রমণ করিলেন। প্রেমদাস ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে২ হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসি হস্ত হইলেন। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে অক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং দুই জনে একেবারে প্রেমদাসকে আক্রমন করিলেন।

এবার প্রেমদাসের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত এক জনের অসি যুদ্ধ করা সম্ভবে না। বিশেষতঃ তর্থান ও হুমায়ুনও অসি চালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হুমায়ুনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার বশতঃই কিছু ক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাণ রক্ষার সম্ভবনা।

প্রেমদাস এ সকল চিন্তায় ভীত হইলেন না। এ সকল চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্র শিক্ষাবশতঃ, অনেক ক্ষণ একাকী দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে একবার ইহাকে একবার উহাকে প্রহার করেন; তাঁহারাও প্রহৃত হইলেই কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনরায় সম্মুখীন হয়েন। হুমায়ুন যেরূপ কাতরতার সহিত অস্ত্র চালন করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি যে আর অধিক ক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই প্রেমদাসের জয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। যতক্ষণ হুমায়ুন না ক্ষান্ত হয়েন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করা প্রেমদাসের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। সহস্র কৌশল থাকাতেও তিনি একাকী দুই জনের সহিত সমযুদ্ধ করিতে পারিলেন না,—কেহই পারে না। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; রুধিরে অঙ্গ ও বস্ত্র প্লাবিত হইতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। রুধিরাক্ত কলেবরে সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে; সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে; ক্রোধে অধর দংশন করাতে অধর হইতে শোনিত নির্গত হইতেছে; সর্ব্ব অঙ্গ ও বস্ত্র রক্তে প্লাবিত, নয়নে নিমেষ মাত্র নাই; অস্ত্র চালনে মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ নাই; সমস্ত অবয়ব দেখিলে বোধ হয় যেন ক্রোধ মূর্ত্তিমান হইয়া

রক্তাক্ত কলেবরে যুদ্ধ করিতেছে।

বিপদ্ একাকী আইসে না। এই বিপত্তির উপর প্রেমদাসের অন্য বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন শরীর হওয়াতে, শেষে তর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্খানও সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। এক জন দক্ষিণ দিক হইতে ও অন্য জন বাম দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমকালীন সতেজ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রেমদাস হটাৎ পশ্চাৎ যাইবার মানস করিলেন, ভাবিলেন হটাৎ পশ্চাৎ যাইলে তাঁহার দুই জন শত্রু পরস্পরের উপর যাইয়া পড়িবে। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লম্ফ দিয়া যেই পশ্চাতে যাইবেন, অমনি গঙ্গা সলিলে নিপতিত হইলেন। "মাতঃ পৃথিবি! এই বিপত্তি কালে তুমিও স্থান দিলে না" এই কথা বলিতে না বলিতে, গঙ্গা সলিলে মগ্ন হইলেন। তর্খান ও হুমায়ুন প্রেমদাসের মৃত্যু স্থির করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব উদ্ধার

Prisoner! pardon youthful fancies;
Wedded? If you *can*, say no!
Blessed is and be your consort;
Hopes I cherished let them go!

Wordsworth.

হুমায়ুন ও তর্খান যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা বড় মিথ্যা নহে প্রেমদাস যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থান শক্তি ছিল না, সন্তরণ করা দূরে থাক। উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া একেবারে অচেতন হইলেন, শরীর ক্ষণেক জলে ভাসিতে লাগিল, যখন মগ্ন হইবার উপক্রম হইল, সেই সময় এক বার বিদ্যুতালোক হইল, বিদ্যুতালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দূরস্থ নৌকারোহী এক যুবক ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন।

সেই নৌকার মাঝী মাল্লা সকলেই সুপ্ত ছিল,—সেই যুবক একাকী বাহিরে বসিয়া মেঘের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন, বিদ্যুৎ ও বাত্যায় তাঁহার হৃদয়ে যেন আনন্দ উদ্রেক করিতেছিল;—তাঁহার অন্তরের বিদ্যুৎ ও বাত্যা এই প্রকৃতির গর্জ্জন শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইতেছিল।

দূর হইতে প্রেমদাসকে প্রথমে কাষ্ঠ খণ্ড বোধ হইল। কিন্তু বিদ্যুতালোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া দেখিতে পাইলেন,—প্রেমদাসের মুখ খানিও স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইলেন,—প্রেমদাসের হাত পা কিঞ্চিৎ চলিত হওয়াতে যুবক জানিতে পারিলেন যে ইনি এখনও জীবিত আছেন। তৎক্ষণাৎ আর কাহাকেও না জাগাইয়া, কাহারও সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া আপনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

প্রেমদাস জলে মগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই যুবক আসিয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিলেন। অচেতন ভাসমান শরীরকে জলের উপর টানিয়া লইয়া যাওয়া বড় কঠিন নহে,—যুবক ধীরে২ তাঁহাকে নৌকার দিগে লইয়া চলিলেন। শেষে আপনি নৌকায় উঠিয়া প্রেমদাসকে তুলিলেন।

প্রেমদাসের শরীরে রক্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহার শরীর ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার পর

সেই অস্ত্রাঘাতগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া ঔষধি দিতে লাগিলেন। দেখিলেন যদিও অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাজ্ঘাতিক নহে, তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না।

সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রেমদাস দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরম সুন্দর যুবক বসিয়া রহিয়াছেন; অনিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, প্রেমদাসের বোধ হইল যেন এই সুপুরুষকে কখন দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,

"যুবক! আপনি আমার প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয়, আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আপনি কে বলুন, কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব বলুন। আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন জানিলে, রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না।"

যুবক উত্তর করিলেন "আপনার নিকট অন্য পুরস্কার চাহি না কেবল একটী প্রার্থনা আছে। কিন্তু প্রেমদাস আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছে"? এই কথা বলিয়া বক্তা একটু হাসিলেন।

সে সুমিষ্ট অধরে সে সুমিষ্ট হাসি এখনও প্রেমদাস বিস্মৃত হয়েন নাই; সে কোকিলনিন্দিতকণ্ঠধ্বনি তিনি এখনও ভুলেন নাই। কাতরতা সত্ত্বেও একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন।

"রমণী রত্ন! ভিক্ষারিণি! আমি জীবত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না। কিন্তু এ পুরুষ বেশ"——

প্রেমদাস আরও কিছু বলিতেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষারিণী (পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত বিমলা) ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। পরে ধীরে২ বলিলেন।

"আমি স্ত্রীলোক এই নৌকায় কেহ জানে না, জানিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে শ্রবণ করুন।"

প্রেমদাস বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া সেই রমণীর বদন মণ্ডলের উপর চাহিয়া রহিলেন। সে বদনমণ্ডলের সহসা ভাবান্তর হইল। যে সুহাসিতে চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল, ওষ্ঠদ্বয় মিষ্টতর হইয়াছিল, সে সুহাসি শুখাইয়া যাইয়া মুখ অতিশয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। অতি গম্ভীর স্বরে বিমলা বলিতে লাগিলেন,

"প্রেমদাস! মহেশ্বর মন্দিরে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার দ্বিতীয় একটী ভিক্ষা আছে। এই ক্ষণেই আমার ভিক্ষা দান করিতে আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সে ভিক্ষা এই, আপনি আমাকে জন্মের মত বিস্মৃত হউন"!

প্রেমদাস চমকিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

"সে ভিক্ষা এই যে, আমি কখন প্রেম দৃষ্টিতে আপনাকে নিরীক্ষন করিয়াছি তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন, আমি কখন আপনার দেব মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন"।

প্রেমদাস এখনও বিস্মিত ও নিরুত্তর

হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতি রমণীর প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল তাহা প্রেমদাস অগ্রেই দুই একবার অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদূর হইয়াছে তাহা জানিতেন না। আর এক্ষণই বা সেই প্রেম উচ্ছেদ করিবার যত্ন করিতেছেন কেন? প্রেমদাস কিছু স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

"আর আমি অভাগিনি! আমার হৃদয়েও আপনার মূর্ত্তি গভীরাঙ্কিত হইয়াছে তাহাও উৎপাটিত করিতে যত্ন করিব,—না পারি হৃদয় উৎপাটন করিয়া জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিব"।

প্রেমদাস ধীরে২ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনার এ অভিপ্রায় কি জন্য হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি"?

বিমলা উত্তর করিলেন "আমি আপনার প্রণয়ের পত্নী হইব মানস ছিল, প্রণয়ে কাহারও স্বপত্নী হইবার আকাঙ্ক্ষা করি না। বিধাতা আমার ললাটে দুঃখ লিখিয়াছেন, অন্যের সুখের পথে কাঁটা দিব কি জন্য।"

প্রেমদাসের সরলার কথা মনে পড়িল—তিনি অবাক হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রাতে শিবিরে রাষ্ট হইল যে, হুমায়ুনও তখন পূর্ব্ব রাত্রিতে শিবির পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন।

প্রেমদাস নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া ধীরে২ শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমলা।

But hawks will rob the tender joys,
That bless the little lint white's nest
And frost will blight the fairest flowers,
And love will break the soundest rest,

* * * * * *

As in the bosom o' the stream,
The moon beam dwells at dewy e'en,
So trembling, pure was tender love,
Within the breast o' bonnie Jean.
And now she works her mammie's work,
And aye she sighs with care and pain,
Ye wist na what her ail might be,
Or what wad make her weel again,

Burns,

বিমলা কি জন্য সেই অপরূপ পরিচ্ছদে মুঙ্গের যাত্রা করিতেছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হইবেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের তাঁহারও পূর্ব্ব কথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং প্রেমদাস যে আশ্রমে সরলাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই আশ্রমের কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিব।

ইচ্ছামতী তীরে বিস্তীর্ণ আশ্রম ছিল। তথায় কিয়ৎ সংখ্যক মুনি সপরিবারে বাস করিতেন। নিকটে একটী আরও বিস্তীর্ণ বন ছিল, সেই হেতু সেই আশ্রমকে লোকে বনাশ্রম বলিত। অধুনা তথায় একটী গ্রাম হইয়াছে, তাহাকে বনগ্রাম কহে।

সায়ংকাল উপস্থিত। যে২ আশ্রমবাসীগণ কার্য্যোপলক্ষে দূরে কোথাও যাইয়াছিলেন, তাঁহারা একে২ আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; আশ্রমের শান্ত লতাপাদপের মধ্য হইতে উত্থিত সায়ংকালের যজ্ঞধূম দেখিতে পাইলেন; দুই একটী কুটীর হইতে

সায়ংকালীন প্রদীপালোক দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের মধ্যে সকলই শান্ত, নিস্তব্ধ। স্বচ্ছমনা মুনিগণ সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন, কোন কোন মুনিপত্নী গৃহকার্য্য সমাধা করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিশুদিগকে সমবেত করিয়া মহাভারতের পুণ্যকথা গল্প করিতেছেন। মুনিকন্যাগণ কেহ বা হরিণ শিশু লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বা হরিণীর নয়নের সহিত স্বীয় বয়স্যার নয়নের বিশালতা ও চঞ্চলতার উপমা দিতেছেন। নদীতীর হইতে রমণীগণ কলস পুরিয়া জল লইয়া আসিতেছেন; কুটীর প্রাঙ্গণে হরিণ হরিণীগণ রোমন্থ করিতেছে।

সন্ধ্যার শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি আশ্রমের সহস্র পাদপে প্রতিহত হইয়া গগণমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রদোষকালীয় শঙ্খধ্বনি অপেক্ষা মানব হৃদয়ে উপাসনা উত্তেজক আর কিছুই নাই। সেই পবিত্র ধ্বনিতে মুনিদিগের হৃদয়কবাট উদ্ঘাটিত হইল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আরাধনা করিতে লাগিলেন। রোদনপটু শিশুকে ক্ষণেক শান্ত করিয়া মুনিপত্নী সেই গীতে যোগ দিলেন, ক্রোড় হইতে কলস নামাইয়া অর্দ্ধ পথে দণ্ডায়মান হইয়া মুনিকন্যা গীত গাইলেন, চঞ্চল হরিণশিশুকে ধানা দিয়া ক্ষণেক শান্ত করিয়া কিশোর বয়স্কা সেই আরাধনায় তৎপর হইলেন, ক্রীড়া তৎপর বালক ক্ষণেক ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইয়া সেই গান গাইল,—মাতার ক্রোড়ে শিশুও মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সেই সঙ্গে২ সেই গীতে যোগ দিল। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার কণ্ঠনিঃসৃত এই অনন্ত গীত সায়ংকালের শঙ্খধ্বনি সঙ্গে২ নৈশ গগণে উত্থিত হইতে লাগিল। গীত সাঙ্গ হইলে সমস্ত আশ্রম পুনরায় তুষ্ণীম্ভাব. ধারণ করিল।

সেই সায়ংকালে মুনিকন্যা বেশে দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই মুনি কন্যা নহেন,—এক জন আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত সরলা, অন্য জনের নাম কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তিনি কাহার দুহিতা, কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কত দিন মৃত্যু হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া আশ্রমবাসীগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা সততই শান্ত, অন্যমনস্কা, ও চিন্তাশীলা। যে স্থানে আশ্রম পাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারময়, যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ মাত্র নাই, মধ্যাহ্ন কালে লোকালয় ত্যাগ করিয়া কমলা সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি মৃদু নিঃস্বৃত ঘুঘুর প্রেমগীত শুনিতে ভাল বাসিতেন। যেখানে অভ্র বৃক্ষের পদ প্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, গভীর রজনীতে কমলা সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন, নদীর অনন্ত কুল২ ধ্বনি শুনিতে ভাল বাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি শুনিতে২ কমলা যে অনন্ত চিন্তা করিতেন, সে চিন্তা কিসের? কে বলিবে কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন

গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্যার মত যত্ন করিতেন কিন্তু কমলা গৃহে থাকিবার সময় সর্ব্বদাই অন্যমনস্কা হইয়া থাকিতেন, অন্যের সহিত কথা কহিতে২ কথন কথন চিন্তা মগ্ন হইতেন, তাহাতে লোকে হাসিলে আবার লজ্জিত হইয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিতেন। সে কথা বার্ত্তা কি মধুর, কি ভাব পরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

কমলা নিরুপমা সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটি অতিশয় প্রশস্ত শান্তজ্যোতি ও চিন্তা প্রকাশক, সমস্ত মুখ খানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় ম্লান। দেহ অতি সুকুমার বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত হইয়া শৈবাল বেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত; কিন্তু সে প্রস্ফুটিত পদ্ম নহে,—সায়ংকালে মুদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জল হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে,সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়াতে যেরূপ ধ্যাননিমগ্নের ন্যায় দেখায়, এই কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সততই চিন্তায় মগ্ন,—লোকালয়ে সেইরূপ মুদিত প্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন. চন্দ্রশেখরের গৃহ কার্য্য সমস্ত তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন,—কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত, নিবিড় পাদপ আবৃত স্থানে যাইতেন। শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন,—তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ তিনি যেরূপ একাকী বনে২ বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়াম্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অদ্য সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বন বিচরণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা সরলাকে ভাল বাসিতেন,—সে সরল চিত্ত বালিকাকে না ভাল বাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন,—আপনার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সেই বিধবার দুঃখে দুঃখী হইতেন—সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন সরলার আবার দুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব সরলা আর বালিকা নাই,—হৃদয় কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যে দিন হইতে প্রেমদাস সরলারনিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময়ী কন্যা, কিন্তু এক্ষনে মাতার সেবা সুশ্রুষা করিতে২ সততই আর এক জনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর এক খানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিত, কিন্তু কার্য্য করিতে২ মধ্যে২ সহসা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, মধ্যে২ সহসা চক্ষে জল আসিত। লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে২ চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুদ্বয় পরিপূর্ণ হইত,—ক্রমে২ ধীরে২ সেই জলে মুখ খানি সিক্ত হইত। আহা! বালিকার মুখে সে জল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে

তাহার উত্তর দিতে পারিত না,—কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? যাঁহার কণ্ঠে একবার লীলাক্রমে মালা দিয়াছিলাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? হৃদয়ের প্রেমদাসকে আবার কি দেখিতে পাইব। এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইত, চারি দিক শূন্য দেখিত। জ্ঞানচক্ষে সেই ইচ্ছাপুরের কুটীর দেখিতে পাইত,—সেই কুটীরের পার্শ্বে সেই উদ্যান,—সে উদ্যানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র,—সেই পুষ্পচারার মধ্যে, সেই চন্দ্রালোকে সেই হৃদয়ের প্রেমদাস,—সহসা নয়নজলে সরলার মুখ খানি প্লাবিত হইয়া যাইত।

আবার চক্ষু মুছিয়া কার্য্য করিতে বসিত, আবার কিছু ক্ষণ পর ধীরে ধীরে চিন্তা আসিত। সন্ধ্যার সময় ছায়া যেমন ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে গগনমণ্ডল ও পৃথিবী আচ্ছন্ন করে,—প্রণয় চিন্তাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে সরলার হৃদয় আচ্ছন্ন করিত। ভাবিত একবার যদি তাঁহার দেখা পাই,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তাঁহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে বলি,—কি বলি?—না কিছু বলি না,—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে আমার জ্বলন্ত হৃদয় স্থাপন করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে আমার মস্তক স্থাপন করিয়া একবার মনের সাধে ক্রন্দন করিয়া স্বর্গ সুখ লাভ করি। অভাগিনী একবার ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

আবার চিন্তা আসিত। একবার কি প্রেমদাসের সহিত দেখা হইবে না? অবশ্য হইবে। কিন্তু সে কবে হইবে? এক্ষণেই দেখা হয় না কেন? প্রেমদাস আসিতেছেননা কেন? তিনি কি সরলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? সরলার চক্ষে আবার জল আসিল। প্রেমদাস কুশলে আছেন ত? নয়ন জলে মুখ খানি প্লাবিত হইয়া যাইল।

বালিকা প্রেমের কথা কাহাকেও বলিত না, যে পাবকে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল সে পাবক কাহাকেও দেখাইত না, নীরবে অবারিত অশ্রুবারি দ্বারা সেই পাবক নির্ব্বাণ করিতে চাহিত, ব্যাধবিদ্ধকপোতীর ন্যায় নীরবে নিভৃত নিকুঞ্জ বনে যাতনা সহ্য করিত। আর আশ্রমবাসীগণ?—হায় তাহাদিগের মধ্যে কয়জন সরলার যাতনা বুঝিত? মুনিগণ ক্রিয়া কর্ম্মেই ব্যস্ত, সরল চিত্ত মুনিকন্যাগণ সরলার পীড়ার কিছুই বুঝিত না, সরলাকে কাতর দেখিলে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত "সরলা! অদ্য তোমাকে এরূপ ম্লান দেখিতেছি কেন,—কোন অসুখ ত হয় নাই? কোন কষ্ট হইয়াছে? কি মনে কোন দুঃখ কি ভাবনা হইয়াছে?" এরূপ প্রশ্নে সরলা অধিকতর লজ্জিত হইত,—সে স্থান হইতে প্রস্থান করিত। এমন বিপত্তির সময় তাহার হৃদয়ের অমলা কোথায়? স্নেহগর্ভ বাক্যে হৃদয় শান্ত করিবে, মিষ্ট হাস্য দ্বারা ভাবনা দূর করিবে, এমন অমলা কোথায়?

আশ্রমের মধ্যে এক জন মাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল।—কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূলে, সুস্নিগ্ধ ছায়ারত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন, সান্ত্বনা করিতেন, আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন; পবিত্র প্রেমের কথা বলিতেন; দুঃখের কথা বলি-

তেন; সহিষ্ণুতার কথা বলিতেন ; সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতেন। সরলা সেই গল্প শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইত ; সেই মুখের দিগে চাহিয়া চাহিয়া আপন দুঃখ দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকা হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। ফলতঃ দুই জনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানা রূপ হৃদয়গ্রাহী কথা ও গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ গভীর তলচারী ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত এক মনে সেই সমুদয় শুনিত ;—সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত ; সে হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে, আপন দুঃখ কথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কেবল দেখি।

Spirits—Earth, ocean, air, night, mountains, winds, thy star,
Are at they beck and bidding, child of clay!
Before thee at thy quest the spirits are,—
What wouldst thou with us, son of mortals——Say?

Manfred—Forgetfulness————

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Spirits—Ask of us subject, sovreignty the power,
O'er Earth—the whole or portion—or a sign,
Which shall control the Elements where of,
We are the domenators, each and all
These shall be thine.

Manfred—Oblivion, self oblivion :————

Byron.

কমলা বলিলেন- সরলা"।

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন"?

সরলা মুখ খানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন আজ দুঃখবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহ সহকারে সরলার নিকটে বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন, পরে স্নেহগর্ভবচনে নানা প্রসঙ্গের কথা আনাতে সরলার মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা হতভাগিনী আছে। তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, জগৎ সংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়েশ্বর জীবিত আছেন, তোমার আশা ভরসা সকলই আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে যাহার কিছু মাত্র নাই, যাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই ইহজন্মে কেহ নাই, সংসারে সুখ নাই, কেবল অতুল চিন্তা জলে ভাসিতেছে"।

সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল, বলিল "দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাই, তুমি কিরূপে এত সহ্য কর?"

ক। "বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারী জন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব"।

স। "যদি না পারি"?

ক। "তবে নারী জন্ম গ্রহণ করিলে কেন?—দেখ মনুষ্যের মান সম্ভ্রম আছে, ধন সম্পত্তি আছে, কুল মর্য্যাদা আছে, নাম গৌরব আছে, জীবনের সহস্র ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে একটী না হইলে অন্যটী অন্বেষণ করিতে পারে, সেটী না পাইলে অপর একটী অনুসন্ধান করে, সেই অনুসন্ধানে জীবন স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, যত দিন চেষ্টা থাকে, যত দিন আশা থাকে, তত দিন জীবন দুর্ব্বহনীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মনুষ্যের? যুবকের প্রেম, উচ্চাভিলাষ, মান,সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন কামনা, পুত্র কামনা, বংশবৃদ্ধি কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষায় জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে"?

কমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। সরলার দিকে চাহিলেন দেখিলেন সরলা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছে আর তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন।

"অভাগিনী নারী কুলের কি আছে? সংসার স্বরূপ অপার অগাধ সমুদ্রে তাহাদিগের একটীমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তরী আছে,—সেটী প্রেম। সেই প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে, যদি সেই তরীটী ডুবিল, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে সন্তরণ ভিন্ন আর উপায় নাই"।

সরলা বলিল,—"আমার বোধ হয় দিদি তুমি বড় দুঃখিনী, কেননা তোমার কেহই নাই, জগতে আশাও নাই"।

কমলা উত্তর করিলেন।

"তথাপি সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিন্তাবলে আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতে শিখিয়াছি,—চিন্তাই আমার জীবন স্বরূপ হইয়াছে। ঐ যে গলিত বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিতে পাইতেছে, মধ্যাহ্নে যখন ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ মর্ম্মর শব্দ শ্রবণ করি, আর ঘুঘুর মৃদুনিঃসৃত প্রেমগীত শ্রবণ করি তখন আমার হৃদয় শান্তিরসে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ যে আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র যাইতেছে দেখিতেছ, ক্ষণেক মাত্র ঈষৎ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগণ মণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতি বিস্তার করিতেছে; ঐ চন্দ্র ও ঐ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তি লাভ করি; প্রকৃতির শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুকরণ করিয়া আমার হৃদয়ও শান্তি ও নিস্তব্ধতা গ্রহণ করে। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত, অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয় তাহা আর কি বলিব, সেই সকল ভাবেই আমাকে পাগলিনী করিয়াছে,—উদাসীনী করিয়াছে। আমি এ সংসারে নাই,—যে স্থানে স্বভাবের অনন্ত মহিমা বিরাজ করিতেছে, আমার মন সততই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে"।

সরলা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল —"দিদি, তোমার পূর্ব্ব কথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা করে"।

কমলা বলিলেন "সরলা তুমিও আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রম বাসীদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার

লুকাইবার কিছুই নাই; আমি সত্য সত্য বলিতেছি আমার জীবন কোন অপরূপ মোহজালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না,—আমার কিছু মাত্র স্মরণ নাই"।

সরলা আশ্চর্য্য হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,

"কিছুই মনে নাই? তোমার বাড়ী কোথায়"?

ক। "স্মরণ নাই"।

স। "তোমার পিতার নাম কি?

ক। "স্মরণ নাই"।

স। "তোমার বিবাহ হইয়াছিল কোথায়"?

ক। "স্মরণ নাই"

স। "তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় কবে, কি রূপে"?

ক। স্মরণ নাই"।

সরলা বিস্মিত হইল। অন্য কেহ হইলে ভাবিত কমলা মিথ্যা কথা কহিতেছে। কিন্তু সরলার মনে সে ভাব উদয় হয় নাই। যাঁহাকে জ্যেষ্ঠার মত ভাল বাসিত, তিনি যে মিথ্যা কথা কহিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস সরলার হৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই; অথচ জীবনের সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ইহাও বিশ্বাস করা সহজ নহে; সরলা সত্য সত্যই ভাবিলেন কমলার জীবন কোন মন্ত্রজালে জড়িত, হতভাগিনী কোন ভীষণ শাপে অভিশপ্ত।

কমলা ক্ষণেক পর বলিতে লাগিলেন,

"আমার কেবল এই মাত্র স্মরণ আছে যে, কিছু দিন সংজ্ঞা শূন্য হইয়াছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নে একটী দেবমূর্ত্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র অতি শুভ্র মেঘ খণ্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। একবার বোধ করিতাম তিনি ইন্দ্রদেব, কিন্তু তাঁহার গলায় যজ্ঞোপবীত, হস্তে নৌকার দাঁড়,—সেই দাঁড় দিয়া যেন সেই মেঘ খানিকে গগণ সাগরের মধ্যে সঞ্চালন করিতেছেন। মহাদেবের হস্তে ত্রিশূল থাকে, নারায়ণের হস্তে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম থাকে, দাঁড় কোন দেবের হস্তে থাকে আমি জানি না।—আশ্রমবাসী কেহ আমাকে বলিতে পারেন না। যাহা হউক সেই ভীষণ পীড়া হইতে যখন আমি আরোগ্য লাভ করিলাম লোকে বলিল আমি বিধবা হইয়াছি। কিন্তু তখন আর পূর্ব্ব কথা কিছু মাত্র মনে ছিল না,—স্বামীর কথা কিছু মাত্র মনে ছিল না, বৈধব্য যাতনাও কিছু মাত্র বোধ করি নাই।"

সরলা অধিকতম বিস্মিত হইল,—সে অপরূপ কথা শুনিয়া যেন কিছু ভয়েরও সঞ্চার হইল। আশ্রমবাসীগণ উপহাস করিয়া কমলাকে "বনদেবী" বলিত, তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া সরলার যেন যথার্থই বোধ হইতে লাগিল, তিনি মানুষী নহেন, কোন দেবী হইবেন। অতিশয় শোকে যে স্মরণ শক্তি এত দূর বিনাশ হয় তাহা সরলা অনুভব করিতে পারিত না। ক্ষণেক পর সরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

"তাহার পর এ আশ্রমে আসিলে কি প্রকারে?" কমলা উত্তর করিলেন "যখন আমি ঘোরতর পীড়া সহ্য করিতেছিলাম, তখন সকল লোকেই স্থির করিয়াছিল যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সেই সময়ে তীর্থ পর্য্যটন করিতে

করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। পিতার দয়ার শরীর তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। সে স্থানে আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই ছিল না। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয় দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোর পীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে নৌকাতেই আমার কাল হইবে। অনেক দিন জল পথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্য লাভ করিলাম, সংজ্ঞা লাভ করিলাম ;—কিন্তু পূর্ব্ব কথার স্মৃতি আর লাভ করিলাম না,—আমি কে, কাহার দুহিতা, কাহার স্ত্রী কিছুই জানিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার কিছু দিন পরই নৌকা আসিয়া এই আশ্রমের ঘাটে লাগিল,—সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।”

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষে জল আসিল। সরলা ধীরে২ কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত ধারাণ পূর্ব্বক বলিল,—“দিদি, আমি আর আপনার জন্য দুঃখ করিব না, তোমার এ সংসারে কিছু নাই, কেহই নাই সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে।” পর দুঃখে সরলার সরল হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছিল।

কমলা উত্তর করিলেন “ভগিনি! আমার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। স্মৃতিই আমাদের দুঃখের কারণ যাহার স্মৃতি নাই তাহার দুঃখ কি? আমার যদি পিতার কথা মনে থাকিত, স্বামীর কথা মনে থাকিত, তাহা হইলে কি আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতাম? এখন আমি বালিকার মত সংসারচিন্তা শূন্য হইয়া এই বনে বিচরণ করি, নানারূপ অপার্থিব চিন্তায় সুখ লাভ করি, প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। প্রকৃতিই আমার পিতা স্বরূপ, প্রকৃতিই আমার স্বামীস্থানীয়। ইহা ভিন্ন অন্য স্বামী বা অন্য পিতা আমি জানি না।”

দুই জনে অনেক ক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইতে চলিল, আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চন্দ্র মেঘের ভিতর লুকাইলেন, মেঘরাশিও ক্রমে ক্রমে গভীর নীল বর্ণ ধারণ করিল। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা যাইতে লাগিল, ও অল্প অল্প বায়ু বহিতে লাগিল। সরলা কুটীরে যাইবার জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কমলা স্থির নয়নে সেই নীল মেঘ রাশির দিকে দেখিতে লাগিলেন স্থির চিত্তে সেই নিবিড় বনের ভিতর সেই বায়ুর শব্দ শুনিতে লাগিলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি সরলাকে সেই বিদ্যুতালোক দেখাইতে লাগিলেন, ইচ্ছামতীর ফেনচূড় তরঙ্গমালা দেখাইতে লাগিলেন। সরলা অগত্যা তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতি মধ্যে পশ্চাৎ হইতে এক জন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল “কে বল দেখি”।

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হটাৎ মনে পড়িল না একে২ আশ্রমবাসিনী মুনি কন্যাদিগের নাম করিতে লাগিল “নিস্তারিণী”—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না,

“মনোমহিণী”—তথাপি হস্ত উঠিল না,

“যোগেন্দ্রমোহিনী”—তবু হইল না,

"তারা"—

"তোর মাথা,—আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছিস,—তবু এখনও বিবাহ হয় নাই, না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে"—ইত্যাদি বলিতে২ সরলার প্রিয় সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না —"সই"? "এখানে"? "কবে আসিলে"?—আর মুখ দিয়া কথা সরিল না। সরলার বিস্ময় ক্ষণকাল স্থায়িমাত্র,—অনেক দিন পরে দুঃখের সময় প্রাণের সইকে পাইয়া সরলার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইল সে অপার আনন্দ হৃদয়ে স্থান পাইল না, উথলিয়া পড়িতে লাগিল। বাষ্পপরিপূর্ণ লোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেক দিন পরে সেই প্রেম পুত্তলীটীকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষু নিতান্ত শুষ্ক ছিল না।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল "এই দুই প্রহর রাত্রিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্য আশ্রমে কত অন্বেষণ করিয়াছি বলিতে পারি না"

স—"এখানে কমলার সহিত আসিয়াছি, কথায়২ রাত্রি অধিক হইয়াছে। সই তুমি অদ্য আসিলে?"

অ। "হাঁ আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্য কত দিন আসিব২ মনে করি, তা "বৃদ্ধ স্বামী" কি আমাকে ছাড়ে। আজ কত করিয়া তবে আসিলাম। তুমি আশ্রমে নূতন২ বন্ধু পাইয়া তোমার পুরাতন সইকে ভুলে যাও নাই ত?"

স। "না সই, আমি রাত্রি দিন তোমার কথাই চিন্তা করি, আর সেই"—সরলা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া মুখ অবনত করিল।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অমলার মনে সন্দেহ হইল,—সরলার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া তাহার ম্লান ও প্রফুল্লতা শূন্য মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবিষ্ট নয়ন দুইটী দেখিয়া অমলার সন্দেহ গাঢ় হইল। ধীরে ধীরে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিন রাত্রি আর কাহার চিন্তা কর সই?"

সরলা মুখ অবনত করিয়া রহিল,—অমলা নিশ্চয় জানিল কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছে। অমলার মুখ গম্ভীর হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল

"ছি! সইয়ের নিকট তুমি আবার কথা লুকাইতেছ,—তবে বুঝি আমাকে আর ভাল বাস না।"

স। হাঁ সই ভাল বাসি।"

অ। "তবে বল কোন্ পুরুষের চিন্তা দিন রাত্রি তোমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে?"

সরলা আবার নিস্তব্ধ হইল। অমলার নিকট কখনও কোন কথা লুকায় নাই, লুকাইতে পারেও না, অথচ সে প্রিয় নামটী মুখে আসিয়াও বহির্গত হইতেছে না। লজ্জায় সরলার মুখ রুদ্ধ হইয়াছে।

সরলার অন্তরে যে যাতনা হইতেছিল, অমলা তাহা বুঝিল। বুঝিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা তাঁহাকে কি আমি চিনি?"

সরলা অতি মৃদু, অপরিস্ফুট স্বরে বলিল "হাঁ।"

অমলা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিয়া বলিল "তবে প্রেমদাস।" এবার সরলাকে আর উত্তর করিতে হইল না। সে প্রিয় নামটী শুনিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিল।

অমলা বুঝিল ঠিক অনুভব করিয়াছি।

অমলা নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিল।

পৃথিবীর মধ্যে এরূপ এক জন লোক ছিল না, যাহাকে অমলা সরলা অপেক্ষা ভাল বাসিত,—সেই সরলা আজ অপার প্রেম সাগরে ভাসিতেছে। সে সাগরের কি কূল আছে? যদি থাকে, বালিকা কি সে কূল প্রাপ্ত হইতে পারিবে? অমলা মনে২ বলিল "বিধাতঃ, আমি আপনার জন্য কোন ভিক্ষা চাহি না,—তুমি এই বালিকার প্রতি সদয় হও, আমার প্রাণের সইকে রক্ষা কর।"

ক্ষণেক পর অমলা, চিন্তা বেগ সম্বরণ ও আপন নৈসর্গিক প্রফুল্লতা ধারণ করিয়া, সরলাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বলিল—"তা চিন্তা কি জন্য? শুনিয়াছি প্রেমদাস পশ্চিমে গিয়াছেন। তথা হইতে বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। তোমার মাতাও বোধ হয় এ বিবাহে অসম্মত হইবেন না, আর প্রেমদাস একটু পাগলের মত হউক, ছেলে ভাল। তোমার মনের কথা প্রেমদাস জানেন?"

স। "জানেন"

অ। "তিনি সম্মত আছেন?"

স। "আছেন"

অ। "ঘরে ঘরে বর দেখা কন্যা দেখা হইয়া গিয়াছে বুঝি,—আমরা ইহার কিছু জানি না?"

সরলা লজ্জিত হইল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল "সইয়ের মনে এত আছে তা কে জানে বল। আমি ভাবি সই আমার বালিকা! ইহার ভিতর এত কাণ্ড কে জানে বল? তা বরটীকে মনে ধরিয়াছে?"

সরলা অধিকতর লজ্জিত হইল,—অথচ প্রেমদাসের কথা হইতেছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ লহরী উথলিয়া পড়িতেছিল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল—"আর কন্যাটীকে ত বরের মনে অবশ্যই ধরিবে,—এ সোনার মুখ দেখিলে কাহার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার না হয়? আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম, আর যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হইতাম, তাহা হইলে তোকে দেখিয়া পাগল হইয়া যাইতাম"—এই বলিয়া অমলা সরলার অবনত মুখ খানি ধীরে ধীরে তুলিয়া তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিল।

অচ্যুত গঙ্গা।

সহর বালেশ্বরের প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ সমুদ্রকূল হইতে অনধিক দূরস্থ শ্রীজঙ্গ নামে এক গ্রাম আছে। উক্ত গ্রাম বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত লুণ খণ্ড পরগণার সীমা মধ্যগত। সেই গ্রাম অনেক প্রাচীন। তাহার অনতিদূরস্থ এক খালের লোণাজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রামে এক অতি বিস্তৃত গড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহাকে লোকে "বলিআর সিংহের কাঁথি বলিয়া ডাকে। সেই গড়ের চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্বে পরিখা ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যদিও সেই পরিখার এখন ভগ্নদশা, তথাপি বর্ষাকালে তাহার স্থানে স্থানে জল পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র২ পুষ্ক-

রিণীর আকার ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন সেই গ্রামের প,উ,প, প্রান্তে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়। তাহার আয়তন এত বিস্তৃত যে তাহার দ্বারা আবৃত ভূমির পরিমাণ ৩০০ বিঘার ন্যূন নহে। গ্রামের অপর প্রান্তে এই পুষ্করিণীর ঠিক্ বিপরীত দিকে, তাদৃশ আর এক সরোবর আছে। উক্ত গড় যাহার ছিল, এই জলাশয় দ্বয় যে তাহারই কীর্ত্তি পুষ্করিণী, তদ্বিষয়ে অধিক সন্দেহ করা যাইতে পারে না। লোকে ইহার প্রথমটীকে 'অচ্যূত-সাগর,' এবং দ্বিতীয়টীকে 'মল্লিকা-সাগর' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কয়েক মাস গত হইল, বালেশ্বরের পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট বিখ্যাত পুরাতন সন্ধায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জন বীম্‌স্ সাহেব সেই পুষ্করিণীর নিকটস্থ স্থান অনুসন্ধান করিয়া তাহার পশ্চিম পার্শ্বে এক খণ্ড প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হন। বিশেষ যত্নে তাহাকে উঠাইয়া তিনি তাঁহার নিজ বাস স্থানে বালেশ্বরে আনিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত ফলক (অথবা স্তম্ভ) দীর্ঘে প্রায় ৪ হাত হইবে, এবং তাহা চতুষ্কোণ (চৌপল)। তাহার দুই পার্শ্বের বিস্তৃতি প্রায় ১ ফুট করিয়া হইবে, আর অপর দুই পার্শ্বের এক দিক্ অর্দ্ধ হস্ত, অপর দিক্ তদপেক্ষা কিছু অধিক চৌড়া হইবে। এই প্রস্তর খণ্ডের উপরিভাগে চারিদিকে নিম্ন লিখিত মত স্তম্ভাকারে কতকগুলি কথা খোদিত আছে। তাহার অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আর উপরের দুই এক পুংক্তি কৃষক এবং রাখালদিগের কর্ত্তরী, ছুরিকা প্রভৃতি শাণিত করিবার জন্য ঘর্ষণ করাতে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ। তদুপরে লিখিত অক্ষর গুলি উড়িয়া আকারে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু খোদকার বোধ হয় সুনিপুণ ছিল না, সুতরাং কয়েক স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অথবা হয়ত সে বঙ্গদেশবাসী ছিল, সেই জন্য কয়েকটী অক্ষরকে বঙ্গাকৃতি করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহাতে বর্ণাশুদ্ধি বিস্তর। আমরা অনেক যত্নে তাহার পাঠ যতদূর উদ্ধার করিতে পারিয়াছি,—তাহা নিম্নে লেখা গেল, কিন্তু আমাদের পাঠক মহাশয়দের মধ্যে অনেকে বোধ হয় উৎকল প্রচলিত গোলাকৃতি বর্ণাবলীর সহিত সুপরিচিত না থাকিতে পারেন; এই ভয়ে আমরা প্রস্তর-লিখিত বিষয়টিকে অবিকল বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিলাম; বোধ করি তাহাতে তাঁহাদের সুবিধা বই অসুবিধা হইবে না। অতএব দেখুন তাহাতে কি লেখা আছে;—

A.

(a) ধর্ম্ম সরণ
(f) জুগাব্দা ৪৬৯৯
(b) সাকাব্দা ১৫২০
দইতা রিবি
সুআ লসু
পুত্র অচুত
বলি আর সি
ঙ্ঘ কৃতি পুষ্ক

B.

(d) রণ। স
গা।৭অ
চূত গ
(e) গা৭এ
(f) মণ্ডলে
একা না
(h) একত্র
থী মৃত্ত
সিণ্ডদহ

C.

কুলরাঢ়ক
(c) মু কন্দ
দেব অস্তে
জবন ভোগ
বরস ৩০
ঢিলি সুর
এক বর পা
ত্তিসা হোই
(f) রজপুত মা
নসিঙ্ঘ রজা
(i) আমন ওড়ীসা
(k) ন করীব

D.

(f) ত ...সরা (g)
কটেক পসী
মেপ রগ৭
ঝরী দাথী
ত কটেক
সুদ্রু রজা
গজপ্তি রা
মচন্দ্র দে
ব ৩৭ অক (j)
এদিবসর
এপুষ্করণ
খোল

উপরে প্রদত্ত ইংরাজী চিহ্নগুলি যে আমাদের, প্রস্তরে তাহার একটীও নাই, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। আমরা বক্তব্য বিষয় সুবিধা করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই উক্ত চিহ্নগুলি দিয়াছি, এবং তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা নিম্নে বলিতেছি ;—

(*a*) আমার কোন উড়িয়া বন্ধু এই পংক্তিকে এই রূপে শুদ্ধ করেন,—ধর্ম্ম শরণ। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা না হইয়া, 'ধর্ম্ম স্মরণ' হওয়াই অধিক সঙ্গত।

(*b*) এই চিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন পংক্তির অক্ষর ঐরূপ বিভিন্ন করিয়া লেখা আছে। কারণ সেই পাথরে একটা স্বাভাবিক অল্প গভীর দাগ ছিল, সুতরাং সেখানে বাটালি চলে নাই।

(*c*) এখানেও তদ্রূপ। 'ম' অক্ষরের পর কোন বর্ণ পড়িয়া যায় নাই। তবে একটা অস্ত্রাকৃতি ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকাতে 'কুন্দ,'—এই বর্ণ দুটী বিভিন্ন করিয়া লেখা হইয়াছে।

(*d*) এখানে পূর্ব্ব পংক্তির শেষ অক্ষর 'স' এবং পর পংক্তির আদি অক্ষর 'গ্যাং,' আপাততঃ এই দুইটীকে একত্র করিয়া পড়িতে গেলে, 'সগ্যাং' হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার কোন অর্থই হয় না। বাস্তবিক এই কথা সেরূপে পঠিত হইবে না। 'গ্যাং' বর্ণের যে প্রথম (া) আকার, তাহা আকার নহে ; তাহা অনুখোদিত (্য) যফলা মাত্র। তাহা হইলেও কিছু হইল না। 'সংগ্যাং' শব্দেরই বা অর্থ কি?—আর এক কথা আছে। যাঁহারা উড়িষ্যা দেশের আদালত কর্ম্মচারী প্রভৃতির হস্তলিপি পাঠ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ব্যাকরণানভিজ্ঞ উড়িয়া মোক্তার প্রভৃতিরা কোন বর্ণে অনুস্বার, অথবা ঙ, যোগ করিতে হইলে, তাহা পরে বসাইয়া থাকেন ; যেমন 'বংগ' লিখিতে হইলে, তাঁহারা ওরূপ না লিখিয়া 'বগং' লেখেন, কিন্তু পড়িবার বেলা 'বঙ্গ' পাঠ করেন।—এখানেও সেইরূপ লেখা হইয়াছে। অতএব 'সগ্যাং' শব্দের অনুস্বার 'গ্যা'—র পর না বসাইয়া, তাহার পূর্ব্বে দিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে এক সার্থক শব্দ অশুদ্ধ বর্ণে লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ উক্ত শব্দটী আদৌ শুদ্ধ করিয়া লিখিতে গেলে 'সংজ্ঞা' হইবে ; কিন্তু আমরা সচরাচর তাহাকে যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহাতে উক্ত কথাটী প্রকৃতই লেখা হইয়াছে, যথা——'সংগ্যা'। তদ্রূপ।

(*e*) 'গগাং' শব্দটীকে 'গঙ্গা' পাঠ করিতে হইবে।

(*f*) লিখিত অক্ষরের মধ্যে, গু, ত, র, এবং জ হস্ত লিখিত বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ।

(*g*) এই পংক্তির মধ্যস্থলের অক্ষরগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

(*h*) এথী মৃত্ত সিণ্ড দহ কুলরাঢক, এবং (*g*) পংক্তির হইতে আরম্ভ করিয়া 'ত......সরা কটেক পসীমেপ রঙ্গঝুরী দাথীত' এই কয়েকটী কথার কোন অর্থ বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, সেগুলিকে সার্থক করিবার জন্য দুই একটী প্রয়োজনীয় বর্ণের অভাব আছে।

(*i*) 'আমন'—এই বাক্যের 'আ'-কারের পর 'গ' পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা 'আগমন' পড়িতে হইবে।

(j) 'অক'—এই কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে 'অংকা' ইহার পরে হয়ত (২) ছিল, ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা খোদিত হয় নাই। (২) অনুস্বার থাকিলে, তাহা এইরূপে লেখা থাকিত, —'অকং', অর্থাৎ 'অংক,। (d নিয়ম দেখ)।

(k) 'ন করীব'—এই কথা দুইটী কাহার সহিত যোজনা করিয়া পাঠ করিতে হইবে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ইহার উপরিভাগে আমরা যেমন একটী রেখা টানিয়া দিয়াছি, প্রস্তরেও সেই রূপ এক রেখা খোদিত আছে। সুতরাং তাহা দৃষ্টে বোধ হয় যে 'ন করীব' কথা দুইটী, তদুপরিস্থিত 'আমন ওডীসা'র সহ কখনই যুক্ত হইবে না। তবে কি D স্তম্ভের শেষ পুংক্তির সঙ্গে যোজনা করিয়া, 'খোলন করীব' এই রূপ পাঠ করিতে হইবে? কিন্তু তাহা হইলেই বা 'করীব' ক্রিয়া কোন কালে প্রযুক্ত? 'করিল' পাঠ বিবেচনা করিলে কতকটা সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু উড়িয়া ব্যাকরণানুসারে শুদ্ধ হয় না। যাহা হউক এক্ষণে আমরা উপরোক্ত শুদ্ধি নিয়মের সাহায্যে যতদূর পারি শুদ্ধ করিয়া উড়িয়া ভাষায় পাঠ করিয়া দেখি খোদিত বিষয় কিরূপ দাঁড়ায়।—

"ধর্ম্ম স্মরণ, যুগাব্দা ৪৬৯৯, শকাব্দা ১৫২০, দৈত্যারি বিস্থআল সুপুত্র অচ্যুত বলিআর-সিংহ-কীর্ত্তি পুষ্করিণী সংজ্ঞা অচ্যুত-গঙ্গা এ মণ্ডলে এক নায়ক.........মুকুন্দ দেব অস্তে যবন ভোগ বর্ষ ৩০ দিল্লীশ্বর আকবর পাতসা হোই রজঃপুত মানসিংহ রজা আগমন উড়িষ্যা.........কটক শূত্র রজা গজপতি রামচন্দ্র দেব ৩৭ অঙ্ক এদিবসর পুষ্করিণী খোল...।"

উড়িয়া ভাষা কঠিন নহে, প্রায়ই বাঙ্গালার সহ এক। সুতরাং ইহার অর্থ বোধগম্য করিতে কাহারও অধিক কষ্ট হইবে না। এক্ষণে উক্ত বিষয়ক দুই একটী ঐতিহাসিক কথার আলোচনা করা যাউক।

আদৌ পুষ্করিণী খননের সময়,—যুগাব্দা ৪৬৯৯, খ্রীষ্টীয় ১৫৯৮ অব্দের সহ এক (যুঃ অঃ ৪৬৯৯—খৃঃ পূঃ অঃ ৩১০১ —খৃঃ অঃ ১৫৯৮)। শকাব্দা ১৫২০ ও খৃঃ ১৫৯৮ অব্দের সহ এক; (১৫২০+৭৮=১৫৯৮)। সুতরাং, উক্ত বৎসরে তাহার খনন সমাপ্তি ও প্রতিষ্ঠাদি ধরিলে সরোবরের বয়ঃক্রম ২৭৬ বৎসরের ন্যূন নহে। কিন্তু এই সময়ের সহিত উক্ত ফলকে যে আর দুই সময়ের উল্লেখ আছে, তাহার ঐক্য হয় না। 'মুকুন্দ দেব অস্তে যবন ভোগ বর্ষ ৩০'—এই এক সময়সূচক কথা। যে মুকুন্দ দেবের কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা, তৈলঙ্গ মুকুন্দ দেব, নামান্তর হরিচন্দন। তিনি ১৫৫০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন; এবং ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক অধিকৃত হন। সেই হইতে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত; যবনাধিকার আরম্ভ। তবে দেখা যাইতেছে যে উড়িষ্যার যবন ভোগ খৃঃ ১৫৫৮ অব্দে আরম্ভ হয়। এবং উক্ত প্রস্তর ফলক লিখিতেছে যে, যবন ভোগ ৩০ বর্ষ হইলে পুষ্করিণী খাত হয়। সুতরাং এ গণনায় খননের সময় (১৫৫৮+৩০)=১৫৮৮ খৃঃ অব্দ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সময় যুগাব্দা ও শকাব্দার সহিত ঐক্য হয় না; ১০ বৎসরের ন্যূন হইয়া পড়ে। ইহা কিরূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে?

২য়তঃ। গজপতি রামচন্দ্র দেবের রাজত্বের যে অঙ্ক দেওয়া আছে, তাহার সহিতও যুগাব্দা শকাব্দার মিল হয় না। এই গজপতি রাজা উড়িষ্যার প্রথম শূদ্র রাজা ছিলেন। আকবরের সময় যে 'ভুঁই-বংশ' (ভূম্যধিকারী বংশ) রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া উড়িষ্যার করদ-অধিপতি স্বরূপ ছিলেন, রামচন্দ্র দেব সেই বংশের আদি রাজা। তখন কটক উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। রামচন্দ্র গজপতি খৃঃ ১৫৮০ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার পর ইহাঁর '৩৭ অঙ্ক' রাজত্বকাল হইলে পুষ্করিণী খনন করা হয়। এই '৩৭ অঙ্ক' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। দেশ বিশেষে গণনা প্রণালী বিভিন্ন। আমাদের কলিযুগের গণনার নিয়ম এই যে প্রথম বৎসরকে শূন্য ধরা যায়। দ্বিতীয় বৎসর হইতে ১ গণনা করা যায়। সুতরাং অদ্য কলিযুগের যদিও ৪৯৭৫ বৎসর বলিয়া গণনা করা যায়, বাস্তবিক তাহা ৪৯৭৬ বৎসর। তদ্রূপ উড়িষ্যার রাজাদের অঙ্ক এই রূপে গণিতে হয়,—রাজত্বের প্রথম বৎসরকে '৩ অঙ্ক' বলা যায়। তৎপরে পরে ৪, ৫, প্রভৃতি অঙ্ক যথাক্রমে গণনা করা যায় বটে, কিন্তু সে সকল অঙ্কে ৬ অথবা ০ শূন্য থাকে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। যেমন ৫ অঙ্কের পর একবারে ৭ গণিতে হইবে, এবং ৯ অঙ্কের পর ১১ গণিতে হইবে। তদ্রূপ ১৬ এবং ২০ অঙ্ক গণনা করা যাইবে না। তাহারাও পরিত্যক্ত হইবে। এইরূপ গণনা দ্বারা কোন রাজার রাজত্বের অঙ্ক ৩৭ হইলে, তাহার রাজত্বকাল ২৮ বৎসর হয়। সুতরাং গজপতি রামচন্দ্রের ২৮ বৎসর রাজত্ব হইলে উক্ত পুষ্করিণী খাত হয়, ইহা নিশ্চিত হইল। রামচন্দ্রের ২৮ বর্ষ রাজত্ব হইলে খৃঃ ১৬০৮(১৫৮০+২৮=১৬০৮) অব্দ হইয়া পড়ে। সুতরাং এ গণনাতে খনন সময় যুগাব্দা ও শকাব্দা অপেক্ষা ১০ বৎসর অধিক হইয়া পড়ে। যবন ভোগের বর্ষ ১০ বৎসর কম, আর রামচন্দ্রের অঙ্ক দশ বৎসর বেশী হয়। ইহা কিরূপে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে? যবন ভোগের দ্বারা যদি সলিমানের সৈন্যাধ্যক্ষ কালাপাহার কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয় বুঝায়, এবং তাহার সময় নির্ণয়ে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের মত গ্রহণ করা যায়, তবে উক্ত ব্যাপার ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে না হইয়া ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল বলিতে হইবে। এ বিষয়ে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের লিখিত সময়ই অভ্রান্ত বোধ হইতেছে। কেননা উড়িষ্যার যবন ভোগ ১৫৬৮ খৃঃ অব্দের বিবেচনা করিলে, পুষ্করিণী খননের সময়ের সহিত সম্পুর্ণ ঐক্য হইতেছে (১৫৬৮+৩০=১৫৯৮)। বিশেষতঃ প্রস্তর ফলকে প্রদত্ত সময়ই অধিক বিশ্বাস্য, কেননা উক্ত ফলক যবনাধিকারের ৩০ বৎসর মাত্র পরে খোদিত হয়। সুতরাং যে সময়ে যবনাধিকারের কথা লোকের স্মৃতিপথের পথিক ছিল; এমন কি যাহারা উক্ত ব্যাপার, হয় ত কলাপাহাড়কে, স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, তাহাদেরও অনেকে জীবিত ছিল। সুতরাং পুষ্করিণীর সন তারিখই অভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগেরও প্রদত্ত উড়িষ্যাবিজয় সময়ও অভ্রান্ত; কেননা তাহার সহিত পুষ্করিণীর সন তারিখের সম্পুর্ণ ঐক্য হইতেছে। কিন্তু উড়িয়া ইতিহাস বেত্তাদিগের সময় ঐক্য হইতেছে না; সুতরাং

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার যবনাধিকারের কথা ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দকে ভুল বিবেচনা করিবার আরও এক কারণ এই যে, উক্ত প্রস্তরে লিখিত আছে, যে পুষ্করিণীর খনন সময়ে মানসিংহ রাজা হইয়া উড়িষ্যায় আগমন করেন। মানসিংহ খৃঃ ১৫৯২ অব্দে উড়িষ্যায় আসিয়া ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত থাকেন। সুতরাং ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে যবন ভোগ আরম্ভ বিবেচনা করিলে, পুষ্করিণী খনন সময় ১৫৮৮ অব্দ হয়; কিন্তু সে সময় মানসিংহ উড়িষ্যায় আগমন করেন নাই। অতএব উড়িয়া ইতিহাস সংগৃহীতাগণের প্রদত্ত যবনাধিকারের সন ভ্রান্ত হইতেছে। সুতরাং যবন ভোগের বিষয় এক প্রকার মীমাংসিত হইল।

আমরা দেখিলাম যে রামচন্দ্রের অঙ্ক ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের সহিত ঐক্য হয় না। এ বিষয় কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে হইবে, তাহা আমরা জানি না। যদি রামচন্দ্রের অঙ্ক ৩৭ না হইয়া ২৪ হইত, তাহা হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত।

উপসংহার কালে এই বলা আবশ্যক যে অচ্যুত বলিআর সিংহ জাতিতে খণ্ডাইত ছিল। খণ্ডাইতদিগের উড়িষ্যায় বিলক্ষণ প্রাধান্য। পূর্ব্বাবধি এই জাতির দ্বারা উড়িষ্যার অনেক বড় বড় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। অদ্যাপি উড়িষ্যার জমীদারদিগের মধ্যে অনেকে খাণ্ডাইত আছেন।

শ্রীঃ—

বালেশ্বর।

মসলা বাঁধা কাগজ।

৫ম সংখ্যা।

কূপ

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্টং গ্রীষ্মকালেচ শীতলং॥

হে কূপ, চানক্য পণ্ডিত কেবল তোমার গুণ দেখিয়াছিলেন, গুণ গাইয়াছিলেন। তিনি গান্ কিন্তু আমি তোমার অনেক দোষ দেখিতে পাই। তুমি রাগ করিও না; এ সংসারে কিছুই নির্দ্দোষ নহে, কিছুই নির্গুণ নহে—সকলেরই গুণ আছে, সকলেরই দোষ আছে। পূর্ণচন্দ্র মাসে এক দিন, সূর্য্য দুর্লক্ষ্যনীয়, নক্ষত্রগণ অগম্য প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে, স্নেহ আশঙ্কা পরায়ণ, মনুষ্য আত্মাদররত, সৌন্দর্য্য সর্ব্বনাশের কারণ, বিদ্যায় সন্দেহ বাড়ে, হৃদয় কঠিন হয়, মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়। আবার সমুদ্রে দ্বীপ আছে, আকাশে চাঁদ আছে, মেঘে বিদ্যুৎ হয়, অরণ্যে ফুল ফুটে, সংসারে ভালবাসা আছে, মনুষ্যজীবনে বিবাহ আছে, মূর্খতা শান্তিপ্রদ, দারিদ্র্য রোগহীন, বিচ্ছেদে তন্ময় হই—যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাহাকে দেখি; তুমিও গ্রীষ্মকালে শীতল, শীতকালে উষ্ণ।

তোমার ন্যায়, বটচ্ছায়াও গ্রীষ্মকালে শীতল, কিন্তু শ্যামা স্ত্রী, বুঝি সকলের ভাগ্যে নয়। অপরের যেমন হোক্, আমার ভাগ্যে নয়। আমার গৃহিণী শ্যামা স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁর শীত গ্রীষ্ম নাই—

বার মাস—দিবারাত্রি গরম হইয়া থাকেন। তাঁর চক্ষের উষ্ণতা থাক্, কেবল কথার জ্বালায় গায়ে ফোস্কা পড়ে। শ্রীমুখের বাক্য যন্ত্রণায় আমার ইষ্টকালয় পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে—এক দণ্ড বড়ীতে তিষ্ঠিতে পারি না। কত হরির লুট দিলাম, পীরের সিন্নি দিলাম মধুমণ্ডার ব্রত করাইলাম; আপনি পেটে না খাইয়া চন্দ্রহার তৈয়ার করাইলাম, আপনি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া নীলাম্বরী এবং ঢাকাই সাড়ী কিনিলাম, আলতাপরা পদযুগলকে স্মরগরল খণ্ডন বলিয়া মস্তকে ধরিলাম, এবং সকল কথায়, মোসাহেবের ন্যায় কেবল 'যে আজ্ঞা২' করিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কর্কট রাশি—কখন শ্রীমুখে 'পোড়ার মুখো' বই আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ কথা তিনি বলিতে পারেন—তাঁর রাইট্ আছে, কারণ পদ্মহস্তে এমনি যত্ন করিয়া তাম্বুল তৈয়ার করেন যে, প্রায় প্রত্যহই মুখ পুড়িয়া যায়; ব্যঞ্জনে লবণ এমনি করিয়া দেন যে, এত দিন বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষেই পোড়ারমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

দেখ কূপ, তুমি গ্রীষ্মকালে শীতল। যখন সূর্য্যদেব কুলকামিনীর বক্ষোবসন খুলিয়া দিয়া, কালজয়ীরূপে পাগল হইয়া মনের আগুন পৃথিবীময় ছড়াইয়া দেন—পৃথিবী জ্বলিয়া উঠে,যখন অন্তরে বাহিরে, অকাশে, পৃথিবীতলে, গৃহাভ্যন্তরে, দুর্গম প্রান্তরে, নদীহৃদয়ে, মরুভূমে আগুন জ্বলে তখন তুমি শীতল হইয়া থাক। আবার যখন শীতল বাতাস বহে, যখন চতুর্দ্দিক শীতল দেখ, তখন উষ্ণ হইয়া উঠ। তোমার এ কি রীতি? কিন্তু তোমার দোষ নহে। পৃথিবীশুদ্ধ এই।

লোকে বলে, রাশি গুণে ভুতে পায়। ঠিক কথা! আমি মানি। আমি এমন লোক দেখিয়াছি—কত শত তার সীমা নাই—যিনি কথায়২ লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন, ভিটা উঠাইয়া দিয়াছেন, আবার পর দণ্ডে বাবুর বাড়ী গিয়া দেখিয়াছি, তিনি যেন আর সে তিনিই নন্। তখন বাবু যদি বলিলেন, "ওহে মধ্যে গঙ্গায় বড় অল্প জল" তাহা হইলে 'আহা কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! বাবু ঠিক এঁয়েছেন; জল কোথা? আধ্ হাত চর দেখা যাচ্ছে" বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। যে কেরাণীকে সাহেব, ড্যাম ষ্টুপিড্ বলিয়া সম্মানিত করেন, তিনি সেই দিন বাড়ী আসিয়া গল্প করেন, সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসে না। দেখ পাঠক, তুমি স্বয়ং এমনি কর কি না? যদি কোন কার্য্যবশতঃ তামাকু সাজিয়া দিতে, তোমার খানসামার অর্দ্ধ মিনিট বিলম্ব হয়, তাহা হইলে নানা প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া, হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিয়া, অনর্গল হিন্দি বলিতে থাক। বাঙ্গালায় পোষায় না, কারণ বাঙ্গালা বড় কোমল, বড় শীতল ভাষা—বৈষ্ণব কবিগণ ইহার আদি লেখক; কৃষ্ণরাধিকার প্রেম ইহার আদি বিষয়। ইহা ভাল বাসিবার ভাষা, প্রেম করিবার ভাষা, কাঁদিবার ভাষা—ক্রোধের ভাষা নহে, সুতরাং হিন্দি ব্যবহার কর। কিন্তু কোন দিন বেড়াইয়া আসিতে রাত্রি অধিক হইলে, তোমার গৃহিনী যখন আপনার রাগে আপনি চুল ছিঁড়িয়া, কপাল ভাঙ্গিয়া, চোকের জলে নাকের জলে এক করিয়া তোমাকে আণ্ডামান আইলণ্ডে পাঠাইতে চাহেন, অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যাই-

তে বলেন, তখন তুমি শীতল হও কি না? তখন খাটের পাশে দাঁড়াইয়া—সাহস করিয়া বসিতে পার না, পাছে তোমার ও আল্‌বার্ট করা চুল ছিঁড়িয়া যায়—ঠোঁট চাটিতে২ মাথা চুলকাইতে২ হতগজ ইতি কর কি না?

সংসারে, এ পাপ সংসারে সকলেই এমনি। অমুক বড় গরিব। তার ধন নাই, বল নাই, বন্ধু নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে প্রতিকার করিতে পারিবে না, প্রতিশোধ দিতে পারিবে না, অতএব তাহার সর্ব্বনাশ কর। তার একটী সুন্দরী স্ত্রী আছে, তাহাকে কুলটা করিতে হইবে। মিষ্ট কথায় হউক, কড়া কথায় হউক, টাকায় হউক, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক, তার সর্ব্বনাশ কর; তার ভগ্ন কুটীরের চাঁদের আলো, তার যৌবনের সহচরী, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, সংসার সাগরের তরণী, ইহ লোকের সর্ব্বস্ব, পরলোকের আশ্রয় কাড়িয়া লও, কারণ তার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই। আবার অমুক বড় লোক—তাঁর দুই লক্ষ টাকা আয় আছে, তিনি গরিবকে চাবুক মারেন, তিনি আপনার স্ত্রী খানসামার জিম্মা দিয়া পরের স্ত্রীর অনুসরণ করেন, তিনি চব্বিশ ঘন্টা নেশায় ভোঁ হইয়া থাকেন, তিনি বেশ্যার নাথি ঝ্যাটাই মনুষ্যজীবনের গৌরব মনে করেন, তাঁর পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধাদি প্রায় বারবিলাসিনীরাই করে, সুতরাং তিনি বড় লোক, অতএব যে কোন প্রকারে হউক তাঁর প্রিয়পাত্র হও। তিনি যদি বলেন, "তুমি বড় পাজি" তবে অমনি যুক্ত করে বলিও "আজ্ঞা আমি একা নই; আমাদের সাত পুরুষ পাজি।" কোন ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়া দেশের উপকার করিয়া বাবুর বিরাগভাজন হইয়াছে, অতএব মুক্তকণ্ঠে তাহার নিন্দা করিতে হইবে। সে যদি পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে ত বলিতে হইবে যে সে চোর—কোন মহাজনের বাক্‌স ভাঙ্গিয়া এ অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। আবার বাবু একটী বেশ্যা রাখিয়াছেন, অতএব বলিতে হইবে যে অহল্যা, সীতা অথবা রাধিকা সে সুন্দরীর শতাংসের এক অংশও নহেন। সে যে বেশ্যা! তা হোক—বাবু যখন তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, তখন সে দেবত্ব পাইয়াছে; মলয় পর্ব্বতের নিকটে থাকিলে স্যাওড়া গাছও সুবর্ণ হয়, স্পর্শমণি ছোঁয়াইলে লৌহও সুবর্ণ হয়। এই রূপ না করিলে তুমি বাবুর বৈঠকখানায় স্থান পাইবে কেন? বাবু অন্যের কাছে ঝাল হইলেও তোমার কাছে তুর্‌সি টক। তুমি এমনই কর, আবার হয় ত বাবুও এক দিন তোমার কলহ আপনার করিয়া লইয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন।

তোমার দোষ কি? তোমার ধর্ম্ম এই—না করিলে পাপ আছে। নিশ্চয় জানিও, তুমি যদি আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে মনুষ্য বলিয়াও গণ্য করিবে না। অতএব যত দূর সাধ্য বীরত্ব প্রকাশ কর। কিন্তু তেজস্বীর কাছে তেজ দেখাইতে গেলে পাছে রোগের মুখে ঔষধ পড়ে, অতএব এই কূপের অনুকরণ কর। যে শীতল তার শৈত্যগুণেই হয়ত পৃথিবী কাঁপিতেছে; তা হোক, তবু ত শীতল, অতএব তুমি গরম হও। হও;

তোমার লাভ বই ক্ষতি নাই। এ সংসারে বিচারপরায়ণ, স্বাধীন চিন্তারত কয় জন? তলস্পর্শ করিতে, তুলনা করিয়া গুণাগুণ স্থির করিতে কয় জন পারে? অধিকাংশ লোকেই বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া প্রশংসা করে। যদি জন কত লোককে প্রশংসা করাইতে পার তাহা হইলেই হইল—বাকী লোকে গোলে হরিবোল দিবে—গণ্ডায় গুা মিসাইবে * গোলে হরিবোল দিবার লোকই সংসারে অধিক নহিলে কেবল আপন গুণে লোকে এত শীঘ্র বড়, এত শীঘ্র ছোট হইত না।

দেখ কূপ, তোমার আর একটী মহৎ দোষ আছে। তোমার ভিতরে যত অল্প জল থাকে তত তুমি গভীর দেখাও; আবার জল না থাকিলে তুমি অতলস্পর্শ বলিয়া অনুমীত হও। আমি এই স্থলে গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে তোমার সাদৃশ্য দেখি। গ্রন্থকার যত কেন গভীর হউন না, যদি জল থাকে অবশ্য তাহা দৃষ্ট হইবে। যিনি কেবল অন্ধকার, বুঝিতে হইবে তাঁহাতে জল নাই। বেকনের গ্রন্থ সকল অতি দুরূহ, তবু তাঁহার ভাবগ্রহণ করা যায়। কোলরিজের দর্শন সম্বন্ধীয় রচনাবলির অর্থ বোধ হয় না। হয় না, কিন্তু তাহা পাঠকের বুদ্ধির দোষ নহে, গ্রন্থকারের চিন্তা প্রণালীর দোষ। হয় তাঁহার চিন্তা প্রণালী অতি গোলমেলে অথবা তাঁহার রচনার ভাব নাই—কেবল কথার আড়ম্বর মাত্র। আজকাল, অনেক অক্রবান বাঙ্গালী কবির কথা বুঝা যায় না। আমাদের বক্তব্য, একটু লেখা পড়া শিখিয়া কবিতা লিখিলে ভাল হয় না?

দেখ, যে খানে নদী নাই সেখানে তোমার জল অল্প—অনেক দূর না খুঁড়িলে পাওয়া যায় না। যায় না, কিন্তু যাহা যায় তাহারই আদর কত। স্নান, আহার, ঠকুর সেবা সব তোমারই জলে হয়। নদীতীরে তোমার জল অধিক হইলেও তাহার আদর নাই। কেহ স্নান করে না, কেহ খায় না—তাহাতে কেবল পাদধৌত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে? সেও কেবল ঘর নিকাইতে। বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা তোমার এই গুণের অধিকারী। নিকটে গভীর শ্রোতস্বতী বহিতেছে, বলিয়াই আমাদের গ্রন্থ লেখার এত আড়ম্বর। আজ যদি ইংরেজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে কাল্ আমাদিগকে ইষ্টিল নিব, চস্‌মা, পারপেচুয়াল ইন্‌কষ্ট্যাণ্ড ফেলিয়া আবার হলধর হইতে হয়। ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের কল্পতরু, আমাদের কামধেনু। কিন্তু যেখানে ইংরেজী শিক্ষার প্রদুর্ভাব অধিক সেখানে কূপজলের বা বাঙ্গালা গ্রন্থের আদর নাই। সমস্ত দিন মিল্, কোমৎ, বেকন্ লইয়া ক্লান্ত হইয়া একখানি বাঙ্গালা সাময়িকপত্র পড়িতে২ তামাকু খাই এবং গৃহিণীর সঙ্গে রসিকতাই করি। কূপোদকে পদধৌত হয়। আবার যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের কাছে বটতলার মহাত্মারাই মহারথী বলিয়া পরিচিত।

অতএব ভাই বঙ্গীয় গ্রন্থকার, অত

* এটি পাঠশালার কথা। গুরু মহাশয় বলেন, 'বলরে, চারি কড়ায় এক গণ্ডা,' ছেলেরা মিতভাষী সুতরাং কেবল সুর টানিয়া 'গুা' বলিয়া কার্য্য সমাধা করে এবং গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দেয়। আমরাই এক দিন দিয়াছি। চঃ

বাড়াবাড়ীতে কাজ নাই। দাদা যত মরদ তা বড় বৌয়ের পায়েই মালুম। পরস্পরকে গালিগালাজ করিয়া লেখনী ক্ষয় করিবার দিন আজিও আমাদের হয় নাই—হইতে বিলম্ব আছে। গালিগালাজের দিন ত পলায় নাই। সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি কর, দর্শনের উন্নতি সাধন কর, বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া নূতন২ তত্ত্ব অবিষ্কৃত কর—কেবল বিবাদ করিলে কি হইবে? আইস ভাই, সকলে মিলে মিসে উন্নতির স্বর্ণভূমে যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মাণ করি। যাহার যাহা সাধ্য সে তাহা করুক। তোমার ক্ষমতা অধিক, তুমি লোমকূপে করিয়া পর্ব্বত আনয়ন কর। আমার তেমন ক্ষমতা নাই, আমি না হয় বালুকা তুলিয়া ক্ষুদ্র২ রন্ধ্র পূর্ণ করিব। সাগর বন্ধনে কাঠবিড়ালিও কাজে লাগিয়াছিল।

হে কূপ, তুমি গৃহস্থের অন্তঃপুরে থাক। তুমি একাধারে যত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও এত কে পায়? তোমার এই সুখের জন্য আমি তোমার হিংসা করি। তোমার পাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া যখন কুলকামিনীগণ পরস্পরের এবং আপন২ স্বামীর উদ্দেশে রঙ্গরস করেন তখন তুমি বুঝিতে পার কামিনীকুসুমে কত মধু? যখন কোন যুবতী সুকুমার করকমলে তোমার হৃদয় হইতে জল তুলিতে আসিয়া, তোমার জলে আপনার কালজয়ী লাবণ্য দেখিয়া—হাতের দড়ি হাতে থাকে—ভুবনমোহন অধরে ভুবনভুলান হাসি হাসেন, তখন তুমি বুঝিতে পার যে একই সমুদ্র হইতে অমৃত এবং হলাহল উঠা অসম্ভব নয়। যখন কোন অর্দ্ধবয়স্কা রূপসী, অরসিক স্বামীর মুখে আপনার পাক নৈপুণ্যের নিন্দা শুনিয়া "পোড়ারমুখোর হাতে পড়ে সুখ পেলেম না; আমার মরণ হয়ত বাঁচি" বলিতে২ তোমার কাছে বসিয়া কাঁদিতে আসেন; ক্রোধে মত্ত মাতঙ্গ গতিতে আসেন, আর পায়ের চারিগাছি মল মন্মথের নাগপাশ—ভৈরব রাগিণীতে বিরহ সংগীত গায়, তখন সে বীণানিন্দিত শব্দ তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং অশ্রু ভারাকীর্ণ সুন্দর চক্ষু শক্তিশেল বটে কি না, তাহা তুমিই অনুভব কর। আবার যখন তাঁহার স্বামী মান ভাঙ্গাইতে আসিয়া বলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ধ্যান জ্ঞান, যপ, তপ; তুমি আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ; তুমি আমার রতি মতি গতি; তুমি আমার আদ্যাশক্তি ভগবতী; তুমি আমার একমেবাদ্বিতীয়ং," যখন স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়া অভিমানিনী 'তোমার আদরের কপালে আগুণ' বলিয়া "কাঁদন মাখি হাসি দেয় গারি" তখন তুমি বুঝিতে পার সে আগুণ, আগুণ না অমৃত। যখন কোন রসিকা সিমন্তিনী স্বামীর আসিতে রাত্রি হইয়াছে বলিয়া সহস্র প্রকার অঙ্গভঙ্গীর সহিত সাধা গলায় দীপক ধরিয়া আগুণ উঠান্ এবং তানসেনের ন্যায় আপন আহুত অগ্নিতে আপনি পোড়েন, তখন সে আগুণের হল্‌কাও তোমার উপর দিয়া বহিয়া যায়। যখন তরলমতি ভামিনী মধুর অধরে তরল হাসি হাসির্তে২ ঘটে করিয়া তোমার জল তুলেন, তখন তুমি কেমন মনের আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাক; যখন তোমার জল সে করকমলে শোভা পায়, তখন কেমন হস্তালঙ্কার প্রভায় ঝক্ ঝক্ কর, আবার যখন সে

জলে চরণ সরোজ ধুইয়া গড়াইয়া দেন, তখন তুমি সে স্মরগরল খণ্ডন, সে অরুচির রুচি, সে স্বামী দমনের মহাস্ত্র, সে রাত্‌বেড়ান রোগের মহৌষধ পদযুগল হইতে বিযুক্ত হইয়া মনের দুঃখে যাইতে২ হুং কর। এই সকল দেখিয়া আমার হিংসা হয়। আমার ইচ্ছা হয়, এইবার মরিয়া কুপ হইব। তুমি শিখাইতে পার, পাঠকবর্গ তোমরা কেহ বলিয়া দিতে পার, কি পুণ্য করিলে কূপ জন্ম হয়?

দেখ কূপ, অনেক সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব তোমার হৃদয়ে পড়ে। আমি এক খানি সুন্দর মুখের জন্য কত দিন নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করি, তেমন মুখ কি কখন দেখিয়াছি? সে মুখ কি আমায় দেখাইতে পার? যে দিন চন্দ্রদেব, নীলগগণ আলো করিয়া, সাতাইশটী সেবা দাসীর সঙ্গে রসের তরঙ্গ তুলিয়া আমোদ করেন এবং কুমুদিনী, নায়কের নিষ্ঠুরতা এবং অপ্রেমিকতা দেখিয়া অভিমানভরে অঙ্গ দোলাইয়া উঠে; যখন প্রভঞ্জন কানে২ কি বলিয়া তাহাকে শান্ত্বনা করে, কিন্তু প্রেমের অভিমান! কুমুদিনী, 'এ প্রাণ আর রাখিব না— চক্ষের উপর এই পোড়ানি।' বলিয়া যেন মরিবার জন্যই বার২ ঢলিয়া২ জলে পড়ে; যখন নির্লজ্জ লম্পট স্বভাব শশাঙ্ক, প্রণয়িনীর অভিমান দেখিয়া মান ভাঙ্গিবার জন্য পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন এবং কুমুদিনী মাথা দোলাইয়া "নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে" আর বায়ু প্রিয়তমা সহচরীর ন্যায় দুঃখে গলিয়া গায়—

"যাঁহা সারি রহ্‌নে গুমাই তাঁহা যাও২ নেহি বোলুঁরে" তখন এই শোভার মধ্যে বসিয়া, এই শোভা দেখিতে২ এক খানি সুন্দর মুখ চিন্তা প্রবাহ মধ্যে ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া যায়, তার পর অনুসন্ধান করিয়া আর পাই না, সে মুখ খানি কোথায় পাওয়া যায়, বলিতে পার? যখন সন্ধ্যা সমীরণ প্রেম উদাসিনীর ন্যায় শূন্য হৃদয়ে বলে উপবনে, নদীতীরে, বৃক্ষ মধ্যে ঘুরিয়া২ বেড়ায়, তখন ভূতপূর্ব্ব আন্দোলন করিতে২ যে অপ্সরানিন্দিত মুখ বিদ্যুৎবৎ হৃদয়ে চমকিত হয়; বিদ্যুৎবৎ যেমন জ্বলে তেমনি নিভায়—যেমন ভাসে তেমনি ডুবে; বিদ্যুৎবৎ হৃদয়াকাশের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিয়া যায়; বিদ্যুৎবৎ বজ্রাঘাৎ লইয়া আসে, কেহ বলিতে পার সে মুখ কোথায় পাওয়া যায়? কেহ বলিতে পার কোথায় হারাধন মিলে? আমি তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু সে মুখ দেখিতে পাই না। কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, কত ঘর আলো করা রূপ দেখিয়াছি, কত সোনার সীতা দেখিয়াছি, কত এক মানিক সাত রাজার ধন দেখিয়াছি, কত রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন পবিত্র সৌন্দর্য্য এ পাপ সংসারে, এ জন্মে এ পোড়া চক্ষে আর পড়িল না। সে সরলতা, সে কোমলতা, যে পবিত্রতা, সে অনির্ব্বচনীয় শোভা কাহার মুখে দেখিতে পাইলাম না। কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কোন্ স্থানে গেলে, কার উপাসনা করিলে, কি তপস্যা বলে তাহা পাওয়া যায় আমি তাহারই উপসনা করিব, সেই তপস্যাই করিব? গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলে শয় ইত্যাদি নিয়ম পালনে আমি পরাঙ্মুখ নহি। ইহার অপেক্ষাও যদি কোন

কঠোর নিয়ম থাকে তবে তাহাতেও স্বীকৃত আছি। হৃদয়ের পরতেং যে কালাগ্নি জ্বলিতেছে তাহার তুলনায় পঞ্চাগ্নি কোন ছার? পঞ্চাগ্নি কোন ছার—আমি ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতা শুনিতেং, স্ত্রীলোকের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেং, উত্তমর্ণের তাগাদা শুনিতেং সেই তপশ্চারণ করিব। করিব, কিন্তু হায়, এ সংসারে যাহা যায় তাহা কি আর ফিরিয়া আসে?

সদসদ্বিবেচনা।

হব্‌স।

টমস্ হব্‌স শতত দশ শতাব্দীতে স্বীয় মত প্রচার করেন। হব্‌স প্রবৃত্তির স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু স্বদেশ প্রচলিত রাজনীতিই প্রবৃত্তির নেতা অথবা সদসদ্বিবেচনা রূপে ব্যাখ্য করিতেন।

হব্‌সের ইহা বিশ্বাসের কারণ কি? জড় জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও কার্য্য কারণ ভাব বিদ্যমান আছে। মনুষ্যের মনও অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। সর্ব্বদা যাহার কুফল প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার উপর আপনা হইতেই নিরতিশয় বিদ্বেষ সঞ্চার হয়। হব্‌সের পক্ষেও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। হব্‌সের জীবন কালেই প্রথম ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন, এবং তাঁহারই আচরণে সমগ্র ব্রিটন দ্বীপ বিদ্রোহানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ছারখারে যাইবার উন্মুখ হইয়াছিল। বস্তুতঃ গৃহ বিচ্ছেদ ও স্বদেশ প্রচলিত রাজনীতি সম্বন্ধে যথোচিত ভক্তির অভাবই, সপ্তদশ শতাব্দীর তাদৃশ শোনিত শোষণকর ঘটনার কারণ বলিয়া অনুভূত হয়।

হব্‌সের মতে মনুষ্যের স্বার্থ সাধন হেতুই সমুদায় কার্য্য করা বিধেয়। রাজনীতির অবমাননা বশতঃ হব্‌সের জীবনকালে ইংলণ্ডীয়গণ অশেষবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এই জন্যই হয়ত তিনি দেশ প্রচলিত রাজনিয়মের উপর যথোচিত আস্থা রাখিয়া সমুদায় কার্য্য করিতে বলেন। কিন্তু যে দেশে রাজা বা শাসনকর্ত্তা নাই, অধিবাসিগণ অদ্যাবধি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই অবস্থিত আছে। তথায় একমাত্র স্বার্থই মানব সাধারণের সমুদায় কার্য্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

হব্‌সের মত সমালোচন করিতে হইলে আদৌ দৃষ্টব্য এই যে, স্বার্থ সদসদ্বিবেচনার মূল হইতে পারে কিনা? দ্বিতীয়তঃ, রাজ নিয়মানুযায়ীক চলা প্রকৃষ্ট স্বার্থসাধন কি না?

সাধারণতঃ মানব মণ্ডলীর ভাব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, স্বার্থ দ্বারা উত্তেজিত হইলে লোকে কখন সদসদ্বিবেচনা করে না, যাহাতে লভ্য হয়, তদ্দিকেই দৃষ্টি করে। অন্যের সুখ নিরপেক্ষে সমুদয় আত্মশাৎ করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হয় না। মনে কর প্রত্যেক লোক কেবলমাত্র স্ব স্ব স্বার্থ সাধনে ব্যতিব্যস্ত হইল, কেহই অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধির প্রতি দৃক্‌পাত করে না, এ অবস্থাতে সমাজে কি রূপ বৈশৃঙ্খল্য উপস্থিত হয়।

এ স্থলে এই আপত্তি হইতে পারে, সমাজে প্রত্যেকের নিয়মাধীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যথার্থ স্বার্থ পরতার কার্য্য। নিয়ম ভঙ্গকালে প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে, অন্যে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমার যেরূপ পীড়া হইত, আমারও তদ্রূপ আচরণে অন্যের সেই প্রকার ক্লেশ হইতেছে। সুতরাং অন্যে নিয়ম ভঙ্গ না করে, এই অভিপ্রায়ে আমারও নিয়মাধীন হইয়া চলাই যথার্থ স্বার্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংসারে এরূপ লোক অতি বিরল। আদৌ আছে কি না সন্দেহ কল্প।

যখন একমাত্র আপনার ভালই সমুদয় কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য, মনুষ্য কি নিমিত্ত অন্যের হিতের জন্য আপনার সুখ সাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিবে? সংসারে কোন্ লোককে ত্যাগ স্বীকার করিতে দেখা যায়? যাহার মন সাংসারিক ভোগ বাসনা ও সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া পরকালের সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছে, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি গত-রাগ হইয়া যাহার দৃষ্টি পরলোকের অক্ষয়ভাণ্ডারের উপরি পতিত হইয়াছে, তিনিই কেবল পরের সুখের জন্য ঐহিককে বিসর্জ্জন দেন। যখন এই প্রলোভন ও নরক যন্ত্রণা ভোগের সঙ্গে আমরা কয় জন লোককে স্বার্থত্যাগী হইতে দেখি, তখন তাহাও না থাকিলে লোককে কিরূপ নিঃস্বার্থ প্রকৃতি আশা করিতে পারা যায়।

আগষ্টস্ কোমটীর মত হব্‌সের সম্পূর্ণ বিপরীত, তথাপি উভয়ই একরূপ দোষের আকর। সুতরাং আমরা এতৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম * ও প্রত্যক্ষ দর্শন† অন্য প্রস্তাবদ্বয়ে যে মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বক্তব্য। ফল কথা যেমন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করা অসম্ভব, তদ্রূপ মাত্র স্বার্থ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রতি মনোভিনিবেশ সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বার্থবশতঃ সর্ব্বথা রাজনীতির সম্মান সম্ভবপর নহে। আমরা সর্ব্বদাই মিথ্যা মোকর্দ্দমা দেখিতে পাই। তাহার মূল এক মাত্র স্বার্থব্যতীত আর কি হইতে পারে?

হব্‌সের মত শ্রুতি মধুর, কিন্তু কার্য্যস্থলে বড়ই দুঃখ। সদসৎ বিবেচনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিলে প্রকৃষ্টরূপে স্বার্থসাধন হয়। এস্থলে সদসৎ বিবেচনা কারণ, এবং স্বার্থ আনুসঙ্গিক কার্য্য। ইপীকিউরসের মতের ন্যায় একমাত্র কার্য্যকে কারণ জ্ঞানই টমাস হব্‌সের মতের দোষ।

এই সেই।

এই সেই নীলাকীর্ণ অনন্ত আকাশ,
এই সেই ভূমণ্ডল, সমীর মৃত্তিকাজল
অবিচ্ছিন্ন রয়েছে প্রকাশ,
সেই তারা সেই সূর্য্য সেই সুধাবাস।

সেই তো তুষারাবৃত হিমাদ্রিশিখর,
ধবল কিরীট মাথে, নদী মুক্তা হার গাত্রে
দেবদারু দণ্ড ধরি হাতে
ভারতে রক্ষা হেতু আছে নিতন্তর।

৩

সেই তো অনন্ত মুখ করিয়া ব্যাদান,
সেই যাদু সমাকুল, ভীষণ তরঙ্গ কুল

* ১ খণ্ড ৪ র্থ সংখ্যা জ্ঞাঃ।
† ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা জ্ঞাঃ।

সহ সেই বিস্তৃত সাগর
দেখাইছে মানবেরে অনন্ত প্রতান।

৪

সেই আর্য্য ভূমি হায়! সেই তরুলতা,
সেই পাখি গান করে, কত না অমিয় ক্ষরে
সেই মেঘ বরষয়ে বারি,
সেই তেজ, সেই বল ভারতের কোথা।

৫

বুঝিতাম—যদি এই হিমাদ্রি শিখর
ভাঙ্গিয়া পড়িত, কিবা তপনের এই প্রভা
কাল ধর্ম্মে হত ক্ষীণতর;
মিসিত আকাশ প্রান্তে নক্ষত্র নিকর।

৬

বুঝিতাম—দক্ষিণের লবনাম্বু যদি
সম্বরিয়া ভীম নাদ, বক্ষেতে ধরিত বাঁধ
বরজিত উল্লাস লহরি;
পীত জলা হত যদি ভারতের নদী।

৭

বুঝাইতাম মনে—তবে কাল বিবর্ত্তনে
জগতের যত সব, ধরে গুণ অভিনব
অসম্ভব হইত কি তায়;
এই বিড়ম্বনা বীর আর্য্যসুতগণে।

৮

কিন্তু তাতো নয় যে দিকেতে দেখি
সেই গিরি সেই নদী, সেই মেঘ সেই জলধি,
সেই সোভা সেই রূপ; হায়!
শুদ্ধ মাত্র আর্য্যসুত বলবীর্য্য লুকি।

৯

ঐ যে কিরণ জাল করি সম্বরণ
অস্তাচলে গেল রবি, পুন প্রকাশীবে ছবি
চন্দ্র, তারা, আদি করি সব;
এই রূপ হতে আছে উদয় পতন।

১০

কেনহে বিধাতা! কেন এবিধি তোমার?
চির কাল জানি যত, জগতের অবিরত
নিয়মের কূলে প্রবাহিত;
একি প্রতিকূল বিধি ভারতে প্রচার।

১১

উঠ হে ভারতবাসি! আর কত কাল?
বল বীর্য্য ফেলে দূরে, নিস্তেজ নিদ্রার ক্রোড়ে
আর্য্য নামে কলঙ্ক করিবে?
এখনও কি ভাঙ্গিল না নিদ্রামায়াজাল।

১২

আর্য্য নামে গর্ব্ব যদি করিতে মনন
দেখাইয়া বল বীর্য্য কর২ আর্য্য কার্য্য
দেখুক এই জগতের জন,
কত বল বীর্য্য ধরে আর্য্যের নন্দন।

১৩

দেখুক সে আর্য্যবীর্য্য হিমাদ্রি শিখর
সত্য আদি যোগ ভরি, বিশাল মুরতি ধরি
যে করিছে ভারত ঈক্ষণ,
দেখুক দক্ষিণে সেই অনন্ত সাগর।

১৪

অনন্ত আকাশে হউক আর্য্যজয়ধ্বনি,
আর্য্য নামে ক্ষণে২, চমকাইয়া জগজ্জনে
ঘন কূলে নাচুক অসনী,
সরমার তীরে বসি গাই অর্য্য ধ্বনি।

শ্রী গো—
ছাতক

স্বর্ণলতা।

"স্বর্ণলতা আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রী-যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। মূল্য ১ টাকা মাত্র।"

আজ কাল উপন্যাসের রচয়িতার সংখ্যাও অধিক, উপন্যাস পাঠকের সংখ্যাও অধিক। এমন মাস নাই যে নূতন উপান্যাস প্রকাশিত না হইতেছে, এমন লোক নাই যে দু এক খানি উপন্যাস পাঠ না করিয়াছে। উপান্যাস পাঠ করায় উপকার আছে কি না সে তর্কে এক্ষণে আমরা প্রবেশ করিব না।

কিন্তু উপন্যাস কি, কিং গুণ থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে আমরা এই অবকাশে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

সকলেই 'স্বভাব উক্তি' 'ও স্বভাব চিত্রের' কথা বলিয়া থাকেন, মিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্বভাব কাহাকে বলে, অনেকে জ্ঞাত নহেন। সাধারন লোকে মনে করেন যে, 'মলয় সমীরন' 'কোকিলের গীত,' 'পুষ্পের মনোহর সৌরভ' বর্ণিত হইলেই স্বভাব বর্ণন হইল। কিন্তু তাহাতে যে স্বভাবের সহস্রাংশের এক অংশও পর্য্যবশিত হয় না, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। স্বভাব কাহাকে বলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই উত্তর দিতে পারেন না। অথচ তাঁহারাই স্বভাব চিত্তের গুণৎ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বিশ্ব সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলেই স্বভাব। বিশ্বসংসারে যাহা নাই, তাহা স্বভাব নয়। বিশ্বসংসারে জল নিম্নগামী, উচ্চ ভূমি হইতে নিম্ন ভূমিতে যায়; সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে উদয় হন—এজন্য এ উভয়ই স্বভাব। জল উর্দ্ধগামী ও সূর্য্যের পশ্চিমে উদয়, বিশ্বসংসারে দেখা যায় না, সুতরাং ইহারা স্বভাব নয়। পঞ্চম মাসের শিশু কথা কহিতে পারে না। যদি কোন কবি তাহাকে কথা কহান, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা স্বাভাবিক হইল না। আমাদিগের দেশে অদ্যাপি স্ত্রীলোকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকে না। যদি কোন কবি, স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, এ রূপ বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনা হইল না। এইরূপ সকল বিষয়েই। প্রচলিত প্রণালীর অনুসরণ করিলেই কবি স্বভাব বর্ণনা করিলেন, কিন্তু তদ্বিপরীত করিলেই স্বভাব বর্ণনা হইল না।

একদা গোল্‌ডস্মিথ কি রূপে একটী গল্প লিখিবেন, তদ্বিষয় অনন্যমনা হইয়া চিন্তা করিতেছেন। সুধীবর জন্‌সন্ তাঁহার গাম্ভীর্য্য অবলোকন করিয়া হাসিলেন। তদ্দর্শনে গোল্‌ডস্মিথ কহিলেন, 'আপনি যত সহজ মনে করিতেছেন, গল্প লেখা তত সহজ নয়। আপনি যদি পুঁটী মাছকে কথা কহাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে তিমিমাছের ন্যায় কথা কহিবে।' গল্প লেখা কত দুরূহ ব্যাপার ও স্বভাবের কত অনুবর্ত্তী হইতে হয় তাহা এই এক কথাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

উপন্যাস এক প্রকার কাব্য। কাব্যে স্বভাব না থাকিলে সে কাব্য কাব্যই নহে। মল্লিকাফুল শ্বেত; যদি কেহ কাল বলিয়া তাহাকে বর্ণনা করেন, তাহা হইলে সে বর্ণনায় কাহার মনস্তুষ্টী হইবে? অতএব স্বভাবানুরূপ বর্ণনা করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, আশ্চর্য্য বা অভাবনীয় ঘটনা যতই কম হইবেক ততই উপন্যাস ভাল হইবেক। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ কাননে প্রবেশ করিলেই প্রাণ নষ্ট হয় এমত নহে; বিষ ভোজন করিলে যে মৃত্যু হইবে এমত নহে; কিন্তু তা বলিয়া রাজপুত্র নির্ব্বিঘ্নে ছমাস সুন্দর বনে বাস করিবেন, অথবা মন্ত্রীর পুত্র প্রত্যহ বিষ সেবন করিয়া বাঁচিয়া যাইবেন, এরূপ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরস্পর অনুরাগ জন্মিলে এরূপ সম্ভবনীয় যে প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করিবার সময় নায়ক বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া

যে সদাগরের পুত্র বা কোটালের পুত্র ২৪ ঘন্টা ক্রমাগত আহার নিদ্রা ত্যাগ কিরয়া শিতাতপ বোধশূন্য হইয়া এক স্থানে বসিয়া নিয়ত সেই চিন্তাই করি-বেন, এরূপ বর্ণনা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ অতএব এ সকলকে যত পরিহার করা যায়, উপন্যাস ততই ভাল হয়। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনায় বালকদিগের চিত্তই বিমোহিত হয়, প্রবীনদের নহে। যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ইহাতে মোহিত হয় তবে এ নিশ্চয় যে তাঁহার বুদ্ধির বয়সানুরূপ প্রাখর্য্য নাই। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তিনি জ্ঞানে বালকের ন্যায়।

তৃতীয়তঃ, শিল্প যত স্বভাবের ন্যায় হইবেক ততই তাহার পারিপাট্য হইবেক। স্বাভাবিক গোলাপ হইতে একটী কাপড়ের গোলাপকে হটাৎ পৃথক করিতে নাপারিলে তাহাকে উৎ-কৃষ্ট বলা যায় সুতরাং কল্পিত ঘটনা যতই স্বাভাবিক ঘটনার ন্যায় হইবেক ততই ভাল হইবেক। কালে ভদ্রে যেটী ঘটে সেটীকে যত পরিহার করিতে পারিবে ততই উপন্যাস উৎকৃষ্ট হইবেক।

উপন্যাস পাঠ করিবার সময় এই তিনটী কথা মনে যাগরূক থাকা অত্যা-বশ্যক। নচেৎ উপন্যাসের দোষ গুণ বিচার পক্ষে সমুহ ব্যাঘাৎ জন্মিবার সম্ভব।

এ তিনটীর পর ভাষার গুণাগুণ বিচার করা উচিত। সুন্দরী সুবসনা ও সালঙ্কৃতা হইলে যেমন আরও রমণীয়া হয়, সেইরূপ উত্তম উপন্যাস উত্তম ভাষায় বিরচিত হইলে অধিকতর মনো-হর হয়।

ভূমিকাচ্ছলে এই গুটীকতক কথা বলিলাম। ইহাতে যে উপস্থিত বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে সমুদায় বলা হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু যে গুলি নহিলে নয় ভরসা করি তৎ সমুদয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক্ষণে স্বর্ণলতার বিষয়। আমরা অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছি কিন্তু স্বর্ণলতা পাঠে স্বাভাবিক সম্বন্ধে যত দূর প্রীত হইয়াছি বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন উপান্যাস পাঠে তাদৃশ প্রীত হই নাই। স্বর্ণলতার মূল গল্পটী অতি সামান্য যে ঘটনাটী অব-লম্বন করিয়া স্বর্ণলতা লেখা হইয়াছে, সেটী প্রতি পরিবারের মধ্যেই ঘটে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শশীভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই। প্রমদা ও সরলা তাহাদি-গের পত্নী। শশীভূষণ জ্যেষ্ঠ ও উপা-র্জ্জনক্ষম। বিধুভূষণ কনিষ্ঠ, আমোদ প্রমদাশক্ত ও নিগুর্ণ। কিন্তু তথাপি তাহার বিবাহ হইয়াছে ও একটী পুত্রও জন্মিয়াছে। কালক্রমে প্রমদা ও সরলার বিবাদ হইয়া দুই ভাই পৃথক হইল। কনিষ্ঠের জীবনোপায় অতি কঠিন হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা আমোদ ছিল এক্ষণে তাহাই ব্যবসায় হইল। তিনি যাত্রার দলে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং সেই অর্থ বাটীতে সরলার নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের শ্যালক গদাধরচন্দ্র সে রেজেষ্টরি চিঠিগুলি লইয়া অর্থ অপ-হরণ করিতে লাগিলেন। অন্নকষ্টে সরলার প্রাণ বিয়োগ হইল। পরে সর-লার পুত্র গোপাল কলিকাতায় আসিয়া এক বাটীতে পাচকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন এবং পরে এক বড় মানুষের কন্যা বিবাহ করিয়া ধনী ও সুখী হইলেন। শশী-

ভূষণ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না। তিনি প্রথমতঃ বিলক্ষণ সুখে ছিলেন। পরে ধরা পড়িয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্য বিক্রয় হইয়া গেল।

এইটী উপন্যাসটীর কঙ্কাল মাত্র। কিন্তু পুস্তকখানি স্বভাব উক্তি, ও স্বভাব চিত্রে পরিপূর্ণ। আমরা ইহাতে এমন এক স্থানও দেখিতে পাই নাই যাহা সচরাচর ঘটে না কিম্বা যাহাতে স্বভাবের ব্যতিক্রম আছে।

উপন্যাসটীর উদ্দেশ্য দুই। প্রথমতঃ জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ লোকদিগের বিবাহ দেওয়া অন্যায়, দ্বিতীয়তঃ, এক পরিবারে অনেকে বাস করা অনর্থের মূল এই দুটী সপ্রমাণ করা। প্রথমটীর সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য আছে। পুরুষ অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম না হইলে তাহার পক্ষে দারপরিগ্রহ করা চির দুঃখের বিজ রোপণ করা মাত্র।* দ্বিতীয়টীর সহিত যদিও আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য নাই, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকর্ত্তা নিজের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পুস্তক খানি রয়েল ১২ পেজী ২৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য এক টাকা। পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে স্বর্ণলতার জন্য এক টাকা ব্যয় করা সার্থক বোধ হইবেক।

পৃথিবীতে কিছুই নির্দোষ নাই। স্বর্ণলতাও নির্দ্দোষ নহে। স্থানেং গল্পের এত ডাল পালা বাহির হইয়াছে যে তাহাতে পাটকের বিরক্তি জন্মে।

এ গ্রন্থের কিয়দংশ প্রথম খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরে মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং আমরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি না।

স্বর্ণলতাকে প্রশংসা করিলে আমাদিগের আত্ম প্রশংসা করা হয়।

স্বর্ণলতার দোষ গুণ আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন, সুতরাং আমরা তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রাপ্ত গ্রন্থের স সমালোচন।

চরিতাষ্টক দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, কলিকাতা বি,পি, এমস্ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। কলেবর রয়েল ১২ পেজী, ২১৩ পৃষ্ঠা।

২য়। চরিতাষ্টকে বানেশ্বর তর্কলঙ্কার, রাম দুলাল সরকার, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, মদন মোহন তর্কলঙ্কার, জজ সম্ভুনাথ পণ্ডিতের জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের মধ্যে মহৎ ব্যক্তির যথোচিত অসদ্ভাব ছিল না। বরঞ্চ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আর্য্য জাতিকেই এ বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত দেখা যায়। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে কি নিমিত্ত ইতিহাস বা জীবন চরিত লেখার পদ্ধতি প্রচলন ছিল না? আমাদিগের

* ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুরের বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এ বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

বিবেচনাতে জাতীয় নিস্বার্থতাই ইহার প্রধান কারণ। মৃত ব্যক্তির সৎকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া জীবিতদিগকে সৎকর্ম্মে উৎসাহী করা এবং কৃতজ্ঞতা বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই জীবন চরিতের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যশোলিপ্সাতে প্রায় কোন কার্য্যই করিতেন না। চিরস্মরণীয় হওয়ার বাঞ্ছা তাঁহাদিগের সরল মনে অল্পই প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং জীবন চরিত লেখা বা অন্য কোনরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। তথাপি এরূপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে যে সৎকার্য্যের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যেহেতু মনুষ্য যতই কেন নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ হউক না, কখনই নৈসর্গিক যশোলিপ্সাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

৩য়। অন্যের উপকার করিতে হইলে, অনেকরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কিয়ৎ পরিমাণে আপনার সুখ সচ্ছন্দতা বিনাশ সঙ্কল্প না হইলে অন্যের উপকার সাধিত হয় না। লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা উৎসাহিত হইলে অধিক পরিমাণে আত্ম সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। অতএব পূর্ব্ব২ মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ হইলে বিশেষ ফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

৪র্থ। পিতৃপিতামহদিগের সৎকীর্ত্তি স্মরণ থাকিলে লোকে অনেক সময় নীচগামী হইতে ইতস্ততঃ করে। পণ্ডিতবর অলিসন বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে যখন ফরাসী দেশীয় সামান্য লোকেরা জানিতে পারিল যে, তাহারা প্রাচীন রোমীয়দিগের বংশোদ্ভূত, তখনই তাহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইল। ইতিহাসের ইত্যাকার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

৫ম। ব্যক্তি সাধারণের আত্মোন্নতি পক্ষে জীবন চরিত পাঠের ন্যায় অন্য কোন বিষয়ই তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না। কিরূপে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সময় ব্যয় করিতেন, কিরূপে চেম্বার্স ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, কিরূপে রামদুলাল দে, সামান্যাবস্থা হইতে এক জন প্রসিদ্ধ ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ বিষয় পাঠের দ্বারা উপকৃত না হন এরূপ লোক কোথায় দেখা যায়?

বঙ্গ ভাষাতে দেশীয় লোকদিগের জীবন চরিতের ধারাবাহিকরূপে লেখার এই প্রথম উদ্যম। তজ্জন্য কালীময় বাবু আমাদিগের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থ খানি যদিও নির্দ্দোষ নহে, তথাপি আমরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করি। যদি স্থানে২ ভাষাগত বিশেষ দোষ না থাকিত, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় বস্তুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত। আমরা কালীময় বাবুকে অনুরোধ করি, গ্রন্থ পুর্ণমুদ্রাঙ্কন কালে ভাষার প্রতি আরও কিঞ্চিৎ মনোভিনিবেশ করেন।

গ্রন্থকর্ত্তা দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন। ইহার যেমন কতক পরিমাণে উপকারীতা দেখা যায় বটে, কিন্তু সত্য গোপন সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থকারের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"ভিন্ন রুচিহি মানবঃ" কালীময় বাবু জজ সম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির যে ২।১টী বিষয় গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারি না। অতিরিক্ত সামাজিকতা দ্বারা অস্মদ্দেশে অনেক অপকার সাধিত হইতেছে, সুতরাং আমরা তাহার কোন ক্রমেই প্রশংসা করিতে পারি না।

আক্ষেপের বিষয় এই যে,চরিতাষ্টকের ব্যক্তিনিচয়ের মধ্যেও আমরা সচ্ছল পরিমাণে ন্যায়পরতার অভাব দেখিতে পাইলাম। এটী আর্য্যদিগের চিরন্তন দোষ। তদ্বিষয় আমরা জ্ঞানাঙ্কুরে বারম্বার লিখিয়াছে। ভরসা করি গ্রন্থকার চরিতাষ্টকের অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ কালে ন্যায়পরতার উদাহরণ স্বরূপ গুটীকতক দৃষ্টান্ত সংগ্রহদ্বারা বঙ্গদেশকে উপকৃত করিবেন।

সাহিত্য কুসুম—মাসিক পত্র, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। কলেবর রয়েল ৪ পেজী ২ ফর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য ৸০।

প্রথম প্রস্তাবটী মন্দ হয় নাই। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলিন ভাল বোধ হইল না। পত্র এরূপে প্রবন্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বঙ্গভাষার অবনতি সাধন করিতে আমরা সম্পাদককে গলবস্ত্রে নিষেধ করি।

হাবড়া হিতকরী—সাপ্তাহিক পত্র, কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। রামকৃষ্ণ পুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫৷৷ টাকা।

আমরা হাবড়া হিতকরীর কএক সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

জ্ঞান বিকাশিনী—সাপ্তাহিক পত্র, চাটমহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত।

পাবনার পল্লীগ্রাম হইতে সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে, বড়ই আনন্দের বিষয়। যোগ্য পাত্র দ্বারা হইলে আরও আনন্দিত হইতাম। ভরসা করি, জ্ঞান বিকাশিনী উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হইয়া দীর্ঘজিবী হউন।

ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথম ভাগ—শ্রীরামদাস সেন প্রণীত ও শ্রীনিমাই চরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কালকাতা ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালীদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র,হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদ প্রচার, গৌড়ীয়, বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র, পরিশিষ্ট এই কয়েকটী বিষয়ে পুস্তকখানি বিভক্ত।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইল।

১ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন—রামদাস বাবু বলেন যে আর্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। আমরাও এ বিষয় নানা রূপ প্রমাণ দ্বারা "আর্য্যজাতি" * সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণন করিয়াছি। রামদাস বাবু বলেন ঋগ্বেদই রচনার প্রথম কুসুম, একথা নূতন নহে। আক্ষেপের বিষয় রামদাস বাবু ঋগ্বেদের কোথায় কোন অংশে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয় কিছুই বলেন নাই।

প্রস্তাবটীর মধ্যে যদিও অনেক নূতন কথা দেখা যায় না, তথাপি তিনি প্রশংসা যোগ্য। আমরা রামদাস বাবুর মনোগত ভাব জানি। তিনি এই বিষয়ে আরও কতকগুলিন ধারা বাহিক প্রবন্ধ লিখিবেন। ভরসা করি তাহাতে অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব। রামদাস বাবু

এই প্রস্তাব লঘু ভারত সমালোচনচ্ছলে লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনুরোধ করি তিনি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লঘু ভারতের ন্যায় অসার গ্রন্থ সমালোচন আখ্যা প্রদান না করেন।

২য় কালীদাস—আমরা এই প্রস্তাব আর একবার সমালোচন করিয়াছি। প্রকৃতি বর্ণনে কালীদাস যে সর্ব্ব প্রধান কবি এ বিষয় বোধ হয়, আজ কাল কেহই সংশয় করেন না।

রামদাস বাবু বলেন কালীদাসের নামে বঙ্গ দেশে প্রচলিত আদিরস ভানে অশ্লীল কবিতা নিচয়ের রচয়িতা মহাকবি কালীদাস নহে। আমরা এ বাক্যে অনুমোদন করি। এই প্রস্তাবে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বররুচি, শ্রীহর্ষ ও হেমচন্দ্র পাঠ করিয়া আমরা অনেক নূতন বিষয় জানিয়াছি।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় ও ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত শাস্ত্র প্রস্তাবদ্বয় অতি উত্তম হইয়াছে। আমরা নাটক রচনা বা নাটকাভিনয়ের অশেষ গুণ সত্ত্বেও বিশেষ পক্ষপাতী নহি। সত্য বটে নাটকাভিনয়ে সমাজের অনেক দোষ অপনয়ন করে, পক্ষান্তরে সুখ লিপ্সা ও ভোগ বাসনা হৃদয়ে এতই প্রবল করে যে ক্রমে ক্রমে জাতি সাধারণ নিস্তেজ ও শ্লথগতি হইয়া উঠে।

ভারতের অভ্যুদয়ের সময়ে সঙ্গীত প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু নাটক অভিনয় প্রভৃতি তাদৃশ প্রচলিত হইয়াছিল না। পূর্ব্বকালীয় বীর পুরুষগণ বীরোচিত কার্য্যাদিরই বিশেষ আদর করিতেন। কিন্তু যখনই আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আদিম অধিবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বীরত্ব বা বীর জনোচিত কার্য্য দিন দিন লোপ পাইতে লাগিল। এবং তৎসঙ্গে বিলাসক্ত ও নাটকাভিনয় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বেদ প্রচার—প্রস্তাবটীর লেখা আমাদিগের বিবেচনাতে রামদাস বাবুর যোগ্য হয় নাই। ইহাতে কিছুই নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ—রামদাস বাবু বিস্তর শ্রম করিয়া এই প্রস্তাবটী সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বাহুল্যরূপে লিখিত হইলে বিশেষ মনোহর হইত।

উপসংহার কালে আমরা রামদাস বাবুকে শত মুখে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

বঙ্কিম বাবু বা দীনবন্ধু বাবুর লেখা পড়িয়া লোকে আনন্দিত হয়, কিন্তু রামদাস বাবুর লেখা পড়িয়া অনেক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারা যায়।

রামদাস বাবুর ন্যায় আর জন কতক গ্রন্থকার হইলে বঙ্গ ভাষার অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

কুলকালিমা—কলিকাতা নন্দ যন্ত্রে শ্রীঅঘোর ঘোষের দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ৷৶০ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ নাই।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ অতি কদর্য্য হওয়ায় গ্রন্থকর্ত্তা অতি কুণ্ঠিত ভাবে আমাদিগের নিকট তাঁহার গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রকার কুণ্ঠিত হওয়ার কোনই আবশ্যক ছিল না। যেহেতু আমরা অল্প দিন হইল সমালোচকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি * সুতরাং-

* ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুর।

রাং গ্রন্থ পাঠ না করিয়া সমালোচন করিতে সাহসী নহি। কুল কালিমায় গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ করিলে জন সমাজে নিন্দনীয় না হইয়া কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসারই ভাজন হইতেন।

আমাদিগের দেশের অতি অল্প লোকই এরূপ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কুল কালিমা কৌলিন্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, (যে সময়ে বঙ্গ দেশে তৎ প্রথা অবলম্বিত হয় এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালের) হিন্দুসমাজের সামাজিক চিত্র দ্বারা আপনার গ্রন্থকে সজ্জিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার চেষ্টাকে প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি যে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

গ্রন্থকার বলেন বল্লালের হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী মতই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। আমরা এ কথাতে যথোচিত আস্থা করিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনাতে বল্লাল গুণীদিগের সম্মানার্থই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল, কিন্তু রাজ ক্ষমতা দ্বারা ঐ মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক করায় বর্ত্তমান সামাজিক কুফল উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রন্থকার এক স্থলে বঙ্গ দেশীয় পাল বংশের ভূপতিগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইংরেজদিগের যুক্তি অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সামান্য শ্রম স্বীকার করিয়া রাজসাহী জেলাস্থ কুমারপুর গ্রামে আগমন করিলে এতদ্বিষয়ের জনপ্রবাদ ও ভগ্নাবশেষাদি সন্দর্শন করিলে যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেন।

গ্রন্থের ভাষা অতি বিশদ, সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

A FREE ENQUIRY AFTER TRUTH.*— কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির যন্ত্রে মুদ্রিত—শ্রী কিশোরী লাল রায় প্রণীত। কলেবর ডিমাই ৮ পেজী ৮২ পৃষ্ঠা।

সহজ জ্ঞানমূলক প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্টতা প্রতিপাদনই গ্রন্থ কারের উদ্দেশ্য। আমাদিগের বিবেচনাতে তিনি যুক্তির দ্বারা তদ্বিষয়ে সম্যক কৃতকার্য্য লাভ করিয়াছেন। আমরা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দুঃখিত অন্তরে পুস্তক খানি সমালোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই পুস্তক প্রণয়ন জন্য কিশোরী বাবুকে শতং ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

তাঁহার হৃদয় সংকীর্ণতা ও পূর্ব্ব সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া দর্শনের আলোকে আলোকিত হইয়াছে। আজ কাল অনেকেই ব্রাহ্মদিগকে মূর্খ ও গোঁড়া বলিয়া থাকে, আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা একবার কিশোরী বাবু প্রণীত স্বাধীন ভাবে সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন।

নলদময়ন্তি কাব্য—কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমরা লজ্জিত ভাবে পরিচয় দিতেছি এই গ্রন্থ খানিও কিশোরী বাবু প্রণীত। আমরা ইহার প্রশংসা করিতে পারি না। কিশোরী বাবু কবি নহেন। তিনি একজন দার্শনিক। অনুরোধ করি তিনি কাব্য ত্যাগে দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন।

* ইংরাজী ভাষায় লিখিত।

বঙ্গবিজেতা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অতিথিদ্বয়।

And wherefore do the poor complain,
The rich man asked of me,
* * * *
You asked me why the poor complain,
And these have answered thee,

Southey.

যখন সরলা ও অমলার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইল তখন কমলা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমান ও সরল পথ দিয়া না যাইয়া বন্ধুর, বক্র ইচ্ছামতী তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর তরঙ্গমালা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে; ভীষণ উচ্ছ্বাসে ক্রীড়া করিতেছে;—ফেন রাশিতে আবৃত হইয়া স্বুবর্ণ রৌপ্যালঙ্কার বিভূষিতা শ্যামাঙ্গী উন্মাদিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্যই কমলা নিকট পথ পরিত্যাগ করিয়া নদী তীর দিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন।

আসিতে২ অমলা সহসা ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে ধ্বনি শিশু কণ্ঠজাত বলিয়া বোধ হইল,—এই গভীর রজনীতে নদী তীরে কোথায় শিশু ক্রন্দন করিতেছে। কমলার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সেই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইয়া দেখিলেন নদীর উপকূল ভাগে দুইটি অল্প বয়স্ক বালক একটী বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতেছে; তাহাদিগের সমস্ত শরীর ও বস্ত্রাদি আর্দ্র। তাহার উপর সেই প্রচণ্ড শীতল বায়ুতে তাহারা শীতার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে।

কমলা অতি সকরুণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে বাছা, এখানে বসিয়া রহিয়াছ?"

দুইটী বালকই একেবারে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাদিগের দুই জনেরই অল্প বয়স হইবে,—এক জনের বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইবে, অন্যের বয়ঃক্রম ১ কি ২ বৎসর অধিক। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল,

"আমরা মাঝি, রুদ্রপুর হইতে নৌকা লইয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইবার সময় পথে ঝড় উঠিল। মা, তুমি যেই হও, আমাদের সাহায্য কর, আমাদের কেহই নাই।"

দ্বিতীয় বালকটী বলিল "আমাদের কেহই নাই, মা তুমি সাহায্য কর"—দুই জনেরই চক্ষুতে জল পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কমলার কোমল হৃদয়ে আরও দয়া দুঃখের সঞ্চার হইল। বলিলেন,

"বাছা, তোমরা এই বয়সে এত কষ্ট সহ্য করিতে শিখিয়াছ?—তোমরা রুদ্রপুর হইতে কোথায় আসিয়াছিলে?"

প্র, বা,—"এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। এখানে বৈকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে যাইতেছিলাম। পথে ঝড় উঠিয়াছে।"

ক, "পুনরায় আশ্রমে চল না কেন? আশ্রম অধিক দূর নহে। অদ্য রাত্রি তথায় থাকিয়া কালি বাড়ী যাইও"।

প্র, বা, “তাহাই করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বাতাস উল্টা হইয়াছে, নৌকা আশ্রমের দিকে আর এক রশীও চলে না।”

ক, “নৌকা কোথায় ?”

প্র, বা, “এই খানেই আছে” বলিয়া কমলাকে নদী কূলে লইয়া যাইল, নৌকা তথায় বাঁধা ছিল।

কমলা বলিলেন “নৌকা এই স্থানেই থাকুক, তোমরা আশ্রমে আইস।”

দ্বি, বা, যেরূপ বাতাস হইতেছে বোধ হয় নৌকার দড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে, নৌকা ভাসিয়া যাইবে।”

ক, “তবে নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখ।”

দ্বি, বা, “আমরা দুই জনে তুলিতে পারিলাম না।”

ক, “আইস আমিও ধরিতেছি।”

পরোপকারিণী ব্রাহ্মণকন্যা নৌকার এক দিক ধরিলেন, দুই জন বালক নৌকার অপর দিক ধরিল। নৌকা অতি ক্ষুদ্র, অনায়াসে ডাঙ্গার উপর উঠিল। তথায় দুইটী আম্র বৃক্ষে সেই নৌকা উত্তমরূপে বদ্ধ হইল। তখন বালকদ্বয় অতি স্নেহগর্ব্ভস্বরে বলিল—“মা আর অধিক কি বলিব, তুমি আজ আমাদের বাঁচাইলে।”

কমলা বলিলেন, “আইস বাছা আশ্রমে যাই। যেরূপ মেঘ হইয়াছে, শীঘ্রই ভয়ানক বৃষ্টি হইবে।” এই বলিয়া তিন জনই আশ্রমাভিমুখে চলিল। ক্রমে গভীর মেঘরাশি আকাশে জড় হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড২ নীল মেঘ পশ্চিম দিকে রাশিকৃত হইতে লাগিল, রহিয়া২ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা মুহুর্মুহু দেখা দিতে লাগিল, মেঘের ভীষণ গর্জ্জনে বৃক্ষ, গ্রাম, অটবী, সমস্ত মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। বালকদ্বয় ভয়ে কমলার নিকটে যাইতে লাগিল, কমলা বিষ্ময়োৎফুল্ললোচনে স্বভাবের সেই ভীম শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন, অলৌকিক আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর বালকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন, সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের এই অল্প বয়স, তোমরা এই রূপ কষ্ট করিয়া জীবন ধারণ কর ? তোমাদের কি পিতা মাতা নাই ?”

নবীন উত্তর করিল “আছেন কিন্তু তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ কার্য্য কর্ম্মে অক্ষম। আজ মা আমাদের জন্য কত ভাবনা করিবেন ;—ভাবিবেন এই ঝড়ে আমরা ডুবিয়া গিয়াছি।”

রাখাল বলিল “দাদার মৃত্যু হইয়া অবধি একটু বাতাস হইলে মা আমাদিগকে বাহির হইতে দেন না। আজ তিনি কত ভাবিতেছেন।” দুই জনে কাঁদিতে লাগিল।

কমলা তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমার দাদার কবে মৃত্যু হইয়াছে ?”

রাখাল উত্তর করিল “আজ ছয় মাস হইল, এক দিন মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন, ভয়ানক তুফানে নৌকা উলটিয়া পড়িল, আর দাদাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই অবধি পিতা পীড়ায় ও শোকে শয্যাগত, যতক্ষণ আমরা কিছু আনিতে না পারি ততক্ষণ তাঁহার খাওয়া হয় না। আর মাতা ত সেই অবধি আজ

পর্য্যন্ত দিন রাত্রি রোদন করিতেছেন।”

কমলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কিরূপে রোজগার কর ?”

নবীন বলিল “কখন মাছ ধরি, কখন নদীর শেওলা জড় করিয়া যাহারা চিনি করে তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করি, কখন বা যাত্রীদিগকে এস্থান ওস্থানে লইয়া যাইয়া কিছু২ পাই। যিনি আজ রুদ্রপুর হইতে এই আশ্রমে আসিলেন তিনি আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোথাও যাইতে হইলে আমাদের ভিন্ন আর কাহাকেও ডাকেন না। আর কত দিন আমাদিগের খাই-বার কিছু না থাকিলে আমরা উঁহার স্বামী নবীন দাসের,নিকট যাইয়া দাঁড়াই, তিনি আমাদের চাল, ডাল, পয়সা না দিয়া বিদায় করেন না।”

রাখাল বলিতে লাগিল “কিন্তু তথাপিও আমাদের কখন২ চলা ভার হয়;—কতবার বৃষ্টি বাদলার দিন এমন হয় যে আমাদের ঘরে খাবার নাই, আমরা ক্ষুধায় কাঁদি, মা আমাদের দেখিয়া কাঁদে, পিতা রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে মুখে এক খানি বাতাসা দি কি এক বিন্দু দুদ দি এমন উপায় নাই। গ্রামে ধার চাহিলে ধার পাই না, গরিবকে কে ধার দিবে? মা এক২ বার বলে যা নবীন দাসের কাছে কিছু ভিক্ষা করিয়া আন,—কিন্তু আবার ঘর হইতে বাহির না হইতে২ ফিরাইয়া আনেন; বলেন এ বাতাসে কোথাও যায় না বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাকিলে অন্ন জুটিবে।”

এই রূপ কথা কহিতে২ দুইটী বালক কমলার সঙ্গে২ চলিল। সে কথার শেষ নাই,—দুঃখী লোক যখন দুঃখের কথা বলিবার লোক পায় তখন কি তাহার কথার শেষ থাকে?—হৃদয়ে দুঃখও যে রূপ অনন্ত, কথাও সেই রূপ অনন্ত। কিন্তু এ জগতে হতভাগাগণ দুঃখের কথা বলিয়া একটু রোদন করিবে এরূপ সময়ও কত অল্প? হতভাগার দুঃখ কথা কে শ্রবণ করিবে? ধনীগণ ধনমদে মত্ত, বিলাসীগণ বিলাসে সংজ্ঞা হীন, কুল-মর্য্যাদাগর্ব্বী লোক নীচদিগের সহিত কথা কহেন না,—জগতে সকলেই ধন, মান লাভাদি নিজ২ অভিপ্রায়ে ব্যতি-ব্যস্ত। দুঃখীলোক কাহার কাছে রোদন করিবে, হত ভাগার দুঃখ কথা কে শ্রবণ করিবে?

তিন জনে যাইতে যাইতে পথে মহা-শ্বেতার সহিত দেখা হইল। তিনি নদী-তীরে শিব প্রতিমা পূজা করিয়া আশ্র-মাভিমুখে যাইতেছিলেন। কমলাকে কিছু দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন,

“কে ও কমলা? এস মা আশ্রমে যাই; এই অন্ধকার ঝড়ের সময় কি তোমার বনে বনে বিচরণ করিবার সময়? আর ও দুইটী বালক কে?”

কমলা উত্তর করিলেন “ও নিরাশ্রয় বালক, নৌকা লইয়া যাইতে ছিল, এরূপ সময়ে ঝড় উঠিল, সুতরাং আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হইবে।”

ম,—‘আহা বাছাদের সমস্ত বস্ত্র সিক্ত, আয় শীঘ্র শীঘ্র আশ্রমে আয়। আর কমলা তোমার সহিত আমার সরলা গিয়াছিল, সে কোথায়? তুমি আপনি যেমন বনদেবী তাহাকেও তাই করিলে। বাছা রুদ্রপুরে অমলাকে যেমন ভাল বাসিত এখানে তোমাকে সেই রূপই ভাল বাসে। কিন্তু এখনও অমলাকে ভুলে নাই, তাহার জন্য দিন রাত্রি কাঁদে।

এ জগতে বিপদ কালে কয় জন বন্ধু হয় ? যাহারা হয় তাহাদিগকে কি কেহ কখন ভুলিতে পারে ?”

সরলার দিবা রাত্রি ক্রন্দনের অন্য কারণ ছিল তাহা কমলা জানিতেন, তথাপি মহাশ্বেতার সম্মুখে তাহা বলিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন,

“হাঁ সরলা এক্ষণও অমলাকে বড় ভাল বাসে, অমলার সঙ্গে আশ্রমাভিমুখে গিয়াছে।”

“আর বনদেবীর বুঝি এক্ষণও আশ্রমাভিমুখে যাইবার সময় হয় নাই, এক্ষণও বনে২ বিচরণ করিতেছেন,”— এই বলিয়া শিখণ্ডিবাহন সম্মুখে আসিলেন।

কমলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। বলিলেন “শিখণ্ডিবাহন! তুমি এই রাত্রিতে আশ্রম হইতে কোথায় যাইতেছ ?”

শি—পিতা চন্দ্রশেখর আমাকে আপনার অন্বেষণে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি বনাভিমুখে যাইতে ছিলাম, বনদেবীকে আর কোথায় পাওয়া যাইবে! আপনার সঙ্গে এই দুইটী বালক কে ?”

এইরূপ নানা কথোপকথন করিতে২ মহাশ্বেতা, কমলা, শিখণ্ডিবাহন, আর সেই দুইটী দরিদ্র বালক আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

—০—

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদারের পূর্ব্বকথা।

But I have woes of other kind
 Troubles and sorrows more severe
Give me to ease my tortured mind
 Lend to my woes a patient ear
And let me—if I may not find
 A friend to help—find one to hear

Crabbe

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে আশ্রমে আর কেহই মহাশ্বেতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না। তাঁহারাও এ পরিচয়ের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

ধর্ম্মপরায়ন আশ্রমবাসিগণ চিরকালই অতিথি সেবায় তৎপর। সুতরাং যখন মহাশ্বেতা দ্বিতীয়বার আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইলেন, তখন সকলেই, বিশেষ চন্দ্রশেখর, তাঁহাকে আপন গৃহে রাখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু মানিনী মহাশ্বেতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি আপনার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন ও তথায় কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও কন্যার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে অনেকেই ভক্তি সহকারে আশ্রমবাসিদিগের নিকট পূজা পাঠাইতেন। সেই পূজা দ্রব্য আশ্রমবাসী সকলেই সমান ভাগ করিয়া লইতেন, মহাশ্বেতাও এক অংশ পাইতেন, সুতরাং তাঁহার ভরণ পোষণে কিছু মাত্র কষ্ট হইত না।

আশ্রমের শান্ত, দ্বেষ বিদ্বেষ শূন্য নিবাসিগণের সহিত একত্র বাস করিতে২ মহাশ্বেতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল।—কিন্তু সে বয়সে স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন কখনই হয় না। মহাশ্বেতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে সেইরূপই জাগরিত ছিল। স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেইরূপই প্রতি রাত্রিবৈর নির্য্যাতনের জন্য

শিব পূজা করিতেন ;—সেই রূপই প্রতি দিন বৈরনির্য্যাতনের আলোচনা করিতেন। শিখণ্ডিবাহন এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেন না, মনেং ভাবিতেন সিংহপত্নীকে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে রাখিলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

আজি রাত্রি অতিশয় দুর্যোগ বশতঃ অনেক জন অতিথি আশ্রমে আসিয়াছেন, আশ্রমবাসিগণ অতিথি সেবা অপেক্ষা অধিক আনন্দ জানিত না। মুনিপত্নিগণ অতিথিদিগের জন্য অন্ন পাক করিতে লাগিলেন, সহর্ষ চিত্তে নানারূপ ব্যঞ্জন পাক করিয়া আপনং রন্ধন কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। মুনিগণ সুনৃত বাক্যে অতিথিদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। গৃহেং শীত নিবারণার্থ অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে বন্ধু বান্ধবে উপবেশন করিয়া মিষ্টালাপ করিতেছে ; শুদ্ধান্তঃপুর হইতে গৃহিনীদিগের সংসার কথা শুনা যাইতেছে, কখনং রন্ধনের সৌরভ আসিতেছে, কখনং বা অল্প বয়স্কাদিগের সুমিষ্ট রহস্য হাস্য শুনা যাইতেছে। জগতের মধ্যে এই আশ্রমটী শান্তি ও কুশলের স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।

চন্দ্রশেখরের কুটীরে অদ্য একজন অতি সমৃদ্ধিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া অনেকেই খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হইলে তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন। সে আশ্রমটী এরূপ ক্ষুদ্র যে তাহার মধ্যে সকলেই সকলকেই এক পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিত, মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণ সকল আশ্রমবাসিদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে সঙ্কোচ করিত না। সুতরাং অদ্য রাত্রিতে চন্দ্রশেখরের প্রশস্ত কুটীরাভ্যন্তরে অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রী একত্র হইলেন,—দুই এক জন অপরিচিত অতিথি আসিয়াছে বলিয়া আশ্রমের রীতি ভঙ্গ হইল না।

গৃহের মধ্য স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে অগ্নির ঠিক পশ্চাতে চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু দিনং আশ্রমের শাস্ত্র দেব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই হউক, বা মানসিক শান্তি বশতঃই হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটী মাত্র বার্দ্ধক্য চিহ্ন নাই। নয়ন দুইটী জ্যোতিঃপূর্ণ, সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর যজ্ঞোপবীত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। উপমাপটু কালীদাস তাঁহাকে দেখিলে বলিতেন যে উন্নতকায় হিমালয় গঙ্গাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়াছেন,—দেব কার্য্য সাধনার্থ তাঁহার তেজোময় শরীর বার্দ্ধক্যে ও যৌবন বলে বলিষ্ট হইয়াছে,—অথবা

> অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্
> জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
> বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং
> শরীর বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥

তাঁহার নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন। তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার চিন্তায় ও পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর কি শীর্ণ করিয়াছে ! মস্তকের কেশ অধিকাংশ পলিত হইয়াছে, ভ্রূযুগলের কেশও দুই একটী শুক্লবর্ণ হইয়াছে। চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদন মণ্ডলে তেজঃ নাই, শরীরে বল নাই। হস্ত পদাদি শীর্ণ হইয়াছে, চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে। তাঁহাদিগের দুই

জনকে দেখিলে সংসার ও সংসার চিন্তার অকিঞ্চিৎকারিতা ও অনিষ্টকারিতা, ও যোগবল ও পুণ্যবলের গৌরব ও মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমৃদ্ধিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহেন,—ইনি ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ।

সেই দুই জনের উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক জন আশ্রমবাসিগণ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,—অন্ধকারে থাকিলেও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত সে উন্নতকায় সকলেই দেখিতে পাইতে ছিল, তাঁহার স্থির গম্ভীরভাব দেখিয়া অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও আশ্রমবাসী সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া ছিল। তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু২ কি কথা কহিতেছেন, এক২বার নগেন্দ্র নাথের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের বাম হস্তের নিকট, অগ্নির সন্নিকটে কমলা বিনীত ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, অগ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। এক২ বার তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই দুইটী নিরাশ্রয় বালকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, স্নেহ সহকারে তাহাদিগকে অগ্নির নিকটে বসাইয়াছেন,—তাহাদিগের সিক্ত বসন উত্তপ্ত করিতেছেন, এক২বার তাহাদিগের সংসার কথা, দুঃখ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুটীরের এক কোণে অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে,—আজ তাহাদিগের; আনন্দ অপার, তাহাদিগের গল্প শেষ হইতেছে না, তাহাদিগের সুমিষ্ট ওষ্ঠে সুহাসি শুখাইবার সময় পাইতেছে না। অপর একটী কোণে নিস্তারিণী, মনোমোহিণী, যোগেন্দ্রমোহিণী তারা ইত্যাদি অল্প বয়স্কা মুনিকন্যাগণ আমোদ রহস্য করিতেছে,—তাহাদিগেরও কথার শেষ নাই, আমোদের শেষ নাই,—এক২ বার মুখে বসন দিয়া হাসি সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে,—আবার এক২ বার নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে। ইহা ভিন্ন অপরাপর মুনি ও মুনিকন্যা অগ্নির চারি পার্শ্বে বসিয়া কখন২ আপনাদিগের মধ্যে কথা কহিতেছে, কখন নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মহাত্মন্! আমি আপনার পুণ্যাশ্রম দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। যদি আপনার মত মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে এই বার্দ্ধক্যে আমি অসীম দুঃখসাগরে ভাসিতাম না।" চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, কেবলই কি আশ্রমে পুণ্য কর্ম্ম করা যায়,—সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি পুণ্য কর্ম্ম সম্ভবে না? শাস্ত্রে বলে দান ধর্ম্ম ও পরোপকারিতায় যত পুণ্য, যাগ যজ্ঞে তত নাই। যে জমীদার পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়েন তাঁহার কি আশ্রমবাসের জন্য আক্ষেপ উচিত?"

ন,—"মহাশয়! আপনি আমাকে অতিশয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, যদি মহাপাপী না হইতাম, তবে আজ পাপ প্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিতাম না।"

চ,—"এ জগতে সহস্র গুণ সত্ত্বেও কে মহাপাপী নহে। কে বলিতে পারে আমি পাপ করি নাই,—কে বলিতে পারে আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?"

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"মুনিবর আমার মত পাপী এ জগতে আর কেহই নাই, আমার মত দুঃখীও আর কেহই নাই, আমার দুঃখ কথা শ্রবণ করুন।

"আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলিতেন যে, যে দিন তাঁহার জন্ম হয়, সে দিন, আকাশে অপরূপ তিথি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে গণিয়া বলিয়াছিলেন যে শিশুকন্যা ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে ভ্রম। আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি সুকুমার মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল সে জন্য আমি তাঁহাকে পাগলিনী বলিতাম। আজি দ্বাদশ বর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলিনীর কাল হইয়াছে।

"পাগলিনীর গর্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদিগের গর্ভধারিণীর মত দুই জনই পাগল। জ্যেষ্ঠটী চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটী কার্য্য কর্ম্মে পাগল। সে দুইটী পুত্র আমার দুইটী নয়নের তারা ছিল,—আজ তাহারা কোথায়? হায় দারুণ বিধি! বার্দ্ধক্যে কি আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? আমার দুইটী নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি, দুইটী রত্ন হারাইয়াছি, আমি কাঙ্গালী হইয়াছি।"

সে দুঃখ বচনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ক্ষণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—

"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অল্প বয়সে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তাহারই শোকে তাহার মাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ্য করিয়াছিলাম। আহা! সেরূপ বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই! দয়া ধর্ম্মে, বিদ্যালোচনায়, বল. বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীন বয়সে সিংহবল ধারণ করিত, মল্ল যুদ্ধে শত২ যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়াছে, অসীম বাহুবলে সকলকে বিস্মিত করিয়াছে, অশ্ব চালনায় তাহার সমকক্ষ এ দেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে দয়া ধর্ম্মে দাতাকর্ণ বলিত, বল বিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বাল্য কালেই রাজা সমরসিংহের নিকট যুদ্ধ বার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিত, শুনিতে২ বালকের মুখ গম্ভীর হইত, নয়নদ্বয় তেজে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইত, শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও যুদ্ধে যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত, রাজা সমরসিংহ অশ্রু পূর্ণ লোচনে বালককে চুম্বন করিত। আজি সে বালক কোথায়! বিধাতঃ এক্ষণ আর কে আছে যাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিব।"

বৃদ্ধ পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "তাহা যদি শ্রবণ করিতাম তাহা হইলে আর

এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না, সেই ক্ষণেই জীবন ত্যাগ করিতাম।”

চ। “তবে এত চিন্তিত হইতেছেন কেন, সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় অবশ্যই কুশলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।”

ন। “আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্য রাত্রি যোগে অতিশয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি,—সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়াছি,—সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হইল যেন ভীষণ সেনারাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন যুদ্ধের ভীষণ কোলাহলে উন্মত্ত হইয়া আমার পুত্র শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া সাগর তরঙ্গের ফেন চূড়ের ন্যায় সেনা তরঙ্গের সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইতেছে। আহা! বৎস অল্প বয়স হইতেই যুদ্ধে যাইয়া যশোলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু এখনকার ভীষণ মোগল পাঠানদিগের যুদ্ধে যদি লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব? মুনি শ্রেষ্ঠ! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দেন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তবে আমি এই ক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন “শান্ত হউন।” বলিয়া ক্ষণেক ধ্যান করিতে লাগিলেন। কুটীরের সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সরলা প্রিয় সইয়ের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া উপবেশনাবস্থাই নিদ্রা যাইতেছিল, নিদ্রাতেও তাহার অধরে হাস্যকনা বিরাজমান রহিয়াছে। যেন প্রিয় সখীর স্পর্শসুখে নিদ্রাতেও আনন্দ স্বপ্ন দেখিতেছে। অমলা অনন্যমনে জমীদারের কথা শুনিতেছিল—সুরেন্দ্রনাথ কে তাহা জানিত না। মহাশ্বেতার শরীর ভয়ে কন্টকিত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহারই কার্য্যের জন্য যাইয়াছেন, সে কার্য্যও বিপদ্‌রাশি বেষ্টিত। মহাশ্বেতা ভাবিলেন “আমি অভাগিনী যদি সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি, তবে, আপন শোণিত দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। ভগবন! রক্ষা কর।”

অনেক ক্ষণ পর চন্দ্রশেখর চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—

“নিশ্চিন্ত হউন, আপনার সন্তান কুশলে আছেন।” নগেন্দ্রনাথের শরীরে যেন জীবন আসিল,—এ বিশাল বিপদাকীর্ণ সংসারে এক মাত্র পুত্র বিয়োগের ন্যায় আর কি বিপদ্ আছে? তথাপি বোধ হয় মহাশ্বেতার চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও অধিকতর আরাম বোধ করিলেন,—পুণ্যাত্মার হৃদয়ে মহাপাতকের ভয়, পুত্র বিয়োগের ভয় অপেক্ষাও গাঢ়তর ও ভীষণতর।

এ আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। পুত্র কবে গৃহে আসিবেন,—এক্ষণও আসিলেন না কেন, অনেক বার ত ভ্রমণ করিতে বাহির হয়েন কিন্তু কখনও এত দিন বিলম্ব করেন নাই,—স্নেহবান্ পুত্র হইয়া পিতাকে ছাড়িয়া এত দিন কিরূপে আছেন,—ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন।

“মহাশয় আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—এবার আপনার পুত্রের এত দিন বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণ আপনি কিছু জানেন, যাইবার সময় আপনাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন”?

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—পরে বলিলেন

"আপনার নিকট আর আমি পাপ কথা লুকাইব কেন? আমার পুত্রের দোষ কিছুই নাই। বাছা যদিও পাগলের মত কখন২ গ্রামে২ ভ্রমণ করিত, তথাপি আমাকে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাত দিন কখন থাকিতে পারিত না। এবার যে দুই মাস রহিয়াছে, সে কেবল আমারই পাপে।

"যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন রাজা সমরসিংহ আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভাল বাসিতেন; আমাকে অতিশয় সম্মান পুরঃসর আলিঙ্গন করিতেন। আমরা দুই জনে কথা কহিতেছি আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একটী দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে সেই দুহিতা একটী পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিল। রাজা কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন,—কন্যার এই কার্য্যটী দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমাকে বলিলেন 'নগেন্দ্রনাথ, অনেক রাজ পুত্রের সহিত আমার এই কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু কন্যা যাহাকে আপনি বরণ করিয়াছে তাহারই সহিত আমি উহার বিবাহ দিব। তোমার পুত্রের সহিত আমার একমাত্র দুহিতার বিবাহ হইবে।' আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বঙ্গ চূড়ামণি রাজা সমরসিংহ আপনি একমাত্র দুহিতাকে যে এই অকিঞ্চিৎকর জমীদারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। সেই দিনই আমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলাম,———সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ করিয়াছি।"

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ সকোপ কঠাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কন্টকিত হইতে ছিল। তিনি নগেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই সে দিন আসিয়া তথায় বসিয়া ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন। "আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমরসিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্য সমৃদ্ধিশালী পাত্রী স্থির করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক উপযুক্ত পাত্রী পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকার ভঙ্গে তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র তাহাতে অসম্মত হইল। এক দিন আমাকে বলিল, 'পিতা, আমি আপনার কোন কথায় অবাধ্য হইতে পারি না, কিন্তু একটী বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমরসিংহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না।' এই যথার্থ কথায় আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষাৎ নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির করিলাম, বলপূর্ব্বক তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, ধর্ম্মের জয় হইল,—আমার পুত্র গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল,—বাছাকে সেই অবধি আর দেখি নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ যে কেবল একটী পুরাতন প্রতিজ্ঞা রক্ষা হেতু পিতার অবাধ্য হয়েন

নাই তাহা পাঠক মহাশয় অবগত আছেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, কত পাপ করিয়াছি, সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই যাতনা। কোথায় এই বয়সে আমার অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দুই পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্রবধূ বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া আমার পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী নাই, অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছি,—মুনিবর! কি পাপে আমার এই অদৃষ্ট হইয়াছে,—কি করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তাহা আপনি বিধান করুন।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন,—"আমি আপনার জন্য পূজা দিতে ক্রুটী করিব না; যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় সেরূপ বিধান করিতে ক্রুটী করিব না।"

শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার সহিত কথা কহিতেছিলেন,—তিনি নগেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য কহিয়া বলিলেন,

"প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যদি পাপ করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা পুনরায় পালন করিতে যত্নবান হউন।"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন "শিখণ্ডিবাহন! আমি প্রতীজ্ঞা পালন করিব। রাজা সমরসিংহের অনাথা দুহিতাকে আনিয়া দাও, আমার সুরেন্দ্রনাথের সহিত অবশ্যই বিবাহ দিব। আর আমার পূর্ব্ববৎ গর্ব্ব নাই, পূর্ব্ববৎ অভিমান নাই। বার্দ্ধক্যে ও শোক দুঃখে আমার উচ্চ মস্তক নম্র করিয়াছে। এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আমি আর জানি না।"

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া মহাশ্বেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। সে কি কথা হইতেছিল পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন "ভগিনি! আর বিলম্বে আবশ্যক কি আপনার পরিচয় দিন,"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন "যদি বিধাতা আমাদিগকে পূর্ব্বমত উন্নতি সম্পন্ন না করেন তাহা হইলে এ জন্মে পরিচয় দিব না, এজন্মে কন্যার বিবাহ দিব না"

শি। "কেন?"

ম। "প্রথম কারণ আমার ব্রত ভঙ্গ কখনই করিব না। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ আছে।"

শি। "সে কি?"

ম। "পরের নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি অপরকে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহারও নিকট গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বিধবা নিরাশ্রয় হইয়াও সেই রীতি পালন করিবে।"

শি। "আমি আপনার কথা বুঝিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

ম। "আমি নিরাশ্রয় বিধবা,—নগেন্দ্রনাথ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, দয়া প্রকাশ করিয়া আমার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিবেন, ইহা আমি মরিলেও সহ্য করিব না। লোকে আমার কন্যার প্রতি অঙ্গুলী নিদর্শন করিয়া বলিবে 'ইহার মাতা সুতা কাটিয়া খাইত, নগেন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া ইহার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন'—আমি

মরিলেও এ কথা সহ্য করিব না। শিখণ্ডিবাহন! মানিনী মৃত্যু ভয় করে না, কিন্তু পরের নিকট দয়া বা অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে ভয় করে।”

শিখণ্ডিবাহন অবাক্ হইয়া রহিলেন,—বলিলেন “তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিজ্ঞা পালনের প্রস্তাব করিতে বলিলেন কেন?”

ম,—“এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞা পালনে সম্মত আছেন কি না দেখিবার জন্য,—আমি সম্মত নাই”

এই কথোপকথন অতি অপরিস্ফুট স্বরে হইতেছিল, সুতরাং আর কেহই শুনিতে পায় নই।

নগেন্দ্রনাথ আবার আপন দুঃখ কথা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের কথা শীঘ্র শেষ হয় না, বিশেষ দুঃখের কথা পরকে জানাইলে মনের দুঃখ কিছু শান্ত হয়।

নগেন্দ্রনাথের সামান্য দুঃখ নহে, যখন আপন অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন, স্ত্রী নাই, পরিবার নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, জগৎ সংসার অন্ধকার;—বৃদ্ধ পুনঃ২ আপন দুঃখ কথা বলিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চন্দ্রশেখর বলিলেন “মহাশয়! আপনার মত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি দুঃখ শোকে সংজ্ঞা শূন্য হইবে, তবে অপর লোক কি করিবে? আপনার পুত্র জীবিত আছেন, কুশলে আছেন, আমার বংশে কেহই নাই আপনি যদি এইরূপ শোক বিহ্বল হইবেন, তবে আমি কি করিব?”

নগেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন—“মুনিবর! আপনি যে কখন বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতাম না। আপনার কি পুত্র কন্যা কিছু হইয়াছিল?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন “পূর্ব্বকথা স্মরণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র,—কিন্তু দুঃখীর দুঃখ কথাই ভাল লাগে। আপনি আমার দুঃখ কথা শ্রবণ করুন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুনিবরের পূর্ব্ব কথা।

To gather life's roses, unscathed by the briar,
Is given alone to the bare footed friar,
Scott.

কুটীরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, একে২ তাঁহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া গেলেন। মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণ সকলেই আপন২ গৃহে গমন করিলেন, কমলা বালকদ্বয়কে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া একটী ঘরে শয়ন করিতে বলিলেন, আপনিও নিজ শয্যা গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। শিখণ্ডিবাহনও উঠিয়া আপন আশ্রমে গমন করিলেন। কুটীরে নগেন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখর ভিন্ন কেবল মহাশ্বেতা বসিয়াছিলেন, আর অমলা প্রিয় সখীর মস্তক আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। অমলা এতক্ষণ কি জন্য বসিয়াছিল পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিবেন।—অমলার কিসের ঔৎসুক্য যে সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে? অমলা ভাবিতেছে,—“নগেন্দ্রনাথের পুত্র পাগল, মধ্যে২ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামে২ বেড়ায়,—লুকাইয়া কৃষকদিগের সঙ্গে বাস করে, আজ দুই মাস হইল কোন সন্ধান নাই, বলিষ্ঠ বীরপুরুষ,

অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুন্দর——যদি প্রেমদাস নগেন্দ্রনাথের পুত্র না হয় তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নহি।— স্থির হও, বাপ যাহাকে বলে তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের মেয়েকে বিবাহ করিবে,—সমর সিংহের বিধবা এক্ষণে নিরাশ্রয় ;—ছদ্ম বেশে আছে, —তাহার মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য প্রেমদাস পাগল হইয়াছে। প্রেমদাসকে বিবাহ করিবার জন্য ত সরলা পাগল হইয়াছে,—সই বলিল প্রেমদাস তাহাতে সম্মত আছে——হরি হরি! আমার সই কি সমরসিংহের কন্যা? মহাশ্বেতাকে দেখিলেও রাজরাণীর মত বোধ হয়, সামান্য ব্রাহ্মণীর মত বোধ হয় না,—কাহারও সহিত অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শ্বেত প্রস্তরের শিব পূজা করেন, বৃদ্ধ বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করিতেছে। আর সরলা, —সই আমার বক্ষের উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আমার বোধ হয় উহার স্মরণ শক্তি ইহা অপেক্ষাও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত,—আপনি রাজ কন্যা হইয়াও আপনাকে রাজকুমারী বলিয়া জানে না। রাজকুমারীর সহিত আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি।—রাজকুমারীর পদ বিক্ষেপে রুদ্রপুর ও বনাশ্রমের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে? ভগবন্! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না"——অমলা এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন,

"আমি অতি অল্প বয়স অবধি শিব পূজা ভক্ত ছিলাম। ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রম গ্রহণ করি নাই; গুরু সেবায়, শাস্ত্রালোচনায় ও দেবপূজায় কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অবশেষে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম।

"মায়াজালে জড়িত হইয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলাম, —যে সমস্ত অনীর্ব্বচনীয় সুখ পূর্ব্বে কখন ভোগ করি নাই, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে লাগিলাম। যে সমস্ত কষ্ট ও ক্লেশ পূর্ব্বে কখন জানিতাম না, এক্ষণে তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। সংসার কি মোহ জালে জড়িত। মায়া, প্রেম, বাৎসল্য, দয়া এ সকল কি স্বর্গীয় সুখের আকর, আবার এই সকল হইতে কি অচিন্তনীয় দুঃখ উৎপন্ন হয়! গুরু সেবায় ও দেব পূজায় যে শান্তি লাভ করিয়াছিলাম, এই মোহজালে জড়িত হইয়া এক্ষণে তাহা ভুলিলাম। সমভূমির উপর স্বচ্ছ নদী যেরূপ নিঃশব্দে শান্ত ভাবে বহিতে থাকে, আমার জীবন গুরুর আশ্রমে সেইরূপ বহিতেছিল,—সহসা নিম্ন ভূমি পাইলে সেই প্রবাহিনী ঘোর গর্জ্জন সহকারে যেরূপ জলপ্রপাৎ স্বরূপ পতিত হয়, সংসারাশ্রম প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার জীবন সেইরূপ সহস্ররূপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। সে কয় বৎসর এক্ষণে আমার স্বপ্নসম বোধ হয়।

"অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার পুত্র কন্যাদি কিছু হয় নাই। তাহাতে আমার পত্নী ও আমি দেবতার নিকট মানিলাম যে, প্রথমে আমার যে সন্তান হইবে তাহাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। তাহারই দুই এক বৎসর পরে দেবকন্যার ন্যায় রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন আমার একটী

কন্যা হইল। সে কন্যার মুখাবলোকন করিয়া আমরা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, পিতা মাতার সাধ্যে ছিল না যে সেই সুন্দর পুত্তলীটীকে বিসর্জ্জন দেয়।

"সে কন্যার মুখ আমি এক্ষণও বিস্মৃত হই নাই। চক্ষু দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ও শান্ত, চিত্তও নিরুপম শান্ত, প্রায় ক্রন্দন করিত না। যদি কখনও ক্রন্দন করিত, তাহার মাতা তাহাকে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইয়া চন্দ্র দেখাইত বা কল্লোলিনী নদীর কলং ধ্বনি শুনাইত, —শিশু তাহাতেই একেবারে নিস্তব্ধ হইত। অল্প বয়সে কি হৃদয় স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে?

"মায়ায় প্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, কিন্তু সে পাপের ফল ফলিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল, জীবনের আশা রহিল না। তখন আমরা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলাম। দেবতার নিকট আবার মানিলাম যদি কন্যা এই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে তবে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। সে পীড়া আরাম হইল, হৃদয় হইতে মায়া উৎপাটিত করিয়া আমরা কন্যাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিলাম।

"বিসর্জ্জন দিবার অগ্রে তাহার বক্ষঃস্থলে এক অপরূপ চিহ্ন দিলাম,—শিবের প্রতিমা অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া দিলাম, মানস ছিল যদি বাছা সাগর হইতে পরিত্রাণ পায়, যদি তাহাকে কখন আবার দেখি তবে আপন কন্যা বলিয়া চিনিব। বৎস পরিত্রাণ পাইয়াছিল,—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণী তাহাকে জলরাশি হইতে তুলিয়া লইল,—কিন্তু সে কন্যাকে আর পাইলাম না।

"গৃহে আসিয়া দেখিলাম আমার সহধর্ম্মিণী কন্যাশোকে বিহ্বল হইয়াছেন—সেই শোকে তাঁহার পীড়া হইল, সেই পীড়াই তাহার কাল হইল। তাঁহার শব শ্মশানে সৎকার করিতে লইয়া যাইলাম। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আমি সংজ্ঞা শূন্য পাগলের ন্যায় সেই দিকে দেখিতে লাগিলাম। সে সময় আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান থাকিলে আমি সে দুঃখ ভার বহন করিতে পারিতাম না,—জ্ঞান থাকিলে সেই অগ্নি রাশিতে মানবলীলা সম্বরণ করিতাম। অজ্ঞানের মত সেই চিতার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিল,—আমার চারিদিকে ঘোর অন্ধকার হইল।

"তখন মায়াজাল সহসাছিন্ন হইল। যে কুহা এত দিন জীবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সহসা তিরোহিত হইল। সংসারে আপনার বলিয়া সম্বোধন করি এরূপ আর কেহই ছিল না। চারিদিকই শূন্য ধূ ধূ করিতেছে যে দিকে চাই সেই দিকে শূন্য দেখি,—সেই দিকেই মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নাই। প্রণয়িনী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, —এক মাত্র কন্যা অতল জলে ভাসিতেছে;—এইরূপ পূর্ব্ব স্মৃতিতে আমার হৃদয় ব্যথিত ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল,— নদী তীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

সে দুঃখ রোদনে শান্ত হইল না,— প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোদন করিলাম। সন্ধ্যার সময় আর সহ্য না করিতে পারিয়া আত্মহত্যার স্থির সংকল্প করিলাম। যাহার এ পৃথিবীতে কেহ নাই, যে মরিলে শোক করিবার

কেহ নাই, অথচ নিজ অসহ্য শোক বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার আত্ম-হত্যার বাধা কি ?

"জলে মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় পশ্চাৎ হইতে স্কন্ধে কে হাত দিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম আমার প্রাচীন গুরু দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন।"

"এক্ষণও মায়া জাল ছিন্ন হয় নাই ?—এক্ষণও জ্ঞান বিকাশ হয় নাই ?—চন্দ্রশেখর অজ্ঞানের কার্য্য করিওনা, আমার সঙ্গে আইস।"

"আমি সঙ্গে২ এই আশ্রমে আসিলাম। পুনরায় যোগ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, গুরুর মৃত্যুর পর অবধি আমিই এই স্থানের অধ্যক্ষ হইয়াছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেং সহসা এক জন বালক আসিয়া মহাশ্বেতাকে মৃদু স্বরে বলিল "বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে।" মহাশ্বেতা অতি দ্রুত বেগে সেই দিকে চলিলেন। কিছু পথ যাইয়া পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন তাহার ভীষণ আকার অধিকতর ভীষণ হইয়াছে, সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিতেছে, বলিল "মহাশ্বেতা এই ক্ষণেই পলায়ন কর, শত্রু এই আশ্রমে আসিয়াছে।"

মহাশ্বেতা বলিলেন "পাগলিনি! তুমি বিপদ্‌কালে চির কালই আমার বন্ধু, তোমার ঋণ কিরূপে সোধ করিব ?"

পা। "এক্ষণে আপন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা দেখ।"

ম। "কোথায় পলাইব ?"

পা। "রুদ্রপুরে বা ইচ্ছাপুরে, যথায় ইচ্ছা,—শীঘ্র পলায়ন কর।"

ম। "আশ্রমবাসিদিগের নিকট বিদায় লইব না,—তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য একবার ধন্যবাদ দিব না ?"

পা। "আর এক দণ্ডকাল এস্থানে থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু,—চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আপনার সন্ধানে আশ্রমে বেড়াইতেছে।"

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "আমার হৃদয়েও সেই সন্দেহ হইয়াছিল। সে কাল সর্প না হইলে এ নিরাশ্রয় বিধবাকে দংশন করিতে কে ইচ্ছা করে। হায়! আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াও তোর মানস সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদের প্রাণে বধ করিবি ? মৃত্যু!—মৃত্যুকে কে ভয় করে, যদি এই প্রাণের কন্যা না থাকিত তবে আর কাহাকে ভয় করিতাম ?"

পাগলিনী পুনরায় বলিল "চিন্তার সময় নাই।"

ম। "আমি যদি আপন পরিচয় দিয়া আশ্রমবাসিদিগের শরণাগত হই তাহা হইলে কি পরিত্রাণ নাই ?"

পা। "আশ্রম সুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে এত লোক আসিয়াছে,—মহাশ্বেতা শীঘ্র পলায়ন করুন।"

ম। "আমিইবা আপনার জন্য আশ্রমবাসিদিগের কেন দুর্ঘটন ঘটাইব।—আমার যাহা কপালে আছে হউক, মহেশ্বর কন্যাকে রক্ষা কর। পাগলিনি! আমি চলিলাম কিন্তু তুমি যে আপদ্ বিপদ্ কালে আমাদের সহায়তা করিয়াছ, তোমার কি পরিচয় পাইব না ?"

পা। "অন্য সময়, এখন শীঘ্র পলায়ন কর।" এই বলিয়া পাগলিনী অদৃশ্য হইল।

মহাশ্বেতা দ্রুতবেগে আপন গৃহে

যাইয়া শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শিব প্রতিমা ও কিছু অর্থ লইয়া নদীতীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতেং ভাবিলেন "এই রাত্রিতে কি নৌকা পাইব,—মাঝিরা কি কেহ ঘাটে আছে"—ভাবিতেং নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যথার্থই চিন্তা করিয়াছিলেন, দুই এক খানি নৌকা ঘাটে আছে কিন্তু এক জনও মাঝি নাই। ইতস্ততঃ যাইতে যাইতে দেখিলেন একখানি নৌকায় অনেক মাঝি আছে ও সকলেই জাগিয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বাপু, তোমরা রুদ্রপুরে যাইবে?"

নৌকারোহীগণ মহাশ্বেতা ও সরলার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণেক পর বলিল "যাইব, আসুন।"

মহাশ্বেতা আরও বিস্মিত হইলেন। কিন্তু চিন্তার সময় নাই "ভগবান্ সহায় হও" বলিয়া মাতা কন্যা নৌকায় উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িল।

মহাশ্বেতা আপনা হইতে শত্রু হস্তে আসিয়া পড়িলেন। সেই নৌকায় চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন আশ্রমে সন্ধান করিয়া মহাশ্বেতা ও সরলাকে চিনিয়াছিল সেই বলিয়াছিল "যাইব, আসুন।"

নৌকা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

In low dark rounds the arches hung,
From the rude rock the side walls sprung,
• • • •
A cresset in an iron chain,
Which served to light this drear domain,
With damp and darkness seemed to strive.
As if it scarce might keep alive,
• • • •
Fixed was her look, and stern her air,
Back from her shoulders streamed her hair,
The locks that wont her brow to shade,
Started up erectly from her head,

Scott.

প্রাতঃকালের স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্ত প্রবাহিনী যমুনার উপর ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদী বক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্রস্থিত শিশির বিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইয়া বহিতেছে, ও ঘাটে যে সকল রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসিয়াছে তাহাদিগের শরীর পুলকিত করিতেছে। কৃষকগণ গরু লইয়া মাঠে যাইতেছে ও রহিয়াং আনন্দে গান করিতেছে;—পক্ষীগণও তরুণ অরুণ কিরণে পুলকিত হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়। এরূপ হতভাগিনী কে আছে, যে এই আনন্দের সময় শোক বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছে?—মনুষ্যই মনুষ্যের দুঃখের কারণ।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী ঘর ছিল, তথায় আনন্দদায়ী সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারিত না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একটী ভীষণ প্রকোষ্ঠ ছিল তথায় শকুনি ইচ্ছামত বিদ্রোহী প্রজা বা পরম শত্রুকে কখন কখন বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সে গৃহের ভিত্তি আনন্দ বা হাস্যের ধ্বনিতে কখন প্রতিধ্বনিত

হয় নাই,—সে গৃহের অভ্যন্তরে সুখ অথবা ভরসা কখন প্রবেশ করে নাই, তথায় কেবল মাত্র হতভাগ্য বন্দীদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রুত হইত, অশ্রু বিন্দু দৃষ্ট হইত। গৃহতল মৃত্তিকাময়; অন্ধকার নিবারণার্থ একটী হীন জ্যোতিঃ প্রদীপ দিবা রাত্রি জ্বলিত। সেই প্রদীপালোকে সেই অসুখজনক গৃহতলে মহাশ্বেতা ও সরলা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

সরলা নিদ্রিত;—মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় মহাশ্বেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা নিদ্রিত রহিয়াছে। সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে; চক্ষু দুইটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা বা বালিকা ভাব দেখা যাইতেছে না, সরলা আর বালিকা নাই,—সহসা অসীম শোক সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকাসুলভ সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াছে। সে জাগরণ কি ক্লেশদায়ী? সুখের আশা ভরসা একেবারে দূর হয়, মানব জীবনের প্রকৃত অবস্থা একেবারে সম্মুখীন হয়।

সরলার পার্শ্বে মহাশ্বেতা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,—অনিদ্র হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সে ভীষণ স্থানে তাঁহার মুখে যে ভীষণ ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত,—সে ভাব ভয়ের নহে, দুঃখের নহে, কেবল চিন্তার নহে। তাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক অভিমান অদ্য এই ভীষণ কারাগারে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নয়ন ধক্২ করিয়া জ্বলিতেছিল; যেন অবারিত অগ্নি কনা বহির্গত হইতেছে;—সূক্ষ্ম ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে; সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ততার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, নয়ন নিমেষ শূন্য, হৃদয় পূর্ব্ব স্মৃতি ও চিন্তা তরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে।

ক্ষণেক পর সরলা জাগিল। উঠিয়া মাতার মুখমণ্ডলে অপরূপ ভীষণ ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীত হইয়া বলিল "মা, সমস্ত রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?"

মহাশ্বেতার চিন্তা শৃঙ্খল সহসা ছিন্ন হইল, সরলার দিকে চাহিলেন, চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া মুখের বিকৃত ভাব লীন হইল, চক্ষুতে জল আসিল। মনে২ ভাবিলেন "ভগবান্ এই মৃত্তিকা শয্যা যদি অগ্নি শয্যা হইত তাহাও সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রাণের সরলাকে এ অবস্থায় দেখিয়া চক্ষুতে শূল বিঁধিতেছে।"

সরলা আবার বলিল,—

"মা, তোমার জন্য কল্য যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা এক্ষণও স্পর্শ কর নাই, যেরূপ ছিল সেইরূপ আছে?"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন "আহারে রুচি নাই।"

সরলা পুনরায় বলিল "না খাইলে শরীর কত দিন থাকিবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "বাছা আর শরীর থাকার আবশ্যক কি? ভগবান যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।"

সরলা বলিল—"মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?"

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন "না মা, হত ভাগিণীর এখনও যাইবার সময় হয় নাই।"

যখন মহাশ্বেতা চিন্তা করিতেছিলেন, সরলাও চিন্তা শূন্য ছিল না। মাতার দুরবস্থা, আপনার দুর্দ্দশা, প্রেমদাসের চিন্তা এ সকলই সরলার দুঃখের কারণ। কিন্তু তাহার সরল হৃদয়ে এক সময়ে একটীর অধিক চিন্তা স্থান পাইত না। বালিকার হৃদয় অধিক দুঃখ কখন অনুভব করে নাই, অধিক দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না,—একটী চিন্তায় একটী দুঃখে সে হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। বনাশ্রমে প্রেমদাসের চিন্তায় সরলা দিবা রাত্রি নিমগ্ন থাকিত,—এক্ষণে সে চিন্তা, ও আপন দুঃখ চিন্তা সকলই বিস্মৃত হইল, কেবল মাতার দুঃখ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। যে সময় মহাশ্বেতা চিন্তামগ্ন ছিলেন, সরলা এক পার্শ্বে বসিয়া এক দৃষ্টিতে মাতার দিকে অবলোকন করিতেছিল। দেখিতে২ আপন নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল এক২বার কুঞ্চিত হইতেছিল, বিশাল নয়ন দুইটী জলে পরিপূর্ণ হইতেছিল, মধ্যে২ দীর্ঘ নিশ্বাসে বক্ষস্থল স্ফীত হইতেছিল। মাতার দুঃখ দেখিয়া বালিকার হৃদয়ে যে কি যাতনা হইতেছিল তাহা সেই বালিকাই জানে।

এমন সময়ে ঝন্‌ঝনা শব্দে কাগারের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা দ্বারের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সরলা মুখ ফিরাইয়া দেখিল এক জন নিরুপমা সুন্দরী দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন; —বলা আবশ্যক নাই যে সে সুন্দরী বিমলা।

বিমলা কারাগারের ভিতর যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন পূর্ব্ব দিনের খাদ্য দ্রব্য এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী বালিকা বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মাতঃ আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে আপনারা বাহিরে আসুন।"

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেই দিকে চাহিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি কে?"

বিমলা উত্তর করিলেন

"এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের দুহিতা, আমার নাম বিমলা।"

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর ধীরে২ বলিলেন

"তোমার পিতাকে বলিও আমাদের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,—যে কয় দিন আছি আমাদিগকে নির্জ্জনে থাকিতে দাও,তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না।"

অন্য সময়ে এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশমাত্র উদিত হয় নাই। তিনি ধীরে২ উত্তর করিলেন

"আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আইসি নাই, এই জঘন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন,

"বন্দির এই রূপ ঘরে থাকাই ভাল, —যাহার চরণে শিকল তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপ-

যুক্ত। যাও আর দয়া প্রকাশে আবশ্যক নাই, হতভাগিনীদিগের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।”

বিমলা সজলনয়নে উত্তর করিলেন

“মাতঃ আমি যে আপনাদিগকে উপহাস করিতে আইসি নাই জগদীশ্বর জানেন”—

বিমলা আরও বলিতেন কিন্তু মহাশ্বেতা ভীষণ স্বরে বলিলেন

“জগদীশ্বরের নাম করিও না,—তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, নরাধমের বংশে যেন সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।”

বিমলা গম্ভীর স্বরে বলিলেন।

“মাতঃ আপনি আমাদিগকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন। আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ,—হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে,—মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব,—এই দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিণীর সেই নামই একমাত্র অবলম্বন, এক মাত্র সুখ।”

সে পবিত্র নাম শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ একেবারে লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন দেব কন্যার মত সেই উন্নত প্রকৃতি রমনীরত্ন দণ্ডায়মান আছেন। নয়নে অশ্রুজল ;—মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে২ বলিতে লাগিলেন

“বিমলা, ক্ষমা কর; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, দুঃখে বিবেচনা শক্তির লোপ হয়,”—

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,

“মাতঃ ক্ষমা প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই—আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্প দুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনি আমার প্রতিও দয়া করিবেন।”

মহাশ্বেতা বিমলাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন, দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন ;—হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেকপর মহাশ্বেতা বলিলেন

“বিমলা তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপ কর্ম্ম দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণা কন্যার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?”—

বিমলা উত্তর করিলেন,

“মাতঃ আপনি এখনও ভ্রান্ত। আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাঁহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে সেই পিতাকেও হতভাগ্য করিয়াছে,—আমি আশঙ্কা করি সে পিতার মৃত্যু সংকল্প করিতেছে।”

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন ভাবিলেন “সে কি,—সতীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে।”

বিমলা মহাশ্বেতার চিন্তা দেখিয়া বলিলেন “মাতঃ উপরে আসুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।”

তিন জনে ধীরে২ সেই জঘন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে ভগিনী মত স্নেহ করিয়া লইয়া যাইলেন। তাঁহাদিগের আহারাদি সাঙ্গ হইলে বিমলা শকুনি সংক্রান্ত সমস্ত কথা

মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন। কেবল বিমলা আপনি যে সেই পামরের নিকট কত অনুনয় কত কষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের কারামুক্তির অনুমতি পাইয়াছিলেন সেই কথা লুকাইয়া রাখিলেন।

সদসদ্বিবেচনা।

দার্শনিক রিচার্ড কম্বার্লাণ্ড ১৬৩২ খৃঃ অঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৭১৮ খঃ অঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার *De Leqilius Naturæ disquisitio philosophica centra Hobbium instituta* নামক দর্শনগ্রন্থ ১৬৭২ খৃঃ অঃ প্রকাশিত হয়।

কম্বার্লাণ্ডের মতে প্রত্যক্ষে মানব সাধারণের হিত সাধন এবং পরোক্ষে আপনার হিত সাধন—জীবনের উদ্দেশ্য। প্রজ্ঞা সদসদ্বিবেচনার মূল। প্রজ্ঞা স্বাভাবিক নহে। কিন্তু অত্যল্প চিন্তা দ্বারা আপনা হইতেই উদয় হয়। যে কার্য্যে জন সাধারণের শুভ হয়, তাহা বৈধ এবং তাহার দ্বারা অন্তিমে আপনার হিত হয়। আর যে কার্য্যানুষ্ঠানে জন সমাজের অনিষ্ট হয়, তাহার দ্বারা আপনারও অশিব হয় সুতরাং তাহা অবৈধ। সংক্ষেপতঃ কম্বার্লাণ্ডের মত সমালোচন করিতে হইলে এই কয়েকটী কথা দ্রষ্টব্য।

১। পরোক্ষে আপনার শুভ সাধনের ইচ্ছাতে কার্য্য করিলে, তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষে জন সাধারণের হিত হয় কি না?

২। "জন সাধারণের হিত সাধন" রূপ বৈধ ও "জন সাধারণের অনিষ্ট করণ" রূপ অবৈধ জ্ঞান স্বভাবজাত বা বহু আয়াস ও চিন্তাসাধ্য না হইয়া অত্যল্প চিন্তা ও অনুসন্ধান কি না?

৩। "জন সাধারণের উপকার" বাক্যের অর্থ কি?

১। স্বার্থ সাধন উদ্দেশে লোকে জন সাধারণের উপকারের জন্য ব্রতী হইতে পারে না, এ বিষয় এই প্রস্তাবের পূর্ব্বেও অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি বোধে তাহা এক্ষণে আর বলা গেল না। স্থূল দৃষ্টিতে সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমরা ইহার ভূরি পরিমাণে দৃষ্টান্ত পাই। সংসারে আমরা কাহাকে পরোপকারী দেখি? যে স্বার্থশূন্য। অপিচ উপচিকীর্ষাবৃত্তিদ্বারা উত্তেজিত লোকের উদাসীন ভাবের কার্য্য দ্বারাও অনেক সময়ে সাধারণের হিত হয়, কিন্তু তাহা গণনার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; যেহেতু তদ্রূপ উপকারের কোন নিশ্চয়তা নাই, এবং কেহ তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে না। সংসারে এক মাত্র নিঃস্বার্থ ভাব ব্যতীত যশোলিপ্সা, প্রত্যুপকার অথবা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা প্রভৃতি উদ্দেশ্য বশতঃও লোকে সময়ে সময়ে সৎকার্য্যানুষ্ঠান করে এবং অনেকে তদ্দ্বারা বহুল অংশে উপকৃত হয়। কিন্তু এই সমুদয় ভাব বিশেষের কার্য্য, সুতরাং ইহার কোন স্থৈর্য্য নাই। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য পরায়ণতা ব্যতীত এক মাত্র ভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে,

তাহার দ্বারা সময়ে লোকের হিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সময়ে অনিষ্টও সাধিত হয়। অপরন্তু ভাব বিশেষ অথবা যশোলিপ্সা প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলেও অনেক অংশে আপনার স্বার্থ বিনাশ করিতে হয়।

কম্বার্লাণ্ড জন সাধারণের ও আপনার উপকার সাধন সম্বন্ধে ২টী বিভাগ করেন;—"এক আপনার অপকার না করিয়া পরের সাহায্য করা; দ্বিতীয় পরের অপকার সাধন না করিয়া আপনার উন্নতি করা।" এ স্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থনাশ না করিলে অপরের উপকার সাধন হয় না। মৌখিক সহানুভূতিতেও (যাহা কেবল বাক্য ব্যতীত অন্যোপায়ে প্রকাশিত হয় না) কিয়ৎ পরিমাণে সময়ের অপব্যয় হয়। পক্ষান্তরে সেই সময় বিশেষ লাভজনক কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত, স্মুতরাং তাহার অপব্যয় হওয়ায় কিঞ্চিৎ স্বার্থনাশ হইল। অতএব এ কথা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, স্বার্থসাধন ও পরোপকার ব্রত গ্রহণ যুগপৎ এক জন লোক দ্বারা সংসিদ্ধ হয় না। স্মুতরাং কম্বার্লাণ্ডের প্রথম মত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু সমাজস্থ প্রত্যেক লোকই যদি পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে; তাহা হইলে পরোক্ষে সকলেরই স্বার্থসাধন হয়। যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া, সংসারে সকলেই অপরের হিত সাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই মর্ত্ত্যলোক কি স্মুখের ভবনই না হয়? পরস্পর কলহ বিবাদে আর সমাজের ধন গূঢ় ও প্রত্যক্ষ উভয়বিধ ভাবে ক্ষয় হয় না। এক্ষণে সংসারে যত ধন সঞ্চয় আছে, হয়ত বৎসরের মধ্যেই তাহার দ্বিগুণ হয়। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পের ভূরিপরিমাণে উন্নতি হয়। আরও অধিক সংখ্যক লোক কেবল মনস্তত্ত্ব ও প্রাকৃতিকতত্ত্ব লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতে পারে। স্মুতরাং অধুনাতন অনেকের পক্ষে দুঃখময় সংসার কল্পনাতীত স্মুখের ভবন হইয়া উঠে। আহা! সে স্মুখের কথা স্মরণ পথে উদিত হইলে, মন আনন্দে নৃত্য করে এবং শরীর লোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু হায়! যখন আমরা বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় অতিক্রম করিয়া একমাত্র কল্পনার কুহকে বশীভূত হইয়া তাহারই সহিত ভ্রমণ করি, তখনই কেবল এই অবস্থা অনুভব করিতে পারি স্মুতরাং পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলেই যে স্বার্থসাধন হইবে একথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। পাঠক! আমার দৃষ্টান্তে হয়ত তুমিও পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতে পার। তাহাতে সুখ পাইবে। কিন্তু সংসারীর ন্যায় কখন লাভবান হইতে পারিবে না। কারণ জন সাধারণ কখন তোমার দৃষ্টান্তানুসরণ করিবে না। জন সাধারণ কেবল স্বার্থসাধন জন্য ব্যস্ত হইল আর তুমি জন সাধারণের জন্য ব্যস্ত হইলে, এরূপ স্থলে কিরূপে তুমি আপনার হিত সাধন করিতে ক্ষমবান হইবে। অতএব কম্বার্লাণ্ডের মত কাল্পনিক, কখন প্রত্যক্ষ গোচর নহে।

দ্বিতীয়তঃ "সকল মনুষ্যের উপকার অথবা অধিকাংশ লোকের উপকারই আমাদিগের বিবেচনাতে জন সাধারণের উপকার" বাক্যের অর্থ। স্বভাবতঃ আমরা

সৎকর্ম্মশালী, সুতরাং আমাদিগের স্বাভাবিক কার্য্য হইতে সাধারণের বিপুল উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উপায় ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (যথা, কেন, কি প্রকারে, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ কর? ইত্যাদি) সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এবং কেহ ইহার ব্যভিচার করিলে, যে কিরূপে প্রতিকার হয় তাহাও সহজে ইয়ত্ত্বাধীন নহে। যদি সমুদয় লোকেই, স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি পরবশ হইয়া সৎপথে বিচরণ করিত, তাহা হইলে বাক্য ব্যয়ের কিছু আবশ্যক ছিলনা। অন্যথা সমাজ শাসনের জন্য রাজনীতির আবশ্যক হইয়াছে। রাজনীতিজ্ঞেরা সকলেই সমাজের মঙ্গল সংকল্প হইয়া স্ব স্ব মত ব্যক্ত করেন, তথাপি কেন পরস্পর বৈষম্য উপস্থিত হয়, কেন ইংলণ্ডদেশে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয়বিধ দলে সমস্ত রাজনীতিতত্ত্ব বিত্তেরা বিভক্ত? একথাতে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমান সমাজের ন্যায় সৎ ও অসৎ উভয়বিধ লোক পরিপূর্ণ সমাজে কখন অধিকাংশ লোকের উপকার সাধন উপযোগী নিয়ম আবিষ্করণ সহজে সম্ভবপর নহে।

পক্ষান্তরে অসীম দয়াবান ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও রাজত্বে বিশ্বাস করিলে একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসের অযোগ্য যে, পরস্পর বিরোধী মতোদ্ভাবক বুদ্ধি বৃত্তির উপর লোকের প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান কর্ত্তব্যজ্ঞান নির্ভর করে। সুতরাং চিন্তাসাধ্য জনসাধারণের হিতসাধন কখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় অথবা উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের ন্যায় কম্বার্লাণ্ডও কার্য্যকে কারণ ও কারণকে কার্য্য জ্ঞান করিয়া বিষম ভ্রম-জালে আবদ্ধ হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে কোন কার্য্য দ্বারা লোকের আশু হিত সাধিত হয়, কিন্তু তাহার ফল অধিক কাল স্থায়ী নহে। আবার যে কার্য্য সাধারণ্যে আশু অপকারজনক হইতে পারে, চরমে তাহাও সুফল প্রসব করে।

নৃত্য গীত প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য বিষয় সকল প্রথমোক্ত স্থলের উদাহরণ (পাঠকগণ মনে করিবেন না যে আমরা নৃত্য গীত প্রভৃতির মুহূর্ত্তমাত্র সন্তোষবর্দ্ধন ব্যতীত অন্য কোন উপকার নাই বলিতেছি।) পক্ষান্তরে একটী সূতা ও বস্ত্রের কল আনয়ন করিতে হইলে রাজসাহীবাসীদিগের পক্ষে হয়ত আপাততঃ বিশেষ ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কালে তাহা হইতে কত উপকার হইবে তাহা পাঠকগণের নিকট অধিক বর্ণনার আবশ্যক নাই। বৎসর বৎসর আমাদিগের দেশের যে অর্থ মাঞ্চাষ্টার নগরের তন্তুবায়গণ লাভ করিতেছেন তাহা দেশেই থাকিবে। কিন্তু হায়! কয়জন ইহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং উপকৃতের সংখ্যা ও সেই উপকার ভোগের কাল বিবেচনা করিয়া কিরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ অত্যল্প চিন্তা দ্বারা জন সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর।

জন লক।

ব্রিটন দ্বীপে আবহমান কাল, যত চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে জন লক কাহারও অপেক্ষা অধিক নিম্নস্থানীয় নহেন। লক ১৬৩২ খৃঃ অঃ হইতে ১৭০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার দর্শন সম্বন্ধীয়

গ্রন্থের নাম "Essays on the Human Understanding" মানব-বুদ্ধি বিচার। সত্য বটে আজ কাল তাঁহার অনেক মত তামাদি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ কালে, আমরা তাঁহাকে শত মুখে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। আজ আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছি, এই জন্য তাঁহার অনেক মতকে ভ্রম-সঙ্কুল বলিতে পারিতেছি, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে কয় জন লোক তাঁহার বাক্যে সন্দেহ করিত? লক সহজজ্ঞান অথবা স্বাভাবিক ন্যায়ান্যায় বোধ শক্তি বিশ্বাস করিতেন না। (১ম খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরের ৭ম সংখ্যাতে আমরা এ বিষয়ের একটী সুদীর্ঘ সমালোচন প্রকাশ করিয়াছি।)

লকের মতে যাহা হইতে জনসাধারণের হিত সাধন হয় তাহাই সৎ, আর যাহা হইতে জনসাধারণের ক্লেশোৎপত্তি হয়, তাহাই অসৎ। জনসাধারণের হিত সাধনই সৎ আর অনিষ্ট করা অসৎ আমরা এবাক্য অবিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ ধর্ম্মাচরণ হইতেই লোকের প্রকৃত উপকার হয়। অন্যায় ও প্রবঞ্চনা দ্বারা সময়ে সময়ে কাহারও হিত সাধন হয়, কিন্তু সেরূপ উপকার যারপর নাই অকিঞ্চিৎকর। একথা এস্থলে বলা দ্বিরুক্তি মাত্র যে জনসাধারণের হিত ও অহিত কখন সদসদ্বিবেচনার মূল হইতে পারে না। এ বিষয় দার্শনিকপ্রবর কম্বার্লাণ্ডের মত সমালোচন কালে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

মনে কর, কাহার মিথ্যাপবাদে রাজদ্বারে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, আর তুমি মিথ্যা বলিলে তাহার প্রাণরক্ষা পায় এস্থলে উপরি উক্ত মত ন্যায়ান্যায়ের মূল হইলে মিথ্যা বলা বিহিত। জনসাধারণের ইষ্ট ও অনিষ্ট মাত্র ন্যায়ান্যায় বিচারের উপায় হইলে এইরূপ বিষম বিভ্রাট ও মনুষ্যের স্থূল বুদ্ধির অগোচরে অশেষবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ন্যায়ান্যায় বিচার সম্বন্ধে আমরা লকের মত গ্রহণ করিতে পারি না।

কডওয়ার্থ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাল্‌ফ কডওয়ার্থ নামক জনৈক দার্শনিক ন্যায়ান্যায় বিচারের অখণ্ডনিয়ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া, মানব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য সদসদ্বিবেচনার মূল তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন।

কডওয়ার্থই প্রথমতঃ বিশদরূপে ফল নিরপেক্ষ নৈতিক মত বাদ প্রচার করিয়াছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদিগের মতের ভ্রান্তি দর্শাইয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনার স্বাভাবিকত্ব বর্ণন করেন। কাহারং মতে কার্য্য ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন ন্যায়ান্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ কডওয়ার্থই এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে অকাট্য তর্ক-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন।

(১) জ্ঞানের অস্তিত্বে কোন বস্তু অথবা তাহার গুণ-বিশেষের অস্তিত্ব হইতে পারে না। অন্যের জ্ঞান থাক বা না থাক, সুন্দর বনে ব্যাঘ্র আছে এবং সেই ব্যাঘ্র হিংস্র স্বভাবাপন্ন। আমি জানি বলিয়াই আমার গৃহের বাহিরে বৃক্ষ আছে? অথবা আমার গৃহের বাহিরে বৃক্ষ আছে, এই জন্যই আমার তদ্বিষয় জ্ঞান আছে? ভূমণ্ডলে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগের অজ্ঞাতসারে এই তরুবর বহুকালাবধি বহু পক্ষীর আবাসস্থল রূপে বিরাজমান আছে সুতরাং

যাহা বহু লোকের জ্ঞানের নিরপেক্ষে হইতে পারে,আমরও জ্ঞানের নিরপেক্ষে তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। এবং যখন আমি জানিতাম না তখনও তাহাই হইত অতএব এক্ষণে হইতে পারে না, এ কথা বলা যারপর নাই যুক্তি বিরুদ্ধ। এই যুক্তি হইতে আমরা এবিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রাক্কার্য্যের গুণাগুণও তন্নিবন্ধন বৈধাবৈধ ছিল।

(২) ফলাফল বিবেচনাতে কার্য্যের ন্যায়ান্যায় নির্দ্দিষ্ট হইলে, যে কার্য্য এক সময়ে ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা আবার সময়ান্তরে অন্যায় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। Propriety and Impropriety পক্ষান্তরে ন্যায়ান্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ, সুতরাং এক কার্য্যের এক সময়ে ন্যায় ও সময়ান্তরে অন্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া অসঙ্গত। যেমন অন্ধকার কখন আলোক নামে অভিহিত হইতে পারে না,তদ্রূপ অন্যায় কার্য্য কখন ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

অতএব কডওয়ার্থের মত যে সম্পূর্ণরূপে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র লেখক বিষপ্ বট্লার সাহেবেরও এই মত। কেবল তিনি কডওয়ার্থ অপেক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন। বট্লার বলেন লোকের ন্যায়ান্যায় বিচার শক্তি স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ—প্রকৃতির অঙ্কে স্থিত শিশুদিগের অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয়, ন্যায়পরতা, সত্য, নিরহংকার ও সরলতা মনুষ্য হৃদয়ে স্বভাবজাত। বালক অন্যের দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে মিথ্যা বলে না। যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করে। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হইতেছে? মনুষ্যের সত্য কথা বলা স্বাভাবিক। অন্যথা প্রাকৃতিক অবস্থায় স্থিত শিশু কি জন্য অসত্যের ভাবগ্রাহী নহে। ঘোর পাপী লোকও অন্যের বাক্যের অসত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে, সন্দিহান হয় না। বস্তুতঃ স্বার্থ্য, আমোদস্পৃহা অথবা কোন প্রবৃত্তি বিশেষ বলবতী না হইলে, লোকে কখন অনৃত আচরণ বা অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে না। ইহাতে কি প্রমাণ করিতেছে না যে, ন্যায়ের ভাব মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক?

কেহ২ আপত্তি করিতে পারেন কর্ত্তব্য জ্ঞান স্বভাব জাত নহে যে সময়ে যাহা মনে করা যায়, ভাব সংসর্গ গুণে তাহা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

সত্য বটে কর্ত্তব্য জ্ঞান, আত্মগ্লানি, ও আত্মপ্রসাদ প্রভৃতির সহ ভাবসংসর্গ গুণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অভ্যাস ভাব বিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি করে, কিন্তু যাহার মূল নাই,তাহা কখন উৎপাদন অথবা যাহার মূল আছে তাহা কখন একেবারে উৎপাটন করিতে পারে না।

লোক যত দূরই পাপাসক্ত হউক না কেন, তাহার নৈসর্গিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কখন একেবারে নির্ম্মূল হয় না। ইতিহাস কাব্য নাটক ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছে। সত্য বটে যতক্ষণ কোন প্রবৃত্তি বিশেষে বা স্বার্থ হৃদয় রাজ্যকে একেবারে অধিকার করে, ততক্ষণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ভাব বা আত্মগ্লানির উদয় হয় না। কিন্তু নির্জ্জন প্রদেশে স্থির চিন্তা কালে বা প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, অবশ্যই জীবনের চির অভ্যস্ত

পাপ রাশি ভেদ করিয়াও আত্মগ্লানি আপনার শিখা বিস্তার করে।

সত্যই মানব প্রকৃতি পরিদর্শক সেক্‌ষপিয় ক্লডিয়াসের * মুখ হইতে নিম্ন লিখিত ভাব নির্গত করাইছেন।

O, my offence is rank, it smiles to Heaven ;
It hath the primal eldest curse upon 't,
A brother's murder !—Pray can I not,
Though inclination be as sharp as will,
My strongest guilt defeats my strongly intent :
And, like a man to double business bound,
I stand in pause where I shall first begin,
And both neglect. What is this cursed hand,
Mere thicker than itself with brotherly blood ?
Is there not rain enough in the sweet Heavens,
To wash it white as snow ? Whereto serves mercy,
But to confront the visage of offence ?
And what's in prayer, but this two fold force
To be forestalled, ere we come to fall,
Or pardoned being down ? Then I will look up
My fault is past. But, O, what form of prayer
Can serve my turn ? Forgive me my foul murder.
That cannot be ; since I am still possessed
Of those effects for which I did the murder,
My crown, mine own ambition, and my queen.
May one be pardoned, and retain the offence ?
In the corrupted currents of this world,
Offences gilded hands may show by Justice.
And oft 'tis seen, the wicked prize itself
Buys out the law : But 'tis not so above ;
There is no shuffling ; there the action lies
In his own true nature ; And we ourselves compelled,
Even to the teeth and forehead of our faults,
To give in evidence. What then ? What rests ?
Try what repentence can : What can it not ?
Yet what can it when one cannot repent.
O, wretched state ! O bosom black as death,
O, limed soul, that, struggling to be free,
Art more engaged ! Help angels, make assay !
Bow, stubburn knees ! And, heart, with strings of steel,
Be soft as sinews of the new born babe,
All may be well
Retires and kneels,
* * * *
My words fly up, my thoughts remain below
Wonds, without thoughts, never to heaven go.
Hamlet Act III. scene III.

অশেষবিধ সুখের বস্তু সত্তেও কি জন্য ক্লডিয়াস অসুখী হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্য সুখ লাভ করিয়াছিলেন, সুন্দরীর প্রণয় * পাত্র হইয়াছিলেন, শত শত দাস দাসীর প্রভু হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কিসের অসুখ। এ অসুখ সংসার কর্ত্তৃক বিতারিত হইতে পারে না। ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ইহার শমতা করিতে পারে না। এই অসুখই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির ও ঈশ্বর তৃষ্ণার স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ করিতেছে।

সুখ শান্তির ইচ্ছা মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক। পরব্রহ্মে নিবিষ্ট চিত্ত ধর্ম্মাত্মা সাধু হইতে, কুটিল হৃদয় বিষয়ী লোক পর্য্যন্ত সকলেই শান্তি অন্বেষণ করে। শান্তির জন্যই যোগী যোগাসক্ত, ভোগী ভোগাসক্ত, পিতা মাতা পুত্র মুখ সাপেক্ষ এবং যুবক যুবতী ইন্দ্রিয়রত। সকলেরই হৃদয় এক ভাব দ্বারা উত্তেজিত, কেবল বিষয় ভেদে ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মাত্ম যোগী ব্যতীত আর কেহই শান্তি সুখের আস্বাদ পান না। সুতরাং ধর্ম্মের পথ কন্টকাবৃত জটিল বলিলে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের উপর দোষারোপ † হয়। (দর্শনশাস্ত্রবিৎ সন্দেহবাদী পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, যদি ইচ্ছা করেন আমাদিগের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন।) অতএব ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বাভাবিকত্ব যেমন বাঞ্ছনীয় মঙ্গলময়ের রাজত্বের সহিত তাহার তেমনই সম্মিলন আছে।

উপসংহার কালে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছি যে, পাপাসক্ত লোকের হৃদয় সর্ব্বদাই অশান্তি

* ক্লডিয়াস ভ্রাতাকে বধ করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃবধুর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* " Gentlemen, ladies and perchance that are happy lovers. "

† বঙ্গবিজেতায় সতীশচন্দ্র ও চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী ইহার উদাহরণ।

অগ্নি দ্বারা দাহিত হয়। পক্ষান্তরে হৃদয়ের এইরূপ অশান্তিভাব কখন স্বভাবোৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃতি হইতে সুখ ব্যতীত দুঃখের নিদান নহে।

উপর্যুক্ত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বাভাবিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমরা পণ্ডিতবর বটলারকে শতং ধন্য বাদ দিতেছি।

(ক্রমশঃ)

সভ্যতার ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মধ্যবর্ত্তী কাল। মিনিসের সময় হইতে সিসষ্ট্রিস পর্য্যন্ত যত ভূপতি মিসোরের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গিরিস ব্যতীত আর কাহারও সহিত সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ যোগ দেখা যায় না। মিতিসহ প্রথমতঃ মিসোরবাসিগণকে ব্যবহারের আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। বোধ হয়, মহারাজ নিরিস অতি পরোপকারী ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। অন্যথা কিরূপে নৃপতিদিগের স্বেচ্ছাচারের মূলচ্ছেদক ব্যবস্থা দেশ দেশান্তরে [illegible] এতাদৃশ যত্ন করিয়া[illegible]এন। কথিত আছে, লোকের সন্তোষের নিমিত্ত তিনি রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন যে, দেবতাদিগের অগ্রণী মার্কাবী তাঁহাকে ব্যবহার প্রচলন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২। মিনিসের অসত্যবাদীতা। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মিনিস যখন স্পষ্টতঃ সত্যকে অতিক্রম করিয়া অসত্য দ্বারা ব্যবহার প্রচলন করিলেন, তদ্বিষয়ে কিরূপে তাঁহার ভাল অভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর? এরূপ আপত্তি কেবল ফল নিরপেক্ষ নৈতিকমতবাদীদিগের কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইতে পারে। হিতবাদ-বাদী অথবা ফল সাপেক্ষ মতবাদীর অন্য কোন শাখাস্থ লোক কখনই এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করিবেন না। কিন্তু মিনিস, যে কালের লোক ছিলেন, তখন নীতি বৈষয়িক প্রোক্তমত উদ্ভাবিত হয় নাই। মিনিস প্রভৃতি মিসোরীয়গণ অথবা মনু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপকগণ, সকলেই কর্ম্ম ফলাফল বিবেচনা করিতেন। বিশেষ দেবতার নামাঙ্কিত না করিলে, হয়ত, মিনিস ব্যবহার প্রচলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। অজ্ঞ লোকে চিরপ্রসিদ্ধ প্রথা ব্যতীত [illegible]ন রীতি অবলম্বন করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। যে প্রজাদিগের হিতার্থে মিনিস ব্যবহার প্রচার করেন, হইতে পারে যে, তাহারা তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করিয়া উপহাস করিত, অথবা রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের ক্ষমতার লাঘব দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করিত। সুতরাং দেবতার দোহায়ে কার্য্য করিয়া মিনিস বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩। ব্যবহারের সুফল। রাজা স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহারানুযায়ী চলিলে যে দেশের কত মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বর্ত্তমান কাবুল, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার স্বাধীন জাতিদিগের অবস্থাসহ, ইংরেজদিগের অবস্থা তুলনা করিয়া দে-

খিলেই সম্যক প্রতীতি হইবেক।

১। রাজা যতই কেন ন্যায়-পরায়ণ হউন না, সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে, কখনই প্রজাবর্গ সর্ব্বথা ন্যায়াচরণ প্রত্যাশা করিতে পারে না। মনুষ্য স্বার্থপর ও কামক্রোধাধীন, সুতরাং এই ত্রিতয় দ্বারা উত্তেজিত হইলে ধার্ম্মিক লোকও সময়েং লোমহর্ষণ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। এতদ্বিষয়ে অধিক লেখা অথবা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক।

২। সত্য বটে, ন্যায়পরায়ণ ভূপাল ব্যবহারাধীন না হইয়া রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে, যেমন প্রোক্ত কারণেই হউক অথবা বুদ্ধির দোষেই হউক, ২।১ পক্ষে প্রজাবর্গের অহিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সেইরূপ তাঁহার দ্বারা বহুল সৎ কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশ হয়ত, তাঁহার পদশৃঙ্খলাবদ্ধ ...কলে হই৬-- পারিত না। কিন্তু সেই রাজপদ বংশানুক্র... --২৬-- তাঁহা... পুত্রেরা যে পিতার ন্যায় সদ্গুণ ভূষিত হইবে একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে।

৩। ব্যবহার প্রচার দ্বারা দেশ মধ্যে ন্যায় বিচার প্রচলিত না হইলে লোকে ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয় না। বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত অর্থ উদরকে বঞ্চনা করিয়া কে সঞ্চয় করিতে সমিচ্ছুক হইত, যদি তাহা নিরাপদে রক্ষিত না হয়, বা তাহা প্রাণাধিক অপত্যাদি নিরাপদে ভোগ করিতে না পারে। বস্তুতঃ অভাবে গুণোদয় হইবে, এবং মৃত্যুর পর পরিবার বর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ পাইবে না, এই জন্যই লোকে ধন সঞ্চয় করে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ভূপালের রাজত্বে বাস হইলে, কখনই লোকে তদ্দিকে আকৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে ধন সঞ্চয়ই সভ্যতার মূল কারণ * এই জন্য স্বেচ্ছাচার বিরোধী, মিনিস প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার যে সভ্যতার একটী মূল কারণ স্বরূপ তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময়ে সবসিক্স নামক এক ব্যক্তি ক্ষেত্রতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, নীল নদের তীরবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব কালে বড় নিম্ন ভূমি ছিল, এবং বর্ষেং বর্ষাকালে নদীর জল দ্বারা প্লাবিত হইত, সুতরাং কৃষকদিগের ভূমির সীমা নির্দ্দেশের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই প্রয়োজন বশতঃ ক্ষেত্রতত্ত্বের আবিষ্কার হয়। কিন্তু এটী প্রকৃত কারণ বোধ হয় না, যেহেতু ভারতবর্ষে অনেক স্থানও বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্ব অথবা সর্ব্বেইং জরিপের সাহায্য ব্যতীত পুনর্ব্বার মৃত্তিকার সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল যে নদীর তীরে অত্যন্ত ভাঙ্গন আছে, তথায় সর্ব্বেইং বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ...ার আস্বাদ ...ন্যায় বিচার হয় না, যেহেতু সর্ব্বদা।২ তথায় বহুল পরিমাণে মৃত্তিকা বৎসরং পয়ঃস্থ বা শিখস্থ হয়। ক্ষেত্রতত্ত্ব মিসোরে অথবা ভারতবর্ষে কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয় তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রকৃত ব্যবহার ভারতবর্ষবাসিরাও প্রথম অবগত হয়েন। ১ম পুস্তকের ৪৭ প্রতিজ্ঞা এবং বীজ গণিতই সমুদয় গণিত শাস্ত্রের মূল। মিসোরীয়গণ ৪৭ প্রতিজ্ঞার বিষয় বোধ হয় কিছুই জানিতেন না। যেহেতু তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময়ে পণ্ডিতবর

* সভ্যতার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়। ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুর।

পিথাগোরাস নানা রূপ ক্লেশ এমন কি ত্বকচ্ছেদ * পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। কিন্তু গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ২ সমুদয় ইতিহাস বেত্তারাই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে পীথাগোরাস ভারতবর্ষ হইতে ৪৭ প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য শিক্ষা করিয়া স্বয়ং বুদ্ধি প্রভাবে তাহা সপ্রমাণ করেন। এতদ্ব্যতীত আধুনিক পণ্ডিতগণ সকলেই ভারতবর্ষই বীজগণিতের আদিম স্থান রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব আমরা একথা এক রূপ নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারণ করিতে পারি যে, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম না হউক প্রধান স্থান ভারতবর্ষ—মিসর নহে।

৪। সিসষ্ট্রীস। নিবিসের পরে আমরা অন্যান্য ভূপতিদিগের রাজত্বকাল পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সিসষ্ট্রীসের রাজত্ব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত [illegible] দেশের দুর- [illegible] সিসষ্ট্রীসের সময়েই মিসো[illegible] পতি [illegible]য়প- তাকা দেশ দেশান্তরে [illegible]উড্ডীয়মান্ হইয়াছিল এবং মিসোরের নামে অতি দুরস্থ জাতিবর্গও কম্পিত কলেবর হইত।

সিসষ্ট্রীসের জীবন চরিত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই প্রাচীন বাক্যের যাথার্থ্য দেখিতে পাই। সিসষ্ট্রীসের জন্ম রজনীতে তাঁহার পিতা নিদ্রিত অবস্থাতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র সমুদয় পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিবে। এই বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া তিনি পুত্রকে মিসোরীয় সমুদয় এক বয়স্ক শিশুর সহিত একত্র লালন পালন করিতেন, যে তাহারা যুদ্ধকালে বন্ধুতা নিবন্ধন তাঁহার প্রধান সহায় হইতে পারে। কালে শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া তাহাই করিল। সিসষ্ট্রীস যেরূপ যুদ্ধ নিপুণ ছিলেন সেইরূপ রাজ্যের আভ্যন্তরিক উন্নতিতেও মনোভিনিবেশ করিতেন। তিনি খাল খনন, অট্টালিকা নির্ম্মাণ ব্যতীত ভাস্করের কার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অধুনাতন বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের ন্যায় সিসষ্ট্রীসও কতক অংশে ধন বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি খাল খনন প্রভৃতি কার্য্য যুদ্ধে রুদ্ধ বিদেশীয় বন্দীদিগের দ্বারা সম্পাদন করিয়া লইতেন, সুতরাং একথা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, কিরূপে দেশের প্রকৃত ধন বৃদ্ধি হয় তাহা তিনি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি[illegible]। [illegible] খাল খনন [illegible] প্রভৃতি সামান্য কার্য্যে [illegible]শীয়দিগকে নিযুক্ত না রাখিয়া ভাল ভাল বিষয়ে ব্যাপৃত রাখা, এবং বন্দীদিগকে নিষ্কর্ম্মণ্য অবস্থাতে আহার্য্য প্রদান করিয়া কিয়ৎপরিমাণে দেশের ধন ভাগ নিষ্কারণে ক্ষয় করার দোষ গুণ সিসষ্ট্রীস, আদম স্মিথ্ ও মিল সাহেবের বহুকাল পূর্ব্বে বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

৫। ওসিমিণ্ডিস। সিসষ্ট্রীসের পরবর্ত্তী ভূপতিদিগের মধ্যে ওসিমিণ্ডিস্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ওসিমিণ্ডিসের সময়ে আলিকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় প্রথম সংস্থাপিত হয়। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে, ওসিমিণ্ডিসের বহু কাল পূর্ব্ব হইতে মিসোরে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভূয়সী চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকাগার সংস্থাপন দ্বারা যে তাহা দ্বিগুণিত হইয়াছিল,

---

* ত্বকচ্ছেদ না করিয়া মিসোরীয়গণ কাহাকেও কোন প্রকার বিষয়ে উপদেশ দিত না।

নিয়ত যুগপ্রলয় সাধন করিতে পারেন, এমন কোন মহাপুরুষ নাই ;—কিছুই নাই। কেবল কয়েক জন বৈষ্ণব গীতি-কাব্যকার আছেন। কেবল তাঁহাদের লইয়া আমাদের মাতৃভুমি অন্যান্য দেশের সঙ্গে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে। এই গীতিকাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের শিরোনাম-ধারী ব্যক্তি এক জন।) কিন্তু বাঙ্গালার এমনি হতভাগ্য যে, এমন গৌরবের পাত্রদিগকেও অনেকে চিনেন না। অ-নেকে আবার চিনাইয়া দিলেও, তাঁহা-দের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কহেন, যদি বাস্তবিক তাঁহারা কবিকুল-চূড়ামণি হইতেন, তবে [illegible] আমরা এত দিন [illegible] চিনিতাম না কেন ? "কেন অধিকাংশ হয় [illegible]দিগকে চিনিতাম না," [illegible] মেনালেয়াসকে আহ্বান ক[illegible] বনিতা প্রত্যর্পণ করিলেন এই প্রবা-দের সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় আমাদিগের প্রয়োজন বহির্ভূত। যদিও এ ঘটনা সম্পূর্ণ অলীক হয়, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, লোকের ইহার প্রতি আস্থা ছিল। অন্যথা কখন এরূপ আচরণ সমাজ মধ্যে আদরণীয় বা প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিত না। পক্ষান্তরে পারিস যদি এতদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিয়া কোন আর্য্যবংশীয় ভূপালের রাজ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, রাজা সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া তাঁহার সেই অসদাচরণকে গোপন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

৭ এসাইকিস। ইহার পরে মিসোরাধিপতি-দিগের মধ্যে এসাইকিসের সহিত আমা-দিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এসাইকিসের নামান্তর বকারস অথবা এসাইসিস।

তাহার পূর্ব্বে এবং সেই সময় পর্য্যন্ত রাজা হিন্দু, মন্ত্রী হিন্দু, সেনাপতি হিন্দু, সৈন্যগণ হিন্দু, সকলই হিন্দু,—হিন্দু-সন্তানেরা যাহা বাসনা করিতে পারেন, তৎ সমস্তই ছিল। ঐ সময়ের ঐরূপ অবস্থা বাহ্যিক দেখিতে বড় সুন্দর বটে ; কিন্তু আন্তরিক তাদৃশ ছিল কি না ? এ বিষয়ের অধিক কথা বলার আবশ্যক নাই। দাসরাজ সেনাপতি বখ্‌তিয়ার যখন বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনই ব্রাহ্মণেরা আসিয়া শাস্ত্রোদ্ঘা-টন করিয়া রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, বঙ্গে যবনাধিকার শাস্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং রাজার পলায়ন বৈধ। বখ্‌তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজ-পুরী প্রবেশ করিলেন ; কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজা—যিনি প্রায় মাতৃগর্ভে অবস্থিতি সময়াবধি রাজা— [illegible] বয়সে যুদ্ধ যাত্রা অপেক্ষা তীর্থ-একটী আনু[illegible] বিবেচনা করিলেন ; এবং থাকিতে পারিল[illegible]—[illegible] প্রচ্ছন্নভাবে সভ্যতার ইতিহাসের পদে২ যোগ লক্ষিত হয়। সে বিষয় ধর্ম্ম। দেনা পাওনা বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রাণ স্বরূপ। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম দেনা পাওনার প্রাণ। যখন ন্যায়ের ভাব যথারূপে আবিষ্কৃত হয় নাই, যখন ন্যায় ব্যবহারসহ যে পরলোকের সম্বন্ধ আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিল না, তখন অন্য যে কোন বিষয়ে পারলৌকিক দুর্গ-তির সম্ভাবনা ছিল তাহা যে অবগত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? এই মিসোর ইতিহাস হইতে আমরা যে পর-লোকের ভয় মনুষ্যের স্বাভাবিক এবং ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ যাহাই কেন বলুন না, এই ভয় ব্যতীত অধিকাংশ লোক

পারে? দুরবস্থার ও হীনতার পরাকাষ্ঠা এই! এরূপ অবস্থায় সমাজে নূতন তেজ প্রবেশ না করিলে, সমাজ কখন থাকিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গে যবন প্রবেশ করিয়াছিল। বঙ্গে হিন্দু রাজত্ব লোপ শোচনীয় ব্যাপার হইলেও এরূপ অবস্থায় মুসলমানদিগের আগমন মহোপকারী—সম্পূর্ণরূপে প্রার্থনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তজ্জন্য বিশ্বনিয়ন্তাকে ধন্যবাদ করা আবশ্যক।

এই সকল দুরবস্থার প্রধান কারণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের দৌরাত্ম্য—তাঁহাদের প্রচারিত কঠিন শাস্ত্রনিয়ম। সেই নিয়ম-নিগড়ে দেশকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। নিগড়বদ্ধ হইলে কেহই উন্নত-ভাব ধরিতে পারে না—তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেই হয়। সুতরাং সেই সময়ে আমাদের দেশের দুরবস্থা সম্পূর্ণ বেগবতী হইয়া পতি- য়ের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্য, আশা আর সমাজে স্থান পাইল না। জ্ঞানের পথ যত সংকীর্ণ হইতে লাগিল, চিত্তও ততদূর সংকীর্ণ হইয়া উঠিল। এই রূপে এক কূল ভাঙ্গিল। আবার তেমনি অপর দিকে হিন্দুরা দেখিলেন যে, পৃথিবী কেবল তাঁহাদের দৃষ্টিমধ্যগত নহে, তাহার আরও বিস্তৃতি আছে, তাহাতে আরও অনেক জাতি আছে। তাহারাও তাঁহাদের ন্যায় পরকালের চিন্তা করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের জ্বালায় তত জ্বালাতন হয় না,—তাহারা ধর্ম্মের জন্য পার্থিব উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ নহে, তাহাদের বলবীর্য্যও নূতন ধরণের। তাঁহারা আর দেখিতে পাইলেন যে, হিন্দু সমাজ ভিন্ন আরও মনুষ্য সমাজ আছে, কিন্তু সে সমাজে প্রতি[illegible] শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া[illegible]

গোবিন্দ দাস।

নিবীড় অরণ্য মধ্যে যেমন একমাত্র পুষ্পরাজী স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতাগুণে, কি প্রকৃতিস্থ কি অপ্রকৃতিস্থ সকলেরই প্রফুল্লতা সম্পাদনে সমর্থ; মানব সমাজে কবিতাও তদ্রূপ। জগতের আর সকলই শৈশব, কৈশোর, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থায় পতিত হয়; কিন্তু স্বভাব-দুহিতা কবিতা চিরতরুণী—চির সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল-কান্তি। এই কবিতা মনুষ্যের আদিম সমাজকে বিমোহিত ও আনন্দিত করিয়াছে; মধ্যমকালে উৎসাহিত করিয়াছে, এবং উন্নতাবস্থায় পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে।

মনুষ্য যে অশেষবিধ রত্নের অধিকারী আছে, তাহার মধ্যে কবিতা একটী সর্ব্বপ্রধান। যে সমাজ এই ধনের গৌরব করিতে পারে না, সে সমাজ অতি হতভাগা। বঙ্গের এরূপ ধনদাতা যে কয়েক জন, তাঁহাদের মধ্যে "কবিরাজ-রাজি-মুকুটাশংকার-হীরক-স্বরূপ" কেবল কয়েক জন গীতিকাব্যকার বৈষ্ণব কবি সর্ব্বাগ্রগণ্য ও পূজনীয়। বঙ্গের অহঙ্কার করিবার আর কিছুই নাই,—বীর নাই, পিতৃলোক নাই। স্বীয় প্রতিভা বলে যাঁহারা অসংখ্য-মানব-মনোরাজ্যে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক মতাদি লইয়া প্রতি-

রুচির সাক্ষী। আর ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি এবং আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতা সাধু রুচির সাক্ষী বলা যাইতে পারে।

অতএব বোধ হয় এখন বুঝা যাইতে পারে যে, মুসলমান-শাসনারম্ভ বাস্তবিকই আমাদের হিতের জন্য হইয়াছিল। সেই শাসনের ফলেই ক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম রূপ নিগড় শিথিল হইয়া শেষে ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটে। তাহা হইতেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাব প্রাপ্ত অনেক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ঐ রূপ অবস্থায় যে ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিবে, তাহাও সহজে বোধগম্য করা যাইতে পারে। ভার অত্যধিক অসহ্য হইলেই ছিঁড়িয়া পড়িবে। [illegible] হিন্দু ধর্ম্মের অত্যাচার অতি-[illegible] উঠিয়াছিল, চৈতন্য যে আমরা [illegible] আমাদের বক্তব্য বিষয়ও বলিব [illegible] তদ্বিষয়ের কিছু আলোচনা করা উচিত। হয়ত অনেকবার তাঁহাদের নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুই এক মধুবর্ষী পদ শুনিয়া কর্ণ জুড়াইয়াছে, চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে;—কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য; সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছি; পুনরায় দেখিলে, চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই। যে কারণে তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ীরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃতরূপ চিনিতে পারি নাই, তাঁহাদের মর্য্যাদা অবগত হইতে পারি নাই। সেই কারণসমূহের মধ্যে একটী প্রধান কারণের কথা বলা যাইতেছে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালায় হিন্দুরাজত্বের লোপ হয়। যবন অনায়াসে পুরা অধিকার করিল জানিয়া, মুখের গ্রাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নাবিকগণের শরণাগত হইলেন, এবং রাজ্যলালসা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়া শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজ্যের প্রতি মমতা এতদূর!! বখ্‌তিয়ার অনায়াসে দেশ হস্তগত করিলেন—কেহ কথাটী কহিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কোন রাজা কোন দেশে এরূপ দুর্দ্দশায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন কি না—কোন রাজ্য এরূপে বৈদেশিক হস্তে পতিত হইয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা আর দেশের কতদূর হীনাবস্থা হইতে

পাশব রুচি লাভ করিয়াছিল; বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকল লোকেই প্রায় অসদ্রুচির ফলভাগী অধিক পরিমাণে হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরাও যে সম্পূর্ণরূপে দোষ বিমুক্ত ছিলেন, ঐ রুচিতে তাঁহাদের চিত্তকে কিছুমাত্র কলুষিত করিতে পারে নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। তবে সমাজের অপর লোকে যতদূর হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবেরা ততদূর হয়েন নাই। সুতরাং তখন সাধারণ লোকে যে বৈষ্ণবদিগের সুমধুর কাব্য রসাস্বাদনে সক্ষম হইবেন, তাহার প্রত্যাশা কি রূপে করা যাইতে পারে। মর্য্যাদা না বুঝিলে কিছুরই প্রতি উচিতমত আস্থা জন্মে না। তখন সাধারণে বৈষ্ণব কবিদিগের মর্য্যাদা বুঝিতেন না, সুতরাং কেবল আপনাদের পশুরুচির পোষক বিষয়ে [illegible] অনুসন্ধান করিতেন; তাহা না যাত্রা শ্রেয়ঃসন্তুষ্ট হইত না। এই কার-

স্রোতে তাঁহাদের চিত্তও ক্রমে কলুষিত করিয়া ফেলিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে লোকে ভুলিয়া গেল—তাঁহারা অপরিচিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এই কারণেই তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিলেও অনেকে চিনিতে পারেন না,—সহজে বিজাতীয় বলিয়া ভাণ হয়।

কিন্তু এক্ষণে রুচির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ও দিন২ হইতেছে। সুতরাং অনেকে এই সকল কবিদের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, অনেকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই কবিদের প্রকৃত মর্য্যাদা প্রদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে২ অনেক বিঘ্ন আসিয়া জুটিতেছে। অধুনা আবার অশ্লীলতা নিবারণের জন্য সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমাদের ভয় হয়, পাছে এই বৈষ্ণব কবিগণ ঐ সভার সভ্যদের হাতে অবমাননা সহ্য করেন, পাছে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

... —বেগ বাড়িয়াছিল সত্য কিন্তু রাজবিপ্লব হওয়াতে তাহার পরিসর বাড়িতে পারিল না, সুতরাং সবেগ তরঙ্গাঘাতে এক কূল ভাঙ্গিতে লাগিল, এবং (প্রাকৃতিক নিয়মে) যেমন এক কূল ভাঙ্গিতে থাকিল, তেমনই অপরকূলে চরবৃদ্ধি হইতে লাগিল। মুসলমানেরা আসিয়া দেশ অধিকার করিল, তৎসঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা লোপ পাইতে থাকিল। ইন্দ্রিয়পরতার পরাকাষ্ঠা দেশময় দেখা দিল, সকলে বিধিমতে তাহা শিক্ষা করিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা নাই, ইন্দ্রিয়পরতা প্রবল, এরূপ অবস্থায় যে সহজেই রুচি পশুবৎ হইয়া আসিবে, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। উচ্চ বিষ-

রচনা অপেক্ষা গোবিন্দদাসের পদাবলীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই গোবিন্দদাস বৈদ্যবংশসম্ভূত। ইনি বিদ্যাপতির মৃত্যুর ৮৬ বৎসর এবং চৈতন্যের জন্মের ৭৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় (খ্রীঃ ১৫৬৭ অব্দে) বুধুরি গ্রামে পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্তমালায় এই কারণ ইঁহার নাম গোবিন্দ কবিরাজ লেখা আছে।

গোবিন্দদাস অধিক কালের লোক নহেন, সুতরাং তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে ভক্তমাল একমাত্র প্রমাণ নহে। মুল ভক্তমাল গোবিন্দদাসের বহু পূর্ব্বে নভোজী কর্ত্তৃক হিন্দুভাষায় বিরচিত। তবে গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জীবনচরিত যে ভক্তমালে দৃষ্ট হয় ... আমাদিগের বিবেচনায় চলিতে হয় না;— অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে বেড়াইতে পারা যায়, অথচ পরকালের হানি হয় না। তাঁহাদের সমাজে যেমন সকলেই পৃথক্২, একাসনে উপবেশন অথবা পরস্পর সংস্পর্শ চলিতে পারে না, যে নূতন সমাজ তাঁহারা দেখিলেন, তাহাতে সেরূপ নহে, সে সমাজের দুই জন অপরিচিত লোকও একত্র হইলে একপাত্রে আহার করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া এ বিষয়ে চিত্ত ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে লাগিল। অপর কূলে চর বাড়িল। মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তের এই দুইটী ফল,—একটী অসৎ, অপরটী সৎ। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে তন্ত্র সৃষ্টি এবং ইদানীন্তন কালে পরিবারস্থ সমস্ত লোকে একত্র হইয়া 'গোপালে উড়ের যাত্রা' ও 'দাশুরায়ের অশ্লীল ছড়া' শ্রবণ করিতে লজ্জা বোধ না করা, অস-

রামচন্দ্র কবিরাজ রাঢ় দেশ * হইতে বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে মালিহাটীর (শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাস স্থান) নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার সহিত আচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র আচার্য্যের জ্ঞান-গর্ভ উপদেশে এত বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তদ্দণ্ডেই বিষ্ণু মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এবং নব ধর্ম্মের উপর সমধিক অনুরাগী হইলেন। গোবিন্দ এক্ষণ পর্য্যন্তও কালী উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ ইষ্ট দেবীকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রতিদিন যোড়শোপচারে পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

কথিত আছে, মহামায়াও তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধাতে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, পূজা সময়ে স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। একদা গোবিন্দ গৃহমধ্যে পূজা করিতেছিলেন, এবং রামচন্দ্র গৃহের দ্বার দেশে উপবিষ্ট ছিলেন। সে দিবস অনেক স্তব স্তুতি করিয়াও গোবিন্দ ইষ্ট দেবীর আবির্ভাব দেখিতে পান না। গোবিন্দ নিতান্ত অধীর হইয়া মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কালী গৃহের বাহির হইতে উত্তর দিলেন, "গৃহের দ্বারে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছে, তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার গৃহ প্রবেশের ক্ষমতা নাই।" গোবিন্দ ইষ্ট দেবীর মুখে ঈদৃশ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন, এবং তদ্দণ্ডেই উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

উপর্য্যুক্ত বাক্য সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে যে, গোবিন্দ প্রথমতঃ কালীর উপাসক ছিলেন।

গোবিন্দদাস ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫৬১ শকাব্দায় (খ্রীঃ ১৬৩৯ অব্দে) পদ্মা নদীর তীরস্থ খেতর * নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিরচিত এক মাত্র গ্রন্থের নাম "পদমালা।" এক্ষণে গোবিন্দদাস কিরূপ কবিত্ব লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী পদ যথেচ্ছা উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা।

অভিনব নীল জলদতনু ঢর ঢর,
পিচ্ছ মুকুট শিরে সাজনীরে।
কাঞ্চন বসন, রত্নময় অভরণ,
নূপুর রুণু ঝনু বাজনীরে॥
জয় জয় জগজন লোচন ফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ধ্রু॥
ইন্দীবর যুগ, সুভগ বিলোচন,
চঞ্চল অঞ্জন কুসুম শরে।
আ... কুল... রমণীগণ মানস,
জর জর অন্তর প্রেম ভরে॥
বনি বনমালা, আজানু লম্বিত,
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী,
গায়ত গোবিন্দ দাস পহুঁ॥

তথা—

ও মুখ মণ্ডল, জিতি শরদ-সুধাকর,
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডিক মণ্ডিত,
মালতী মধুকর মাল॥
ধনি ধনি বলি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবনমনমোহন,
মধুর মুরলী করু গান॥ ধ্রু॥
টলমল অলক, তিলক ঝল ঝল কই,
ভাওকি ধনুয়া ধনুয়া ধুশন।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন,
বিষম কুসুম শরবান॥

* মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতি টীঁয়া বৈদ্যপুর প্রভৃতি বৈদ্য প্রধান স্থান রাঢ়ের অন্তর্গত।

* খেতর নরোত্তম দাসের আবাস।

বান্ধুলী বন্ধু অধরে, মধু মাখল,
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদে, মদন মদ মন্থর,
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গোবিন্দ দাস গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী; সুতরাং গৌরাঙ্গের বিষয়ক অনেক কবিতা গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন। নিম্ন লিখিত গীতে তিনি নদীয়ার নাগরী মুখে গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণি,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষদ হাসির, তরঙ্গ হিল্লোলে,
মদন মুরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর, কি ক্ষেণে দেখিনু,
ধৈরহ রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
...ক্ষ, বিষম বিশিখে,
পরাণ বিঁধিতে ধায়।
মালতী ফুলের, মালাটী গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতাল ভ্রমরা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধিল,
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি, কি জানি, হয় পরিণামে,
দাস গোবিন্দ কয়॥

নিম্ন লিখিত গীত রাধিকা-মিলন-কাতর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার পরিচায়ক; তাহা রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি ঃ—

কাঞ্চন-দ্যুতি কমলময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতনে করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তণু-তাপে ভসম ভৈ যায়॥
শুন শুন বৃকভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥ ধ্রু॥
ঝামর নীল উৎপল অঙ্গ।
লোরে না হেরিয়ে নয়ন-তরঙ্গ॥
বিছুরল পিচ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচরি মেলি মরত জীউ ফাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া অভিলাষে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দ দাসে॥

আবার শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকা আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন, যে তিনি মানিনী হইয়াছিলেন বলিয়াই এক্ষণে অনুতাপানলে দহনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে ঃ—

সো মুখ-চন্দ্র, নয়নে নাহি হেরিনু,
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সো মধুর বোল, শ্রবণে নহি শুনলুঁ,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ॥
সজনি, কাহে বাঢ়ায়নু মান।
প্রেম ভঙ্গ ভয়ে অবজীউ কাতর,
তুহুঁ পরবোধবি কান॥ ধ্রু॥
সো কর কিশলয় পরশ উপেখলুঁ,
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দ দাস কহ সো অতি দূর গহ
যো ঐছন মতি দেল॥

পুনশ্চ মাধবীলতা দেখিয়া আক্ষেপ ঃ—

এইত মাধবি তলে আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন, সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে,
বড় দুঃখ রহল মরমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলে বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেয বিছায়ই,
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে,
যামিনী জাগিয়া পোহায়।

সে হেন গুণের পিয়া কোথায় রহল গিয়া,
কৈছনে দিবস গোঁয়ায়॥
এতেক দিবস হৈল, তবু পিয়া না আইল,
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চল্ শ্যাম সমুঝাইতে,
দূর কর বিরহ বিষাদ॥

অপরঞ্চ ঃ—

মরিব মরিব সাধ নিচয় মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগে মুঞি এহি বরসার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুঃখ।
মরণ সময়ে না দেখিলুঁ পিয়া-মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণে ধরিয়া।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ পিয়া॥

যিনি রাধিকা বিরহে এত ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনিই যখন বিনয় সহকারে কহিয়াছিলেন,

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পূণিমিক চাঁদ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীর্ঘ নিশ্বাস॥
রাই হে, অব তেজহ মান;
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাও ভুজঙ্গম রহু আগোর॥
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ॥
বচন অমিয়া বিনু যে নাহি জীয়ে।
মান কুলীশ দরশায়সি কিয়ে॥

তখন সেই দাসের দোষ বিস্মৃত হইয়া, মান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! আবার সেই কৃষ্ণ প্রেমে মুগ্ধা হইয়া রাধিকা কহিতেছেন

এমন পিয়ার কথা কিপুছসি, রে সখি,
পরাণ নিছনি দিয়া।
গড়োর কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া,
আলাই বালাই তার নিয়া॥ ধ্রু॥
হাত দিয়া দিয়া মু-খানি মোছায়া,
দীপ নিয়া নিয়া যায়।
কতেক যতনে পাইয়ে রতনে,
থুইতে ঠাঁই না পায়॥
কত না আদরে, রসের বাদরে
নিমগন করে মোরে।
তিলে না দেখিলে, নিমিখ তেজিলে,
ভাসয়ে নয়ান লোরে॥
সে হেন নাগর, রসের সাগর,
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গেবিন্দে, কহল আনন্দে,
তুমি সে জান মহিমা॥

পুনশ্চ সেই ভাবে ঃ—

অবলা কি জানি গুণধরে?
রসিক মুকুটমনি নাগর হইয়া, গো,
কেনে এত আদর মোরে করে? ধ্রু॥
আলুইয়া কবরীভার বেশ করে বারে বার,
বসন পরায় কুতুহলে।
রাখিয়া আপন উরে, নুপুর পরায় মোরে,
চরণ পরশে করতলে॥
অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ রসে লালস হইয়া বসে,
প্রাণনাথ বলে জিনুজিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
আপনা তোমারে দিনু দিনু॥
বিদগধ শ্যামরায় বীজন করয়ে গায়,
আপনে ভুঞ্জায় গুয়াপান।
গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
তুমি সে কানুর একপ্রাণ॥

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে গোবিন্দদাসের রচনা অনেক স্থলে অনুপ্রাসময়ী; এ বিষয়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন। স্থলেং বিলক্ষণ রচনা চাতুর্য্যও দেখা যায়। কেবল ছন্দের অনুরোধে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

কামিনি, কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল কমলিনী কেনে
কঠিন করু তোয়॥ ধ্রু॥
কালিন্দিকুল কদম্ব কানন,
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীর।

কাম কলহ করি,　কপটে কলাবতী
　　কানুক করহ অথির ।।
পরশিতে কান্ত　কবরী, কুচ-কঞ্চুক,
　　করসি শয়ন কর বারী।
কুটিল কটাক্ষ　কুসুম শরে,
　　কোপিনি, কিয়েং নাকর হামারি।
করইতে কোরে,　কাঁপি কর কাকলি,
　　কোকিল কুজিত ভাষে।
কেলি কুঞ্জবনে　কৈতবে কি কহল,
　　কহত না গোবিন্দ দাসে ।।

অপরঞ্চ—
শরদ চন্দ,　পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল　কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা　মালতী যুথী,
　　মত্ত মধুকর ভোরনী।
হেরত রাতি,　ঐছন ভাতি,
শ্যাম মোহন　মদনে মাতি,
মুরলি গান,　পঞ্চম তান,
　　কুলবতী-চিত-চোরনী ।।
শুনত গোপী,　প্রেম আরোপি,
মনহি মনহি　আপনা সোঁপি,
তাঁহি চলত,　যাঁহি বোলত
　　মুরলীক কল-লোলনি।
বিছুরি গেহ,　নিজহিঁ দেহ,
একু নয়ানে　কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত　কঙ্কণ একু,
　　একু কুণ্ডল দোলনি ।।
শিথিল ছন্দ　নীবিক বন্ধ,
বেগে ধাওত　যুবতী বৃন্দ,
খসন বসন,　বসন চেলি,
　　গলিত বেনী লোলনী।
ততহিঁ বেলি　সখিনী মেলি,
কেহু কাহুক　পথ না হেরি,
ঐছনে মিলন গোকুল চন্দ,
　　গোবিন্দ দাস বোলনী।।

বিষমতা।

মনুষ্যের আকৃতি, মানসিক শক্তি, এবং কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে স্বভাবতঃই মনে এ রূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে সমাকৃতি, প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবগণ মধ্যে কি নিমিত্ত অবস্থার বৈষম্য হইল। অবশ্যই ধনী বংশ সম্ভূত সন্তান দরিদ্র নন্দন অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি সম্পন্ন দেখা যাইতেছে, কিন্তু মূলে অন্বেষণ করিয়া দেখ সকল মনুষ্যই এক শরীর ও মন লইয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব আদিম কাল হইতে মানবগণ সর্ব্ব প্রকারে সমাবস্থ হওয়াই সুসঙ্গত। অথচ সাংসারিক ব্যাপারে এই সম্ভাবনা উন্মত্ত প্রলপিতের ন্যায়।

মনুষ্যের শরীরগত বৈষম্যের ন্যায় মনোগত বৈষম্যও প্রকৃতি সিদ্ধ। কেবল মানব জাতির কেন? কি শরীরী জীব, কি উদ্ভিজ্জ, কি একমাত্র ভৌতিক জগৎ যাহা কেন পর্য্যালোচনা করনা, স্বাভাবিক পদার্থ মধ্যে ঠিক অভিন্নাকৃতি কি অভিন্ন প্রকৃতির দুইটি পদার্থ পাওয়া যাইবে না; দুইটি বৃক্ষ পত্র হস্তে লইয়া দেখ তাহাদের আকৃতিগত সমতাও যেমন আছে বিষমতাও তেমনই দেখা যাইবে। বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগৎও বিভিন্নতাময়। সুতরাং মানসিক শক্তি বা রুচির বিভিন্নতা অনুসারে সম্পত্তি ও নানা প্রকার মানসিক ভাবের বিভিন্নতা হইয়াছে।

মনুষ্য বর্ত্তমান দর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ উভয়ই তাহার পক্ষে সমানরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অথচ অতীত অনাগত

ঘটনার অবগতির উপর তাহার সুখ দুঃখের অনেক নির্ভর করিতেছে। ইতিহাস, কাব্য, নাটক, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভাষা প্রভৃতির সমালোচন দ্বারা অতীত কালের বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু মনুষ্য সমাজে সর্ব্বদা যত কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার সহিত তুলনা করিলে ইতিহাসাদি গ্রন্থে যাহা থাকে তাহা এত অল্প যে, কিছুই না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সত্যাসত্য অনুমান দ্বারা নিশ্চয় হইয়া থাকে। পুরাকালের গ্রন্থকর্ত্তাদের কথায় বিশ্বাস না করিলে ইতিহাস পাঠ হয় না, কিন্তু সকল গ্রন্থকর্ত্তা সমানরূপ বিশ্বাসের পাত্র নহেন। কেহ এক মাত্র কবিত্ব প্রচার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় লইয়া থাকেন; কেহ বা সমাজকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেন এই সকল স্থলে বাস্তবিক ঘটনাগুলি বিচার দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হয়, আবার যাঁহারা এক মাত্র প্রকৃত ঘটনার প্রচার জন্য ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজ পরিবর্ত্ত এবং যুদ্ধাদি বিষয় লইয়া ব্যতিবস্ত ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ দ্বারা পুরাকালের সামাজিক অবস্থা অল্পই পাওয়া যায়।

যদিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদি অতীত কালের সমুদায় বিবরণ সমগ্ররূপে জানিবার উপায় নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তথা বিধ গ্রন্থ না থাকিলে পূর্ব্বতন কোন ঘটনাই জানা যাইত না। যে অনুমানের কথা বলা হইল, তাহা ঐ সকল গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া হয়। উক্ত রূপ বিবরণ না জানিতে পারিলে অনুমান দ্বারা আমরা কিছুই করিতে পারি না। ফলতঃ বিনা প্রত্যক্ষে কোন অনুমানই হয় না; পুরাতন মুদ্রা, কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং ভগ্নাট্টালিকা ইত্যাদি, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতেরা অনেক প্রাচীন জাতির ইতিহাস আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব বক্তব্যের প্রমান স্বরূপ ঐ সকল পদার্থ না পাইলে, কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। ঐ সকল মুদ্রাদি দ্বারা যেমন পুরাকালের জাতি বিশেষের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তদ্রূপ সমগ্র পৃথিবীর জন সাধারণের ইতিহাস বা জাতিয় অবস্থা সূচক অন্যবিধ গ্রন্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ মানব জাতির অবস্থা বিষয়ে অনেক বলা যাইতে পারে; এস্থলে ইতিহাসাদি গ্রন্থের ঘটনা গুলি প্রত্যক্ষরূপে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে যে অনুমান হয় তাহাই বলা হইবে।

[illegible]তের কার্য্য পরম্পরা যেমন পরস্পার নিয়ত সম্বন্ধ বদ্ধ এই সম্বন্ধ ও পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি জ্ঞাত হইয়াই মহাত্মা নিউটন সমস্ত জড় পদার্থের আকর্ষণ অনুমাণ ও তদ্দারা গ্রহাদির গতির নিয়মাদি স্থির করিয়াছেন। মনুষ্যের কার্য্যও এইরূপ সম্বন্ধ বদ্ধ। ঘটনা মাত্রেরই পূর্ব্বাপর ঘটনার সহিত যোগ আছে। সমাজে এমন কোন কার্য্য হয় না যাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

গ্রহাদির গতির নিয়ম জানা থাকিলে যেমন তৎসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মানব চরিত্র বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা সাংসারিক ঘটনা পরম্পরার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের বিষয় অভিজ্ঞ হইলে ঐ অভিজ্ঞতা সহকারের ইতি-

হাসাদি গত কাল পরিচায়ক গ্রন্থ পাঠ দ্বারা সমাজতত্ত্বের অনেকগুলি বিষয় জানা যায়। মানব জাতির বিভিন্নাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে এই অভিজ্ঞতাই তাহা বলিয়া দিবে।

অতীত কাল পরিচায়ক যাহা পাওয়া যায় তদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয় যে, শীক্ষা, সমাজ, প্রকৃতি এবং পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থ-শ্রেণী এই সকলই মানব জাতির অবস্থা বিষমতার হেতু *। যে চারিটি কারণের উল্লেখ করা গেল, ইহারাও আবার পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভর করে। যথা, শিক্ষানুসারে সমাজ, বা সমাজ অনুসারে শিক্ষা, ইত্যাদি †। ফলে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে শরীরিক বা মানসিক ভাবের উদ্ভূত হয়। আহার পরিচ্ছদাদি সুলভ থাকায় ভারতবর্ষীয় বা [illegible] উর্ব্বর ও উষ্ণপ্রধান দেশবাসী স্বভাব এখন সাহস লণ্ডন প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশবাসীদিগের ন্যায় শিল্পী হইতে পারে না। ফলে, শীতপ্রধান দেশে আহার ও আচ্ছাদন নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত কথঞ্চিৎ বিবাদ বিসম্বাদ না করিলে তাহা লাভ করা কঠিন। আমাদের দেশে ধান্য বা কার্পাস বীজ বপন করিলে প্রকৃতি আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন; সুতরাং তদর্থে বিশেষ কোন বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনার প্রয়োজন হয় না। অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি শিক্ষা বা অন্য প্রকারে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। প্রয়োজন থাকিলে ইচ্ছাও হইত।

এদিগে আবার দেখ শীতপ্রধান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃতির উপর কথঞ্চিৎ আধিপত্য স্থাপন আবশ্যক বলিয়া তথায় প্রকৃতির মূর্ত্তিও তত ভীষণ নহে। তথাকার ক্ষুদ্র টেমস নদী বা গ্রাম্পিয়ান পর্ব্বতের বাহ্যাকৃতি দেখিলে তাহার উপর সেতু বন্ধন ও সুরঙ্গ নির্ম্মাণের সাহস অনায়াসে মনে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালীন পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি বা চিরনিহারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গ দেখিলে তাহা অতিক্রম বা আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা সহসা মানব প্রকৃতির ক্ষমতাতীত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ প্রকৃতি বা চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী পদার্থ অনুসারে প্রয়োজনের উদ্ভব হয় এবং এই প্রয়োজন বশতঃই [illegible]র বিভিন্নতা। এই বাসনা বিভিন্নতা হেতু শিক্ষা বা সমাজ পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ দেশবাসিদিগের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম।

যে কারণে দেশ বিশেষে প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি বা অবস্থা ভেদ বিষয়েও তাহা সমষ্টিরূপে না হউক কোন২ বিষয়ে পাওয়া যাইবে। ফলে, প্রয়োজন ও তদনুসারে শিক্ষা দ্বারা মানবদিগের অবস্থার বৈষম্য হইয়াছে। সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে, প্রয়োজনও এক নয়। তদর্থ চিন্তাও একরূপ হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-সম্পন্ন-ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বৃত্তির চালনা হয়। সুতরাং মনের গতিও ভিন্ন হয়। মানসিক প্রকৃতি বিভিন্ন হইলে অবস্থাও যে বিভিন্ন হইবে তাহা [illegible] বাহুল্য।

* এ বিষয় বিশদরূপে সভ্যতার ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

† পণ্ডিতবর বক্‌লস বলেন, সমাজস্থ প্রত্যেক লোকের কার্য্যের জন্য সমাজ দায়ী, Buckler's History of Civilisation Vol. I.

তুমি আমি দুই জনই মনুষ্য। আকৃতিগত একতা কত। এই একতা সত্ত্বেও আমাদের আকৃতিতে এত বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, লক্ষ২ লোকের মধ্য হইতে তুমি আমাকে চিনিবে ও আমি তোমাকে চিনিয়া আনিতে পারিব। তুমি আমি উভয়ই বাঙ্গালী সুতরাং অন্য দেশী অপেক্ষা তোমার সহিত আমার বা আমার সহিত তোমার আকৃতিগত মিলন যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, মানসিক মিলনও সেইরূপ। তোমার আমার শরীরের ন্যায় সকল বাঙ্গালীরই শরীর দুর্ব্বল, এবং আমাদের মনের ন্যায় সকলেরই বাসনা যে, সুখ অপেক্ষা শান্তি ভাল।*

পক্ষান্তরে আমাদের শরীরের ন্যায় রৌদ্রি[illegible] বিভিন্নতা আছে। তুমি

বদন না কর মলি[illegible]
বাদে কি আওয়ে পূণিমিক চাঁদ [illegible]
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীর্ঘ নিশ্বাস।।
রাই হে, অব তেজহ মান;
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান।।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাও ভুজঙ্গম রহু আগোর।।
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ।।
বচন অমিয়া বিনু যে নাহি জীয়ে।
মান কুলীশ দরশায়সি কিয়ে।।

তখন সেই দাসের দোষ বিস্মৃত হইয়া, মান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! আবার সেই কৃষ্ণ প্রেমে মুগ্ধা হইয়া রাধিকা কহিতেছেন

এমন পিয়ার কথা কিপুছসি, রে সখি,
পরাণ নিছনি দিয়া।
গড়্যের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া,
আলাই বালাই তার নিয়া।। ধ্রু।।

ব্যতীত কোন রূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই। যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের অবস্থার বিভিন্নতাই প্রকৃতির নিয়ম অতএব তদ্দ্বারা অবশ্যই মানব সমাজের উপকার হইতেছে।

১ম। দ্বেষ হিংসাদির ন্যায় দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতগুলি সদ্বৃত্তিও আমাদের অন্তরে বিরাজমান; দেবতা ও পশু এই উভয় প্রকার জীবের মধ্যস্থলে মনুষ্যজাতি। তাহাতে দেবভাব, দয়া, ভক্তি, ন্যায় প্রভৃতি সদগুণও আছে। পশুভাব (অর্থাৎ এ সকল ভাবের ব্যভিচার) দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তিও আছে। আমাদের শারীরিক ভাব, মানসিক প্রকৃতি এবং পৃথিবীস্থ পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা কর, স্পষ্ট অনুভব হইবে, দেববৃত্তি, পশুবৃত্তি উভয় না থাকিলে মানব [illegible]

[illegible] কার্য্য পরম্পরা যেমন
প্রাণনাথ বলে জিনুজিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
আপনা তোমারে দিনু দিনু।।
বিদগধ শ্যামরায় বীজন করয়ে গায়,
আপনে ভুঞ্জায় গুয়াপান।
গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
তুমি সে কানুর একপ্রাণ।।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে গোবিন্দদাসের রচনা অনেক স্থলে অনুপ্রাসময়ী; এ বিষয়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন। স্থলে২ বিলক্ষণ রচনা চাতুর্য্যও দেখা যায়। কেবল ছন্দের অনুরোধে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

কামিনি, কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল কমলিনী কেনে
কঠিন করু তোয়।। ধ্রু।।
কালিন্দিকুল কদম্ব কানন,
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীর।

করিত না এবং কাহারও কিছু অভাব না থাকিলে তাহার উপকার করাও ন্যায়ানুসারিণী দয়ার কার্য্য হইত না। অতএব পরোপকারী মহাত্মা ব্যক্তি এইক্ষণে লোকের উপকার করিয়া যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহা এবং উপকৃত ব্যক্তির পবিত্র কৃতজ্ঞতা কখনও দেখা যাইত না, এ দিগে সকলের মনের ভাব অবস্থাদি একরূপ হইলে এইক্ষণে যেমন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা জগতে বিদ্যা বা অন্যবিধ ব্যাপারের পরমোপকার সাধিত হইতেছে তাহাও কখন হইত না। লোকে বিভিন্নরুচি হওয়াতে জ্যোতিষ, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি এখন দেখা যায়, সকলে সমভাবে সকল বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে তাহা কখনই হইত না। ব্যক্তি বিশেষ কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত থাকায় এ দিগে জগতের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, অন্য দিগে দয়া ভক্তি প্রভৃতি পরিচালনার সুবিধাও বিস্তর হইয়াছে। ফলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাহা হইতেছে তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।*

বৈতালিক গীত।

উদয় অচলে উদিত তপন,
নিশার আঁধার করিয়া হরণ;
স্বভাব এখন সাক্ষম —

পতিত উঠাতে নয়নের নী—
তনয়গণ—

বিষমতা।

মনুষ্যের আকৃতি, মানসিক শক্তি, এবং কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে স্বভাবতঃই মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে সমাকৃতি, প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবগণ মধ্যে কি নিমিত্ত অবস্থার বৈষম্য হইল। অবশ্যই ধনী বংশ সম্ভূত সন্তান দরিদ্র নন্দন অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি সম্পন্ন দেখা যাইতেছে, কিন্তু মূলে অন্বেষণ করিয়া দেখ সকল মনুষ্যই এক শরীর ও মন লইয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব আদিম কাল হইতে মানবগণ সর্ব্ব প্রকারে সমাবস্থ হওয়াই সুসঙ্গত। অথচ সাংসারিক ব্যাপারে এই সম্ভাবনা উন্মত্ত প্রলপিতের ন্যায়।

মনুষ্যের শরীরগত বৈষম্যের ন্যায় মনোগত বৈষম্যও প্রকৃতি সিদ্ধ। কেবল মানব জাতির কেন? কি শরীরী জীব, কি উদ্ভিজ্জ, কি একমাত্র ভৌতিক জগৎ যাহা কেন পর্য্যালোচনা করনা, স্বাভাবিক পদার্থ মধ্যে ঠিক অভিন্নাকৃতি কি অভিন্ন প্রকৃতির দুইটি পদার্থ পাওয়া যাইবে না; দুইটি বৃক্ষ পত্র হস্তে লইয়া দেখ তাহাদের আকৃতিগত সমতাও যেমন আছে বিষমতাও তেমনই দেখা যাইবে। বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগৎও বিভিন্নতাময়। সুতরাং মানসিক শক্তি বা রুচির বিভিন্নতা অনুসারে সম্পত্তি ও নানা প্রকার মানসিক ভাবের বিভিন্নতা হইয়াছে।

মনুষ্য বর্ত্তমান দর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ উভয়ই তাহার পক্ষে সমানরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অথচ অতীত অনাগত

প্রসারিয়া কর আপনি তপন
তোমাদিগে জাগাইতে যত্নবান!
উঠ আর্য্যগণ! হও জাগরিত,
অলসের শয্যা ত্যজহ ত্বরিত;
পরশিয়া দেহ করি রোমাঞ্চিত;
বলিছে পবন করিতে উত্থান। ৬

মেঘের প্রতি উক্তি।

চতুর্দ্দশ পদী কবিতা।

কেন হে নিদয় হ'লে ওহে জলধর?
দেখ এই বঙ্গ-ভূমি চাতকীর ন্যায়
যাচিতেছে নীর ধারা তবু তুমি, হায়!
বারি বিন্দু বরষণে হতেছ কাতর!
বৃষ্টি না করিবে যদি, ওহে শ্যামকায়,
ব্যাপিয়া অম্বর কেন কর আড়ম্বর?
ধনিদের মত কি হে তব আচরণ
আজি, কালি বলি কর যাচকে বঞ্চনা?
আশানষ্টে কত কষ্ট তুমি কি জাননা?
জাননা কি চিরদিন নাহি থাকে ধন?
সৌভাগ্য থাকিতে যদি কর বিড়ম্বনা,
অসময়ে বসু-শূন্য হইবে যখন,
অকৃত পুণ্যের জন্য করিবে শোচনা,
তখন বৃথায় হবে অশ্রু বরিষণ।

অমৃতে গরল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুরভিসন্ধি।

[illegible]ীয় কুলতিলক শিবজী বৃদ্ধ লইয়া থাকেন; [illegible]জের সমস্ত দেশ দিবার নিমিত্ত ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেন এই সকল স্থলে বাস্তবিক ঘটনাগুলি বিচার দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হয়, আবার যাঁহারা এক মাত্র প্রকৃত ঘটনার প্রচার জন্য ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজ পরিবর্ত্ত এবং যুদ্ধাদি বিষয় লইয়া ব্যতিবস্ত ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ দ্বারা পুরাকালের সামাজিক অবস্থা অল্পই পাওয়া যায়।

যদিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদি অতীত কালের সমুদায় বিবরণ সমগ্ররূপে জানিবার উপায় নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তথা বিধ গ্রন্থ না থাকিলে পূর্ব্বতন কোন ঘটনাই জানা যাইত না। যে অনুমানের কথা বলা হইল, তাহা ঐ সকল গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া হয়। উক্ত রূপ বিবরণ না জানিতে পারিলে অনুমান দ্বারা আমরা কিছুই

স্তুত ছিলেন। মোগলেরা হঠাৎ যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং অতি সহজেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিল। আরঙ্গজের চির [illegible] দেখিয়া [illegible]হিত বিবে-

পরস্পার নিয়ত সম্বন্ধ বদ্ধ এই সম্বন্ধ ও পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি জ্ঞাত হইয়াই মহাত্মা নিউটন সমস্ত জড় পদার্থের আকর্ষণ অনুমাণ ও তদ্দ্বারা গ্রহাদির গতির নিয়মাদি স্থির করিয়াছেন। মনুষ্যের কার্য্যও এইরূপ সম্বন্ধ বদ্ধ। ঘটনা মাত্রেরই পূর্ব্বাপর ঘটনার সহিত যোগ আছে। সমাজে এমন কোন কার্য্য হয় না যাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

গ্রহাদির গতির নিয়ম জানা থাকিলে যেমন তৎসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মানব চরিত্র বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা সাংসারিক ঘটনা পরম্পরার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের বিষয় অভিজ্ঞ হইলে ঐ অভিজ্ঞতা সহকারের ইতি-

অনঙ্গপুর আক্রান্ত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইহাদিগের মধ্যে এক দল কর্ত্তৃকই হইয়াছিল।

জগৎমোহন বৃহদারণ্যের অভ্যন্তরস্থিত মন্দির হইতে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও তাড়িত হইয়া তাহার প্রতিশোধ দিবার মানসে বিন্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে মাহারাষ্ট্রীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাধিপতির মধ্যে রঘুজী নামক এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। জগৎমোহন যে সময় বুরহানপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সে সময় রঘুজী সাতপুরা পর্ব্বতের উপরিস্থ দুর্গে স্বদলবলে বাস করিতেছিলেন। জগৎমোহন রঘুজীর নিকট গমন করিলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রঘুজী হাসিতে২ কহিলেন, "যদি [illegible] ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশবাসীদিগের ন্যায় শিল্পী হইতে পারে না। ফলে, শীতপ্রধান দেশে আহার ও আচ্ছাদন নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত কথঞ্চিৎ বিবাদ বিসম্বাদ না করিলে তাহা লাভ করা কঠিন। আমাদের দেশে ধান্য বা কার্পাস বীজ বপন করিলে প্রকৃতি আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন; সুতরাং তদর্থে বিশেষ কোন বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনার প্রয়োজন হয় না। অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি শিক্ষা বা অন্য প্রকারে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে

* এ বিষয় বিশদরূপে সভ্যতার ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

† পণ্ডিতবর বক্লস বলেন, সমাজস্থ প্রত্যেক লোকের কার্য্যের জন্য সমাজ দায়ী, Buckler's History of Civilisation Vol. I.

জগৎ। "লোকে বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই।"

রঘুজী। "তবে আপনি ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি এত বিরাগভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন?"

জগৎমোহন কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, ক্ষীরোদবাসিনী বিজয়সিংহের প্রতি অনুরক্তা।" রঘুজী শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বিজয়সিংহ কে?"

জগৎ। "সারণাধিপের পুত্র।"

রঘুজী। "তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন?"

জগৎ। "তিনি বিবাগী হইয়া কোথায় গিয়াছেন জানি না।"

রঘুজী। "ক্ষীরোদবাসিনী কোথায়?"

জগৎ। "তিনি এক্ষণে [illegible] আছেন।" [illegible]নার বিভিন্নতা। এই বাসনা বিভিন্নতা হেতু শিক্ষা বা সমাজ পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ দেশবাসিদিগেব বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম।

যে কারণে দেশ বিশেষে প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি বা অবস্থা ভেদ বিষয়েও তাহা সমষ্টিরূপে না হউক কোন২ বিষয়ে পাওয়া যাইবে। ফলে, প্রয়োজন ও তদনুসারে শিক্ষা দ্বারা মানবদিগের অবস্থার বৈষম্য হইয়াছে। সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে, প্রয়োজনও এক নয়। তদর্থ চিন্তাও একরূপ হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-সম্পন্ন-ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বৃত্তির চালনা হয়। সুতরাং মনের গতিও ভিন্ন হয়। মানসিক প্রকৃতি বিভিন্ন হইলে অবস্থাও যে বিভিন্ন হইবে তাহা [illegible] বাহুল্য।

রিলে সারণগড়কে হস্তগত করিতে বেসি প্রয়াস পাইতে হইবে না।”

রঘুজী। অনঙ্গপুর এক্ষণে কাহার অধীনে রহিয়াছে?”

জগৎ। অনঙ্গপুরের রাজপরিবারের মধ্যেতে কেহই নাই—একটীমাত্র কথা আছে, সেও সারণগড়ে। অনঙ্গপুর এক্ষণে মন্ত্রীর অধীনে আছে।”

রঘুজী সদর্পে কহিলেন, “এত তুচ্ছ কথা! সামন্য এক জন সৈন্য হইলেই, মন্ত্রীকে পরাজয় করিতে পারি।”

আচ্ছা, অদ্য আপনি এই স্থানে থাকুন, কল্য প্রত্যূষে উভয়ে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিব।” জগৎমোহন আশ্বস্ত হইলেন।

[illegible]য়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনেরও প্র[illegible]দ।

যেমন আমাকে লক্ষ[illegible] হইতে বাছিয়া বাহির করিতে পারিবে, সেই রূপ যদি তোমার মন দেখিবার ক্ষমতা থাকে, তবে আমার মানসিক ভাব যে শরীরের ন্যায় সকলের মনের ভাব হইতে পৃথক্ ইহা অনায়াসে দেখিতে পাইবে। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সুখ দুঃখ বিভিন্ন প্রকার। একে যাহাতে উদাসীন, অন্যে তাহাই পরম সুখপ্রদ বলিয়া তৎসংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হয়। এই রূপে লোকের প্রয়োজন বিভিন্ন হওয়াতে তদর্থে শরীর ও মনের চালনাও পৃথকরূপে হইতে থাকে; সুতরাং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের ফল স্বরূপ অবস্থাও বিভিন্ন হইয়াছে।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাহা কিছু সংঘটিত হয় তদ্দ্বারা জগতের উপকার বিধ চিন্তা করিতেছেন। পল্লীবাসীনীরা কলসী কক্ষে পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া যাইতেছে, কেহ বা রাজকুমারকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে যাইতেছে। কেহ বা যাইতে২ দুই এক বার বিজয়সিংহের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিতেছে, এবং কেহ কেহ বা দুই এক বচন ঝাড়িয়া হাসিতে হাসিতে হস্ত নাড়িয়া যাইতেছে। রাজকুমারের চক্ষু সেদিকে নাই ভবিষ্যতের দিকে রহিয়াছে, কর্ণ সে কথা গ্রহণ করিতেছে না, বিদায়কালীন শৈলবালার কাতর ধ্বনীতে পরিপূরিত রহিয়াছে। তিনি শৈলবালার সেই কথাই শুনিতেছেন সেইরূপই চক্ষে দেখিতেছেন। গভীর চিন্তা! ইতিমধ্যে “ব্যোম্ ব্যোম্” শব্দে তাঁহার চিন্তানিদ্রা ভঙ্গ হইল। পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন একটী সন্ন্যাসী স্নানান্তে [illegible]দিখয়া [illegible]হিত বিবে-

রূপেই পাপপুণ্যময় [illegible]

উপযুক্ত হইত না। *

আমাদের প্রবৃত্তি অনুসারে যেমন দেবত্ব বা পশুত্ব উভয় ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, এই পৃথিবীই সেই উভয় ভাব পরিচালনার সম্যক্ উপযুক্ত স্থান। এখানে আবশ্যক মতে দ্বেষ, হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির যেমন পরিচালনা হয়, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি দেবভাব সকলের পরিচালনাও প্রয়োজন মতে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

যদি জগতে সকলের সমান অবস্থা হইত, তাহা হইলে পরোপকাররূপ মহাব্রত পৃথিবীতে থাকিত না। কেহ কাহারও নিকট উপকারের প্রত্যাশা

সুখের চেয়ে সুয়াস্তি ভাল। জন প্রবাদ।

*সংসার নিষ্পাপ হইলে এক মাত্র দেবভাবে চলিতে পারিত।

সন্ন্যাসী। “সংপ্রতি জব্বলপুর হইতে আগমন করিতেছি।”

কুমার মনে করিলেন যে, ইহাঁর নিকট হইতে অনঙ্গপুর ও সারণগড়ের সংবাদ পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। ইহা ভাবিয়া কহিলেন “আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আশ্রম পর্য্যন্ত কি যাইতে পারি?” সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “গেলে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তবে কিনা একটী লোক আমার সঙ্গে আছেন তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত।”

বিজয়। “তবে আর আবশ্যক নাই।”

“যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয়, তবে যাইতে পার।” ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী অগ্রে২ গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়সিংহ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

“যদি [illegible]

আলোক বসন পরি মনোনীত।
পরশি কোমল মলয় সমির,
কাঁপে মৃদু মৃদু সুরনদী-নীর;
ফুটিছে কমল শোভা সরসীর—
সুবাসে মধুপে করিয়া মোহিত॥ ১
কিন্তু আর্য্যকুলে, আহা মরি হায়!
সৌভাগ্য রবির উদয় কোথায়?
অজ্ঞানতা নিশা ঘোরে শব প্রায়
নিদ্রা যায় হায়! ইহারা এখন।
জীবন এদের যেন বদ্ধ জল,
উদ্যম অভাবে না হয় চঞ্চল;
মুদ্রিত রয়েছে হৃদয়-কমল,
গৌরব সৌরভ করিয়া গোপন। ২
কি বলি’ বলিল সুপ্রভাত তবে?
এ দেশের নিশা পোহাইবে কবে?
কবে আমাদের অভ্যুদয় হবে?
আলোকে পুলকে ভারত ভরিয়া।
নব দূর্ব্বাদলে নিরখি শিশির,
জ্ঞান হয় যেন ভারত-ভূমির

চাহিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব।

বৃদ্ধের এবম্বিধ আচরণে বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন কিন্তু সন্ন্যাসীর ভয়ে কিছু বলিলেন না। কেবল একবার আরক্ত লোচনে বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।” বিজয়সিংহ কথা কহিবার অবসর পাইলেন, কহিলেন “অপরিচিতের সহিত এরূপ করা কত দূর সঙ্গত বলিতে পারি না।

বৃদ্ধ। “পরিচিত হইতেই বা কতক্ষণ?”

বিজয়। কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, “তবে চরিতার্থ করিতে অনুমতি হউক

বৃদ্ধ। “যাহার এ দশা হেরিয়া॥ ৩
আর্য্যগণ! হও জাগরিত!
আর কতক্ষণ থাকিবে নিদ্রিত?
অচৈতন্য দেখে অশঙ্কিত চিত
কাল চোরে সব করিছে হরণ।
নিদ্রা হ’তে উঠি অলস বর্জ্জিয়া,
হৃদয়-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়া,
পুরুষার্থ লাভে উৎসুক হইয়া
অভয়ে অবাধে কর বিচরণ॥ ৪
অনলে পুড়িয়া সুবর্ণ যেমতি
পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ধরে চারু দ্যুতি
দুঃখ-দাহ হ’তে উঠিয়া তেমনি
দ্বিগুণ উন্নতি লভিবে তোমরা।
একত্র মিলিলে অনিল অনল
সহজেতে হয় যেমন প্রবল,
জ্ঞান-বল যোগে তথা বাহুবল
তেজে উদ্ভাসিত করিবেক ধরা॥ ৫
তাই বলি উঠ উঠ আর্য্যগণ!
মোহ নিদ্রা আর যাবে কতক্ষণ?

* এ বিষয় সভ্যতার ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়ে সম্যক বিবৃত হইয়াছে।

স্থিত কিম্বা পূর্ব্ব কোন কথা স্মরণ পড়িয়া থাকিবেক ?”

বৃদ্ধ এ কথাতে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কুমারের প্রতি একবার সজল-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি স্নেহ ব্যঞ্জক, সে দৃষ্টিপাতে কুমারের মন আর্দ্র হইল। অনন্তর বৃদ্ধ একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী হইতে এক খানী পত্র লইয়া কুমারের হস্তে প্রদান করিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। কুমার পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তম ভ্রাতঃ !

বিধির ললাট লিপি ! মনুষ্যের সাধ্য নাই তাহা খণ্ডন করে। আমি তোমার হিতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কি করি, সকলই বিফল [illegible]রেচ্ছা হউক দুই চারি দিন মধ্যে দশায় দিল্লীর সম্রাট [illegible]। [illegible] ভারতকে এক ছত্র করিবার মানসে সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডাকে স্বকরতলে আনয়ন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। এই সময়ে শিবজীর মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিপতি হইলেন, তিনি জনকের ন্যায় একজন বীরপুরুষ ছিলেন, এবং সময়কে সেরূপ অমূল্য জ্ঞান করিতেন না, কেবল ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বিষয়লালসা চরিতার্থ করিয়াই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সংবাদ গুপ্তচর মুখে শ্রবণ করিয়া আরঙ্গজেবের এক দল মোগল সৈন্য সম্ভুজীর বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। সম্ভুজী এ সকল বিষয় কিছুই জানিতেন না, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে এক কালীন অপ্র-

পাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন কোথাও তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন মনে হইল না। কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব। তখন বৃদ্ধ কহিলেন, “যুবরাজ! অনঙ্গপুরের কথা কি কিছু মনে পড়ে ?”

বিজয়সিংহ নিদ্রান্বিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “ কে ? মন্ত্রিবর ।”

মন্ত্রী। “ এ নরাধমকে আর মন্ত্রী বলিয়া ডাকিবেন না।”

বিজয়। ‘ সংবাদ কি বলুন দেখি।’

মন্ত্রি। ‘তাহা আর শুনিবার আবশ্যক নাই, শুনিলে ব্যথা পাইবেন বৈত নয়।’

রাজকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি[illegible] [illegible]ক্রকে সম্মু[illegible] [illegible]হিত বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করিতে অনুমতি দিলেন। আজ্ঞাবাহকগণ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া এবং শম্ভুজীর সঙ্গেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল।

শম্ভুজীর ভ্রাতা রাম তদীয় জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া কর্ণাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং গিঞ্জীর বিখ্যাত দুর্গকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে তিনি সম্রাটের সৈন্যগণকে নানা প্রকারে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন।

এই সময়ে পার্ব্বাত্য প্রদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ নানা দলে বিভক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, খান্দেন, মালোয়া, বিরার প্রভৃতি রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক যে

সন্ধান করিলে পাইলে পাইতে পারিব, ইহা ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও অনুসন্ধান পাইলাম না। এই রূপে কতক দিন গত হয়,এক দিন বৈকালে দূত মুখে সংবাদ পাইলাম, জগৎমোহন কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া নগরাভিমুখে আগমন করিতেছেন। শুনিবামাত্রই জগতের দুরাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম এবং কাল বিলম্ব না করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিলাম। জগৎমোহন সৈন্যগণসহ পুরী প্রবেশ করিল এবং সেই অবধি অনঙ্গপুরের সিংহাসনে বসিয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে।'

ক্রোধে বিজয়সিংহের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল কহিলেন, 'সে হয়। মুখের সে ভাব কেবল [illegible]

[illegible] "যদি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি, তবে আমাকে কিরূপ পুরস্কৃত করিবে?" জগৎমোহন কহিলেন, যদি আপনি আমাকে সারণগড়ের সিংহাসনে বসাইতে পারেন এবং সারণাধিপের মন্ত্রীনন্দিনী শৈলবালার সহিত বিবাহ দিতে পারেন, তবে আমি অনঙ্গপুরের সিংহাসন আপনাকে প্রদান করিব এবং ইচ্ছা করিলে অনঙ্গপুর রাজকুমারী ক্ষীরোদবাসিনীকেও বিবাহ করিতে পারেন।"

রঘুজী কহিলেন, "আপনি রাজকুমারী পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য শৈলবালাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক?"

জগৎমোহন একটুকু হাসিলেন, কথার উত্তর করিলেন না। রঘুজী পুনর্ব্বার হাসিতে২ কহিলেন, "শৈলবালা কি ক্ষীরোদবাসিনী অপেক্ষা রূপবতী?"

সমস্ত ক্রোধানলে কে যেন জল ঢালিয়া দিল, মন্ত্র দ্বারায় কে যেন দেহ হইতে সমস্ত তাড়িৎ নির্গত করিয়া লইল, নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। মস্তক অবনত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

এই রূপে কিঞ্চিৎকাল গত হইলে পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "বাসায় গমন করিতেছেন?"

উত্তর। "হাঁ"

সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিলেন না?

উত্তর। "হাঁ"

নিজে নিজেই একবার বলিলেন, "শৈল পিড়ীতা" ইহা কহিয়া ধীরে২ তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কল্য [illegible]রণসময়ে কোথায় দেখা হইবে?" [illegible]

রঘুজী কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্গের সহিত বলি- [illegible] "আপনি যাহাকে অন্যের প্রতি আসক্তা জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহাকে কেমন করিয়া বন্ধুর করে সমর্পণ করিতে চাহেন?"

জগৎমোহন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আমি এ বিষয় নিশ্চয় কিছুই বলিতে পারি না, কিন্তু ভাব ভঙ্গিতে অনেকটা সেইরূপ বোধ হয়, এবং সেই জন্য আপনাকেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদি ইচ্ছা করেন, তবে ক্ষীরোদবাসিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন।"

রঘুজী এসম্বন্ধে আর কিছু আন্দোলন না করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে প্রথমতঃ কি করিতে হইবে, শুনিতে ইচ্ছা করি।"

জগৎমোহন কহিলেন, "প্রথমতঃ— অনঙ্গপুরকে করতলস্থ করিতে হইবে। কারণ অনঙ্গপুরকে হস্তগত করিতে পা-

পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইলেন, ক্ষীরোদ-বাসিনী কহিলেন, "আবার যে দাড়াই-লেন।" বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া কহিলেন "তুমি অগ্রে যাও, আমি কিঞ্চিৎ পরে যাইতেছি।" ক্ষীরোদ বাসিনী কহিলেন, "না একত্রেই চলুন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ পী-ড়িত শরীরে এরূপ করিয়া ভ্রমণ করা উচিত নহে।" বিজয়সিংহ আর কোন আপত্তি না করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর সঙ্গে২ চলিলেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ললিত সুন্দরী কাব্য। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।—মূল্য ।।০ আনা

ললিত সুন্দরীর এক সর্গ মাত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। বোধ হয় গ্রন্থকর্ত্তার জনসমাজে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হওয়ায় আত্যন্তিক ইচ্ছাবশতঃ [illegible] গ্রস্থ হইয়া তিনি তাড়া তাড়ি [illegible]

এদিকে বিজয় সিংহ সুচিকিৎসা ও উত্তম রূপ শুশ্রূষার গুণে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। যদিও এই সময় মধ্যে ক্ষতদেশ উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়াছিল, তত্রাচ প্রায় দুই মাস যাবৎ পীড়িত থাকাতে অনাহার অনিদ্রায় শরীরে একবারে বলশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। একটুকু বেশি চিন্তা করিতে গেলেই মস্তক ঘুরাইয়া ফেলে, একটুকু বেশি চলিলেই শরীর অস্থির করে এবং গাত্র হইতে প্রভূত পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শরীর আরও কাতর করে। এইত শরীরের অবস্থা, কিন্তু চিকিৎসকের মতে পীড়ান্তে সকালে বৈকালে ভ্রমণ কর্ত্তব্য।

এক দিবস সূর্য্যাস্তের অনতিকাল পরেই বিজয়সিংহ পরীক্ষিতের বাটীর উত্তর পার্শ্বস্থিত পুষ্করিণীর একটী ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানের উপর বসিয়া নানা-দিগের আশার সঞ্চার হইয়াছে ভরসা করি পরিণামে যেন তাহা ফলবতী হয়।

গ্রন্থের গল্পটী কিরূপ হইবে তাহা অধুনা বলা যায় না। ভরসা করি সেরাজের ব্যভিচার বর্ণনাই যেন গ্রন্থ-কর্ত্তার উদ্দেশ্য না হয়। এবং কবিবর কাউপা[illegible]কেও করিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি[illegible] কীরতেছেন। সন্ন্যাসীর দিব্য কান্তিতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল, তিনি সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইবার বাস-নায় তাঁহার নিকটে যাইয়া অভিবাদন করিলেন, "মহাদেব তোমার মঙ্গল করুন।" ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিল।

বিজয়সিংহ বিনম্রবচনে কহিলেন, "প্রভুর আশ্রম কোথায়?"

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী—যে পথের ভিকারী, তাহার আবার আশ্রম কি? যেখানে থাকি সেই খানেই আশ্রম।"

বিজয়। "এক্ষণে কোথায় আছেন?"

সন্ন্যাসী। "অদ্য দুই দিবস পর্য্যন্ত ইহার নিকটে একটী আমের বাগান আছে, সেই খানেই আছি।"

বিজয়। "কোথা হইতে আশা হই-তেছে?"

বঙ্গ বিজেতা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ স্বপ্ন নহে,—পূর্ব্ব স্মৃতি।

O! these new tenants dare me call
Intruder in my father's hall!
Walls of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the owlet's awful shriek
Or raven's uncouth song,
Fain would I ask of days gone by
And o'er each tale would heave a sigh

J. C. Dutt.

পৃথিবীতে এ প্রকার একরূপ লোক আছে যে তাহাদিগের মুখ দর্শন মাত্রই নির্দ্দয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, নিষ্প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হয়, সকলেরই হৃদয়ে ভাল বাসার উদ্রেক হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য ইচ্ছা করে। সরলা পরমাসুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, হৃদয় ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাসিবেন আশ্চর্য্য নহে।

আর এক প্রকার আকৃতি আছে যাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভুষিত করিবার জন্য প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃপূর্ণ মুখ মণ্ডল, জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত ললাট, তুলিকা চিত্রিতবৎ সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, তনু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব, ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির [illegible]

পরা[illegible] দক্ষিণেই সেই আশ্রমের বাগান। সন্ন্যাসী যে স্থানে থাকিত, সে খানে একখানী মৃগচর্ম্ম, ও দুই খানি কুশাসন রহিয়াছে, নিকটে একটু অগ্নিকুণ্ড, একবারে কতকগুলি ফল, ফুল, বিল্বপত্র ও পূজার অন্যান্য উপকরণ রহিয়াছে। একখানী কুশাসনে একটী বৃদ্ধ বসিয়া আছে। সন্ন্যাসী ও একটী অপর পুরুষকে দেখিয়া বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল। বিজয়সিংহ বৃদ্ধকে নমস্কার করিলেন বৃদ্ধও প্রতিনমস্কার করিলেন।

অনন্তর সন্ন্যাসীর আদেশ ক্রমে বিজয়সিংহ ও বৃদ্ধ উপবেশন করিলে পর, সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। বিজয় একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর পূজা দেখিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ বিজয়সিংহের মুখ পানে এক দৃষ্টে

[illegible] কাল গত হইয়া [illegible] কোথায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিচয়ে আপনি কিছুই সুখ লাভ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ এই কিশোর বয়সে আপনি কি জন্য এরূপ উদাসীন হইয়াছেন জানিতে পারিলে আমি পরম সুখী হইব।”

বিজয়সিংহ বৃদ্ধের কথাতে প্রতিবাদ না করিয়া শুদ্ধ সরল ভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন অনন্তর পরিচয় প্রদান করা হইলে পর কুমার বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া দেখেন বৃদ্ধের ললাট দেশ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিৎ এবং লোচনদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইতেছে। এতদ্দৃষ্টে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “এ হতভাগার পরিচয়ে বোধ করি আপনার কোনরূপ দুঃখ উপ-

মধ্যে২ ঘুঘুর অতি মৃদুপ্রায় অপরিস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে,—দুই প্রহরে এইরূপ সুস্নিগ্ধ স্থানে যে সেই রব শুনিয়াছে তাহারই হৃদয় মোহিত ও শান্তি পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উভয়ে উদ্যান হইতে সরোবর সমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ,—চারি পার্শ্বের আম্র ছায়া আপন স্থির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুই জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরের ঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তব্ধ শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল। বিমলা মধ্যে২ কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে। ক্ষণেক পর বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন।

“—া, অত মৌন হইয়া রহিয়াছ

হইল। যা— কি দুঃখ চিন্তা করি-

আমরা শ্রীক্ষেত্রে গ—

বাসিনী আমাদের সঙ্গে থাকিবে; যদি কোন ক্রমে পথিমধ্যে হরণ করিতে পার, তবে ভালই, আমিও সহায়তা করিব, নতুবা সকলই বিফল হইবে।

জগৎ! আমি এত দিন জানিতাম তুমি আমার সহোদর। কিন্তু এক্ষণে জানিতে পারিলাম তুমি আমার কেহই নহ। ‘কেননা তাহা হইলে তুমি কখনই আমার শত্রুকে সম্মুখে রাখিয়া উদর পূরণ করিতে পারিতে না। তুমি কাপুরুষ! কি করিব, বিধাতা আমাকে একে স্ত্রীলোক তাহাতে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য বিষয় পরে লিখিব। উদ্দেশানুসারে চলিলে মনোরথ পূর্ণ হইবে, ইতি।

তোমার হৈমবতী।

বিজয়সিংহ পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইলেন, এবং এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের আ-

ভাব গোপন করিতে জানিত না, কখন চেষ্টাও করে নাই; বিমলা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে সরলার হৃদয়ে কোন খেদ চিন্তা ঘনীভূত হইতেছে। তিনি যে সকল কথা বলিতেছিলেন সরলার তাহাতে মন নাই,—এক মুহূর্ত্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তে চারিদিকে চাহিতেছে আর কি চিন্তা করিতেছে। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

“সরলা, আমার নিকট কেন লুকাইবে,—তুমি আবার সেই দুঃখ চিন্তা করিতেছ। তুমি চারিদিকে অবলোকন কবিতেছ, অদ্য সমস্ত দিনই অন্যমনস্কা হইয়া রহিয়াছ। ছি, সে দুঃখ চিন্তা ত্যাগ কর, আইস আমার নিকটে আইস।”

এই বলিয়া বিমলা অতি স্নেহ সহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া

লাগিলেন। মন্ত্রী অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিলেন,‘রাজকুমার! আপনি এই দিকে আগমন করিলে পর, আমি আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ অনঙ্গপুরের রাজ্যভার বহন করিতে ছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম, মহারাজ সুরেন্দ্রসিংহের শ্রীক্ষেত্রে গমন করা হয় নাই। পথিমধ্যে দুই খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল। তাহার এক খানিতে আমাদের ক্ষীরোদবাসিনীও ছিলেন। ইহা কহিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া কহিলেন, ‘এই সংবাদে নগরের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ এক কালে শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। ইতিমধ্যে পরস্পর শুনিতে পাইলাম, রাজকুমারী জল মগ্ন হয়েন নাই—দস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন, তখন মনে কিছু আশ্বস্ত হইলাম, অনু-

উদ্যান হইতে পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন, ও নানারূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনার শয়নাগারে লইয়া যাইলেন, তথায় একটী টিয়াপাখি ছিল সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বল্ দেখি এ কে?" পাখি বলিল "এ কে?"

বি "তুই বল্ না আমি বল্‌ব কেন?"

পা "বল্‌ব কেন?"

বি "তবে বুঝি তুই জানিস্ না।"

পা "তুই জানিস্ না।"

বি "আমি জানি, তুই বল দেখি সরলা বাহিরের কোন লোক না এই [illegible]"

মন্ত্রী। তিনি কি [illegible]রবেন? তিনি একে পীড়িত তাহাতে তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই। আপনার বিমাতা সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন।

বিজয়। কেন, মন্ত্রী মহাশয় কি রাজকার্য্যাদি কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করেন না।

মন্ত্রী। করিতে দেয় কে? তাঁহার কথা কেহই শুনে না, সুতরাং তিনি এক্ষণে সারণগড়ে আসাই রহিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ শৈলবালা অত্যন্ত পীড়িতা আছেন।

বিজয়সিংহ সোৎবেগে কহিলেন, কি পীড়া?

মন্ত্রী। "পীড়া কেহই ভালরূপ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই, এক এক জন চিকিৎসকে এক একরূপ বর্ণনা করে।"

বিজয়সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার

খিবামাত্র সরলার বিষণ্নতা দ্বিগুণ হইল, হঠাৎ অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন,

"আইস, আবার চিন্তা কেন?"

সরলা উত্তর করিল,

"আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি,—মা কোথায়?"

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল,—নিস্তব্ধে তাহাকে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা দ্রুতবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রু পরিপূর্ণ নয়ন মাতার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি মা, কি হইয়াছে?"

[illegible] উত্তর নাই।

কোথায় যাইতেছেন? কাহার অনুসন্ধানে যাইতেছেন? রাজপুত্র একমনে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে কে যেন তাঁহার বাম বাহুতে সুকোমল কর দ্বারা ধরিয়া আকর্ষণ করিল। বিজয়সিংহ সিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। পশ্চাৎ হইতে বামাস্বরে প্রশ্ন হইল, "এত রাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছেন?" বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, কে—ক্ষীরোদবাসিনী! আমি এই দিকে বেড়াইতে২ আসিয়াছি, চল বাড়ীতে যাই।' ক্ষীরোদবাসিনী বুঝিতে পারিলেন, রাজকুমার প্রকৃত ঘটনা গোপন করিলেন, অতএব আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, "হাঁ তাই চলুন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে।"

বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া

দিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।”

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্ম কথা, সমরসিংহের সন্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অন্যায় মৃত্যুর কথা আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্ম-বেশের কথা এ সমস্ত কথা বালিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমেং মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমেং দুই একটী কথা স্মরণ হইতে লাগিল, ঘর দালান, স্তম্ভ হইল। যা পূর্ব্বকথা জাগরিত হইতে আমরা শ্রীক্ষেত্রে গম[illegible] বাসিনী আমাদের সঙ্গে থাকিবে, যদি কোন ক্রমে পথিমধ্যে হরণ করিতে পার, তবে ভালই, আমিও সহায়তা করিব, নতুবা সকলই বিফল হইবে।

জগৎ! আমি এত দিন জানিতাম তুমি আমার সহোদর। কিন্তু এক্ষণে জানিতে পারিলাম তুমি আমার কেহই নহ। ‘কেননা তাহা হইলে তুমি কখনই আমার শত্রুকে সম্মুখে রাখিয়া উদর পূরণ করিতে পারিতে না। তুমি কাপুরুষ! কি করিব, বিধাতা আমাকে একে স্ত্রীলোক তাহাতে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য বিষয় পরে লিখিব। উদ্দেশানুসারে চলিলে মনোরথ পূর্ণ হইবে, ইতি।

তোমার হৈমবতী।

বিজয়সিংহ পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইলেন, এবং এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের আ-

“মাতঃ, পামর শকুনির পাপ আমি এত দিনে জানিলাম,—এ বিশ্ব সংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই। কিন্তু উপরে ভগবান্ আছেন, এ ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আছে।”

এই গম্ভীর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা আপন চিন্তা ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন

“বৎস বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহার লীলা খেলা আমরা বুঝিতে পারি না। না হইলে পাপের জয় কি জন্য?”

বিমলা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন,

“মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত অধিক দূর নাই। আমি এই পামরের মত্যার, উপ[illegible] লাগিলেন। মন্ত্রী অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিলেন,‘রাজকুমার! আপনি এই দিকে আগমন করিলে পর, আমি আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ অনঙ্গপুরের রাজ্যভার বহন করিতে ছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম, মহারাজ সুরেন্দ্রসিংহের শ্রীক্ষেত্রে গমন করা হয় নাই। পথিমধ্যে দুই খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল। তাহার এক খানিতে আমাদের ক্ষীরোদবাসিনীও ছিলেন। ইহা কহিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া কহিলেন, ‘এই সংবাদে নগরের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ এক কালে শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। ইতিমধ্যে পরস্পর শুনিতে পাইলাম, রাজকুমারী জল মগ্ন হয়েন নাই—দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন, তখন মনে কিছু আশ্বস্ত হইলাম, অমু-

গত হইয়াছিল, যথায় তিনি বঙ্গকুল-চূড়ামণি সমরসিংহের রাজমহিষী হইয়া কাল যাপন করিয়াছিলেন,—আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুর্গ পার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ ভ্রুকুটী করিয়া প্রবাহিত হই-তেছে, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মহাশ্বেতা পূর্ব্বে যে ভাবে ঐ নদীর প্রতি অবলোকন করিতেন অদ্য কি সেই ভাবে অবলোকন করিতেছেন? দূরে যে পল্লীস্থ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইত, পার্শ্বে যে আম্রকানন দেখা যাইত, সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যাইত তাহাতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু মানব হৃদয়ে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে! [illegible]য় সারণাধিপতি [illegible] কোথায়, সে

মন্ত্রী। তিনি কি [illegible]রিবেন? তিনি একে পীড়িত তাহাতে তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই। আপনার বিমাতা সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন।

বিজয়। কেন, মন্ত্রী মহাশয় কি রাজ-কার্য্যাদি কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করেন না।

মন্ত্রী। করিতে দেয় কে? তাঁহার কথা কেহই শুনে না, সুতরাং তিনি এ-ক্ষণে সারণগড়ে আসাই রহিত করি-য়াছেন। বিশেষতঃ শৈলবালা অত্যন্ত পীড়িতা আছেন।

বিজয়সিংহ সোৎবেগে কহিলেন, কি পীড়া?

মন্ত্রী। "পীড়া কেহই ভালরূপ নি-রাকরণ করিতে পারেন নাই, এক এক জন চিকিৎসকে এক একরূপ বর্ণনা করে।"

বিজয়সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। সে কালাগ্নি যেন অন্য কাহারও হৃদয়ে না জ্বলে, জি-ঘাংসা যেন কাহারও ব্রত না হয়, কোন নরাধম প্রতিহিংসার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে যেন সাহসী না হয়। হৃদয় হইতে ক্রোধ, দর্প, অভিমান উৎপাটিত কর,—কেবল পরোপকার ও ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—এ সংসারে কয় দিনের জন্য আসিয়াছ? *

এ দিকে বিমলা সরলাকে আপন ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার ন্যায় এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও আ-পন পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছেন, তখন আর তা[illegible] প্রতি [illegible] যত্নের সীমা ছিল না। উত্তর নাই।

কোথায় যাইতেছেন? কাহার অনু-সন্ধানে যাইতেছেন? রাজপুত্র এক-মনে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে কে যেন তাঁহার বাম বাহুতে সু-কোমল কর দ্বারা ধরিয়া আকর্ষণ করিল। বিজয়সিংহ সিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। পশ্চাৎ হইতে বামাস্বরে প্রশ্ন হইল, "এত রাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছেন?" বিজয়-সিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, কে—ক্ষীরোদবাসিনী! আমি এই দিকে বেড়াইতে২ আসিয়াছি, চল বাড়ীতে যাই।' ক্ষীরোদবাসিনী বুঝিতে পারি-লেন, রাজকুমার প্রকৃত ঘটনা গোপন করিলেন, অতএব আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, "হাঁ তাই চলুন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে।"

বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া

হইতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। সে সকল কথা বলিতে সরলার কিছু মাত্র দুঃখ হয় নাই,—চির কালই আপনাকে সামান্য কৃষককন্যা বলিয়া জানিত, সে কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইবে কেন? কিন্তু সরলা যে কিছু মাত্র কষ্ট বা দুঃখ অনুভব না করিয়া দারিদ্র ও দুঃখের গল্প করিতেছে, ইহাতেই বিমলার উন্নত হৃদয় অধিকতর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অতি স্নেহ সহকারে দুই বাহু দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠের নিকট আপন ওষ্ঠ আনিয়া বার বার সেই সরল চিত্ত বালিকার মুখে সেই দারিদ্রের কথা, সেই পল্লিগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার২ সেই এক কথা শু- [illegible] সলাগিলেন, বারং চক্ষুজলে সর- কেন? [illegible] কেশরাশি তেছ। ছি সে সকল চিন্তা দূর কর। [illegible]

সরলা উত্তর করিল,

"কৈ না, আমি ত আর সে চিন্তা করিতেছি না।"

সরলা সত্য কথাই বলিল,—তাহার হৃদয়ে প্রাতঃকালের দুঃখের চিন্তা ছিল না,—অথচ বিমলার বোধ হইল সরলার হৃদয় চিন্তা শূন্য ছিল না। স্নেহ সহকারে তাহাকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠাইলেন, আপনি তাহার দাঁড় ধরিয়া সেই বিস্তীর্ণ সরোবরে তরী চালন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই সেই ঘন ছায়ান্বিত আম্র বেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয় সখীর সরলান্তঃকরণেও কোন দুঃখ তিমির ঘনীভূত হইতেছে। সরলা আন্তরিক

স। "বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন আর কেহ আমাকে সেরূপ ভাল বাসিতে পারে না, তাহার কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে।"

বি। "আচ্ছা তোমরা কি ব্যবসায় করিতে?"

স। "আমি বাড়ীতে সূতা কাটিতাম, চিত্র আঁকিতাম, আমাদের বাড়ীতে বাগান ছিল, তাহার ফল হইত,—সুতরাং আমাদের কষ্ট হইত না।"

বি। "সরলা, তোমাদের প্রতি যে কি অন্যায় হইয়াছে আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার সাধ্যে যদি থাকে, আমি আপনি ভিখারিণী হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিব।"

স। "আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে সেরূপ অবস্থায় আমার কিছমাত্র কষ্ট হইত না। [illegible] না হয় আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন।

সরলা উত্তর করিল

"তোমার কাছে লুকাইব কি জন্য,—সত্য আমার মন কেমন২ করিতেছে, কিন্তু যথার্থ বলিতেছি আমি সে দুঃখ চিন্তা করিতেছি না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন

"তবে কি চিন্তা করিতেছ?"

সরলা উত্তর করিল

"জানি, জানি—না,—চিন্তা কিছুই নাই,—এক একবার মন কেমন২ করিতেছে।"

সরলা সম্পূর্ণ সত্য কথাই কহিয়াছিল, মন কি জন্য চঞ্চলা হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই,—পাঠক মহাশয় যদি পারেন অনুভব করুন।

সন্ধ্যা হইল। বিমলা ও সরলা

তেছে। আমার দিবা রাত্রি পিতার চিন্তায় নিদ্রা হয় না। কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।”

স। আর কি ?”

বি। “সরলা, তোমার নিকট কিছু লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। সরলা, আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর নরাধম কয়েক দিন অবধি প্রত্যহই বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে বলপূর্ব্বক পাণি গ্রহণ করিতে চাহে। আজ তিন দিন হইল, আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আমি উপায়ন্তর না দেখিয়া—সময় চাহিলাম, অতি কষ্টে তিন দিনের সময় পাইলাম। বাড়ীর মেয়ে ? পূর্ব্ব গোরব তিন দিন শেষ

পা “বাড়ীর মেয়ে।”

বি “পারিলিনি ! দূর বাঁদী !

পা “দূর বাঁদী।”

সে গৃহ হইতে দুই জনে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল “আমি কি এই বাড়ীর মেয়ে ?”

বিমলা পাখীর কথায় কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই, পাখীর কতদূর বিদ্যা তাহা তিনি জানিতেন,—সে পাখীকে যে কথাগুলি বলা যাইত, কিছু না বুঝিয়া তাহার শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে পারিত। বিমলাও এইরূপ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিলে এক রূপ উত্তর হয়।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দে-

সরলা বিস্মিত হইয়া রহিল। বিমলা আপনার চিন্তায় অভীভূত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,

“হাঁ——মুঙ্গের যাইয়া পিতার পরিত্রাণ করিব,—হত্যার প্রতিহিংসা হইবে, পাপীর শাস্তি হইবে।—তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুর্গ, মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ন্যায় কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর তাহার পর জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, আমার হৃদয়েশ্বর মুঙ্গেরে আছেন, ———সরলা, তুমি কখন প্রেমে পড়িয়াছ ? তুমি বালিকা, সে চিন্তা, সে যাতনা এক্ষণও জান না।”

সরলা কোন উত্তর ক[illegible]

সরলা উত্তর করিল,

“মা, আমি জানি না, এ বাটীতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল দ্রব্যই যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক বীরমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগলিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ডাকিলাম। মা আমি অজ্ঞান,—কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছি।”

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না,—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—অজ্ঞান বালিকার কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে মহাশ্বেতা কন্যাকে পুনরায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, যে কথা আমি এত

প্রেমে পরিপূর্ণ ;—আমারই মত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছে ;—হৃদয়েশ্বরের ঘর বাড়ী বংশকুল কিছুই জানে না, পরমেশ্বর সরলার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।”

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “সরলা, তাঁহার নাম কি ?”

সরলা মুখ লুকাইয়া বলিল

“প্রেমদাস !”

বলিবা মাত্র বিমলা বজ্রাহতের ন্যায় সিহরিয়া উঠিলেন। সরলা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল

“কি হইয়াছে”

বিমলা উত্তর করিলেন, “কিছু নহে,” —স্মরণ করিলেন জগতে সহস্র প্রেমদাস থাকিতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন

“তাঁহার সহিত কবে তোমার শেষ দেখা হইয়াছে ?”

সরলা বলিল,—“অদ্য দুই মাস হইবে তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন।”

বিমলা আরও বিস্মিত হইলেন,—ঠিক দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার প্রেমদাসও পশ্চিম যাত্রা করিয়াছিলেন। পরে প্রেমদাসের অবয়ব আকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সরলা যে বর্ণনা করিল তাহা প্রেমদাসের প্রকৃত আকৃতি নহে, কেন না প্রেমদাস যেরূপ সুপুরুষ সরলা তাহার দশ গুণ অধিক করিয়া ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু বিমলার হৃদয়ে যে আকৃতি অঙ্কিত ছিল তাহার সহিত এই বর্ণনা মিলিল,—কেন না বিমলা ও সরলা দুই জনেই প্রেমদাসকে প্রেম চক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন,—দুই জনেরই হৃদয়ে একরূপ আকৃতি অঙ্কিত ছিল। বিমলার হৃৎকম্প হইতে লাগিল ; শরীরে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল। অবশেষে তিনি সরলাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তাঁহার শরীরে কোন স্থানে কোন চিহ্ন আছে ”—নিস্পন্দ শরীরে নির্নিমেষ নয়নে বিমলা এই প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরলা বলিল “তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যের অঙ্গুলীতে একটী নিবীড় কৃষ্ণ যৌতুক আছে।”

বিমলা চীৎকার করিয়া শয্যায় বদন লুকাইলেন,—তিনি সে চিহ্ন মহেশ্বর মন্দিরে বার২ লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

সরলা বিমলার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে”

“ না ” বলিয়া বিমলা সরলার হস্ত সজোরে নিক্ষেপ করিল।

সরলা বিস্মিত হইয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কোথাও ব্যথা পাইয়াছ ?”

বিমলা পুনরার হস্ত সরাইয়া দিয়া উত্তর করিল “না”—“হাঁ পাইয়াছি, হৃদয়ে”—“না পাই নাই।”

সরলা অধিকতর বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সেই ক্ষণে বিমলার হৃদয়ে বজ্রের আঘাত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর সরলা অতি কাতর করুণস্বরে বললি,

“বিমলা, আমর উপর রাগ করিয়াছ ? আমি কোন দোষ করিয়া থাকি ক্ষমা কর, আমি অতি অজ্ঞান, হতভাগিনী।”

সে করুনস্বরে কাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয় ?—বিমলার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। বলিলেন,

"না সরলা তুমি আমার কোন দোষ কর নাই,—আমাকে ক্ষমা কর আমার শিরঃপীড়া আছে। নিদ্রা যাও, আমিও নিদ্রা যাই তাহা হইলেই ব্যথা আরাম হইবে।"

সরলা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বিমলাকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিয়া আপনি ফিরিয়া শুইল। তাহার পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা বশতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

বিমলার নিদ্রা হইল না,—সে রাত্রিতে বিমলার যাতনা কে বর্ণনা করিতে পারে? যে ভীষণ বাত্যায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল তাহা ক্ষণকাল পরে নীরব হইল কিন্তু শান্ত নীরব অথচ মর্ম্মভেদী শোকের প্রবাহ থামিল না। হৃদয়ে যে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, সরলার শান্ত বদনমণ্ডল ও মুদিত নয়নের দিকে দেখিতে২ তাহা ক্রমে লীন হইয়া গেল।

"এই নির্দ্দোষী বালিকা—এই নিরাশ্রয় অনাথা, ইহার কি দোষ, ইহার উপর কি আমি রাগ করিতে পারি। আমরাই সরলাকে অনাথা করিয়াছি, আমরাই মহাশ্বেতাকে বিধবা করিয়াছি, আমরাই তাঁহাদিগকে গ্রামে২ ভিখারিণীর মত বাস করিতে ও ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। সেই গ্রামে বাস করিয়া যে সরলা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে,—করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছে সে কেবল এক মাত্র আশায়,—সে প্রেমের আশা। দরিদ্রাবস্থায় সেই পল্লীগ্রামে যে রত্ন পাইয়াছে ভিখারিণীর সে রত্ন কি আমি কাড়িয়া লইতে পারি?—

"ভিখারিণী কে?——আমাকেই হৃদয়েশ্বর ভিখারিণী বলিয়া জানেন, সরলা তুমিই সে ভিখারিণীর রত্ন কাড়িয়া লইতেছ। সরলা, তোমাদের মান, সম্ভ্রম, সম্পত্তি জমীদারী আমরা কাড়িয়া লইয়াছি, সে সকল ফিরাইয়া লও,—আরও চাহ, আরও আমাদিগের যাহা কিছু আছে কাড়িয়া লও, সকল সহ্য হইবে;—কিন্তু ভিখারিণীর এ রত্ন কাড়িয়া লইও না,—এ রত্ন কাড়িয়া লইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।" বিমলা দুঃখে অভিভূত হইয়া দুঃখিনীর ক্রন্দন কান্দিতে লাগিলেন,—দরবিগলিত অশ্রু ধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আজি যথার্থই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি শোকের প্রবাহে যাতনায় অস্থির হইয়াছিলেন—"হৃদয়েশ্বর! তুমি কাহার হইবে? সরলা তোমার নিকট আমি কাড়িয়া লইব না,—পাপে আমাদের বংশ পরিপূর্ণ আছে, আজি হৃদয় রত্ন তোমাকে দিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।——হায়! বৃথা চেষ্টা, এ রত্ন হৃদয়ের অংশ হইয়াছে, এ প্রেম উৎপাটন করিলে হৃদয় উৎপাটিত হইবে" পুনরায় অবিরল অশ্রু ধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আবার ভাবিতে লাগিলেন "সরলা! এ রত্ন তুমি কোথায় পাইয়াছিলে? দরিদ্র হইলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? পল্লী গ্রামে কুটীরে বাস করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি দরিদ্র হইব, কুটীরে বাস করিব, আমি দ্বারে২ ভিক্ষা করিব, আমাকে এ রত্নটী দাও। চিরকাল তপস্যা করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়, সাগরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি ভস্ম

মাখিয়া তপস্বিনী হইব, আমি সাগরে ঝাঁপ দিব,—আমাকে এ রত্নটী দাও। —না, সরলা, তোমার এ রত্ন আমি লইব না, পরের দ্রব্যে লোভ করিব না, —পরমেশ্বর সহায় হউন আমা হইতে সরলার যেন আর কষ্ট না হয়, আমি যেন পাপীয়সী না হই। না সরলা, আমি তোমার প্রেমদাসকে লইব না, আমি আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিলাম, —প্রেম উৎপাটন করিতে যদি হৃদয় উৎপাটন করিতে হয়, তাহাতেও স্বীকার আছি,—দেখিবে নারীর হৃদয়ে কত সহ্য হয়। আমি দিব্য করিতেছি তোমার প্রণয়ে সপত্নী হইব না, সরলা! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।"

পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিলে কোন্ অভাগিনীর দুঃখ শান্তি না হয়। বিমলা পরমেশ্বরের নাম লইয়া হৃদয় সুস্থ করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন হৃদয়ে যাহাই থাকুক, বাহ্যে প্রেমদাসের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইবেন না।

প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে শোক নিবারণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। যে নারী কখনও মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিরাছেন, বক্ষস্থল হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিমলার যাতনা বুঝিয়াছেন। রজনী অধিক হইল, বিমলার চিন্তার শেষ হইল না। এক একবার সরলার চিন্তা শূন্য মুখ খানি ও মুদিত নয়ন দুইটি দৃষ্টি করেন, এক২ বার চিন্তায় অভিভূত হয়েন, আর এক২ বার চক্ষু দিয়া নীরবে জলধারা পড়িতে থাকে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—চক্ষুতে অশ্রু ধীরে২ ক্রমে২ সঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে২ চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, শেষে ধীরে২ সেই জল বদনমণ্ডল দিয়া বহিয়া শয্যায় পতিত হয়। আবার অশ্রু সঞ্চিত হয় আবার চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, আবার ধারা বহিতে থাকে। সেই গভীর রজনীতে সেই নীরব অশ্রু বিন্দু যে একের পর অন্যটী নিপতিত হইতেছিল তাহা কে লক্ষ্য করিতেছিল? এই জগৎসংসারে রজনী যোগে যে কত নীরব অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় তাহা কে লক্ষ্য করে?

ক্রমে রজনী প্রভাতপ্রায় হইল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; ঘরের ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে লাগিল। রজনী যোগে অশ্রু বর্ষণে বিমলার হৃদয় শান্ত হইয়াছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। বিমলা দেখিলেন সরলা তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে, গুচ্ছ২ কৃষ্ণ কেশ বদনমণ্ডল আবৃত করিয়াছে, ওষ্ঠ দুইটী ঈষৎ ভিন্ন, তাহার ভিতর দিয়া মুক্তা ফলের ন্যায় দন্ত দেখা যাইতেছে। বিমলা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন, তাহার পর সরলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আজ আমি তোমা অপেক্ষাও দরিদ্র ভিখারিণী হইলাম,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" এই বলিয়া সস্নেহে সরলার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ অবলম্বন।

"O! do not tempt" she said;
O! do not add to my distress,

I have tasted much of bitterness"

* * *

But ah, fair maid, thou plead'st in vain,
His heart is proof to prayers.
Albeit like darksome floods of rain
Thou shedst thy scalding tears.

* * *

One cry she gave, one shriek of wail;
Her hands her tresses roved among,
Thence drew her mother's parting blade,
Now let the tyrant have his meed,
Now dagger do thy deed.

S. C. Dutt.

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইল তাহা পাঠ করিয়া কোনং পাঠিকা হাসিবেন,—বলিবেন "স্ত্রীলোকে কি কখন সপত্নীর জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিতে পারে? এমন অন্যায় লিখিলে বিশ্বাস করিব কেন,— লেখক স্ত্রীলোকের হৃদয় জানে না।"

আমরা স্বীকার করিতেছি আমাদিগের সাধ্য কি যে স্ত্রীলোকের হৃদয় জানিব,—সে গভীর চক্রান্তে আমরা দন্তস্ফুট করিতে পারি এরূপ সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে বিমলার সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা যেরূপ দৃঢ় ও অভঙ্গুর ছিল, পুরুষের হৃদয়েও সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মুখে "হৃৎপিণ্ড উৎপাটন" করিবার কথাও আমরা দুই একবার শুনিয়াছি। আমাদের বোধ হয় আবশ্যক হইলে তিনি তাহাও করিতে পারিতেন। এ কথাতে যদি পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট না হয়েন, তবে আমরা নাচার!

প্রেমদাসের প্রতি বিমলা যে উন্মত্তের ন্যায় আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। যে দিন দুর্গে চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল সেই দিনই বিমলা পাগলিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি সেই প্রেম গাঢ়ভূত হইবারও অনেক কারণ ছিল।

গৃহে যদি বিমলার অনেক সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্রমে মহেশ্বর মন্দিরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু গৃহে অনেক পরিবার থাকিলে সতীশচন্দ্রের ও শকুনীর চক্রান্ত সাধনে ব্যাঘাত হইতে পারে এই জন্য সে গৃহে অধিক লোক থাকিতে পাইত না। সচরাচর হিন্দু জমীদারের বাটী যেরূপ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কুটুম্বিনীতে পরিপূর্ণ থাকে, সতীশচন্দ্রের বাটী সেরূপ ছিল না। সুতরাং বিমলা অনেক সময়ে একাকী বসিয়া থাকিতেন,—সে সময়ে প্রথম প্রেমের চিন্তার মত আর কোন্ চিন্তা ভাল লাগে? দিন গত হইতে লাগিল; মাস গত হইতে লাগিল; সেই চিন্তা গাঢ়ভূত হইতে লাগিল;—তাহার সঙ্গেং হৃদয়ে প্রেম গাঢ়ভূত হইতে লাগিল।

গৃহে যদি বিমলার সুখের কারণ থাকিত, ভাল বাসার পাত্র কেহ থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখে অভিভূত হইয়া বা সেই পাত্রকে (ভ্রাতাই হউক ভগিনীই হউক) ভাল বাসিয়া বিমলা মহেশ্বর মন্দিরের চিন্তা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বংশের মধ্যে বিমলা একাকী, প্রাণের সহিত ভাল বাসিবেন এরূপ এক জনও লোক তথায় ছিল না। আর সুখ,—বিমলার

সুখ কি, জগতে বিমলার সুখের কারণ কিছুই ছিল না। পিতা দূরে গিয়াছেন,—যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন সকল সময়েই অনিশ্চিত, তাহাতে আবার শকুনির যেরূপ ধূর্ত্ততা বিমলার পিতার জন্য সর্ব্বদাই ভয় হইত। আর গৃহে সেই পিশাচ শকুনী,—বিমলাকে বিবাহ করিবার জন্য দিবা রাত্রি জ্বালাতন করিতেছে। তাঁহার উন্নত চরিত্র ও স্থির সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না, এত দুঃখ চিন্তা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভীষণ মেঘের অন্ধকারের মধ্যেও বিদ্যুতালোক দেখা দেয়, মানব জাতির ঘোর দুঃখ দুর্দ্দিনেও মায়াবিনী আশা দেখা দেয়।—কেবল দুঃখ চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে মনুষ্যের প্রকৃতি এরূপ নহে। বিমলার দুঃখ মেঘের মধ্যে বিদ্যুতালোক কি? বিমলার দুঃখ দুর্দ্দিনে এক মাত্র আশা কি?—প্রেমদাসের প্রেমের চিন্তা,—রমণীর আর কি হইতে পারে? সেই দুঃখ ও চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া বিমলা প্রেম স্বরূপ এক মাত্র ধ্রুব নক্ষত্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া জীবন ধারণ করিতে ছিলেন,—দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

বিমলা যদি সামান্য বালিকার ন্যায় চঞ্চল চিত্তা হইতেন তাহা হইলে দুঃখের সময় বাটীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক থাকিত, তাহাদিগের নিকট দুঃখ কথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিমলা গম্ভীর চিত্তা, উন্নত চরিত্রা, মানিনী স্ত্রীলোক ছিলেন,—আপনার সুখ দুঃখ নীরবে অনুভব করিতেন; আপনার পরামর্শ আপনিই করিতেন। এমন কি সতীশচন্দ্রও কখনং আপন ধর্ম্মপরায়ণা মানিনী কন্যাকে ভয় করিতেন, কখনং তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতেন। এরূপ স্থির চরিত্রে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে প্রস্তরে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শীঘ্র বিলীন হয় না। মহেশ্বর মন্দিরে বিমলার হৃদয়ে যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অনপনেয়।

এই সকল ও অন্যান্য নানা বিধ কারণ বশতঃ বিমলার হৃদয়ে যে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে অপনীত হইতে পারে নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহেশ্বর মন্দিরে যে বীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন,—সে বীরমূর্ত্তি, সে দেবমূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার নয়নের সম্মুখে জাগরুক ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত ছিল। সেই প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার কার্য্য,—কি বীরত্বের কার্য্য পাঠক মহাশয় এক্ষণে আলোচনা করুন। রমণী হৃদয়ে ইহার অধিক বীরত্ব সম্ভবে না।

আজিশবিমলার পক্ষে ভীষণ দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যাগৃহ হইতে অন্য একটী গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে লাগিলেন,—অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা কপোল দেশ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে বিমলা বাহিরে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে হাসিও আসিল, কান্নাও আসিল। দেখিলেন সরলা একটী মৃণ্ময় কলস কক্ষে লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সরলা বলিল,—

"বিমলা, তোমার কলস কই? অনেক বেলা হইয়াছে, ঘাটে যাইবে না"?

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন?—একি সরলা, কলস কেন?"

স। "ঘাটে জল আনিতে যাইতেছি। বেলা হইয়াছে এক্ষণও জল আনিলাম না রান্না হইবে কখন। আমি তোমার জন্যই দাঁড়াইয়া আছি।"

বি। "রান্না অনেক ক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ঘাটে যাইব কেন, আমরা জল আনিব কেন?"

স। "তবে কে আনিবে? রুদ্রপুরে ত আপনারাই জল আনিতাম।"

বিমলার চক্ষে জল আসিল। সরলার হস্ত হইতে কলস লইয়া রাখিয়া দিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলেন,

"আমাদের দাস দাসী আছে, তাহারা সব কার্য্য করিবে, আমাদের কিছু করিতে হইবে না। যাও তুমি মার কাছে যাও তিনি এতক্ষণ উঠিয়াছেন।"

সরলা অতিশয় লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন করিল;—বিমলা আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন শকুনি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, গাত্রের রক্ত শুখাইয়া গেল।

শকুনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিস্পন্দ শরীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমি দিকে এক দৃষ্টে চাহিতে ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। পূর্ব্ব রাত্রির কথা স্মরণ করিলেন, আজি দুই মাস অবধি জগতে যে একমাত্র সুখের আশা করিয়াছিলেন, সে আশা দূর হইয়াছে,—নারী জীবনের একমাত্র আরাধ্য যে প্রেমের আশা করিয়াছিলেন, সে প্রেমে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন,—হৃদয়ের হৃদয়ে যে প্রতিমাকে স্থান দিয়াছিলেন সে প্রতিমা চূর্ণ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও একেবারে চূর্ণ হইয়াছে। সেই সকল চিন্তা করিতে২ বিমলা অস্থির হইলেন,—চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল, প্রকাশ্যে বলিলেন,

"শকুনি, আমি হতভাগিনী,—আমার মত হতভাগিনী আর নাই, আমাকে আর দুঃখ দিও না, ক্ষমা কর।"

সে দুঃখের বচনে পাষাণও দ্রবীভূত হইত, শকুনির হৃদয় হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

"এই জন্য বুঝি তিন দিন সময় চাহিয়াছিলে?"

বি। "আমাকে সময় দিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি,—কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইতেছে তাহা তুমি জান না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে ক্ষমা কর।"

শ। "বিবাহের আগে সকল স্ত্রী লোকই ঐ রূপ করে, শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় সকলেই কাঁদে, কিন্তু একবার গেলে আর বাপের বাড়ী আসিতে চাহে না।"

বি। "শকুনি, উপহাস করিও না, আমি হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছি,—উপহাস ভাল লাগে না।"

শকুনি ঈষৎ ক্রোধ সহকারে বলিলেন,

"আমি উপহাস করিতে আইসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা পালন করিতে সম্মত আছ কি না ?"

বিমলা দুঃখের স্বর ত্যাগ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।"

শ। "প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক,—আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি না ?"

বি। "জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।"

শ। "আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে বল প্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।"

বি। "আমার পিতা থাকিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার অবর্ত্তমানে, রক্ষাকর্ত্তার অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় অবলার উপর অত্যাচার করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।"

শ। "আমি বালিকার নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিখিতে আইসি নাই।"

বি। "তথাপি আমার কথা অবধারণা কর। দেখ আমার পিতা তোমাকে কত অনুগ্রহ করেন ;—তোমাকে দারিদ্রাবস্থা হইতে পুত্রের মত লালন পালন করিয়াছেন ; তোমাকে অদ্যাপি পুত্রের মত যত্ন করেন। তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যাচার করা তোমার বিধেয় নহে।"

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দারিদ্রাবস্থার কথা শ্রবণে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন

"তোমার পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন সে আমার অনুগ্রহে।"

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আরক্ত নয়নে কহিলেন,

"পামর,তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমি আবার তাঁহাকে তিরস্কার কর। কুক্ষণে ভৃত্যের বেশে এই দুর্গে আসিয়াছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ। ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।"

শ। "কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ জান ?—তোমার জীবন মরণ, তোমার পিতার জীবন মরণ আমার হস্তে তাহা জান ?"

বি। "জানি,—সতীশচন্দ্রের কন্যা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ পুত্র অন্নের জন্য পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।"

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় কোপে ধক্২ করিয়া জ্বলিতেছিল,—আলুলায়িত কেশ কপোলে ও উন্নত বক্ষস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা কথঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিলেন ও ধীরে২ বলিলেন,

"আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি আমি জানি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আছি। তোমাকে যে ভৎর্সনা করিলাম সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া,পিতৃ নিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না,—আমার নিকট পিতার নিন্দা করিওনা।"

শ। “আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আইসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার উত্তর কি?”

বি। “আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।”

শ। “বিমলা তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ দুঃখ, প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিতেছ;—বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ম্মে যখন দৃঢ়ব্রত হইয়াছি, জগৎ সংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি;—কিন্তু আর পারিবে না। অদ্যই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে,—আমি এতক্ষণ তোমাকে বলি নাই, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। পুরোহিত নীচে অপেক্ষা করিতেছেন, দিনের মধ্যে অন্য সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিতে আমাদিগের বিবাহ দিবেন। বিমলা, তুমি বুদ্ধিমতী, বিবেচনা করিয়া দেখ আর বাধা দেওয়া নিরর্থক। তুমি বাধা দিলেই বল প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কিজন্য আপত্তি কর, আইস দুই জনে নীচে যাই।”

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। কালসর্পে দংশন করিলেও এত চমকিত হইতেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অজ্ঞানের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,

“পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।”

শ। “তোমার পিতা মুঙ্গেরে, তোমার বৃথা প্রার্থনা।”

বি। “তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।” এই বলিয়া বিমলা হস্ত জোড় করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে; নয়ন দুটী জলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জ্বলিতেছে; কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে, উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,

“জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।”

সে আকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এক দৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা ধীরে২ তাঁহাকে বলিলেন,

“শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাপ করিয়াছ অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতা স্বরূপ, আমি তোমার ভগিনী স্বরূপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপ,—আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।”

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাপীর হৃদয় কম্পিত না হয়,—শকুনি আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল;

“হতভাগিনি! নির্ব্বোধ! দেখিব কে তোর সহায় হয়,” এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কক্ষ হইতে বাহির করিবার উপক্রম করিল।

বিমলা উত্তর করিলেন,

"পামর, নরাধম! এই বিপত্তিকালে ভগবান আমার সহায় হইবেন," এই বলিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন, গত তিন দিন চিন্তা করিয়া যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিলেন। বস্ত্রের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন, নবজাত সূর্য্য রশ্মিতে সে ছুরিকা ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল। ভীরু শকুনি বিস্মিত হইয়া আট হস্ত দূরে যাইয়া দাঁড়াইল।

বিমলা গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,

"আমি এই পণ করিলাম, যদি তুমি বা অন্য কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার চেষ্টা কর,—সেই মানসে যদি এই কক্ষের ভিতর প্রবেশ কর, তাহা হইলে আমি আপন বক্ষস্থল এই ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া একেবারে সকল কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ বলহীনা, কিন্তু এ পণ হইতে আমাকে কে বিরত করিতে পারে দেখিব।"

শকুনি ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন "এ বাঘিনীর হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেরূপ উদ্যোগ করিলে, হঠাৎ হত্যাকাণ্ড হইতে পারে। থাক্, অদ্য থাক্,—নিদ্রাযোগে বিমলাকে বশ করা অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, তাহার পর আর এক দিনও শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিব না, অদ্য পরিত্রাণ পাইল, কল্য পরিত্রাণ পাইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিতে২ শকুনি ধীরে২ চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

And shall my life in one sad tenour run,
And end in sorrow as it first begun.

Pope.

সকল স্থির হইল। বিমলাকে অদ্য না হয় কল্য বিবাহ করিবেন, কিন্তু মহাশ্বেতার মুখ কিরূপে রুদ্ধ করা যায়। শকুনি তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। সরলাকেও বিবাহ করিবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহার পর মহাশ্বেতা ভীষণ ক্রোধপরবশ হইলেও আপন জামতার উপর প্রতিহিংসা লইয়া আপন একমাত্র কন্যাকে বিধবা করিতে সাহস করিবেন না।

এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মহাশ্বেতা ক্রোধে অন্ধ হইলেন, কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার ক্রোধ করা বৃথা। সরলা ভয়ে অস্থির হইল, কিন্তু শকুনি যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যথা করা কখনও কাহারও সাধ্য ছিল না। বিমলার পরামর্শানুসারে সরলা কিছু দিনের অবসর চাহিল,—যে পূর্ণিমা তিথিতে প্রেমদাসের সহিত পুনরায় মিলন হইবার ভরসা ছিল, সেই দিন পর্য্যন্ত অবসর চাহিল। শকুনির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, মনে২ ভাবিলেন যত বিলম্ব হউক না কেন, সিংহ হস্ত হইতে মেষ শাবকের উদ্ধারের উপায় বা সম্ভাবনা নাই।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিমলা গোপনে মহাশ্বেতা ও সরলার নিকট বিদায় লইয়া ছদ্মবেশে এক খানি নৌকায় আরোহণ করিলেন, সে নৌকা মুঙ্গেরাভিমুখে যাইতেছিল। দুর্গের অতি গুপ্ত স্থান হইতে কতকগুলি কাগজাদি লইয়া যাইলেন, শকুনির জীবন মরণ তাহার উপর নির্ভর করিত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী বিমলা মুঙ্গেরনিবাসী পুরুষ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া অন্য যাত্রীদিগের সহিত যাইয়া মিশিলেন।

আকাশ অন্ধকারময়, যত দূর দৃষ্ট হয় সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধূ ধূ করিতেছে, রাশি২ মেঘ সেই নীল জলে প্রতিফলিত হইতেছে, অল্প বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও ফেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কলং শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও বা অভ্রকানন, নিশাচর শ্রেণীর ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ও বায়ুতে গম্ভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা যতদূর দেখা যায় শুভ্র বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে,—নৌকা কলং শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাৎভাগে বসিয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে২ হৃদয়ে যে কত চিন্তা আবির্ভাব হইতে লাগিল কে বলিবে। ছয় বৎসর কাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, যথায় বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কূল আছে, বিমলা কি সেই কূল পাইবেন, আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন,—সে দুর্গ কি আর কখন দেখিতে পাইবেন? এইরূপ সহস্র চিন্তাতরঙ্গে বিমলার নারী-হৃদয় প্রতিহত হইতে লাগিল।

যিনি কখন অনেক দিনের জন্য দেশত্যাগী হইবার মানসে যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, নিরীক্ষণ করিতে২ একেবারে সহস্র সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করিয়াছেন, সহস্র চিন্তায় অভিভূত হইয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে, সজল নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অল্প বয়সে সহায়হীন, বন্ধুহীন প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তিনিই বিমলার সে রাত্রির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একাকী নৌকার পশ্চাৎভাগে বসিয়া সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে দেখিতে লাগিলেন। জলের কলং শব্দ শুনিতে ছিলেন না, অভ্রকাননের গম্ভীর শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও ফেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, ঘোর মেঘের ছটা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ দেখিতেছিলেন, আর সহস্র গভীর চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর স্রোত যেরূপ অবারিত, সে চিন্তাস্রোত সেইরূপ অনন্ত ও অবারিত। ভাবিতে২ বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরান্তঃকরণ অদ্য দ্রবীভূত হইতে লাগিল,—যখন চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল দুর্ভেদ্য তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, অনেক শোক, অনেক আঘাত না হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসহ

অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয় না;—এতক্ষণ ও এত অধিক ক্রন্দন করিলেন যে তাঁহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া হস্তদ্বয় ও বক্ষস্থল একেবারে সিক্ত হইয়া গেল।

হা সংসার! হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে বিমলার ন্যায় কত উন্নত চরিত্রা ধর্ম্মপরায়ণা অভাগিনী অন্ধকারে একাকী বসিয়া দিনং রোদন করিতেছে, সে রোদন কেহ দেখে না, কেহ শুনে না, কেহ জানে না, সে রোদন অলক্ষিত, অবারিত অশান্তিপ্রদ! কত নির্ম্মল চরিত্রা অনাথার জীবন জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল শোক দুঃখে পরিপূর্ণ, সে দুঃখ কেহ জানে না, যদি জানে তবে মোচন করে না। সে দুঃখিনীর সমদুঃখিনী কেহ হয় না, কেবল অকূল নদীর জল কলং শব্দে ও অনন্ত অরণ্যকানন মর্ম্মর শব্দে সে দুঃখের জন্য রোদন করে। হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে কত পাপীষ্ঠ, পাপপরায়ণ ধনে মানে গৌরবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, লোকের প্রশংসাভাজন হইতেছে। যদি আমাদের ইচ্ছাধীন হইত, কে এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিত?

বিমলা যে নিরাপদে মুঙ্গের পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। যে দিন পঁহুছেন সেই দিনই প্রেমদাসের প্রাণ রক্ষা করেন। তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়-বিবাহ*।

অস্মৎ সমাজে যে সমস্ত দূষ্য প্রথা প্রচলিত আছে, বোধ হয় তাহার মধ্যে বর্ত্তমান বিবাহ প্রথা একটী প্রধান। এই প্রথা এত দূষ্য, যে ইহা প্রচলিত থাকায় শত শত মনুষ্যের প্রতিক্ষণ অসহ্য ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। যে মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রথমে সমাজে এই প্রথার প্রচলন হয়, এক্ষণে তাহার প্রতি আর কেহ দৃষ্টি রাখেন না। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ একত্র করিবার উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত?—কে না বলিবে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ, দাম্পত্য-সুখ ও সন্তান-লাভ সুখের ন্যায্যমত অংশ ভোগ করিতে পারিবে, এবং সেই উৎপাদিত সন্তানগণ উচিত মত প্রতিপালিত হইবে, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এরূপ হয়, তবে সমাজ প্রচলিত বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারে না। কেননা বিবাহই যদি দাম্পত্য ও পিতৃত্ব-সুখ সম্ভোগের এক মাত্র সু-কর ও সাধুসম্মত উপায় হয়, তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহা হইলে সমাজের অনেকেই মানব-জীবনের ঐ দুই প্রধান সুখে বঞ্চিত থাকিবে। কেননা বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমাজে অধিক হইলেও, এমন অনেক লোক থাকিবে, যাহাদের নানা কারণে বিবাহ ঘটে না; সুতরাং হয়

* এই প্রস্তাবের সকল মত আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে।

তাহারা ঐ দুই প্রধান সুখে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে; না হয় তাহাদিগকে কঠিন সমাজের বিরুদ্ধ অন্য কোন উপায়ে ঐ সুখ ভোগ করিতে হইবে। তাহাতেও অসুখ ও অসুবিধা বিস্তর। অতএব যে প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকাতে, এক সম্প্রদায়ে সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, আর অপর এক সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন লজ্জাভয় অপমান প্রভৃতি কঠোর মানসিক যন্ত্রণা ও নানাবিধ কায়িক ক্লেশ ও অসুখ ভোগ করে, সে প্রথাকে কখনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সাধুসম্মত বলা যাইতে পারে না।

বিবাহরূপ দুষণীয় প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকাতে, মনুষ্যকে যে অনন্ত দুঃখসাগরে সর্ব্বদা নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে, উপরোক্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণাদি তাহার উপরে দুই একটী জলবিন্দু মাত্র। যাহা হউক আমরা আপাততঃ অপর সকল কথা বিস্মৃত হইয়া বঙ্গীয় বিবাহকে সাধুসম্মত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখি, সমাজে তাহাতে কতদূর সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গ সমাজ প্রচলিত দাম্পত্য বিষয়ক নীতি-নিয়মাবলী অনেক স্থলে ভ্রমসংকুল। এই নীতি-নিয়মেই, বিবাহ ব্যতীত দাম্পত্য সুখভোগকে দুষ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছে। এইরূপ নয় বেদীরা কহিয়া থাকেন, যে বিবাহ দম্পতীকে আজীবন বাঁধিয়া রাখিবে, —আজীবন ভার বহন করিতে হইবে, —উভয়েই অপর কোন রূপে দম্পতীসুখ ভোগ করিতে পারিবে না, এবং আজীবন কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এইটী সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বঙ্গ সমাজে ইহার আবার বিচিত্র প্রকার ভেদ আছে। যদিও বিবাহ দ্বারা উভয়েরই পক্ষে অন্য কোন উপায়ে দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ নিষিদ্ধ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, বঙ্গ-সমাজে এই নিয়ম বলসহকারে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই কঠিন ভাবে প্রযুক্ত দেখা যায়, পুরুষের পক্ষে তত নহে। পুরুষের অন্য কোন প্রকারে দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিলে তত দোষ পড়ে না। আবার আজীবন কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না;—এমন কি দম্পতীর মধ্যে একজন যদি ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে অপর জন পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহারও বিচিত্র প্রকার ভেদ আছে;—স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয়, তবে পুরুষ, স্ত্রীর ইচ্ছা না হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; অর্থাৎ স্ত্রীর ইচ্ছা হইলে সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিতে পারিবে। এ বড় বিচিত্র নিয়ম। ব্যভিচার উভয়েরই পক্ষে সমান দোষাবহ। তবে যে একের প্রতি এত পীড়াপড়ী, অন্যের প্রতি তত নহে, তাহার কারণ কি? ইহা অপেক্ষা অধিক হাস্যজনক নীতি-নিয়ম আর কি হইতে পারে? ইহাতে যে স্ত্রীপুরুষ অখণ্ডনীয় বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের শুদ্ধ যে অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ও অসুখ বৃদ্ধি হয়, এমত নহে; তাহাতে স্ত্রীপুরুষ, উভয়েরই মানসিক স্বাধীনতা এবং অধিক পরিমাণে কায়িক স্বাধীনতাও লোপ পায়। বঙ্গ সমাজের বিবাহের নিয়ম কি কঠিন? কতদূর দূষ্য? অবিচলিত প্রণয় ও অনন্যানুরাগই কেবল বিশুদ্ধ, বাঞ্ছনীয় ও সাধুসম্মত, এবং তাহাই নীতি-সঙ্গত, সাধারণের মনে এই মতের প্রতি বিশ্বাস হইতেই এতা-

দৃশ কঠিন ও অশুভকর নিয়মাবলী সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত মত প্রায় দেখা যায় না। লোকে যখন ঐরূপ মত প্রকাশ করে, ও তাহাতে বিশ্বাস করে, তখন তাহারা ইহা ভাবিয়া দেখে না, যে মনুষ্যের অপর সমস্ত মনোবৃত্তির ন্যায় প্রণয়ও পরিবর্ত্তনশীল। যত নব নব বস্তুর সঙ্গে মিলন হয়, ততই প্রণয়ের বল ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইটী প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং একাদিক্রমে এক প্রণালীতে প্রণয়স্রোতঃ প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা, কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা মাত্র। যে সময়ে ইন্দ্রিয় সকল প্রবলতম হইয়া উঠে, এবং মন সতেজ ও সুখের পথে প্রধাবিত হইতে থাকে, সেই যৌবনে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে ও নূতনের প্রতি অভিলাষ হয়। ইহা স্বভাবের অভিপ্রায়—প্রকৃতির আজ্ঞা ও নিয়ম—যে আমরা নানা অবস্থাতে পতিত হইয়া নানা বিষয়িণী বহুদর্শীতা লাভ করিব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের নানা ক্ষমতা ও শক্তি ব্যক্ত ও পরিচালিত হইবে। প্রণয়-সুখ সম্বন্ধেও তাই। সুতরাং যৌবনে কাহাকে তাদৃশ কার্য্য করিতে দেখিলে, তাহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া দোষ দেওয়া, অথবা মহাপাপী বা দুরাচার বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করা, আর স্বভাবের অপেক্ষা আমি অধিকতর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রকাশ করা, দুই সমান। যৌবনের প্রারম্ভে, যখন ইন্দ্রিয় সকল নব নব তেজঃ ধারণ করিতে থাকে, তখন কোন যুবা পুরুষ ও স্ত্রীকে নিবারন না করিলে, অথবা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিলে, নিশ্চয়ই তাহারা প্রথম যে সামান্যরূপ সুশ্রী স্ত্রী বা পুরুষ দেখিবে, তাহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রণয়াসক্ত হইবে। যদি এইরূপ দম্পতী তখনই অখণ্ডনীয় বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হয়, তবে প্রায় শতকরা দশ জন ব্যতীত, আর সকলকেই তজ্জন্য অনুতাপ করিতে দেখা যাইবে। আবার আমাদের মত যাহাদিগকে বিবাহ করিতে হয়, অর্থাৎ যাঁহাদের বিবাহ বিষয়ে কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কেননা হইতে পারে, দুই চারি দিন স্ত্রীর যৌবন-সুলভ রূপে মন আকৃষ্ট হইয়া রহিল; কিন্তু অতি শীঘ্রই বঙ্গ দম্পতীকে আর তাদৃশ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। উভয়েই অথবা পুরুষই শীঘ্র স্বীয় রমণীর প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠেন, এবং অন্য উপায়ে প্রণয় সুখ সম্ভোগের চেষ্টা দেখেন ও আকাঙ্ক্ষা করেন। এরূপ অবস্থায় প্রণয় বিষয়িণী বহুদর্শীতা না জন্মিলে, কিরূপে সেই স্ত্রী বা পুরুষ নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, যে ব্যক্তির প্রণয়ে সে এক্ষণে মুগ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই প্রণয়ে চিরকাল সেইরূপ মুগ্ধ থাকিবে,—আর কখন তদপেক্ষা অধিকতর প্রিয়দর্শন এবং একান্তঃকরণ কোন ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। যাহারা পৃথিবীর লোকের চরিত্র ও মন চিনিবার জন্য কিছু মাত্র শক্ত হয় নাই,—এমন কি নিজের স্বভাবও সম্যক্ রূপে অবগত হইতে, বুঝিতে পারে নাই—তাহারা চিরকালের জন্য বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলে পরিণামে কত অসংখ্য অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা, ভাবিয়া দেখ।

যে সমাজে লোকে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পায়, সেই সমাজেই যুবা অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা সচরাচর ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে। তখন বিবেচনা কর, যে হতভাগ্য বঙ্গ সমাজে বিবাহের নিয়ম এরূপ, যে বর কন্যা বিবাহের অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত (সেই সময়েও চকিতের ন্যায় বই) কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না, সেই সমাজের লোকের কত না যন্ত্রণা হইবে। তাহারা লজ্জায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাদিগকে সে ভাব প্রকাশ করিবার অবকাশও দেওয়া হয় না;—দিলেও, হয়ত তাহাদের প্রণয় বিষয়িণী বহুদর্শীতা জন্মে নাই, সুতরাং সে স্থলে আমাদের সুখের নিমিত্ত সর্ব্ব-প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়, উপযুক্তদম্পাতী নির্ব্বাচনের ক্ষমতাই জন্মেই নাই;—এরূপ স্থলে অবিচ্ছেদ্য বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলে, যে ভবিষ্যতে অশেষ দুঃখে ও যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অন্যান্য অনেক সমাজে বরং লোকে পরস্পর বাহ্যিক ভাবাদি অবগত হইতে পারে, বাহ্য গুণপণাদিও দেখিতে পায়; কিন্তু দুর্ভাগা বঙ্গ সমাজে তাহারও উপায় নাই। তুমি বিবাহ করিয়া দাম্পত্য নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে সক্ষম হও আর অক্ষম হও; তোমার স্ত্রী বা স্বামী যে হইবে, তাহার তুমি উপযুক্ত দাম্পত্য সহচর হও আর না হও;—তোমার কর্ত্তৃপক্ষী-য়ের ইচ্ছা হইল যে তুমি বিবাহ করিবে,—পাত্র বা কন্যা অন্বেষিত হইল; তুমি কেবল কাণে মাত্র শুনিলে যে অমুক স্থানে অমুকের বাটীতে তোমার বিবাহ হইবে; বিবাহের পূর্ব্বে তোমার যে চিরসহচর হইবে, তাহার এই মাত্র পরিচয় পাইলে; বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, তুমি চিরকালের নিমিত্ত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলে, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলে, কিন্তু কথাটী কহিতে পারিলে না!! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনে-কেরই বিবাহে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা না। হইবারই অধিক সম্ভাবনা। কেননা এরূপ বিবাহ একপ্রকার রহস্য মাত্র। প্রতিজ্ঞা করিয়া লোকে অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা কিরূপে ভঙ্গ করিতে হয়, বিবাহে তাহাই শিক্ষা দেয়। আজীবন প্রণয় রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার অনেকস্থলে স্ত্রী বা পুরু-ষের ক্ষমতা থাকে না। আবার স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর দাসীবৎ আজ্ঞাবহা হইবার যে নিয়ম, তাহা আরও লজ্জাকর। সেই লজ্জাকর নিয়ম হইতেই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ও অসাধু ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই অত্যাচার ও অসাধুব্যবহার অসহ্য হইলেও স্ত্রী পুরুষ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। কেন পারে না? তাহা হইলে স্ত্রীর পেটের ভাত জুটিবে না। এ বিষয়ের অনেক কথা আমরা বিষয়ান্তরে বলিয়াছি; অতএব এখানে বিস্তারের প্রয়োজনাভাব। বিবাহের এই অখণ্ডনীয়ত্ব (অর্থাৎ ইচ্ছা ও নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও অবাধে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর পৃথক্ হইবার উপায় অভাব),—এবং অপরিচিতের সহিত বিবাহ ঘটনা বঙ্গীয় বিবাহের এই দুই প্রধান কলঙ্কই অসংখ্য ক্লেশের কারণ। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ও জানেন যে অনেক সময়ে স্বামী স্ত্রীকে অসহ্য প্রহার করিয়া (অনেক স্থলে

তাহার পরিণাম স্বরূপ স্ত্রীহত্যা ঘটিয়া) থাকে ; তাহার কেবল একমাত্র কারণ বিবাহের অখণ্ডনীয়ত্ব। যে নিয়ম দীর্ঘকালের নিমিত্ত দুই জন মনুষ্যকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধিয়া রাখে, সে নিয়ম যে অশেষ দোষের ক্লেশের আকর হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বাস্তবিক ইহা অতি ভয়ানক ও শোচনীয় ব্যাপার যে, যে দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি অনুরাগ নাই—এমন কি পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা জন্মিয়াছে,তাহারা বিবাহনিগড়ে বদ্ধ থাকিবে! যে স্থলে প্রণয় সূত্রের কোমল বন্ধন আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, সে স্থলে কঠিন, কর্কশ, দুর্ভেদ্য বন্ধন! ইহা অপেক্ষা প্রণয়ের প্রতি বিদ্রূপ, ও স্ত্রী পুরুষের স্বাধীনতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্য, আর কিরূপে করা যাইতে পারে? যাঁহারা এই কঠিন অভেদ্য বিবাহ নিয়মের পক্ষপাতী, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, যে এরূপ স্থলে স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ হওয়া কদাচ উচিত নহে; কেননা, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের সুখের জন্য, তাঁহাদের সন্তানগণের (যদি হইয়া থাকে), তবে মহা কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, যে পিতামাতার চিত্ত পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, ও অপ্রণয় বশতঃ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, সেই পিতামাতার নিকট থাকা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। উদাহরণের বোধ হয় অসদ্ভাব নাই। ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলেই অনেক বঙ্গপরিবার মধ্যেই কত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং সেরূপ স্থলে সকল পক্ষেরই মঙ্গলের নিমিত্ত দম্পতীর পার্থক্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় ও শ্রেয়স্কর। ইয়ুরোপ খণ্ডের অনেক ভাগে (যেমন জর্ম্মানি) এই উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত। বঙ্গ সমাজে এই নিয়ম প্রচলিত হইলে যে অশেষ শুভকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ পরাধীন ও তাহাদের মানসিক নিস্তেজতা সাধন করিবার প্রধান কারণ বিবাহ। কেননা এই অতীব দুষ্য নিয়মেই স্ত্রীলোককে স্বীয় ভরণপোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন করিয়া রাখিয়াছে;—এই নিয়মেই শিক্ষা দিয়াছে ও দিতেছে যে, স্ত্রীলোক কেবল পুরুষের অধীনে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করিবে ও সন্তান মানুষ করিবে। এই বিশ্বাস স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও মানসিক গুণনিচয়ের বিলোপকারী এবং সমাজের উন্নতিরও প্রতিরোধক। এই নিয়মই পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি অসাধু ব্যবহার ও দাম্পত্য-নিয়ম ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়াছে, আর স্ত্রীলোক তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহার প্রতি সমধিক কঠিন দণ্ড দিবার বিধি করিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কোন পুরুষ ব্যভিচার করিলে, তাহার "সুখ" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক সেরূপ আচরণ করিলে মহাদোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বিবাহের পূর্ব্বে সেই কার্য্য কৃত হইলে ত একবারে সর্ব্বনাশ,—তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক কুলকলঙ্কিনী প্রভৃতি কত মিষ্ট আখ্যা পাইয়া থাকে, এবং তাহার এ প্রকার দুর্ণাম রটনা হয় যে চিরকালের জন্য তাহার সুখ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর কোন রূপে বিবাহ হওয়া ভার হয়। লোকে

গৃহ ধন প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রীকে এক প্রকার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। সেই সম্পত্তি অন্য কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই;—এবং সেই সম্পত্তিরও স্বীয় প্রভু বা স্বামী ভিন্ন (ইচ্ছা হইলেও) অন্য কাহারও ভাবনা করিবার অধিকার নাই; যদি ভাবে (ভাবনা হইবারই অধিক সম্ভাবনা), তবে প্রকাশ হইলে বড় দোষ; সে দোষের, সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে বিধি নাই।

আবার এরূপ অনেক পীড়াদি আছে, যাহা আরোগ্য করণে দাম্পত্যসুখ একটী সর্ব্ব প্রধান উপায়। সুতরাং সেরূপ স্থলে যদি কেবল বিবাহ দ্বারা সেই সুখ লাভ করিয়া পীড়া নিবারণ করিতে হয়, তবে অনেক স্থলে ব্যাধি আরাম না হইবার সম্ভাবনা। কারণ সে স্থলে বিবাহ দ্বারা সহজে সে সুখ লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ সেরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অখণ্ডনীয় বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নীতি সঙ্গত বিবেচনা করিলেও, অনেকের সে সময়ে বিবাহে স্পৃহা—অনেকের ক্ষমতা থাকে না, ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং অসংখ্য অনন্যোপায় ব্যাধি নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি ও প্রশ্রয় পাইতে থাকে, তাহাতে যে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি হইয়া থাকে, তাহা এ বিষয়ের যাঁহারা সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁহারাই জানেন। বিবাহ ব্যতীত দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ নীতি বিরুদ্ধ,—এই মহাভ্রান্ত অতীব দূষ্য নিয়ম সমাজে প্রচলিত থাকাতেই যে কত মহানর্থ ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনুমান করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ বিবাহপ্রথার দোষ কীর্ত্তন করা গেল। এক্ষণে বঙ্গ সমাজ সম্পর্কীয় তদ্বিষয়ক বিশেষ কথার অলোচনা করা যাইতেছে। অখণ্ডনীয় বিবাহপ্রথা দূষ্য হইলেও, আমরা এ স্থলে আপাততঃ ভাল বলিয়া জ্ঞান করিব। মনে কর বিবাহ প্রথা উৎকৃষ্ট, তা বলিয়া কি বঙ্গসমাজে যেরূপ প্রথা চলিত আছে, তাহাকে উৎকৃষ্ট বলা যাইবে? উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের বিবেচনায় তাদৃশ কুৎসিত ও দূষ্য প্রথা বোধ হয়, আর কোন দেশে প্রচলিত নাই।

১। আদৌ দেখ বাল্য বিবাহ।—এই কুৎসিত প্রথা দেশে প্রচলিত থাকাতে যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা একবার চিন্তাশীল চিত্তে আপনার চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। একে ত বাঙ্গালীর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য; শুদ্ধ সেই কারণেই কত অসংখ্য অশুভ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাতে আবার শৈশবাবস্থায় কোন বালক বালিকাকে এরূপ চিরনিগড়বদ্ধ করিলে যে ভবিষ্যতে কত অসংখ্য যন্ত্রণা লাভ করিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বিষয়রূপ বিবাহ-ব্যাপারে বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যখন ইচ্ছা এবং যাহার সঙ্গে ইচ্ছা, যোজনা করিয়া দিয়া থাকেন। যখন বয়স অপেক্ষাকৃত তরুণভাব প্রাপ্ত হইলে, নিজে চক্ষে দেখিয়া জীবন সহচর বা সহচরী খুজিয়া লইলে, অনেক স্থলে ভবিষ্যতে অনুতপ্ত ও যন্ত্রণা দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অবিচ্ছেদ্য বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার,

তখন যে অতি শৈশবাবস্থায় অপরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোন সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত সংযোজিত হওয়া কতদূর দূষ্য ও গর্হিত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। মনে কর সাত বা আট বৎসর বয়স্কা কোন বালিকার সঙ্গে দশ বা একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল। ইহাঁরা বাঙ্গালী দম্পতী, আর কখন ইহাঁদের আজীবন পৃথক্ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে এক জনের নির্ব্বুদ্ধিতা, কার্কশ্য নির্দ্দয়তা অথবা অননুরাগের জন্য, অপরকে আজীবন মানসিক ও কায়িক অসহ্য যন্ত্রণা পরম্পরা সহ্য করিতে হইলেও, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এইরূপ বিবাহনিগড় তাঁহারা পায়ে পরিলেন। যখন পরিণত বয়স্ক লোকেরাই অনেক স্থলে লোক চিনিতে পারেন না, তখন যে যথেচ্ছ সংযোজিত বালক বালিকারা পরে একান্তঃকরণ হইয়া সুখে কাল কাটাইবে, এ কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? তাঁহাদের পিতামাতা কিছু সর্ব্বজ্ঞ নহেন। বিশেষতঃ যে বয়সে ঐ বালক বালিকা সংযোজিত হইল, সে বয়সে, তাহারা ভবিষ্যতে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া উঠিবে, তাহা জানিবারও কিছু মাত্র উপায় বা চিহ্ন লক্ষিত হয় না। সুতরাং যে দম্পতীর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব বিষয়ে সমান্তঃকরণ হওয়া উচিত ও সকলের আকাঙ্ক্ষিত, সেই দম্পতীরই ভবিষ্যতে (যখন বয়োবৃদ্ধির সহ তাহাদের রুচি ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ মনোবৃত্তি সকল সতেজ ও প্রবুদ্ধ হইতে থাকে, তখন) সম্পূর্ণ বিষমান্তঃকরণ হওয়া সবিশেষ সম্ভব। অতএব এরূপ স্থলে যে বিবাহ বন্ধন অখণ্ডনীয় হইবে, তাহা কখনই স্বভাবের অভিপ্রায়ানুরূপ ও জ্ঞানযুক্তি সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ বিবাহে বিবাহকারীদিগের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, সুতরাং যে পিতামাতা স্বেচ্ছাবশতঃ তাঁহাদের সন্তানের মানসিক স্বাধীনতা (বিশেষতঃ বিবাহরূপ গুরুতর বিষয়ে) লোপ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মনীতির নিয়মানুসারে ও স্বভাবের মতে নিন্দনীয়। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমরা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। তৃতীয়তঃ, এইরূপ বিবাহে পিতামাতা সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না। অনেক স্থলে তাঁহারা অপাতসুখকর (কিন্তু পরিণাম বিষময়) বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কন্যার পিতা স্বীয় দুহিতা সুখে থাকিবে কি না (সে সুখ সচ্ছন্দে অশন বসন লাভ), বৈবাহিকের বিষয় বিভব কিরূপ, ইত্যাদি দেখিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। যিনি আজি কালি বড় দেখিলেন, তিনি না হয় ছেলেটী পড়া শুনা করিতেছে কি না, কি "পাস" করিয়াছে, তাহা দেখিলেন। অনেক স্থলে বিষয় বিভবের অনুরোধে যে তাহাও দেখা হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। আর বরকর্ত্তা, যাঁহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিবেন, তাঁহার কয়টী কন্যা, অন্য সন্তানাদি আছে কি না, বিষয় বিভব কিরূপ, বিবাহ দিলে বৈবাহিক স্বীয় পুত্রের মুরুব্বি হইতে পারিবেন কি না ও ভবিষ্যতে চাকুরির যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন কি না, এই সকল বিষয়ই দেখেন। যিনি বড় অধিক দেখিলেন, তিনি না হয়, পাত্রী কিরূপ সুশ্রী, তাহাও তাহার সঙ্গে দেখি-

লেন। কিন্তু অনেকে টাকার রূপ দেখিয়া যে পাত্রীর রূপ দেখিতে ভুলিয়া যান, তাহাও বলা বাহুল্য। আমরা অবগত আছি যে, আমাদের পরিচিত কোন লোকের বিবাহ বিষয়ে এইরূপ সংস্কার ও নিয়ম ছিল, তিনি নিজে সেই রূপ কার্য্য করিতেন ও আত্মীয় স্বজনগণকেও তদনুরূপ করিতে উপদেশ দিতেন,—তাঁহার মতে পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে এই রূপ ঘরে দিতে হইবে,—বৈবাহিক ধনী লোক হইবেন, পুত্রের মুরুব্বি হইতে পারিবেন, এবং তাঁহার একটী মাত্র কন্যা বই অন্য সন্তান সন্ততি থাকিবে না। যেখানে লোকের মনে বিবাহের এরূপ অভিপ্রায় দৃঢ়বদ্ধ, সেখানে বিবাহ যে কত দূর লজ্জাকর ব্যাপার, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ।—এরূপ বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজের আর অধিক কলঙ্ক কি হইতে পারে? এই রূপ বিবাহে কয়েকটী অতীব গুরুতর এবং সবিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে, উপেক্ষা করিয়া দৃষ্টি করা হয় না। (১ম) বর ও কন্যার প্রকৃতি। বিবাহ বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের বনিয়া উঠিবে কি না;—তাহাদের মনের ভাব এক প্রকার কি না, ইহা দেখা হয় না। স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বতোভাবে একান্তঃকরণ হইবে, ইহা সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে, এবং ইহা হইলে সকলেরই সুখের বিষয় হয়। যাহাদের এরূপ হওয়া বিধেয়, তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকৃতির লোক হইলে, কত না যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। (২য়) তাহাদের শারীরিক বল। বর কন্যার উপযুক্ত সহচর, এবং কন্যা বরের উপযুক্ত সঙ্গিনী হইবার পাত্র কি না,—তাহাদের উভয়ের শারীরিক বল এক প্রকার কি না, ইহাও কেহ বিচার করিয়া দেখে না। সুতরাং অনেক স্থলে অতি রুগ্নশরীর নিস্তেজ পুরুষের সহিত অতি স্থূলকায়া বলশালিনী কন্যার সংঘটন হইয়া থাকে; সে সংঘটনে স্বভাবের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় না,—বিবাহের উদ্দেশ্য সম্যক্ চরিতার্থ হয় না,—উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি জন্মে না; সুতরাং অনেক স্থলে মহা অসুখ ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। সে বিবাহের ফল স্বরূপ রুগ্ন ও অল্পায়ুঃ সন্তান সচরাচরই থাকে। (৩য়) বয়ঃসাম্য। অনেক স্থলে বিবাহ বিষম-বয়স্কের সহিতই ঘটনা হইয়া থাকে। উভয় বর ও কন্যা শিশু হইলেই যে তাহাকে বাল্য বিবাহ বলা যায়, এরূপ নহে। এরূপ অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে, যে অর্থলোভ প্রভৃতি কারণের জন্য অতি বয়স্কের সঙ্গে অল্প বয়স্কা কিশোরীর বিবাহ ঘটনা হইয়া থাকে; তাহাকেও বাল্য বিবাহ বলিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, বর কন্যার মধ্যে উভয়ে অথবা এক জন বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া বিবাহ করিলেই তাহাকে বাল্যবিবাহ বলা যায়। আমাদের দেশে বৃদ্ধা কন্যার সহ শিশু বরের বিবাহ প্রায় ঘটেনা বটে; কিন্তু বৃদ্ধ বরের সঙ্গে শিশু কুমারীর বিবাহ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ও দূষ্য প্রথা আর নাই। এরূপ বিষম বয়স্কের সহিত বিবাহ ঘটনা হইলে, সে স্থানে যে কখনই প্রণয় স্থাপনা হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং এই কুরীতি বঙ্গ সমাজের মহা কলঙ্ক বিবেচনা করিতে হইবে। বিবাহে প্রণয় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারিবে বলিয়া, বর কন্যার বয়সে সম্ভ-

বতঃ যত অল্প প্রভেদ হয়, ততই শুভকর। তাহাতে অনেক স্বাভাবিক নিয়ম সুচারু প্রতিপালিত হয়, এবং সম বয়স্কের সহিত যত শীঘ্র সুখের মিলন ও প্রণয় বদ্ধমূল হয়, এমত আর কোথাও হইতে পারে না। বিষম বয়স্কের সহিত সংঘটন হইলে, এক জনের মনে ভয়, আর অপর জনের মনে অসম্ভব প্রণয় সংস্থাপনের চেষ্টা, সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে। তাহাতে উভয়েরই যথোচিত মানসিক কষ্ট হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? এতদ্দারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, উপরোক্ত তিনটী বিষয়ের কেবল একটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে;—তিনটীর প্রতিই সমভাবে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তাহা করিতে গেলে স্থল বিশেষে আবার একটীর অনুরোধে অপরটীর ব্যত্যয়ও করিতে হইবে। যেমন সকল স্ত্রী বা পুরুষ এক বয়সে কিছু বিবাহ যোগ্য হয় না, কোন কোন স্ত্রীকে এত শীঘ্র যৌবন লক্ষণাক্রান্তা হইতে দেখা যায় যে, তাহার দশ বা একাদশ বর্ষ বয়সেই গর্ভধারণ ক্ষমতা জন্মে; সেরূপ স্ত্রীলোকের বিবাহ দিবার বেলা অবশ্য বয়ঃসাম্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কোন অল্প বয়স্ক বালকের সহিত বিবাহ দিলে চলিবে না। সেখানে উক্ত কন্যার উপযুক্ত কোন বয়োধিক যুবকের সহ যোজনা করাই বিধেয়। এ সকল যুক্তির কথা। সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা, যাঁহাদের উপর বিবাহের ভার থাকে, তাঁহাদের দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা;—তাঁহাদের বিচারক্ষমতার উপরই শুভাশুভ ফল নির্ভর করে। আমাদের কথার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহে বর ও কন্যা যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে পরস্পরের উপযুক্ত সহচর হয়, তাহারই প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গ সমাজে যেরূপ বিবাহ কার্য্য সচরাচর নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা হয় না। তজ্জন্যই আমরা আক্ষেপ করিতেছি। এ স্থলে অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন, তবে কি আমাদের মতে যাঁহাদের অর্দ্ধেক বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইবে, তাঁহারা আর পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না? আমরা তাহা বলি না—আমাদের মত তাহার ঠিক্ বিপরীত। যত দিন দেহে বিশেষরূপ বল থাকিবে, ততদিন কাহারই স্ত্রী বিরহিত হইয়া থাকা উচিত নহে—স্বভাবের অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধান নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। এ বিষয়ের বিচার বিধবা বিবাহের কথা বলিবার বেলা করা যাইবে।

আর এক প্রকার বাল্য বিবাহ আছে। বঙ্গসমাজের বিবাহের নিয়ম এরূপ কঠিন, যে অনেকে বিবাহ করিতে পারেন না,—বিবাহ করিতে গেলে, হয় তাঁহাদের টাকা দিতে হয়, না হয় বিনিময় করিয়া বিবাহ করিতে হয়। টাকা দিয়া বিবাহ করার কথা পশ্চাৎ বলা যাইবে। সম্প্রতি "পরিবর্ত্ত" বিবাহের কথা বলা যাইতেছে। এ বিবাহ কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ প্রথা যে কতদূর দূষ্য, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। হয়ত ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, বিবাহ হয় নাই,—সুযোগ ও ক্ষমতা হয় নাই। তখন অকস্মাৎ এক সুযোগ উপস্থিত হইল—কোন আত্মীয়ের এক কন্যা হইল। এই কন্যা হইতে সব দিক্ রক্ষা

হইবে। কন্যা চলিতে মাত্র শিখিয়াছে কি না সন্দেহ, অমনি অন্য কোন তাদৃশ বৃদ্ধ অকৃতদার পুরুষের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্থির হইল। এই দ্বিতীয় বৃদ্ধেরও অবস্থা তাদৃশ; তাহারও বিবাহ করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তাহার দুই বৎসর বয়স্কা এক ভ্রাতুষ্কন্যা আছে; সেই কন্যার তিনিই রক্ষক। তখনই তিনি সেই কন্যাকে বিনিময় করিয়া প্রথম ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার বয়সের সহিত তুলনা করিলে, সেই নবজাতা কন্যাকে, তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্রী বলিয়া জ্ঞান হয়। কি চমৎকার বিবাহ! কত দূর লজ্জাকর! একবার ভাবিয়া দেখ, দেখিয়া সচেতন হও, আর যাহাতে এরূপ লজ্জাকর ব্যাপারসমূহ চক্ষে দেখিতে না হয়, তাহার উপায় চিন্তা কর।

২। অসাময়িক বিবাহ, বঙ্গীয় বিবাহের দ্বিতীয় দোষ। বিবাহ করিয়া পরিবার পোষণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করাকেই আসাময়িক বিবাহ বলা যাইতেছে। এরূপ বিবাহ অহরহ বঙ্গসমাজে ঘটিতেছে। বাল্য বিবাহকেও এই অসাময়িক বিবাহের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। কেননা সে স্থলে বর উত্তর কালে স্বীয় ও ভার্য্যা পুত্র কন্যা প্রভৃতি ভরণ পোষণ করিতে পারিবে কি না, তাহার কিছু মাত্র বিচার করা হয় না। আবার যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়স্থ হইয়া অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অবর্ত্তমান হেতু, স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া বিবাহ করেন,তাঁহারাও প্রায় পরিবার পোষণের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বসেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এরূপ বাঙ্গালী দম্পতী অতি শীঘ্রই পুত্রমুখ সন্দর্শনে নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন বটে;—কিন্তু যখন বর্ষে২ এক একটী নরকত্রাতা তাঁহাদের গৃহ আলোকময় করিয়া, পুন্নাম নরক পথে কন্টক দিতে থাকে, তেমনই তৎসঙ্গে এই পৃথিবীতেই সাক্ষাৎ নরকাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা এবং মনঃক্লেশ পাইতে হয়। যাঁহারা অস্মৎ সমাজে এরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, (আর তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে), তাঁহারাই জানেন, সে যন্ত্রণা শত শত পুন্নাম নরকের যন্ত্রণা হইতে কত সহস্রগুণে অধিক। এই সকল অপার দুঃখ কেবল সামাজিক দূষ্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার এবং অপরিণামদর্শীতার সাক্ষাৎ ফল। এই কুপ্রথা এতদূর প্রচলিত হইয়াছে, যে বিবাহ করিয়া পরিবার পোষণের ক্ষমতা দূরে থাকুক, বিবাহের জন্য আপাততঃ যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা অভাব সত্ত্বেও অনেকে বিবাহ করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অস্মদ্দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। তাহারা কন্যার বিবাহে টাকা পায়, (অর্থাৎ কন্যা বিক্রয় করে,) আর পুত্রের বিবাহে টাকা দিতে হয়; নতুবা বিবাহ হয় না। এরূপ লোকের মধ্যে যাহারা হীনাবস্থ, তাহাদের বিবাহে স্পৃহা দেখিলে কি বিবেচনা হয়? আশৈশব ৪০।৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়ত কোন নীচকুলজাতা পরস্ত্রীর অবৈধ প্রণয়সুখে অতিবাহিত হইল, পরে যখন মাথার কেশ ধবল ও দন্ত দুই একটী তিরোহিত হইল, তখন মনে প্রগাঢ়

ইচ্ছা হইল, যে 'আইবড়' নাম ঘুচাইতে হইবে। উপায় ?—তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি দুই কুড়া লাখরাজ ভূমি আছে, তাহাই বিক্রয় করিয়া একটী ২।৩ বৎসর বয়সের কন্যা সংগ্রহ করিলেন! কন্যা যৌবন পথে পদার্পণ করিতে না করিতে, হয়ত পুরুষ পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলেন। এরূপে বিবাহ করিয়া একজন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী সরলা বালার গলায় ছুরি দিয়া যাইতে দেখিলে, তাহাকে কি বাতুল বলিয়া বিবেচনা হয় না? যে পিতা মাতা ধনের লোভে কুমারী আত্মজাকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া এরূপে অসুখ সাগরে নিক্ষেপ করে, সে পিতামাতাকে ধিক্। আর যে পামর এরূপ বিবাহ করে তাহাকে শত ধিক্। আর যে সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত, সে সমাজকে শত সহস্র ধিক্। বঙ্গ সমাজ কি আজিও মোহ নিদ্রায় অবস্থিত! প্রতিক্ষণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়াও কি লোকের চৈতন্য হয় না! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!

আবার না হয়, বিবাহ মাত্র করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষমতা আছে বলিয়াই যে নিশ্চিন্তে বিবাহ করিতে পারা যায়, এমত নহে। কেননা বিবেচনা কর, তোমার স্বীয় ও স্বীয় স্ত্রীর মাত্র ভরণপোষণের ক্ষমতা আছে, তাহা হইলেই যে তুমি নিশ্চিন্তে বিবাহ করিবে এরূপ নহে। সে স্থলে বিবাহ করিলে, তোমাকে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। তাহা না হইলে তোমার আর দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। এই সকল বিষয় ভাল করিয়া না বুঝাতেই, লোকে কতশত অসহ্য যন্ত্রণা প্রতিক্ষণ সহ্য করিতেছে, তাহা তোমার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। অনুচিত সন্তানোৎপাদন দ্বারা সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট হয়, দৈন্য দশা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদসমূহ সমাজকে অহরহ পীড়া দিতে থাকে, তাহা একটু সবিশেষ মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। [ভবিষ্যতে এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা রহিল।]

৩। বঙ্গীয় বিবাহের তৃতীয় দোষ, বিধবা-বিবাহ সমধিক প্রচলিত না থাকা। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কি না, তদ্বিষয়ের বিচার এখানে করা যাইবে না। তাহার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া, তাঁহারই মীমাংসা গ্রাহ্য করা গেল। আমরা এখানে বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য কেবল দুই একটী প্রাকৃতিক কারণের নির্দ্দেশ করিব। যদি স্বভাবের অভিপ্রায়ে বিধবা-বিবাহ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তবে যে সেইরূপ বিবাহের বহুল প্রচার আবশ্যক ও অশেষ শুভকর, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ করা যাইতে পারে না। প্রায় সকলেই অবগত আছেন, আমাদের যে সমস্ত মনোবৃত্তি ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে, তৎসমুদায়েরই ন্যায্যমত চালনা করা বিধেয়। তাহা না করিলে স্বভাবের অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করা হয়। করিলে, স্বভাবও দণ্ড বিধান না করিয়া এড়াইয়া যাইতে দেয় না। যাহার যে পরিমাণে চালনা বন্ধ করা যায়, তাহা সেই পরিমাণে নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহারা যৌবনের পূর্ব্বে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহাদের নানা রূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা

পাইবার সম্ভাবনা। যাহারা কিছুকাল স্বামীসহবাস সুখ ভোগ করিয়া সন্তান লাভ করিবার পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহাদেরও অনেক পীড়া হইতে দেখা যায়। কেননা সকল স্ত্রীলোকই উপযুক্ত সময়ে গর্ভধারণ করিবে, ইহা স্বভাবের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। সুতরাং গর্ভিণী না হইয়া যাঁহারা বিধবা হয়েন, তাঁহাদের একটী অতীব প্রয়োজনীয় শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান-কর প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। * সেইটী স্বভাবের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন; সে সকল কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজনাভাব। আবার যাহাদের দুই একটী সন্তান হইয়াছে, অথচ যৌবন সম্পূর্ণ অতীত না হইতেং বিধবা হইয়াছেন, তাহাদেরও পুনরায় স্বামী গ্রহণ করা আবশ্যক, কিন্তু সন্তান উৎপাদন করা আর না করা, ইচ্ছা ও অবস্থা সাপেক্ষ। কেননা সে স্থলেও স্বামী গ্রহণ না করিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটী অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রধান নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। সুতরাং, দেখা গেল যে সন্তান প্রসবের কাল অতীত না হইবার পূর্ব্বে বিধবা হইলে, সকল স্ত্রীলোকই পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিবে, ইহা স্বভাবের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। বিশেষতঃ কুমারী যুবতী বিধবাগণের পুনঃসংস্কার সম্পূর্ণ আবশ্যক ও মঙ্গলকর। ইহাতে ধর্ম্মনীতির নিয়ম রক্ষা হয়।

* হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তিমান্ পাঠক, আমাদের শাস্ত্রে সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে বিধবা হইলে, দেবরদ্বারা এক মাত্র পুত্রোৎপাদনের যে বিধি আছে, তাহার কতদূর গূঢ় তাৎপর্য্য এবং যাঁহারা সেই বিধি দিয়াছিলেন, তাঁহারা কত দূরদর্শী ও দেহতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, এবং এই প্রাকৃতিক তত্ত্বটী কেমন সুন্দর বুঝিয়াছিলেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকা যে অতীব দূষ্য, তাহা যাঁহারা তজ্জন্য সংসাধিত অসংখ্য দুষ্ক্রিয়ার প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকাতে, ব্যভিচার, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতীব ঘোরতর ভয়প্রদ পাপাচার সকল প্রতিক্ষণ সাধিত হইতেছে; তাহা দেখিয়া শুনিয়া বিধবা বিবাহের প্রচলন অবৈধ বলিয়া কে স্বীকার করিতে পারে? এমন পাষণ্ড কে আছে, বলিতে পারি না? বরং তাহার বহুল প্রচারে অনেক শুভফল ফলিয়া সামাজিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ঐ সকল পাপাচরণই বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া দিতেছে, এবং স্বামী অভাবে পত্যন্তর গ্রহণ করা, শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য যে নিতান্ত আবশ্যক ও স্বভাবের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে। সুতরাং এরূপ বিবাহের বহুল প্রচার হইলে যে সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল পাপাচরণ উঠিয়া যাইবে, এবং সমাজেরও যে অনেক কলঙ্ক ঘুচিয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি বিধবা বিবাহের নিম্নলিখিত সাধুসম্মত নিয়ম সমাজে প্রচলিত হয়, তবে আর মঙ্গলের ও সুখের সীমা থাকে না;—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের বয়সের প্রভেদ সম্ভবতঃ যত অল্প হয়, ততই ভাল। আবার যখন সকল বয়সেই স্ত্রীলোকের বিধবা হইবার সম্ভাবনা, এবং সকল বয়সের পুরুষকেও মৃতদার হইতে দেখা যায়, তখন যে সকল মৃতদার পুরুষ পুনরায় দার পরিগ্রহ করি-

বেন; তাঁহারা যদি স্বীয় অবস্থা ও বয়সের অনুরূপ বিধবা বিবাহ করেন, তাহা হইলে অতিশয় সুখের বিষয় হয়, ও সমাজেরও অনেক শুভ সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ, নাই। পুনরায় দারপরিগ্রহকারীদিগকে প্রায়ই একটু বয়স্থা কন্যা অন্বেষণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অনেক স্থলে অনুরূপ ও উপযুক্ত অসূঢ়া কন্যা মিলে না। সুতরাং সেরূপ লোকে বিধবা বিবাহ করিলে, প্রয়োজন মত সকল অবস্থারই কন্যা মিলিতে পারে। তাহা হইলে আর পুনরায় বিবাহকারীদিগকে স্বীয় দৌহিত্রী সদৃশী বালিকাদিগকে বিবাহ করিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি বিধবা-বিবাহ সকল এরূপ নিয়মে সম্পন্ন হয়, তবে আর সুখের সীমা থাকে না; তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল ও সুখ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে স্ত্রীও অনুরূপ বরলাভে সন্তুষ্টা হয়, এবং পুরুষও উপযুক্ত সঙ্গিনীলাভে অসীম সুখ ভোগ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, বিধবা বিবাহের বহুল প্রচার হইলে, গনিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার অনেক হ্রাস হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর তৎসঙ্গে সমাজ কলঙ্ক অনেক কুৎসিত পীড়া ও যন্ত্রণাদিরও বিনাশ হইতে পারে।

বিধবা-বিবাহ স্বভাবের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইলেও, আর এক কথা বলা আবশ্যক। এই বিবাহ প্রথা প্রচলনে বল প্রয়োগ করিলে চলে না। সকল বিধবা স্ত্রীলোককে এ পরিমাণে স্বাধীনতা দিলেই সকল বিষয় সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে যে, তাহারা, বিবাহে ইচ্ছা আছে কি না, তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারিবে; [অনুরূপ পাত্র মনোনীত করিতে পারিবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে এরূপ নিয়ম করিলে আর সুখের সীমা থাকে না]। কিন্তু যে বিধবাগণের প্রথম স্বামীর সহিত প্রগাঢ় প্রীতির কারণ (এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে,) তদভাবে আর পত্যন্তর গ্রহণে স্পৃহা নাই,—বাস্তবিক যাহাদের মনে বিরাগ জন্মিয়াছে, তাহাদিগের পুনরায় স্বামী পরিগ্রহ করা বা বিবাহে বদ্ধ করা, নিতান্ত অযৌক্তিক, সন্দেহ নাই। কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে শ্রেয়ঃ না হইয়া,অশুভ ফলোৎপত্তিরই অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং যাহার পুনঃ স্বামী গ্রহণে ইচ্ছা আছে, তাহাকে পূর্ব্বোক্তমত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রশ্রয় দিলে এবং ব্যক্ত করিলে, তাহা কিছুমাত্র লজ্জাকর বা দুষ্য বিবেচনা না করিলে, সকল প্রকার শুভ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ।

অদৃষ্টবাদ।

মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বিউরিডেনাস্ প্রথম ইচ্ছার স্বাধীনতা সমর্থন করেন। সেন্ট অগষ্টিনের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে ইহা ইউরোপীয় দর্শনবেত্তাদিগের মধ্যে একটি প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সেই দিন হইতে একাল পর্য্যন্ত অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এত বাদানুবাদের পর এক্ষ-

নেও বাদানুবাদ চলিতেছে এবং চির-কালই চলিবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ন্যায়, এ সকল বিষয়ের অকাট্য, অবশ্যগ্রাহ্য, অপরি-হার্য্য মীমাংসা হইতে পারে না। এরূপ প্রশ্নের উভয় পার্শ্ব হইতেই বহুল যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বিচারের যে সকল উপকরণ, তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহে। আভ্যন্তরীণ জগৎ ইন্দ্রি-য়ের অগোচর। আমি আপনার মনের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলাম, মনুষ্য চিত্তের এইরূপ গতি। তুমি আপ-নার মন দেখিয়া বলিলে, তাহা নয়। আমি আমার উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা সংস্থা-পিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিজ্ঞানে এরূপ হয় না। আমি বলিলাম, বায়ুহীন প্রদেশে জল বত্রিশ ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠিবে। তুমি না মানিলে, আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া মানাইতে পারি।

এই জন্য দর্শন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের চরম মীমাংসা হয় না। যে সকল যুক্তি প্রদ-র্শিত হয় তাহাও অত্যন্ত জটিল। আবার যে যুক্তি একজনের চক্ষে সারগর্ভ, অপ-রের বিবেচনায় তাহা অসার। আর এক কথা, আপনার বিশ্বাস কেহ সহজে ছাড়িতে চাহে না। অন্য পক্ষে সহস্র যুক্তি থাকিলেও তাহা দাঁড়াইতে পায় না।

এ সকল আমরা জানি। জানিয়াও এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইব; যাঁহার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, তিনি অনুমোদন করিবেন, যিনি অসঙ্গত বোধ করিবেন, অনুমো-দন করিবেন না। তবে যদি কেহ বন্ধু-ভাবে, সারবতী যুক্তি দিয়া আমাদের ভ্রম বুঝাইয়া দেন, তবে বন্ধুর কথার ন্যায় তাঁহার কথা আমরা আদরে গ্রহণ করিব—ভ্রম সংশোধন করিব।

কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে, দুইটি নিয়মের কথা আমরা বলিয়া রাখি। যাঁহারা, এই দুইটি নিয়মের সত্যতা অস্বীকার করিবেন, তাঁহাদের, আমাদের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগকে আমরা বুঝাইতে অসমর্থ। যাঁহারা স্বীকার করিবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসুন। নিয়ম দুইটি এই ঃ——

(১) সকল কার্য্যেরই কারণ আছে।

(২) এক কারণ হইতে এক অভিন্ন কার্য্যই সমুদ্ভূত হইতে পারে। এক কারণে ভিন্ন২ কার্য্য হইতে পারে না। এ স্থলে ‘কারণ’ শব্দে, প্রধান অথবা মুখ্য কারণ এবং তদানুসঙ্গিক অবস্থা-নিচয় পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ যে সকল অবস্থা একত্র সমবেত হইয়া কার্য্য বিশেষ প্রসব করে, তাহাদের সমষ্টিকে কারণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

এ দুইটি সত্যই স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে আমাদের নৈসর্গিক বিশ্বাস আছে। ইহার প্রমাণ আবশ্যক করে না। যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার প্রমাণ হইতেও পারে না। তবে ইহাতে অমাদের বিশ্বাস যে নৈসর্গিক তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

বালক কথা কহিতে শিখিলেই, দেখা যায় সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিয়া থাকে; দিনান্তে সহস্রবার ‘কেন২’ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, চাকর চাকরাণীকে বিরক্ত করিয়া থাকে।

বাবা ও কি?

ও সব কাক।

ওরা কোথা যাবে?

বাসায়।

ওদের বাসা কোথা?

গাছে।

বাসায় যাবে কেন?

এখন বাসায় গিয়া শোবে।

শোবে কেন?

সন্ধ্যা হলো কি না, তাতেই।

সন্ধ্যা হলো কেন?

তা হয়।

কেন হয় বাবা?

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদশিখরে বসিয়া অথবা বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র কুসুমোদ্যানে বায়ু সেবন করিতেং আধং কণ্ঠে এরূপ মধু মাখা প্রশ্নাবলী কে না শুনিয়াছেন। যিনি শুনিয়াছেন তিনি অবশ্য প্রথম সত্যটিতে আমাদের বিশ্বাসের স্বতঃসিদ্ধত্ব স্বীকার করিবেন। যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁর এ মনুষ্য জন্ম বৃথায় গিয়াছে—মনুষ্যের একটী প্রধান সুখে তিনি বঞ্চিত।

দ্বিতীয় সত্যটি সম্বন্ধেও ঐ কথা। ইহাতেও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস আছে। যে শিশু না জানিয়া একদিন কোন তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছে, তাহার পর সে তদ্রূপ আকারের মিষ্ট দ্রব্যেও অজেয় বিরাগ প্রদর্শন করে—খাওয়াইতে গেলে কাঁদিয়া আকুল হয়। তুমি হাজার বল তবু সে তাহা স্পর্শ করিবে না। তোমার কথায় যে সে অবিশ্বাস করিতেছে, তাহা নহে। লোকে যে মিথ্যা কথা বলে, ইহা হয় ত সে জানেনা, কারণ তখনও হয়ত তাহার নিজের মিথ্যা কথার প্রয়োজন হয় নাই—মিথ্যা কথার লাভালাভ বুঝিতে পারে নাই। সে তোমাকে অবিশ্বাস করে বলিয়া নয়;—তোমার কথায় তাহার বিশ্বাস অপেক্ষা, কার্য্য কারণ নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তায়, স্বভাবের গতির অব্যভিচারে তাহার অধিক বিশ্বাস। সে ইচ্ছা করিলেও তোমায় বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহার অন্যতর বিশ্বাস, তাহার ইচ্ছার অপেক্ষা প্রবল—তাহার হৃদয় অপেক্ষা বলবান। এক কারণের একই কার্য্য, এ বিশ্বাস তাহার অস্থিমজ্জাগত। কে না দেখিয়াছেন যে, যে বালক পীড়িত অবস্থায় একবার তরল ঔষধি সেবন করিয়াছে, সে তাহার পর জল পর্য্যন্ত পান করিতে চাহে না। "ঘর পোড়া গোরু রক্তসন্ধ্যা দেখে ডরায়" এই যে প্রাচীন এবং সাধারণ পরিচিত প্রবাদ প্রচলিত আছে, ইহা এই বিশ্বাসের স্বভাব সিদ্ধত্বের প্রতিপোষক।

আমাদের সকল কার্য্যের মূলে এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মূলে না থাকিলে, সংসারে থাকা কঠিন হইত—জীবন রক্ষা ভার হইত। ব্যবসায় বাণিজ্য, সমাজ, আহার, ব্যবহার সকলেরই ভিত্তিমূল এই বিশ্বাস। বালককে কেহ শিখাইয়া দেয় না; কিন্তু যদি এক দিন সে অগ্নির জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহাতে হস্ত দিয়া থাকে, তবে আর সে তাহার কাছেও যাইবে না। সে কখন প্রকৃতির নিয়মের কথা ভাবিয়া থাকুক, বা না থাকুক, প্রকৃতিই তাহার মনের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলে, "আমার চাইল্ বিগ্‌ড়াইবার নহে।" সে ভাবুক বা না ভাবুক, কেহ বলিয়া দিক্ বা না দিক্, তাহার মন জানে যে এক কারণ হইতে একই কার্য্য হইতে পারে। শুদ্ধ মানুষ কেন? যে বানরী এক দিন মদ্যপানে

উন্মত্ত হইয়া, তাহার পর মদ্য দিলে স্পর্শও করিত না,সেও জানিত যে, কার্য্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার নাই—প্রকৃতির কার্য্যে ব্যতিক্রম নাই।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা বলিব। দেখা যাক্ আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন কি না।

আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, এ কথার অর্থ কি? যদি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার একতা সত্ত্বেও আমরা এক সময় একরূপ অন্য সময় অন্য রূপ সংকল্প করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেই ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ইচ্ছাকে স্বাধীন বলেন তাঁহারা এই কথাই বলেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে দুই মত আছে।—

(১) আমাদের ইচ্ছাই স্বাধীন। কুজিন, জুফ্রয়, ডেকার্ট, প্রাইস্ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের এই মত।

(২) ইচ্ছা স্বাধীন হইতে পারে না, কারণ ইচ্ছার অবশ্য বিষয় থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত ইচ্ছার কার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ সংকল্প উদ্দেশ্য সাপেক্ষ। অতএব ইচ্ছা স্বাধীন নহে,—কার্য্যকর্ত্তা স্বাধীন। রিড,ষ্টুয়ার্ট, লক্ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের এই মত।

অপর পক্ষীয়েরা বলেন ইচ্ছা স্বাধীন নহে, কার্য্যকর্ত্তাও স্বাধীন নহে। আমরা যে সংকল্প করি, সুতরাং যে কার্য্য করি, তাহা করিতে অমরা বাধ্য। যে অবস্থায় * যে সংকল্প করিয়াছি, সে অবস্থায় তদ্ভিন্ন অন্য রূপ সংকল্প কোন ক্রমেই করিতে পারিতাম না। লাইব্নিজ্, স্পাইনোজা, হব্‌স, হার্টলি, জোনাথান্, এডোয়ার্ডস্, মিল্ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের এই মত।

যে সকল মহাত্মাদিগের নাম করা গেল তাহাতেই বিলক্ষণ অনুমীত হইবে যে, উভয় পক্ষেই বহুল যুক্তি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান২ যুক্তিগুলির আমরা সমালোচন করিব—আমাদের বক্তব্য সরল ভাবে বলিয়া যাইব—তার পর পাঠকের বিবেচনা।

পাঠক মহাশয়ের অন্য সিদ্ধান্ত থাকিলে, তিনি অবশ্য আমাদের কথা শুনিবেন না। আপনার সিদ্ধান্তের কাছে আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের যুক্তি কোন্ কাজের? আপনার সিদ্ধান্ত, আপনার চিরপরিচিত যত্নের ধন—মনে স্থান দিয়াছেন—কত আদরে, কত যত্নে তাহাকে লালিত করিয়াছেন,—কত দিন তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে আমোদ করিয়াছেন—তাহাকে সঙ্গী করিয়া একা থাকার ক্লেশ অনুভব করেন নাই—কত দিন তাহাকে বসনে ভূষণে সাজাইয়া, অতৃপ্তনয়নে আপনি দেখিয়াছেন, দশ জনকে দেখাইয়াছেন। আর আমাদের সিদ্ধান্ত, আপনার পরিচিত হইলেও, যত্নের ধন নহে—হয়ত আপনার শত্রু, কারণ আপনার যত্নের ধনের শত্রু। আপনি কি শত্রুর জন্যে আপনার চিরপরিচিত, যত্নসংবর্দ্ধিত মমতার ধনকে—নির্জ্জনে যে সঙ্গী, কথাবার্ত্তায় যে বিষয়, জাগ্রতে যে চিন্তা—এমন ধনকে ত্যাগ করিবেন? সে ভরসা আমরা করি না।

যত দিন আমরা কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করি, কোন পক্ষই অবলম্বন করি না, তত দিন তাহা মনের বিষয় থাকে। কিন্তু যুক্তি স্থির করিয়া

* মনে ভাবের উদ্রেক ব্যতীত সংকল্প হইতে পারে না। যে সকল ভাবের দ্বারা সংকল্প বিশেষ হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম ‘অবস্থা’।

সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা হৃদয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মনের অপেক্ষা, বিবেচনা শক্তি অপেক্ষা, হৃদয় বলবান। স্নেহের চক্ষে, দোষও গুণ বলিয়া বোধ হয়। প্রণয় অন্ধ। ভালবাসায় বাছাবাছি নাই। "আমাদের ছেলেটি, ভাত খায় এতুটি, বেড়ায় যেন পুতুলটি; আর ওদের ছেলেটা, ভাত খায় এতটা, বেড়ায় যেন মুষলটা।" তাইত বটে। আমি যাকে ভালবাসি, তার সব ভাল—সে অতুল। তাহার সহিত তুলনায়, তুমি যাকে ভালবাস—ও দশা আমার! এ যে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভেদ।

রহস্য যাউক। এক্ষণে বক্তব্য বিষয়। প্রথমতঃ, কেহ২ বলেন আমাদের ইচ্ছাই স্বাধীন। ডেকার্ট বলেন যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের অহম্প্রতীতি * সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষী। অহম্প্রতীতিকে জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্টই বলে যে, আমরা যাহা কিছু করি, স্বাধীন ভাবে করি—বাধ্য হইয়া করি না। মনে করিলে অন্যরূপ করিতে পারিতাম।

অন্য রূপ মনে করিতে পারিলে যে অন্য রূপ করিতে পারিতাম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কোন বাহ্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে, আমাদের সংকল্প যে আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কথা হইতেছে যে আমরা অন্যরূপ মনে করিতে পারিতাম কিনা? এ স্থলে, অন্যরূপ সংকল্প করিতাম, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তি যুক্ত নহে।

আত্ম প্রতীতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষীত্বের বিরুদ্ধে রিড্ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন; আমাদের স্বাধীনতায় অবশ্য আমাদের বাল্যকাল হইতে বিশ্বাস আছে, কিন্তু এ বিশ্বাসকে আত্মপ্রতীতি বলা যাইতে পারে না, কারণ আত্মপ্রতীতি আমাদিগকে কখন প্রতারণা করে না, অথচ পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসে আমরা প্রতারিত হইতে পারি।

কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। আর একটি ঐ রূপ দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা বুঝাইতেছি। এ দৃষ্টান্তটিও রিড্ সাহেবের। নিদ্রিতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে, চেতন হইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালনের প্রয়াস না করিয়া সে ব্যক্তি বলিতে পারে না, সে সঞ্চালন ক্ষমতা হারাইয়াছে কি না? এবং এরূপ প্রয়াস না করিয়া আত্মপ্রতীতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, আত্মপ্রতীতি উক্ত ক্ষমতার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারে না। সঞ্চালন প্রয়াসের পূর্ব্বে অবশ্য ক্ষমতার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকিবে, কিন্তু সে বিশ্বাস আত্মপ্রতীতি নহে, কারণ তাহা ভ্রমাত্মক।

মান্সেল সাহেব 'ইচ্ছার স্বাধীনতার' এইরূপ অর্থ করেন;—আত্মপ্রতীতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন২ উদ্দেশ্য ইচ্ছার উপর কার্য্য করিতেছে কিন্তু কোন উদ্দেশ্যই বলপূর্ব্বক ইচ্ছাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে না এই ভিন্ন২ পথগামী উদ্দেশ্যনিচয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রবল হইতে দেওয়া যাইবে,

* Consciousness : বাঙ্গালী লেখকেরা 'অহম্প্রতীতি' অথবা 'আত্মপ্রতীতি' শব্দের দ্বারা এ শব্দটীর অনুবাদ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ দুইটি শব্দ 'Self-consciousness' শব্দের প্রতিশব্দ। সকলের বোধগম্য হইতে পারে, এই জন্য অন্য শব্দ গ্রহণ করিলাম না।

ইহা স্থির করিবার ক্ষমতাই ইচ্ছার স্বাধীনতা।* ·

স্বীকার্য্য; কিন্তু এ সম্বন্ধে আত্মপ্রতীতি কোন কথাই বলিতে পারে না। আমাদের আত্মপ্রতীতি, কেবল মাত্র আভ্যন্তরীণ উপস্থিত অবস্থার কথা বলিতে পারে। কিন্তু যাহাকে ক্ষমতা বলি, তাহা মনের উপস্থিত অবস্থা হইতে পারে না, কারণ তাহা কোন বিশেষ অবস্থা নহে—বিশেষ অবস্থা কেন,—অবস্থাই নহে।

আমি যাহা করিতেছি, যাহা অনুভব করিতেছি, অথবা যে চিন্তা করিতেছি, তাহারই কথা, আমার আত্মপ্রতীতি আমায় বলিতে পারে; কিন্তু আমি কি করিতে পারি—কি চিন্তা করিতে পারি—কি অনুভব করিতে পারি, তাহা আত্মপ্রতীতি বলিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মপ্রতীতির বিষয় নহে। আত্মপ্রতীতি ভবিষ্যদ্বক্তা নহে। হ্যামিল্টন বলিয়াছেন † যে আত্মপ্রতীতি "আভ্যন্তরীণ কার্য্যের অব্যবহিত উপস্থিত জ্ঞান"। সুতরাং যাহা উপস্থিত অথবা যাহা হইতেছে তাহারই কথা আত্মপ্রতীতি বলিতে পারে। কি হইবে—কি হইতে পারে, এ বিষয়ে আত্মপ্রতীতি সাক্ষী হইতে পারে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতা পক্ষে কোন কথাই আত্মপ্রতীতি বলে না। সত্য মিথ্যা পরের কথা, দূরের কথা—আদৌ কোন কথাই বলেন না। বরং হার্টলি বলেন ‡ যে আত্মপ্রতীতির সাক্ষ স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, এ কথা সপ্রমাণ করিতে হইলে, আমাদের এরূপ অনুভব করা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য এক থাকিলেও আমরা ভিন্ন২ কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু এরূপ অনুভব আমরা করি কি? আত্মপ্রতীতি এরূপ অনুভবের কথা বলে কি? বরং স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হইবে যে আত্মপ্রতীতি তদ্বিপরীত বলে। যখন আমাদের উদ্দেশ্য সকল নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, অর্থাৎ যখন সে গুলি বেশ উপলব্ধি হয়, সে গুলিকে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, তখন আমরা স্পষ্ট অনুভব করি যে, এ উদ্দেশ্যগুলি থাকিতে, আমরা কখনই অন্যরূপ করিতে পারিতাম না। আর যখন উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট নহে, তখন কিছুই স্থির হইতে পারে না—কোন দিকেই কোন কথা বলা যায় না।

সংকল্পের সহিত অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিলে, ইচ্ছার স্বাধীনতা কোন প্রকারেই স্বীকার করা যায় না। সেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহা আমরা দেখাইতেছি।

প্রত্যেক সংকল্পেরই একটি না একটি বিষয় আবশ্যক; সংকল্প করিতে হইলে, অবশ্য কোন বিষয়ে সংকল্প করিতে হইবে, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক;—যে বিষয়ে সংকল্প করিব সে বিষয়টা কি তাহা জানা আবশ্যক। বিষয় জ্ঞান ব্যতীত তদ্বিষয়ক সংকল্প অসম্ভব। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, ইচ্ছার কার্য্যের পূর্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তির * কার্য্য হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য হইলেই যথেষ্ট

* Mansel's Metaphysics.

† Sir William Hamilton's Lectures on Metaphysic.

‡ Hartley's Observations on Man.

* Intellect.

হইল না। বুদ্ধিবৃত্তির সত্ত্বা ব্যতীত ইচ্ছা হইতে পারে না, কিন্তু নিরপেক্ষ বুদ্ধিও ইচ্ছার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যের উপর আরও কিছু আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান যত কেন বৃদ্ধি হউক না, তাহাতেই ইচ্ছার কার্য্য হইতে পারে না।

বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যের পর, বিচারশক্তির কার্য্য আবশ্যক। বিচার না করিলে গুণাগুণ স্থিরীকৃত হইবে কিরূপে? বিষয় জ্ঞানের পর আমাকে দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয় আমার কোন প্রকার ইষ্টসাধনের, কোন প্রকার অভাব পূরণের, কোন প্রকার অনিষ্ট নিরাকরণের, কোন প্রকার সুখ বৃদ্ধির উপযোগী বটে কি না?

কিন্তু এখনও গোল মিটিল না। বিচারের প্রবৃত্তির কার্য্য হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি তাহার অনুকূল অথবা প্রতিকূল হয়—বিচারের দ্বারা গুণাগুণ স্থির হইলে, তৎসম্বন্ধে অনুরাগ অথবা বিরাগ উপস্থিত হয়—তাহা পাইবার অথবা পরিত্যাগের ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার ফল, সংকল্প।

জন্ লক্ লিখিয়াছেন যে "বিশেষ করিয়া বিচার এবং তথ্যানুসন্ধান করিয়া দেখিয়া আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বিষয় বিশেষের স্বার্থ সাধনোপযোগিতা এবং অভাব দূরীকরণোপযোগিতা বুঝিতে পারিলে এবং স্বীকার করিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির উত্তেজিত হইয়া তদভাববশতঃ অথবা তৎ স্বার্থসাধন ভাববশতঃ অসুখী না করে, ততক্ষণ ইচ্ছার কার্য্য হইতে পারে না।"*

অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধি সাপেক্ষ, বিবেচনা সাপেক্ষ, প্রবৃত্তি সাপেক্ষ এবং অভাব সাপেক্ষ। অভাবের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। কতকগুলি অভাব নৈসর্গিক; আর কতকগুলি অনৈসর্গিক। এই অনৈসর্গিক অভাবনিচয়, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার এবং দেশকালপাত্র সাপেক্ষ। আমাদের ইচ্ছা সুতরাং এত গুলির অধীন। যাহাকে এত বিষয়ের মন রাখিতে হয়—বঙ্গকুলবধূর ন্যায়, বাড়ীশুদ্ধ লোকের, পাড়াশুদ্ধ লোকের মন রাখিতে হয়, সে যদি স্বাধীন তবে আবার পরাধীন কি? এতগুলি সত্যের মুখের উপর, ইচ্ছাকে স্বাধীন, অকৃত, স্বপ্রবর্ত্তিত, অনন্যসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা পারি না।

সংকল্প যখন পূর্ব্ববর্ত্তী মানসিক অবস্থাবিশেষের ফল, তখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে সংকল্পের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, এক কারণ হইতে একই কার্য্য হইতে পারে—পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা একরূপ থাকিলে, পরবর্ত্তী অবস্থাও এক হইবে। যে অবস্থায় যে সংকল্প করিয়াছি, সে অবস্থায় অন্য সংকল্প করা আমাদের অসাধ্য।

অদৃষ্টবাদিরা বলেন যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন;—"মনুষ্য অদৃষ্টের দাস, কারণ তাহার সকল কার্য্যেরই আরম্ভ আছে, এবং যাহা কিছুরই আরম্ভ আছে তাহারই কারণ আছে, এবং প্রত্যেক কারণের কার্য্য অপ্রতিহত।"*

* Locke's Essay on the Human Understanding.

* Collens' Philosophical Inquiry concerning Human Liberty.

কারণ মাত্রেই আপনার কার্য্য করিবে, কাহারও সাধ্য নাই, তাহার নিবারণ করে—কাহারও সাধ্য নাই, কারণ হইতে কার্য্যানুস্মৃতির নিরোধ করে। প্রত্যেক কারণের কার্য্য অবশ্যম্ভাবী।

বাহ্য জগতেই হউক আর আভ্যন্তরীণ জগতেই হউক, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেরই যে কারণ আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যখন সংকল্প করিলাম তখন আভ্যন্তরীণ জগতে অবশ্য পরিবর্ত্তন হইল। যে সংকল্প করিলাম সে সংকল্প অবশ্য, সেই সংকল্পেরই পূর্ব্বক্ষণে মনে ছিল না; সুতরাং সংকল্পের দ্বারা, সংকল্পের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। এই মানসিক পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ সংকল্পের অবশ্য 'উপযুক্ত কারণ'* আছে। যদি স্বীকার করেন, আছে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইল যে ইচ্ছা স্বাধীন নহে। যদি বলেন, উপযুক্ত কারণ নাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইল যে উপযুক্ত কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিলে, প্রথমতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করা হয়। তাহা হইলেও আবার স্বীকার করিতে হইল যে, এ সংসারযন্ত্র অন্ধ নিয়মবলে চলিতেছে এবং আমরা অন্ধনিয়মস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। সুতরাং পুনরায় অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, ইহা আমাদের ধারণার অতীত। কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে, ইহা প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই বোধ হয়, স্বীকার করিতে পারেন না।

রিড, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি দার্শনিকেরা, ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, কার্য্যকর্ত্তা অর্থাৎ মন স্বাধীন। আমাদের সংকল্প, অকৃত নহে—মন, তাহার প্রবর্ত্তক। উদ্দেশ্য অভাবে সংকল্প হইতে পারে না, সত্য*; উদ্দেশ্যই ইচ্ছার পরিচালক, সত্য; কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষকে প্রবল হইতে দেওয়া না দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা, মনের আছে। অতএব মনই স্বাধীন।

জন্ লক্ লিখিয়াছেন যে—স্বাধীনতা একটী ক্ষমতা এবং ক্ষমতা বলিয়াই তাহা ইচ্ছায় থাকিতে পারে না, কেননা ইহাও ক্ষমতা-বিশেষ বই আর কিছুই নহে। ক্ষমতার ক্ষমতা আবার কি রূপ?†

কার্য্যকর্ত্তার স্বাধীনতা আছে, এ মতের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েকটী আপত্তি আছে। তাহার আমরা সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে দুইটি অবশ্যগ্রাহ্য নিয়মের কথা বলিয়াছি, এ মত, তাহার প্রথমটির বিরোধী না হইলেও, দ্বিতীয়টির বিরোধী। প্রথম নিয়ম এই যে, সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। মন, ইচ্ছার প্রবর্ত্তক, এ মতে ঐ নিয়ম রক্ষিত হইল, কেননা এ স্থলে সংকল্পের কারণ রহিল। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, এক কারণের একই কার্য্য। মন স্বাধীন বলিলে এই নিয়ম রক্ষা হয় না। যে মন সেই মনই থাকিল, উদ্দেশ্য ঠিক্ তাহাই থাকিল, অথচ সংকল্প অনন্তবিধ হইতে পারে;—এ কথা মানিতে হইলে, দ্বিতীয় নিয়মের বুকে বসিয়া মানিতে হয়।

* Vide Liebnity's principle of Sufficient Reason.

* প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য নমন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।

† Locke on Human Understanding. Book II. Chap. 21.

দ্বিতীয়তঃ। মন যেন ইচ্ছার প্রবর্ত্তক হইল, কিন্তু মনের প্রবর্ত্তক কে? যদি বল, উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মন স্বাধীন হইল না। যদি বল, কেহ নহে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিনা উদ্দেশ্যে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি, অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেই পাগল। ইহা অস্বীকার্য্য। আর এক কথা;—পাপ পুণ্য উদ্দেশ্য লইয়া। পাপ পুণ্য, কার্য্যগত হইতে পারে না, কারণ এক অভিন্ন কার্য্যই পুণ্যার্থে এবং পাপার্থে হইতে পারে। সুতরাং যে বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, তার পাপ পুণ্য নাই। সে আপন কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট দায়ী হইতে পারে না। যে পরলোক, যে স্বর্গ নরক রাখিবার জন্য এ মতের উদ্ভাবন, ইহাতে তাহাই উল্টাইয়া যাইতেছে।

তৃতীয়তঃ। মন কি? আভ্যন্তরীণ বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি মাত্র। যদি প্রত্যেক আভ্যন্তরীণ বৃত্তি, কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন হয়, তবে তাহাদের সমষ্টি অর্থাৎ মনও সেই নিয়মের অধীন হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের কার্য্য যদি আমাদের আয়ত্ত নহে, তবে পাপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হয় কেন? সে দিন যদি বাটীর বাহির না হইতাম, তাহা হইলে আর এ বিপদ ঘটিত না;—কেন বাহির হইয়াছিলাম?"—এরূপ কথা কি কেহ কখন আপনার মনে বলেন নাই? কোন সময়ে না কোন সময়ে, সকলের মনেই এরূপ ভাব হয়, সুতরাং ইচ্ছা অথবা মন স্বাধীন। আমরা যদি স্বাধীন না হই, তাহা হইলে, যাহা করিয়াছি তাহা করিতে বাধ্য ছিলাম। যাহা বাধ্য হইয়া করিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা স্বাধীন ভাবে করি নাই, তাহার জন্য অনুতাপ কেন হইবে?

ইচ্ছার অথবা মানবের স্বাধীনতা সমর্থনকারিদিগের এইটিই প্রধান যুক্তি। এইটি লইয়া অনেকে আস্ফালন করিয়া থাকেন। অতএব এ যুক্তির সারবত্তা আমরা সবিস্তারে সমালোচন করিব। পাঠকবর্গ বিস্তৃতি দোষ মার্জ্জনা করিবেন। উপর্য্যুক্ত যুক্তিটিকে বিচারের নিয়মানুসারে উপযুক্ত আকারে পরিণত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়;——

যাহা স্বাধীনভাবে করি, তাহারই জন্য অনুতাপ হইতে পারে।

আমাদের কার্য্যের জন্য আমাদের অনুতাপ হয়।

সুতরাং আমাদের কার্য্য আমরা স্বাধীনভাবে করি।

প্রথম প্রতিজ্ঞা দুইটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শেষ সিদ্ধান্তটি যে অবশ্য স্বীকার্য্য তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটী যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য তাহাও আমরা স্বীকার করি আমাদের আপত্তি, প্রথম প্রতিজ্ঞাটির বিরুদ্ধে। প্রথম প্রতিজ্ঞাটি সত্য নহে। যাহা স্বাধীনভাবে করি, তাহারই জন্য অনুতাপ হইতে পারে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। অনুতাপ অথবা আত্মপ্রসাদ, কার্য্যের গুণের অনুগামী নহে—কার্য্যের গুণে বিশ্বাসের অনুগামী; স্বাধীনতা আছে বলিয়া নহে—স্বাধীনতায় বিশ্বাস আছে বলিয়া। যদি আমারা পরাধীন হইয়া কোন কার্য্য করি অথচ স্বাধীনভাবে করিলাম বলিয়া বিশ্বাস থাকে, এবং সেই কার্য্য হইতে যদি অনিষ্ট সমুদ্ভূত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যের জন্য অবশ্য অনুতাপ হইবে।

কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবাসিরা সাগর সঙ্গমে সন্তান নিক্ষেপ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত—পাঠক মহাশয় কি তাহা পারেন? না। যদি করেন তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা দূরে থাক্ অনুতাপানলে দগ্ধ হইবেন। কেন? পূর্ব্বেকার লোকেরা ইহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, স্বর্গের সোপান বলিয়া জানিতেন—আপনি ইহাকে নরকের সিঁড়ি বলিয়া জানেন। তাহাতেই বলিয়াছি, অনুতাপ কার্য্যের অনুগামী নহে—বিশ্বাসের অনুগামী।

আত্মকর্ম্মের জন্য—যদি তাহা অনিষ্ট প্রসব করিয়া থাকে—যে মনের বিকার হয় তাহা সকল সময়ে অনুতাপ নহে। উক্ত কর্ম্মের জন্য যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহারই জন্য দুঃখ মাত্র। কখনং নৈরাশ্য এবং অভিলাষও অনুতাপ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'অমুক দিন অমুক কার্য্য যদি না করিতাম তাহা হইলে ত এমন হইত না' এরূপ ভাব মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা অভিলাষ মাত্র—অনুতাপ নহে। আবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, সে অবস্থায় তদ্ভিন্ন অন্যরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারিতাম না। এরূপ অভিলাষের দরুণ যদি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে কিছুই অবিশ্বাস্য থাকে না। মনুষ্যের মন বড় চঞ্চল—কখন্ কি অভিলাষ করে তাহার ঠিক নাই। অনেক সময় মনে হয়, যদি আলাদিনের সেই প্রদীপ অথবা অঙ্গুরীয় পাইতাম তাহা হইলে—আর ভাবিতে পারি না; মন হাসিয়া পাগল হয়। এখন কি স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রদীপ পাওয়া সম্ভব?

অনেক কার্য্য, যাহাতে আমাদের কোন হাত নাই; যাহা হয়ত আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও উক্তরূপ দুঃখ হইতে পারে। পশুপ্রকৃতি স্বামীর জ্বালায় জ্বলিয়া বঙ্গবালা কি এমন দুঃখ করেনা?—দুঃখ করে না কি, যে কেন বঙ্গকুলবধূ হইয়াছিলাম—কেন বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছিলাম। যে দেশে মন পরীক্ষা করিয়া বিবাহ হয়, যে দেশে জন্মিলাম না কেন—যে দেশে মেয়ে হইলে মারিয়া ফেলে সে দেশে জন্মিলাম না কেন?

আমরা যে যুক্তিটির সমালোচন করিতেছি, তাহার দ্বারা এই মাত্র প্রমাণ হইতে পারে যে, আমরা স্বাধীন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। অনেকের যে বিশ্বাস আছে তাহা আমরাও স্বীকার করি। কেন যে আছে তাহা পরে সবিস্তারে বলিব।

স্বাধীনতাবাদিরা বলেন যে, মনুষ্য স্বাধীন, এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কেন না বলিবামাত্র বিনা প্রমাণে লোকে ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে।

লোকে এরূপ বলে বটে যে, আমার যাহা ইচ্ছা, আমি করিতে পারি—যে সংকল্প ইচ্ছা, করিতে পারি; কিন্তু উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া কার্য্য করিতে পারি, এরূপ অর্থে কেহ বলে না। তাহাদের বক্তব্য—আমি যে সংকল্প অথবা যে কার্য্য করিব তাহা হইতে অপর কেহ আমায় ধরিয়া রাখিতে পারে না। আপনি যে অর্থে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করেন, সাধারণে সে অর্থে স্বীকার করে না। কথাটার অর্থ ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে—উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া কার্য্য করিতে পারি, কি না পারি, এরূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে—এক উদ্দেশ্যে দুই কার্য্য

করিতে পারি কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বোধ করি কেহই আপনার মতে মত দিবেন না। সুতরাং মূল কথাটিকে সত্য বলিয়াই বিশেষতঃ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমার সংকল্প হইতে যে কেহ আমায় ধরিয়া রাখিতে পারে না, তাহা আমরাও স্বীকার করি। এরূপ স্বাধীনতা অবশ্য আছে, কিন্তু সে ভিন্ন কথা হইল।

তাঁহারা আরও বলেন যে, যখন ইচ্ছার স্বাধীনতায় পৃথিবীশুদ্ধ লোকের বিশ্বাস—যখন এ বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী, তখন ইচ্ছা প্রকৃত পক্ষেই স্বাধীন—তখন ইচ্ছাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

· এ কথার অসারতা জাজ্বল্যমান, সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। আমাদের আপত্তিগুলি আমরা সোজাসুজি বলিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ, ইচ্ছা যে স্বাধীন এ বিষয়ে সকলের বিশ্বাস নাই—এ বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী নহে। অধিকাংশ লোকে এ কথা কখন মনেও করে না—স্বপ্নেও ভাবে না। যাহারা ভাবে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্য মতাবলম্বী। যদি ইহাতে সকলের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে হইত না। সকলের যাহাতে বিশ্বাস আছে তাহা আবার যুক্তির দ্বারা তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে আপনার এত মাথাব্যথা কেন? সকলের যে বিশ্বাস নাই, আপনার এই যুক্তিই তাহার প্রমাণ। তবে কতক্ লোকে অবশ্য বিশ্বাস করে। কিন্তু কতক্ লোকে ইহাও বিশ্বাস করে যে, মেঘে শালপত্র খায় এবং তাহাদের মুখ নিঃসৃত ফেণরাজিতে অভ্র হয়। মেঘের পাতা খাওয়া সম্বন্ধে যদি কতক লোকের বিশ্বাস অগ্রাহ্য হয়, তবে এ সম্বন্ধে কতক লোকের বিশ্বাস প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে কেন?

দ্বিতীয়তঃ, সকলের বিশ্বাস, কোন সত্যের নিয়ামক নহে। যাহা সত্য, তাহা সত্য; যাহা মিথ্যা, তাহা মিথ্যা—মানবের বিশ্বাসাবিশ্বাসে তাহার কি যায় আসে? গালিলিওর পূর্ব্বে সকলেই বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীকে বেষ্ঠন করিয়া সূর্য্য ঘুরিতেছে। তাই বলিয়া ইহা সত্য হইতে পারে না যে, তখন সকলে একরূপ বিশ্বাস করিত বলিয়া সূর্য্য ঘুরিত; আবার গালিলিওর পরলোকে অন্যরূপ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল বলিয়া, সেই দিন হইতে সূর্য্যদেব, ঘুরিবার ভার পৃথিবীকে দিয়া স্বয়ং পেন্সন গ্রহণ করিলেন।

ডি আলেমবার্টও এই যুক্তি দিয়া মানবের স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমরা স্বাধীন হই বা না হই, কিন্তু স্বাধীনতায় আমাদের বিশ্বাস স্পষ্ট। যদি কোন প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন জীব থাকে, তাহা হইলে তাহার, আপন স্বাধীনতায় বিশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস অপেক্ষা পরিষ্কার এবং সতেজ হইতে পারে না। আমাদের যখন এমন দৃঢ়, পরিস্ফুট, স্পষ্ট, পরিষ্কার, সতেজ, সজীব বিশ্বাস আছে, তখন আমরা যে প্রকৃত পক্ষেই স্বাধীন, ইহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতেই এ কথার খণ্ডন হইয়াছে। তবে এ যুক্তিতে আমাদের একটী রহস্যের কথা মনে হইল তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

মনুষ্য মাত্রেই আপনাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া জানেন, সকল যুবতীই মনে করেন, আমার মত সুন্দরী কেহ নাই—এমন চটক্ কাহারও চেহারায় নাই; যিনিই একটু গাইতে জানেন তিনিই মনে করেন, আমি গাই ভাল, কেননা পরকে ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আপনার গান আপনাকে ভালই লাগে। এখন ডি আলেমবার্টের যুক্তি মানিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ব্যক্তি-মাত্রেই দ্বিতীয় নিউটন, রমণী মাত্রেই অসূর্য্যম্পশারূপা কুলবধূ হইতে পদ্মাপেরে বাঙ্গাল ঘুঁঘুরওয়ালী পর্য্যন্ত সকলেই নুরজেহান, আর যিনিই কায়ক্লেশে লক্ষ্ণৌয়ের আদ্ধা অথবা গোপালে উড়ের আড়খেমটা পর্য্যন্ত গাইতে পারেন তিনিই তানসেন।

তবে সকলে এরূপ মনে করে না। স্বীকার, কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতাও সকলে স্বীকার করে না—ইহাতে সকলের বিশ্বাস নাই। নাই যে তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সকলের বিশ্বাস থাকিলে, এ কথা উঠিবে কেন?—এ গোল বাধিবে কেন? সক্রেটীস, প্লেটো, আরিষ্টটল্, জিনো অথবা এপিকিউরস এ কথা জানিতেন না। আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যেও অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। জর্ম্মাণিতে লাইবনিজ, হলণ্ডে স্পাইনোজা, ইংলণ্ডে হব্‌স, হার্টলি, প্রিস্‌টলি প্রভৃতি এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিত ইহা স্বীকার করে না। আমেরিকায় জোনাথান এডোয়ার্ডস্ ইহার অসভ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী হইলে জগন্মান্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ কেন?

সকলের বিশ্বাস না থাকে, অনেকের যে বিশ্বাস আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কেন যে আছে, তাহা পরে দেখাইব

ইচ্ছার স্বাধীনতা সমর্থনকারী দার্শনিকেরা আর একটি আপত্তি করিয়া থাকেন। অপ্‌হাম সাহেব বলেন—"সকলেই স্বীকার করেন যে, আমরা আমাদের কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী, সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা আছে।"* ঈশ্বর যখন আমাদিগকে, কার্য্য বিশেষ করিতে এবং কার্য্য বিশেষ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন, তখন করা এবং না করার ক্ষমতাও দিয়াছেন। তাহা নহিলে ঈশ্বর, দ্বিতীয় ক্যালিগুলা হইয়া দাঁড়ান। আমরা যাহা করি তাহা যদি বাধ্য হইয়া করি, তাহা হইতে বিরত হওয়া যদি আমাদের সাধ্যাতীত হয়, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে পারি না। যাহা আমার অসাধ্য তাহা করি নাই বলিয়া, ঈশ্বর আমায় দণ্ড দিতে পারেন না—দায়ী করিতে পারেন না। আমাদের কর্ম্মের জন্য যখন আমাদিগকে দায়ী করিয়াছেন, তখন অবশ্য স্বাধীনতাও দিয়াছেন

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা আমরা বলিতে চাহিনা, কারণ তাহা মনুষ্য শক্তির অতীত। 'যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ'—'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—তাঁহার কথা আমরা কি বলিব? মনুষ্য শম্বুক কি আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ে সমুদ্র ধরিতে পারে? একটি বৃক্ষ পত্রের একটি পিপীলিকার রচনা কৌশল আমরা বুঝিতে অসমর্থ, আমরা যে ঈশ্বর এমন, ঈশ্বর তেমন, ঈশ্বর ইহা করেন, ঈশ্বর ইহা করেন না, এরূপ কথা

*Upham on the Will.

বলি, এ আমাদের পাগলামি—আমাদের উদ্ধত্য। এই লোকের দুটো কথা ভাল করিয়া জানিতে জীবন কাটিয়া যায়, আমরা যে পরলোকের কথা বলি, এ আমাদের বেকুবির, আমাদের মূঢ়তার পরিচয়। তবে যে ঈশ্বর লইয়া এত গোলোযোগ, এত মারামারি—কেহ ঈশ্বরের দৈনিক কার্য্যের ডায়ারি লিখিতেছেন, কেহ ঈশ্বরের জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন ; আবার লক্ষ২ যুগান্ত ঈশ্বর কি করিবেন তাহাও কেহ২ স্থির করিয়া রাখিতেছেন,—এটা কেবল আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ করা। আমার বিবেচনায়, এ সকল লোক, পাগলাগারদ অথবা ভারতাশ্রমেরই যোগ্য।

পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অপ্‌হাম সাহেবের যুক্তিসমালোচন করা আবশ্যক হইতেছে।

আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা যে কাহারও নিকট দায়ী. এতদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। মৃত্যুর পর, অন্যলোকে থাকিয়া যে কর্ম্মোপযোগী সুখদুঃখভোগ করিব, এ কথা কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এ শরীরের নাশ হইলেও যে আত্মা থাকিবে, এ কথা কে বলিতে পারে? আত্মা, আভ্যন্তরীণ বৃত্তি নিচয়ের সমষ্টি মাত্র। সে বৃত্তিগুলি ভূতের বিকার মাত্র। ভৌতিক সংযোগের বিশ্লেষ হইয়া গেলে যে সে গুলি থাকিবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যদি বলেন, পুরুষ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—তাহাও কেবল চৈতন্য স্বরূপ, তাহার সুখ দুঃখ ভোগ নাই, সুতরাং স্বর্গ নরকও নাই। সাংখ্য দর্শনের এই মত।

যাঁহারা বলেন, যে পরলোক না মানিলে, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করা হয়, তাঁহারা অল্প বুঝেন। তোমাদের এই ইংরেজি ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বটে, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ ঈশ্বরকে যে রূপ জানিতেন তাহার কোন ক্ষতি হয় না। জগতে দুর্লক্ষ্য, অপ্রতিহত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে কার্য্য পরম্পরা হইয়া যাইতেছে,—ঈশ্বর আছেন মাত্র। তাঁহাকেও উদাসীন বলিয়া তাঁহারা জানিতেন। তিনি নির্ব্বিকার—তাঁর দুঃখ নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই, বিষাদ নাই, করুণা নাই, প্রেম নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই, স্পৃহা নাই, অভিলাষ নাই, ইচ্ছা নাই, দয়া নাই, কিছুই নাই—কারণ তিনি নির্ব্বিকার : তিনি ভূত স্মরণ করেন না, ভবিষ্যৎ দেখেন না, বর্ত্তমানের সাক্ষী নহেন—কেবল আছেন মাত্র। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, নিয়ন্তা নহেন, পাপ পুণ্যের ফল বিধাতা নহেন—কেননা তিনি নির্ব্বিকার। যদি এ সকল স্বীকার না কর, তবে ঈশ্বর নির্ব্বিকার নহেন, মায়ামুক্ত নহেন—প্রত্যুত বিকারে পরিপূর্ণ। তেমন ঈশ্বর আমরা মানি না। তোমাদের এ ইংরাজী ঈশ্বর—তোমাদের এ অমৃতস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং ধর্ম্ম-জানেন-কি-স্বরূপ ঈশ্বর—তোমাদের এ প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময়, করুণাময় এবং তোমরাই-জান-কি-ময় ঈশ্বর—তোমাদের এ কতকগুলা বিশেষণ পদের মার পেঁচ, আমরা মানি না। প্রকৃতিগত যে শক্তি বলে স্বভাবের কার্য্য হইয়া যাইতেছে তাহাই ঈশ্বর। তদ্ভিন্ন অন্য ঈশ্বর অপ্রামাণ্য। যদি বল, এমন ঈশ্বর থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি—তা আমি কি করিব? সকল সত্য তোমার মনের মত না হইতে পারে। ফল কথা,

যাহা অনিশ্চিত তাহা লইয়া কোন বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা বাদীদিগের এ উক্তিটি অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইহার বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহার অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

(ক্রমশঃ)

সদসদ্বিবেচনা।

মাণ্ডীবালী।

বার্ণার্ড ডি মাণ্ডীবালী ১৬৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার কৃত Fable of the Bees নামক গ্রন্থ ১৮১৪ খৃঃ অঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সূক্ষ্মভাবে সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জনসাধারণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই ; জ্ঞানপ্রধান * ও কার্য্যপ্রধান †। প্রথমোক্ত দলস্থ লোক প্রায় অসংশায়ী, তাঁহারা অনেক সময়েই বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় প্রশ্ন অথবা গণিতের উৎকৃষ্ট প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের মনকে অভিনিবিষ্ট রাখে। অধিকাংশ সময়ে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সুতরাং তাঁহারা চর্ম্মচক্ষু গোচর জগৎ অতিক্রম করিয়া কাল্পনিক জগতে বিচরণ করেন। এই জন্যই এই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ উদ্ভট মত ব্যক্ত করেন, যাহার সম্ভবাতীততা সাধারণ মনুষ্য অনুমাত্র চিন্তা বিরহিত হইয়া স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে। পক্ষান্তরে তিনি হয়ত দশ বৎসর চিন্তা করিয়া ঐমত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার তদুপরি দৃঢ় প্রতীতি আছে। অনায়াসে তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি মত ত্যাগ করিবেন না। মত প্রচারের নিমিত্ত আজীবন নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিবেন। সঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতবর্ষস্থ অদ্বয়বাদী ও হিউম বর্ক্‌লার প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডস্থ আডিয়ালিষ্টগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় কার্য্যপ্রধান শ্রেণীস্থ লোকেরা সচরাচর সংসারে যাহা দেখিতে পায় তাহাতেই মনোভিনিবেশ করে, এবং তদতীত প্রায় অন্য কোন বিষয়কে মনোরাজ্যে স্থান দেয় না। এই শ্রেণীস্থ লোক মাত্রে প্রায় ঐহিকের জন্য ব্যস্ত হয়, পারলৌকিক কোন বিষয় আলোচনা করে না। প্রত্যক্ষবাদ, হিতবাদ, জড়বাদ ও চার্ব্বাকবাদ, প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই সম্প্রদায়ের দোষ গুণ বর্ণন আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে কোনই আবশ্যক নাই। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, মাণ্ডীবালী দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। সুতরাং তাঁহার মত ভ্রান্ত হউক বা অভ্রান্ত হউক, সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান চর্ম্মচক্ষু গোচর জগত সম্বন্ধীয় কাল্পনিক নহে। সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে অধিকাংশ সৎকার্য্য সুনাম লাভ প্রত্যাশামূলক দেখা যায়, এই জন্যই

* Theoretical.
† Practical.

মাণ্ডীবালী সুনাম অথবা সম্মান লাভকে সৎকার্য্যের মূল রূপে বর্ণন করেন।

মাণ্ডীবালী বলেন, মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপ্রিয়। পর হিত অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কার্য্য কখন মানব জীবনের নৈসর্গিক নহে। পক্ষান্তরে সংসারে যদি সকলেই স্বার্থ ব্যতীত অন্য দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তাহা হইলে অল্পদিনেই সংসার উচ্ছিন্ন হয়। এই জন্য বিজ্ঞ লোকেরা সম্মানের প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অন্যের হিতের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই উক্ত সম্মানের অধিকারী হয়। লোকে এই সম্মান প্রত্যাশায় আপনার সুখবিসর্জ্জন দিয়া পরের হিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং ইহা হইতেই জগতে ভূরি পরিমাণে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। এই রূপে মনুষ্য স্বার্থ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আত্মপ্রশংসা বা আত্মাভিমান পরায়ণ হয়।

আমরা মাণ্ডীবালীর মতের সহিত অনেক পরিমাণে ঐক্য হই ও স্বীকার করি যে সুনাম লাভের জন্যই জগতে অধিকাংশ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।* অভিমানবশতঃ অনেক লোকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। এ বিষয় জ্ঞানাঙ্কুরে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, সুতরাং দ্বিরুক্তি বোধে আপাততঃ পরিত্যাজ্য হইল। পণ্ডিতবর বেন আত্মাভিমান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেন।

মনুষ্য † নির্দ্দোষ ও ভীরু প্রকৃতি। কোন বিশেষ ভাব প্রধান নহে। সুতরাং আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা হইতে পারিত না। তথাপি ধর্ম্ম শাস্ত্রবেত্তারা আত্মাভিমানের উপর দোষারোপ করেন। অভিমান নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন আমি বড় নিচাভিমানী এই বলিয়া সময়েং অভিমান হয়। আত্মাভিমান অনেক সময়ে লোককে সৎকর্ম্মশালী করে। সতীর সতীত্ব এবং বীরের বীরত্ব অভিমান মূলক।

আমরা উপর্য্যুক্ত যুক্তিকে, সম্পূর্ণ না হউক, অধিক পরিমাণে অনুমোদন করি। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, স্থানে স্থানে ইহার ব্যভিচার ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অদ্যাবধি এই পাপ পুণ্যময় সংসারে এমন অনেক লোক আছে ধর্ম্মই যাহাদিগের ব্রত এবং জীবনের এক মাত্র অবলম্বন। সত্য বটে অধিকাংশ লোকই সম্মান প্রত্যাশায় সৎকর্ম্মশালী, কিন্তু এমন সাধুর নিতান্ত অভাব নাই, যাহারা পরলোকের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া লোকের হিতে মনোভিনিবেশ করিয়াছে। ইসা, মহম্মদ, চৈতন্য নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংস্থাপকগণ এই সীমার অন্তর্গত।

অন্বিকিক্ষী সাধারণ সূত্র ✽ কাহাকে কহে? যে বাক্যের ব্যভিচার কখন দৃষ্ট হয় নাই। যদি এক স্থলে তাহার ব্যভিচার দেখা যায়, তাহা অন্বিকিক্ষী সূত্র নামে অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং সম্মান লাভ ইচ্ছারূপ সৎপ্রবৃত্তি কখন অন্বিকিক্ষী সূত্র নহে।

* "The moral virtues are the political offsprings which flattery begat upon pride."

† Man is naturally innocent, timid and stupid, destitute of strong passions or appetites, he would remain in his primitive barbarism were it not for pride. Yet all moralists condemn pride, as a vain notion of our superiority. It is a subtle passion not easy to trace. It is often seen in the humility of the humble, and the shamelessness of the shameless. It stimulates charity; pride and vanity have built more hospitals than all the virtues together. It is the chief ingridient in the chastity of women and in the courage of men.

✽ Inductive truth.

২য়। সম্মান লাভ ইচ্ছা সৎপ্রবৃত্তির মূল হইলে লোকে তদ্দ্বারা যেরূপ সৎকর্ম্মশালী হয়, সেইরূপ সময়ে সময়ে গর্হিত কুকর্ম্মও করিয়া থাকে।

রাজপুত্রগণ বংশ মর্য্যাদা রক্ষা হেতুই কন্যা সন্তানের প্রাণ বধ করে। সুতরাং সম্মান লাভ ইচ্ছা প্রবৃত্তি এইরূপ ক্ষণস্থায়ী যে তাহা হইতে অনেক সময়ে পরস্পর বিরোধী ফলোৎপত্তি হয়।

৩য়। লোকে যে কার্য্যে রত হয়, তাহাতেই অধিক খ্যাত হইতে ইচ্ছা করে। মাতাল অধিক পরিমাণে মদ্য পান ও লম্পট আপনার দুষ্ক্রিয়াতে চাতুর্য্য লাভকে গৌরবের বিষয় মনে করে। সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বদাই দেখা যায় যে লোক প্রত্যেক কার্য্যে বাহবা লাভের জন্য সমিচ্ছুক। কেবল স্থল ভেদে কার্য্য ভেদ হয়। সুতরাং সম্মান লাভ ইচ্ছা মাত্র লক্ষ্য হইলে মানব জীবন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার সর্ব্বদা অন্তরের সহিত ইলিয়াড অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং কল্পনা প্রভাবে বীরজনোচিত কার্য্যেতেই গৌরব ও মনুষ্যত্বের মূল নিহিত আছে মনে করিতেন। কালে তিনি পৃথিবী জয়ের সংকল্প করিয়া কত রাজ্য, কত দেশ ছার খার করিলেন, কত নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ বধ করিলেন। এক মাত্র সম্মান লাভ ইচ্ছা যদি জীবনের সমুদায় কার্য্যের মূল হয়, তাহা হইলে লোকে অনায়াসে আলেকজাণ্ডারের ন্যায় অত্যাচারী হইতে পারে। শিবজী, নেপোলীয়ান প্রভৃতি বীর পুরুষ ও সাম্রাজ্য সংস্থাপকগণের জীবন চরিত এই সম্বন্ধে জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন গিজনীর মহম্মদ সোমনাথের মন্দির অধিকার করিলেন, মন্দিরাধিপতি ব্রাহ্মণগণ গলবস্ত্রে প্রচুর অর্থ প্রদানে সম্মত হইয়া সোমনাথের মূর্ত্তি অবিকৃত রাখিতে প্রার্থনা করিল। কিন্তু মহম্মদ এই কথা বলিলেন লোকে আমাকে যেন পুতুল বিক্রেতা না বলিয়া পুতুল ধ্বংসকারক বলে, এই বলিয়া মহম্মদ সোমনাথের মূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। মহম্মদ পৌত্তলিকতার বিনাস জীবনের মুখ্য কার্য্য মনে করিয়া, তজ্জন্যই জীবন অবসান করিয়াছেন। গ্রীস দেশীয় জনৈক ভূপতি মক্ষিকা বধ করিতে বিশেষ পারগ ছিলেন এবং মক্ষিকা বধ যারপর নাই যশের বিষয় মনে করিতেন। এক জন রোম সম্রাট উৎকৃষ্টরূপে বেহালা বাজাইতে পারিতেন। অশ্লীলতা ভয়ে আমরা বিশেষ হাস্যজনক কএকটা দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলাম না।

৪ র্থ—সংসারে সকলেই প্রকৃতি অনুযায়ীক সুখী। যদি সম্মান লাভই মনুষ্যের নৈসর্গিক হয়, তাহা হইলে মনুষ্যও একমাত্র সম্মান লাভ হইলেই প্রসন্নচিত্ত হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যকে সম্মান দ্বারা কখন সুখী দেখা যায় না। পণ্ডিতবর বল্টের পীড়িত হইলেই নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের শরণাপন্ন হইতেন এবং মৃত্যু কালে, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকায় মানসিক শান্তির অভাবে, যারপর নাই ক্লেশানুভব করিয়াছেন। কথিত আছে বল্টের পরিচারিকা তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণাতে এত ক্লেশানুভব করিয়াছিল যে, বিশেষ ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্যকে অন্তিম কালে সে দেখিতে যাইত না।

৫ মতঃ—সম্মান লাভ মাত্র মানব জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হইলে মনুষ্য

কেবল পার্থিব জীব হয়। আমরা অমর। এ জন্ম কেবল জীবনের শৈশব মাত্র। সম্মান পার্থিব পদার্থ। যত দিন জীবদ্দশাতে থাকা যায়, ততদিনই সম্মান উপভোগ। সুতরাং অনন্ত কালের জীব মনুষ্যের কি প্রকারে সম্মান লাভ মাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে?

উপর্যুক্ত কারণ পরম্পরার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে মাণ্ডিবালীর মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শরৎ।

সু-বি-মল দশ-দিশ, গগণ বি-ভাতে।
পবন বহত মৃদু, শীতল গাতে।।
যুগপত্য মন্দঋতু, খেলত ভুবনে॥
শরত সমাগত, মৃদু মৃদু গমনে।। * ১
বর্ষত মৃদু, জল-ধর তবু,
গত ঋতু-বর বরষা।
বিনু অধি-গত হিম ঋতু তবু,
অবনি-শিশির-স-রসা।।
না হয় ইহ শিশির সময়,
শীতল-বহ-পবন।
অসময় ইহ সুখ-দ-সুরভি,
নিরমল তবু গগণ।। ২
বহু দিন গত ঋতু-নিদাঘ,
খর-কর তবু তপনে।
অদ্ভুত ঋতু-শান্ত-শরত,
বিচরত মরি ভুবনে॥
পাদপ চয় অভিনব-দল,
বীজত মৃদু পবনে।
মঙ্গল-ময় জগত পূর্ণ,
ধবল গগণ গহনে।। ৩
কাশ-কুসুম-সিত,-শোভিত ধরণী!
বি-মল-শশী-সিত,-শোভিত-রজনী॥
ফুল্ল-কুমুদ-সিত,-শোভিত সরস।
ছিন্ন-জলদ-সিত,-শোভিত-নভস।। ৪
বিমল-স-শীকর,-কুসুমবাস-হর,
মৃদুল-সমীরণ বাহে।
স্ফুট-কমলপর, আকুল মধু-কর,
মধু-রস গুঞ্জত তাহে॥
তদুপর নব-রবি, থাপরি নিজ ছবি,
চির অনুরাগ বিলাতে।
দয়িত-মিলন-সুখ,-রুচির-কমল-মুখ,
নিরখি জলাশয় হাসে।। ৫
মঞ্জরীত হরিত-শস্য,
হেলত মৃদু পবনে।
শালি-বি-নত সু-পরি-পক্ক,
কাঞ্চন-বর-বরণে॥
তৃপ্ত-তুষিত-কৃষক-চিত্ত,
ইক্ষু নিরখি নয়নে।
শারদ-ফল-ফুল-শোভিত,-
পাদপ নত গহনে। ৬
লঘু-বল-সহরী, তটিনী বদনে।
দিন দিন কৃশ-তনু, বরিষা বিহনে॥
যাত ত্বরিত খল,-গরব বিলীনে।
অঙ্ক লিখত কৃশ,-সরিত পুলীনে।। ৭
হ্রদিনীগণ শান্ত-সলিল,
শান্তি ধরিল ধরণী।
জীব জন্তু সুখদ কান্তি,
চিত্ত হরিল রজনী।।
ফল-কুসুমিত-ভূ-রুহগণ,
লতিকা বর বরণী।।
মন-মোহন ধরিল বেশ,
যুবতি মরি অবনী।। ৮
প্রাবিষ-ভব সলিল-সিক্ত,
নিরমল তনু ধরণী।
কাশ-কুসুম-ধবল-বসন,
আবৃত বর-বরণী।।
ফুল্ল-কুমুদ-রক্ত কমল,—
গন্ধ-মধুর পরশে।
অমল চন্দ্র-রবি-ময়ূখ,
রুচিরা নিশি দিবসে।। ৯

* সংস্কৃত ছন্দের আদর্শ-স্বরূপ ইহার স্বরের হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও যতি বিবেচনা করিয়া পাঠ্য। অর্দ্ধ যতিতে (।) ও পূর্ণ যতিতে, চিহ্ন অঙ্কিত হইল।

মধু-রস গো-রস অমিয় সমান।
সম সম অংশক নিশি দিন মান॥
ফুটিল মনোহর-ফুল-শেফালী!
হৃদয় উচাটত নিশি হিম-মালী॥ ১০
নীল-গগণ পর, সমুদিত শশ-ধর,
ক্ষরত সুধা-রস ধারা।
হীরক লাঞ্ছন, দী-পত-সু-বরণ,
বিকসিত অগণিত তারা॥
কুমুদ হৃদয় পর, সু-বিশদ-বিধু-কর,
চঞ্চল চলত চকোরা॥
রস-মদ গদ গদ, চালত যুগ-পদ,
চন্দ্রিক পান বিভোরা॥ ১১
রঙ্গ-বিমুখ-রঙ্গ-ভূমি,
পর পদ তল দলিতা।
শারদ-শুভ-উৎসব-সুখ,
ভেল তবুহি ললিতা।
দুর্গোৎসব-সুখ-বিহ্বল,
আর্য্য বংশ উথলে।
কান্ত-মিলন-শান্ত-হৃদয়,
পতি-বি-যুতা সকলে॥ ১২

সভ্যতার ইতিহাস।

সাবাকু। এসাইকিসের মৃত্যুর কিয়দ্দিনান্তে মিসোর, সাবাকু নামক এক জন বিদেশীয় ভূপালের করতলস্থ হয়। সাবাকু মিসোরে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম মিসোরের সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। সাবাকু অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড ও কারাবাস রহিত করিয়া অপরাধের পরিমাণানুসারে নগরাদি উচ্চ ভূমিস্থ করণ অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া লইতেন। মিসোর প্রথমতঃ অতি নিম্নভূমি ছিল। এবং প্রবল বেগবান নীলনদ দেশের মধ্য দিয়া তরঙ্গাকুলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। অধিকন্তু রাজাগ্রগণ্য সিসষ্ট্রীস অনেক খাল খন্দ খনন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ কথা সহজেই বোধগম্য হয় যে, বর্ষাকালে অধিকাংশ স্থল জলাপ্লুত হইত। নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য শোভিত নগর সকল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। অধিবাসিগণ যার পর নাই ক্লেশ পাইত। জলযান ব্যতীত গতি বিধির উপায়ান্তর থাকিত না। সুতরাং মৃত্তিকোত্তোলন দ্বারা মিসোরকে উচ্চভূমি করিয়া যে সাবাকু জনগণের কি পরিমাণে হিত সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

লোকে অধিক উপার্জ্জনশীল হইলেই অধিক ধনশালী হইতে পারে না। সঞ্চয়শীলতা ধনী হওয়ার প্রধান কারণ। অতএব যাহা অলক্ষিতভাবে সঞ্চিত ধন ক্ষয় করে, এবং সঞ্চয়শীলতা প্রবৃত্তির হ্রাস করে, তাহা অবশ্যই ধন সঞ্চয় পক্ষে বিশেষ বাধা স্বরূপ। পক্ষান্তরে ধন সঞ্চয় সভ্যতার অন্যতর (আদিম কালে সর্ব্বপ্রধান) কারণ। সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বর্ষা দ্বারা মিসোরের সভ্যতার বিশেষ অনিষ্ট হইত, অধিবাসিগণের আজীবন ক্লেশে সঞ্চিত দ্রব্যজাত হয়ত, মুহূর্ত্ত মধ্যে জলসাৎ হইত ও বিচিত্র নেত্রানন্দদায়িনী রাজপ্রাসাদে বিভূষিত মহানগরী ভগ্নাবশেষ মাত্র হইত, কত মাতার ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী শিশু জলমগ্ন হইয়া যাবজ্জীবন জননীর হৃদয়কে দারুণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ করিত। সুতরাং মৃত্তিকোত্তোলন দ্বারা যে সাবাকু মিসোরের অশেষ হিত সাধন করিয়া কি সহায়, কি অসহায়, কি বিদ্বান, কি মুর্খ, কি ধনী, কি নির্ধনী, কি স্ত্রী,

কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি সাধু, কি অসাধু, সকলেরই যারপর নাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য বটে, সিসষ্টী সও এবম্বিধ কার্য্যের উপকারীতা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট মিসোর কখনই এ রূপে বিশেষ আবদ্ধ নহে।

এতদ্ব্যতীত এই পদ্ধতি দ্বারা সাবাকু গূঢ় রূপে দেশের অনেক হিত করিয়াছিলেন। সুস্থ শরীর লোক যতই কেন অক্ষম হউক না, দেশের যে পরিমাণে ধনক্ষয় করে, তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম। বস্তুতঃ বিবেচনা করিতে হইলে কয়েকজন অলসপ্রকৃতি ইন্দ্রিয় পরায়ণ সুখ সন্তোষের চিরশত্রু ধনী সন্তান ব্যতীত প্রায় সকলেই জগতের ধন ভাগ ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যে পরিমাণে সুস্থকায় লোকের প্রাণ হানি * করেন, সেই পরিমাণে তাহাদিগের ক্ষমতানুযায়ীক, (অবশ্য তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনজনিত ধনক্ষয় উপায় হইতে বাদ দিতে হইবেক) দেশকে ধন সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করেন।

পক্ষান্তরে ববং (দেশের ধন বৃদ্ধি ক্ষয় মাত্র বিবেচনা করিলে) প্রাণ দণ্ড ভাল, তথাপি দোষী লোকদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া নিষ্কর্ম্মণ্যাবস্থায় না রাখা হয়। কারণ যাহার প্রাণ দণ্ড হয়, তাহার দ্বারা জগতের ধন ভাগ যেমন বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ ক্ষয়ও হয় না। কিন্তু কারারুদ্ধ কার্য্যবিরহিত লোক গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে দেশের ধন ভাগ ক্ষয় করে, কিন্তু নিষ্কর্ম্মণ্যাবস্থায় থাকে, সুতরাং ধন বৃদ্ধি করিতে পারে না। যদিও দোষীকে কারারুদ্ধ করিয়া, কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম্মণ্য রাখিলে, অধিক ক্লেশ * দেওয়া হয়, তথাপি এরূপ বিচারে নির্দ্দোষী জগতের উপার্জ্জনশীল লোকের কিয়ৎ পরিমাণে অনিষ্ট করা হয়, কারণ তাহারা নিদাঘ কালীন দ্বিতীয় প্রহর দিবার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে গলদ্‌ঘর্ম্ম-গাত্রে যে শস্য উৎপাদন করিয়াছে এবং দারুণ দুর্ব্বিসহ মাঘ মাসের নিশীথ সময়ে শীতার্ত্ত হইয়া কাঁপিতে২ যে বস্ত্র বয়ন করিয়াছে, তাহা জগতের কার্য্য সম্বন্ধীয় উদাসীন রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত দোষী লোকে ক্ষয় করে।

অতএব কি প্রত্যক্ষ কি গূঢ় যে রূপেই বিবেচনা কর, সাবাকুর কর্ত্তৃক মিসোরের অনেক হিত হইয়াছে।

* দোষীর প্রাণদণ্ড উচিত কি না? আমরা তদ্বিষয় এ স্থলে আলোচনা করিতেছি না।

* কার্য্যক্ষম বৃত্তি নিচয়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই মনুষ্যের সুখ। (Vide Sir William Hamilton's defination of Happiness.

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মৃণ্ময়ী, কল্পতরু, বালাবোধিনী, বিধবার দাঁতে মিসি প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু সম্পাদকের অতীব শারীরিক পীড়া নিবন্ধন এবারে জ্ঞানাঙ্কুরে সমালোচিত হইল না। ভরসা করি গ্রন্থকারগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গবিজেতা।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ ব্যূহ।

Yet though thick the shafts as snow,
Though charging knights like whirl-
winds go,
Though bellwar ply their ghastly blow,
Unbroken was the ring.
The stubborn spearmen still made good,
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শত্রুরা এক্ষণও মুঙ্গের অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণও অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। প্রেমদাস দিন২ খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন, সুযোগ পাইলেই আপনার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেন,—অল্প সংখ্যক শত্রুসৈন্য কোথাও আছে এরূপ সংবাদ পাইলেই, মহারাজের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার২ এই রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল,—দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, দিন২ তাঁহার বীরত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময়, রাজা টোডরমল্ল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রুর শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী ছিল। অশ্বারোহীগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা এক দৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা শত্রুপক্ষীয় চারি জন অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজার অনুচরগণ না আসিতে আসিতেই শত্রুপক্ষীয়দিগের মধ্যে একজন খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল, এমন সময় নিকটস্থ অভ্রকানন হইতে সহসা অপর এক জন অশ্বারোহী তীরবেগে বহির্গত হইয়া নিমেষ মধ্যে সেই খড়্গধারীর মস্তক ছেদন করিলেন। সকলেই চাহিয়া দেখিল প্রেমদাস! শত্রুগণ বেগে পলায়ন করিল।

প্রেমদাসের বীরত্বের সাধুবাদ করিবার অবকাশ ছিল না। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিলেন দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে। আরও দেখিলেন এক জন অশ্বারোহী বায়ুবেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে,—দেখিলে বোধ হয় যেন অশ্ব ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্ত মধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিলেন সে মহারাজের এক জন চর। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল যে, অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্যে পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল!

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও

অবকাশ ছিল না। চর প্রণাম করিয়া ভীত চিত্তে বলিল "মহারাজ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহোন্মুখ সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, মহারাজ অদ্য সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরের বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া আপনার প্রাণ নাশের জন্য এই অভ্রকাননে চারি জন অশ্বারোহী লুকাইয়াছিল। আর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুই সহস্র অশ্বারোহী অপেক্ষা করিয়াছিল,—সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী এক্ষণে আসিতেছে।" চর এইমাত্র বলিয়া শ্রান্তিবশতঃ ভূমিতে শুইয়া পড়িল।

রাজার অনুচরেরা আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল. রাজা আজ্ঞা দিলেন,

"তোমরা ও অশ্বারোহী, দুর্গের দিকে ধাবমান হও, শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব।"

সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অশ্ব চালন করিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি প্রেমদাস দূরে ধূলি দেখিয়াই আপন রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীও সেই অভ্রকাননের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত ছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। তখন প্রেমদাস রাজাকে বলিলেন,

"মহারাজ! যদি আজ্ঞা পাই, আমার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে ক্ষণেক বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা সচ্ছন্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।"

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,

"অজ্ঞান বালক! যুদ্ধের উচিত সময় হইলে টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না। বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।"

প্রেমদাস আবার বলিলেন,

"মহারাজ! ক্ষমা করুণ, দিল্লীশ্বরের অধীনের পঞ্চশত অশ্বারোহী বিদ্রোহীদিগের দুই সহস্রের সহিত সমতুল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

রাজা সরোষে উত্তর করিলেন,

"সেনাপতির আজ্ঞার উপর উত্তর করিলে প্রাণ দণ্ড হয়,—এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" কিঞ্চিৎ পরে মৃদু স্বরে বলিলেন "প্রেমদাস! আমার দুর্গের মধ্যে সেনাগণ যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে, তোমার অধীন পঞ্চশত অশ্বারোহীই আমার প্রধান সম্বল, তাহাদিগকে আমি অন্যায় যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারি না।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে২ সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্গের সম্মুখে পরিখা; সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিলেন পরিখার উপরিস্থ সেতু ভগ্ন হইয়াছে! যে নরাধম শত্রুদিগকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং অশ্বারোহীদিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই!

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শত্রুদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "পার হইতে না হইতে শত্রু আসিয়া পড়িবে, তখন কাপুরুষের ন্যায় শত্রু কর্ত্তৃক সকলে আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের কার্য্যকর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও এইক্ষণেই কাষ্ঠের নূতন সেতু নির্ম্মিত হউক, যত

ক্ষণ নির্ম্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। প্রেমদাস, তুমি সেনাপতি, এবার সেনাপতির কার্য্য কর।"

"ভৃত্য সাধ্যমত কার্য্য করিবে" বলিয়া প্রেমদাস ব্যূহ নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল। ব্যূহ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীতে এক শত অশ্বারোহী। প্রথম শ্রেণীর পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি। সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাদের পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন হইবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রেণীই এক২ বার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে পরিখার জল, সে দিক হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা নাই,—সেই পরিখার নিকট কয়েক জন দুই চারিটী নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া শেতু বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রু আসিয়া পড়িল, প্রেমদাসের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল।

আজি প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মুঙ্গের নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অদ্য যেরূপ দুই পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই রাজা টোডরমল্ল পরাস্ত হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা সাগর তরঙ্গের ন্যায় বার২ ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যূহ ভাঙ্গিবার নহে,—পর্ব্বত শেখরের ন্যায় বার২ শত্রু দলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রুরা অধিক সংখ্যক বলিয়া তাহাদিগের বড় উপকার হইল না, কেন না প্রেমদাস যেরূপ কৌশলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যূহ আক্রমণ করিতে পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি শত্রুরা অদ্য বার২ সিংহ গর্জ্জন করিয়া সিংহবিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, বীরমদে উন্মত্ত হইয়া বার২ ভীষণ শব্দ করিয়া সেই ব্যূহ ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রেমদাসের সৈন্যেরাও সাহসে হীন ছিল না। অদ্য তিন চারি মাস অবধি প্রেমদাসের অধীনে যুদ্ধ করিয়া যে যুদ্ধ কৌশল শিখিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষ অদ্য স্বয়ং রাজা টোডরমল্লের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। প্রেমদাস তীরের মত ব্যূহের এ পার্শ্ব হইতে ও পার্শ্বে, এ দিক হইতে ও দিকে অশ্ব চালন করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতে ছিল, দেখিয়া২ সেই২ স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন এবং আপনার বিচিত্র অস্ত্রচালনা দ্বারা শত্রুপক্ষকে কম্পিত করিতে ও স্বপক্ষকে উৎসাহে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে২ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন," "আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে," "আজি দীল্লিশ্বরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে" এই রূপ উৎসাহ বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ উল্লাসে পরি-

পূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, সে ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ ভিন্ন হইতে লাগিল, শক্রর হৃদয় কম্পিত করিতে লাগিল!

তথাপি দুই সহস্র সৈন্যের সহিত পঞ্চশত সৈন্যের যুদ্ধ সম্ভবে না,—প্রেমদাসের সেনাগণ একে২ নিহত হইতে লাগিল। শক্রদিগেরও অনেক জন হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে হানি নাই, পঞ্চশতের মধ্যে এক শত জন হত হইলে অনেক হইল। দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, সেতু নির্ম্মাতাদিগকে শীঘ্র২ কার্য্য সমাধা করিতে বলিলেন ও আপনি সিংহ-বীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেনাদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন। একবার প্রেমদাসকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন,

"প্রেমদাস, তুমি আপন সৈন্যদিগকে যেরূপ রণ শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু যেরূপ সেনাগণ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয় রণে ভঙ্গ দিবে"

প্রেমদাসের মুখ রক্ত বর্ণ হইল,—বলিলেন,

"মহারাজ, আমার সৈন্যদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভঙ্গ দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ এক জন অশ্বারোহী থাকিবে, ততক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ হইবে।"

রাজা পুনরায় বলিলেন, "তথাপি এরূপ বীরগণের হত্যা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বেদনা হইতেছে। যাহারা এরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় বোধ হয়,—এক জন বিদ্রোহীর দোষে অন্যায় সমরে দিল্লীশ্বরের কত বিক্রান্ত সাহসী সৈন্যের প্রাণ বধ হইতেছে।"

প্রেমদাস পুনরায় উত্তর করিলেন,

"মহারাজ, যদি হস্ত নিক্ষিপ্ত তীর শক্রর বক্ষঃস্থল ভেদ করে, তবে সেই তীর পুনরায় হস্তে ফিরিয়া আসিল না বলিয়া কি কেহ আক্ষেপ করে? বীর পুরুষ যদি সম্মুখ যুদ্ধে শক্র বিনাশ করিয়া সমরশায়ী হয়েন, তাহা হইলে কি তাঁহার জন্য আবার আক্ষেপ করা কর্ত্তব্য?"

রাজা টোডরমল্ল প্রকৃত আক্ষেপের কারণ বলিলেন না। প্রকৃত যুদ্ধের সময় সহস্র লোকের বিনাশেও টোডরমল্ল কখনও আক্ষেপ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু এ প্রকৃত যুদ্ধ নহে,—দুই সহস্রের সহিত পঞ্চশতের যুদ্ধ কেবল নরহত্যা মাত্র। বিশেষ রাজা জানিলেন যে, কেবল তাঁহার প্রাণ রক্ষা হেতু পঞ্চশত যোদ্ধা দুই সহস্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। "আমার প্রাণ রক্ষা! আমি কি স্ত্রীলোক যে আমার প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য লোকে যুদ্ধ করিবে? বীরপুরুষ ত আপনি আপনার প্রাণ রক্ষা করে।" রাজা অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বেগে সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

প্রেমদাসও লম্ফ দিয়া পুনরায় সম্মুখে গমন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "আজি আমাদের উৎসবের দিন, নিজের শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিব; দিল্লীশ্বরের নাম গৌরব বর্দ্ধন করিব। যোদ্ধার ইহা অপেক্ষা আর কি আনন্দ আছে? বীরগণ অগ্রসর হও।"

যোদ্ধাগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া পুন-

রায় সিংহগর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে সিংহগর্জ্জনেও আকাশ ভিন্ন হইল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল।

সন্ধ্যার ছায়ায় ক্রমেং যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার বূহ ভঙ্গ হইল না! এক জন অশ্বারোহী হত হয় তাহার স্থানে অপর এক জন অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, সে হত হয় আর এক জন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হয়। শ্রেণী যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, সৈন্যদিগের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বর্দ্ধন হইতে লাগিল। প্রেমদাস যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাঁহার সৈন্যেরা শিখে নাই। আজি রাজার জীবন রক্ষার ভার আমাদের হস্তে, সকলেরই এই কথা স্মরণ ছিল, সকলেই সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছে, কেহই পশ্চাতে দেখিতে জানে না। ক্রমেং রজনীর অন্ধকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিল, যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধাদিগকে আচ্ছন্ন করিল, হত ও আহতদিগকে আচ্ছন্ন করিল, অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আচ্ছন্ন করিল কিন্তু সে অপরূপ যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে আশ্চর্য্য বূহ ভঙ্গ হইল না। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অশ্বারোহীর সে ভীষণ গর্জ্জন চারিদিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, আকাশের মেঘ পর্য্যন্ত কম্পিত হইল,—দুই সহস্র অশ্বের যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল! কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে প্রেমদাসের বূহ কম্পিত হইল না। সে ভীষণ গর্জ্জন ভীষণতর গর্জ্জন দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিল, সে আক্রমণকারীদিগকে আবার তাহার দূরে নিক্ষেপ করিল। যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে অপরূপ বূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্ম্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে আসিয়াছেন শুনিয়া প্রেমদাসের সৈন্যগণ একেবারে সিংহগর্জ্জন করিল,—সে গর্জ্জন এক ক্রোশ দূরে শত্রু শিবির প্রবেশ করিল। তখনই তাহারা জানিল, যে জন্য দুই সহস্র সৈন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারীগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া নীরবে নিজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল, যতক্ষণ রাজা টোডরমল্ল সেতু পার হইতেছিলেন, প্রেমদাস এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, প্রেমদাস সহসা আপন অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। শত্রুর বর্ষাতে তাঁহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ দিক ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়াছিল। বলশূন্যতা বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

প্রেমদাসের সৈন্যেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিলেন। শত্রুগণ যাইবার সময় দেখিল প্রেমদাস স্বয়ং আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া প্রেমদাসকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। প্রেমদাস বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

The soldier's hope the patriot's zeal
  For ever dimmed, for ever crossed
Oh! who shall say what heroes feel
  When all but life and honor's lost.

The last sad hour of freedom's dream
And valor's task moved slowly by
While mute they watched till mornings beam,
Should rise and give them light to die.
There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss
If death that world's bright opening be,
Oh! who would live a slave in this.
Moore.

রাজা টোডরমল্ল যখন শুনিলেন, যে প্রেমদাস আহত হইয়া শত্রুদিগের বন্দী হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিল না। বলিতে লাগিলেন, "আজি দিল্লীশ্বরের যথার্থই পরাজয় হইয়াছে! প্রেমদাস তুমি আমার জন্য বন্দী হইলে? তোমার পিতা যখন আমার নিকট একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়া চাহিবেন,আমি কি বলিব।" প্রেমদাসের জন্য শিবিরের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। গৌরব ও সম্পদের দিনে প্রেমদাস সকলের সহিত সদাচরণ করিতেন, সামান্য সেনার প্রতিও অতিশয় বাৎসল্য ও দয়ার সহিত আচরণ করিতেন, সকলের সহিত আত্মনির্ব্বিশেষে কথা কহিতেন। সুতরাং আজি প্রেমদাসের বিপদের দিনে সকলেই তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাজার দুই এক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি রাজাকে বলিলেন,

"মহারাজ! আর আমাদের দুর্গের ভিতর থাকিবার আবশ্যক নাই। আজ্ঞা করুন, শত্রুকে আক্রমণ করি। তাহা হইলে এক্ষণও প্রেমদাসকে পাইব,— আমাদের অবশ্যই জয় হইবে।"

রাজা উত্তর করিলেন,

"প্রেমদাসকে হারাইয়াছি, ভগবান্ জানেন পুত্রশোকেও আমার এরূপ দুঃখ হইত না, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধে গমন করিলে তোমাদের মত বিশ্বাসী আর দুই চারি জন যে সেনাপতি আছেন, তাঁহাদেরও হারাইব।"

সে। "কেন? আপনি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছেন কি জন্য?"

রা। আমাদের সৈন্যেরা যদি যুদ্ধ করে, তাহা হইলে অবশ্য জয় লাভ হইবে। কিন্তু তোমাদের মত কয় জন বিশ্বাসী সেনাপতি আছে? আমি আশঙ্কা করি, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেই আমার অধিকাংশ সৈন্য শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিবে।"

সে। "আপনি এরূপ আশঙ্কা কি জন্য করিতেছেন?"

রা। "সেনাপতি! টোডরমল্ল কখনই অমূলক আশঙ্কা করে না। কল্য যখন আমরা দুর্গের বাহিরে গিয়াছিলাম, কি প্রকারে আমাদের পশ্চাতে সেতু ভগ্ন হইয়াছিল? কি রূপে শত্রুরা আমাদিগের গূঢ় বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিল? এক প্রহর কাল আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম, কি জন্যই বা তাহার মধ্যে দুর্গ হইতে কেহই পরিখা পার হইল না, আমাদিগের সাহায্যার্থ আইসে নাই?"

সে। "মহারাজ, আমাদের সৈন্যেরা জানিতে পারে নাই, জানিলে অবশ্যই আপনার সাহায্যে যাইত। তাহারা সকলেই দুর্গের অপর পার্শ্বে ছিল, কল্য একটা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই সকলে রত ছিল,

রা। "সত্য। আমি জানি অধিকাংশ সৈন্য উৎসবে মত্ত ছিল, আমাদিগের যুদ্ধ কথা কিছুই জানিতে পারে

নাই। কিন্তু আমি জানি, একজন সেনাপতি ত্রিংশৎ সহস্র আশ্বারোহী লইয়া পরিখার অপর পার্শ্বেই অবস্থিতি করিতেছিল। পামর গোপনে যেরূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, আমার সমক্ষে যদি সেইরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহস করিত, তাহা হইলে কল্যই আমাদের বিপদের সময় বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যোগ দিত। সেনাপতি! এইরূপ সৈন্য লইয়া তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দাও? তাহা হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুর কৌশল জালে পতিত হইতে হইবে।"

প্রেমদাসের জন্য সকলেই দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতভাগিনী বিমলা একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। বিমলা যে দিন নদী হইতে প্রেমদাসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে প্রেমদাস বিমলাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সরলার প্রতি প্রেমদাসের প্রগাঢ় প্রেম ছিল; ছয় বৎসর কাল হইতে যে বালিকাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ সরলার পূর্ব্ব গৌরব, এক্ষণকার দারিদ্র ও নিরাশ্রয়তা,সরলার সুন্দর অকপট বদনমণ্ডল ও সরল অকপট অন্তঃকরণ, সরলার রুদ্রপুরে কুটীরে বাস ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম,——এ সকল কথা যখন প্রেমদাসের হৃদয়ে জাগরিত হইত, তখন লৌহ বর্ম্মের ভিতরও তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইত, তখন যুদ্ধ সজ্জায়ও প্রেমদাসের চক্ষু শুষ্ক থাকিত না। যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভীষণ পরিশ্রমের পরও প্রেমদাস নিশিযোগে সেই নিস্তব্ধ শান্ত পাদপাচ্ছাদিত রুদ্রপুর স্বপ্নে দেখিতে পাইতেন,—সেই সরল চিত্ত বালিকা ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে, অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া সূতা কাটিতেছে, অথবা চন্দ্রালোকে উদ্যানে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে প্রেমদাসের সহিত কথা কহিতেছে! সে কথা কি সুধাময়—প্রেমদাস মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন, স্বপ্নে যেরূপ সুখ অনুভব করা যায়, জগতে কি সেরূপ সুখ আছে?

কিন্তু যদিও সরলার প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম ছিল, তথাপি বিমলাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ রমণী কে? অদৃষ্টপূর্ব্ব, অসীম রূপরাশিসম্পন্না এ অল্প বয়স্কা যুবতী কে? মহেশ্বর মন্দিরে সহসা দেখা দিয়াছিলেন, ভিখারিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, দুই চারিটি সুধা পরিপূর্ণ কথায় প্রেমদাসের হৃদয় আনন্দিত করিয়াছিলেন। আবার সহসা এক দিন অপরূপ বেশে দেখা দিয়া প্রেমদাসকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, আপনাকে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন অথচ প্রেমাশায় জলাঞ্জলি দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন! এ অপরূপ কন্যা কে? মানুষী না দেব কন্যা? যেরূপ উজ্জ্বল লাবণ্যবিভূষিতা, তাহাতে দেবকন্যা বা বিদ্যাধরী বলিয়া বোধ হয়,—সেরূপ উজ্জ্বল রূপরাশি প্রেমদাস কখনও দেখেন নাই, সরলার স্তিমিত সৌন্দর্য্য তাহার সহিত তুলনা হয় না।

এ স্থানে পাঠিকাগণ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তবে কি প্রেমদাসের বিমলার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল?" সত্য কথা বলিতে ভয় হয়, কিন্তু সত্য না বলিলেও নয়——অপরূপ রূপলাবণ্যবিভূষিতা, পূর্ণযৌবনসম্পন্না

রমণী রত্নের বিষয় বার২ চিন্তা করিলেও কিছুই প্রেমের সঞ্চার হয় না, এরূপ যোগী পুরুষ কে আছে ? প্রেমদাস সে-রূপ যোগী পুরুষ ছিলেন না,—আমরা স্বীকার করিতেছি, সে অপরিচিতা সুন্দ-রীর কথা ভাবিতে২ প্রেমদাসের হৃদয় কখন২ চঞ্চল হইত, ঈষৎ বিচলিত হইত। পাঠিকাগণ ইহা শুনিয়া রুষ্ট হইবেন, প্রেমদাসকে নিন্দা করিবেন, ধিক্কার দিবেন। আমরাও নিন্দা করি-তেছি, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রেমদাসের হৃদয়ে বিমলার জন্য যদি কিছু প্রেম সঞ্চার হইয়া থাকে, সে এত সুক্ষ্ম যে প্রেমদাস আপনিও তাহা জানি-তেন না,—জানিলে তিনি আপনিই আপনাকে নিন্দাবাদ করিতেন, সে অন্যায় প্রেম উৎপাটিত করিতে যত্নবান হইতেন।

আর বিমলা! হতভাগিনী, দগ্ধহৃদয়া বিমলা মুঙ্গেরে পিত্রালয়ে কিরূপে ছিলে-ন ? তিনি প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের চিন্তায় জলা-ঞ্জলি দেওয়া রমণীর সাধ্য নহে। সে গূঢ় চিন্তা কোরকের ভিতর কীটের ন্যায়, বস্ত্রের ভিতর অগ্নির ন্যায় নিভৃত রহিল। —নিভৃত রহিল, কিন্তু হৃদয়কে স্তরে২ দগ্ধ করিতে লাগিল। আশ্রয়হীনা সরলা যেরূপ প্রেমদাসের প্রেমে নিমগ্ন হইয়া-ছিল, হতভাগিনী বিমলাও সেইরূপ হইলেন। তথাপি বাহ্যিক ভাব ভঙ্গী ও কার্য্যে সরলার ও বিমলার প্রেমে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। বনাশ্রমের শান্ত বৃক্ষতলে দিবা রাত্রেই বালিকার নয়ন দুইটী অশ্রুতে আপ্লুত হইত,—সরলা সময় পাইলেই কমলা বা অমলার নিকট দুঃখ কথা বলিয়া শান্তি লাভ করিত বিমলাকে কেহ কখনও প্রেমের নাম উচ্চারণ করিতে শুনে নাই, কেহ কখনও নয়নবারি বর্ষণ করিতে দেখে নাই প্রেম চিন্তারূপ অগ্নিশিখায় হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু মুখে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না, কার্য্য কর্ম্মে সকল সময়ে মনোযোগী, ধীর, শান্ত। দিন গেল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাস অতি-বাহিত হইল, বিমলার আকৃতিতে কেহ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ করিল না—— কেবল মাত্র বদনমণ্ডল দিনে২ ঈষৎ রক্তশূন্য হইল ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল —কেবল মাত্র তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন দিনে২ এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে লাগিল, তাহা ভিন্ন দৈনিক কার্য্যে বিম-লার দাস দাসীরাও কোন বৈলক্ষণ্য দেখিল না। বিমলার পিতা রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক কোন বিশেষ কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বিমলার মুখমণ্ডলে যে অল্প পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল, দাস দাসীরা স্থির করিল, পিতার চিন্তাই তাহার কারণ।

এরূপ সময়ে বিমলা এক দিন সহসা শুনিলেন, প্রেমদাস আহত হইয়া শত্রু দিগের বন্দী হইয়াছেন! রমণীর হৃদয়ে অনেক সহ্য হয়, সকল সহ্য হয় না,— বিমলার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। তথাপি সে মর্ম্মান্তিক ব্যথাও কাহাকে বলিলেন না, নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন, নীরবে রজনী দুই প্রহরের সময় সপ্তদশ বর্ষীয়া কামিনী একাকী অসহায় পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অসহায় সংসার সাগরে ঝাঁপ দিলেন।

পর দিন প্রাতে দাস দাসীগণ বিম-লাকে আর দেখিতে পাইল না। বিমলা কোথায় ? হতভাগিনী কি আর জীবিত

আছে? পাগলিনী কি আত্মহত্যা দ্বারা অসহনীয় দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, উৎক্ষিপ্ত হৃদয়কে শান্তি দান করিয়াছে?—ভীষণ চিন্তা!—কিন্তু না করিবে কি জন্য? যাহার ইহকালে সুখ নাই সুখের আশা নাই, যাহাকে ভগবান কেবল মাত্র দুঃসহ দুঃখভার বহন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন সে যদি ভগবান দত্ত—সে জীবন লইতে অস্বীকৃত হয়,—সে যদি সেরূপ জীবনকে উপলখণ্ডের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া সেই দুঃখভারের সহিত সেচ্ছাপূর্ব্বক কালের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে,—কে বলিবে সে পাপাত্মা বা অকৃতজ্ঞ,—কে বলিবে তাহার সে কার্য্যে দোষ স্পর্শে।

এ দিকে শত্রুরা প্রেমদাসকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেক ক্ষণ পর পুনরায় প্রেমদাসের চেতনা সঞ্চার হইল। তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে সামান্য লোক হইলে ভয়ে হতজ্ঞান হইত।

দেখিলেন তাঁহার চারি দিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ সিংহাসনে মাসুমী কাবুলী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামান্য পাঠান ওমরাহ ও অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। প্রেমদাস তাহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্খান ও হুমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। প্রেমদাসের পশ্চাতে নিষ্কোষিত অসি হস্তে সহস্র সেনা দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—যদিও প্রেমদাস এক্ষণে হীনবল তথাপি শত্রুরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, আহত সিংহও লম্ফ দিয়া ব্যাধদিগকে সংহার করিতে পারে, এই ভয়ে সহস্র খড়্গধারী প্রেমদাসকে রক্ষা করিতেছিল। প্রেমদাসের নিকটে ভীষণাকৃতি জল্লাদ কুঠার হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, প্রভুর দিকে নিমেষশূন্য লোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই এই ভীষণ বৈরীর শিরশ্ছেদন করিবে। প্রেমদাস কিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত হইলেন না। তীব্র দৃষ্টিতে মাসুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাসুমীও প্রেমদাসকে চেতনাবস্থায় দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

হিন্দু! তুমি বীর পুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ,—বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন!”

প্রেমদাস ভীষণ স্বরে উত্তর করিলেন,

“যোদ্ধা মৃত্যু আশঙ্কা করে না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, যাহা ক্ষমতায় থাকে কর, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।”

মসুমী প্রেমদাসের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন,

“টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গ দেশের প্রাচীন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?”

প্রেমদাস পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,

“বঙ্গ দেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবর সাহের জন্য আমি বিদ্রোহী পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।”

সকলেই ভাবিলেন প্রেমদাস অপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন মাসুমী সেই ক্ষণেই প্রেমদাসের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু মহানুভব সাহসী মাসুমী হীনবল অসহায় হিন্দুর এরূপ নির্ভীকতা

দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আহ্লাদিত হইলেন। ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,

"বীর! তুমি যে প্রকারে আমার সহিত আচরণ করিতেছে, অন্য কেহ হইলে তাহার সমুচিত দণ্ড দিত, আমি এবার তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম—কিন্তু তুমি বঙ্গ দেশের প্রাচীন রাজবংশকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না। যাঁহারা ক্রমান্বয়ে চারিশত বৎসর এই বঙ্গ দেশে রাজত্ব করিয়াছেন,—বখ্তীয়ার খিলজীর সময় হইতে যে পাঠানেরা একাধীশ্বর হইয়া হিন্দুদিগকে শাসন করিয়াছেন, তোমার পিতা, তোমার পিতামহ তোমার প্রপিতামহ যে রাজবংশের অধীনে বাস করিয়াছেন,সেই পাঠান বিদ্রোহী, না অদ্য যে অন্যায়াচারী দিল্লীর অধীশ্বর চাতুরী ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের পুরাতন সাম্রাজ্য লইতে চাহে সে বিদ্রোহী?"

প্রেমদাস পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,

"পাঠান রাজ! আপনারা বঙ্গদেশের পুরাতন অধিপতি আমি অস্বীকার করি না। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনাদিগের অধীনে বাস করিতেন অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন জাতির জয় পরাজয় চিরস্থায়ী নহে, কোন জাতির সুদিন বা দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী নহে, উন্নতি অবনতি চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি তাহা না হইত, যদি পুরাতন রাজাদিগের শাসন চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে মুসলমানেরা কোথায় থাকিত, তাহা হইলে আজি হিন্দু রাজ্যের গৌরবসূর্য্য চিরান্ধকারে অস্ত যাইত না; তাহা হইলে আমি অদ্য দিল্লীশ্বরের জন্য যুদ্ধ না করিয়া রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ভারতবর্ষের একাধিপতি রাজাদিগের অধীনে যুদ্ধ করিতাম। কিন্তু সে পুরাতন হিন্দুগৌরব অস্তমিত হইয়াছে! পাঠানরাজ! আপনাদিগের গৌরবও তিরোহিত হইয়াছে, বিধির নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেন শোণিতস্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন?"

প্রেমদাসের সগৌরব কথা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই হীনবল আহত যোদ্ধার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মাসুমীর বীরান্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক পীড়া জন্মিয়াছিল। প্রেমদাস যখন তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিক বিরক্ত হয়েন নাই, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের গৌরব অস্তে গিয়াছে, এ কথায় তাঁহার হৃদয়ে শূল বিঁধিতে লাগিল। যে স্বজাতির পুনরুন্নতির জন্য তিনি দিবা নিশি চিন্তা করিতেছিলেন,যে পাঠান রাজ্য স্থাপনার জন্য তিনি মহাপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে কোপের সঞ্চার হইতেছিল, শরীরে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কোপ প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"হিন্দু! তোমরা বিধির নির্ব্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী পাঠানেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না। পাঠান-গৌরব-সূর্য্য এক্ষণও অস্ত যায় নাই।"

প্রেমদাস পুনরায় বলিলেন,

"যে দিন কটকের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁ পরাজিত হয়েন, সেই দিনই পাঠানের গৌরবসূর্য্য অস্তে গিয়াছে। যে দিন সন্ধি কথা বিস্মৃত হইয়া দায়ুদ খাঁ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই দিন পাঠানদিগের বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ হয়। দায়ুদ খাঁ নিজ শোণিতে সে বিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করেন ;—সেই অবধি যেং পাঠান সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই পাঠানই সেইরূপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন।"

মাসুমী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। ভীষণ স্বরে বলিলেন,

"হিন্দু ! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ ?"

নির্ভীক প্রেমদাস সেইরূপ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন।

"আমার জীবনের আশা ভরসা এক্ষণও শেষ হয় নাই, সুখের দ্রব্য, মায়ার দ্রব্য, ভালবাসার দ্রব্য এক্ষণও আমার সকলই আছে ;—কিন্তু এসকল থাকিতেও যখন তোমাদের হস্তে পড়িয়াছি, তখন জীবনের আশা রাখি না।"

মাসুমী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?"

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,

"সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে,—যাঁহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ভীরু, যাঁহারা নিজের জয় সংশয় করেন, তাঁহারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না। পাঠানের হস্তে আমি ক্ষমার প্রত্যাশা করি না।"

অনেকক্ষণ কথা কহিতেং প্রেমদাসের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, বিশেষতঃ শেষে যে কথা কহিতেছিলেন তাহাতে বক্ষ হইতে পুনরায় শোণিত স্রোত নির্গত হইতে লাগিল।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন,

"পামর ! কৌশল বাক্যের দ্বারা ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না।"

প্রেমদাস পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,

"আমি কোন প্রত্যাশা করি না,—কেবল এই প্রত্যাশা করি, যে জল্লাদ আপন কার্য্য শীঘ্রই নিষ্পন্ন করিবে। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, বিলম্ব করিলে যোদ্ধা কিরূপে মরে তাহা দেখিতে পাইবে না।"

মাসুমী উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে। জল্লাদ বিলম্বে কার্য্য নাই।"

কিন্তু জল্লাদকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না। প্রেমদাসের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ত্বরায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পুনরায় চেতন শূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে আহত, বলহীন, চৈতন্যহীন যোদ্ধার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না। বলিলেন "অধুনা কারাগারে লইয়া যাও।"

প্রেমদাস কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

—০—

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রমণীর বীরত্ব।

The midnight passed and to the massy door
A light step came—it paused,—it moved
once more ;

Slow turns the grating bolt and sullen key :
'Tis as his heart foreboded—that fair she !
Wate'er her sins to him a guardian saint,
And beautious still as hermits hope can paint ;

° °

" Why shouldst thou seek an outlaw's life, to spare,
" And change the sentence I deserve to bear ? "

° °

" Why should I seek ?—hath misery made thee blind,
" To the fond workings of a woman's mind ?
" And must I say ? Albeit may heart rebel,
" With all that woman feels but should not tell—

° ° °

" Reply not, tell not now thy tale again,
" Thou lov'st another—and I love in vain :
" Though fond as mine her bosom, form more fair,
" I rush through peril which she would not dare. "

Byron.

একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে এক জন বীর পুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন । কারাগারের একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রৌদ্র আসিতেছে, অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই রৌদ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । অসংখ্য অতি ক্ষুদ্রং পতঙ্গ সেই রৌদ্ররেখায় খেলা করিতেছে,—উঠিতেছে—নাবিতেছে,—একবার রৌদ্র-রেখায় দেখা যাইতেছে, আবার অন্ধকার রাশিতে লীন হইতেছে । দুই একটী ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া যাইতেছে,—সে বন্দী নহে,—পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ শাখায় বিচরণ করিতে পারে, জগৎ সংসার ও আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে পারে । বীর পুরুষ সেই তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন,—অন্ধকারস্থিত লতা পল্লব যেরূপ বাহু বিস্তার করিয়া আলোকের দিকে ধায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে । বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন ? রৌদ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিয়া ও নিজ অবস্থা স্মরণ করিয়া কি খেদ করিতেছেন ? পতঙ্গগণ এক দিন মাত্র কি এক প্রহর মাত্র জীবিত থাকে,—বন্দী কি সেই এক প্রহর বা এক দিনের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন অভিলাষ করিতেছেন ? বাতায়নাগত পক্ষীগণ যখন পুনরায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দীও কি তাহার সঙ্গেং মানসপক্ষ বিস্তার করিয়া সুন্দর জগৎ সংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্য্যটন করিতেছেন ?

প্রেমদাস এ সকল চিন্তা করিতেছেন না । তাঁহার হৃদয়কন্দরে ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক চিন্তার উদ্রেক হইতেছে । তাঁহার আর জীবনের আশা নাই,—পাঠানেরা যদি সেই সময়েই তাঁহাকে হত্যা করিত, তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠুর পামরেরা তাঁহাকে কারাবাসে রাখিয়া চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে । প্রেমদাস যোদ্ধা,—যোদ্ধার মৃত্যুতে ভয় নাই । কিন্তু তিনি মরিলে অন্যের কি ক্লেশ হইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন । তাঁহার পিতা পুন্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ এই বার্দ্ধক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিলে জীবন ত্যাগ করিবেন । নগেন্দ্রনাথের আর কেহই

নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই, অন্য পুত্র নাই, বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, সেই পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে, হৃদয় শূন্য হইবে, বৃদ্ধ প্রাণ ত্যাগ করিবেন। পিতার কথা স্মরণ করিতে২ প্রেমদাসের চক্ষুতে জল আসিল, যোদ্ধা চক্ষুর জল মোচন করিলেন।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেমবিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা, কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে? সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিস্ফুট পুষ্পের ন্যায় নীরবে অসময়ে শুখাইবে। চিন্তা করিতে২ প্রেমদাসের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল,—বলিলেন "ভগবন! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, বিধির নির্ব্বন্ধে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তাযাতনা সহ্য করিতে পারি না।"

পাঠানদিগের মধ্যে প্রেমদাসকে পীড়ার সময় যত্ন করে এরূপ কেহই ছিল না। কারাগারের পার্শ্বে প্রহরীগণ নিঃশব্দে খড়্গ হস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় এক জন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত,—আহার সাঙ্গ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। মধ্যে২ কোন নিষ্ঠুর পাঠান সেনাপতি প্রেমদাসের এই দুর্দ্দশায় উপহাস করিতে আসিতেন, অথবা কোন যথার্থ সাহসী, উন্নত চরিত্র সেনাপতি, শত্রুপক্ষীয় বীর পুরুষের হীনাবস্থা দেখিয়া যথার্থ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে আসিতেন। শত্রুর উপহাসে প্রেমদাসের হৃদয়ে কিছুমাত্র বেদনা হইত না,—যাহার যথার্থ গুণ আছে, সে কবে সামান্য লোকের উপহাসে কাতর হয়?——কিন্তু শত্রু হইয়াও প্রেমদাসের দুঃখে যথার্থ দুঃখ প্রকাশ করিলে প্রেমদাসের হৃদয় দ্রবীভূত হইত।

পাঠানশিবিরের মধ্যে প্রেমদাসের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল। যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই প্রেমদাসের দুঃখে যথার্থ দুঃখিনী। দাসী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের পাঠান মোগল জ্ঞান নাই, শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, পরের দুঃখে চির কালই দুঃখিনী আমাদের সুখের সময়, সম্পদের সময়, আহ্লাদের সময় রমণী কতবার দ্বেষ করেন, কতবার ক্রোধ করেন, কতবার মুখরা হইয়া কলহ করেন, কিন্তু যখন জীবনাকাশে দুঃখরূপ মেঘরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে, যখন আমাদের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আমরা ভীষণ নৈরাস্য তিমিরে আচ্ছন্ন হই, যখন ক্লেশে বা শোকে বা পীড়ায় আমরা বিহ্বল হই, তখনই রমণী যথার্থ আপন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন রমণীর মত আমাদের দুঃখে কে দুঃখিনী হয়, আমাদের পীড়ায় কে শুশ্রূষা করে, আমাদের শোকে কে ভরসা দান করে, আমাদের বিপদে কে আশ্বাস দেয়? পীড়ার শয্যায় অনিদ্র,

অবিশ্রান্ত হইয়া দিবা নিশি কে উপবেশন করিয়া পাড়িতের শুষ্ক ওষ্ঠে জল দুগ্ধ দান করে? শোকের সময় আপনার হৃদয় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া কে অবারিত অশ্রু বর্ষণে আপন বসন সিক্ত করিয়া আমাদের সমদুঃখিনী হয়? বিপদের সময় কে অনন্ত মায়ার ভাণ্ডার হইতে অনন্ত অজস্র মায়া স্রোতঃ দ্বারা আমাদের শান্ত্বনা দেয়? জগতে রমণী রত্নের মত রত্ন নাই। স্বর্গে কি আছে?

প্রেমদাসের দুঃখে সেই দাসীই যথার্থ দুঃখিনী। প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই সুপুরুষের দুঃখ দেখিয়া অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত। নির্দ্দয় পাঠান বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিয়াছিল,—শয়নের জন্য ভূমিতে কেবল মাত্র তৃণশয্যা রচিত হইয়াছিল,—দরিদ্রা দাসী প্রেমদাসের জন্য আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা মণ্ডিত করিয়া যাইত। পাঠানেরা প্রেমদাসকে দিনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র অপকৃষ্ট আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া বহু পরিশ্রমার্জ্জিত অল্প ধন ব্যয় করিয়া প্রেমদাসকে নানা প্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত, প্রেমদাস তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রেমদাসের পীড়ার সময় পাঠানেরা কোন চিকিৎসক পাঠায় নাই, দাসী, প্রেমদাস সুপ্ত বা পীড়ায় জ্ঞান শূন্য থাকিলে, তাঁহার ক্ষত গুলি নয়ন জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত। সেই করুণাজল সেচনে প্রেমদাসের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। প্রেমদাস প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে২ দাসীর দুঃখ একং বার লক্ষ্য করিতেন। অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, সস্নেহে কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে২ প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিত। প্রেমদাস আবার নিস্তব্ধ হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন

প্রহরীগণ দাসীর এই স্বাভাবিক করুণা দেখিয়া কখন২ উপহাস করিত, বলিত "এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে শাদী করিবে?" এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন২ উত্তর দিত, কখন২ প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত। সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া চৌকি দিবার সময় সেই নব প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত,—নিদ্রার সময় স্বপ্নে সাকী ও সুরা পেয়ালার কথা ভাবিত।

অদ্য রজনীতে দাসী রক্ষকদ্বয়কে সুরাপন করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল দাসী সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিল প্রহরীদ্বয়ের মন একেবারে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। একে সেই স্বর্গীয় সুরা তাহার উপর কুরঙ্গনয়না সাকী স্বহস্তে ঢালিয়া দিতেছে,—প্রহরীদ্বয় কখন২ দুই একটী বায়েৎ শুনিয়াছিল, সুরাদেবীর প্রভাবে সেই বায়েৎ মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রহরীদ্বয় অজ্ঞানাবস্থায় শয়ন করিয়া পেয়ালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। আজি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গভীর নীল আকাশে

সহস্র মেঘ রাশীকৃত হইতেছে, দূরে কিছুই দেখা যায় না। দূরে গঙ্গানদ অতি শান্ত মৃদু কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অপর পার্শ্বে অনন্ত বৃক্ষাবলী সেই অনন্ত বারিরাশির উপর লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। জগতে শব্দ মাত্র নাই—কেবল মধ্যে২ বৃক্ষকোটর হইতে পেচক ভীষণ শব্দ করিতেছে, আর মধ্যে২ প্রহরীগণ ভীষণতর স্বরে শিবির রক্ষা করিতেছে।—আর সমস্ত জগৎই সুষুপ্ত।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যায় বীর পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। আজি ইচ্ছাপুর নগরস্থ তাঁহার বহু মূল্য পালঙ্ক কোথায়? পিতার স্নেহ, সরলার ভালবাসা, রাজা টোডরমল্লের বাৎসল্য ভাব এ সমস্ত কোথায়? বীর পুরুষ সেই তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। জগৎ তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময়, জীবন শোক পরিপূর্ণ, নিদ্রাই তাঁহার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী আরাম।

প্রেমদাসের ললাট পরিষ্কার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন,—এ দুঃখসাগরে তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? দেখিতেছেন যেন আজি সপ্তম পূর্ণিমা,—যেন অদ্য তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে গিয়াছেন,—যেন বহু দিন পর হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিতেছেন,—যেন তাঁহার নয়নজলে সরলার কৃষ্ণ কেশরাশি সিক্ত হইতেছে, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইতেছে। নিদারুণ বিধি! যে হতভাগার পক্ষে কিছুই নহে, জগতে সুখ নাই, তাহাকে এমন স্বপ্ন হইতে কেন জাগরিত কর,—এমন সুখের নিদ্রা থাকিতে থাকিতে কেন সে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয় না?

সরলার অশ্রু জলে যেন প্রেমদাসের হৃদয় অধিকতর সিক্ত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ অধিক শীতল হইতে লাগিল। শীত বোধ হওয়াতে প্রেমদাস জাগিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, যথার্থই শ্রাবণ মাসের বারি ধারার ন্যায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে অশ্রুধারা পড়িতেছে—নিকটে দাসী বসিয়া নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে!

প্রেমদাস শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর মায়া ও দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন "দাসি! হতভাগার দুঃখে তুমি কি জন্য দুঃখিনী, আমার জন্য ক্রন্দন করিও না, আমার আর জীবনের আশা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন। তুমি আমার দুঃখ বিস্মরণ হও;—আমি আমার কারাবাসের এক মাত্র বন্ধুকে জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না।"

দাসী উত্তর করিল না,—নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

প্রেমদাস আপন দুঃখবেগ সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন—"দাসি! আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি এরূপ আমার কিছুই নাই, যাহা আছে তাহা তোমাকে দিলাম" এই বলিয়া আপন বাহু হইতে সুবর্ণ বলয় দাসীকে দিতে উদ্যত হইলেন।

দাসী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন,

"প্রেমদাস! আমি ভিখারিণী বটে, কিন্তু অর্থ ভিক্ষা করি না।"

বিমলার কণ্ঠধ্বনি যে একবার শুনি-

য়াছে সে কদাচ বিস্মৃত হইতে পারে না। প্রেমদাস শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,

"একি ভিখারিণি! তুমি আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, দাসীবেশ ধারণ করিয়াছ,—শত্রু শিবিরে আগমন করিয়াছ?

বিমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,

"জগতে কোন্ স্থান আছে,—নরকে কোন্ স্থান আছে যথায় প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী প্রেমের জন্য যাইতে ভয় করে?

প্রেমদাস বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টিতে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন ভয়ের চিহ্ন নাই, খেদের চিহ্ন নাই, উন্নত অবয়বে অসাধারণ সাহস ও অলৌকিক বীরত্ব বিরাজ করিতেছে?

বিমলা বলিলেন,

"প্রেমদাস! আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সঙ্কল্প করিয়াছি,—প্রহরীগণ চৈতন্য শূন্য হইয়াছে,—আপনি রমণীর বেশ করিয়া চলিয়া যাউন, পথে জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বলিবেন 'আমি ভিখারিণী দাসী'"

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,

"আমি শত্রুর হস্ত হইতে, মৃত্যুর হস্ত হইতে অন্ধকারে রমণীর বেশ ধারণ করিয়া পলাইব না,—সে পুরুষের কার্য্য নহে।"

মানিনী—বিমলার বদনমণ্ডল আরক্ত বর্ণ হইল, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে২ বলিলেন,

"স্ত্রীজাতি আপনাদিগের ঘৃণার পাত্র, বীরপুরুষ তাহাদিগের বেশ ধারণ করিতে স্বীকার করিবে কি জন্য?"

প্রেমদাস মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন,

"ভিখারিণি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তাহা বলি নাই। রমণী আমাদিগের প্রেমের পাত্র, আমাদিগের জীবনের জীবন। বিশেষ তুমি আমার এক দিন জীবন রক্ষা করিয়াছ, অদ্য আমার রক্ষার জন্য স্বয়ং দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছ, যে দিন আমি এ উপকার বিস্মৃত হইব, যে দিন তোমাকে তাচ্ছিল্য করিব, ভগবান যেন সেই দিন আমার নিধন সাধন করেন।"

বিমলা ধীর স্বরে বলিলেন,

"তবে রমণীর বেশ পরিধান করিতে সঙ্কোচ করিতেছেন কি জন্য?"

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,

"রমণী কোমলা, প্রেমবিহ্বলা, ক্লেশ সহনে অক্ষমা! এ গুলি রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোমলতা ও অসহিষ্ণুতা যোদ্ধার পক্ষে খাটে না,—যোদ্ধা এই জন্যেই রমণীর বেশ ধারণ করিতে সঙ্কোচ করে।"

বিমলার বদনমণ্ডল আবার রক্ত বর্ণ হইল,—বলিলেন,

"প্রেমদাস! আপনি রমণীজাতিকে জানেন না, রমণীজাতির সহিষ্ণুতা কখনও আপনি দেখেন নাই। গত কয়েক মাস হইতে আপনার যশে মুঙ্গের পরিপূরিত হইয়াছে, আপনি বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল যুদ্ধ কার্য্যে যে সহিষ্ণুতা দেখাইতেছেন, সমস্ত বঙ্গ দেশে তাহা রাষ্ট্র হইয়াছে! কিন্তু আমি এই অন্ধকার নিশি সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, এই মুঙ্গেরে এক জন রমণী আছেন, যে আপনা অপেক্ষাও দুর্ব্বহনীয় ভার,

ভীষণতর যাতনা, আপনা অপেক্ষা অপরূপ সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে বহন করিযাছে,—আহতা কপোতীর ন্যায় নীরবে আপন হৃদয়ের ক্ষত সহ্য করিয়াছে! প্রেমদাস! ভগবান্ আপনাকে অনেক দিন নিরাপদে রাখুন, কিন্তু বিধির ইচ্ছা কেহই জানিতে পারে না।—কল্য যদি আপনি সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিজয় লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হয়েন, আর আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর পাঠানগণ যদি আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করে, জানিবেন যে আপনি যেরূপ ভয় শূন্য, উল্লাস পরিপূর্ণ হৃদয়ে যোদ্ধার মরণ স্বীকার করিবেন,—আপনার উদ্ধার সাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছি, এই বিশ্বাসে এই অভাগিনী তদপেক্ষা উল্লাসের সহিত মরিতে সম্মত হইবে! জানিবেন যে সে অগ্নিরাশি দর্শনে আমার মস্তকের একটী কেশও কম্পিত হইবে না, নয়নে এক বিন্দু জলও লক্ষিত হইবে না! জানিবেন যে যখন অগ্নিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইবে তখন পর্য্যন্ত ওষ্ঠে বীরদর্প ও সহিষ্ণুতার হাসি বিরাজমান থাকিবে,—পাঠানগণ রমণীর শরীর ভস্মীভূত করিতে পারে কিন্তু রমণীর বীরত্ব জয় করিতে পারিবে না, প্রেমদাস, নারীজাতিকে সহিষ্ণুতায় অক্ষম বলিও না,—সহিষ্ণুতার জন্যই নারীজাতি জন্ম গ্রহণ করে।”

এই কথা শুনিয়া প্রেমদাস স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—অনিমেষ লোচনে সেই বীরাঙ্গনার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই গম্ভীর আকৃতি, সেই উন্নত প্রশস্ত ললাট, সেই কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে সেই অনলবিক্ষেপী নয়নদ্বয়, সেই রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, সেই কম্পিত হৃদয় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষণ পর বিমলা আবার অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,

“প্রেমদাস, ক্ষমা করুন, আমি প্রেমের পরিচয় দিতে আইসি নাই, আপন অহঙ্কারার্থও আইসি নাই, যাহা বলিলাম বিস্মরণ হইবেন।”

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,—“ভিখারিণি! আজি যাহা দেখিলাম জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না,—স্ত্রীলোকের বীরত্ব নাই, একথা আর আমি কখনও বলিব না;—কি করিতে হইবে বল, আমি তোমার বেশ ধরিতে সম্মত আছি,—কিন্তু আমি গেলে কিরূপে তোমার উদ্ধার হইবে?”

বিমলা বলিলেন “আমার জন্য চিন্তা করিবেন না আমার উদ্ধারের উপায় আছে,—উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই, ভিখারিণীর জন্য চিন্তা করিবে, ভিখারিণীর জন্য শোক করিবে জগতে এরূপ কেহ নাই। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটী জলবিম্ব যেরূপ লীন হইয়া যায় তদ্রূপ এই জগৎ সংসারে একজন হতভাগিনীর মৃত্যু অশ্রুত, অলক্ষিত, ও অচিন্তিত থাকিবে। ভগবান আমার স্থানে জগতে যাহাকে পাঠাইবেন তাঁহাকে যেন আমা অপেক্ষা সুখী করেন।”

প্রেমদাস বিমলার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীর ভাবে বলিলেন ভিখারিণি! তুমি আমার উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছ, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল তোমার নিকট বাধিত রহিলাম কিন্তু তোমাকে এই স্থানে

রাখিয়া আমি কারাগার ত্যাগ করিব না,—উপরোধ করিও না।”

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন,—কিছুতেই বীর পুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না। প্রেমদাসের একই উত্তর,—“যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধার প্রার্থনা করি না;—এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কায নাই।”

বিমলা পরাস্ত হইলেন। বসিয়া অনেক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন,

“প্রেমদাস! আপনাকে দুঃখ দেওয়া আমার সঙ্কল্প নহে, কিন্তু আর উপায়ন্তর নাই,—আমি আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন, আপনার উদ্ধার বাঞ্ছনীয় কি না, বিচার করুন।”

প্রেমদাস শুনিতে লাগিলেন;—বিমলা অনেকক্ষণ পর অতি কষ্টে বলিলেন,

“আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী সরলা আজি চতুর্বেষ্টিত দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আগত পূর্ণিমার পরপূর্ণিমার মধ্যে যদি আপনি তাঁহার উদ্ধার না করেন, তবে পামর শকুনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন।”

প্রেমদাস সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—ললাট হইতে স্বেদ বিন্দু বিনির্গত হইতে লাগিল, নয়নে নিমেষ নাই, স্পন্দ নাই! বিমলা তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রেমদাস নীরবে শুনিলেন,—নীরবে হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন। মস্তকে শিরা স্ফীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল, হৃদয়ের ভিতর মুহূর্ত্তেং যেন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রেমদাস ধীরেং মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন,

“ভিখারিণি! তোমার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব,—কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা কর।”

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি প্রতিজ্ঞা?”

প্রেমদাস বলিতে লাগিলেন,

“যদি কল্য উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখ,—যদি নৃশংস পাঠানেরা তোমার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার কর মাসুমীর নিকট এক দিবসের সময় প্রার্থনা করিও। আমি মাসুমীকে বিলক্ষণ জানি,—অবলার এ যাচ্ঞায় কখনই অস্বীকৃত হইবেন না—এক দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে।”

বিমলা প্রতিশ্রুত হইলেন।

তখন বিমলা প্রেমদাসকে স্ত্রী বেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। প্রেমদাস আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন। আবার বিমলার দিকে চাহিলেন,—সে হাসি শুখাইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে বিমলার হস্ত দুইটী আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,

“ভিখারিণি! দুইবার তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে, আমি চিরকাল তোমার নিকট ঋণী রহিলাম।” নয়নের অশ্রু বেগে বহিতে লাগিল, বিমলার হস্ত সিক্ত হইল, প্রেমদাস বেগে বহির্গত হইলেন। বিমলা তখন বাক্

শূন্য হইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল, অপার্থিব সুখে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল! প্রেমদাসের মধুর বাক্যে তাঁহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেছিল, প্রেমদাসের প্রীতি-সূচক নয়নজলে তাঁহার হস্ত সিক্ত হইতেছিল,—বিমলা স্ত্রীলোক,—মুহূর্ত্তের জন্য একবার বীর প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য প্রেমদাসকে লইয়া সুখী হইবেন, এইরূপ আশা জাগরিত হইল! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য সেই প্রেমময় বীর পুরুষকে মনেং আপন স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অভাগিনি! তোমার স্বামী কে? বিমলা সহসা সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল,—প্রেমদাসের দিকে চাহিলেন,—প্রেমদাস নাই,—হৃদয় শূন্য হইল,—মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

Heard ye the din of battle bray,
Lance to lance and horse to horse.

Grey.

প্রেমদাসকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা ছিল না। কিন্তু প্রেমদাস গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক বর্ম্ম পরিধান ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হও,—এই ক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিব।"

সৈন্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল।

প্রেমদাস এই অবসরে নিকটস্থ এক শিবমন্দিরে যাইলেন। ক্ষণেক উপাসনা করিলেন, পরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন "ভগবন্! অদ্যকার মত অসংসাহসী কার্য্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই, অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয় লাভ করিতে দিন, বিজয় লাভ করিয়া যদি প্রাণ হানি হয়, ক্ষতি নাই,—পিতাকে কুশলে রাখুন" —পিতার সঙ্গেং আর একটী নাম প্রেমদাস উচ্চারণ করিলেন,—আর এক জনের কুশল প্রার্থনা করিলেন, নিঃশব্দে সকলে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

রজনী দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, আবার মেঘ রাশিতে আবৃত হইতেছে, মধ্যেং পেচকের ভীষণ শব্দ ও নিশার ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, ও নিকটস্থ গঙ্গার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে প্রেমদাসের সেনা নিঃশব্দে শত্রু শিবিরাভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতেং দূর হইতে একটা আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক এক বার দেখা যায়, অন্য বার নির্ব্বাণ প্রায় হয়। প্রেমদাস দাঁড়াইলেন। এক জন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বলিল "শত্রু পক্ষের চারি জন শিবির রক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে, অন্ধকারে কেহ না যাইতে পারে বলিয়া অগ্নি জ্বালাইয়াছে।" প্রেম-

দাস ১০ জন তীরান্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ দিলেন " যদি ঐ চারি জনের মধ্যে এক জনও পলাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের ১০ জনের প্রাণ সংহার করিব "। তীরান্দাজগণ ধীরে২ যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। প্রেমদাসের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। এক স্থানের এক জন রক্ষক পলায়ন করিল। প্রেমদাস চিন্তিত হইলেন। আদেশ দিলেন " অশ্ব ধাবিত করিয়া আইস, রক্ষক শিবিরে পঁহুছিবার অগ্রে আমরা যাইব।"

অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম পরিখা পার হইয়া অপর পার্শ্বে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় দুই শত জন পদাতিক শিবির রক্ষা করিতেছিল, আর সকলে সুপ্ত। সে দুই শত জন সেনা সহসা শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল ও পলায়নপর হইল,—পলায়ন কাহাকেও করিতে হইল না, সকলেই ভূতলশায়ী হইলেন।

প্রেমদাস শত্রু হস্তে পতিত হওয়া অবধি নিশাযোগে কখনও শত্রু শিবির আক্রান্ত হয় নাই। এখনও প্রেমদাস কারারুদ্ধ আছে জানিয়া শত্রুরা নিশ্চিন্ত চিত্ত ছিল, এই নিমিত্তই প্রেমদাস অনায়াসে প্রথম পরিখা পার হইতে পারিলেন।

তথায় প্রায় তিন চারি শত তাম্বু ছিল অনুমান তিন হাজার সেনা ছিল। প্রেমদাস এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া আদেশ দিলেন " পশ্চাতে শত্রু সৈন্য রাখা কর্ত্তব্য নহে, অথচ এই সৈন্যদিগের বিনাশ করিবার আমার অবসর নাই, পদাতিকদিগকে বল এই তাম্বু সমুদায়ে অগ্নি প্রদান করে ও এই শত্রু ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হয় " এই বলিয়া প্রেমদাস ও অশ্বারোহীগণ অশ্ব ধাবিত করিয়া শীঘ্রই দ্বিতীয় পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইলেন।

এ দিকে পদাতিকগণ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিখার মধ্যস্থ সমস্ত তাম্বুতে অগ্নি প্রদান করিল। শত্রু-সৈন্যগণ কেহ বা নিদ্রিত কেহ বা জাগরিত হইয়াছে। যাহারা জাগরিত হইল তাহারা সহসা মোগল সৈন্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পলায়নতৎপর হইল, কিন্তু পলাইবার পথ নাই, চারিদিকে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। তথায় এক সহস্র মাত্র মোগল সৈন্য ছিল, কিন্তু পাঠানেরা তাহা জানিত না, তাহারা অনুমান করিল রাজা টোডরমল্লের সমস্ত সৈন্যই আসিয়াছে। পাঠানেরা সকলে এক্ষণও জাগরিত হয় নাই, যাহারা হইয়াছে তাহারা রণসজ্জা করিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং অনায়াসে মোগলদিগের হস্তে নিহত হইতে লাগিল।

শীঘ্রই তথায় অতি ভীষণ কাণ্ড হইয়া উঠিল। চারিদিক ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই ধূমের মধ্য দিয়া ভীষণ অগ্নি ফলাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সেই গভীর নৈশ গগণ স্পর্শ করিতে চলিল। তাহাতে বিজেতাদিগের ভীষণ যুদ্ধরব ও শত্রুদিগের মৃত্যু যাতনার আর্ত্তনাদ অগ্নির রবের সহিত মিশ্রিত হইয়া কর্ণ ভেদ করিতে লাগিল। এক একবার " দিল্লীশ্বরের জয় হউক " বলিয়া মোগলেরা বজ্র অপেক্ষা উচ্চতর

ও ভীষণতর শব্দ করিতে লাগিল। মধ্যে২ "আল্লা হু আকবর" বলিয়া চিৎকার করিয়া পাঠানেরা নৈরাশে সাহস পাইয়া রিক্তহস্তে মোগলদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, পর্ব্বত শেখরে যেরূপ সমুদ্র বারি তেজে আঘাত করে সেইরূপ তেজে আক্রমণ করিতে লাগিল,—সেইরূপ প্রতিহত ও ভগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এক সহস্রেরও অধিক লোক অগ্নিদাহনে প্রাণ ত্যাগ করিল, শত২ সৈন্য মোগল কর্ত্তৃক নিহত হইল, ও শত শত লোকে নৈরাশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিল, সে বিষম বিপদে কাহারও রক্ষা নাই। উপরে অগ্নিশিখা এখনও ভীষণ রবে গগণাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, নীচে রক্ত স্রোতে মেদনী ভাসিয়া যাইতেছে ও ভীষণ আর্ত্তনাদ ও ভীষণতর যুদ্ধ রবে আকাশ ও পৃথিবী পরিপুরিত হইতে লাগিল। সেই রব ভেদ করিয়া সহসা প্রেমদাসের ভেরী রব বায়ুমার্গে আগমন করিল;—তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যগণ সেই নৃশংস কার্য্য ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় পরিখা পার হইল।

প্রেমদাস ইতিপূর্ব্বেই দ্বিতীয় পরিখা পার হইয়াছিলেন, কিন্তু পার হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে জয়ের আশা রহিল না। গোলমাল শুনিয়া প্রায় সকল মুসলমান সৈন্যই রণসজ্জা করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা প্রায় তিন সহস্র, প্রেমদাসের সহিত কেবল পঞ্চশত অশ্বারোহী মাত্র। কিন্তু প্রেমদাস ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। শত্রুরা সম্মুখে তিন রেখায় সজ্জিত ছিল। প্রথম রেখার সৈন্যেরা উপবেশন করিয়া অশ্বারোহীদিগের গতিরোধের জন্য বর্ষা উত্তোলন করিয়াছিল,—দ্বিতীয় রেখার সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ নত হইয়া সেইরূপ বর্ষা ধারণ করিয়াছিল, ও কিঞ্চিৎ দূরে তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্যরা দণ্ডায়মান হইয়া বর্ষা ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে, যদি ভীষণ পর্ব্বতরাশি আসিয়া তাহাদিগের মস্তকে পতিত হয়, তাহারা সেই পর্ব্বতরাশির গতি রোধ করিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু প্রেমদাসের গতি রোধ করিতে পারিল না।

প্রেমদাস আদেশ দিলেন, "এ স্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, অগ্রসর হও।" অশ্বারোহীগণ কাহারও উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া অশ্ব ধাবিত করিলেন।

বর্ষাকালে পর্ব্বতশেখর হইতে নদী যেরূপ বেগে অবতরণ করিয়া নিম্নস্থ বৃক্ষ, কুটীর, গ্রাম একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, পঞ্চশত অশ্ব সেইরূপ সৈন্য রেখাত্রয়ের উপর আসিয়া পড়িল। কাহার সাধ্য সে বেগগতি রোধ করে, নদীর বেগ কে ফিরাইতে পারে। তিন রেখা ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, অশ্বের পদাঘাতে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, অনেক সৈন্যের উপর দিয়া অশ্ব লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইল, কতক গুলি অশ্ব ও অশ্বারোহী শত্রুর অনিবার্য্য বর্ষাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল, কিন্তু প্রেমদাসের কার্য্য সাধন হইল, সে রেখা উত্তীর্ণ হইলেন।

কিন্তু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিগুণ বিপদে পড়িলেন। তিন সহস্র শত্রুর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যাই হত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন সকলে এক্ষণে মেঘজালের মত অন্ধকার করিয়া পঞ্চশত অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিল। যাহা মনুষ্য সাধ্য তাহা প্রেম-

দাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পঞ্চশত অশ্বারোহীর পক্ষে এই নিবিড় সেনা রাশী ভেদ করিয়া সম্মুখীন হওয়া মনুষ্য সাধ্য নহে। প্রেমদাস ক্ষণেক চিন্তাকুল হইলেন। "এ সেনা পতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে আমি ভয় করি না, দুই সহস্র শত্রুসেনাকে নিপাত করিয়া আমরা পঞ্চশত জন প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ভিখারিণি! তোমার উদ্ধার হইল কৈ?" এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া আপন ভেরী বাজাইলেন, পদাতিকগণ সেই ভেরী রব শুনিতে পাইয়াছিল;—ভেরী বাজাইয়া শত্রুদিগের সহিত একেবারে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

কাহার সাধ্য সে ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করে? চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, আকাশে ভীষণ মেঘরাশি বায়ুতে ধাবিত হইতেছে, প্রেমদাসের চতুর্দ্দিকে ভীষণতর সৈন্যমেঘ প্রধাবিত হইতেছে। সে পঞ্চশত সেনা ভয় কাহাকে বলে জানে না, প্রেমদাস যতক্ষণ আছেন, অবশ্য জয় হইবে। সেই পঞ্চশত বীর পুরুষের বীরত্ব কে বর্ণনা করিবে। চক্ষুতে নিমেষ নাই,অস্ত্র সঞ্চালনে বিশ্রাম নাই, সহস্র২ সৈনিক চারি দিকে আঘাত করিতেছে, অনায়াসে প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—ভীষণ বায়ু প্রপীড়িত সমুদ্রের মধ্যে পর্ব্বতশেখরবৎ, ভীষণ বাত্যার মধ্যে লৌহ স্তম্ভবৎ তাঁহারা অচল অটল হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। এক জন দুই জন দশ জন হত হইলেন,—ক্ষতি নাই,—চারিদিকে সেনাতরঙ্গ ভীম কলরবে "আল্লা হু আকবর" শব্দ করিয়া মুহূর্ত্তেং বারং আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই, শত্রু সৈন্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্ষার মেঘের মত জড় হইতেছে, বর্ষার বজ্রের মত গর্জ্জন করিতেছে,— ক্ষতি নাই, নিঃশব্দে নিঃশঙ্কে পঞ্চশত যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছেন, ধন্য যুদ্ধ কৌশল! ধন্য বীরত্ব!

অপার্থিব রাক্ষসের মত বলিষ্ঠ ও ভীষণ শত্রুগণ অপার্থিব সাহস ও তেজে আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই। অসুর তুল্য পাঠানেরা তরঙ্গেং আসিয়া আঘাত করিতেছে, দেবতুল্য অশ্বারোহীগণ নিঃশব্দে তাহাদিগকে প্রতিহত করিতেছেন, শীঘ্রই সেই রণস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মৃতদেহের প্রাচীর হইয়া উঠিল, কিন্তু রণস্তম্ভ ভগ্ন হইল না! ধন্য বীরত্ব!

চারিদিকের সৈন্য-মেঘ ক্রমশঃ অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর কোলাহলপূর্ব্বক অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিল। সেই কোলাহল ভেদ করিয়া সহসা আর এক দিক হইতে ভীষণতর কোলাহল গগণে উত্থিত হইল। পাঠানেরা সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইল,—প্রেমদাসের পদাতিক দ্বিতীয় পরিখা পার হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছে! পাঠানগণ স্থির করিল, স্বয়ং রাজা সমস্ত সৈন্য লইয়া আগমন করিতেছেন, কেবল সহস্র মাত্র পদাতিক-আসিয়াছে, অন্ধকারে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পাঠানেরা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন তৎপর হইল,মোগল পদাতিকগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগের সহস্র সহস্রের প্রাণ হিংসা করিল ও তাম্বুতে অগ্নি প্রয়োগ করিল। ইতিমধ্যে প্রেমদাস ও অশ্বারোহীগণ অশ্বধাবিত করিয়া তৃতীয় পরিখার নিকট পঁহুছিলেন।

তখন প্রেমদাস এক বার পশ্চাতে

চাহিয়া দেখিলেন, শত্রুর চিহ্ন মাত্র নাই, শত্রুদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল। দেখিলেন, নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। সম্মুখে দেখিলেন শত্রু সেনা রাশি২ সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও তৃতীয় পরিখা রক্ষা করিতেছে। মনে২ ভাবিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমাদের অধিক ক্ষতি হয় নাই, বোধ হয়, অশ্বারোহী ও পদাতিক এক শত মাত্র হত হইয়াছে, শত্রুরা অগ্নি দাহেই ন্যূন কল্পে তিন সহস্র হত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন দুই এক সহস্র আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। সম্মুখে নিশ্চয় বিনাশ, এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভিখারিণি! দুই বার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার জীবন রক্ষা করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব।" "পরিখা পার হও" এই বলিয়া বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

কিন্তু এবার তাঁহার গতি রোধ হইল। তৃতীয় পরিখার অপর পার্শ্বে সৈন্যরাশী সজ্জিত ছিল, অশ্বারোহীগণ উঠিতে২ তাহারা আসিয়া গতি রোধ করিল, মুহূর্ত্ত মাত্র ভীষণ যুদ্ধ হইল, অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ বেগে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অনেকের প্রাণ সংহার হইল। সতর্ক পাঠানেরা স্বয়ং নীচে না থাকিয়া পুনরায় উপরে যাইয়া পুনরায় আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অশ্বারোহীদিগের মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত শোণিত ও কর্দ্দমে আপ্লুত হইয়াছে। নিঃশব্দে ধীরে২ তাঁহারা উঠিলেন। প্রেমদাস মনে২ স্থির করিলেন, "এই পরিখা পার হইব কিম্বা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিব।"

দ্বিতীয় বার ভীষণ বেগে অশ্বারোহীগণ পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিলেন,—দ্বিতীয় বার ভীষণ যুদ্ধ হইল, দ্বিতীয় বার অশ্ব ও অশ্বারোহী নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। ক্ষতি নাই। তৃতীয় বার ভীষণতর বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন,—এ বার সৈন্যদিগের মস্তকের উপর লম্ফ দিয়া অশ্বগণ উঠিল,—পরিখা পার হইল। প্রেমদাস ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। পঞ্চ শত অশ্বারোহীর মধ্যে তখন কেবল তিন শত জীবিত, আর অন্য দুই শত পরিখায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্রেমদাস পুনরায় ভেরী বাজাইয়া সেই সেনা সমুদ্র ভেদ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, আবার রাশি২ পাঠান সেনা সেই যুদ্ধ স্তম্ভকে আক্রমণ করিল, আবার "রাজা টোডরমল্লের" নাম করিয়া পদাতিকগণ আসিয়া পড়িল, কিন্তু এবার পাঠানেরা ভঙ্গ দিল না ভীষণ কলরবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ;— প্রেমদাস সসৈন্যে বিনাশভিন্ন আর উপায় দেখিলেন না।

সহসা সহস্র বজ্রের অধিক শব্দ হইয়া উঠিল। পাঠানদিগের শিবিরে যে অগ্নি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কোন রূপে যাইয়া বারুদে পড়িয়াছিল, একেবারে কত শত মন বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে বৃহৎ অট্টালিকায় বারুদ ছিল তাহা চূর্ণ হইয়া আকাশে উঠিল, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ঝলসাইয়া যাইল। সে তেজঃ ও সে ভীষণ রবের সম্মুখে মনুষ্যের তেজঃ স্তব্ধ হইল, সহসা যুদ্ধ থামিয়া যাইল, সকলেই সেই দিকে এক দৃষ্টিতে

চাহিল। প্রেমদাস এই অবসরে কেবল পঞ্চ জন মাত্র অতি বিশ্বাসী অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া সহসা বিদ্যুতের ন্যায় তেজে একদিক ভেদ করিয়া চলিয়া যাইলেন। পাঠানেরা তাঁহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া সম্মুখের সহস্র মোগল পদাতিক ও অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

প্রেমদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইয়া কারাগারের নিকট পঁহুছিলেন, তিন চারি জন সেনা বজ্রাঘাতে তাহার লৌহ কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রেমদাস বিদ্যুতের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন,

"ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!"—হরি হরি! ভিখারিণী তথায় নাই। প্রেমদাসের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল, সহসা শরীর অবসন্ন হইল।

তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিলেন স্ত্রীলোকদিগের জন্য ভিন্ন কারাগার আছে। তৎক্ষণাৎ সেই কারাগারে দৌড়াইয়া যাইলেন। ভরসা ও ভয়ে হৃদয় দুরু২ করিতে লাগিল, ঘন২ নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে লাগিলেন, হৃদয় এরূপ স্ফীত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন অস্থি চর্ম্ম ও উপরিস্থিত লৌহ বর্ম্ম বিদীর্ণ হইবে।

স্ত্রীলোকের কারাগারের কবাট সহসা উৎপাটিত হইল। প্রেমদাস দ্রুতবেগে যাইয়া ডাকিলেন "ভিখারিণি" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!"—ভিখারিণী নাই। প্রেমদাসের মুখে আর কথা নাই, ধীরে২ মুখ অবনত করিলেন, হস্ত দিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন,ললাট, ভ্রূযুগল ও সমস্ত বদনমণ্ডল ভীষণ বিকৃতি ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভগবন্, এই কি তোমার মনে ছিল, আমার সকল যত্ন বিফল করিলেন!"

সহসা একটা কথা মনে পড়িল, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে কারাগারের রক্ষককে যাইয়া ধরিলেন, বলিলেন "যে রমণীকে প্রেমদাসের কারাগারে পাওয়া গিয়াছিল সে কোথায়? বলিতে বিলম্ব করিলে মস্তক ছেদন করিব।"

রক্ষক ভীত হইয়া বলিল "বধ্যভূমি," ভয়ে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, আর কথা বাহির হইল না।

তৎক্ষণাৎ পঞ্চ জন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে বধ্যভূমিতে যাইলেন। প্রেমদাস সভয়ে দেখিলেন চারিদিকে পাঠান সেনা জড় হইতেছে, অলক্ষিতরূপে অন্ধকারে বধ্যভূমিতে যাইয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখনও ভরসা ও ভয়ে স্ফীত হইতেছে। যাইয়া দেখিলেন, চারি দিকে ঘোর অন্ধকার "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" এক বার, দুই বার, তিন বার ডাকিলেন, উত্তর নাই,—অন্ধকার বধ্যভূমি হইতে সেই নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রোষে, খেদে প্রেমদাস জ্ঞানশূন্য হইলেন, লৌহমণ্ডিত হস্ত দ্বারা আপন ললাটে আঘাত করিলেন, ঝন্ ঝনা করিয়া শব্দ হইল, ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

আবার ডাকিলেন, "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" কোন উত্তর নাই, এক পার্শ্বে দেখিলেন, অগ্নিরাশি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। নৃশংস পাঠান ভিখারিণিকে দাহ

করিয়াছে? প্রেমদাসের হৃৎকম্প হইল, ভূমিতে পতিত হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন,—সহসা নিকটস্থ তরুকোটর হইতে যেন সেই দীর্ঘ নিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইল!

প্রেমদাস লম্ফ দিয়া উঠিলেন, সেই বৃক্ষের অন্তরালে যাইয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই, কেবল মাত্র রজনী বায়ু এক২ বার ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতেছে, কেবল মাত্র দূর হইতে ভীষণ যুদ্ধ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক২ বার ভীষণ অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে—প্রেমদাস হতাশ হইয়া আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, সহস্র শত্রুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ভিখারিণীর দশা চিন্তা করিয়া আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আবার সে নিশ্বাস যেন প্রতিধ্বনিত হইল। প্রেমদাস বিস্মিত হইলেন, আবার চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, সহসা অন্ধকারে এক মানবাকৃতি দেখিতে পাইলেন,—হরি হরি! একি ভিখারিণি!

ভিখারিণীকে যে অবস্থায় দেখিলেন, তাহাতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। বিমলা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কিন্তু সেই বৃক্ষে আপাদ মস্তক বদ্ধ রহিয়াছেন। হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, পদদ্বয় বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কক্ষ ও বক্ষস্থল রজ্জুদ্বারা এরূপ সজোরে বদ্ধ রহিয়াছে, যে সেই২ স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে, কেশপাশ কতক পশ্চাতে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কতক শরীরের উপর লম্বিত রহিয়াছে। মুখের উপর এক খণ্ড বস্ত্র বদ্ধ রহিয়াছে, কথা কহিবার উপায় নাই। কোটীদেশে কেবল একখানি জীর্ণ বস্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল নিবিড় কেশরাশি জানু পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়া শরীর আবৃত করিতেছেন। বিমলা স্বর্গের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, বদনমণ্ডলে ও নয়নে পরম পবিত্র ভাব আবির্ভাব হইয়া রহিয়াছে, বাহ্যিক বস্তুতে তাঁহার মন নাই, বিমলা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিতেছিলেন, তাঁহার ক্লেশ নাই, খেদ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাঁহার বদনমণ্ডলে কেবল পবিত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

প্রেমদাসের নয়নে শূল বিদ্ধ হইতে লাগিল। বলিলেন "ভগবন্! আজি পাঠানদিগের যাতনা দেখিয়া একবার আমি দুঃখ করিয়াছিলাম,—আর করিব না, নরকেও তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত যাতনা নাই।"

নিঃশব্দে বিমলার শরীরের রজ্জু খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বিমলার এক বার চেতনা হইল,—প্রেমদাসকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন "প্রেমদাস, কি জন্য আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছ, আমার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় আমি এ পাপ প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি" এই মাত্র বলিয়া আবার প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

যে স্বরে এ কথা উচ্চারিত হইল, প্রেমদাস শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অতি ক্ষীণ মৃদু পবিত্র স্বর শুনিয়া প্রেমদাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ভিখারিণি! কথার সময় নাই, তোমার জন্য এক্ষণে বস্ত্র

কোথায় পাইব, আমি এক বার তোমার বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি এক বার আমার বেশ ধারণ কর," এই বলিয়া প্রেমদাস আপন শরীর হইতে লৌহবর্ম্ম খুলিয়া বিমলাকে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। বিমলার সংজ্ঞা নাই, বস্ত্রহীন হইয়া ছিলেন, স্মরণ ছিল না। প্রেমদাস যাহা পরাইলেন, অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় তাহাই পরিলেন।

প্রেমদাস সমস্ত লৌহবর্ম্ম বিমলাকে দিয়া আপনি কেবল শরীরে যে বস্ত্র ছিল তাহাই রাখিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার আদেশে এক জন অশ্বারোহী বিমলাকে আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন, না পড়িয়া যান এই জন্য একটা পেটী দিয়া বিমলার শরীর আপনার শরীরের সহিত বদ্ধ করিলেন। পরে পঞ্চ অশ্বারোহী, যে দিকে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। বিমলা তখনও সংজ্ঞাশূন্য, এক চিত্তে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিতেছিলেন।

পাঠান-সেনা-সমুদ্র ভেদ করিয়া কি রূপে শিবিরে ফিরিয়া যাইবেন, তাহা প্রেমদাস স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল ভগবান ও আপন খড়্গের উপর বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধ শ্রেণীতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিকে পাইয়া মোগল সৈন্যগণ পুনরায় জয়রব করিয়া উঠিল, সে জয়রব আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল।

বারুদে যে অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহা হইতেই প্রেমদাসের অদ্য পরিত্রাণ হইল ও পাঠানদিগের সর্ব্বনাশ হইল। সে অগ্নি নিবৃত্তি না হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য তাম্বু ও অট্টালিকাকে ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভগ্নচেতা হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। সেই জন্য এক সহস্র মাত্র মোগল সেনা এতক্ষণ অধিক সংখ্যক পাঠান সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অগ্নি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে যে দিকে সেনাদিগের স্ত্রী পরিবার ছিল, সেই দিকে অগ্নি লাগিল। পাঠানেরা ব্যাকুল চিত্ত হইল, এই সময়ে প্রেমদাসের আগমনে মোগল সৈন্যেরা জয় জয় করিয়া উঠিল। ভীত পাঠানেরা স্থির করিল, পুনরায় অধিক মোগল সৈন্য আসিয়াছে, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

প্রেমদাসের আদেশে মোগল সৈন্য শিবিরাভিমুখে চলিল। প্রাতঃকাল প্রায় হইয়া আসিয়াছে,—প্রেমদাস ভাবিলেন "যদি এখনও শত্রুরা জানিতে পারে যে আমরা কেবল সহস্র জন মাত্র আসিয়াছি, তাহা হইলে এক্ষণও ফিরিয়া আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিতে পারে, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।" প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই প্রেমদাস সসৈন্যে মুঙ্গের পঁহুছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। "প্রেমদাস কারামুক্ত হইয়াছেন,—হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। মোগলদিগের পঞ্চদশ শত সৈন্যে পাঠানদিগের তিন পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছে, মোগলদিগের পঞ্চশত সেনা মাত্র হত হইয়াছে, পাঠানদিগের ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র সেনা হত হইয়াছে ও সমস্ত তাম্বু, বারুদ,খাদ্য দ্রব্য দাহ হইয়াছে," এ রূপ সংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্যগণ উল্লাসে উন্মত্ত প্রায় হইল। টোডরমল্ল স্নেহসহকারে প্রেমদাসকে আলিঙ্গন করিলেন,

—তিনি কি রূপে উদ্ধার পাইলেন জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অশ্বারোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা রজনীযোগে আপন বস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে পিত্রালয়ে যাইলেন

বঙ্গীয় বিবাহ।

৪। বহুবিবাহকে বঙ্গীয় বিবাহের চতুর্থ দোষ বলিয়া গণ্য করি। অতি জঘন্য কৌলীন্য প্রথাই এরূপ বিবাহের মূলীভূত কারণ। একেত অবিচ্ছেদ্য বঙ্গীয় বিবাহ অশেষ দোষের ও অসুখের কারণ, তাহাতে আবার এক পুরুষ এককালে অধিক সংখ্যক দারপরিগ্রহ করিলে, তাহাতে যে কত প্রকারে কত অশুভ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ বিবাহকারীরা বিবাহকে এক প্রকার ব্যবসায় জ্ঞান করিয়া, অনেক স্থলে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আর এই বহুবিবাহকারী পুরুষদিগের পত্নীবর্গ স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেই বৈধব্য বেদনার দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন, কেবল বিধবাগণের ন্যায় একাদশী করিতে হয় না মাত্র। সুতরাং এস্থলে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি এবং স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যে কখনই প্রকৃত অনুরাগ সঞ্চার হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। দম্পতীর মধ্যে অনুরাগ বন্ধন না থাকিলে, দাম্পত্য ধর্ম্মও যে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হয় না, তাহাও নিশ্চয়। আর যেখানে দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না, অথবা প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা না থাকে, সেখানে অনেক পাপাচরণও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহা কতকটা আনন্দের বিষয় যে, আজিকালি কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদের মধ্যে এরূপ বিবাহ আর বড় দেখা যায় না; ইহা ক্রমে বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির সহ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ভরসা করি আর বড় অধিক দিন এ কলঙ্ক বঙ্গ সমাজে থাকিবে না।

৫। বঙ্গীয় বিবাহের পঞ্চম দোষ, বৈদেশিক বিবাহের অপ্রচলন।* জাতীয় উন্নতি সাধনের এমন সহজ উপায় আর নাই। সুবুদ্ধিশালী হীনবল বাঙ্গালী ভারতবর্ষবাসী অন্য কোন বলশালী আর্য্যজাতির সহিত যদি বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়েন, তবে তাহার ফলস্বরূপ বীর্য্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ সন্তান অবশ্যই জন্মিবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অক্ষয় বাবু, বিখ্যাত ডাক্তার এণ্ড্রু কোম্বের মতের অনুসরণ করিয়া, অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল কথার যাথার্থ্য ও ন্যায় সঙ্গত বুঝিলেও, অদ্যাপি কেহই সে বিষয়ে স্বীকৃত বা কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাহার প্রধান কারণ জাতিভেদ। এই অতীব গর্হিত অসাধু প্রথা যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজের যে কখনই উন্নতি হইবে না, তাহা নিশ্চয়

* ভারতবর্ষীয় ভিন্ন প্রদেশবাসী (যেমন পঞ্জাবী প্রভৃতি) দিগের সহিত আদান প্রদানকেই বৈদেশিক বিবাহ বলিতেছি।

বুঝা যায়। যদিও এবিষয়ে আমাদের কোন কথা বলা, বক্ষ্যমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি প্রসঙ্গাধীন দুই এক কথা বলিতে হইল। জাতিভেদ যে মহানিষ্টের মূল, তাহা বলা বাহুল্য। ইতিহাস ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, যে সময় হইতে জাতীয় বন্ধন বিশেষ কঠিন হইয়া উঠিল, সেই অবধিই হিন্দুজাতির অধোগতি আরম্ভ হইল। ক্রমে জাত্যভিমান যত প্রবল হইতে লাগিল, ততই ভারতবাসীগণের বল বীর্য্য গৌরব হীন হইতে লাগিল। এই জাত্যভিমানই প্রবল হইয়া অধুনা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছে, সুতরাং বাণিজ্যও রহিত হইয়াছে, দেশীয় ধন বৃদ্ধি বন্ধ হইয়াছে, গৌরবও তাদৃশ নাই। এইরূপ কত বিষয়ে যে জাত্যভিমান অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা একবার প্রাচীনকালের অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলেই, অনুমিত হইতে পারে। যত দিন এই জাত্যভিমান প্রবল থাকিবে, তত দিন যে হিন্দুদিগের জাতীয় উন্নতি হইবে না, তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ততদিন বৈদেশিক বিবাহও প্রচলিত হইবে না—বঙ্গ সমাজে হীন বীর্য্য সন্তানের অভাবও হইবে না;—তত দিন বঙ্গ সমাজস্থ লোকদিগের পুনঃ পুনঃ পদাঘাতও সহ্য করিতে হইবে।

যদি সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রাখাই আবশ্যক হয়, (এবং আপাততঃ রাখা আবশ্যক) তাহা হইলেও যাহাতে আশু এই সকল অশেষ মঙ্গলকর নিয়ম সমাজ মধ্যে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা বর্ত্তমানের ন্যায় বিবাহ প্রথা না উঠাইয়া দিয়া প্রচলিত রাখিলে, কখনই মঙ্গল হইবে না। বরং পদে পদে লজ্জাকর ব্যাপারসমূহ চক্ষে দেখিতে হইবে, এবং কলঙ্কিত সমাজ মধ্যে বাস করিয়া মানব নামেরও কলঙ্ক রটাইতে হইবে। আধুনিক বিবাহ রূপ কদর্য্য প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তাহা স্ত্রীলোককে ভয় দেখাইয়া অতীব কঠোর অস্বাভাবিক দাম্পত্য নিয়ম প্রতিপালনে বদ্ধ করাইয়াছে, এবং পুরুষ, অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায়, এ বিষয়েও আপনি সবিশেষ স্বাধীনতা (যথেচ্ছাচারিতা) গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষ স্বয়ং কঠিন দাম্পত্য নিয়মাবলী প্রতিপালনে তত সমুৎসুক নহেন; কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন, যে তাঁহার স্ত্রী সেই পরিমাণে ঐ নিয়ম পালনে অবহেলা করিলে, তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলে, তাঁহার মর্য্যাদা—‘মান সম্ভ্রম’—(ইজ্জত) ইত্যাদির হানি হইবে, তাঁহার মাথা কাটা যাইবে। যে স্ত্রীকে বাস্তবিক তিনি মনের সহিত ভাল বাসেন না, এমন কি তাহাকে অস্পৃশ্য পদার্থের ন্যায় ঘৃণা করেন ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, সেই স্ত্রীর নিকট কোন পুরুষ দাঁড়াইয়া বিরলে কি কথা বলিতেছিল, হয়ত (তিনিই অন্য কোন লোকের স্ত্রীর সহিত ঐ রূপ কথা কহিয়া আসিয়া) এই কথা শুনিলে খড়্গ হস্ত হইবেন এবং সেই পুরুষকে পাইলে কাটিয়া ফেলিবেন। ইহা অপেক্ষা রহস্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এতদপেক্ষা আর অধিক তামসা কোথা দেখা যায়? ইহাতে কি আমাদিগকে পাগল বলিয়া জ্ঞান হয় না? ইহাতে কি আমাদের দাম্পত্য নিয়ম কত নিন্দ-

নীয় তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয় না? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে বিবাহ স্ত্রীকে হাত পা বান্ধিয়া পুরুষ হস্তে সমর্পণ করে, তাহার মানসিক ও কায়িক স্বাধীনতা লোপ করিয়া দেয়,—তাহাকে স্বীয় ভরণ পোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন করিয়া দেয়,—তখন তাহার সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন করা ব্যতীত আর কোন বিষয়ে গুণপনা প্রকাশ পায় না। বিবাহের অখণ্ডনীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মানসিক বল বীর্য্যাদি হরণ করিয়া লয়; সুতরাং সে তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া (যাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার কোন সহজ ও সাধুসম্মত উপায় থাকিলে কখনই মুহূর্ত্ত মাত্রও সহ্য করিত না) এরূপ শত শত অসহ্য অবমাননা ও যন্ত্রণা পুরুষ হস্তে অগত্যা সহ্য করে। পুরুষও বিবাহের এরূপ অখণ্ডনীয়ত্ব অবগত আছে বলিয়াই, স্বাধীন ভাবে স্ত্রীর প্রতি ঐ সকল অত্যাচার করে, এবং স্ত্রীকে হাতে পাইয়া স্বীয় ক্ষমতার অসাধু ব্যবহার করে। অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যায়, বিবাহ পুরুষকে স্বেচ্ছাচারী প্রভু এবং স্ত্রীকে—প্রণয়িনী জীবন সখিকে—দাসীবৎ করিয়া রাখে!!

যে স্ত্রী বা পুরুষ বিবাহের এরূপ কাঠিন্য ক্ষণমাত্র চিন্তা করেন, তাহার আর এরূপ দুর্মোচ্য ফাঁদে পা দিতে কখনই ইচ্ছা হয় না। তবে যে আজিও লোকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা কেবল অন্য কোন সাধুসম্মত উপায়ে দাম্পত্য সুখ সম্ভোগের উপায় নাই বলিয়া। আজি কোন সাধুসম্মত সুযোগ বা উপায় করিয়া দাও, কালি আর কেহ অবিচ্ছেদ্য বিবাহে স্বীকার পাইবে না। বাস্তবিক যদি সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রাখাই একান্ত বিধেয় ও আবশ্যক হয়, তবে আদৌ তাহার এমন কোন নিয়ম হওয়া উচিত যে, দম্পতীর পরস্পরের ইচ্ছা হইলে এবং আবশ্যক জ্ঞান হইলে, তাঁহারা সহজে ও অবাধে পৃথক্ হইতে পারেন, এবং উভয়েই পুনরায় মনোমত ও উপযুক্ত জীবন সহচর বা সখী বাছিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ নির্দ্দিষ্ট ও পরিমিত কাল ব্যাপক হওয়া উচিত; কখনই আজীবনের জন্য হওয়া বিধেয় নহে। এবং এরূপ নিয়ম থাকা আবশ্যক, যে যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই দম্পতীর পৃথক্ হওয়া আবশ্যক হয়, তাহাও অবাধে ও অনায়াসে হইতে পারিবে; এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, যদি তাঁহাদের মনোমিলন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয় এবং একত্রে থাকিলে উভয়েরই সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া বিবেচনা হয়, তবে আর কিছু কালের জন্য (কাল নির্দ্দেশ করিয়া) একত্র থাকিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, প্রণয়ই বিবাহের ভিত্তি স্বরূপ হওয়া বিধেয়। কেননা সেই বন্ধনে যে বিবাহ সূচনা হয়, তাহা অশেষ সুখদায়ক। কিন্তু সেরূপ বিবাহ বঙ্গ সমাজে কয়টা হইয়া থাকে? বঙ্গসমাজের কোন্ স্ত্রী পুরুষ পূর্ব্বে প্রণয়াসক্ত হইয়া পরে বিবাহ করিয়া থাকেন? কে না বলিবে, যে সেখানে উভয়পক্ষেই প্রণয়ই ঘটক, এরূপ বিবাহ অস্মৎ সমাজে দেখা যায় না?—বরং তদ্বিপরীতই সচরাচর ঘটিয়া থাকে; প্রথমে প্রণয়, পরে পরিণয়, তাহা না হইয়া, অগ্রে পরিণয় পরে প্রণয়, সংস্থাপনরূপ অনৈসর্গিক চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখা গিয়া থাকে। তাহার কারণ

এই যে, উভয়ের মনে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় সঞ্চারিত হইবার সুযোগ থাকে না;—বঙ্গ দম্পতী পরিণয় ব্যাপারের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকেন। উভয়ের মনে প্রণয় সঞ্চার হইতে পারিবে বলিয়া, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের সবিশেষ আলাপ পরিচয় হওয়া নিতান্ত বিধেয়। এ বিষয়ের জন্য যে কষ্ট, স্ত্রীলোকেরাই তাহার অধিকাংশ সহ্য করে। এরূপ প্রায় দেখা যায় না, যে স্ত্রী যে পুরুষকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বাস্তবিক ভালবাসে, অথবা ভাল বাসিয়াছে বলিয়াই বিবাহ করিয়াছে। অনেক স্থলেই বিভিন্ন প্রকৃতির ও অবস্থার স্ত্রী পুরুষের সংঘটন হইয়া থাকে। সে স্থলে ভালবাসা দূরে থাকুক, বরং অসুখ ও অত্যাচারই সর্ব্বদা দেখা যায়। তবে যে স্ত্রীলোক পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এবং বাহ্যিক তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখাইতে বাধ্য হয়, সে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের খাতিরে ও ভয়ে। একথা আমরা প্রস্তাবান্তরে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি। অতএব এরূপ বিবাহে স্ত্রীকে বারবিলাসিনী পদবীতে নীতা করে; তবে এই মাত্র প্রভেদ থাকে, যে একের সহবাস সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ, আর অপরের সহবাসে সমাজ সম্মত আছে, সুতরাং দোষাবহ বলিয়া জ্ঞান হয় না। সেখানে স্ত্রী তাহার জীবন সহচরকে প্রণয় ভাজন বলিয়া জ্ঞান না করিয়া, প্রায়ই "ভর্ত্তা" অর্থাৎ ভরণপোষণকর্ত্তা মাত্র বোধ করিয়া থাকে; এবং পুরুষও স্ত্রীকে প্রণয়পাত্রী বিবেচনা না করিয়া "ভার্য্যা" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সকল কারণবশতঃ প্রকৃত প্রণয় সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া, অধুনা কেবল কবির লেখনিতে আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহা শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাতে যে মানব জীবনের এক অতীব প্রধান সুখ সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কি আশ্চর্য্য, যে লোকে এরূপ বিবাহকে সুখকর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে!

তবে কি বঙ্গ সমাজের বিবাহের নিয়মের মধ্যে কিছুই ভাল—কিছুই প্রশংসনীয় নাই?—আছে—একটি বিষয় আছে, তজ্জন্য বঙ্গীয় বিবাহকে শতমুখে প্রশংসা করি। সে নিয়ম সপিণ্ডা বিবাহ নিষেধ। এইটী অতিশয় মঙ্গলকর নিয়ম। নিকট সম্পর্কীয়া কন্যা বিবাহ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়াই যে অবৈধ, এমত নহে; শাস্ত্রকারেরা যে প্রাকৃতিক নিয়মের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়া, ঐ বিবাহকে অন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের বিপরীত, বিরুদ্ধ বলিয়াই সপিণ্ডা বিবাহ অন্যায় ও অশুভকর। স্বভাব এ কথা স্পষ্ট করিয়া শিক্ষাও দিয়া থাকে। যাঁহারা কৃষি বিদ্যায় বিশেষ নিপুন এবং তাহার গূঢ় কৌশল সম্যক্ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, এক ভূমিতে উপর্য্যুপরি এক শস্য রোপণ করিলে, ক্রমে সে শস্যের তেজোহানি হইয়া থাকে, এবং সে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে, অনেক স্থলে ভূমির আর উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। * তদ্রূপ শারীরিক রক্ত দ্বারা সংযুক্ত অতি নিকট সম্পর্কীয় কোন বংশে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিলে তাহা হইতে উৎপন্ন সন্তানাদি ক্রমে

* যেমন তামাকের চাস, যেখানে উপর্য্যুপরি করা যায়, সেখানে ক্ষেত্র মরুত্ব (অনুর্ব্বরত্ব) পাইয়া থাকে।

তেজোহীন ও অল্পায়ুঃ হইয়া আইসে। অনেক স্থলে বন্ধ্যাত্বও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বিবাহ যত দূর-সম্পর্কীয়া কন্যার সহ হয়, ততই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। [আমরা পূর্ব্বে যে বৈদেশিক বিবাহ প্রচলনের কথা বলিয়াছি, তাহারও উপকারিতা এই জন্য।] আমাদের শাস্ত্রকারকেরা এই প্রাকৃতিক নিয়ম সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়াই এই অশেষ মঙ্গলকর অসপিণ্ডা বিবাহের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। সপিণ্ডা বিবাহে শুদ্ধ যে হীনতেজাঃ সন্তান উৎপন্ন হয়, এমত নহে; তাহাতে আরও অনেক অশুভ ঘটিতে পারে। তাহাতে বংশ পারম্পার্য্যে অশেষ বিধ রোগ ও ব্যাধি অচিকিৎস্য হইয়া চলিয়া আসিতে পারে। সুতরাং এরূপ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতীব সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, বঙ্গ সমাজে এই শুভকর নিয়ম প্রচলিত আছে।

আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ছিল, তখনই বিবাহের মন্ত্র সংস্কৃতে পঠিত হওয়া শোভা পাইত। এক্ষণে বঙ্গ সমাজে সংস্কৃতের তাদৃশ আলোচনা বা প্রচলন নাই। বিশেষতঃ সমাজের স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃতজ্ঞা নহেন। সুতরাং বিবাহের মন্ত্রের কি তাৎপর্য্য, তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না। পুরুষবর্গের মধ্যেও অনেকেরই সেই গতি। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ করা, আর চীন দেশীয় ভাষায় মন্ত্র বলা, দুই সমান হাস্যজনক ব্যাপার। অতএব জিজ্ঞাসা করি, যাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বিবাহের মন্ত্রের তাৎপর্য্য এবং উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে পারেন, এরূপ সহজ দেশীয় ভাষায় বিবাহকালে বক্তব্য আবশ্যকীয় কথা গুলি বলিলে ভাল হয় না? আজি কালি আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতারা এই নিয়ম অবলম্বন করিতেছেন; আশা করি, সমাজস্থ অপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও শীঘ্র তাহাই করিবেন।

অদৃষ্টবাদ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, আমাদের বিশ্বাস কি রূপ, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস, আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। তেমন করিয়া ঈশ্বরকে জানিলে—যেমন করিয়া জানা উচিত,তেমন করিয়া ঈশ্বরকে জানিলে—তাঁহাকে এই প্রপঞ্চের মূল বলিয়া জানিলে—যে শক্তিবলে স্বভাবের কার্য্য হইয়া যাইতেছে,যে শক্তিবলে অনন্ত ঘটনাস্রোতঃ বহিতেছে, সেই শক্তি বলিয়া তাঁহাকে জানিলে, ঈশ্বর এবং অদৃষ্টবাদ পরস্পর বিরোধী হয় না; প্রত্যুত অদৃষ্টই মানিতে হয়। অনন্তশক্তি বলে যে কার্য্যমালা গ্রথিত হইতেছে, মনুষ্য কীট—কীটাণুকীট—পরমাণুতে পরমাণু—সাগর সৈকতে বালুকণা, তাহার অন্যথা করিতে পারে শুনিলে কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির না হাসি পায়? এ সাধারণ ঔদ্ধত্য নহে।

কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন উন্নত, এমন মহৎ, এমন গভীর ভাব যে তোমরা একেবারে ধারণা করিতে পারিবে, সে ভরসা আমরা করি না; সুতরাং এ কথা

লইয়া অধিক তর্ক বিতর্ক অনাবশ্যক, কেননা তোমরা ইহা বুঝিবে না। না বুঝ, না মান; কিন্তু তোমাদের ন্যায়, ঈশ্বরকে মানুষে পরিণত করিয়া মানিলেও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। হয় যে, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিতেছি। ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে অবশ্য অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। খ্যাত আমেরিকান দর্শনবেত্তা জোনাথান এডোয়ার্ড্‌স্ এই যুক্তির সম্যক্ সমালোচন এবং সপ্রসারণ করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা তাঁহারই যুক্তি অবলম্বন করিয়া।*

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সব জানেন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানেন; যাহা হইতেছে, তাহা তিনি জানেন; যাহা হইবে, তাহাও তিনি জানেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তিনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব জানেন। কি হইবে, তাহা তিনি যখন নিশ্চয়রূপে জানেন, তখন তিনি যাহা জানেন তাহা অবশ্য হইবে —যাহা জানেন তাহাই হইবে, তদন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহারই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। আমরা যাহা করিব—যে সংকল্প করিব এবং যে কার্য্য করিব, তাহারও ঘটনা অবশ্যম্ভাবী—তাহা তিনি জানেন, সুতরাং তাহা অবশ্য হইবে; আমাদের কি সাধ্য যে তাহার অন্যথা করি? আমরা যাহা কেন মনে করি না, যত কেন আয়াস করি না, যাহা হইবার তাহা হইবে—তাহা করিতে আমারা বাধ্য। আমাদিগকে যদি বাধ্য হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইল, তবে আবার স্বাধীন হইলাম কি দিয়া? ইচ্ছার কার্য্য অবশ্যম্ভাবী—ইচ্ছার স্বাধীনতা কোথা? সূর্য্যদেব যেমন প্রতিদিন উদয়াস্ত হইতে বাধ্য, পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে বাধ্য, নক্ষত্রগণ যেমন জ্বলিতে বাধ্য, নদী যেমন নিম্নভূমিতে যাইতে বাধ্য, চন্দ্রদেব যেমন পৃথিবীকে বেড়িয়া বেড়িয়া ইলিপ্স্ আঁকিতে বাধ্য, যাহা করি, তাহা করিতে, আমরা তেমনই বাধ্য। আমাদের স্বাধীনতা কোথা?

আমাদের ইচ্ছা যদি স্বাধীন হয় অথবা আমরা যদি স্বাধীন জীব হই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য অথবা সংকল্প অনিশ্চিত—ঘটিতে পারে, না ঘটিতেও পারে। যাহা অনিশ্চিত তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে না। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ সংকল্প অথবা কার্য্য নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ইচ্ছা যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার নিজের জ্ঞানেরই বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী। অমুক দিন অমুক কার্য্য নিশ্চয় হইবে বলিয়া তিনি জানেন। কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছা যে স্বাধীন তাহাও তিনি জানেন, কেননা তিনি সব জানেন। সুতরাং তিনি ইহাও জানেন যে, সে কার্য্য না ঘটিতেও পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, যে কার্য্য না হইতেও পারে বলিয়া ঈশ্বর জানেন, সেই কার্য্যই নিশ্চয় হইবে বলিয়া তিনি জানেন—অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁর নিজের জ্ঞানেরই

* Vide Jonathan Edwards' Inquiry into the Freedom of the Will.

বিরোধী। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সুতরাং ইচ্ছা স্বাধীন নহে।

এডোয়ার্ডস্ সাহেবের তর্কের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি হইয়াছে। কেহ২ বলেন যে, আমরা যেমন সময়ের এবং বিস্তৃতির দাস, অর্থাৎ সময় এবং বিস্তৃতি হইতে বিযুক্ত করিয়া কোন বিষয় ভাবিতে পারি না, ঈশ্বর তেমন নহেন। যিনি সময়ের এবং বিস্তৃতির দাস তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না— তিনি ঈশ্বরই নহেন। তাঁহার নিকট কিছুই ভবিষ্যৎ নহে। তিনি সকল বিষয় উপস্থিতের ন্যায় দেখেন, সুতরাং 'অমুক ঘটনা ঘটীবে, ইহা ঈশ্বর জানেন' এরূপ কথা বলা, নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। *

ট্যাপান্ সাহেবের এ আপত্তি নিতান্ত অসার। ঈশ্বর, বিনাসম্বন্ধে সকল বিষয় দেখেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে বিষয়ের আন্দোলন করিবারও এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সকলই উপস্থিত, ইহা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি কোন কাজে লাগে না। ঈশ্বর, সকল বিষয় হইবে বলিয়াই জানুন, হইয়াছে বলিয়াই জানুন, আর হইতেছে বলিয়াই জানুন, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা নাই। তাঁহারই যেন ভবিষ্যৎ নাই—আমাদের ত আছে। তাঁহার জ্ঞানই যেন কালসাপেক্ষ না হইল—আমরা ত কালের দাস। তবে যুক্তির খণ্ডন হইল কই? ঈশ্বর যাহা হইতে দেখিতেছেন, আমাদের পক্ষে তাহা এখনও হয় নাই।

* Vide H. P. Tappans' Review of Edward's Inquiry into the Freedom of the Will.

ইচ্ছা যদি স্বাধীন হয়, তবে আমি তাহা না করিতেও পারি। করি না করি ভিন্ন কথা—না করা সম্ভব ত বটে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? যাহা না ঘটিতেও পারে, তাহা ঈশ্বর ঘটিতে দেখিতেছেন, অথবা যাহা ঈশ্বর ঘটিতে দেখিতেছেন তাহা, আমি মনে করিলে, না ঘটিতেও পারে। আরও বা কি হয়?

কেহ২ বলেন, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা, ঈশ্বর যে নিশ্চিতরূপে জানেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি ভূত এবং উপস্থিত সমগ্ররূপে জানেন। অনন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা হইল, তাহা তিনি জানেন এবং পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘঠনাসমষ্টির কার্য্যমাত্র। অনন্তকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়া গেল, তাহাই পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ। ঈশ্বর সমগ্র কারণসমষ্টি অবগত আছেন, সুতরাং সেই কারণ হইতে যে কার্য্য সমুদ্ভূত হইবে, তাহাও তিনি জানেন, কেননা কার্য্য, কারণের পরিণাম মাত্র। জগতে কিছুই নূতন হয় না—যাহা এখন উপস্থিত আছে, তাহা চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাকিবে;—যে আকারেই হউক, চিরকাল থাকিবে এবং চিরকালই ছিল।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহা হইলে আবার নিয়তি স্বীকার করিতে হইল। ঈশ্বর যখন, কারণ জনেন বলিয়া কার্য্য জানেন, তখন অবশ্য কার্য্য কারণের মধ্যে অবশ্যম্ভাব আছে—নিত্য সম্বন্ধ আছে। কারণবিশেষ হইতে কার্য্যবিশেষের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী না হইলে, কারণ দেখিয়া, কার্য্য স্থিরীকৃত হইতে

পারে না। এক অভিন্ন কারণ হইতে যদি ভিন্ন২ কার্য্য হয়, তাহা হইলে সেই কারণ, কোন্ কার্য্যটি প্রসব করিবে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে না। অতএব অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইল।

এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। ইহার অধিক বলিবার বোধ হয় আবশ্যকতাও নাই। এক্ষণে আর একটি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া, আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি যে, ইচ্ছা অথবা কার্য্যকর্ত্তা স্বাধীন বলিয়া, অনেকের বিশ্বাস আছে; কেন যে আছে, তাহা দেখাইতেও আমরা প্রতিশ্রুত আছি। এক্ষণে তাহাই দেখাইবার যত্ন করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, বলিতে পারিনা।

আমরা যে আপনাকে স্বাধীন বিবেচনা করি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান২ কয়েকটীর কথা আমরা বলিতেছি।

প্রথমতঃ। স্পাইনোজা বলেন যে, এ বিশ্বাসের একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আমাদের অভিলাষ এবং সংকল্পনিচয় স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু যে কারণবশতঃ সে অভিলাষ অথবা সে সংকল্প হইল, তাহা অনেক সময়ে দেখিতে পাই না। সুরাপায়ী যখন মত্ততাবস্থায় রহস্যোদ্ভেদ করে, তখন অবশ্য মনে করে যে, স্বাধীনভাবে বলিতেছি। প্রকৃতিস্থ থাকিলে হয়ত প্রাণান্তেও সে কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। সুরার অপার মহিমা তাহা টানিয়া বাহির করিল, অথচ সে মনে করিল, আমি স্বাধীনভাবে বলিলাম। সে ইহা মনে করে, কেননা সে দেখিতে পায়না যে, এই তরল অগ্নি সকল খাইদ গলাইয়া বাহির করিতেছে।

লাইবনিজও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—ডেকার্ট যে আমাদের আন্তরিক জাজ্বল্যমান বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছার স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসার এবং দুর্ব্বল, কেননা আমাদের সংকল্পের কারণনিচয় আমরা সকল সময়ে অবগত হইতে পারি না—সকল সময়ে কেন—কোন সময়েই আমরা সংকল্পের সকল কারণ স্থির করিতে পারি না। তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞাতব্য। সুতরাং আমরা যেমন ইচ্ছাকে স্বাধীন বোধ করি, শূন্য প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের যদি চিন্তাশক্তি থাকিত, তাহা হইলে উহাও মনে করিতে পারিত যে, আমি আপন ইচ্ছায় শূন্যমার্গে প্যারাবোলা আঁকিয়া পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিতেছি।

সংকল্পের কারণ, অজ্ঞাতব্য কেমন করিয়া হয়, তাহা বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারেন নাই। আমরা বুঝাইতে চাহি। ঐ যে দূরে ঐ উচ্চ বৃক্ষটি দেখা যাইতেছে, উহা আমি দেখিতেছি, কেননা উহাকে বৃক্ষ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। উটিকে বৃক্ষ বলিয়া বেশ উপলব্ধি হইতেছে, সুতরাং উহা দেখিতেছি; কিন্তু উটি কি বৃক্ষ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, উহার প্রত্যেক পত্র দৃষ্ট হইতেছে না। ঐ বৃক্ষটি যত দূরে আছে, তত দূরে একটি মাত্র পত্র থাকিলে তাহা কখনই দেখা যায় না। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি তাহা কি? পত্ররাজির সমষ্টি মাত্র।

একটি২ পত্র লইয়াই সমষ্টি। যদি কোন পত্রটিই দেখা না যায়, তবে সমষ্টি দেখা যাইবে কি রূপে? এ পত্রটি দেখা যাইতেছে না, ও পত্রটি দেখা যাইতেছে না, তৎপরস্থিত পত্রটি দেখা যাইতেছে না, কোন পত্রটিই দেখা যাইতেছে না, —তবে কিছুই দেখা যাইতেছে না, অথচ বৃক্ষটি দেখিতেছি। তবে কি বলিতে হইবে? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, প্রত্যেক পত্র-প্রেরিত আলোকরেখার কার্য্য, নয়নে এবং মনে হইতেছে, কিন্তু সে আলোকরেখা এত সূক্ষ্ম, তাহার কার্য্য এত অল্প যে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যেক পত্র প্রসারিত আলোকরেখা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না, কিন্তু পত্রসমষ্টি-প্রসারিত আলোকরেখাসমষ্টির কার্য্যসমষ্টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সুতরাং তাহা নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের মানসিক পরিবর্ত্তন হয়—মনে অনেক কার্য্য হয়, অথচ আমরা তাহা জানিতে পারি না। *

এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে যে, আমরা পুস্তক পাঠ করিতে২ অন্যমনস্ক হইয়া যাই—অন্য কোন চিন্তায় মন ব্যাপৃত হয়। কিন্তু তৎকারণে পাঠের কোন ব্যাঘাত হয় না। মন চিন্তা করে; চক্ষু পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া যায়। তার পর চমক্ ভাঙ্গিলে দেখি যে, অনেক দূর পড়িয়া গিয়াছি, কিন্তু কি যে পড়িয়াছি, তার বিন্দু বিসর্গও মনে হয় না। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, চক্ষুর কিছু পড়িবার ক্ষমতা নাই;—তবে কি হইয়াছে? মনই পড়িয়াছে। পুস্তকস্থ অক্ষরনিচয়-প্রসারিত আলোকরেখা চক্ষু সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে, সুতরাং মনেও তাহাদের কার্য্য হইয়াছে, অথচ মন তাহা জানিতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মনের অজ্ঞাতসারে মনের কার্য্য হইতে পারে। ইহাকেই ইংরেজী দার্শনিকেরা, অপরিজ্ঞাত মানসিক পরিবর্ত্তন বলেন। *

আরও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলণ্ডে কোন অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারাণ্ট বাহির হয়। অপরাধী, অপর এক বন্ধুর সহিত পলায়ন করিয়া, দূরস্থ একটি হোটেলে বিশ্রাম করিতেছিল। সেই ঘরের বাতায়ন সকল উন্মুক্ত ছিল। পথ বাহিয়া অসংখ্য লোক চলিয়া যাইতেছিল; অপরাধী বাতায়ন পথে তাহাই দেখিতেছিল এবং সঙ্গীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মুখ রক্ত শূন্য হইল চক্ষু নৈরাশ্য পরিপূর্ণ হইল, হস্তপদাদি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কেন যে এমন হইল, তাহা সে আপনি বুঝিতে পারিল না—তাহার সঙ্গীও, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন শান্তিরক্ষক আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তখন সকল স্থির হইল। বাতায়ন পার্শ্ব দিয়া যে সহস্র২ লোক যাইতেছিল, তাহার মধ্যে সে শান্তিরক্ষকও গিয়াছিল। অপরাধীর চক্ষে যে সহস্র২ ছায়া পড়িতেছিল, তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষকের ছায়াও পড়িয়াছিল। সে

* Hamilton gives a clear exposition of this. Vide his Lectures on Metaphysics.

* Latent or unconscious modifications of the mind.

স্বয়ং জানিতে পারে নাই, অথচ সে ছায়া পড়িবামাত্র মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, শরীর কম্পিত হইয়াছিল। যদি সে শান্তিরক্ষক তাহাকে গ্রেপ্তার না করিত, তাহা হইলে এ কম্পনের, এ নৈরাশ্যের, এ অবসাদের কারণ অপরিজ্ঞাত থাকিত এবং পরে অপরাধী মনে করিত যে, মন আপনা আপনি এমন হইয়াছিল। *

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, মনের সকল কার্য্য, সকল পরিবর্ত্তন, আমরা জানিতে পারি না; সুতরাং সংকল্পের সকল কারণ দেখিতে পাই না। সমাজ, শিক্ষা, অবস্থা সংস্কারবশতঃ, কোন্ বিশেষ সংকল্পের দিকে কি পরিমাণ প্রবণতা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না, স্থির করিতে পারি না। বাহ্য জগতের কার্য্য কতটুকু—শরীরের অবস্থার কার্য্য কতটুকু—ভয়ের কার্য্য কতটুকু, আশার কার্য্য কতটুকু—অনুরাগের কার্য্য কতটুকু, বিরাগের কার্য্য কতটুকু, তাহা জানিতে পারি না। মস্তিষ্কের লঘুত্ব অথবা গুরুত্ব, শোণিতের আধিক্য অথবা অল্পতা, অস্থির কাঠিন্যভেদ অথবা আয়তন ভেদ, পাকস্থালীর পটুতা অথবা অপটুতা—এ সকলের কি পরিমাণ কার্য্য হয়, তাহা টের পাই না। ইচ্ছাকে স্বাধীন স্থির করিবার এই একটি কারণ।

আমি এই বসিয়া লিখিতেছি। ইচ্ছার স্বাধীনতা পরীক্ষা করিবার জন্য, আমি মনে করিলাম যে, এখানে বসিয়া থাকা না থাকা আমার ইচ্ছাধীন কি না? অবশ্য ইহাই বোধ হইবে যে, আমি মনে করিলে, এখানে বসিয়া থাকিতে পারি; মনে করিলে এখান হইতে উঠিয়া একবার বেড়াইয়া আসিতে পারি। এক্ষণে কোন কার্য্য করিয়া—বসিয়া থাকিয়া না বেড়াইয়া আসিয়া—আপনার স্বাধীনতা সপ্রমাণ করিব? তুমি বলিবে উভয় পথ অবলম্বন করিবারই সমান সম্ভাবনা। আমি বলি তাহা নহে। আমি লিখিতেছি;—যদি লিখিতব্য অনেক কথা মনে উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত বসিয়া থাকিয়াই স্বাধীনতা সপ্রমাণ করিব। যদি মন অন্য দিকে গিয়া থাকে, অন্য সুখে মাতিয়া থাকে—ভবিষ্যতের কল্পনায় অথবা ভূতপূর্ব্বের আন্দোলনে মজিয়া থাকে—বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া এই বিষয়ে বাঁধিয়া দিতেছি, আবার পরক্ষণে বন্ধন ছিঁড়িয়া, না বলিয়া না কহিয়া, ছুটিয়া কোথায় উড়িয়া যাইতেছে—যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ লেখা বন্ধ করিয়া, উঠিয়া বেড়াইয়া, স্বাধীনতা সমর্থন করিব। চঞ্চলপ্রকৃতি যুবা, হয়ত উঠিয়া বেড়াইয়া মনে করিবেন, আমার ইচ্ছা স্বাধীন; আলস্যপরতন্ত্র বৃদ্ধ হয়ত বসিয়া থাকিয়া তাহাই মনে করিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, কেহই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলেন না। বৃদ্ধ বয়োধর্ম্মে বসিয়া থাকিলেন; যুবা বয়োধর্ম্মে উঠিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু বয়োধর্ম্মের কার্য্য কেহই দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং ইচ্ছা যে স্বাধীন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন।

ইচ্ছাকে স্বাধীন স্থির করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা ভূতপূর্ব্ব চিন্তা করিবার সময়, আপনার উপস্থিত অবস্থা হইতে আপনাকে বিযুক্ত করি-

* I do not, at this moment, remember where I found this. It is, I think, given by Hazlitt somewhere in his Table-Talk.

তে পারি না। আমি যখন স্মৃতি সহায়ে আপনাকে ভূতকালে সংস্থাপিত করিয়া, সে সময়ে কি করিতে পারিতাম, কি না করিতে পারিতাম, এই বিষয়ের কথা ভাবি, তখন, এখন যে আমি, সেই 'আমির' ক্ষমতা পরীক্ষা করি, তখন যে আমি ছিলাম, সে 'আমির' ক্ষমতা পরীক্ষা হয় না। সুতরাং প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকৃত সংকল্প সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। এখনকার 'আমি' যদি তখনকার 'আমি' হইত, তাহা হইলে যে পূর্ব্বকৃত কার্য্যবিশেষ হইতে অনায়াসে বিরত হইতে পারিতাম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তখনকার 'আমি' আসিয়া আজ যদি সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে চিনিতেই পারি না। এখনকার জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কার, অভাব ভুলিয়া রাখিয়া, ঠিক সেই 'আমি' হইয়া বল দেখি, পূর্ব্বকৃত কার্য্য বিশেষ হইতে বিরত হইতে পারিতে কি না? অবশ্য বোধ হইবে, পারিতে না।

আমরা যাহা বলিলাম, ডাক্তার প্রীসট্‌লিও তাহাই বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি, আপনার গত কর্ম্মের জন্য, আপনাকে আপনি ধিক্কার দেয়, তখন সে অবশ্য কল্পনা করে যে, সেই অবস্থায় আবার পড়িলে, অন্যরূপ কার্য্য করি। কিন্তু এটি ভয়ানক ভ্রম। যদি সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার মন অনুসন্ধান করিয়া দেখে; যদি সকল কথা ভাবিয়া দেখে; যদি মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ রাখিয়া দেখে; যদি বিষয়নিচয় সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ মতামত রাখিয়া দেখে; সে কার্য্য করার পর, যে জ্ঞান বৃদ্ধি, যে মত পরিবর্ত্তন, যে রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া দেখে, তাহা হইলে অবশ্য প্রতীতি হইবে যে, যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহার অন্যথা করিতে পারিতাম না।*

তুমি একবার প্রলোভনে পড়িয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, কিন্তু আবার যদি সেই অবস্থায় সেই প্রলোভনে পতিত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি, আবার সেই দুষ্কর্ম্ম কর। তুমি হয়ত বলিবে—"আচ্ছা! আমায় পরীক্ষা কর—সেই প্রলোভন দেখাও—আমি আর তাহাতে ভুলিব না।" আমিও জানি, তুমি ভুলিবে না—কিন্তু কেন? অবিকল সে অবস্থা হইবার যে আর উপায় নাই। সেই দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন হয়ত বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ—হয়ত কোন উৎকট বিপদে পড়িয়াছ—হয়ত নিজের এবং অপরের শ্রদ্ধা হারাইয়াছ—হয়ত কোন চিরাকাঙ্ক্ষিত ধনে বঞ্চিত হইয়াছ—হয়ত কোন প্রাণের অধিক প্রিয় বস্তু হারাইয়াছ—হয়ত কোন আশালতায় চিরকাল যত্নে বারি সিঞ্চন করিতেছিলে, সেই লতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সংসার চিনিয়াছ—কিসে কি হয়, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছ—তিলে যে তাল হয়, তাহা জানিতে পারিয়াছ, সুতরাং আর তাহাতে ভুলিবে না। সেই দিন অবধি আজি পর্য্যন্ত যত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, যত চিন্তা করিয়াছ, যত মনুষ্যচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সে জ্ঞান, সে চিন্তার ফল হইতে যদি বিযুক্ত হইতে পার, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি, ভাবিয়া বল দেখি, আবার সেই কার্য্য কর কি না? আর

* Priestley's Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated.

এক কথা। আর সে প্রলোভনে ভুলিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাই যে এক নূতন উদ্দেশ্য। যখন কার্য্যটি করিয়াছিলে, তখন এ কথা মনে ছিল না।

ইচ্ছাকে স্বাধীন বোধ করিবার তৃতীয় কারণ এই যে, আমরা জগৎ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বোধ করি। এই অনন্ত জগতের যে আমরা একটি অংশ—এই অনন্ত ঘটনাবলির মধ্যে আমরা যে একটি ঘটনা, তাহা আমরা মনে করি না। এটি আমাদের ভয়ঙ্কর ভ্রম।

তোমরা যে দিবারাত্র 'আমি২' করিয়া মর—আমি কে? ভাবিয়া বল দেখি—আমি কে? সকলই নিয়মের ফল; তুমিও নিয়মের ফল। যে অনন্ত নিয়মে জগৎকার্য্য হইয়া যাইতেছে, তুমি সেই নিয়মের একটি ফল মাত্র। এই সংসার-সাগরে যে লক্ষ২, কোটি২ তরঙ্গ উঠিতেছে, তুমি তাহারই মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বীচি—সাগর হইতে উঠিয়া আবার সাগরে মিলাইতেছ। তুমি তোমার শেষ নও; তুমি তোমার আদি নও। তুমি অন্য আকারে পূর্ব্বে ছিলা; তুমি অন্য আকারে পরেও থাকিবা, কেননা পরমাণুর বিনাশ নাই—কেননা সূক্ষ্মভূত নিত্য। প্রকৃতিই বিশ্বকার্য্যসংঘাতের মূল; প্রকৃতিই বিশ্বকার্য্যসংঘাতের শেষ।* তোমার পূর্ব্বে যে কোটি২ তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাদের কার্য্য, যার চক্ষু আছে, সে তোমাতে দেখিতে পায়। তোমার পর যে কোটি২ তরঙ্গ উঠিবে, সে সকলে তোমার কার্য্য, যার চক্ষু আছে, সে দেখিতে পাইবে। জগতে কিছুই নিরর্থক হয় না। বৃক্ষ হইতে একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িলে, তাহার কার্য্য, জগতে অনন্তকাল বিচরণ করে। আকাশমার্গে একটি ক্ষুদ্র পাখী উড়িয়া গেলে, তাহার পক্ষসঞ্চালন কার্য্য, যত দিন জগৎ থাকিবে, তত দিন থাকিবে। ঐ যে অদৃশ্যপ্রায় কীট কর্দ্দমের উপর বুকে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছে, উহারও গতির কার্য্য অনন্তকাল স্থায়ী। তুমি, তোমার পিতা মাতার অনুরূপ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছ; তাঁহারা, তাঁহাদের পিতা মাতার অনুরূপ; তাঁহারা আবার, তাঁহাদের পিতা মাতার অনুরূপ;—এই সূত্র ধরিয়া, যতদূর যাইতে পার যাও—যতক্ষণ কল্পনা, নিস্তেজ, অবসন্ন হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ যাও—তার পর দেখ, তুমি যেমন হইবে, তাহা কবে স্থির হইয়া রহিয়াছে? বল, লক্ষ২ ঘটনার মধ্যে তুমি একটি ঘটনা কি না? অন্ধ হইয়া অধিক দিন থাকিলে বস্তুনিচয়ের চক্ষুগ্রাহ্য গুণচিন্তা ক্রমশঃ কমিয়া যায়; বধির হইলে, ভাবসংসর্গ হইতে, শব্দচিন্তা ক্রমে অপসৃত হয়; যখন শরীর অবসন্ন হয়, তখন মনও অবসন্ন হয়; যখন ইন্দ্রিয় সকল সুষুপ্তিতে ডুবিয়া থাকে, তখন মনেরও কার্য্য হয় না; নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখ বটে, কিন্তু তাহা, এ জীবনের মধ্যে কয় দিন—যে সময় টুকু ঘুমাও, তার কত টুকু?*

* বিশ্বস্য কার্য্যসংঘাতস্য সামূলং। নত্বস্যা মূলান্তরমস্তি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

* Vide Locke's remarks on Dreaming. Hamilton's arguments against them are not conclusive. He made several experiments by causing himself to be awakened in the midst of his sleep; and he says, whenever he was so awakened, he found himself in the midst of a dream. All this is very well; but what ground had he to conclude, that the dream was not caused by the very act of awakening?

তবে—জড়জগতের সঙ্গে কি তোমার সম্বন্ধ নাই ? তুমি ইংলণ্ডে জন্মিলে দোকানদার হইতে, ফ্রান্সে জন্মিলে বিলাসী হইতে, জর্ম্মানিতে জন্মিলে দার্শনিক হইতে, আমেরিকায় জন্মিলে স্ত্রীলোকের বাহন হইতে, রাজপুতানায় জন্মিলে স্বদেশানুরাগী হইতে ; বঙ্গ দেশে জন্মিয়াছ, দাসত্বপ্রিয় হইয়াছ—জড় জগৎ হইতে কি তুমি বিযুক্ত ? সূর্য্য উঠিলে তুমি হৃষ্ট হও ; সূর্য্য না উঠিলে বিষণ্ণ হও ; বৃষ্টি হইলে বিরক্ত হয় ; আকাশ পরিষ্কার থাকিলে প্রফুল্ল থাক ; পর মুখভারি করে, তুমি ভাবিয়া মর ; পর দূরে যায়, তুমি কাঁদিয়া মর—তুমি জগৎ ছাড়া কিসে ? এ গ্রামে থাকিলে বেশ থাক ; ও গ্রামে থাকিলে মন ভাল থাকে না ; পূর্ব্বদিকের বাতাসে গা ভাঙ্গে, দক্ষিণ দিকের বাতাসে মন ভাঙ্গে ; শরীর পীড়িত হইলে মন পীড়িত হয়, মস্তিষ্কের ওজন কম হইলে ভাবিতে পার না—তুমি সংসার ছাড়া কিসে ? এখনও যদি বল, আমি সংসার ছাড়া, তবে তুমি তাই বটে। শুদ্ধ সংসার নয়—তুমি সৃষ্টি ছাড়া।

বিশ্ব ঘটনাময়। সেই অনন্ত ঘটনারাজির মধ্যে, তুমিও একটি ঘটনামাত্র। সংসারবৃক্ষে যে লক্ষ২ পত্র সমুদ্ভূত হয়, তুমি তাহার মধ্যে একটি। আজ বাহির হইলে, কাল্ বড় হইলে, পরশ্ব বৃদ্ধ হইলে, তার পর দিন শুষ্ক হইলে, পর দিন ঝরিয়া পড়িলে, তার পর—নিবিড় অন্ধকার। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ২ পত্র যেখানে গিয়াছে, তোমার পর লক্ষ২ পত্র যেখানে যাবে, সেই খানে চল। কোথায় সে ? ভূগর্ভে, সাগরসলিলে, অনন্ত আকাশে, দশ দিকে ; যেখানে ভূত আছে সেই খানে ; যেখানে পরমানু আছে সেই খানে।

তুমি বলিবে যে, মন, বাহ্যজগতের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করিলেও, জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। মনের কার্য্য এক প্রকার, ভূতের কার্য্য অন্য প্রকার। আত্মার কার্য্যের সঙ্গে, জড়জগতের কার্য্যের, দেখাও কোথায় সাদৃশ্য আছে ? আমি বলিতেছি—দেখাও কোথায় নাই ? মনে, স্মৃতি আছে, অনুরাগ আছে, প্রেম আছে, স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, প্রীতি আছে, শ্রদ্ধা আছে, বাৎসল্য আছে—জড়জগতে আকর্ষণ আছে ; প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে। মনে ঘৃণা আছে, দ্বেষ আছে, বিরাগ আছে—জড়জগতে প্রতিঘাত* আছে। মনে রাগ আছে—জড়জগতেও দুই পদার্থ ঘর্ষণ করিলে, উষ্ণতা সমুৎপন্ন হয়—বৃক্ষে২ ঘর্ষণে দাবানল হয়। জড়পদার্থে কাঠিন্য আছে—মনে, সহিষ্ণুতা আছে, ধৈর্য্য আছে, গাম্ভির্য্য আছে। তারপর বলিবেন—চিন্তা! মন যে অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতেছে, এ নিয়ত—চাঞ্চল্যের সাদৃশ্য কোথায় ? ভাবিয়া দেখুন, জড়জগতেও ঐ নিয়ম। গতি সম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম, নিউটন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্ব প্রথমটি এই ;—অন্য কোন পদার্থ আসিয়া গতিরোধ না করিলে, গমনশীল পদার্থ চিরকাল গমন করিবে।† সাদৃশ্য নাই কোথায় ? উভয়ের কার্য্যপ্রণালিই এক প্রকার। আমরা আরও সমধর্ম্মতা দেখাইতে পারিতাম,

* Resistance.

† A moving mass shall continue to move for ever, if its motion be not reterded by anything else Newton's First sew of motion.

কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম। যাঁহারা পদার্থবিদ্যার পারদর্শী তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক স্থলে, এই সমধর্ম্মতা দেখিতে পাইবেন, দেখাইতে পারিবেন।

আমাদের 'সীতারবনবাস' এবং 'বাহ্য বস্তু' পড়া পাঠিকাগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, 'শরীরের সঙ্গে জড় প্রকৃতির সঙ্গে মনের সম্বন্ধ কোথায়'—তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অতি সহজে বুঝাইতে পারি—পূর্ব্বোক্ত কটমট ছাড়িয়াই বুঝাইতে পারি। তাঁহাদিগকে বলি ;—আপনার চক্ষু দুটি যদি অমন সমুজ্জ্বল না হইত, তাহা হইলে আপনি, অধিক বিনয়বতী হইতেন; আপনার মুখ খানি যদি অত সুন্দর না হইত, তাহা হইলে আপনি কথায়২ রাগ করিতেন না; আপনার নাসিকাটি বেশ ছাঁচে তোলা বলিয়াই আপনি, এ প্রবন্ধ পড়িয়া নাক তুলিলেন ;—আর তুমি সুন্দরি !—তুমি যে লেখককে পাগল স্থির করিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছ, তোমার দন্তগুলি আর কিছু ছোট২ হইলে, বোধ করি, হাসিবার সময় মুখে কাপড় দিতেনা। স্বর্ণের শরীরটি বেশ গোলগাল—স্বর্ণ, দশটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘাটে যায় ; কুমুদের পা দুখানি বেজায় লম্বা—কুমুদ প্রাতঃস্নান করে। রামী ধান ভানে, শ্যামমোহিনী কারপেট্ বোনে ; কিন্তু দুই জনের মনই, শান্তিপুরের অথবা বালুচরের তাঁতে পড়িয়া থাকে। আপনারা যখন এত ভূতপ্রিয়—ভূতের জন্য আপনাদের মনে যখন এত বিকার, তখন আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, মন ভূতের বিকার বই আর কিছুই নহে।

রহস্য ছাড়িয়া বলিতেছি,তুমি যে মনে কর, অমুক কার্য্য না করিলে না করিতে পারিতাম—নির্ব্বোধ তুমি ! কি সাধে করিয়াছ ? সেই দিন সেই কার্য্য করিতে তুমি বাধ্য। তুমি ছায়াবাজির পুতুল মাত্র—বিশ্বব্যাপার তোমাকে যে দিকে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেই দিকে যাইতেছ। তুমি মান বা না মান, তোমাকে যাইতে হইবে। পৃথিবী ঘুরিতেছে—নিয়ত ঘুরিতেছে—তুমি মান বা না মান, ঘুরিবে দাঁড়াইয়া থাকিবে না ; তুমি ইচ্ছা কর বা না কর—তুমি মান বা না মান—তাহার সঙ্গে তোমাকেও ঘুরিতে হইবে।

ইচ্ছাকে স্বাধীন স্থির করিবার চতুর্থ কারণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক মত—তাঁহাকে পাপপুণ্যের ফল বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করা—তাঁহাকে বিচারকর্ত্তা স্থির করা। কিন্তু ঈশ্বর বিচারকর্ত্তা হইতে পারে না। তোমরা এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ—প্রাচীন ভারতে এ কথা ছিলনা। প্রাচীন আর্য্যেরা জানিতেন যে, সকলেই আপন২ কর্ম্ম ফল ভোগ করে ; ঈশ্বর যে ফল বিধান করেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এই কার্য্য কর, এই ফল হইবে—সব নিয়মাধীন। নিয়ম মত বিচার হয়, সমন জারি হয়, নথি তলব হয়, সাক্ষীসাবুদ লাগে—এত তাঁহারা জানিতেন না। তোমাদের কথাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা, মৃত্যুর পর বড়ই অপ্রস্তুত হইয়াছেন—বিচার স্থলে উপস্থিত হইয়া অবশ্য মনে২ করিয়াছেন,—"এত হবে তাতো জানিনে।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজ যাহা বলে তাহাই কি অভ্রান্ত।

সে যাহাই হউক, ত্রুটি যে ভ্রম, তাহা আমরা দেখাইতেছি—তোমাদের কথা দিয়াই দেখাইতেছি। ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ, ইহা আবশ্য স্বীকার কর; কিন্তু যিনি পাপের দণ্ড করেন, তিনি অপাপবিদ্ধ হইতে পারেন না। মনুষ্য মাত্রেই পাপী—নিষ্পাপ মনুষ্য কোথায় দেখিয়াছ? যুধিষ্ঠিরও প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন—আদমও ঈশ্বরাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন—নিষ্পাপ কে?

সুতরাং ঈশ্বর নিরন্তর পাপ দর্শন করেন;—তিনি যখন ফলবিধাতা, তখন অবশ্য করেন। যিনি, অনন্ত মনুষ্যের অনন্ত পাপ অনন্তকাল দেখিতেছেন, তিনি অপাপবিদ্ধ কিসে? সমুদয় বিশ্বব্যাপার তাঁহার মনে জাগিতেছে, সুতরাং মনুষ্যের অনন্ত পাপ তাঁহার মনে নিরন্তর জাগিতেছে—তিনি অপাপবিদ্ধ কেমন করিয়া? তবে তোমরা এরূপ অবশ্য বলিতে পার যে, পুণ্যের বিচারই তিনি করেন, এবং যদিও তিনি ফলবিধাতা বটেন, তবু পাপের বিচার নিজে না করিয়া, কমিটিতে রেফার করেন। মোকর্দ্দমা খারিজ করেন না ত?

অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে, আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে সংক্ষেপে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। কেহ২ বলেন যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। কোন২ অসূক্ষ্মদর্শী, পল্লবগ্রাহী ব্যক্তি বলেন যে, অদৃষ্ট মানিয়া লোকে নিরুদ্যোগ হয়, সুতরাং অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। এ কথাটি এত অসার যে ইহা খণ্ডনের অযোগ্য। তবু আমরা বলিতেছি যে, সকলই যখন নিয়তিবলে হয়, তখন উদ্যোগ নিরুদ্যোগও নিয়তিবলে হয়। যদি এরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে যে, অমুক দিন অমুক কার্য্য তোমার উদ্যোগে সিদ্ধ হইবে,তাহা হইলে তুমি উদ্যোগী হইতে বাধ্য। যদি তদ্বিপরীত নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য। কাহার মতামতে যে নিয়তি ফিরে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

অমৃতে গরল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশে যাত্রা।

এ দিকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজকুমার ও রাজকুমারীকে না দেখিয়া বাটীর সকলেই ব্যস্ত। পরীক্ষিত ও তাহার ভৃত্য উভয়ে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় রাজকুমারের সঙ্গে ক্ষীরোদবাসিনী বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুদেবী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া, দৌড়িয়া যাইয়া রাজনন্দিনীর হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। অন্যান্য দিবস তিলার্দ্ধ অদর্শনের পর সুদেবীকে দেখিলে যেমন হাসিতে২ যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন, অদ্য অনেকক্ষণ পরে এইরূপ দেখা হওয়া সত্বেও সেরূপ হাসি হাসিলেন না। হাসিলেন কিন্তু সে হাসিতে কিঞ্চিৎ

শুষ্কতা প্রকাশ পাইল। কথা কহিলেন, কিন্তু সে স্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাতরতা প্রকাশ পাইল। সু-দেবী বুঝিতে পারিলেন না, যে মৃণালের নিম্নে সর্প প্রবেশ করিযাছে। অমৃতে গরল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে !

দক্ষিণা দৌড়াদৌড়ি আসিয়া ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল " বউ, পাক করি-তে করিতে কোথায় গিয়াছিলে ?" ক্ষীরোদবাসিনী মৃদুস্বরে বলিলেন " এই এখানেই।" " এসে বিজয়কে ভাত দাও, ব্যারাম শরীর, তাতে এত রাত্রি—"এই বলিতে২ বুড়ি চলিয়া গেল।

এস্থলে পাঠককে একটী কথা বলিলে বোধ করি বিরক্ত হইবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বকালের লোকেরা অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। আ-মাদের দক্ষিণা বুড়িও তাঁহাদের মধ্যে এক জন। বিজয়সিংহ ও ক্ষীরোদবাসিনী উভয়েই রাজবংশোদ্ভব, দক্ষিণা তাহার কিছুই জানিত না। জানিতে পারিলে তাহাদিগকে কিরূপ সম্ভাষণ করিত, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু তাহারা যে ধনবন্তের ঘরের পুত্র, কন্যা তাহা সে জানিত। বিজয়ের বয়স অল্প বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, দক্ষিণা বিজয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিত, এক্ "বিজয়" বলিয়াই ডাকিত। আবার ক্ষীরোদবাসিনী যে বিজয়ের স্ত্রী, ইহা তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ক্ষীরোদবাসিনীকে যে "বউ" বলিয়া ডাকিবে এ কোন্ বিচিত্র কথা ? পক্ষা-ন্তরে ক্ষীরোদবাসিনীকে "বউ" বলিয়া ডাকিলে তিনি সন্তোষ হইতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে "বউ" বলিয়া ডাকিলে মৃদুমন্দ হাস্য করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লচিত্তে কথার উত্তর প্রদান করিতেন।

কিন্তু অদ্য দক্ষিণা " বউ " বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে ডাকিলে যে তিনি কি জন্য মৃদুস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক নিজে নিজেই বুঝিয়া লইবেন। আজ শুভ্র বসনে কা-লিমা পতিত হইয়াছে ! সরল মনে গরল প্রবেশ করিয়াছে।

ক্ষীরোদবাসিনী ধীরে২ রন্ধনশালায় যাইয়া সকলের জন্য আহার প্রস্তুত করি-লেন। অগ্রে রাজকুমার আহার করিয়া শয়ন করিলেন, পরে আর আর সকলে ভোজন করিল। রাজনন্দিনী সে রাত্রি-তে কিছুই আহার করিলেন না। বৃদ্ধের সহিত রাজ পুত্রের যে সকল কথা হই-য়াছিল, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কথাগুলি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তিনি সকলই শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে বিজয়সিংহ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। অন্যান্য বিষয়ের কথা-বার্ত্তার পর, স্বদেশে প্রত্যাগমনের কথা উপস্থিত হইলে, বিজয়সিংহ কহিলেন, "আমার আর দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, ও পাপরাজ্য হইতে দূরে থাকাই ভাল, বরঞ্চ আপনি রাজনন্দিনী-কে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে গমন করুন, আমি এই মহাত্মার সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হই।"

মন্ত্রী কহিলেন, " পাপরাজ্য যে তা-হার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈর-নির্যাতন না করা বীরপুরুষদিগের ধর্ম্ম নহে। আমার চরমদশা উপস্থিত আমিই তীর্থ যাত্রায় নির্গত হই, আপনি রাজ-

নন্দিনীকে সঙ্গে লইয়া সারণগড়ে গমন করুন।" এই সময় সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনারা উভয়েই বিষয়ী ও সাংসারিক। পার্থিব পদার্থের উপর হইতে মনকে সম্যকরূপে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম সাধন হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় আপনারা উভয়েই দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সংসার ধর্ম্ম করুন।"

অবশেষে এই যুক্তিই স্থিরীকৃত হইলে পর, মন্ত্রী কহিলেন, "চতুর্দ্দিকে শত্রু বেষ্টিত, এজন্য দিবাভাগে গমন না করিয়া, রাত্রিতেই গমন করিলেই ভাল হয়। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।"

বিজয়সিংহ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। বরং সেই রাত্রিতেই যাহাতে তথা হইতে রওয়ানা হইতে পারেন, এরূপ উদ্যোগ করিবার জন্য সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার সময় মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীঠাকুরের সহিত যে পরিচিত হইতে পারিলাম না, এইটীই বড় মনে দুঃখ রহিল," মন্ত্রী রাজকুমারের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনার পরিচয় ত কল্য রাত্রেই আমি ইহাঁকে প্রদান করিয়াছি, ইহাঁর পরিচয় দিবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। তবে এইমাত্র বলি, যে কল্য রজনীতে আপনি যে পত্র পড়িয়াছিলেন, সে খানি ইহাঁরই প্রদত্ত। ইনিই তাহা পথে পড়িয়া পাইয়াছিলেন। এবং ইনিই আপনাদিগের অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।" তখন কুমার প্রীতিপ্রফুল্ল মনে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পরীক্ষিতের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে সমস্ত অবগত করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষিত তিন খানি শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এবং ভৃত্যকে সারণগড় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিতে কহিয়া ছিলেন, ভৃত্য যাইতে প্রস্তুত হইল। ক্ষীরোদবাসিনী কর্ণের অপর স্বর্ণ কুণ্ডলটী লইয়া পরীক্ষিতের হস্তে দিয়া বলিলেন "এইটী চিকিৎসককে দিও। এই রত্নকণ্ঠী তোমার দয়ার পুরস্কার স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম। আর এই রত্নচূড় তোমার তনয়াকে আমি স্বহস্তে পরাইয়া দিব, ইহা কহিয়া তিনি স্বহস্তে সুদেবীকে রত্নচূড় পরাইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সুদেবী ক্ষীরোদবাসিনীর গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, ক্ষীরোদবাসিনী সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর গমনের যথোপযুক্ত আয়োজন হইলে, বিজয়সিংহ, ক্ষীরোদবাসিনী ও মন্ত্রী তিন জনেই শিবিকা আরোহণ করিলেন। পরিক্ষিত, তাঁহার জননী, সুদেবী তাহারাও কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যতদূর দৃষ্টি চলিল সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিল, পরে দৃষ্টির অতীত হইলে সকলেই এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদ।

চির দিন কাহারও সমান ভাবে যায়

না। অদৃষ্টের ফল সকলকেই সমান পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে। দসরথাত্মজ রাম চন্দ্র রাজার পুত্র, রাজার জামাতা, বিপুল ঐশ্বের অধিকারী, কিন্তু অদৃষ্টের লিখন! বিমাতার কুচক্রে বনে২ ভিকারির ন্যায় ভ্রমণ করিয়া জীবনের সার ভাগকে গত করিতে হইয়াছিল। বিজয়সিংহও রাজপুত্র, অতুল সম্পত্তিশালী, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। কিন্তু অদৃষ্টের লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, বিমাতার বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া দেশ দেশান্তরে, বনে, জঙ্গলে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া একাল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিলেন। পুনর্ব্বার জন্মভূমিতে আগমন করিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ পরাধিন! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের রাখাল, ব্রজ গোপিনীদিগের নবনী গোপনে চুরি করিয়া খাইতেন এবং বৃন্দাবনে রাখালগণসহ গোচারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সুখ ছিল, অন্যের রাজত্ব পাইয়া সুখি হইলেন, এখন মথুরার রাজা। জগৎমোহন একাল পর্য্যন্ত পরান্নে প্রতিপালিত, কুলবধুগণের সর্ব্বনাশ্ এবং বনে২ দস্যুগণ সহ কালাতিপাত করিতেন কিন্তু অদৃষ্টে সুখ লেখা আছে, তিনি অনঙ্গপুরের রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অতুল সুখের অধিকারী হইলেন।

জগৎমোহন অনঙ্গপুরের রাজা, সারণগড়ের রাজপ্রতিনিধি, সমস্ত দেশ মধ্যে একাধিপত্য। কোন বিষয়েরই অভাব নাই। তত্রাচ প্রকৃত সুখের সুখী নহেন। সময়ে২ নানাবিধ দুশ্চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; চিন্তা এই—কিরূপে বিজয়সিংহের প্রাণ বিনষ্ট করিবেন; কারণ তাঁহার মনে এইটী দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বিজয় জীবদ্দশায় থাকিতে, তিনি কখনই ক্ষীরোদবাসিনীকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। এবং তাঁহার স্বোপার্জ্জিত রাজ্যকেও রক্ষা করিতে পারিবেন না, কালে বিজয় তাঁহার নিকট হইতে রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেই করিবে।

বিজয়সিংহ, ক্ষীরোদবাসিনী ও মন্ত্রির সহিত সারণগড়ে পৌছিয়া প্রথমতঃ পরীক্ষিতের ভৃত্যকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, পরে মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "এক্ষণে কোথায় যাওয়া কর্ত্তব্য?" মন্ত্রী কহিলেন, "আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন" কুমার কহিলেন, "শুনিলাম মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত সুতরাং প্রথমতঃ তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া কোথায়ও যাইতে পারি না, অতএব আমাকে একবার সারণগড়ে যাইতে হইবে।"

বিজয়সিংহের কথাতে ক্ষীরোদবাসিনী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তবে আপনি গমন করুন, আমরা আর সে পাপ পুরিতে যাইব না, আমরা চন্দ্রপুরেই গমন করি।

বি। আচ্ছা তাহাই হউক।

ক্ষী। "আপনার সঙ্গে কবে দেখা হইবে?"

বি। "কল্য না হয় পরশ্ব দিবসে আমি চন্দ্রপুরে যাইব।"

মন্ত্রী। "আমি আর চন্দ্রপুরে যাইব না, এ মুখ লোকের নিকট দেখাইতে বড়ই লজ্জা বোধ হয়।"

বি। আপনি প্রথমতঃ মন্ত্রী মহাশয়ের বাটীতেই গমন করুন, বরঞ্চ আপনার যদি বেশি লোকের মধ্যে থাকিতে

কষ্ট বোধ হয়, তবে আপনি মন্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে না থাকিয়া তাঁহার প্রমোদ-কাননের নিকট রত্নমালার বাটী আছে, আপনি সেই বাটীতে থাকিবেন, তাহা হইলে কোনই কষ্ট হইবে না।"

ম। "রত্নমালা কে?"

বি। "মন্ত্রী মহাশয়ের এক জন পরিচারিকা।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। বিজয়সিংহ সারণগড়ে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

কুমার দীর্ঘকাল পরে সারণগড়ে আগমন করিলেন, কোথায় সকলে তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইবে, না পুরবাসীগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বিরস ও বিষাদিত হইলেন। রাজ্যেরও সে শ্রী নাই, স্থানে২ জঙ্গলময়, রাজপথ সকল অপরিস্কৃত, কুমার বুঝিতে পারিলেন "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।" প্রবল ঝটিকাতে রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

যেমন বাহিরে, ভিতরেও ততোধিক। কুমার পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী রক্ষককে কহিলেন, "মহারাজকে প্রণাম জানাইয়া আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর।" রক্ষক শ্রবণমাত্রে চলিয়া গেল। কুমার তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে রক্ষক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মহারাজ অজ্ঞানাবস্থায় আছেন, এখন দেখা হওয়া অসম্ভব।" কুমার জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভাগ্যে আর পিতৃদর্শন ঘটিবে না" অগত্যা পুনরায় পুরী হইতে প্রস্থান করিবার মানসে দ্বারদেশে আগমন করিলেন।

নগরপাল সেই সময় দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন, সে বিজয়সিংহকে পুরী-হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া করযোড়ে কহিল 'রাজকুমার' কোথায় গমন করিতেছেন?"

বিজয়সিংহ কহিলেন "চন্দ্রপুরে যাইতেছি।"

নগরপাল। "মহারাজ কাতর, এ অবস্থাতে দুই এক দিন এখানে থাকিয়া গেলে ভাল হইত না?"

বিজয়। "মহারাজকে দেখিবার মানসেই আসিয়াছিলাম, দেখা হইল না, তখন আর থাকিয়া ফল কি?

নগরপাল আর কোন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।"

বিজয়। "আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, আমাকে কোন কথা বলিবা।" নগরপাল তখন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিল, "মহারাণীর ইচ্ছা যে, আপনি তাঁহার বিনাভিপ্রায়ে কোথায়ও না যান।"

শ্রবণমাত্রে রাজকুমারের মুখ গম্ভীর হইল, চক্ষু দুইটী রক্ত বর্ণ হইল, গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি পুনর্ব্বার পুরীর মধ্যে গমন করিলেন।

এদিকে মন্ত্রী ও ক্ষীরোদবাসিনী চন্দ্রপুরে মন্ত্রীর ভবনে যাইয়া উপনীত হইলেন। ক্ষীরোদবাসিনীর শিবিকা খিড়কির দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, মন্ত্রী মহাশয় বর্হির্বাটীতে গমন করিলেন।

সারণাধিপতির মন্ত্রী সে সময় দরবার করিতেছিলেন, হঠাৎ পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুকে সমাগত দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে

আলিঙ্গন করিলেন। কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব। পরে সারনরাজ্যের মন্ত্রীর প্রশ্নানুসারে আগন্তুক সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলেন, শুনিয়া মন্ত্রীর মনোমধ্যে সুখরাশি উত্থিত হইল এবং চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু আনন্দাশ্রুও পতিত হইল। অবশেষে অনেক্ষণ আলাপাদির পর অনঙ্গপুরের রাজমন্ত্রী বলিলেন "আমার অধিক লোকের মধ্যে থাকিতে বড় কষ্ট বোধ হয়, যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে আমি রত্নমালার বাটীতে থাকিতে পারি।" শৈলবালার পিতা কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন, "রত্নমালার সহিত আপনার কবে পরিচয় হইল ?"

"রত্নমালার সহিত আমার পরিচয় নাই, তবে আপনার পরিচয়েই আমার পরিচয়, বিশেষতঃ আসিবার সময় কুমার বিজয়সিংহ আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন।" শৈলবালার পিতা এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না, বরং মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রত্নমালার বাটীতে গমন করিলেন।

পাঠক, এক বার এই সময়ে চল দেখিগে শৈলবালা কিরূপ অবস্থায় আছেন।

শৈলবালা পীড়িতা। চিকিৎসকের পরামর্শ, পীড়িত শরীরে স্থান পরিবর্ত্তন করা অতীব কর্ত্তব্য। শৈলবালা এক্ষনে মন্ত্রীর প্রমোদকাননস্থিত অট্টালিকায় অবস্থিতি করিতেছেন। সরোজিনী ও হেমলতা তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। আবশ্যক মত মন্ত্রী ও চিকিৎসক তথায় আগমন করিয়া থাকেন, এতৎব্যতীত অন্য কাহারও সে গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই।

শৈলবালা শয্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মস্তকের নিবিড় কেশরাশি আলুলায়িতভাবে উপাধানের উপর দিয়া মৃত্তিকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। চক্ষু দুইটী নিমীলিত। মুখের আর সে অপূর্ব্ব কান্তি নাই, কিঞ্চিৎ নিলীমা লক্ষিত হইতেছে। ওষ্ঠদ্বয়ের আর সে সুচিক্কণ সৌন্দর্য্য সে অপরূপ-মাধুর্য্য নাই, এক্ষণে তাহা শুষ্ক ও মলিনভাব ধারণ করিয়াছে। অঙ্গে তাদৃশ অতিরিক্ত অলঙ্কার ছিল না। যাহা দুই এক খানি ছিল, তাহা শরীরের শীর্ণতা হেতু শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। নব যৌবনের আর সে প্রস্ফুটিতভাব লক্ষিত হইতেছে না, তাহা এক্ষণে সায়হ্নু কমলিনীর ন্যায় বিরসভাব ধারণ করিয়াছে। সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সে জগজ্জন-মনোরঞ্জন-মাধুর্য্য, সে বিস্ফারিত কান্তি এক্ষণে কিছুই নাই, সমস্তই মলিনতাতে পরিণত হইয়াছে। আকার মেঘাচ্ছন্ন, শশীও মেঘাচ্ছন্ন !

সরোজিনী শৈলবালার মস্তকের নিকট বসিয়া আছেন। এক হস্ত শৈলবালার বক্ষোপরি রহিয়াছে, অন্য হস্ত দ্বারা বীজন করিতেছেন। সজল নয়নের অনিমিষ দৃষ্টি শৈলবালার মুখের উপর পতিত রহিয়াছে। তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় হেমলতা সহাস্য মুখে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হেমলতার এরূপ ভাব দৃষ্টে সরোজিনী ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "হেম, এই বুঝি তোমার হাসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ?" হেমলতা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া কহিলেন "একটী সুসংবাদ পাইলাম, তাই তোমাকে বলিতে আসিলাম।" ইহা কহিয়া তিনি সরোজিনীর কর্ণের নিকট মুখ লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, রাজকুমার নাকি দেশে আসিয়া-

ছেন।” রোগী, ভোগী, যোগী, ও নির্দ্ধন ব্যক্তিদিগের চক্ষে নিদ্রা নাই। “রাজকুমার” এই শব্দটী শৈলবালার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। চির অভিলষিত বস্তু নাই। সুতরাং পুনর্ব্বার চক্ষু নিমীলিত করিলেন। সরোজিনী ও হেমলতা তাহা জানিতে পারিলেন না।

সরোজিনী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, “রাজপুত্র কবে আসিয়াছেন?”

হেমলতা। “অদ্যই আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি সারণগড়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন। রাজকুমারী ক্ষীরোদবাসিনী ও অনঙ্গপুরের রাজমন্ত্রী আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন।”

সরো। তুই সচক্ষে দেখিয়াছিস?”

হেম। “না, রত্নমালা বলিল, সে সচক্ষে দেখিয়াছে।”

সরো। “তবে তুই একবার শীঘ্র যাইয়া দেখিয়া আয়।”

হেমলতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। সরোজিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজে নিজেই কহিলেন “হা! রাজকুমার! তোমার মনে এই ছিল। এই সময় তাহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু শৈলবালার মুখের উপর পতিত হইল। শৈলবালা পুনর্ব্বার চক্ষুরুণ্মীলন করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন “বউ, কাঁদিতেছ?”

“না” ইহা বলিয়া সরোজিনী নিস্তব্ধ হইলেন। শৈলবালাও চক্ষু মুদিত কিরলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে সরোজিনী কহিলেন “শৈল, শরীর কেমন আছে।”

শৈল। “ভাল।”

সরো। “সন্ধ্যা অ[illegible]তে প্রায়। এসময় একবার উঠিয়া ব[illegible]লে ভাল হয় না?”

“আচ্ছা।” ইহা বলিয়া শৈলবালা হস্ত প্রসারণ করিলেন, সরোজিনী শৈলবালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া উঠাইলেন।

শৈলবালা কহিলেন, “আমাকে ধরিয়া রাখিতে হইবেনা, আমি এম্নিই বসিতে পারিব।” সরোজিনী আহ্লাদ সহকারে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন “শৈল, ক্ষু[illegible] হইয়াছে?”

শৈল। “না।”

সরো। “অমন ছট্ ফট্ করিতেছ কেন? শরীর অস্থির করিতেছে?”

শৈল। “না। শরীর আজ বেশ্ আছে।”

সরো। “তুমি তবে বস আমি একটা প্রদীপ লইয়া আসি।”

শৈল। “হেম কোথায় গিয়াছে?”

সরো। “হেম বাটীর উপর গিয়াছে।”

শৈল। “কেন?”

সরো। “রাজকুমারী ক্ষীরোদবাসিনী আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন, তাই দেখিতে গিয়াছে।”

শৈলবালার শরীর রোমাঞ্চিত হইল কহিলেন, “তিনি কোথা হইতে আসিলেন?”

সরো। “তাহা জানি না।”

শৈল। “কাহার সঙ্গে আসিলেন?”

সরো। “শুনিলাম অনঙ্গপুরের রাজমন্ত্রীর সহিত আসিয়াছেন।”

শৈলবালার নিকট বিজয়সিংহের আগমন সংবাদ দিতে সরোজিনীর ইচ্ছা ছিল না। কারণ তিনি জানিতেন পীড়িতের নিকট দূরাগত বন্ধুর আগমন সংবাদ প্রদান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু শৈল-

বালার মনোমধ্যে বিজয়সিংহের রূপ অহর্নিশি জাগিতে ছিল, তিনি কহিলেন "আর কেহ আসিল না?" ইহা কহিয়া শয়নের উদ্যোগ করিলেন। সরোজিনী কহিলেন, "রাজকুমারও নাকি এই সঙ্গে আসিয়াছেন।" কথা শুনিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শৈলবালা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া শয়ন করিলেন।

শৈলবালা শয়ন করিলে পর, সরোজিনী পুনর্ব্বার কহিলেন "শৈল, রাজপুত্র আসিয়াছেন?" শৈলবালা সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। কেবল একবার মৃদুস্বরে "হুঁ" বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

একি শারীরিক কাতরতা না অভিমান?

সরোজিনী ভাবিলেন শরীর অসুস্থ হইলে কিছুই ভাল লাগে না। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া প্রদীপ আনয়নার্থে গমন করিলেন।

শৈলবালা মৃদুস্বরে কহিলেন "বউ, তুমিও আমাকে একা রাখিয়া গেলে?" সরোজিনী তাহা শুনিতে পাইলেন না। শৈলবালা ঈষৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া "হেম—হেম" করিয়া দুইবার ডাকিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। "হেম, এখনও আসিল না।" ইহা কহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিলেন।

বর্ষার জল যেমন বেগে গমন করিতে করিতে শিলাখণ্ডে আঘাতিত হইয়া ঘুর্ণার উৎপত্তি করে, এবং সেই ঘুর্ণীয়মান জলরাশি আড়ির নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রান্তর, গ্রাম, বন, উপবন সকল উদরসাৎ করিতে থাকে, সেইরূপ শৈলবালার যৌবনস্রোতও বিরহশৈলে আঘাতিত হইয়া চক্রাকারে ঘুর্ণিত হইতেছিল, নব নব চিন্তার উৎপত্তি করিতেছিল—এতদ্দ্বারা যে পরিণামে তাঁহার জীবনকে আত্মসাৎও না করিবে, কে বলিতে পারে?

